সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

অষ্টবিংশ বর্ষ

১৩২৫

VISVA-BHARATI
LIBRARY

কলিকাতা,
২।১ রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩এ, রাধাপ্রসাদ লেন মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
	অ	
অকলঙ্ক উদ্ভিদ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে	৮৬৫
	আ	
আমাদের শিক্ষা	সার্ আশুতোষ চৌধুরী	৫৭০
আয়ুঃ ও কোষ	শ্রীশশধর রায়	৪৭
আলোচনা	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১১
আলোচনা	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৬৭০
আর্য্য ও ইত্রীয় জাতির বিবাহ	শ্রীআজিমউদ্দীন আহম্মদ	৬৮, ১৫৪, ১৮৪
আর্য্য ও ইত্রীয় জাতির আচার ব্যবহার	,,	৩৫৭
আর্য্য ও ইত্রীয় জাতির কৃষিকার্য্য	,,	৪৩২
আর্য্য ও ইত্রীয় ভূমির উদ্ভিদতত্ত্ব	,,	৬৬৩
আর্য্য ও ইত্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব	,,	৭০০
	ঈ	
ঈথার	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	৪১৯, ৬০১
	উ	
উরুক্ষিতি ও পঞ্চজন	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৫০০
	ঋ	
ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্য	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৭২৪
	ক	
কামরূপের ইতিহাসের একাংশ	শ্রীআমানতউল্ল আহম্মদ চৌধুরী	৬৮১, ৮৫৩
কুইনাইন পিল (গল্প)	শ্রীনিধিরাম	৭৬৩
	খ	
খ্রীষ্ট যজ্ঞ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৮৫

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা

গ

গল্প-সাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৬
গায়ক পাখী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪২৯
গোরা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৭৪৫
গোরা ও তাহার অবিনাশ	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	৬৩১
গৌড়-প্রসঙ্গ	শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	২৬৪

চ

চন্দ্র-রশ্মি	শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	৫৬৭
চন্দ্রের বঙ্গবিজয়	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	৬০৯
চিরসুন্দরী (কবিতা)	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৫
চিড়িয়াখানা (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৮

জ

জিজিয়া	আবদুল কালাম মোহাম্মদ সামসুদ্দিন	৪২২

ত

তন্ত্রের ইতিহাস	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৪৬৫
তিমুর বুদ্ধি (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬১২

দ

দুখে দুলী (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭১০
দুর্গোৎসবের ব্যাপার (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫২০

ন

দ্বাসপাতি ও নাসপাতি	৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	২৩৩
নায়িকার শেষ কথা (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪২৮
নির্ব্বোধের শাস্তি (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮৭৮

প

পরীর শ্রম (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫০৬
প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে	৬৯৫

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
প্রাচীন শিল্প-পরিচয়	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৫১, ৮২৫
প্রাণময় প্রেম (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭৪৪
পুরাতন বাটী (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১১৮
পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	২৯২, ৪১৩
পুরুষ যজ্ঞ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩১৩
ব		
বাঁশের কথা	শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন	৭৩৬
বিশু মল্লিকের অধঃপতন (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৫১
বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৬৪৮
বৈরাগী (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৬২
ভ		
ভারতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	২৪১
ভালবাসার আর এক ধারা (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩০২
ম		
মক্কা-ভ্রমণ	শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী	২০৭
মল্লারিসেবক	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	২৯৯
মানব-মঙ্গল	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৪১
মালবাবুর কোটশিপ (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৯৩
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	সম্পাদক	৭৬, ১৬০, ২৩৫, ৩০৪, ৩৮৭, ৪৫৭, ৫৩৫, ৬০৫, ৬৭৭, ৭৪৬, ৮২০, ৮৮৯
র		
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস	৮৬৮
রায় পরিবার (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৭৯৫, ৮৩০
শ		
শাস্তি (গল্প)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	২১৫

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠা
	স	
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	সম্পাদক	৬৭৫, ৮১৭
সঙ্গীত-ঔষধ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৬৬
সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ	শ্রীআবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	৬২৫
সন্ধ্যায় (কবিতা)	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২৭
সপ্ত-সিন্ধু	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৫৭৭
সমর্পণ (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫২৩
সমুদ্র-তীরে (গল্প)	শ্রীগুরুদাস সরকার	৪৮৪
সহযোগী সাহিত্য	শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৬, ১৩৮, ২০১ ২৮৬, ৩৮১, ৪৪১
সহযোগী সাহিত্য	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৬৫৬
সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয়	শ্রীমহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	৭৮৬
স্থাপত্য-শিল্প	শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১১১, ৬১৭
স্বাভাবিক রঙ্গে আলোক-চিত্র	শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫৯৩
সিন্ধুর মা (গল্প)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৫৪৬
সোম যাগ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১
	হ	
হৃদয়-শ্মশান (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৯, ১৪৩, ১৯০, ২৭৪, ৩৫০
হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র	সার আশুতোষ চৌধুরী	৮০৯
হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৭৫৩

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহযোগী সাহিত্য ৫৬, ১৩৮, ২০১, ২৮৬, ৩৮১, ৪৪১

আজিমউদ্দীন আহম্মদ

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির বিবাহ ৬৮, ১৫৪, ১৮৪
আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার ৩৫৭
আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির কৃষিকর্ম্ম ৪৩২
আর্য্য ও ইব্রীয় ভূমির উদ্ভিদতত্ত্ব ৬৬৩
আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব ৭০০

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

মক্কা-ভ্রমণ ২০৭

আবদুল কালাম মোহাম্মদ সামসুদ্দিন

জিজিয়া ৪২২

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ৬২৫

আমানতউল্লা আহম্মদ

কামরূপের ইতিহাসের এক অংশ ৬৮১, ৮৪৩

সার আশুতোষ চৌধুরী

আমাদের শিক্ষা ৫৭০
হিন্দুধর্ম্মের বীজমন্ত্র ৮০৯

কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা ২১১
গদ্য-সাহিত্যে ভক্তের খিচুড়ী ২২৬

কালিদাস ভট্টাচার্য্য

ঈথার ৪১৯, ৬০১

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র ৫৯৩

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

চিরসুন্দরী (কবিতা) ১৬৫
সন্ধ্যায় (কবিতা) ২৭

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

তন্ত্রের ইতিহাস ৪৬৫
প্রাচীন শিল্প-পরিচয় ৫২, ৮২৫
মল্লারিসেবক ২৯৯

গুরুদাস সরকার

সমুদ্রতীরে (গল্প) ৪৮৪

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গোরা (কবিতা) ৭৪৫

৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

জাসপাতি ও নবন্যাস ২৭৩

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

উরুক্ষিতি ও পঞ্চজন ৫০০
ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্য ৭২৪
পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ ২৯২, ৪১৩
বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি ৬৪৮
সপ্ত-সিন্ধু ৫৭৭
হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল ৭৫৩

নিধিরাম

কুইনাইন পিল (গল্প) ৭৬৬

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
তিমুর বুদ্ধি (গল্প) ৬৩২
দুখে দুলী (গল্প) ৭১০
নির্ব্বোধের শাস্তি ৮৭৮
বৈরাগী (গল্প) ৩৬২
সমর্পণ (গল্প) ৫২৩

নলিনীমোহন রায়চৌধুরী
সহযোগী সাহিত্য ৬৫৬

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গায়ক পাখী ৪২১

প্রবোধচন্দ্র দে
অফলন্ত উদ্ভিদ ৮৬১
প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান ৬৯৫

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
আলোচনা ৫৭০

ভূপেন্দ্রমোহন সেন
বাঁশের কথা ৭৩৬

ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
শান্তি (গল্প) ২১৫
সিদুর মা (গল্প) ৪৪৬

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
স্থাপত্য-শিল্প ১১১, ৬১৭

মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয় ৭৮৬

যতীন্দ্রমোহন সিংহ
গোরা ও তাহার অবিনাশ ৬৪৩

যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নায়িকার শেষ কথা (কবিতা) ৪২৮
প্রাণময় প্রেম (কবিতা) ৭৪৪
ভালবাসার আর এক ধারা (কবিতা) ৩০২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
খ্রীষ্ট যজ্ঞ ৮৫
পুরুষ যজ্ঞ ৩১৩
সোম যাগ ১

রাধাগোবিন্দ বসাক
চন্দ্রের বঙ্গবিজয় ৬০৯
ভারতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য ২৪১

শশধর রায়
আয়ুঃ ও কোষ ৪৭

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
চিড়িয়াখানা (গল্প) ২৮
দুর্গোৎসবের ব্যাপার (গল্প) ৫৫০
পুরাতন বাটী (গল্প) ১১৮
পরীর শ্রম (গল্প) ৫০৬
বিশু মল্লিকের অধঃপতন (গল্প) ২৫১
মালবাবুর কেটিশিপ (গল্প) ৩৯৩
সঙ্গীত ঔষধ ১৬৬

সম্পাদক
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৭৬, ১৬০, ২১৫, ৩০৪, ৩৮৭, ৪৫৭, ৫১৫, ৬০৫, ৬৭৭, ৭৪৬, ৮২০, ৮৮৯

হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী
গৌড়-প্রসঙ্গ ২৬৪
চন্দ্র রশ্মি ৫৬৭

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মানব-মঙ্গল ৫৪১

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বায় পরিবার ৭৯৫, ৮৩০
হৃদয় শ্মশান ৫৯, ১৪৩, ১৯০, ২৭৪, ৩৫০

সোম যাগ।

সোম যজ্ঞ অতি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত জটিল। অনেক সরঞ্জাম আবশ্যক; বহু ঋত্বিক আবশ্যক; ব্যয় বিধানও যথেষ্ট। সকলের পক্ষে ইহা সাধ্য ছিল না। সেই জন্য ইহা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইত না। তবে ব্রাহ্মণের ঘরে পর পর তিন পুরুষের মধ্যে কেহ সোম যাগ না করিলে নিন্দা হইত। সেই ব্রাহ্মণকে দুর্ব্রাহ্মণ বলিত। সোম যজ্ঞ আর্য্য-জাতির অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বেই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরাণীদের মধ্যে সোম যজ্ঞ চলিত ছিল। সোম স্বয়ং এক জন দেবতা। দেবতাদের মধ্যে এক জন রাজা। পরবর্ত্তী কালে দেবতাদের মধ্যে চারি জন রাজার কথা শুনা যায়। এক এক রাজা এক এক দিকের অধিপতি। রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের, যম রাজা দক্ষিণ দিকের, রাজা বরুণ পশ্চিম দিকের, রাজা সোম উত্তর দিকের অধিপতি। দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। পার্থিব সোম মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ। এই পার্থিব সোম এক জাতীয় পার্ব্বত্য উদ্ভিদ। হিমালয়ের উত্তরে মূজবান্ পর্ব্বতে ইহা পাওয়া যাইত। মূজবান্ পর্ব্বত কোথায় বলা যায় না। হয় ত ইহাই পরবর্ত্তী কালে কৈলাস পর্ব্বতে দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মূজবান্ পর্ব্বতে রুদ্র দেবতার বাস ছিল। বেদের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। এই রুদ্র দেবতা পরবর্ত্তী কালে আমাদের মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন। সোম সেই মহাদেবের চিহ্ন; মহাদেব ললাটে বা মস্তকে সোমকলা ধারণ করেন। এখন আমরা সোম অর্থে চন্দ্র বুঝি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সোম এবং চন্দ্রকে এক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সকলে ইহা মানিতে চান না। তাঁহারা বলেন, বৈদিক সাহিত্যের অতি প্রাচীন স্তরে সোমের সহিত চন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না; বেদের সোম গোড়ায় সোম-লতা মাত্র; উদ্ভিদ্ মাত্র। সোমপান করিলে মত্ততা জন্মিত এবং লোকে স্ফূর্ত্তি ও বল পাইত; এই জন্য সোমকে দেবতা করিয়া লইয়াছিল। ইরাণীরা সোমকে হোমা বলিত। আমাদের দেশে সোম যাগ একবারে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু বোম্বাইয়ের পার্সীরা এখনও সোম যাগ করিয়া থাকেন। এখন যে

উদ্ভিদের রস তাঁহারা এজন্য ব্যবহার করেন, তাহাকে হুম বলে। মার্টিন হোগ নামক পণ্ডিত মূল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইয়ে থাকিয়া পার্সীদের প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি এই হুম রস পান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ। উহাতে কোন দেবতার বা কোন মানুষের তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। ফল কথা, পুরাকালে যে সোম যজ্ঞার্থ ব্যবহৃত হইত, সে সোম কোন্ উদ্ভিদ, তাহা কেহ এখন জানে না। বেদপন্থী সমাজে যখন সোম যাগের বহুল প্রচার ছিল, তখনও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। পর্ব্বত হইতে সোম আনিয়া যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। যজ্ঞের সময় সোম বিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া বসিত। যজমান মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করিয়া লইতেন। সোম ক্রমশঃ দুর্লভ হওয়াই সোম যজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ার একটা মুখ্য কারণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বেদপন্থী দ্বিজাতি সমাজে সোম যজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল। নানাবিধ সোম যাগ তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা যে অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোম যাগ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কালক্রমে সোমপানের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সোমপানে অধিকার ব্রাহ্মণেরা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যজমানেরা সোম যজ্ঞ করিতে পারিতেন, কিন্তু সোমরসের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পান করিতে হইত। ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বা যজ্ঞডুমুরের রস পান করিত; বৈশ্যের পক্ষে দধির ব্যবস্থা ছিল; ইহাতেই তাহাদের সোমপানের ফল হইত। ক্ষত্রিয়েরা সোমপান করিতে পাইবে কি না, তাহা লইয়া কিছু দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক গণ্ডগোল চলিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা সহজে অধিকার ছাড়িতে চাহেন নাই। ইহা লইয়া যজ্ঞের সময় হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। যাঁহারা এ বিষয়ে কুতূহলী, তাঁহারা আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সোমপানের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একটা খুব বড় নজির দেখাইতেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন; বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন; আরও অনেক অনুচিত কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ এবং বৃত্র উভয়েই দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র এইরূপে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত

হইলে দেবতারা বিদ্রোহী হইয়া ইন্দ্রের সোমপান বন্ধ করিয়া দেন। দেখাদেখি ক্ষত্রিয়দেরও সোমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেদপন্থী সমাজে নানাবিধ সোম যাগের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন যজ্ঞ এক দিন, কোন যজ্ঞ একাধিক দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এক দিনের যজ্ঞকে ঐকাহিক যজ্ঞ বলিত। দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন। বার বা বারর অধিক দিন লাগিলে নাম হইত সত্র। কোন কোন সত্র সংবৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত। আমি কেবল আপনাদিগকে ঐকাহিক অর্থাৎ এক দিনে সম্পাদ্য সোম যাগের বিবরণ দিব। এই শ্রেণির সোম যাগের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম অন্ততঃ সাত রকমের ছিল; অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, অপ্তোর্য্যাম এবং বাজপেয়। ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রকৃতি, অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র। অগ্নিষ্টোমের প্রয়োগ পদ্ধতি জানিলে অন্য গুলিরও পদ্ধতির মোটা জ্ঞান জন্মিবে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞের পদ্ধতি ঠিক পাওয়া যায় না। পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য, মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তৎসম্পর্কে উপাখ্যানাদি নানা কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রহিয়াছে। খাঁটি পদ্ধতিটুকু বুঝিবার জন্য শ্রৌতসূত্র নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র রচিত হইয়াছিল। আমি ঐতরেয় এবং শতপথ এই দুই ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন এবং কাত্যায়ন এই দুই শ্রৌতসূত্রের সাহায্য লইয়া অগ্নিষ্টোমের বিবরণ সংকলন করিয়াছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল। উহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে পরম সহিষ্ণু শ্রোতারও ধৈর্য্য থাকিবে না। সেই জন্য অনেক কাট ছাঁট করিয়া যাহাতে একটা মোটা জ্ঞান জন্মিতে পারে, এইরূপ বিবরণ উপস্থিত করিতে চাহি।

গৃহস্থের অগ্নিশালায় সোম যাগের স্থান সংকুলান হইত না। গ্রামের বাহিরে গিয়া যজ্ঞভূমি পছন্দ করা হইত; উহার নাম দেবযজন ভূমি। সেখানে দুইটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হইত। একটি ঐষ্টিক বেদি, সোম যাগের আনুষঙ্গিক ইষ্টিযাগগুলির জন্য। তাহার পূর্ব্ব দিকে আর একটা বড় বেদি, ইহার নাম সৌমিক বেদি বা মহাবেদি; এই মহাবেদি অনেকটা পাশুক বেদির মত। ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে যথাস্থানে আহবনীয়াদি তিন অগ্নির এবং

ব্রহ্মাদি ঋত্বিকের স্থান থাকিত; সমস্তই ইষ্টি যাগের মত। এই বেদিকে ঘেরিয়া খুঁটির উপর আচ্ছাদন দিয়া যে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইত, তাহার নাম প্রাগ্‌বংশ শালা; খুঁটির উপরের বাঁশগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে খাটান হইত, সেই জন্য নাম প্রাগ্‌বংশশালা। মহাবেদির উপরেও ঐরূপ কয়েকটি শালা বা মণ্ডপ তৈয়ার করিতে হইত। পশ্চিমাংশের মণ্ডপটির নাম সদঃশালা; মাঝখানে হবির্দ্ধান মণ্ডপ; আর বেদির দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট মণ্ডপ, নাম আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালার ভিতরে এক সারি অগ্নি থাকিত, অগ্নিস্থানগুলির নাম ধিষ্ণ্য। ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে বসিয়া ঋত্বিকেরা সোম যাগের মন্ত্র পাঠ করিতেন। মাঝখানে একটি ডুমুরের ডালের খুঁটি পোঁতা থাকিত; নাম ঔদুম্বরী শাখা—উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা ঐ ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া সামগান করিতেন। দুই পাশের দুই কুঠরিতেও দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান থাকিত। মহাবেদির পূর্ব্বাংশে উত্তর বেদি ও তাহার নাভি পাশুক বেদির মতই; উহার পূর্ব্ব দিকে পশু বন্ধনের জন্য যূপের স্থান, এবং ভিতরে চাত্বাল, উৎকর ও শামিত্র ভূমি পশু যাগেরই অনুরূপ।

ইষ্টি যাগে চারি জন, পশু যাগে ছয় জন, কিন্তু সোম যাগে ষোল জন ঋত্বিকের দরকার হয়। সকলের নাম জানার দরকার নাই। জনকয়েকের নাম জানা আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ ত আছেনই; তাহার উপরে অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা এবং হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ইহারাও আছেন। হোতার আর দুই জন সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। নাম দুটি কষ্ট করিয়াও মনে রাখিবেন। ইষ্টি যাগে ও পশু যাগে সামগান নাই; সোম যাগে সামগান নহিলে চলে না। সেই জন্য উদ্গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই এগার জন ছাড়া আরো পাঁচ জনের দরকার। এইরূপে সর্ব্বসমেত ষোল জন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়। ষোল জন ঋত্বিক্ ছাড়া চমসাহুতির জন্য দশ জন চমসাধ্বর্য্যুর প্রয়োজন। ইহারা ঋত্বিক নহেন, তবে সোম যাগে সহকারিতা করেন। যাগের পূর্ব্বে সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি ষোল জন ঋত্বিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং যজমান তাঁহাদিগকে বরণ করেন। দেবগণের যজ্ঞে অগ্নি হোতা, আদিত্য অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা এবং অপ্ সমূহ অন্যান্য ঋত্বিক হইয়াছিলেন। যজমান প্রথমে দেব ঋত্বিকদিগকে বরণ করিয়া

তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে মানুষ ঋত্বিকদের বরণ করেন। আপনাদিগকে বলিয়াছি, অগ্নিষ্টোম এক দিনের যজ্ঞ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি ইষ্টি যাগ এবং অন্যান্য কর্ম্ম না করিলে সোম যজ্ঞে অধিকারই জন্মে না। ফলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এক দিনের যজ্ঞ হইলেও উদ্যোগ আয়োজন করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতে পাঁচ দিন সময় লাগে। যথাক্রমে বিবরণ দিতেছি।

প্রথম দিন।—প্রথম দিনে যজমান দীক্ষিত হন। ইষ্টি যাগে বা পশু যাগে দীক্ষার প্রয়োজন নাই। এই দীক্ষা এবং দীক্ষার অনুকূল ইষ্টি যাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। আগেই বলিয়াছি, ইষ্টি যাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি এবং সোম যাগের জন্য মহাবেদি আবশ্যক। যজমানের বাড়ীতে পূর্ণমাসাদি যাগের জন্য অগ্নিশালা থাকে। কিন্তু এখানে গ্রামের বাহিরে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন ঐষ্টিক বেদি গড়িয়া লইতে হয়। যজমানের বাড়ীতে যে গার্হপত্য সারাদিন জ্বলে, সেই আগুনে দুইখানা অরণি তপ্ত করিয়া আনা হয়। ইহার নাম অগ্নি সমারোপণ। সেই অরণি ঘর্ষণে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন গার্হপত্য জ্বালা হয়। যজমানের বাড়ীর গার্হপত্য এবং এই নূতন গার্হপত্য যে একই অগ্নি, তাহা এতদ্বারা বুঝান হইল। এই নূতন গার্হপত্য হইতে নূতন আহবনীয় ও নূতন দক্ষিণাগ্নি যথাবিধি জ্বালান হয়। সোম যাগের আনুষঙ্গিক সমস্ত ইষ্টি যাগ এই অগ্নিতেই সম্পাদ্য। এইরূপ অগ্নি স্থাপনের পর যজমানের দীক্ষা গ্রহণ। যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সপত্নীক যজমান খেউরি করিয়া স্নান করিবেন। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া কুশের উপর দাঁড়াইয়া নবনী মাখিবেন, চোখে কাজল পরিবেন, কুশের দ্বারা গা মাজিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন, আঙুল গুটাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন; যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত বাহিরে আসিবেন না। সেইখানে একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। এই ইষ্টি যাগের নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। দীক্ষার অনুকূল বলিয়া নাম দীক্ষণীয়। যাগের পর যজমান কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তদুপরি বসিবেন। তৃণ ও শণে নির্ম্মিত মেখলা পরিবেন; মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন; কাপড়ের খুঁটায় একটা হরিণের শিঙ বাঁধিয়া হাতে ডুমুর শাখার দণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই যজমানের পরিচ্ছদ। যজমানপত্নীর বেশ ভূষা প্রায়ই তদ্রূপ; উষ্ণীষের বদলে তিনি মাথায় জাল পরেন। এই সকল বেশ ভূষার একটা তাৎপর্য্য আছে। দীক্ষাকর্ম্মে যজমান নূতন জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞশালাটাই তাঁহার পক্ষে মাতৃগর্ভস্বরূপ। সেইখানে ভ্রূণস্বরূপে তাঁহাকে যজ্ঞকাল ব্যাপিয়া অবস্থান

করিতে হয়। যজ্ঞান্তে তিনি সেই গর্ভ হইতে নূতন মানুষ হইয়া বা নব-জীবন পাইয়া নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁহার বেশ ভূষার কোন্‌টার কি তাৎপর্য্য, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বুঝাইয়াছেন। যথা, গর্ভমধ্যে ভ্রূণ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে, এই জন্য যজমানও মুষ্টিবদ্ধ করেন, ইত্যাদি। দীক্ষা উপলক্ষে যে ইষ্টি যাগ হয়, তাহার দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু। অগ্নি সকল দেবতার নিম্নে এবং বিষ্ণু সকলের উর্দ্ধে; অতএব উঁহাদের দুই জনের যাগ করিলেই সকল দেবতার উদ্দেশে যাগ হয়। এই দুই দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি প্রায়ই পূর্ণমাস যাগের মতই। দীক্ষিত যজমানকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদু বাক্য বলিবেন, সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন দেখিবেন না; জলে প্রবেশ করিবেন না; বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। ভোজন সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে। দীক্ষার পূর্ব্বে পেট ভরিয়া ইচ্ছামত খাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু তার পর হইতে নিয়মের বাঁধাবাঁধি। তদবধি দুই বেলা কেবল দুধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম ব্রত এবং সেই দুগ্ধ পানের নাম ব্রতপান। একবার শেষ রাত্রিতে, একবার মধ্যাহ্নে, দুগ্ধপান চলে। দুধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ আসল সোম যাগের দিনে সেই দুগ্ধপানও নিষিদ্ধ। সেই দিন যজ্ঞের হবিঃশেষই একমাত্র ভক্ষ্য।

দ্বিতীয় দিন।—এই দিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টি যাগ; ইহার নাম প্রায়ণীয় ইষ্টি। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ। এই ইষ্টির দেবতা পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা এবং সর্ব্বশেষে অদিতি। দেবতারা অদিতিকে এক সময়ে বর দিয়াছিলেন; তোমাকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। তদবধি সোম যজ্ঞের আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগ। অদিতিকে চরু দিতে হয়; আর চারি জনকে আজ্য দিতে হয়।

এই যাগের পর সোম ক্রয়। যজ্ঞশালার বাহিরে সোমবিক্রেতা সোম লইয়া বসিয়া থাকে; তাঁহার নিকট মূল্য দিয়া সোম ক্রয় করিতে হয়। আগে বলিয়াছি, সোমলতা দুষ্প্রাপ্য; পর্ব্বত হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া যজ্ঞের জন্য বিক্রয় এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। সোমবিক্রেতা যজ্ঞ-শালার বাহিরে বসিয়া সোমলতা বেচিত। এই সোমক্রয় ব্যাপারে একটু কৌতুক আছে। সোম এককালে গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন; দেবতারা কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রী-প্রিয়। দেবগণ

কুমারী বাগ্দেবীকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন এবং নিজেও পলাইয়া আসেন। সোম ক্রয় অনুষ্ঠানে সেই ঘটনার অভিনয় হয়। ঋত্বিকদের সহিত যজমান একটি ছোট বৎসতরী লইয়া সোমবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হন। ঐ সোমবিক্রেতা গন্ধর্ব্ব-স্থানীয় এবং বাছুরটি বাগ্দেবতা। কিছুক্ষণ দর দস্তর করিয়া বাছুরটিকে মূল্য স্বরূপ দিয়া সোম খরিদ করা হয়। সোম হস্তগত হইলে হঠাৎ লাঠি বাহির করিয়া সোমবিক্রেতাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় এবং বাছুরটি কাড়িয়া লওয়া হয়। গন্ধর্ব্বটার সবই গেল; সোমও গেল, বাগ্দেবীকেও সে পাইল না। যজমান সোমলতা কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেন। যজমান এবং অধ্বর্য্যু গাড়ীর উপর বসিয়া থাকেন; হোতা ঋকমন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিক্ গাড়ী চালাইয়া প্রাগ্বংশশালা ঘুরিয়া ভিতরে উপস্থিত হন। সেখানে গাড়ী হইতে সোমকে নামাইয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সোম দেবতাগণের একজন রাজা। রাজা অতিথিরূপে বাড়ী আসিলে তাঁহার সমাদর করিতে হয়। রাজা সোম অতিথিরূপে যজমানের যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন; এখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। ইহার নাম আতিথ্য ইষ্টি। এই যাগের দেবতা বিষ্ণু; হব্য দ্রব্য পুরোডাশ। ইহাতে একটু বিশেষ বিধি আছে যে, যাগের পূর্ব্বে মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে মিশাইতে হয়। পূর্ণমাসাদি ইষ্টি যাগে অগ্নি মন্থনের দরকার হয় না। আতিথ্য ইষ্টির পর প্রবর্গ্য যজ্ঞ আর উপসৎ ইষ্টি। এই সময়ে যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিক একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে এক মত হইয়া কর্ম্ম করিব; পরস্পর বিরোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূনপত্র। অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে দেবতারা এইরূপে ঘৃত স্পর্শ করিয়া পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। এখন যেমন ইউরোপের মিত্র রাষ্ট্রগুলি জর্ম্মনির বিরুদ্ধে সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, কতকটা তদ্রূপ। উপসৎ ইষ্টির সমকালে সোমলতাকে টাট্কা রাখিবার জন্য সোমে জলের ছিটা দেওয়া হয়। ইহার নাম সোমের আপ্যায়ন কর্ম্ম। আপ্যায়নের পর সোমের নিহ্নব বা পূজা। প্রস্তরের নাম আপনাদের মনে থাকিতে পারে। ইষ্টি যাগে বেদির উপরে এক আঁটি কুশ থাকে; ইহাই প্রস্তর। যজমান কয়জন ঋত্বিকের সহিত প্রস্তরের উপরে হাত রাখিয়া নিহ্নব মন্ত্র বলেন। দ্যাবা

পৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। রাজা সোম দ্যাবাপৃথিবীর অপত্যস্বরূপ; তাঁহাকে প্রণাম করিলে সোমেরই পূজা হয়।

আতিথ্যেষ্টির পরে প্রবর্গ্য আর উপসৎ ইষ্টি। তন্মধ্যে প্রবর্গ্যের কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। ইহা যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাক্-ছাড়া। এই কর্ম্মে আহুতির দ্রব্যের নাম ঘর্ম্ম। তপ্ত ঘৃতে ছাগলের ও গরুর দুধ মিশাইয়া গরম করিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। দেবতার নামও ঘর্ম্ম দেবতা। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দ হইতেই আমাদের বাঙ্গালা গরম শব্দ আসিয়াছে। দুধ গরম গরম দিতে হয় বলিয়া উহার নাম ঘর্ম্ম। মাটির ভাঁড়ে ঘর্ম্ম পাক হয়; সেই ভাঁড়ের নাম মহাবীর। পুরোডাশও দিতে হয়, এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। ঘর্ম্ম পাকের জন্য পৃথক্ অগ্নিস্থান থাকে। গার্হপত্যের আগুন আনিয়া সেই আগুন জ্বালা হয়। অধ্বর্য্যু আর দুই জন ঋত্বিকের সহিত আগুনে হাওয়া দেন; প্রস্তোতা নামক সামগায়ী ঋত্বিক সাম গান করেন। হোতা ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন; অধ্বর্য্যু আগুনের উপরে তপ্ত মহাবীরে ঘি ঢালেন। তার পর রৌহিণ পুরোডাশ আহুতি দিয়া আসিয়া অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন; প্রতিপ্রস্থাতা ছাগী দোহন করেন। প্রস্তোতা আর এক প্রস্থ সাম গান ও হোতা আর এক প্রস্থ ঋক্ পাঠ করেন। একখানি প্রকাণ্ড কাঠের হাতা থাকে, তাহার নাম উপযমনা। এই হাতায় তপ্ত মহাবীর নামাইয়া রাখিতে হয় এবং মহাবীরের তপ্ত ঘৃতে সেই ছাগ দুগ্ধ ও গো দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে একটা আহুতি দেন; এবং অগ্নির উদ্দেশে আর একটা আহুতি দেন। হোতা যথাবিধি যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। তবে ঘর্ম্মের কিয়দংশ হবিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিতে হয়। হবিঃশেষ ভক্ষণের পূর্ব্বে আর একখানি রৌহিণ পুরোডাশের আহুতি হয়। ইহাই প্রবর্গ্য কর্ম্ম। এই প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজমানের নূতন জন্মলাভে সাহায্য করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই ঘর্ম্মাহুতির দ্বারা যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে দেবতারূপে উৎপন্ন হন। প্রবর্গ্য কর্ম্মের পর উপসৎ। উপসৎ ইষ্টি যাগ; দেবতা অগ্নি সোম এবং বিষ্ণু। আহুতি আজ্য। অসুরেরা তিন লোক জয় করিয়া ঐ তিন লোককে সোণা, রূপা ও লোহার প্রাকারবেষ্টি[illegible] করিয়া পুরীতে বা দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। দেবতারা ঐ তিন [illegible] সমীপে আসন্ন হইয়া পুরী তিনটিকে অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অ[illegible] প্রতি যে বাণ ছুড়িয়াছিলেন, তাহাই উপসদ্—উপ অর্থাৎ সমীপে, সদ্ ধাতুর

অর্থ আসন্ন হওয়া। ঐ বাণে অগ্নি সোম এবং বিষ্ণু, এই তিন দেবতা অবস্থিত ছিলেন। তাহাতেই অসুরদের পরাজয় হয়। এই ত্রিপুর-জয়-কাহিনী আপনাদিগকে পৌরাণিক ত্রিপুরজয়ের কথা স্মরণ করাইবে।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণেই এই প্রবর্গ্য ও উপসৎ অনুষ্ঠান হয়; দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণেও আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ হইবে। উপসৎ করিতে হইলেই অসুর জয়ে দেবগণের সন্ধিবন্ধনের অনুরূপ তানূনপত্র করিতে হইবে এবং জলের ছিটা দিয়া সোমের আপ্যায়ন করিয়া সোমের নিহ্নব বা পূজাও করিতে হইবে। তৃতীয় দিনের পূর্ব্বাহ্ণে প্রবর্গ্য এবং উপসৎ এবং অপরাহ্ণে আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ। উপসদের সঙ্গে তানূনপত্র, সোমের আপ্যায়ন এবং নিহ্নব দ্বিতীয় দিনের মতই। এই তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে সোম যাগের জন্য মহাবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়।

চতুর্থ দিন। চতুর্থ দিন পূর্ব্বাহ্ণেই দুইবার প্রবর্গ্য ও দুইবার উপসৎ সারিয়া ফেলিয়া অন্য আয়োজন করিতে হইবে। প্রথম কাজ, অগ্নি-প্রণয়ন। ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে আগুন আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রাখিতে হইবে। তদবধি এই নূতন অগ্নিই সোম যজ্ঞের আহবনীয় রূপে গণ্য হয়; পুরাতন আহবনীয়টা গার্হপত্য হইয়া যায়। অগ্নিকে লইয়া যাইবার সময় হোতা মন্ত্র পাঠ করেন। তার পরের কাজ হবির্দ্ধান প্রবর্ত্তন। দুইখানি টপ্পর দেওয়া গরুর গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান; সোম যজ্ঞে প্রধান হবিঃ সোম; সেই সোম এই গাড়ীর উপরে রাখা হয় বলিয়া গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। যজমানের পত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইয়া দেন; অধ্বর্য্যু এক গাড়ীতে, প্রতিপ্রস্থাতা অন্য গাড়ীতে চাপিয়া মহাবেদির দিকে চালাইয়া দেন। গাড়ী ঘর ঘর করিয়া চলিতে থাকে; হোতা এবং যজমান মন্ত্র পাঠ করেন। মহাবেদির উপরে পৌছিলে, গাড়ী দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপরে চালা বাঁধা হয়; এই চালারই নাম হবির্দ্ধান মণ্ডপ। তার পশ্চিম দিকে আর একটি চালা তৈয়ার হয়; উহারই নাম সদঃশালা ও মহাবেদির দুই পার্শ্বে দুই খানি ছোট ঘর তৈয়ার হয়, উহাই আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালায় ছয়টি আর আগ্নীধ্রীয়ে একটি, এই সাতটি ধিষ্ণ্য তৈয়ার করিতে হইবে; ধিষ্ণ্যের অর্থ অগ্নিস্থান; ইহার পাশে ঋত্বিকেরা সোমাহুতি কালে মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই ধিষ্ণ্যের জন্যও ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখিতে হইবে; পরদিন সেই অগ্নি হইতে আর আর ধিষ্ণ্য জ্বালান হইবে।

ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নি আনয়নের পর সোমের আনয়ন। আপনাদের মনে থাকিবে, দ্বিতীয় দিবসে সোম ক্রয় করিয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে কাঠের আসনে রাখা হইয়াছিল; দুই বেলা জলের ছিটা দিয়া তাহাকে টাটকা রাখা হইয়াছিল। আজ সেই সোমকে সেখান হইতে তুলিয়া পূর্ব্ব মুখে আনিয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপে গাড়ীর উপরে রাখিতে হয়। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নির ও সোমের আনয়নের নাম অগ্নীষোম-প্রণয়ন। সকল কর্ম্মেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

অগ্নি এবং সোম উভয়কেই মহাবেদিতে স্থাপন করা হইল। ইঁহারা উপস্থিত না হইলে সোম যাগ হইতে পারে না। অগ্নি এবং সোম উভয়েই দেবতা; এখন ইঁহাদের উদ্দেশে একটি পশু যাগ আবশ্যক। এই চতুর্থ দিনেই সেই পশু যাগ করিতে হইবে; কেবল ইষ্টি যাগে কুলাইবে না। অগ্নি এবং সোমের উদ্দিষ্ট এই পশুটির নাম অগ্নীষোমীয় পশু। পশুটি মোটাসোটা হওয়া আবশ্যক। এই পশুর মাংস ভক্ষণ করিলে নরমাংস ভক্ষণ হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল; গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। পশু যাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি—যূপচ্ছেদন হইতে যাগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই করিতে হয়। পশু যাগ সমাপ্ত করিতে অপরাহ্ণ আসিয়া পড়ে। পরদিন প্রকৃত সোম যাগের দিন—এ কয়দিন তাহার আয়োজন উদ্যোগেই গেল। সোম যাগের জন্য সোম লতা ছেঁচিয়া সোম রস বাহির করিতে হয়—তার জন্য জলের দরকার। এই চতুর্থ দিনেই সন্ধ্যাকালে সেই জল আনিয়া রাখিতে হইবে। স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাজনা বাজাইয়া সমারোহে নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া রাখা হয়। এই জলেরও একটা নাম আছে—নাম বসতীবরী। অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অতএব তাহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। এই বসতীবরী জল এবং হবির্দ্ধানে স্থিত সোমলতাকে রাত্রিকালে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপ মধ্যে রাখা হয় এবং যজমান রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন।—উদ্যোগ আয়োজনে চারি দিন গেল। পঞ্চম দিনে প্রকৃত সোম যাগ। সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রস জলে মিশাইয়া আহুতি দিতে হইবে। সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করার নাম অভিষব। পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে অপরাহ্ণে তিন বার সোমের অভিষব এবং সোমের আহুতি হয়। সোমাভিষব এবং সোম আহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, এক যোগে সমুদায় কর্ম্মের নাম সবন। পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন

সবন, অপরাহ্ণে তৃতীয় সবন। সোম যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটী পশু যাগও বিহিত। ইহার পূর্ব্ব দিন একটী পশু যাগ হইয়া গিয়াছে,—অগ্নীষোমীয় পশু যাগ;—এ দিন আর একটী পশু যাগ হয়। এই পশু যাগের নাম সবনীয় পশু যাগ। তিন সবনে তিনটী পশু যাগ হয় না। সারা দিনে একটী। একই পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাগ করিয়া তিন সবনে আহুতি দেওয়া হয়। আগে বলিয়াছি, পশু যাগের সঙ্গে পুরোডাশ যাগও থাকে। সবনীয় পশু যাগে পুরোডাশ ত থাকেই, তা ছাড়া আরও কয়েকটী দ্রব্যের আহুতি হয়। যথা, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ এবং পয়স্যা। ধানা অর্থে ঘিয়ে ভাজা যব; করম্ভ ঘৃতপক্ক যবের ছাতু; পরিবাপ ঘৃতপক্ক চাল ভাজা। দুধে দই মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। সোমরস পশুমাংস এবং যবভাজা প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চমকারের অন্তর্গত মদ্য মাংস ও মুদ্রা আপনাদের মনে আসিবে। আপনারা দেবতাদের রুচির প্রশংসা করিবেন।

পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী জল আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং যজমান পাহারা দিয়া জাগিয়া আছেন। অতি প্রত্যূষে তিনি ঋত্বিকদিগকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলেন। হোতা প্রাতরনুবাক নামক ঋক্‌মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অগ্নি, উষা এবং অশ্বিদ্বয় এই সকল মন্ত্রের দেবতা। বহু ঋক্ পাঠ করিতে হয়। পাখী ডাকিলে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হয়। কাজেই আবশ্যকমত শতাধিক বা সহস্রাধিক মন্ত্র পড়িতে হয়। বহু মন্ত্র পাঠে যজ্ঞেশ্বর প্রজাপতি সন্তুষ্ট হন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে যজমান ও তাঁহার পত্নী কয়েকজন ঋত্বিক এবং পরিচারক সঙ্গে জলাশয় হইতে জল আনিতে যান। কলসীতে করিয়া জল আনেন। এই জলের নাম একধনা। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী আনা হইয়াছিল; অদ্য প্রত্যূষে একধনা আনা হইল। এই দুই জল খানিকটা মিশাইয়া তৃতীয় জল হয়, তাহার নাম নিগ্রাভ্য। বসতীবরী একধনা এবং নিগ্রাভ্য এই তিন জলই সোম রস প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক।

এইবার সোম অভিষবের অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশনের আয়োজন। পূর্ব্ব দিনে হবির্ধান গাড়ীর নীচে চারিটী গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গর্ত্তের নাম উপরব। গর্ত্তের উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিতে হয়; পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। পাষাণের আঘাত হয়, আর উপরবের গর্ত্ত হইতে গম গম শব্দ হইতে থাকে। অধ্বর্যু আর তিন জন ঋত্বিক পাষাণ

হাতে করিয়া রস বাহির করেন। সোমের টুকরাগুলি মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ ছিবড়া বাহির না হয়, ততক্ষণ রস বাহির করিতে হয়। তিন সবনেই এইরূপ করিতে হয়। প্রাতঃসবনে এবং মাধ্যন্দিন সবনে প্রচুর রস আবশ্যক। সেই জন্য প্রাতঃসবনে সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিতে হয়। মাধ্যন্দিনেও প্রায় বাকি অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়। এক খানা বড় টুকরা তৃতীয় সবনের জন্য রাখা হয়। সেই খানা ছেঁচিয়া যে রসটুকু পাওয়া যায়, তৃতীয় সবনের পক্ষে তাহাই প্রচুর। এইরূপে নিষ্কাশিত সোমরস বসতীবরী এবং একধনা এই দুই জলে মিশাইলে আহুতির জন্য রস প্রস্তুত হয়। রস রাখিবার জন্য তিনটী বড় বড় কাঠের গামলা বা কলস থাকে। একটীর নাম আধবনীয়, একটীর নাম দ্রোণকলস, আর একটীর নাম পূতভৃৎ। আধবনীয়ে বসতীবরী এবং একধনা দুই জল ঢালিয়া তাহাতেই নিষ্কাশিত সোমরস মিশান হয়। এইরূপে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। দ্রোণকলসের মুখে মেষ লোমের ছাঁকনি রাখিয়া আধবনীয়ের জল ঢালিয়া ছাঁকিতে হয়। এইরূপে ছাঁকিলে সোমরস পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। ছাঁকা সোমের নাম হয় পবমান সোম। এই বিশুদ্ধ সোমরসের অর্দ্ধেক দ্রোণকলসে এবং অর্দ্ধেক পূতভৃতে রাখা হয়। পূতভৃতে রাখিবার সময় একটু আড়ম্বর আছে; পরে বলিব। সোম যাগে বহু দেবতাকে আহুতি দিতে হয়। এক এক আহুতিতে যতটুকু সোমরস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম গ্রহ। সোম রস ছোট ছোট পাত্রে লইয়া আহুতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাত্রে একবারে যাহা লওয়া হয়, তাহাই গ্রহ। তিন শ্রেণির পাত্র আবশ্যক। প্রথম শ্রেণির পাত্রকে পাত্রই বলে; সংখ্যা এগার খানি। দ্বিতীয় শ্রেণির পাত্রের নাম স্থালী; সংখ্যায় চারি খানি। তৃতীয় শ্রেণির পাত্রের নাম চমস; সংখ্যায় দশ খানি। এইবার যাগের আরম্ভ।

(১) প্রথমে প্রাতঃসবন। প্রথমাহুতি সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যু এক খানি পাত্রে কিঞ্চিৎ রস লইয়া উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। ইহা যাগ নহে, হোম। অধ্বর্য্যু নিজেই একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দেন। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পড়া হয় বলিয়া হোমের নাম উপাংশু হোম। যে রসটুকু দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু গ্রহ। যে পাত্রে করিয়া দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু পাত্র। সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় সূর্য্যেরই উদ্দেশে অন্তর্যাম হোম। ইহাও হোম। অন্তর্যাম পাত্রে অন্তর্যাম গ্রহ

লইয়া যজুর্মন্ত্র সহিত আগুনে দেওয়া হয়। এই হোমের পর ঋত্বিকেরা মহা বেদির বাহিরে আসিয়া পূতভৃতে ঢালিবার জন্য সোম ছাঁকেন। দ্রোণকলসে সোম আগেই ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছে। পূতভৃতে সোম ছাঁকায় আড়ম্বর আছে। এক দিকে সোম ছাঁকা হইতেছে, অন্য দিকে সেই পবমান সোমের উদ্দেশে উদ্গাতা প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করিতেছেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র গান। পবমান সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া নাম পবমান স্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে আসিয়া গীত হয় বলিয়া নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। তৎপরে তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহাহুতি তিন জোড়া দেবতার উদ্দিষ্ট। প্রথম আহুতি ঐন্দ্রবায়ব অর্থাৎ ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় আহুতি মৈত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। তৃতীয়টি আহুতি আশ্বিন অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু যথাক্রমে এই তিন গ্রহ আহুতি দেন। এবার হোম নহে; রীতিমত যাগ। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা মন্ত্র এবং হোতা স্বয়ং যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। বষট্কারের পর অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ। আহুতি-দাতা অধ্বর্য্যু এবং বষট্কর্ত্তা হোতা উভয়ে একযোগে প্রত্যেক গ্রহের শেষাংশ পান করেন। পান অনাবশ্যক; ঘ্রাণ মাত্রেই ভক্ষণ হয়; বড় জোর ঠোঁট ভিজাইতে হয়। তৎপরে শুক্র গ্রহ এবং মন্থি গ্রহের আহুতি। উভয়ই ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট; অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থি গ্রহ গ্রহণ করিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান; এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠের পর বষট্কারের সময় আগুনে দেন। হোমকর্ত্তা ও বষট্-কর্ত্তা একত্র গ্রহশেষ পান করেন। এবার ঘ্রাণমাত্রে চলে না; রীতিমত পান করিতে হয়। শুক্র এবং মন্থি এই দুই গ্রহ আহুতির পর বলা হয় "নিরস্তঃ শণ্ডঃ নিরস্তোমর্কঃ।" তাৎপর্য্য, এতদ্দ্বারা শণ্ড এবং মর্ক এই দুই অসুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আপনারা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের শণ্ডামার্ক নামে দুই পুত্রের পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়াছেন। সেই কাহিনীর মূল এইখানে পাওয়া যায়। শুক্র শব্দের অর্থ উজ্জ্বল; উহা সোম রসের চলিত বিশেষণ। শুক্র পাত্রে রক্ষিত সোম রসকে বিশেষতঃ শুক্র গ্রহ বলা হয়। কোনরূপে এই শুক্র গ্রহের সহিত আকাশস্থ শুক্র গ্রহের—planet Venusএর—একীকরণ হইয়া থাকিবে। Planet Venus আকাশস্থ planetগণের সকলের চেয়ে উজ্জ্বল। তাহা হইলে মন্থি গ্রহ কে হয়? মহাত্মা গঙ্গাধর টিলক অনুমান করেন একই planetএর দুই নাম, শুক্র এবং মন্থি। একটি morning star, আর একটি evening star.

সোমাহুতির জন্য তিন রকম পাত্রের কথা বলিয়াছি; এক শ্রেণির পাত্রের নাম চমস। যজমান এবং ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে নয় জন, এই দশ জনের জন্য দশ খানি চমস নির্দ্দিষ্ট থাকে; ইহাঁদের নাম এই জন্য চমসী। এক এক খানি চমস এক এক জন চমসাধ্বর্য্যুর জিম্মায় থাকে। চমসাধ্বর্য্যু সোমরসে চমস পূর্ণ করিয়া চমসীদের হাতে দেন। ধিষ্ণ্য নামক অগ্নিস্থানের কথা বলিয়াছি—সেই ধিষ্ণ্যগুলি আজ জ্বালান হইয়াছে। এক একটি ধিষ্ণ্য এক এক জন চমসীর নির্দ্দিষ্ট। চমসীরা আপন আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া অনুবাক্যা এবং যাজ্যা পাঠের পর বষট্‌কার করেন। অধ্বর্য্যু তাঁহাদের প্রত্যেকের হাত হইতে চমস লইয়া সেই চমসের সোম অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। হবিঃশেষ ভোজনের জন্য রক্ষিত হয়। তার পর সেই হবিঃশেষ পানের ধূম লাগিয়া যায়। যজমান ও ঋত্বিকেরা সদঃশালায় প্রবেশ করিয়া হুতাবশিষ্ট সোম রস পান করেন। সোম পান বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি আছে। সকল কথা তুলিয়া আপনাদিগকে ত্যক্ত করিব না।

সোমাহুতির পাত্রের মধ্যে দুইখানি পাত্রের নাম ঋতু পাত্র; একখানি অধ্বর্য্যুর জন্য; একখানি প্রতিপ্রস্থাতার জন্য। ঋতুপাত্র পূর্ণ করিয়া অধ্বর্য্যু ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয় বার এবং প্রতিপ্রস্থাতা ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয় বার সোমাহুতি দেন। যাজ্যা পাঠ করেন, কোন বার হোতা, কোন বার অন্য ঋত্বিক্। আহুতির পর, আহুতিদাতা ও বষট্‌কর্ত্তা হবিঃশেষ পান করেন।

আপনারা বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে চলিবে না। প্রাতঃ-সবনের প্রধান আহুতির কথাই এখনও বলা হয় নাই। এই প্রধান আহুতি তিনটি; নাম যথাক্রমে ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্‌থ্য আহুতি। আহুতিকালে যাজ্যা মন্ত্রের পূর্ব্বে একটি ঋক্‌মন্ত্র,—অনুবাক্যা মন্ত্র,—পাঠ করাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু এই তিন আহুতিতে যাজ্যার পূর্ব্বে বহু ঋক্ মন্ত্র পড়িতে হয়। এই ঋক্ সমূহের নাম শস্ত্র। ঐ সকল মন্ত্রে দেবতার শংসন বা প্রশংসা হয়, সেই জন্য মন্ত্র সমূহের নাম শস্ত্র। হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক, এই চারি ঋত্বিকের শস্ত্র পাঠে অধিকার আছে। প্রত্যেক শস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা এই তিনজন সাম-গায়ী ঋত্বিক সামগান করেন; ইহার নাম স্তোত্রগান। আগে স্তোত্রগান, তার পর শস্ত্রপাঠ। সদঃশালায় একটা ডুমুরের ডাল পোঁতা থাকে, আগে বলিয়াছি—উহার নাম ঔদুম্বরী। স্তোত্রগানের সময় গায়কেরা ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া গান

করেন। স্তোত্রগানের এবং শস্ত্রপাঠের কতকগুলি খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। যিনি শস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি আপনার ধিষ্ণ্যের পাশে পূর্ব্ব মুখে বসেন। আর যিনি আহুতি দিবেন, তিনি শস্ত্র পাঠককে পিছনে রাখিয়া দুই হাতে ও দুই পায়ে ভর দিয়া চতুষ্পদের মত অগ্নির সম্মুখে বসিয়া থাকেন। শস্ত্রপাঠক প্রথমে "সু মৎ পদ্ বক্ দে পিতা মাতরিশ্বা" ইত্যাদি একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। তার পর তিনি আহুতিদাতাকে আহ্বান করিয়া আহাব মন্ত্র পাঠ করেন। প্রাতঃসবনের আহাব মন্ত্র "শোংসাবোম্"। অর্থ, আমরা উভয়ে শংসন করি বা শস্ত্র পাঠ করি। আহুতিদাতা তাহার উত্তরে বলেন—"শংসামোদৈবোম্" অর্থাৎ তুমিই শংসন কর, তাহাতে আমোদ হইবে। এই উত্তরের নাম প্রতিগর। তাহার পর শস্ত্রপাঠক তূষ্ণীংশংস নামক আর একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। প্রাতঃসবনে তূষ্ণীংশংস "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ"। তার পর শস্ত্রপাঠক শস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হন। শস্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্র; কিন্তু তদতিরিক্ত কতকগুলি যজুর্মন্ত্রও সেই সঙ্গেও পড়িতে হয়। এই গুলির নাম নিবিৎ মন্ত্র। শস্ত্র পাঠের পর তিনি বলেন "উক্‌থং বাচি"; অর্থাৎ আমার বাক্যে উক্‌থ বা শস্ত্র পাঠ হইল। অধ্বর্য্যু তাহার উত্তরে বলেন "উক্‌থশাঃ যজ সোমস্য"— উক্‌থ পাঠ হইয়াছে, এখন সোমাহুতির যাজ্যা পাঠ কর। অধ্বর্য্যুর এই আদেশ পাইয়া শস্ত্রপাঠক যাজ্যা পাঠ করেন। "যে যজামহে" বলিয়া যাজ্যা পাঠ আরম্ভ হয়, তাহার পর বৌষট্ উচ্চারণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু এই সময়ে খানিকটা সোমরস আহুতি দেন। শস্ত্রপাঠক আবার বলেন "সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্"—অগ্নি তুমি সোম ভক্ষণ কর ও বহন কর। এই দ্বিতীয় বার বৌষট্ উচ্চারণের নাম অনুবষট্‌কার। অনুবষট্‌কারের পর অধ্বর্য্যু আবার খানিকটা সোম আহুতি দেন। আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আহুতিদাতা এবং শস্ত্রপাঠক উভয়ে মিলিয়া পান করেন। ইহাই শস্ত্রপাঠের পর সোমাহুতির সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক আহুতির পরে চমসীরা সোমাহুতি দেন ও চমসস্থ সোম পান করেন।

ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব, এবং উক্‌থ্য এই তিনটি আহুতির কথা বলিয়াছি। প্রথম দুই গ্রহের আহুতিদাতা অধ্বর্য্যু; শস্ত্রপাঠক হোতা। উক্‌থ্য গ্রহ তিন অংশে আহুতি দেওয়া হয়। শস্ত্রপাঠক যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। ইহাঁরা তিন জনেই হোতার সহকারী।

প্রাতঃসবন সমাপ্ত হইল। পরে মাধ্যন্দিন সবন। মাধ্যন্দিন সবনের অনুষ্ঠান

প্রাতঃসবনের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু হোম নাই, অন্তর্যাম হোম নাই, দ্বিদেবত্য যাগ নাই, ঋতুগ্রহ যাগও নাই। শুক্র গ্রহ ও মন্থি গ্রহের যাগ আছে। উহার সঙ্গে চমসাহুতি আছে। এই সব আহুতির পর তিন প্রধান আহুতি—তজ্জন্য যথারীতি শস্ত্র পাঠ ও স্তোত্র গান। প্রথম দুই আহুতির নাম মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র—স্তোত্রগানের পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্যু আহুতি দেন। তৃতীয় আহুতি উকৃথ্য তিন অংশে দেওয়া হয়। শস্ত্র পাঠ করেন, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। মাঝে মাঝে চমসাহুতি পূর্ব্ববৎ।

তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু ও অন্তর্যাম হোম নাই। দ্বিদেবত্য নাই, ঋতুগ্রহ নাই, শুক্র মন্থি পর্য্যন্ত নাই। এই সকলের পরিবর্ত্তে আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহের এবং পাত্নীবত গ্রহের আহুতি আছে। স্তোত্রগান এবং শস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রধান আহুতি দুইটি ;—বৈশ্বদেব এবং আগ্নি মারুত। তাহার মাঝে মাঝে চমসাহুতি।

এই সকল আহুতিতে সোমরস প্রায়ই ফুরাইয়া আসে! যে একটু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ধানা বা যব ভাজা মিশাইয়া মাথায় লইয়া উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ আহুতি দেন ; হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। ইহার নাম হারিযোজন গ্রহ। ইহাতে শস্ত্র পাঠ নাই। এই খানে সোমাহুতি সমাপ্ত হইল। পশু যাগের যে সকল অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া তৃতীয় সবন সমাপ্ত করা হয়। যজমান সহিত ঋত্বিকেরা এখন সামগান শুনিতে শুনিতে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোম যাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বরুণ দেবতাকে একটা পুরোডাশ দিয়া সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, এবং দীক্ষাকালে যে সকল বেশভূষা করিয়াছিলেন, তাহাও ত্যাগ করেন। যজমান এখন সোমযজ্ঞে পুনর্জন্ম পাইলেন। এখনও কিন্তু খোলসা নাই। অবভৃথ স্নানের পর যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিয়া আর একটি ইষ্টি যাগের প্রয়োজন। দীক্ষার পর দিন প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল। উদয়নীয়ে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হয়। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ; উদয়ন শব্দের অর্থ সমাপ্তি। উদয়নীয় যাগের পদ্ধতি সর্ব্বাংশে প্রায়ণীয়েরই মত। যজ্ঞের আরম্ভ এবং শেষ এক রকমের করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, সমস্ত যজ্ঞটা একগাছা লম্বা দড়ি ; প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়, এই দুই ইষ্টি যাগের দ্বারা এই দড়ির দুই প্রান্তে গিঁঠ দিয়া দড়িকে শক্ত করা হয়।

আপনারা মনে করিতেছেন, এইবার অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এখনও অব্যাহতি পাইবেন না। ইষ্টি যাগের পর আর একটি পশু যাগ করিতে হইবে। বন্ধ্যা গাভী, তদভাবে একটি বৃষ দ্বারা পশু যাগ হইবে। ইহার নাম অনুবন্ধ্য পশু যাগ। পশুযাগের পর নূতন করিয়া মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে আবার একটি ইষ্টি যাগ। ইহার নাম উদবসানীয় ইষ্টি যাগ। এই যাগে অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ দিতে হয়। এইবার সত্যসত্যই অব্যাহতি। যজমান ঐ ইষ্টি যাগ সমাপনের পর সন্ধ্যাকালে দেবযজন ভূমি হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

অগ্নিষ্টোমের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে তাহার ক্রম মনে রাখা আপনাদের কঠিন হইবে। আর একবার অতি সংক্ষেপে আওড়াইব; তাহাতে মনে রাখিবার সুবিধা হইতে পারে।

অগ্নিষ্টোমে সোমাহুতি এক দিনে সম্পাদ্য; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চারি দিন যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে হয়; সমুদায় কার্য্যে পাঁচ দিন লাগে। প্রথম দিনে সপত্নীক যজমানের দীক্ষা এবং সেই প্রসঙ্গে দীক্ষণীয় ইষ্টি যাগ। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে যজ্ঞের আরম্ভ সূচনায় প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগ। পরে সোম ক্রয় করিয়া যজ্ঞশালায় সোমের আনয়ন, এবং সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ আতিথ্য ইষ্টি যাগ। আতিথ্যের পর পূর্ব্বাহ্নেই প্রবর্গ্য যজ্ঞ এবং উপসদিষ্টি যাগ। এই সময়ে তানূনপত্র দ্বারা যজমান ও ঋত্বিক্‌দের সন্ধিবন্ধন। উপসদের সঙ্গে সোমে জলের ছিটা দিয়া আপ্যায়ন ও সোমের পূজার জন্য নিহ্নব পাঠ। সেদিন অপরাহ্নেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্য উপসৎ এবং অপরাহ্নেও প্রবর্গ্য উপসৎ। মাঝে মহাবেদি নির্ম্মাণ। চতুর্থ দিনে পূর্ব্বাহ্নেই দুই বার প্রবর্গ্য এবং দুই বার উপসৎ সারিয়া উত্তর বেদিতে অগ্নিপ্রণয়ন। এই অগ্নিতে সোমাহুতি হইবে। অগ্নি প্রণয়নের পর সোম রাখিবার গাড়ী দুইখানির—হবির্দ্ধান শকট দুইখানির—প্রবর্ত্তন অর্থাৎ মহাবেদির উপরে আনয়ন। তার পর অগ্নি ও সোমের প্রণয়ন; অর্থাৎ ধিষ্ণ্য জ্বালিবার জন্য অগ্নি আনয়ন এবং ঐষ্টিক বেদি হইতে সোমের আনয়ন। এই অগ্নি ও সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্নীষোমীয় পশু যাগ। সন্ধ্যার পর বসতীবরী জল আনয়ন। পঞ্চম দিন সোম যাগের দিন। ভোরের বেলায় হোতা প্রাতরনুবাক মন্ত্র পড়েন; এবং ঋত্বিকেরা একধনা জল আনেন। তার পরে সবন আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সবনে সোমের অভিষব হয় অর্থাৎ নিগ্রাভ্যের জলে সোম ছেঁচিয়া বসতীবরী ও

একধনার সহিত মিশাইতে হয়; পরে ছাঁকিয়া লইয়া দ্রোণকলস ও পূতভৃৎ পূর্ণ করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বা স্থালীতে এবং চমসে করিয়া এই সোমের আহুতি দেওয়া হয়। অনেক আহুতি হয়;—অন্যান্য আহুতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রধান আহুতিগুলিতে আড়ম্বর আছে। প্রধান আহুতির পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা একযোগে স্তোত্রগান করেন, আর হোতা বা তাঁহার সহকারী ঋত্বিকে শাস্ত্র পাঠ করেন। এক এক শস্ত্রমধ্যে বহু ঋক্ থাকে। শস্ত্র পাঠের পর সোমাহুতি ও সোমপান হয়; তৎপরে চমসাহুতি ও চমসপান হয়। তিন সবনেই এইরূপ; তবে প্রাতঃসবনের চেয়ে মাধ্যন্দিন সংক্ষিপ্ত; তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। তিন সবন ব্যাপিয়া একটি পশু যাগ হয়—উহার নাম সবনীয় পশু যাগ।

তিন সবনের পর সপত্নীক যজমানের অবভৃথ স্নান। সেখানে বরুণকে পুরোডাশ দিয়া যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টি যাগ। তৎপরে অনুবন্ধ্য পশু যাগ। পশু যাগের পর মন্থন দ্বারা নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে উদবসানীয় ইষ্টি যাগে যজ্ঞ সমাপ্ত করা হয়।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্ততঃ একশত গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ঋত্বিকদের ভাগ এইরূপ। ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু এই চারিজন প্রধান ঋত্বিকের প্রত্যেকে বারটি করিয়া আটচল্লিশটি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি। পোতা, প্রতিহর্ত্তা, আচ্ছাবাক ও নেষ্টা প্রত্যেকে চারিটি করিয়া ষোলটি। অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, প্রত্যেকে তিনটি করিয়া বারটি। সমুদায় একশতটি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। তদ্ব্যতীত কিছু সোনা, ঘোড়া, বস্ত্র, ছাতু, তিল ইত্যাদিও ঐ অনুপাতে দক্ষিণা দেওয়া হয়। চমসাধ্বর্য্যুরাও যথাসম্ভব দক্ষিণা পান। মাধ্যন্দিন সবনের সময় দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নিষ্টোমের বিবরণ এইখানে সমাপ্ত করিলাম। আপনারা ধীরভাবে শুনিলেন; আপনাদের জয় হউক।

অগ্নিষ্টোমের নানা বিকৃতি আছে; তন্মধ্যে উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র এই তিনটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহি। ইহাদের পদ্ধতি অগ্নিষ্টোমেরই মত; তবে কিছু কিছু বিশেষ বিধি আছে। প্রথমে উক্থ্য যাগ। অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুইটি, তাঁহার তিন সহকারীর তিনটি; মাধ্যন্দিন সবনেও পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুই

ও সহকারীদের; তিন। তৃতীয় সবনে শস্ত্র সংখ্যা দুইটি—হোতাই দুই শস্ত্র পাঠ করেন; সহকারীদের শস্ত্র নাই। কাজেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন সবনে মোটের উপর শস্ত্র সংখ্যা বার। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়; অতএব স্তোত্র সংখ্যাও বার। আনুষঙ্গিক সবনীয় পশুযাগে একটি মাত্র পশু; উহাই সবনীয় পশু; অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ দিতে হয়। এই হইল অগ্নিষ্টোম। উক্থ্য যজ্ঞের প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন অগ্নিষ্টোমেরই মত। তৃতীয় সবনে হোতার দুই শস্ত্র ব্যতীত হোতার তিন সহকারীর, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জনের, তিন শস্ত্র আছে। কাজেই প্রত্যেক সবনে শস্ত্র সংখ্যা পাঁচ; তিন সবনে পনের। শস্ত্র যখন পনের, স্তোত্রও তখন পনের। সবনীয় পশু দুইটি—অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের উদ্দেশে আর একটি ছাগ। তার পর ষোড়শী যজ্ঞ। ইহাতে উক্থ্য যজ্ঞে বিহিত পনেরটি শস্ত্র ত আছেই; তাহার উপর অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র আছে। কাজেই শস্ত্র সংখ্যা ষোল। অতএব স্তোত্র সংখ্যাও ষোল। ষোল বলিয়া যজ্ঞের নাম ষোড়শী। সবনীয় পশু এবার তিনটি; অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। তার পর অতিরাত্র যজ্ঞ; পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞগুলি দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয়; রাত্রিতে কোন কাজ থাকে না। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শীর উপরে অতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। এইজন্য নাম অতিরাত্র; রাত্রিকালে তিন পর্য্যায়ে সোমাহুতি। প্রতি পর্য্যায়ে চারিটি শস্ত্র; হোতার একটি, তাহার সহকারী তিন জনের তিনটি—এইরূপে তিন পর্য্যায়ে বারটি শস্ত্র। রাত্রি শেষে আরো একটি শস্ত্র হোতার পাঠ্য। কাজেই ষোড়শীর ষোল শস্ত্রের উপরে এই তেরটি যোগ করিলে মোটের উপর উনত্রিশটি শস্ত্র হয়। অতএব অতিরাত্র যজ্ঞে সমুদায়ে উনত্রিশটি শস্ত্র। অতএব উনত্রিশটি স্তোত্র। সবনীয় পশু চারিটি। অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ এবং তদ্ব্যতীত সরস্বতীর উদ্দেশে একটি ছাগ।

অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, এই সকল সোমযজ্ঞ এক দিনেই শেষ হইবে। দীক্ষা এবং উদ্যোগ আয়োজনে ও আনুষঙ্গিক ইষ্টি যাগাদিতে কয়েক দিন যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত সোম যাগ এক দিনের অনুষ্ঠান; এক দিনেই তিন সবন। কিন্তু বড় বড় সোম যজ্ঞে একাধিক দিন লাগিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বার দিন অথবা তাহার অধিক দিন ধরিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে সত্র বলিত। দ্বাদশাহ নামক সত্র বার দিনের অনুষ্ঠান; গবাময়ন নামক

সত্র সংবৎসরের অনুষ্ঠান। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক বহুবৎসরব্যাপী সত্রানুষ্ঠান করিতেন, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আপনারা শুনিয়াছেন। এই সকল বহুদিনব্যাপী সত্রানুষ্ঠানে প্রত্যহই সোম যজ্ঞ হইত; প্রত্যহই সোমের অভিষব, সোমের আহুতি, ও তৎসহিত পশু যাগাদি হইত। দ্বাদশাহ যজ্ঞে প্রথম দিনে অতিরাত্র ও শেষ দিনেও অতিরাত্র যজ্ঞ; মাঝের কয়েক দিনের কোন দিন বা অগ্নিষ্টোম, কোন দিন উক্‌থ্য, কোন দিন বা ষোড়শী ইত্যাদি যজ্ঞ হইত। সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রও ঐরূপ—প্রথম দিনে অতিরাত্র, শেষ দিনে অতিরাত্র, অন্যান্য দিনে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ। সংবৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত; প্রথম ছয় মাসে যজ্ঞগুলির যে পর্য্যায় ছিল, দ্বিতীয় ছয় মাসে তাহার পর্য্যায় বিপরীত ক্রমে উল্টাইয়া বৎসরের দুই ভাগকে বিম্ব প্রতিবিম্বরূপে symmetrical করা হইত। এ সকলের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আর কথা বাড়াইলে আমাকে গালি দিবেন। সোম রসে মাদকতা ছিল, কিন্তু আমি সোম যজ্ঞের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে আপনাদের অবসাদ বই উন্মাদনা কিছুই হয় নাই। দুইটা রোচক কথা বলিয়া আমি আজি ছুটি লইব।

আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, সোম লতা যে কোন্ লতা, এ কালে তাহা কেহই জানে না। বেদ এবং আবেস্তা উভয় শাস্ত্রের বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা এক জাতি ওষধি। ওষধি শব্দে বর্ষজীবী উদ্ভিদ বুঝায়; যে সকল গাছ বৎসরের মধ্যেই জন্মে, বাড়ে ও মরিয়া যায়; পর বৎসর আবার নূতন করিয়া জন্মে, বাড়ে ও মরে। সোমকে ওষধিপতি বলা হয়। সোমের বা সোম রসের বর্ণ ছিল অরুণ, পিঙ্গল; সোমের একটা প্রসিদ্ধ বিশেষণ শুক্র; শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। উহার রসে মিষ্টতা ছিল; উহার নামান্তর মধু—বেদে ইহাকে বহু স্থলে মধু বলা হইয়াছে; উপরন্তু ইহা মাদকতা জন্মাইত, বাক্যে স্ফূর্ত্তি দিত, গায়ে বল দিত। দেবতারা ইহা পান করিতেন; ইন্দ্র সোম পান করিয়া বৃত্রকে পরাজয় ও বধ করিয়াছিলেন। শুধু বল কেন, সোমরস ব্যাধি দূর করিত। অধিক কি বলিব, বেদের ভাষায় সোম অমরতা দিত। দেবতারা সোম পান করিয়াই অমর হইয়াছিলেন; ঋষিরাও অমরত্ব পাইবার জন্য সোম পান করিতেন। অমরতা দিতে পারে বলিয়াই সোম যজ্ঞের মাহাত্ম্য। সোমের নামান্তরই এই জন্য অমৃত। এই যে সোম, মর্ত্ত্যে তিনি ওষধির রাজা; স্বর্গে তিনি দেবগণেরও এক জন রাজা, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখিবেন, সোমকে ভূয়োভূয়ঃ

রাজা সোম বলা হইয়াছে। রাজা সোম যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলে উঁহার সম্মানার্থ আতিথ্য ইষ্টি যাগের বিধি। এককালে দেবগণের নিকটেও ইনি দুর্লভ ছিলেন। দেবতারা ইঁহার জন্য লালায়িত ছিলেন; ইঁহার সন্ধান পাইয়া কৌশল আশ্রয়ে ইঁহাকে আনিয়াছিলেন। সোম আনয়নের আখ্যায়িকাতে বৈদিক সাহিত্য পূর্ণ। স্বর্গের কোন্ উচ্চ দেশে সোম গুপ্ত ছিলেন; সুপর্ণ বা শ্যেন পাখী সেখান হইতে দেবতাগণের জন্য, ইন্দ্রের জন্য, সোম আহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় বহু স্থলে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিবেন। পুরাণে ইহা গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণের আখ্যানে পরিণত হইয়াছে। বেদে দেখিবেন, সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; পুরাণেতিহাসে দেখিবেন, সোম বা অমৃত উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মন্থন আবশ্যক হইয়াছিল—দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই অমৃতপ্রার্থী হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে নানা নিধি উঠিয়াছিল; সর্ব্বশেষে উঠিয়াছিলেন সোম বা অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অমৃত লাভ করেন; কেবল মহাদেবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সর্ব্বত্র এই আখ্যায়িকা নানারূপে দেখিবেন। সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট লুক্কায়িত ছিলেন; কোন পাখী, শ্যেনী বা সুপর্ণী সেই সোম আনয়ন করে; সেই সুপর্ণী আর কেহ নহে, স্বয়ং গায়ত্রী। আবার দেখিবেন, গন্ধর্ব্বদের নিকট সোম ছিলেন; দেবতারা বাগ্‌দেবীকে সেই সোম আনিবার জন্য পাঠাইতেছেন; স্ত্রীপ্রিয় গন্ধর্ব্বেরা নগ্না কুমারী বাগ্‌দেবীর লোভে সোম ছাড়িয়া দিল; বাগ্‌দেবী সোম লইয়া চলিয়া আসিলেন। সোম যজ্ঞের আরম্ভে সোমক্রয় উপলক্ষে এই ঘটনার অভিনয় হইত, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই বাগ্‌দেবী এবং গায়ত্রী অভিন্ন; কেন না গায়ত্রী ছন্দোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। দেবের মন্ত্রই বাক্; এবং বেদের সারভূতা গায়ত্রী মন্ত্র বেদের শ্রেষ্ঠ বাক্য; গায়ত্রীই বাগ্‌দেবতা। স্বয়ং বাগ্‌দেবতাকে সোম আনয়ন করিতে হইয়াছিল—তিনিই সোম আনিয়া দেবগণকে অমৃতত্ব দান করিয়াছিলেন। দেবতারা সোম যাগ করিতেন; স্বয়ং প্রজাপতি সোম যাগ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্ত্য দেবগণের পানের জন্য সোম রস প্রস্তুত করিতেন। আবেস্তা শাস্ত্রেও সোমের এই সমুদয় মাহাত্ম্য, এই সমুদয় আখ্যায়িকা, কোনও না কোনও আকারে পাওয়া যায়; আবেস্তা শাস্ত্রেও বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্ত্যের নাম প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের মধ্যেও উপাখ্যান

আছে, দেবরাজ Zeus এর জন্য ঈগল পক্ষী মধু আনিয়াছিল; জর্ম্মাণদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল, দেবরাজ Odhin ঈগল রূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই ঈগল পক্ষী শ্যেন বা সুপর্ণ; এই মধুই সোম। এই সোম কেবল বেদপন্থীর প্রধান দেবতা নহেন; সমস্ত আর্য্য জাতিরও অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা। সোম যজ্ঞ আর্য্য জাতিরই প্রাচীনতম জাতীয় অনুষ্ঠান। সর্ব্বত্র ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কয়েক জন পার্সী ঔপনিবেশিক এখনও এই প্রাচীন অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই।

এই সোম দেবতাটী কে? আপনারা সোমলতা কখনও চোখে দেখেন নাই। সোম শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে আপনারা বলিবেন, সোমের অর্থ চন্দ্র। ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে সোমকে চন্দ্রই বলা হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সোম আর চন্দ্র অভিন্ন। ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র মধ্যেও কয়েক স্থলে সোম অর্থে যে চন্দ্র তাহা মনে করিতেই হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত আছে; সূর্য্যাকন্যা সূর্য্যাকে তাহার ঋষি বলা হইয়াছে। ঐ সূক্ত মধ্যে সূর্য্যারই বিবাহের বর্ণনা রহিয়াছে। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাষায় ঐ সূক্তের আরম্ভ হইয়াছে। "পৃথিবী সত্য দ্বারা উত্তম্ভিত রহিয়াছে, দ্যুলোক সূর্য্যদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আদিত্যগণ ঋতকে আশ্রয় করিয়া দ্যুলোকে রহিয়াছেন; সোমও ঋতের আশ্রয়ে ধৃত রহিয়াছেন। সোমের বলেই আদিত্যগণ বলীয়ান, সোমের বলেই পৃথিবী মহীয়সী। অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ—নক্ষত্রগণের সন্নিধানেই সোম অবস্থিত রহিয়াছেন।" নক্ষত্রগণের নিকটে যে সোম, সে সোমকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। লতা সোমকে সেই চন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তিও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋষি পরক্ষণেই সাবধান হইয়া বলিতেছেন, "সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্তি ওষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পেষণ করিয়া লোকে মনে করে যে সোম পান করিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে সোমের নিগূঢ় তথ্য জানেন, সে সোমকে কেহই পান করিতে পায় না। পুনরায় জোরের সহিত বলা হইতেছে, "ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ"—পৃথিবীর কেহই সোমকে পান করিতে পায় না। আবার বলা হইয়াছে, "যৎ ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ"—দেব সোম, তোমাকে যে পান করা যায়, তাহাতে তোমার ক্ষয় হয় না, তোমার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই সোম দেবতা কোন্ দেবতা?

ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মত। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এখনও এই হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মান পণ্ডিত হিলিব্রান্ত জোরের সহিত বলেন, চন্দ্রই আর্য্য জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন, চন্দ্রই সোম; ঋক্ সংহিতায়ও সর্ব্বত্র সোম অর্থে চন্দ্র। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্ সংহিতায় সোম সোমলতা মাত্র; ক্রমশঃ তাহাতে চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রচারের সময় তিনি একবারে চন্দ্র হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে যখন বিতণ্ডা, তখন আমাদের মত মূর্খের নিরস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু চন্দ্রের সহিত পার্থিব সোমলতায় এই সম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হইল, মানব বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রশ্ন এই যে, চন্দ্রের ও সোমলতার সাদৃশ্য কোথায়? নিতান্ত আন্দাজের উপর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে উল্লেখ আছে যে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সূর্য্যের তেজের কতকটা চন্দ্রে প্রবেশ করে; কতকটা ওষধি মধ্যে প্রবেশ করে; তাই রাত্রিকালে চন্দ্র উজ্জ্বল হন, কোন কোন ওষধিও উজ্জ্বল হয়। কোন কোন ওষধি—বন্য লতা বা বন্য উদ্ভিদ্ রাত্রিতে উজ্জ্বল হয়; অর্থাৎ—phosphoresce করে। কথাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। বস্তুতই চাঁদের আলো এবং বুনো লতার phosphorescence সূর্য্য রশ্মিরই পরিণতি মাত্র। হিমালয় পর্ব্বতে এইরূপ phosphorescent ওষধি আছে, কালিদাসের সময় হইতে কবিগণ তাহা বলিয়া আসিতেছেন। পার্ব্বত্য লতাগুল্মের এই দীপ্তি কালিদাসের কবিচিত্তে বেশ একটা ধাক্কা দিয়াছিল। কুমারসম্ভবের আরম্ভেই "ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রাজন্যাম্ অতৈলপূরাঃ সুরত প্রদীপাঃ" এই শ্লোকটি স্মরণ করিবেন। ওষধিপতি সোমলতা এ পর্য্যন্ত কেহ identify করিতে পারেন নাই; কিন্তু খুব সম্ভব ইহা রাত্রিকালে phosphoresce করিত। লোকে দেখিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ থাকে, সন্ধ্যার পর আঁধার ঘনীভূত হইলে আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠে; পৃথিবীতে সোমলতাও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; একের সঙ্গে যেন অন্যের সম্পর্ক বাঁধা আছে। আকাশের চাঁদ ক্রমে ক্ষয় পায়, অমাবস্যার দিন যেন একবারে লুপ্ত হয়; কিন্তু দুদিন পরে আবার ক্ষীণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমার দিনে পূর্ণচাঁদ আকাশ আলো করে। এই চাঁদ কোথায় যায়? দেবগণ ইহাকে পান করেন, তাহাতেই ইহা ক্রমে ক্ষয় পায়। কিন্তু ইহা একবারে ক্ষীণ হইবার বস্তু নহে; ইহা আবার বৃদ্ধি পায়, ইহার

আপ্যায়ন ঘটে। বস্তুতঃ ইহা লুপ্ত হইবার নহে ; ইহা অমৃতস্বরূপ। সোমলতা ওষধি, অর্থাৎ বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। বৎসর মধ্যে জন্মে, বাড়ে, মরে, আবার পর বৎসর যথাকালে গজাইয়া উঠে ; আরণ্য উদ্ভিদ্, কেহ রোপণ করে না, কেহ যত্ন করে না, অথচ মরিয়াও যেন মরে না। আকাশের চাঁদ যেমন লুপ্ত হইয়াও লোপ পায় না ; পৃথিবীর লতাও তেমনি মরিয়াও মরে না। উভয়েই স্বরূপতঃ এক ; উভয়েই অমৃতস্বরূপ। আকাশে যে গ্রহপতি, পৃথিবীতে তাহা ওষধিপতি। উভয়ই স্বরূপতঃ এক ; উভয়েই সোম। আকাশের নক্ষত্রগুলি দেবতাদের গৃহ ; দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি। দেবতারা আপন আপন ঘরে বসিয়া থাকেন ; সোম সেই ঘরে ঘরে বিচরণ করে ; দেবতারা তাহা পান করেন ; পানের পর সোমপাত্র রিক্তপ্রায় হইলে সোমের আবার আপ্যায়ন হয় বা পূরণ হয়। আকাশে নক্ষত্রমধ্যে বিচরণ কালে ছোট ছোট গ্রহগুলিও—planet গুলিও—হয়ত ছোট ছোট সোমপাত্র ; ঐ পাত্রও অমৃতপূর্ণ ; দেবতারা ঐ গ্রহ পূর্ণ করিয়া সোম পান করেন। পৃথিবীতে ওষধি সোম দ্যুলোকে স্থিত সেই সোমেরই প্রতিরূপ। যজমান ও ঋত্বিকেরা পাত্র পূর্ণ করিয়া সোমরসের গ্রহ পান করেন। সেই সোমও ফুরায় না ; সেই জন্য তাহার আপ্যায়ন অনুষ্ঠান।

এই যে সোম দেবতা, তিনি মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্রই ছিলেন, অথবা পার্ব্বত্য লতামাত্র ছিলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। বেদ-পন্থী যাজ্ঞিকের এবং যজমানের সে বিচারে বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টাইলারের স্বীকারোক্তি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself but of the intention with which the worshipper performs it. কোন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, যজমানের পক্ষে ও যাজ্ঞিকের পক্ষে ঐ intention-টাই বড় কথা এবং একমাত্র কথা। সোম দেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁহাকে কোন্ চোখে কিরূপে দেখিতেন, তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্যঃ"। ইঁহারা স্তুতি গানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ইহার প্রশংসার্থ মন্ত্র পাঠ করিতেন, ঋক মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সাম মন্ত্রে ইহার স্তুতি গান করিতেন। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটাই

ইহাঁর স্তুতি গীতে পরিপূর্ণ—ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইহাঁর প্রশংসাবাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইহাঁর গুণ গান করিতেছেন; বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্ত্য দেব, এই চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব্ব, আকাশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত ছিলেন; সেখান হইতে জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; ইহাঁর শুভ্র তেজ দীপ্তি পাইতেছিল; দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। ইনি স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূলোককে দ্যুলোকের সহিত যুক্ত করিয়াছেন; তিনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন। এই নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান, ইনি জগতের আয়ুঃস্বরূপ। দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন বলিতেছেন, ইনি দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণমধ্যে ঋষি, মৃগগণমধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণমধ্যে শ্যেন পক্ষী। তিনি "ঋতস্য গোপা" সত্যের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি বিদ্বান; ঊর্দ্ধ হইতে তিনি বিশ্বভবনে দৃষ্টি করেন। "ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্রে, আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া"—তাঁহারই মায়াবলে বরুণদেবের জিহ্বাগ্রে সত্যধর্ম্মের তন্তুসূত্র পবিত্রোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে। ঋষি কশ্যপের সহিত আমরাও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্ন
সত্যং বদন্ সত্যকর্ম্মন্
শ্রদ্ধাং বদন্ সোমরাজন্
ধাত্রা সোম পরিষ্কৃতঃ।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

হে ঋতদ্যুম্ন, তুমি ঋত বাক্য বলিয়া থাক; হে সত্যকর্ম্মা, তুমি সত্য বাক্য বলিয়া থাক; হে সোম রাজা, তুমি শ্রদ্ধাবাক্য বলিয়া থাক; ধাতা কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইয়া ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ
সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ,
সং যন্তি রসিনো রসাঃ
পুনানো ব্রহ্মণা হরে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

সত্য তুমি উগ্র; তুমি বৃহৎ; তুমি রসস্বরূপ; তোমার রসধারা সর্ব্বত্র

মিলিত হইতেছে; অহে হরি, ব্রহ্ম বাক্যে পূত হইয়া তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যত্রানুকামং চরণং
ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ,
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

ঊর্দ্ধস্থিত সেই তৃতীয় নাকে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে, যেখানে যথাকাম মুক্ত ভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতিষ্মান্, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র রাজা বৈবস্বতো
যত্রাবরোধনং দিবঃ,
যত্রামূর্যহ্বতীরাপঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

যেখানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেখানে দ্যুলোকের অবরোধ দ্বার, যেখানে অপসমূহ প্রবহমান, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র জ্যোতিরজস্রং
যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্,
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান
অমৃতে লোকে অক্ষিতে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

যেখানে অজস্র জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত, হে পবমান সোম, সেই অক্ষয় অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সন্ধ্যায়।

১

জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়—
নহে দূরে দীর্ঘ অবসর ;
কর্ম্মের গুঞ্জন ক্লান্তপ্রায়,
আনিছে কি নিস্তব্ধ প্রহর ?
বল প্রিয়ে, কোথা ছিনু—কে মিলাল'
অন্তরে অন্তর।

২

মনে পড়ে প্রথম যৌবন,
প্রভাতের অরুণ-উন্মেষ ;
বনে-বনে বিহঙ্গ-কূজন,
ফুলে-ফুলে গন্ধ পরিবেষ !
প্রাণে তৃষা কি আকুল—নয়নে কি স্বপন-
আবেশ !

৩

এসেছিল বসন্ত যখন,—
কুঞ্জে-কুঞ্জে কে দিল সংবাদ ?
বর্ণে—গন্ধে ভরিল ভুবন,
রূপে—রসে কে দিল আস্বাদ ?
তখন কি দিলে দেখা অকলে লইয়া সুখসাধ।

৪

মনে হ'ত সকলি সুন্দর ;—
কি উদার ধরণীর বুক,
মধুময় কিবা আত্ম-পর,
কি মধুর প্রকৃতির মুখ !
মুগ্ধনেত্র—মুগ্ধ হিয়া, ভাবিলাম করতলে সুখ !

৫

সুখে কভু ছিল না সন্দেহ,
অভাব ত বাজিত না বুকে ;
নিত্যপূর্ণ কমলার গেহ,
কি সৌন্দর্য্য ফুটিত ও মুখে !
গৃহকোণে খেলা-ঘর,—সেই স্বর্গে খেলিয়াছি
সুখে !

৬

এবে হায়, কোথা সে বিশ্বাস,—
কোথা প্রীতি—দেবতার দান !
বুকভাঙ্গা পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
কর্ণে শুনি মৃত্যুর আহ্বান !
কই প্রিয়ে, কোথা সুখ—কোথা আশা—
হু-হু করে প্রাণ !

৭

ধূসর আকাশ-পানে চাহি—
সুখ-দুখ—নাহি কারও ধ্যান !
সাঁঝে পাখী উড়ে যায় গাহি—
যেন কোন্ বিষাদের গান।
একে একে উঠে তারা—নাহি জানে সুখের
সন্ধান।

৮

আজি মোরা সুখের কাঙ্গাল—
একি সত্য—অথবা সংশয় ?
সেই ঋতু—প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল,
তুমি আমি অভিন্নহৃদয়।—
এত দিনে—এ সন্ধ্যায়—বুঝিবার এসেছে
সময়।

৯

সেই প্রেম নয়নের কোণে,
সেই হাসি হৃদি করে আলো ;
সেই তৃপ্তি বসি একাসনে,
সেই তুমি—সেই বাস' ভালো।
বাহিরে আসুক্ সন্ধ্যা—গৃহকোণে তুমি
দীপ জ্বালো।

১০

স্বার্থ ল'য়ে কি ঘোর প্রমাদ—
মানুষ করে ধূলি বিতরণ ;
চারি দিকে হানাহানি বাদ—
কে করিবে তিক্ত তাহে মন ?
আমাদের তরে থাক্—সন্ধ্যা-দীপ, শান্ত
গৃহকোণ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

চিড়িয়াখানা।

১

গ্রে ষ্ট্রীটে —নং বাটীর একতালার ঘরগুলি এ কালের মত। দ্বিতলের গৃহ সে কালের মত। বাটীর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। উদ্দেশ্য 'আবরু'-রক্ষা। পার্শ্বের বাটীতে পূর্ব্বে এক জন সুবর্ণবণিক বাস করিতেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় চলিয়া যাইবার পর সে বাটীতে ছাত্রদিগের একটী 'মেস' সংস্থাপিত হইয়াছিল। যখন সে বাটী একতালা ছিল, তখন এ বাটীর প্রাচীর ছোট। সে বাটীর দ্বিতলে গৃহ নির্ম্মিত হইলে, এ বাটীর প্রাচীর উচ্চ হইয়া অবশেষে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষের মাথা ছাড়াইয়া উঠিল। দ্বিতলের বারান্দায় ঘন ঘন বাতায়নশ্রেণী স্থাপিত হইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া লোহের 'রেলিং' খাড়া হইল। কালক্রমে একটা কাকাতুয়া সেই রেলিং বাহিয়া উপরে উঠিত, এবং নীচে নামিয়া আসিত। তাহার ধ্বনিতে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ কম্পিত হইত। নিকটে পাখী আসিতে পারিত না।

বারান্দায় আরও কতকগুলি খাঁচার পাখী ছিল। বারান্দায় পূর্ব্বে রৌদ্র যাইত, এখন আর যায় না। স্ত্রীলোকেরা ছাতে যায় না। ভাড়াটিয়া বাটী হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা নিম্নতলে আসে না। কর্ত্তা নিজের জমিদারীর কাগজপত্র লইয়া বসিয়া থাকেন। ঘটনাক্রমে কোনও স্ত্রীলোক সে প্রদেশে গেলে চীৎকার করিয়া উঠেন। স্ত্রীলোকেরা বারান্দায় দিনের বেলায় যায় না। গেলে কাকাতুয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

বাহিরে পুষ্পোদ্যান ছিল। সেই প্রাচীরেরই মধ্যে। সেই উদ্যানে কীট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর অভাব ছিল না। একটা হরিণ চরিয়া বেড়াইত, তাহার সিং খুব বড়। একটা গাভী ছিল। কতকগুলি খরগোষ ছিল। বিলাতী ইন্দুর ছিল। কতকগুলি ময়ূর মধ্যে মধ্যে আসিয়া টবে জল পান করিয়া যাইত।

কর্ত্তা হলধর বসুর বাটীতে অনেক লোক। কিন্তু জানিবার যো নাই। সকলেই নিঃশব্দ। দরওয়ান রামানুজ সিং রামায়ণ পাঠ করিত—কিন্তু নিঃশব্দে। কর্ত্তা চণ্ডীপাঠ কিংবা গীতা পাঠ করিতেন, তাহাও নিঃশব্দে। স্ত্রীলোকেরা নিঃশব্দে উপন্যাস পাঠ করিত। কোন্ সময় এবং কে পাঠ করিত, তাহা জানা যাইত না, কিন্তু—লাইব্রেরী হইতে দুই তিন দিন অন্তর অনেকগুলি উপন্যাস আসিত, এবং তাহার রসিদ স্ত্রীলোকেরাই দিত। হলধর বসুর পুত্র

সন্তান ছিল না। থাকিলে বাটী অত নিঃশব্দ ভাব ধারণ করিত না। কিন্তু এক জন জামাতা ছিল। তাঁহার চেহারা দেখিলেই বুঝা যাইত যে, তিনি এক জন জামাতা। জামাতা খুব নিঃশব্দ। কিন্তু কর্ত্তার ভয় নহে। তিনি কাণে কম শুনিতেন, এবং কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেও চটিয়া যাইতেন। এই গুণটুকু লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় তাঁহাকে গৃহজামাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিতেন। বলা বাহুল্য যে, জামাইবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর কথোপকথন কেবল ইঙ্গিতে হইত।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, দ্বিতলের গৃহ সে কালের মত। বারান্দার চতুর্দ্দিকের সারি সারি রেলিংএর মধ্যে অনেকগুলি কামরা। একটা পূজার ঘর নিশ্চয় ছিল। কারণ, বারান্দায় মালিনী আসিয়া ফুলের সাজি রাখিয়া যাইত। মালিনী কেন? জামাইবাবু ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের দ্বিতলে যাইবার অধিকার ছিল না। মালিনীর স্বামী কিন্তু 'মালী' নয়। মালিনী বত্রিশ বৎসরের বিধবা। মালী অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ। সে কর্ত্তার তিন পুরুষ দেখিয়াছিল, এবং লর্ড বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারলকে একদা অশ্বারোহণে যাইতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করাতে তাহাকে অনেক দিন 'গবর্ণমেণ্ট হউসে' মালীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সে পেন্সন পাইলে হলধর বসুর পিতামহ রাম বসু (তাঁহার একটা কবির দল ছিল) স্বীয় উদ্যানের মালীরূপে নিযুক্ত করেন। সেই অবধি উদ্যানের শোভা। উদ্যানের বৃক্ষগুলি প্রায় পঁচিশ বৎসরের। তাহারা মালিনী অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট। অর্থাৎ, উদ্যান-প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মালিনী সেখানে ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বসুজা মহাশয় তাঁহার গৃহিণীর পূজার ফুল তুলিতে ও সচন্দন তুলসীপত্র যোগাড় করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মালিনী কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রিয় পাত্রী, সুতরাং কর্ত্রীঠাকুরাণীর তিনটী কন্যাই মালিনীর শাসনাধীনা। সেকালের আরও একটা লক্ষণ যে, দ্বিতলে কর্ত্তা থাকিতেন দক্ষিণ প্রান্তে। প্রথমা কন্যা নলিনী (যাঁহার স্বামী 'জামাইবাবু') থাকিতেন উত্তর দিকে। পূর্ব্ব দিকে দ্বিতীয় কন্যা অনিলা থাকিত, এবং তাহার গৃহে মালিনী বাস করিত। অনিলার ঘরে ধূপ ও নানাবিধ পূজার সরঞ্জামের ছড়াছড়ি। একটা আলমারীতে অনেকগুলি 'টিকিটমারা' পুস্তক। অধিকাংশ নভেল। পশ্চিম দিকে কনিষ্ঠা কন্যা খুকীর বাস। খুকী ও অনিলা, তাহাদের নলিনীদিদির ন্যায় নিতান্ত পর্দ্দানসীন নহে। কারণ, অনিলার বিবাহ হয় নাই, এবং সম্প্রতি

'দ্বিতীয় শ্রেণী'তে প্রোমোশন পাইয়াছে। খুকীর বয়স মোটে দশ কিংবা এগার বৎসর। অনিলা খুব অঙ্ক কসিতে জানে। তাহার মতে খুকীর বয়স আধুনিক 'এভারেজ' মানবের আয়ুর ১/৬ অংশ, এবং তাহার নিজের ১/২ অংশ। তাহার মতে দ্বিতল গৃহে :—

নলিনীদিদির	১/৪ অংশ	তাহাদের মাতার	৩/৪ অংশ
তাহার	১/৩ "	জামাইবাবুর	১/২ "
খুকীর	১/৬ "	কর্ত্তার	৫/৬ "

সর্ব্বসমেত ১/৪ + ১/৩ + ১/৬ + ৩/৪ + ১/২ + ৫/৬ = ২ ৫/১২টি সম্পূর্ণ মানবের বাস।

২

খুকীর ঘরের বেশী ভাগই পুতুলে সাজান। খুকী দিনের বেলায় সেই গুলি গণিয়া রাখে, এবং রাত্রিকালে অনিলাদিদির ঘরে শুইয়া পড়ে। জামাই বাবু নিতান্ত দরকার না হইলে দিনের বেলা দ্বিতলে উঠিতে চাহেন না, এবং তিনি না উঠিলেও যদি তাঁহার মনটা সিঁড়ি বাহিয়া উঠে, তখন তিনি তামাক সাজিয়া তাহার ধূম পান করেন। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির ধাপ কয়টা, তাহা তিনি ও বাটীর 'কণ্ট্রাক্টার' ছাড়া আর কেহ জানিত না। জামাইবাবু আরও বেশী জানিতেন। সিঁড়িতে উঠিতে ঠিক পুরা এক মিনিট লাগিত। নামিতে ঠিক দুই মিনিট লাগিত। এ সম্বন্ধে অনিলা চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে, নামিবার সময় জামাইবাবু ইহজীবনের উদ্দেশ্য ভাবিতেন, তাহাতেই অত দেরী হইত, এবং উঠিবার সময় একটা মতলব করিয়া আসিতেন, তাহা কিন্তু নলিনীদিদি ব্যক্ত করিতে দিতেন না। এই জন্য জামাইবাবু কল্পনা-নদীর মাঝে দুইটী তরীতে পদস্থাপন পূর্ব্বক দুলিতেন। সেই সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কাকাতুয়াও দুলিত, এবং সঘনে চীৎকার করিয়া উঠিত। তখন জামাইবাবু বারান্দায় গিয়া তাহার মুখে একটা কাঠি দিয়া থামাইতেন। কাকাতুয়ার চীৎকার সকলেই সহিয়া থাকিত, কারণ দ্বিতলে শব্দ-জগতের সেই একমাত্র মালিক, যেমন একতালায় কর্ত্তা স্বয়ং।

ক্রমাগত অন্ধকারে থাকিয়া বাটীর মেয়েগুলি খুব ফর্সা ও কেশজাল সুদীর্ঘ। ক্রমাগত সাবধানে থাকিয়া সকলেরই চক্ষু খুব টানা ও পদবিক্ষেপ ধীর। ক্রমাগত নিঃশব্দে থাকিয়া সকলেরই স্বর অতিশয় কোমল। সকালে ও সন্ধ্যায় পূজাগৃহে এক ঘণ্টাকাল ভক্তিভরে বসিয়া থাকায় সকলের স্বভাব অতি ধীর ও নম্র।

দ্বিতলের গৃহকর্ম্মের খুব বাঁধা বন্দোবস্ত। প্রত্যেকের নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া রাখার কথা। প্রত্যেকে নিজের কাপড় দ্বিতলের কলে দুই বেলা ধৌত করে। সূর্য্যোদয়ের সময় সকলে অনিলার ঘরে গিয়া বসে, এবং সূর্য্যাস্তের সময় সকলে খুকীর ঘরে গিয়া চুল বাঁধে। এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দ্বিতলের রন্ধনশালায় গিয়া জলখাবার তৈয়ারী করে, এবং নীচে পাঠাইয়া দেয়। কখনও কখনও অনিলা, খুকী ও স্ত্রী নলিনীকে লইয়া বাটীর মোটরকারে জামাই বাবু হাওয়া খাইতে যান, এবং হাওয়া খাওয়া সাঙ্গ হইলে বাটী ফিরিবার সময় হাসিতে চেষ্টা করেন। এমন কি, জামাই বাবু এক দিন গুণ্‌-গুণ্‌ স্বরে গান ধরাতে অনিলা তাহার পিতাকে বলিয়া একটী ডল্‌সেটিনা কিনিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার 'বেলো' খারাপ হইয়া যাওয়াতে অনিলার মন খারাপ হইয়াছিল। জামাইবাবু মধ্যে মধ্যে কর্ত্তা বাটীতে না থাকিলে একটু জোরে গায়িতে চেষ্টা করিতেন। কর্ত্তা থাকিলে নিঃশব্দে গায়িতেন। কর্ত্তা ধর্ম্মসঙ্গীত ছাড়া আর কিছু ভাল-বাসিতেন না। তাঁহার মতে চীৎকার করিয়া গাওয়া অসভ্যতা, এবং তাহাতে দেবতাদের মানের হানি হয়। কর্ত্তা তালের সঙ্গে গায়িলেই চটিয়া যাইতেন। কিন্তু জামাইবাবুর তালই বেশী 'দোরস্ত' ছিল। তালের জোরে গান চলিয়া যাইত, যেমন হামাগুড়ির জোরে শিশু চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে, যেমন হামা-গুড়ির পরে শিশু চিৎ হইয়া পড়ে, সেই রকম জামাইবাবু তাল 'ফেরতা' করিয়া লইতেন, এবং তাহার গুণপণা দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিতেন। অনিলা অনেকগুলি গান জানিত, এবং সেগুলি নানা রকম করিয়া গায়িত। খুকীর মনে হিংসা ছিল না, কিন্তু দিদির গান সম্বন্ধে সামান্য একটু ছিল, কারণ স্কুলে সকলেই অনিলার প্রশংসা করিত। খুকীর প্রশংসা কেহই করিত না।

এই রকম করিয়া দিন কাটিতেছিল। এমন সময় পার্শ্বের বাটীতে একটা বিপ্লব ঘটিল। মেসের ছেলেদের মধ্যে এক জনের বাক্স পুলিস তালাশ করিয়া যাওয়াতে বাটীর মালিক সে বাটী হইতে সকলকে উঠাইয়া দিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সেখানে একটী পরিবার আসিয়া জুটিল। তাহারা ফুলের টব দিয়া ছাত সাজাইয়া ফেলিল, এবং সেই ছাতের উপর চেয়ার লইয়া সকালে ও সন্ধ্যায় বসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের স্ত্রীলোকদের সাজসজ্জা অনেকটা এ কালের মত, এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা খুব 'রিফাইন্‌ড'। তাহারা চায় সঙ্গে বিস্কুট খাইত, এবং তাহাদের বাটীতে 'মালিনী' ছিল না। তাহাদের পাখী ছিল না। কিন্তু তাহাদের একটা টেব্‌ল হার্ম্মোনিয়ম ছিল, এবং বাটীর একটী ছেলে সুন্দর

সেতার বাজাইত। তাহার সময় অসময় ছিল না। বোধ হয়, বহি মুখস্থ করিয়া অত্যন্ত অবসাদ হইলে সে সেতার ধরিত, এবং তাহা বাজাইতে বাজাইতে ঘুমাইয়া পড়িত। ছেলেটি কলেজে বি. এস্‌-সি. পড়ে। নাম, প্রবোধচন্দ্র। তাহাদের ধরণ ব্রাহ্মদিগের মত। স্ত্রীলোকেরা কোমল বুট্‌ জুতা পায় দিয়া ছাতে বেড়ায়। এক জন চস্‌মা চোখে দেয়। সে 'বি. এ. পাস'। প্রবোধের দিদি।

প্রবোধের দিদিকে প্রবোধ 'বি.এ. দিদি' নাম রাখিয়াছিল। প্রবোধ বাপের অত্যন্ত আদরের ছেলে। তাহার ইচ্ছা ছিল, ক্রমে দিদি 'এম. এ. দিদি'র পদে আরোহণ করিবে। কিন্তু দিদির বিবাহ সিমলা পাহাড়ের এক জন সেক্রেটারিয়টের বড় বাবুর সঙ্গে হইয়া যাওয়াতে তিনি 'কলেজ কেরিয়ার' পরিত্যাগ করিয়া দাম্পত্যজীবনের জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। দিদির প্রধান কাজ চিঠি লেখা, এবং তাঁহার চারি রকম চিঠির কাগজ ও পাঁচ রকমের লেফাফা ছিল। তিনি সরু 'নিবে' স্বামীকে পত্র লিখিতেন, নচেৎ কাগজ বেশী খরচ হইয়া যাইত। নিমন্ত্রণপত্র মোটা 'নিবে' ও সবুজ কালীতে লিখিতেন। দরকার হইলে লাল ও নীল কালী মিশাইয়া বেগুনে কালী করিয়া লইতেন, এবং একই পত্রে কখনও সবুজ, কখনও বেগুনে, কখনও নীল প্রভৃতি কালীর সংযোগে চিত্র বিচিত্র করিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতেন।

আজ 'বি. এ. দিদি' প্রবোধের সঙ্গে ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বসুজা মহাশয়ের ছাতের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে এ বাটীর দ্বিতলের সংগঠন-প্রণালী, ও কাকাতুয়ার ধ্বনি, এবং অবরুদ্ধ স্ত্রীলোকদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা ও জামাইবাবুর আরোহণ ও অবরোহণ প্রভৃতি দেখিয়া দিদি প্রবোধকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এটা একটা চিড়িয়াখানা নিশ্চয়।'

৩

প্রবোধ সাহস পাইয়া আলিশার নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাড়ীর দোতালায় কে আছ গো, এটা কি চিড়িয়াখানা?' খুকী একাকী তাহার ঘরে বসিয়াছিল। সে মেমসাহেবের মত একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক জন পঞ্জাবী আস্তীনওয়ালা যুবককে দেখিয়া একেবারে খোলা ছাতে উঠিয়া গেল, এবং প্রাচীরের উপর গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কি চীনেবাজারের সওদাগর?' উত্তর শুনিয়া প্রবোধ খুব হাসিল। বি.এ. দিদি বলিলেন, এরা নিশ্চয় পর্দ্দানসীন। 'তোমার চেয়ে বড় মেয়ে এ বাড়ীতে নাই?'

খুকী দৌড়িয়া অনিলাকে ডাকিয়া আনিল। অনিলা প্রাচীরে গলা বাড়ির

করিয়া দিল। প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'দিদি, কি সুন্দরী মেয়ে দেখ! যেন শকুন্তলার ছবিখানি।' তাহা শুনিয়া অনিলা অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

বি.এ. দিদি বলিলেন, 'তোমাদের চেয়ে বড় মেয়ে নাই? তোমাদের মাকে ডাক না।'

খুকী। বড় দিদি ও মা পুরুষ মানুষের সম্মুখে বেরোন্ না।

দিদি। (প্রবোধের প্রতি) 'তুমি চলে যাও।'

প্রবোধ চলিয়া গেলে নলিনী প্রাচীরের উপর গলা বাড়াইয়া দিল। বি.এ. দিদি খুব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম?'

নলিনী। আমার নাম নলিনী। আপনারা এ বাড়ীতে কবে এসেছেন?

বি.এ. দিদি। আজ সাত দিন হ'ল। আমরা মনে করেছিলেম, এ বাড়ীটা 'চিড়িয়াখানা'; তাই প্রথমে এদিকে ঘেঁসি নাই। ওরা কি তোমার বোন্? সকলের মুখ এক ছাঁচে ঢালা। আমি 'ফটো' তুল্‌তে পারি। 'ক্যামেরা' আছে।

নলিনী। আপনার স্বামী এ বাড়ীতে থাকেন?

বি.এ. দিদি। (হাসিয়া) তাও কি কখন হয়? তা হলে আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে যেতুম। তিনি নাই বলেই আমি ছাতে এসে তোমাদের সন্ধান করেছি। আমার স্বামী সিমলার পাহাড়ে থাকেন।

অনিলা পার্শ্বে লুকাইয়াছিল। সে বলিল, সে পাহাড়টা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে।

বি.এ. দিদি। তোমার স্বামী কোথায় থাকেন?

অনিলা। (গলা বাড়াইয়া) এ বাটীরই নীচের তালায়। আমাদের দিদির স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন ত?

নলিনী। তাঁর কথা অনিলাকে জিজ্ঞাসা করুন।

অনিলা। তিনি আমাদেরই বাড়ীতে থাকেন।

বি.এ. দিদি। সে খুব ভাল। চিঠিপত্র লিখ্‌তে হয় না। কোনও ভাবনা চিন্তে নেই। খাবারগুলি সব দেখে শুনে দেওয়া যায়। অসুখ হলে কাছে থাকা যায়।

অনিলা। নলিনী দিদি তাঁকে সপ্তাহে একবার চিঠি লেখেন, এবং জামাই-বাবু তার উত্তর পাঠিয়ে দেন।

বি.এ. দিদি। এ বন্দোবস্ত খুব চমৎকার। বাটীর মধ্যেই স্ত্রী স্বামীকে পত্র লেখার প্রথা এই প্রথমে শুনলুম।

অনিলা। ঠিক সে রকম নয়। দিদি চিঠি লিখে দেন। মালিনী ডাকঘরে ফেলে দেয়। জামাইবাবুও তার উত্তর ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসেন।

বি.এ. দিদি। এটা আরও চমৎকার বন্দোবস্ত। অসুখ বিসুখ হ'লে?

অনিলা। ডাক্তারে খবর না দিলে আমরা অসুখ বিসুখ গ্রাহ্য করিনে। আমাদের সামান্য অসুখ বিসুখ হ'লে আমরা তুলসীপাতার রস খাই।

নলিনী। আমাদের বারান্দায় অনেক রকম পাখী আছে, তাদের এই সময় খেতে দিতে হয়।

বি.এ. দিদি। আমার বড় ইচ্ছা, তোমাদের বাড়ী একবার দেখি। অন্ততঃ দোতালা। আমার বোধ হয় তোমরা এক তালায় থাক না?

অনিলা। না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে, এই সহরে যদি ছাতের সঙ্গে ছাত জুড়ে একটা লম্বা রাস্তা থাক্‌ত, তবে আমরা রোজ বেড়াতুম।

বি.এ. দিদি। সেটার যোগাড় করা কোনও শক্ত কথা নয়। তোমাদের ছাত হ'তে আমাদের ছাত কেবল দুই হাত তফাৎ বই ত নয়। একখানা তক্তা ফেলে দিলেই হবে। কাল এর বন্দোবস্ত করা যাবে। আমার 'ক্যামেরা' এনে কাল তোমাদের ফটো তুলে নেব। তুমি স্বামীকে কি কালী দিয়ে পত্র লেখ?

নলিনী। কালো কালী।

বি.এ. দিদি। সেটা উচিত নয়। হয় সবুজ নয় বেগুনে কালী দিয়ে লিখ। নিজের কালী না থাক্‌লে অনেক সময় জাল চিঠি বেরোয়। কিংবা চিঠি ওলট-পালট হয়ে যায়। অনেক চিঠি লিখ্‌তে হলে এমনই জঞ্জাল হয় যে, সাম্‌লানো মুস্কিল। আমি একটা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। মাঝে আমার স্বামীকে যে কবিতা লিখেছিলুম, সেটা মাসিক পত্রিকায় 'পোষ্ট' হয়ে গিয়েছিল। সেটা কবিতা। পত্রিকায় যে কবিতা লিখেছিলুম, সেটা স্বামীর খামের মধ্যে 'পোষ্ট' হয়ে গিয়েছিল। এমন ভুল মাঝে মাঝে হওয়া অসম্ভব নয়।

নলিনী। আমি স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিনে।

বি.এ. দিদি। ঐ যে কাকাতুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে—উনি কে?

অনিলা। ঐ ত আমাদের জামাইবাবু।

বি.এ. দিদি। খুব ভালমানুষ বলে বোধ হয়। আচ্ছা, উনি বাড়ীতে শাল গায় দিয়ে থাকেন কেন?

অনিলা। তা না হ'লে বাবা চটেন। বাবা বলেন, সকলে নিজের নিজের মর্য্যাদা রেখে চ'লবে।

বি.এ. দিদি। এ প্রথাটাও মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের প্রবোধ তা মানে না। তবে জামাইবাবু ও ছেলে, অনেক তফাৎ।

অনিলা। জামাইবাবু কাণে কম শোনেন, সেই জন্য তিনি বড় একটা ওপরে আসেন না।

বি.এ. দিদি। কি দুঃখের কথা, কি আশ্চর্য্য কথা। আমার স্বামীও কাণে কম শুন্‌তেন, কেবল আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সেরে গেছেন। কাণের সুব্যবহার না হ'লে কাণ খোলসা হবে কেন? স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে কথা না কহিলে, স্ত্রীর দিকে ভাল করে চেয়ে না দেখ্‌লে চক্ষু কর্ণের উৎকর্ষ কখনও হ'তে পারে না। আমার বড় দুঃখ হয়েছে তোমাদের দশা দেখে। তোমরা কি ক'রে জীবন কাটাচ্ছ, জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

নলিনী। দিদি, তুমি যদি ওঁর কাণ ভাল ক'রে দাও, তবে চিরকাল দাসী হয়ে থাক্‌ব।

বি.এ. দিদি নলিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, তোমার স্বামী আমার মায়ের পেটের ভাই, আমি তাঁর কাণ সারিয়ে দেব।

৪

অনেক ডাক্তার জামাইবাবুর কর্ণের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কোনও উপকার দর্শাইতে পারেন নাই। বি.এ. দিদির অভূতপূর্ব্ব প্রস্তাবে সকলের মনে একটা আশা হইল। নলিনীর ধারণা হইল যে, একলা বাটীতে চুপ করিয়া বসিয়া স্বামীর কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, এবং চক্ষু পাছে অন্ধ হয়, এই ভয় ভবিষ্যতেও ছিল। নলিনীর মাতা শুনিয়া খুব খুসী হইলেন, এবং বি.এ. দিদিকে তার পর দ্বিতলে লুকাইয়া লইয়া আসিলেন। মালিনী উভয় ছাতের মাঝে একখানা তক্তা বসাইয়া সুচারু রাস্তার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

বি.এ. দিদি গৃহগুলি পরিদর্শন করিয়া বলিলেন, 'এখানে কর্ণ সারিবার উপায় নাই। কর্ত্তা যখন শব্দের বিরোধী, সে বাড়ীতে স্বামী স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি অসম্ভব। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, দাম্পত্য কলহ মানব জগতের উন্নতির মুখ্য কারণ, কেন না, প্রাণ খুলিয়া ঝগড়া আর কারও সঙ্গে অসম্ভব। অন্ততঃ সকালে ও বিকালে চা খাইবার সময় একটু তর্ক করিলে উন্নতি হইতে পারে।'

সেই জন্য বি.এ. দিদি নলিনীকে জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়া তাঁহাদের ছাতের উপর চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

নলিনীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কি বেম্ম', আপনাদের সঙ্গে চা খেতে দোষ নেই ত ?'

বি.এ. দিদি। (সগর্ব্বে) 'স্বয়ং স্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে গেছেন। আমরা সমাজের বেম্ম নয়। কেবল ধরণধারণ বেম্মর মতন। ঠাকুর দেবতাদের মেনে চলি। তবে অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না।'

নলিনীর মা। তা হলেই হল মা। অস্থিতে নাই বা বিশ্বাস কল্লে, রক্ত-মাংসটুকু বিশ্বাস কল্লেই যথেষ্ট। আর বিশ্বাস কেই বা করে ? আমরাও দেখিনি, তোমরাও না। তবে মেনে চলা ভাল। গেরস্তর ঘরে কখন কি বিপদ ঘটে, তা বলা যায় না। যত বিপদের ত্রাণকর্ত্তা দেবতারা। আমার ঘাড়ে একবার মাকসা চেটেছিল, কোনও ডাক্তার কিছু কর্ত্তে পারে নি। তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। অবশেষে কেবল কালীঘাটে পূজো দিয়ে ঘাড় তুলতে পাল্লেম।

বি.এ. দিদি 'গিন্নী'র মনরক্ষা করিয়া কহিলেন, 'আমারও সেই মত। বিপদের সময় চেষ্টা করায় কোনও হানি নাই। আমরাও ঐ রকম অনেক একস্‌পেরিমেণ্ট করেছি।'

ইতিমধ্যে নলিনী জামাইবাবুকে ও বাড়ীর ছাতে যাইতে রাজি করাইয়াছিল। ছাতের যে দিকে ছায়া, সেই দিকে বি.এ. দিদি পর্দ্দা খাটাইয়া একটী জাপানী টেবলের উপর চার সরঞ্জাম ও কেক্ সাজাইতে লাগিলেন। মালিনী ও বাটী হইতে কড়াইসুঁটীর গরম কচুরী লইয়া আসিল।

জামাইবাবুর আহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কেক্ ও কচুরী মিশাইয়া কি করিয়া খাদ্যের মান রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি শীঘ্রই ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে চা খাইয়া তাঁহার উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়া উঠিল। তিনি বি.এ. দিদিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'উনি এক জন মহাপুরুষ।'

ইহাতে নলিনী হাসিল, এবং লজ্জিত হইল। বি.এ. দিদি বলিলেন, 'ভাইয়ের প্রশংসা শিরোধার্য্য, এতে লজ্জার কোনও কারণ নাই।'

জামাইবাবু কর্ণের পার্শ্বে করতল প্রসারিত করিয়া ধ্বনি গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি পেয়ালা শেষ হইলে বলিলেন, 'ঠিক্।'

জামাইবাবুর দাম্পত্যজীবনের মধ্যে এমন উৎসাহ কখনও দেখা যায় নাই। নলিনী খুব খুসী হইয়া বলিল, 'আচ্ছা বল, দিদি শুনবেন।'

জামাইবাবু বলিলেন, 'জীবনের ভার স্কন্ধে না পড়িলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন হয় না। সংসারে কোনও প্রান্তে, কর্ম্মক্ষেত্রে, নিঃসহায় অবস্থায় না পড়লে

সেটা কেহ বুঝতে পারে না। তাই আমি অনেক সময় মনে করেছিলেম যে, ওকে নিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ভয় হয়। সেই জন্য চেষ্টা করি নাই।'

নলিনী অবাক হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'ঠিক বল্‌ছ?'

জামাইবাবু। নিশ্চয়।

নলিনী। তবে এতদিন একবার বলা উচিত ছিল।

জামাইবাবু। বলি কখন? বলিলে পাছে তুমি রাজি না হও, তবে ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। বলিবার 'ফুরসৎ' কৈ? আহার এত বেশী রকম হয় যে, সুন্দর কল্পনাগুলি পেটের মধ্যেই থাকিয়া যায়। যাই কোথা? যদি কষ্ট হয়, তখন তুমি আমাকে দোষের ভাগী করিবে।

নলিনী। তোমার কষ্ট কি আমার নয়? শুনছ দিদি?

বি.এ. দিদি। শারীরিক কষ্ট যাহারা ভাবে, তাদের দিয়ে সংসারের কোনও উপকার হয় না। আমার মতে তোমাদের এক দিন রাত্রিতে পালিয়ে অন্ততঃ গোলদীঘীর ধারেও বেড়ান উচিত ছিল। এটুকু সাহসও যদি না হয়, তবে বিপদে আপদে স্ত্রীকে রক্ষা করবে কি ক'রে?

নলিনী। আমরা ত মাঝে মাঝে এক সঙ্গে থিয়েটরে গিয়েছি।

জামাইবাবু। তাতে ছাই হয়। তুমি কেবল হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক। তোমার হৃদয়ে স্পন্দন কখনও হয়, তা আমার বিশ্বাস হয় না।

নলিনী। তুমি কি তাদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক না?

এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা কলহের সূত্রপাত দেখিয়া বি.এ. দিদি খুব খুসী হইলেন।

৫

কেন না, কলহই প্রেমের প্রথম সোপান।

বি.এ. দিদি একবার মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—'দ্বন্দ্ব না হইলে প্রণয় প্রগাঢ় হয় না। অনেক সময় দুইটী ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে খুনাখুনি হইয়া যায়, পরে পরস্পরের অবস্থা দেখিয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের এত করুণার সঞ্চার হয় যে, অবশেষে উভয়ে উভয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।'

তাই তিনি বলিলেন, 'দেখ গোবিন্দলাল (গোবিন্দলাল জামাইবাবুর নাম) স্ত্রীর চেয়ে আর মায়ার মানুষ কেহ নাই। নিজে না খেয়ে, রোগে কাতর হয়ে, সকল সুখ ত্যাগ করে' প্রথমে গৃহের মধ্যে শান্তি সঞ্চার করে। কখনও

ছেলেপুলের লাথি খায়, কখনও স্বামীর তাড়া খায়, কখনও শ্বশুর শাশুড়ীর গঞ্জনা। স্ত্রী যেন সকলেরই শত্রু। যেন বিশ্বের সকলেই সেই প্রেম ও আত্ম-ত্যাগের প্রতিমূর উপর কুঠারাঘাত করে। কিন্তু সতী বলিয়া সহিয়া যায়। স্ত্রীর গুণে পশু থেকে মানুষ কি ক'রে হয়, তার উদাহরণ ভারতবর্ষ। প্রত্যেক স্ত্রী যীশুখ্রীষ্টের মত কষ্ট পেয়ে মরে, কিন্তু সতী ব'লে সয়ে যায়। স্ত্রী না থাকিলে ছেলে হয় না, ভাই হয় না, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয় না।

'তবে কলহ হওয়া স্বাভাবিক। ডারউইন যেখানে পশুজগতের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, সেটা করুণার প্রথম সোপান। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের স্রোত দেখে অশোকের মনে যেমন করুণার সঞ্চার হয়েছিল, আমাদের গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীর কষ্ট দেখেও কখনও পুরুষের মনে করুণার সঞ্চার হবে, তা নিশ্চয়।'

বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে নলিনী চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। বি.এ. দিদি চশমাখানি রুমালে মুছিয়া আর এক পেয়ালা চা তৈয়ারী করিলেন।

এমন সময় মালিনী আসিয়া খবর দিল যে, খুকীর সঙ্গে অনিলার ঝগড়া হইয়াছে, এবং সেই ঝগড়া দেখিয়া কাকাতুয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। নীচে কর্ত্তা তাহা শুনিয়া চটিয়াছেন।

অনিলার সঙ্গে খুকীর মধ্যে মধ্যে খাবার লইয়া ঝগড়া হয়, এবং তাহাতে বাটীর পশু পক্ষী বিরক্ত হইয়া কলরব আরম্ভ করে। জামাইবাবু ছাড়া তাহা থামাইবার কেহ নাই। ঝগড়ার সূত্রপাত মালিনী করিয়া দেয়। সে অনিলাকে ভালবাসে। খুকী অত্যন্ত রাগী। সে মালিনীকে ধরিয়া প্রহার করে, এবং মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটিয়া দেয়। কর্ত্তা ছোট মেয়েকে ভালবাসেন। গিন্নী অনিলার দিকে। বাটীতে গোলমাল করিবার যো নাই, কিন্তু আজ নলিনী ও জামাইবাবু না থাকাতে অকস্মাৎ গোলমাল বাধিয়া গিয়াছিল।

তাহা শুনিয়া নলিনী স্বামীকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রবোধ কলেজ হইতে আসিয়া দিদির চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

'বি.এ. দিদি, তুমি এতক্ষণ করছিলে কি?'

বি.এ. দিদি। বেশী কিছু নয়, ঐ চিড়িয়াখানার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। ওদের জামাইবাবু এক জন অদ্ভুত লোক।

প্রবোধ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। 'চিড়িয়াখানা'র কথা শুনিয়া তাহার সেতার বাজাইবার ইচ্ছা হইল।

একটা 'এলোমেলো' বাতাস তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহিয়া চিড়িয়াখানার

সুপারী বৃক্ষের মাথা দুলাইয়া দিল। সন্ধ্যা যখন খুব অমকাল, আকাশের তারা যখন খুব উজ্জ্বল, এবং হাওয়াটা যখন খুব মধুর, তখন প্রবোধ তাহার ক্ষুদ্র সেতার লইয়া মনের সাধে পূরবী রাগিণী আলাপ করিতে লাগিল।

কিন্তু অন্য দিনের মত আজ সেতার বাজিল না। প্রবোধের একটা বাঁশের বাঁশী ছিল। প্রবোধ সেটা বাহির করিয়া ছাতের আলিশার উপর মস্তক রাখিল, এবং একটা গৎ বাজাইতে বাজাইতে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল।

নিদ্রিত প্রবোধের হস্ত হইতে বাঁশী স্খলিত হইয়া চিড়িয়াখানার বারান্দায় পড়িয়া গিয়াছিল, এবং কাকাতুয়া সেটা মুখে করিয়া উচ্চ 'রেলিং' হইতে নীচে নামিতেছিল, এমন সময় অনিলা তাহা লক্ষ্য করিয়া কাকাতুয়ার মুখ হইতে বাঁশীটি কাড়িয়া লইল।

খুকীর সঙ্গে ঝগড়ার পর অনিলা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। সেতারের আলাপ ও তৎপরে বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার রাগটুকু তিরোহিত হইয়া মায়া-মমতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কাকাতুয়ার মুখ হইতে বাঁশী কাড়িয়া লইয়া অনিলা তাহা বাজাইতে বসিয়া গেল। বলা বাহুল্য, অনিলার বাঁশী বাজাইবার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু সুরজ্ঞান থাকাতে 'কসরৎ' করিতে চেষ্টা করিল, এবং সেই 'কসরতে'র ফলে বাঁশীটি অপূর্ব্ব ধ্বনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। তার মধ্যে কোনও সুর ছিল না, কোনও রাগিণী ছিল না, এমন কি, সা রি গ ম-গুলিও অনাথ আতুরের মত অঙ্গুলির টিপ্পনীতে ত্রাহি স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া পাখীগুলি অসময়ে ডাকিয়া উঠিল, নারিকেল গাছের অগ্রভাগে ময়ূর কেকারব ছাড়িয়া দিল, এবং কাকাতুয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল।

বেগতিক দেখিয়া অনিলা নিজের শয়নগৃহে গিয়া বাঁশীটি বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, পর দিন তাহার জানা রাগিণীগুলি ও সঙ্গীত-সমাজের প্রকাশিত গৎগুলি তাহাতে সুচারুরূপে বাহির করিবে।

পাখীদের চীৎকার শুনিয়া খুকী লুকাইয়া বারান্দায় আসিয়াছিল, এবং অনিলাদিদির কসরৎ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। সে মনে মনে মতলব আঁটিল যে, সময় পাইলে দিদির বালিশের তলা হইতে বাঁশীটি চুরী করিয়া একবার বাজাইয়া দেখিবে। মতলবটা খুব সাধু, কিন্তু খুকী সে দিন ও তার পর দিন সময়াভাবে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই।

নলিনীর সঙ্গে বি.এ. দিদির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা প্রত্যহ ছাত ডিঙ্গাইয়া ও বাটীতে চলিয়া যায়। বি.এ. দিদি অনিলার পড়া মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন, এবং শক্ত অঙ্ক থাকিলে (বিশেষতঃ ত্রৈরাশিকগুলি) প্রবোধকে দিয়া কসাইয়া লন।

আজ অনিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা, তাই সে সকাল সকাল স্কুলে গিয়াছিল। খুকীদের সেই জন্য ছুটী। অবসর পাইয়া খুকী প্রবোধের বাঁশীটি অনিলার ঘর হইতে লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বাজাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মালিনী তাই দেখিয়া গৃহিণীকে খবর দিল।

গৃহিণী খুকীকে ডাকিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, 'তুই অনিলার বাঁশী কেন নিয়েছিস্?'

খুকী। এ বাঁশী দিদির নয়। ও বাড়ীর ছাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাই দিদি লুকিয়ে বাজাত।

গৃহিণী। সে কি কথা রে? ওরা যে 'বেম্ম'। ওদের এঁটো বাঁশীতে অনিলা মুখ দেয়?

ইহা মনে করিয়া গৃহিণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মালিনী বলিল, 'তাতে আর দোষ কি? গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলেই চল্‌বে।'

গৃহিণী তাহাতে আরও রাগিয়া গেলেন, এবং নলিনীকে ডাকিলেন। নলিনী আসিলে গৃহিণী বলিলেন, 'তোরা বাড়ীতে থেকেও আমার দেখ্‌বার শোনবার কেউ নেই? এই যে সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল, এখন উপায়? অনিলা বেম্মদের এঁটো বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে। এখন যে বাড়ীর হাঁড়ীগুলো ফেল্‌তে হয়, কাপড় চোপড় ধোপার বাড়ী দিতে হয়। কর্ত্তা শুনলে বলবেন কি? কি ছিষ্টিছাড়া মেয়ে গো! আমি আগেই বলেছিলেন, মেয়ে ছেলেদের বেশী দিন স্কুলে দিলে তাদের আর জাতিবিচার থাকে না। এখন উপায়?'

নলিনী মনে মনে হাসিল। এ কয় দিন ধরিয়া জামাইবাবু ও সে যে পরিমাণ বিস্কুট, কেক, ডিমের ওম্‌লেট্ প্রভৃতি খাইয়াছে, তাহার কাছে বাঁশী কোথায় লাগে! কিন্তু গৃহিণীকে ভয়ানক উতলা দেখিয়া নলিনী বলিল, 'এটা গ্রহদোষ হয়ে গিয়েছে। গেরণ টেরণ লাগ্‌লে আমরা যেমন হাঁড়ি ফেলে দিই, সেই রকম একটা কিছু করলেই হবে।'

গৃহিণী। তাই কর মা। আমি ত আর পারি নে। এই বিয়াল্লিশ

বৎসর ধরে' কেবল তোদের জাতি ও কুলমান রক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে আমার বাতে ধরেছে; তাতেও কি তোদের একটু দয়া মায়া হয় না?

নলিনী দয়া মায়া দেখাইয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল; মালিনী একেবারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। গৃহিণী বলিলেন, 'থাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, কর্ত্তা শুন্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না। তিনি একেই গোলমাল ভালবাসেন না, তার উপর জাতি নিয়ে টানাটানি। এ কথা বাইরে কেউ শুন্‌লে মেয়ের বিয়ে হবে না।'

খুকী, এত দূর গড়াইবে, তা মনে করে নাই। পাছে বাঁশী নিয়ে গোলমাল হয়, সেই জন্য সে এক দৌড়ে ছাত পার হইয়া প্রবোধের নিকট উপস্থিত।

প্রবোধ খুকীর চক্ষু জলাকীর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারখানা কি? এ যে আমার বাঁশী। কোথায় ছিল?'

খুকী। এটা আমাদের বারান্দায় পড়ে গিয়েছিল, তাই দিদি বাজাত। মা শুনে বড় রাগ করেছেন। দিদির জাত গিয়েছে। তোমাদের এঁটো বাঁশীতে মুখ দিয়ে। দিদি বাড়ী ফিরে এলে মা ভয়ানক বক্‌বেন।

প্রবোধ। আচ্ছা, তুমি যাও, এর বিধান আমি কর্‌ব এখন।

খুকী লুকাইয়া তার ঘরে আসিয়া বহি লইয়া পড়িতে বসিল। এ দিকে জামাইবাবু, নলিনী, নলিনীর মা (গৃহিণী) ও মালিনী তন্ন তন্ন করিয়া অনিলার ঘর খুঁজিয়া বাঁশী পাইল না।

বিকালে অনিলা স্কুল হইতে হাসিমুখে আসিয়া খবর দিল, 'মা! আজ সব কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি।' কিন্তু অন্যদিনকার ন্যায় গৃহিণী আজ সন্তুষ্ট হইলেন না।

গৃহিণী। তোদের এগ্‌জামিনের মুখে ছাই।

অনিলা। কেন মা?

গৃহিণী। তোর কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই? তুই ঐ বেম্মদের এঁটো বাঁশীতে মুখ দিয়েছিস্?

অনিলা। আমি অত ভেবে দেখি নাই।

গৃহিণী। অত বড় সোমত্ত মেয়ে, তোর এটুকু জ্ঞান নাই। আর বাঁশী বাজান সখ্‌ই বা কি? মেয়েছেলে কি কখনও বাঁশী বাজায়?

অনিলার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সে মুখখানি ভার করিয়া ছাতের উপর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া অনিলা কাঁদিতে বসিল।

গৃহিণী মনে করিলেন, একবার 'অনিলাকে ডেকে এনে বুঝাই।' আবার মনে করিলেন, 'একটু দুঃখ অনুতাপ করুক। অত বড় মেয়ের একটু বুদ্ধি নেই!'

অনিলা কতক্ষণ কাঁদিয়াছিল, তাহার মনে ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা চারি দিক ছাইতেছিল, আকাশে তারকা দেখা দিতেছিল। এমন সময় কে অনিলার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিল, 'অনিলা!'

অনিলা সচকিতে চাহিয়া দেখিল—প্রবোধ। প্রবোধ তাহার সঙ্গে আর কখনও কথা কহে নাই। অনিলা প্রথমে ভয়ে কথা কহিল না।

প্রবোধ। আমার জন্ত তুমি কষ্ট পেয়েছ, সেই জন্ত আমি সাহস করে' এসেছি। বাস্তবিক পক্ষে বাঁশীটা এঁটো নয়। আমি ওটা রোজ গঙ্গাজল দিয়ে ধুই।

কথাগুলি শুনিয়া অনিলার বোধ হইল যে, প্রবোধ যেন খুব আপনার লোক। প্রবোধ আবার বলিল, 'অন্ততঃ সে দিন যখন ক্ষপ্রাবেশে আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তার আগে খুব ধুয়েছিলুম। তোমার মনে কোনও সন্দেহ কি কষ্ট যেন না হয়।'

অনিলা। না।

ঐ 'না'র মধ্যে সংসারের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান লুকানো ছিল। সেটা প্রবোধকে অধীর করিয়া তুলিল। প্রবোধ বলিল, 'ঐ গঙ্গাজলটুকু ভালবাসা —সেখানে কোনও জাতিবিচার নাই।' প্রবোধ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। সমস্ত চিড়িয়াখানার পাখী ও পশুর সন্ধ্যা-কলরব তখন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনিলা সেখানে বসিয়া কথাগুলি ভাবিতে লাগিল।

৭

চিড়িয়াখানার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বি.এ. দিদির কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না। বি.এ. দিদি একবার নলিনীর সহিত পরামর্শ করিলেন, এবং নলিনী জামাইবাবুর সহিত কি পরামর্শ করিল, এবং জামাইবাবু নিজে সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিলেন। মালিনী দেখিল, অনিলা দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও জাগিয়া রহিয়াছে। অত রাত্রি জাগা অনিলার অভ্যাস নাই। পরীক্ষাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। তবে এত রাত্রি জাগিয়া কেন? মালিনী বলিল, 'দিদিমণি, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

অনিলা বলিল, 'দাও।'

কিয়ৎক্ষণ পরে অনিলা বলিল, 'মা কি রাগ করেছেন?'

মালিনী। মোটেই না। ওটা কেবল কর্তার ভয়ে। বাবার জাতিবিচার খুব! সেই ভয়ে মা অত বক্‌ছিলেন। এই যে আমরা পশু ও পাখীগুলোর মুখে মুখ দিই, তাতে কত জাতি যায়? মানুষের বেলাই কি যত দোষ? তাও ত সেটা মুখ নয়, একটা বাঁশী। আর মানুষটাও কিছু হাব্‌শী মুসলমান নয়, আমাদেরি জাত, উচ্চ বংশের, যেন দেবতা! আর অমন সুন্দর মুখ!—

মালিনীর মুখ খুলিয়া যাইবার বিশেষ কারণ ছিল। সেও ছেলেবেলা ঐ রকম কোনও একটা ঘটনা হওয়াতে রাত্রি জাগিয়াছিল, এবং সেই সময় তাহারও একটী সুন্দর মুখের কথা মনে হইয়াছিল, এবং মনে হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাল্যস্বপ্ন সকলেরই এক রকম, মনস্তত্বও একই বিধানে গড়া, সুতরাং মালিনীর পূর্ব্বস্মৃতিটুকু ঠিক সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মালিনীর মন্তব্য-প্রকাশের পর গৃহিণী অনিলার ঘরে আসিলেন। 'মা, তোর কি হয়েছে? আজ এখনও তোর ভাত্ পড়ে রয়েছে?'

অনিলা। আমার অসুখ হয়েছে।

মা অনিলার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ছি! রাগ কর্ত্তে নেই।' মা অনিলাকে ধরিয়া নলিনীর ঘরে লইয়া গেলেন। অনিলার রাগ তখন বার আনা ঘুচিয়াছিল, বাকী চারি আনা নলিনীদিদির বুকে গিয়া জল হইয়া গেল।

অনিলা সে রাত্রি দিদির নিকট শয়ন করিল, এবং নলিনী অনিলার মনের অনেক কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। অনিলা একটা কথাও খুলিয়া বলে নাই, কিন্তু তাহাতেই তাহার মনের কথাগুলি সুচতুরা নলিনী বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। ভালবাসার কথা এমনি আশ্চর্য্য ধরণের যে, তাহাতে সাক্ষী সবুত্ এবং আত্মপ্রকাশের দরকার হয় না! স্বরচিত জালে জীব আপনই জড়াইয়া পড়ে, অথচ বদ্ধাবস্থা স্বীকার করে না।

রাত্রিকালে গৃহিণীর সহিত কর্ত্তার কি কথা হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। কিন্তু প্রাতঃকালে সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, কর্ত্তার একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ কর্ত্তা দরওয়ানকে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে বলিলেন, এবং নিজে উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডী পাঠ করিলেন। বৃদ্ধ দরওয়ানের মনে একটা খোলসা মুক্ত ভাব আসিয়া অধিকার করিল। বৃদ্ধ মালী মালিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি?'

মালিনী অঞ্চলে মুখ খানিকটা ঢাকিয়া বলিল, 'বোধ হয়, মেজোদিদির সঙ্গে ও বাড়ীর প্রবোধ বাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে।'

মালী। এটা আশ্চর্য্য নয়?

বৃদ্ধ লাঠী ধরিয়া উঠিয়া বসিল। মানুষের মধ্যে প্রণয় যেন মিথ্যা জগতের মধ্যে একটা সত্য, ঘোর তমিস্রার মধ্যে একটা আলোক, মৃত্যুর মধ্যে একটা জীবন। সে কথা শুনিলেই মানুষ বল পায়।

এমন সময় দরওয়ান ও কর্ত্তার খাস চাকর বনমালী আসিয়া জুটিল, এবং সেই সমিতির মধ্যে বসিয়া গেল। দুই একটা খরগোস্ ও সেই সিংওয়ালা হরিণটাও অগ্রসর হইল। ময়ূর সুপারী বৃক্ষ হইতে উড়িয়া হরিণের স্কন্ধে বসিয়া গেল। প্রণয়ের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিতে ভালবাসে।

বনমালী বলিল, 'তাই ত! এক দিনে প্রণয়?'

মালী। দরওয়ানজী! তুমি ত ছেলেমানুষ, আমার এই আশী বচ্ছর বয়স। আমি এক দিনে একটা দোপাটী ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যাকালে বীজ পুঁতে দিলুম, সকাল বেলা গাছ হাহাকার ক'রে বেড়ে উঠলো, বেলা আটটার আগেই কুঁড়ি বেরিয়ে গেল, আর দশটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই ফুল। মানুষের মনে এক মিনিটে প্রণয় জন্মাতে পারে।

দূরে কর্ত্তা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'বনমালী!'

বনমালী শশব্যস্তে ছুটিয়া গেল।

কর্ত্তা। আজ থেকে তোরা চুপি চুপি কথা কস্‌নে। আমার বিরক্ত বোধ হয়। যা বল্‌বি, মন খুলে বল্‌বি। জগতে সকলেই স্বাধীনতা চায়। বনের পশু, বাড়ীর মেয়েছেলে, দাস দাসী, সকলেই চায়, সেটাকে রুদ্ধ করা আমাদের সাধ্য নয়। তোদের মনের কথা আমাকে খুলে বলিস্—কোনও ভয় নাই।

বনমালী চক্ষের জলে ভাসিয়া করযোড়ে বলিল, 'যে আজ্ঞা, কর্ত্তা!'

৮

আজ অরিন্দম বাবু সিমলা পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। আসিবার কারণ তাঁর স্ত্রীর একখানা 'লাল কালীর চিঠি'।

অরিন্দম বাবু আপিসের 'ফাইল' লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। স্ত্রীর চিঠিগুলি খুব লম্বাচৌড়া দেখিলে রাত্রিকালে পাঠ করিতেন। কিন্তু এবারকার চিঠি ভয়ানক রকম সংক্ষিপ্ত—'তুমি আমার মাথা খাবে যদি পত্র পাঠ সাত দিনের ছুটী নিয়ে চলে না এস।'—বি.এ. দিদি।'

অরিন্দম বাবু ভাবিলেন, 'যদি না যাই, তবে মাথাই বা কি করিয়া খাওয়া

সম্ভব? ইহার কৈফিয়ৎ বোধ হয় এই যে, না গেলে মাথা খারাপ হইয়া যাইতে পারে।' সুতরাং সাত দিনের ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়াই অরিন্দম বাবু প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?'

প্রবোধ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কই! আমি ত কিছুই জানি না।

অরিন্দম বাবু বিপাকে পড়িয়া স্ত্রীর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, আর একটী স্ত্রীলোক বসিয়া। সুতরাং তিনি কপাটের আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খবর কি?'

বি.এ. দিদি অরিন্দমকে টানিয়া বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একটী বালিকা বসিয়া অঙ্ক কসিতেছিল। বি.এ. দিদি তাহার চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে তোমার পছন্দ হয়?'

একেই সারারাত্রি জাগিয়া অরিন্দম বাবু অবসন্ন, তাহার উপর হেঁয়ালির ছড়াছড়ি দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। বি.এ. দিদি বলিলেন, 'আরও বুঝিয়ে বলি। এটি ঐ চিড়িয়াখানার মেয়ে। প্রবোধ একে দেখে পাগল হয়ে গেছে। এখন এর একটা কূলকিনারা কর।'

অনিলা দুই হাতে মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

'দিব্যি মেয়ে, যেন ছবিখানি।'

বি.এ. দিদি। প্রবোধ এর নাম রেখেছে 'শকুন্তলা'। প্রথমে একে আমি আবিষ্কার করি। তার পর ওর দিদি, যাকে ঘরে দেখ্‌লে, সেও এসে পড়্‌ল। আর একটা কথা বলি, 'ওর দিদির স্বামীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে, তাঁর নাম 'জামাইবাবু'। এঁরা সব আমার শিষ্য। এঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আমি এক জন মহাপুরুষ। তাই প্রমাণ কর্ত্তে তোমাকে ডেকেছি।'

তার পর অরিন্দম বাবু সকলকে লইয়া ছাতে বেড়াইতে গেলেন। যদিও সিমলা পাহাড় খুব রমণীয়, কিন্তু কলিকাতার মধ্যে জড়প্রকৃতির ভাগ কম, আর মানবপ্রকৃতির ভাগ বেশী, সেটা তাঁহার ধারণা হইয়া গেল। ক্রমে, আহার ও একটা লম্বা নিদ্রার পর তিনি চিড়িয়াখানার মালিক বসুজা মহাশয় ও তাঁহার জামাতার সহিত কথোপকথনে অতিশয় প্রীত হইলেন।

বসুজা মহাশয়। দেখ বাবা! সংসার ও সমাজ কখন কি আকার ধারণ করে, আমরা বুঝতে পারি না। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে গিয়ে

আমরা অবসন্ন হয়ে পড়ি। আমি এই চব্বিশ বৎসর জমীদারীর কাগজপত্র ও ছোট একটী সংসার নিয়ে লুকিয়ে ব'সেছিলুম, কিন্তু বিধাতার বিধানে ঘোর বিপ্লব ঘটে গেল। প্রথম বিপ্লব, আমার জামাতা তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাস কর্ত্তে চায়। প্রথমে আমার আপত্তি ছিল, কিন্তু ভেবে দেখলুম, তাদের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া মহা পাপ। দ্বিতীয় বিপ্লব, আমার মেয়ে অনিলার নূতন ভাব। তোমরা ছেলে মানুষ, ও সব বুঝতে পার। আমাদের এখন শেষ কাল। যাতে তোমরা সুখী হও, তাতেই আমাদের শেষকালের শান্তি।

অরিন্দম বাবু বিনীতভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, 'আপনার মত লোকের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা হবে, সেটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রবোধকে বোধ হয় আপনি জানেন না, সে একটী রত্ন। যেখানে থাকবে, সংসারকে পবিত্র ও স্নেহময় করে তুলবে।'

চিড়িয়াখানার মধ্যে কিছু দিন পরেই প্রবোধ আসিয়া বসিল, এবং অনিলা প্রবোধের পার্শ্বে বসিয়া অঙ্কে মনঃসংযোগ করিল। প্রবোধের বাঁশীটি লইয়া অনিলা বাজাইত, প্রবোধ সেতার ধরিত, এবং কাকাতুয়া চুপ করিয়া তাহা শুনিত। জামাইবাবু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলিগড় হইতে অনিলাকে পত্র লেখেন, এবং কর্ত্তা কাশীধাম হইতে আশীর্ব্বাদ পাঠান। বি.এ. দিদি সিমলা হইতে বেগুনে ও সবুজ কালী দিয়া অনিলার পত্র চিত্র-বিচিত্র করেন, এবং মধ্যে মধ্যে পুরাণো 'স্বর্ণ' পাঠাইয়া দেন। দরওয়ান উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করে। মালিনী অনিলার চুল বাঁধিয়া দেয়। তখন ময়ূর পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রবোধ বি. এস্-সি. হইয়া পশুদিগের সমাজতত্ত্ব লিখিতেছে। অনিলা তাদের 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স' টুকিয়া দেয়। মানুষের পরিবর্ত্তন কেন ঘটে, এবং অনেকগুলি আয়ু মিলিত হইয়া একটা দীর্ঘায়ু কি করিয়া সম্ভবে, তাহার তথ্য উভয়ে আবিষ্কার করিতেছে। প্রবোধের বেশ বিশ্বাস যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সখ্যতার সঞ্চার হইলে সমাজ দীর্ঘজীবী হয়, অথচ কেহ কাহাকেও সংহার করিয়া আত্মা কলুষিত করে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আয়ুঃ ও কোষ।

৩

গত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'আয়ুঃ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, মৃত্যু

(১) জীব-বিবর্ত্তনের ফল;

(২) দেহকোষ সকলের দীর্ঘকালব্যাপিনী দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার ফল;

(৩) দেহকোষ সকলের Sclerosis নামক অবস্থার পরিণাম।

কিন্তু আর একটী গুরুতর কথা এখনও বলা হয় নাই। উহা কোষ-পরিত্যাগের কথা। আমাদিগের দেহে নানাবিধ কোষ আছে; অস্থিকোষ, শিরাকোষ, স্নায়ুকোষ, পেশীকোষ ইত্যাদি। অস্থির কঠিন কোষ শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় না। অন্যান্য কোষ বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য (৬০।৭০ বৎসর বয়স) পর্য্যন্ত বহুবার পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহার স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। দেহের কোথাও একটী ক্ষত হইলে দূষিত কোষ সকল পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষের উদ্ভব হয়; তাহাতেই ক্ষত স্থানের পূরণ হইয়া যায়। ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু দেহে স্বভাবতঃই ছয় সাত বৎসর পর পর স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির কোষ সকল পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এইরূপ অনেকবার হইয়া থাকে।

কোষ সকল স্বতঃই বিশ্লিষ্ট হয়; * এবং আহার দ্বারা পুনরায় গঠিত হয়। আহারের ফল পুষ্টি; এবং নানাবিধ কর্ম্মের ফল ক্লান্তি ও ধ্বংস। দেহ (দেহ-কোষ সকল) কর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত হয়, এবং নষ্ট হয়; আহারের দ্বারা পুষ্ট হয়। এই দুই কারণ যত দিন এরূপ থাকে যে, পুষ্টির পরিমাণ অধিক হয়, তত দিন দেহ পুষ্ট হইতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টি কমিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেহ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। তখনই বার্দ্ধক্যের সূচনা হয়। অবশেষে যখন পুষ্টি অপেক্ষা ক্ষয়ই অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, তখন মৃত্যু আসন্ন, বুঝিতে হয়।

বলিয়াছি, কোষ সকল জীবিতকাল মধ্যে বহুবার পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষ জাত হয়। কিন্তু বার্দ্ধক্যে অথবা পীড়ায় যখন কোষ সকলের পুষ্টির এবং ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হয়, তখন পুরাতন কোষ পরিত্যক্ত

---

* শ্রাবণ সংখ্যা; ২৮৪ পৃষ্ঠা।

হইয়া সেই স্থলে নূতন কোষ জাত হইবার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পীড়ায় অথবা বার্দ্ধক্যের বৃদ্ধির সহিত এই বিঘ্ন উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠে। পরে যখন কোষত্যাগের, অথবা ত্যক্ত কোষের স্থলে নূতন কোষোৎপত্তির বিঘ্ন অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, অথবা ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন মৃত্যু আসন্ন হইয়া উঠে। ইহার পরিণাম-ফল—মৃত্যু।

সুতরাং উপরে যে তিনটি কারণ লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই চতুর্থ কারণটির সন্নিবেশ আবশ্যক হইতেছে।

(৪) কোষত্যাগের এবং তৎস্থলে নূতন কোষের আবির্ভাবের বিঘ্ন, অথবা বিরতি।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মৃত্যুর এই কারণটি, অর্থাৎ কোষত্যাগ ও নূতন কোষাবির্ভাব বংশানুগত। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে মৃত্যুকে সাধারণতঃ বংশানুগত বলিয়াছি।

এক্ষণে পূর্ব্বের প্রশ্নগুলি স্মরণ করুন।

(১) আয়ুঃ কিসের উপর নির্ভর করে ?

(২) শেষই বা হয় কেন ?

(৩) বহুকোষ জীবকেও কি অমর অথবা দীর্ঘায়ুঃ করা যায় ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক্ষণে কঠিন হইবে না। মৃত্যুর যে পাঁচটি কারণ উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তাহাই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই বলিলেই প্রচুর হয় যে, ঐ সকল কারণ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কার্য্য উৎপাদন না করে, সেই পর্য্যন্তই আয়ুঃ। দেহকোষের হ্রস্বতা, কোষতন্তুগুলির কাঠিন্য,* কোষের ক্রিয়াশক্তির অপচয়, কোষত্যাগের এবং নবকোষোৎপত্তির বিরতি,—এই সকল, অথবা ইহাদিগের মধ্যে গুরুতর কারণগুলি যখন বিশেষভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মৃত্যু। যে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আয়ুঃ, অর্থাৎ জীবিতকাল। সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম দুইটী প্রশ্নের উত্তর এই ভাবেই দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদান করিতে পারিলে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, মানবসমাজ বিশেষ লাভবান হইতে পারে। দীর্ঘায়ু অথবা অমর হইবার উপায় কি ? আমি এ স্থলে জীবাত্মার কথা বলিতেছি না। উহা ত অমর আছেই। আমি স্থূল দেহের কথাই বলিতেছি।

* Sclerosis.

এ প্রসঙ্গে প্রথমতঃই বলা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় মানবদেহকে অমর করা অসম্ভব। কারণ, মৃত্যুর মূল কারণ জীব-বিবর্ত্তন * নিবৃত্ত হইবার নহে। যাহা হউক, অমর হওয়া, অর্থাৎ স্থূল দেহকে অমর করা সম্ভব না হইলেও, দীর্ঘকাল, এমন কি, অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী করা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহা পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা যে দেহ-কোষ সকলের দুর্ব্বলতার ও ক্ষীণতার কথা বলিয়াছি; যে কোষতন্তুগুলির কাঠিন্য ও কোষের হ্রস্বতার কথা বলিয়াছি; যে পুরাতন কোষত্যাগের এবং নবকোষোদ্ভবের কথা বলিয়াছি; সে সকলেরই ন্যূনাধিক প্রতিরোধ প্রযত্নসাধ্য। চিকিৎসকগণ কোষের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতার বর্ত্তমানকালেই ন্যূনাধিক উপশম করিতে পারিতেছেন। হ্রস্বতাও তাঁহাদিগের আদেশ নিতান্তই অমান্য করিতেছে, এমন নহে। কিন্তু কাঠিন্য (sclerosis) সম্প্রতি তাঁহাদিগের অবাধ্য। কিন্তু কঠিন কোষতন্তু যে কোনও কালেই পূর্ব্ববৎ নরম হইতে পারে না; নরম হওয়া যে একবারেই অসম্ভব, এবং চিরতরে অসাধ্য, এরূপ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তৎপরে, কোষত্যাগের ও নূতন কোষাবির্ভাবের কথা বিবেচনা করিলেও বুঝা যায় যে, যদিও পুরাতন কোষত্যাগ নিবৃত্ত হইবার নহে, তথাপি তৎস্থলে নূতন কোষের উৎপাদন চিরকাল অসাধ্য থাকিতে পারে না। উহা কালে মানবের আয়ত্ত হইবে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। বিশেষতঃ, এই ক্রিয়া যখন বংশানুগত, তখন বংশানুক্রম পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেই ইহা সুসাধ্য হইতে পারে। বহুবিধ কোষ ছয় সাত বৎসর পরে পরিত্যক্ত হয়, তাহা বলিয়াছি। যদি দশ বার পরিত্যক্ত হয়, এবং তৎস্থলে নূতন কোষ জাত হয়, তবে মানব ৬০।৭০ বৎসর জীবিত থাকিবে। যদি কুড়ি বার পরিবর্ত্তিত হয়, তবে মানব ১৪০।১৫০ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যাঁহারা ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের দেহের কোষ সকল ১৬ বার পরিত্যক্ত হইয়া তৎস্থলে নূতন সুস্থ কোষ জাত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি যে সকল অপত্য উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেহেও বংশানুক্রমে ঐরূপ বহুবার কোষ পরিত্যক্ত হইয়া নূতন সুস্থ কোষ জন্মিবে। সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুঃ বংশের

---

* স্মরণ করিতে হইবে যে, এককোষ অবস্থায় জীবের মৃত্যু ছিল না; বিবর্ত্তনবশতঃ বহু-কোষ হইবার পর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বর-কন্যাদিগকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলেই মানবকে দীর্ঘায়ুঃ করা সম্ভব হইতে পারে।

দেহের কোষ সকলের দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াক্ষীণতা বর্ত্তমান সময়েও কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিরোধযোগ্য, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এ সকলকে বিশেষভাবে প্রতিরোধ করিবার কতিপয় বিঘ্ন আছে। সে সকলের মধ্যে প্রধান বিঘ্ন নিরানন্দ, অনাহার, অথবা অল্পাহার, এবং পীড়া। মানব-মনে আনন্দ * না থাকিলে দেহকোষ সুস্থ থাকিতে পারে না। এ নিমিত্ত নির্দ্দোষ আনন্দ দীর্ঘায়ুঃ লাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনাহার অথবা অল্পাহারে দেহকোষ সকল শীর্ণ, সুতরাং আয়তনে হ্রস্ব, এবং দুর্ব্বল, সুতরাং ক্ষীণ-ক্রিয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা সকলেরই সুবোধ্য; বিশেষতঃ জীবকোষ সকল যে জীববস্তুতে পূর্ণ, তাহা যখন স্বভাবতঃই বিশ্লিষ্ট হইতেছে, এবং আহার দ্বারা পুনর্গঠিত হইতেছে, তখন অনাহারে অথবা অল্পাহারে ইহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-ক্রিয় হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ইহার সহিত নানাবিধ পীড়া দেহকে অধিকার করে। দেহে পীড়ার বীজ প্রবেশ করিলেই পীড়া উৎপন্ন করে, এমন নহে। দেহের অর্থাৎ রক্তমধ্যস্থ জীব-কোষগুলির পীড়া-নিবর্ত্তক শক্তি আছে; তাহাতেই বিনা চিকিৎসাতেও বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে। অনাহারে অথবা অল্পাহারে ঐ সকল জীবকোষকে দুর্ব্বল করায় উহাদিগের পীড়া-প্রতিরোধক শক্তির হ্রাস হয়; সুতরাং পরিণামে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

যদি দেহ-পোষণের উপযুক্ত আহার-প্রাপ্তি ঘটে, এবং অসাধ্য পীড়ার বীজ দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, অথবা প্রবিষ্ট হইলেও বিশেষভাবে ক্রিয়া-বিকাশ করিতে অক্ষম হয়, তবে দীর্ঘায়ুঃ হইবার প্রধান বিঘ্ন বিদূরিত হয়।

দীর্ঘায়ুঃ হইবার আর এক প্রধান উপায়,—অস্বাস্থ্যকর বেষ্টনীকে স্বাস্থ্যকর করা। ইহা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অসাধ্য নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দীর্ঘায়ুঃ হইবার যতগুলি বিঘ্ন আছে, তাহার সকলগুলিই মানব-প্রযত্নে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। কেবল কোষের কাঠিন্য এখনও প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাও যে কাল-সহকারে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, এ কথা বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু এ সকল উপায় ভিন্ন আর কি কোনও উপায় নাই? উত্তর—আছে।

---

* এই শব্দ সুখ অর্থে ব্যবহৃত হইল।

উহা যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। সুতরাং যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত। যোগের যে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা দেহকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করা যায়, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটী :—

(ক) শ্বাস নিয়মিত করা ;

(খ) সময় এবং দৈহিক অবস্থাভেদে বাম অথবা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রশ্বাসের চলাচল করা ; তখন অপর নাসাপুটে শ্বাস প্রশ্বাস না করা, অথবা অতি অল্প করা।

(গ) মলদ্বার, মূত্রদ্বার, অথবা কণ্ঠনালীর যোগে দেহাভ্যন্তর পরিষ্কার রাখা ; অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থ অপরিচ্ছন্ন এবং দূষিত পদার্থ সকল ঐ সকল দ্বার-যোগে ত্যাগ করা।

(ঘ) অল্পাহার করা। আহার্য্য বস্তু স্বাদু ও সহজে পরিপাক যোগ্য হওয়া উচিত। দেহরক্ষা বিষয়ে যে বস্তু অত্যন্ত অনাবশ্যক, তাহা দেহমধ্যে কখনই লওয়া উচিত নহে।

(ঙ) দুশ্চিন্তা, দুঃখ, ক্রোধ, কাম ও হিংসাকে যথাসাধ্য মনোমধ্যে স্থান না দেওয়া।

(৫) প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করা, এবং যথাসাধ্য নিষ্পাপ থাকিবার চেষ্টা করা।

(৬) অল্পভাষী হওয়া, এবং প্রত্যহ কিয়ৎকাল নির্জ্জনে থাকা।

এ সকল উপায় সকলেই অবলম্বন করিতে পারেন। এক দিকে স্বল্পায়ুঃ-বংশের বংশানুক্রম-সংশোধন, অপর দিকে এই নয়টী উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেক স্থলে সুস্থ থাকিবার ও দীর্ঘায়ুঃ হইবার আশা করা যায়। জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক স্বাস্থ্য-নাশকর এবং আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্ম প্রায় নিত্যই করিতেছেন। ইহারা সাবধান না হইলে এতদ্দেশীয় সমাজের ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীশশধর রায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

বস্ত্র-পরীক্ষা।

বস্ত্র সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; সংপ্রতি এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে তন্ন তন্ন করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের দোষ গুণ বিচার করা হইত। তিনি কৌশেয় বস্ত্রের প্রসঙ্গে প্রথমতঃ কোশকার কৃমিদিগের জাতিবিভাগ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, পত্রোর্ণা, অর্থাৎ যে সকল পোকা কোশ (কোয়া) প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহারা মাগধিকা, পৌণ্ড্রকা, এবং সৌবর্ণকুড্যকা, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) এই সকল নামের যৌগিকার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মগধ, পুণ্ড্র ও সুবর্ণকুড্য, এই তিন দেশ ইহাদের জন্মভূমি, এবং জন্মভূমির নামানুসারেই উহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ বৃক্ষ, বকুল বৃক্ষ ও বটবৃক্ষ, এই চারি প্রকার বৃক্ষ ইহাদের যোনি, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (২) তন্মধ্যে নাগবৃক্ষজাত কৃমি পীতবর্ণ, লিকুচ বৃক্ষজাত গোধূম-বর্ণ, বকুলবৃক্ষজাত শ্বেতবর্ণ, এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ বটবৃক্ষজাত কৃমি নবনীতবর্ণ (মাখমের মত) হইয়া থাকে। এই সমস্ত কৃমির মধ্যে সুবর্ণকুড্য-দেশ-জাত কৃমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৩) অতঃপর কথিত হইয়াছে যে, সুবর্ণকুড্যজ পত্রোর্ণার বর্ণনার দ্বারাই সমস্ত কৌশেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনপট্ট অর্থাৎ চীনাংশুকও ব্যাখ্যাত হইল। (৪) পত্রোর্ণার সমস্ত বিবরণ বলিয়া সর্ব্বশেষে শ্রেষ্ঠ কৃমির বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, কৃমির বর্ণানু-সারেই তৎকৃত তন্তুর বর্ণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়। সুতরাং সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রের দোষ গুণও ইহা হইতেই স্থির করা যায়। চীনদেশজাত পট্টবস্ত্রের তত্ত্ব ও বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে হইবে। নাগবৃক্ষ নাগকেশর অথবা নাগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। লিকুচ 'ডহু' অর্থাৎ 'ডেউয়া' নামে প্রসিদ্ধ। বকুল ও বট স্বনাম-প্রসিদ্ধ। এই চারি-জাতীয় বৃক্ষ বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ড্র দেশে (বগুড়া প্রদেশে) নাগবৃক্ষের প্রচুরতা অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

---

(১) মাগধিকা পৌণ্ড্রকা সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণা। ২। অধি। ১১। অ। ৮ পৃ।

(২) নাগবৃক্ষো লিকুচো বকুলো বটশ্চ যোনয়ঃ। ২। ১১। ৮ পৃ।

(৩) তাসাং সৌবর্ণকুড্যকা শ্রেষ্ঠা।

(৪) তয়া কৌশেয়ং চীনপট্টাশ্চ চীনভূমিজা ব্যাখ্যাতাঃ।

কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষভূমি সুবর্ণকুড্য কোথায়? বর্ত্তমান কালে উহা কি নামে প্রসিদ্ধ? যুক্তিকল্পতরুতে কৌশেয় বস্ত্রের গুণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—

বেতনা গুরুতাচৈব কৌষেয়ানাং গুণগ্রহঃ।

বেতনা ও গুরুত্বই কৌশেয় বস্ত্রের গুণজ্ঞাপক। বর্ত্তমান সময়েও কৌশেয় বস্ত্রের গুরুত্ব গুণজ্ঞাপক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অদৃষ্টচর বেতনা-শব্দের অর্থ কি? অধুনা সানা, অর্থাৎ বস্ত্রের সূতার সংখ্যাধিক্য গুণরূপে স্বীকৃত হয়। পূর্ব্ব কালের বেতনাই কি বর্ত্তমান কালে সানা নামে পরিচিত হইয়াছে?

যুক্তিকল্পতরুতে কোশকার কৃমির অন্য প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি শ্রেণীতে কৃমিগুলি বিভক্ত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে সূক্ষ্ম, ঈষৎ-সূক্ষ্ম, মৃদু ও স্থূল, এই চারি প্রকার তন্তু প্রসব করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতীয় কৃমি দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রের কচ্ছপ্রদেশে অথবা বনমধ্যে সঞ্জাত হয়, এবং অত্যন্ত শুক্লবর্ণ সূক্ষ্ম তন্তু প্রসব করিয়া থাকে। অতঃপর ক্ষত্রিয়জাতীয় কৃমির বর্ণনা থাকা সঙ্গত। কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে যে যুক্তিকল্পতরু আছে, তাহাতে ক্ষত্রিয়জাতীয় কৃমির বর্ণনা নাই। সম্ভবতঃ লেখকপ্রমাদে এই অংশ পুস্তকে লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহাকে আদর্শ করিয়া যে যুক্তিকল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ক্ষত্রিয় কৃমির বর্ণনা বাদ পড়িয়াছে। তথাপি আনুমানিক ইহার কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয় জাতির বর্ণনায় রক্তবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং ক্ষত্রিয়জাতীয় কৃমিজ সূত্র রক্ত বর্ণ হওয়াই সঙ্গত। বৈশ্যজাতীয় কৃমি পশ্চিম সমুদ্রের কচ্ছপ্রদেশে বনে অথবা জলবহুল স্থানে সঞ্জাত হয়। ইহারা পীতের আভাযুক্ত শুক্লবর্ণ সূত্র প্রসব করিয়া থাকে। শূদ্রজাতীয় কৃমি সমস্ত সমুদ্রের কচ্ছভূমিতে বনে অথবা সাধারণ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা নানাবর্ণ সূত্র প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের উৎপাদিত সূত্র গুরুত্বযুক্ত হয়, এবং ইহাদের আকৃতিও স্থূল। চতুর্বিধ কৃমি হইতে উৎপন্ন বস্ত্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক-জাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র উত্তম, দুই-জাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত মধ্যম, এবং ত্রিজাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র অধম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চতুর্জাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র কখনও ধারণ করিবে না। কারণ, ইহাতে বস্ত্রপরিধানকর্ত্তার আয়ু কীর্ত্তি কুল ও বল বিনষ্ট হইয়া যায়। (৫)

(৫) কৃমিকোষসমুদ্ভূতং কৌষেয়মিতি গদ্যতে।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়-বিট-শূদ্রা কৃময়স্তু চতুর্বিধাঃ॥

ক্ষৌমবস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গক দুকূল, অর্থাৎ, বঙ্গদেশীয় ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ (তৈলাক্তের মত)। পৌণ্ড্রক অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশজাত বস্ত্র শ্যামবর্ণ ও মণির মত স্নিগ্ধ। সুবর্ণকুড্যদেশজাত (সৌবর্ণকুড্য) বস্ত্র সূর্য্যসমানবর্ণ, ইহার বান মণিস্নিগ্ধ জলের মত, অর্থাৎ গলিত বৈদূর্য্যাদি মণির তুল্য চাকচিক্য-যুক্ত। এই বস্ত্রের বান চতুরস্র, অর্থাৎ চতুষ্কোণ হইয়া থাকে। কতক বান ব্যামিশ্র অর্থাৎ নানারূপ হয়। অত্রত্য বান শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ,—সীবন কর্ম্ম। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> বানং শুষ্কফলে শুষ্কে সীবনে গমনে কটে।
> জলসংপ্লুত-বাতোর্ম্মি-সুরঙ্গ-সৌরভেষু চ॥

সীব ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়-যোগে সীবন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধাতুর অর্থ তন্তু-সন্তান। এই তন্তুসন্তানের অর্থ,—বয়ন (বোনা) অথবা শেলাই করা, এই দুইই হইতে পারে। এই স্থলে বয়ন অর্থ গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার বয়নেই চতুরস্র চিহ্ন প্রদর্শিত হইত। পক্ষান্তরে, যদি শেলাই অর্থ গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহাতে সূচীর দ্বারা চতুষ্কোণ প্রভৃতি বোটা উঠান হইত, অথবা পাইড়ে সূচীর দ্বারা চতুষ্কোণাদি কারুকার্য্য করা হইত।

সৌবর্ণকুড্য বস্ত্রের বয়ন কার্য্যে একাংশুক (একখানা বস্ত্র) অথবা অর্দ্ধাংশুক, দ্ব্যংশুক, ত্র্যংশুক ও চতুরংশুক হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আধখানা, এবং দুই তিন চারিখানা বস্ত্র এক সঙ্গে বোনা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই কাশিক, অর্থাৎ

স্পষ্টাস্পষ্টৌ যুক্তযুক্তৌ তন্তবস্তু যথাক্রমম্।
যে জন্তবো দক্ষিণপূর্ব্বসিন্ধুকচ্ছে বনে বা প্রসবন্তি স্পষ্টঃ
শুক্লাভিশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং তে ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ॥
যে জন্তবঃ পশ্চিমসিন্ধুকচ্ছে বনেঽথবাঽনূপমহীপ্রদেশে।
আপীতশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং তেঽমী বিশঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ॥
যে জন্তবঃ সর্ব্বসমুদ্রকচ্ছে বনেঽথ সাধারণভূ-প্রদেশে।
নানাকৃতিস্তে প্রসবন্তি তন্তুং শুক্লং পরিষ্টাকৃতয়ো হি শূদ্রাঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রসংজ্ঞকানি যথাক্রমম্।
বস্ত্রাণি তেভ্যো জায়ন্তে যথাপূর্ব্বং শিবানি চ॥
একজাতিভবং বস্ত্রমুত্তমং সংপ্রচক্ষতে।
দ্বিজাতি-সম্ভবং মধ্যং ত্রৈজাতমধমং বিদুঃ॥
চতুর্জ্জাতং হি কৌষেয়ং কদাচিদপি নাচরেৎ।
চত্বারি তেভ্যঃ নশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ কুলং বলম্॥

কাশীদেশীয়, এবং পৌণ্ড্রক ক্ষৌমবস্ত্রও ব্যাখ্যাত হইল; (৬) অর্থাৎ, তাহাদের লক্ষণও সুবর্ণকুড্যজ ক্ষৌমবস্ত্রেরই অনুরূপ।

কৌটিল্য কার্পাস বস্ত্রের গুণাগুণসূচক লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া, সংক্ষেপতঃ কেবল কোন্ কোন্ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, মধুরাদেশজ, অপরান্তদেশজ, কলিঙ্গদেশজ, কাশীদেশজ, বঙ্গদেশজ, বৎসদেশজ ও মহিষদেশজ কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস সূতার কাপড় শ্রেষ্ঠ। (৭) সে কালের "মধুরা" বর্ত্তমান সময়ে মথুরা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কৌটিল্যের গ্রন্থে বস্ত্রপরীক্ষার বিবরণ জানা যায়; অতএব তাঁহার সময় হইতেই এই পরীক্ষা আরব্ধ হইয়াছে, এমন বুঝিলে বড়ই ভুল করা হইবে। কারণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের উদ্ভাবক নহেন। তিনি কেবল বিনেয় চন্দ্রগুপ্তের জন্য প্রাচীন বিবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণাবলী সংগৃহীত করিয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতেই এই বিদ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে, এমন বুঝিতে হইবে। এই স্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক যে, অর্থশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর, সাহিত্যিক-সমাজে উহার বিশেষ অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদে মূলের অর্থ কতটুকু বিবৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি শিক্ষিতমণ্ডলীর অবধান একান্ত বাঞ্ছনীয়। ক্ষৌমবস্ত্র সম্বন্ধে তিনি মূলের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে প্রদর্শিত হইল। সুধীগণ উহা পাঠ করিয়া সারবত্তা নির্ণয় করিবেন। (৮)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

(৬) বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং সৌবর্ণকুড্যকং সূর্য্যবর্ণং মণিস্নিগ্ধোদকবানং চতুরস্রবানং ব্যামিশ্রবানং চ। এতেষা মেকাংশুক মর্দ্ধং দ্বিত্রিচতুরংশুক মিতি। তেন কাশিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম্।

(৭) মাধুর মাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি।

(৮) *From Shama Sastry's English Translation* (*p.* 93)

"That which is manufactured in the country, Vanga (Vangaka) is a white and soft fabric (dukula) (1) that of Pandya manufacture (Paundraka) is black and as soft as the surface of a gem; and that which is the product of the country, Suvarnakudya, is as red as the sun, as soft (2) as the surface of the gem, woven while the threads are very wet, and of uniform (chaturasra) or mixed texture (vyamisravana). Single, half, double, treble, and quadruple garments are varieties of the same."

From the Comm. of Bhattasvamin :—(1) Dukula is a fine fabric and Kshauma is a little coarse.

(2) It is rubbed with a gem and smoothened while being woven.

সহযোগী সাহিত্য।

'সংঘ' বা 'গণতন্ত্র'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নবিশারদ শ্রীযুত ভাণ্ডারকর সংঘ সম্বন্ধে গত এপ্রিল মাসে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।

প্রাচীন ভারতে খ্রীঃ পূঃ ৬০০—৩২৫ শতাব্দীতে প্রচলিত রাজতন্ত্রেতর সংঘ বা গণতন্ত্রের বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 'বহুপূগগণসংঘস্য তিথুক্' ও 'সংঘোদ্ঘোষগণপ্রশংসয়োঃ', পাণিনির এই দুইটী সূত্র হইতে বেশ বোধ হয় যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে লোকে সংঘ শব্দটী পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিত। সংঘ শব্দের সাধারণ অর্থ, 'কোন প্রকারে একত্রিত জনতা'; আর 'একটী বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমিতি' ইহার পারিভাষিক অর্থ, এবং ইহাই আমাদের আলোচ্য।

অভীষ্ট উদ্দেশ্যের পার্থক্যহেতু সংঘও নানা প্রকারের। ধর্ম্মবিষয়ক মতাদি-প্রচারের জন্য গঠিত সংঘের নাম ধর্ম্মসংঘ, যেমন বৌদ্ধসংঘ। পালি শাস্ত্রবিধি গ্রন্থে বুদ্ধ ও তাঁহার ন্যায় আরও সাত জন ধর্ম্মসংঘের নেতার উল্লেখ আছে। 'সমণব্রাহ্মণা' পদটী হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধসংঘও জৈনসংঘের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগেরও ধর্ম্মসংঘ ছিল। বাণিজ্য শিল্পের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য গঠিত সমাজ 'বাণিজ্যসংঘ বা শিল্পসংঘ'। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে শ্রেণী বা সংঘের বিভাগকালে 'বার্ত্তোপজীবি-সংঘ' অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সংঘের বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল দলবদ্ধ লোক অস্ত্রব্যবসায় দ্বারা নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিত, পাণিনি তাহাদিগকে 'আয়ুধ-জীবি-সংঘ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যৌধেয়, পশু, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি 'আয়ুধ-জীবি-সংঘে'র অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার সংঘই 'রাজনৈতিক-সংঘে'র আদর্শে গঠিত হইত। এখন দেখা যাউক, এই 'রাজনৈতিক-সংঘে'র অর্থ কি? পাণিনির 'জনপদশব্দাৎ'—সূত্রটীর টীকা করিবার সময় কাত্যায়ন ক্ষত্রিয়গণের ভিতর 'এক-রাজ' (possessed of Individual Sovereign) এবং সংঘ (possessed of Collegiate Sovereign) এই উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাত্যায়নের 'সংঘ' ও কৌটিল্যের 'রাজশব্দোপজীবি-সংঘ' একই প্রকারের, এই সংঘ বা গণের প্রত্যেকেই 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতেন; এক জন রাজা (Sovereign One) ও বহুরাজা (Sovereign Number) এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যেই উভয়বিধ ক্ষত্রিয় জাতির পার্থক্য সূচিত হইত। মজ্ঝিমনিকায়ে লিচ্ছবি ও মল্লগণকে স্পষ্টভাবে সংঘ বা গণ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

এই সকল রাষ্ট্রনৈতিক-সংঘের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর বিবরণ বৌদ্ধ ও পালি গ্রন্থনিচয় এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের একশত সপ্তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। জাতক ও কৌটিল্য হইতে আমরা জানি যে, এক সময় রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ৭৭০৭ জন লিচ্ছবি রাজা

বৈশালী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন; ইঁহাদের সকলেরই উপাধি রাজা, পুত্রদের উপাধি রাজকুমার, এবং পবিত্র জলে তাঁহাদের অভিষেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কাত্যায়নের মতে, বহু বিভিন্ন রাজকুলের বা শাসকসম্প্রদায়ের নায়কদিগকে লইয়া রাজনৈতিক সংঘ গঠিত হইত; প্রত্যেক নায়কই রাজা উপাধি ধারণ করিতেন, এবং সংঘের ভিতরে সর্ব্বতোমুখী সমতা রক্ষিত হইত। শাসনকার্য্যপরিচালনের ভার অবশ্য বর্ত্তমান যুগের প্রজাতন্ত্রগুলির ন্যায় স্বল্পসংখ্যক মনোনীত নেতার হস্তে সমর্পণ করা হইত, শান্তিপর্ব্ব ও কৌটিল্য তাঁহাদিগকে 'সংঘ-মুখ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটী জাতকে দেখিতে পাই যে, রাজবর্গের বৈশালী নগরীতে অবস্থানকালে প্রত্যেকের নিজের নিজের 'উপরাজ' বা রাজপ্রতিনিধি, সেনাপতি ও ভাণ্ডাগারিক তাঁহার নিকট অবস্থান করিত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রত্যেক লিচ্ছবি রাজের নিজের পৃথক্ রাজ্য ছিল, এবং তথায় তিনি বিচারকার্য্য প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে একাকী সর্ব্বোচ্চ শক্তি চালনা করিতেন। এই সকল রাজগণের অনেকেই লিচ্ছবি-সংঘে সমবেত হইতেন, এবং এই লিচ্ছবি-সংঘ সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের 'বিজিত' বা রাজ্যে—অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবর্গের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্রের সমষ্টিরূপ বিস্তৃত রাজ্যে—যে কোনও ব্যক্তিকে নিহত, দণ্ড, বা নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন। এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত সংঘ সমষ্টিবদ্ধ রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। এ বিষয়ে মজ্‌ঝিমনিকায়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈশালীর লিচ্ছবি-গণ ও কুসিনারার মল্লগণ এবংবিধ রাজনৈতিক সংঘের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৌটিল্য বৃষ্ণিসংঘ প্রভৃতি আরও অনেক সংঘের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণও এরূপ অনেক সংঘের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের একটী জাতির উদাহরণ গ্রহণ করুন;—এরিয়ানের (Arrian) অবষ্টনৈ, ডিওডোরাসের (Diodorus) সম্বষ্টৈ, কার্টিউসের (Curtius) সব-র্কা এবং ওরোসিউসের (Orosius) সব-গ্রী,—মহাভারতে কথিত অম্বষ্ঠ ও কাহারও কাহারও মতে পাণিনির যৌধেয়গণের অন্তর্ভুক্ত সৌভ্রের। কার্টিউস্ (Curtius) ও ডিওডোরাসের (Diodorus) মতে উক্ত জাতির রাজ্য "প্রজাতন্ত্র" ছিল। এরিয়ান (Arrian) কথনিয়ান (Kathanians) অক্সিড্রেকাই (Oxidrakai) ও মল্লয় (Malloi) এই তিনটীকে স্বাধীন "সাধারণতন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্রক ও মালব নামে পতঞ্জলি কর্ত্তৃক 'সংঘ'-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এরিয়ানের গ্রন্থে নিসা (Nysa) আলেকজান্দারের সময়ে "কুলীনতন্ত্র" (aristocracy) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রাজতন্ত্র (monarchs), কুলীনতন্ত্র (aristocracy), কতিপয় শাসনতন্ত্র (oligarchy), ও প্রজাতন্ত্রের (democracy) পার্থক্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বিশেষরূপে বুঝিতেন, সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যে জাতিগুলিকে স্ব-রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও কুলীনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংঘ-রূপে বুঝিতে হইবে। এই সকল সংঘ সাধারণতঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৩২৫ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরাহমিহিরের 'গণ-রাজ্য' ও 'গণ-পুরুষ' হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও ইহা একেবারে লোপ পায় নাই। এই সকল সংঘের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য কোনও নগরবিশেষ বা দেশবিশেষের উপর নির্ভর করিত না; কারণ, মালব-গণ প্রথমে পঞ্জাবে ছিল,

তথা হইতে জয়পুর ও শেষে বর্ত্তমান মালওয়ায় উপস্থিত হয়। আবার, আয়ুধজীবি-সংঘ পরে রাজনৈতিক-সংঘে পরিণত হইতে পারিত। এ বিষয়ে যৌধেয়গণ দৃষ্টান্তস্বরূপ। রাজতন্ত্র জাতির কুলীনতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হইবার উদাহরণ কুরু ও পাঞ্চালেরা; জাতক ও প্রাচীন পালি সাহিত্যে ইহারা 'একরাজ' বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু কৌটিল্যের সময়ে 'রাজশব্দোপজীবি-সংঘে' পরিণত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক সংঘ 'কুলাধিপত্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গুত্তর-নিকায় দুই প্রকারের শাসন-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন,—'গণ-জেট্ঠক' ও 'কুলাধিপতি'। কুলাধিপতিগণ প্রত্যেক কুল বা পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের অধিকৃত ভূমিভাগ এই উভয়েরই উপর আধিপত্য করিতেন; উদাহরণস্বরূপ শাক্য রাজা ভদ্দিয়ের নাম করা যাইতে পারে। প্রত্যেক কুল বা সম্প্রদায় আবার, গৃহপতি, কুটুম্বী ও কুলিকে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গৃহ, কুটুম্ব, বা কুল, অর্থাৎ পরিবারের নেতারা গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন (পশ্চিম-ভারতের অনুশাসনাবলী ও নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রলিপি দ্রষ্টব্য); এল্‌ফিনষ্টোন্ তাঁহার 'History of India' পুস্তকে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহপতির ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত হইবার কারণ,—তাঁহারা সকলেই, প্রথম যে সকল ব্যক্তি এই সকল দেশে স্বীয় বাসস্থান ঠিক করিয়া লন, তাঁহাদের বংশধর। অবশ্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা নূতন লোকের আগমন সম্ভবপর, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ ধারণা সত্য বলিয়া বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে মনুর 'দশী কুলং তু ভুঞ্জীত' ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন পরিবার নিজেরাই ভূমিকর্ষণ করিতেন, তাঁহাদের ভিতর পরস্পর জাতিত্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাঁহারা সকলেই একই ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিলেন, এবং এই সূত্রে নিজেদের ভিতর স্বায়ত্ত-শাসক গ্রাম্য সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গৃহ বা কুটুম্বের নেতা এবং পরিবারবর্গকে লইয়া কুল বা সম্প্রদায়, এবং প্রত্যেক কুল বা ক্ষত্রিয় (কারণ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উপরেই রাজ্যশাসনের ভার ছিল) কুল বা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা রাজা (কুলাধিপতি) হইতেন, এবং কুলভুক্ত জনসমূহে ও তদধিকৃত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেন। কুলাধিপতির পরিবারে রাজকীয় ক্ষমতা সংবদ্ধ থাকিলে, শাসনপ্রণালী কাত্যায়নের মতে একরাজ; কিন্তু যদি ক্রমে ঐ ক্ষমতা পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইতে থাকে, একরাজতন্ত্র (monarchy) কুলীনতন্ত্রে (aristocracy) পরিণত হয়। সুতরাং এই কুলীনতন্ত্র বা কতিপয়-শাসন এক প্রকারের সংঘ। আমার বিবেচনায়, সম্মিলিত বিভিন্ন জার্ম্মাণ রাজ্যগুলির সমষ্টি—বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের—আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রগঠন-প্রণালীর সহিত লিচ্ছবি-সংঘের গঠনতন্ত্রের বহুল সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এরিয়ান (Arrian) নিসাকে 'পুরতন্ত্র' 'City-state' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাদ-রত্নাকর, যাজ্ঞবল্ক্য, বসংগড়, (Cunningham) কানিংহাম কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও (Buhler) বূলার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মুদ্রানিচয়, পণ্ডিত শ্রীভগবান লাল ইন্দ্রাজির সম্পাদিত নাসিক গুহালিপি (১৮ নং) প্রভৃতিতে এই মতের পোষক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহার প্রদেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সূতিকাগার; আবার এই বিহার প্রদেশেই লিচ্ছবি-সংঘ বা বজ্জি সংঘ রাজত্ব করিতেন। সুতরাং বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মসংঘের গঠনকালে পূর্ব্বপ্রচলিত

রাজনৈতিক-সংঘের গঠনপ্রণালী অবলম্বন করেন, এবং তাহার নাম এবং কার্য্যপ্রণালীও গ্রহণ করেন। এই জন্য বুদ্ধ নিজে যখনই কোনও নূতন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাও দিয়াছেন; কিন্তু সংঘ বা তৎসম্পর্কিত কোনও শব্দের অর্থ দেন নাই, দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ধর্ম্মসংঘ ও রাজনৈতিক সংঘের তর্কপ্রণালী ও কার্য্যনির্ব্বাহক পদ্ধতি একই প্রকারের; সুতরাং আমি বিনয়পিটক হইতে এই সকল সংঘের ব্যবহাররীতির বর্ণনা করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার জন্য আসনাদি অগ্রপশ্চাৎ সজ্জিত করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, চুল্লবগ্‌গ তাঁহার নাম দিয়াছেন—'আসন-প্রজ্ঞাপক'। তাহার পর একটী 'জ্ঞপ্তি' (motion) দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করা হইত। তাহার পর মহাবগ্‌গের বর্ণনা অনুসারে "কম্মবাচা" (resolution) অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ে সংঘ কি কর্ত্তব্য মনে করেন; এই "কম্মবাচা" এক বার অথবা তিন বার উচ্চারণ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক বারে "জ্ঞপ্তি"টী বলিতে হইবে। 'মতপ্রকাশকালে' (Voting) মৌন সম্মতিলক্ষণ বলিয়া ধরা হইত, যাঁহারা জ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকে বাক্য দ্বারা নিজেদের অসম্মতি জানাইতে হইত। যদি 'জ্ঞপ্তি' সমস্ত সভ্যদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইত, এবং সকলেই চুপ করিয়া থাকিতেন, তবে উহা সর্ব্ববাদিক্রমে স্বীকৃত (carried unanimously) বলিয়া বিবেচিত হইত। তর্ক ও মতভেদ ঘটিলে "যেভুয্যসিকা"'র (Vote of the majority) জয় হইত। সদস্যগণ 'শলাকা' দ্বারা স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতেন (ballot-voting), "শলাকা-গাহাপক" নামক কর্ম্মচারী এই সকল 'শলাকা' সংগ্রহ করিতেন। পীড়া বা অপর কারণে অনুপস্থিত ব্যক্তির মতপ্রকাশ "ছন্দ" নামে অভিহিত হইত (absentee vote)। 'কার্য্যসম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা' (quorum) ঠিক রাখিবার জন্য 'গণ-পূরকে'র ("whip") সাহায্য লওয়া হইত। বাস্তবিক সেই সুপ্রাচীন ভারতে (খ্রী: পূ: ৬০০-৫২৫) তর্করীতি ও কার্য্যনির্ব্বাহ-পদ্ধতির এবংবিধ সূক্ষ্ম বিভাগ ও সুচারু সৌষ্ঠব দেখিয়া স্বভাবতঃই বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হৃদয়-শ্মশান।

ক

[ধরানাথের কথা।]

১

বাল্যকালাবধি আমি স্বভাবতঃ সাহিত্য-রসে বঞ্চিত—যৌবনে ডাক্তার হইবার পর হইতে লিখিয়াছি কেবল প্রেস্‌ক্রিপশন, পড়িয়াছি কেবল ডাক্তারী পুস্তক পুস্তিকা পত্রাদি। স্ত্রীকে পত্র লিখিবার সুযোগও বিলাত হইতে কিঞ্চি-

বার পর হইতে আর পাই নাই; কারণ, তদবধি যখন যেখানে গিয়াছি, তখনই তিনি সঙ্গে; যদি কখনও কার্য্যগতিকে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তবে পৌছ-সংবাদের জন্য টেলিগ্রামেই কাজ সারিয়াছি। এই অবস্থায় আমি যে উপন্যাসের অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করিতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হইতে পারে। সে কৈফিয়তে আমি একটা নজীর দিব—আমেরিকার এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার-সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অন্ততঃ একখানা উপন্যাসের উপকরণ থাকে। সে কথা যত সত্য হউক আর না হউক, অনেকেরই অভিজ্ঞতায় একখানা উপন্যাসের উপকরণ থাকে। আমার অভিজ্ঞতায় যে সব উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে উপকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক, তাহাই সাজাইয়া গুছাইয়া একটা ধারাবাহিক বিবরণের প্রকাশে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করিতেছি।

তখন আমি দিল্লীতে হাঁসপাতালে ডাক্তার। শীতকাল—একে দিল্লীর শীত, তাহাতে সে বৎসর শীত কিছু অধিক—একেবারে কন্‌কনে—যেন হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা হইলেই ঘরে অগ্নি জ্বালিতে হয়। এই অবস্থায় রাত্রি প্রায় দুইটার সময় যখন ঘণ্টার শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। হাঁসপাতালে বিশেষ জরুরী কাজ না পড়িলে এ অসময়ে আমাকে ডাকিত না। গৃহিণীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "এত রাত্রিতে—এই শীতে!" হাসিয়া বলিলাম, "মরণের কালবিচারও নাই! মরণের মরণ হয় না?" উঠিয়া ড্রেসিং-গাউন জড়াইয়া হাঁসপাতালের আফিস-ঘরে আসিলাম। আমার সহকারী তথায় নাই—দুই জন অপরিচিত লোক বসিয়া আছে। আমি রোগীদের ওয়ার্ডে যাইয়া দেখিলাম, এক জন রোগীকে শয্যায় ফেলিয়া আমার সহকারী আবশ্যক যন্ত্রাদি গুছাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আফিং খাইয়াছে।" উভয়ে তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে—রোগীর উদর হইতে অহিফেন বাহির করাইয়া তাহার চিকিৎসার উপদেশ দিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছি, তখন দেখিলাম, আফিস-ঘরে আগন্তুকদ্বয় এমন ঝগড়া বাধাইয়াছে যে, কেরাণী বেচারা খাতা লইয়া বসিয়াই আছে—আর গোলমালে হাঁসপাতালের সব রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। আমি ধমক দিতে এক জন একটু নরম হইল। সে হোটেলের কর্ত্তা। তাহার হোটেলে রোগী আসিয়াছিল, এবং

তথায় সে অহিফেন সেবন করিয়াছিল। ঘরে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিয়া তাহার চাকর তাহাকে ডাকিয়া আনে, এবং সে দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া টাঙ্গা করিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে আনিয়াছে। সে রোগীর কাছেই জানিয়াছে, তাহার নাম—শীতলচন্দ্র রায়, বাড়ী বঙ্গদেশে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঝগড়া কি লইয়া?" সে বলিল, অপর ব্যক্তিও রোগীর সঙ্গে এক সময়ে তাহার হোটেলে আশ্রয় লয়, এবং রোগীর ঘরের পাশের ঘর ভাড়া লয়। সে বলিতেছে, রোগীর নাম—বিন্দুমাধব সমাদ্দার। সে লোকটা ততক্ষণ তাহার গাজীপুরী দাড়ী চুমরাইতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কেমন করিয়া উহার নাম জানিলে?" সে অত্যন্ত উদ্ধতভাবে উত্তর করিল, যেহেতু সে সরকারী আদমী এবং পুলিসের লোক, সেহেতু সে সবজান্তা; কেন না, জানাই তাহার কাজ, এবং জানিবার জন্যই সরকার তাহাকে তলবতঙ্কা দেন। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে—সে এই রোগীর সঙ্গেই বানারস হইতে আসিয়াছে—আজ কাল বাঙ্গালীকে বিশ্বাস নাই। তাহার উদ্ধত কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল—বাঙ্গালীর সম্বন্ধে তাহার মত-প্রকাশে আর আমি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না—বলিলাম, "এখনই বাহির হইয়া যাও।" সে আহত সর্পের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল—পুলিসের আদমীকে এত বড় কথা! আমি বলিলাম, "তুমি ফাঁড়ি হইতে আসিয়াছ কি জাহান্নম হইতে আসিয়াছ, জানিতে চাহি না। তুমি পুলিস কি গুণ্ডা, তাহাও জানিবার দরকার নাই। এই মুহূর্ত্তে তুমি হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া না গেলে আমি তোমার কাণ পাকড়াইয়া বাহির করিয়া দিব।" আমি দ্বারবানদিগকে ডাকিলাম। লোকটা পর দিন ইহার প্রতীকার করিবে, শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেল। আমি হোটেলওয়ালাকেও যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া গেলে, কেরাণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রেজিষ্টারে কি নাম লিখিব?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ কিছু লিখিও না। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। বাস্।"

আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম; কিন্তু তাহা হইল না। আমি রোগীর কাছে ফিরিয়া গেলাম। বিন্দুমাধব সমাদ্দার! নামটা বরাবরই আমার কাছে অসাধারণ বোধ হইত। সে প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বের কথা। মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কলেজে আমার এক জন সহপাঠীর নাম ছিল—বিন্দুমাধব সমাদ্দার। কলেজে পঠদ্দশায় আমার সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই

ছিল। তাহার পর যেমন হয়—দুই জন দুই পথে গিয়াছিলাম—ঘনিষ্ঠতাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতযাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাহার সন্ধান হারাই নাই। তাহার পর চাকরী লইয়া আসিলাম পঞ্জাবে—যে কয় দিন মা ও দাদা বাঁচিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় যাইতাম। কিন্তু বসন্ত আমাকে পক্ষকালমধ্যে মাতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী ভ্রাতার পরামর্শে দাদার বিধবা কলিকাতার ছোট বাড়ীখানির ভাগ পাইবার জন্ত মামলার ভয় দেখাইলেন। সংসারের উপর বিরক্ত হইলাম—মনে করিলাম, আমার জন্ত মার সব গহনা বিক্রয় হইয়াছে, দাদা কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি কি দাদার মেয়ের সঙ্গে বাড়ীর বখরা লইয়া ঝগড়া করিব? বাড়ীর অংশ তাহাকে দানপত্র করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর সে বেদনা-ক্ষত যাঁহার প্রেমভেষজে শুষ্ক হইয়াছে, তিনিও কখনও আমাকে বাঙ্গালায় যাইতে বলেন নাই। কারণ, তিনি জানেন, তথায় ফিরিলে স্মৃতির দহন-যন্ত্রণায় আমি কাতর হইব। এইরূপে বাঙ্গালার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিন্দুমাধবের সন্ধান পাইব কেমন করিয়া? কিন্তু এ কি সেই? যদি সে হয়, তবে কেমন করিয়া, কি সূত্রে বিদেশে আসিল; কেন বিপন্ন হইল? সে কি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল? রোগীর কাছে ফিরিয়া গেলাম। যখন ষ্ট্যাক্-পম্প দিয়া উদর হইতে অহিফেন বাহির করিয়া দিয়াছি, এবং ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, তখন তাহার চেহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—অকালজরাগ্রস্ত হইলেও এ যে সেই বিন্দুমাধব, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

এ সেই বিন্দুমাধব। মানুষের হৃদয় কত দুর্ব্বল, কত কোমল, বিন্দুমাধবকে চিনিবামাত্র অনুভূতিতে তাহা বুঝিলাম। কালের ব্যবধান সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল—আমি যেন দেশ কাল ভুলিয়া গেলাম। আমার কাছে হাঁসপাতাল—রোগী—ডাক্তারী—সবই যেন মায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সত্য কেবল সেই তরুণ যৌবন—সেই পঠদ্দশা—সেই সব সতীর্থ, আর তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাধব। আমার হৃদয়ের কোন্ কোণে বিস্মৃত সতীর্থ বিন্দুমাধবের প্রতি এত স্নেহ লুকাইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। কিন্তু আজ সেই স্নেহের উৎকণ্ঠায় আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সহকারীকে আবার একবার চিকিৎসার ও সতর্কতার উপদেশ দিয়া আমি বাসায় ফিরিবার পথে আফিস-ঘরে আসিলাম, এবং কেরাণীকে আবার বলিলাম, "এই ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কাগজে পত্রে

বা কথাবার্ত্তায় কোনও সংবাদ প্রকাশ করিও না।" তাহার পর বাসায় ফিরিলাম।

গৃহিণী তখন নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া অগ্নি আবার জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, এবং সেই অগ্নির কাছে বসিয়া একখানা মাসিকপত্র পাঠ করিতেছেন। আগুনের আলো তাঁহার মুখে পড়িয়া তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে চুম্বনের প্রলোভন সংবরণ করিব? আমাদের দাম্পত্য-জীবন সন্তানের স্নেহে স্নিগ্ধ হয় নাই। তাই বোধ হয় আমরা প্রথম প্রণয়ের তাপই রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। আমি কোনও কাজে যতক্ষণ বাহিরে থাকিতাম, ততক্ষণ গৃহিণী আমারই প্রতীক্ষায় সব কাজ ত্যাগ করিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে ঘটনার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার বাল্যবন্ধু! তবে কালই তাঁহাকে আমাদের বাসায় আন।" আমি বলিলাম, "আনিতেই হইবে। নহিলে বেচারাকে লইয়া পুলিস টানাটানি করিবে।"

২

পর দিন কিরূপে পুলিসের কৌতূহল প্রহত করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলাম, তাহা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, পুলিসের কাছে জানিতে পারিলাম—সন্দেহ ছাড়া পুলিসের বিন্দুমাধবকে লক্ষ্য করিবার কোনও কারণই নাই। গত ছয় মাস সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অথচ পুলিস তাহার কোনও কাজ সন্দেহের অণুবীক্ষণেও ধরিতে পারে নাই। কাজেই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া পুলিস সাবধানের হিসাবে সরকারী তহবিল যথাসম্ভব হালকা করিয়া দিতেছে।

পুলিসের গোল মিটাইয়া আমি বিন্দুমাধবের কাছে গেলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে চিনিতে পার?" সে আমার দিকে চাহিল। দেখিলাম, নয়নে সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত দৃষ্টি—দৃষ্টিতে সেই দৃঢ়তা। সে আমাকে ভাল করিয়া দেখিল, "দেখিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে পারি—তুমি ধরানাথ দত্ত।"

আমি বলিলাম, "ঠিক ধরিয়াছ। আর তুমি তাহার সতীর্থ বিন্দুমাধব মজুমদার। সুতরাং মিসেস দত্তের আদেশে তোমাকে হাঁসপাতাল ছাড়িয়া বন্ধুগৃহে যাইতে হইবে।"

বিষের ক্রিয়ায় ও চিকিৎসার ফলে বিন্দুমাধবের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল—

আমার কথায় তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ যেন আরও পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার নয়নে কাতরতা ও আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তাহা হইবে না",—তাহার পর সে বলিল, "তুমি বিন্দুমাধবকে বাঁচাইয়াছ বটে, কিন্তু সে তোমার সেই পরিচিত বিন্দুমাধব নহে। সে বিন্দুমাধব মরিয়াছে। কোনও ভেষজে, কোনও চিকিৎসায় তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "ঔষধের সংবাদ চিকিৎসক রাখে—রোগী সে বিষয়ে অনধিকারী। যখন আমার হাতে পড়িয়াছ, তখন চিকিৎসার ভার আমার। শুশ্রূষার ভার আমার স্ত্রী লইবেন, বলিয়াছেন।"

শেষ কথায় বিন্দুমাধব যেন কেমন বিমনা হইল। তাহার পর সে বলিল, "আমি মরিতেছিলাম ; তুমি আমাকে বাঁচাইলে কেন ?"

তবে বিন্দুমাধবের অহিফেন-সেবন ভ্রান্তিবশতঃ নহে—ইচ্ছাকৃত ! কিন্তু দুঃখের—বেদনার—যাতনার মাত্রা কত দূর বাড়িলে মানুষ আত্মহত্যা করিতে পারে ? বেদনায়—যাতনায় বুদ্ধিহারা না হইলে ত মানুষ সে কাজ করিতে পারে না। তবে বিন্দুমাধবের জীবনে কি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহারই আঘাতে সে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল ? সে রহস্য জানিয়া আমি কি তাহার বেদনাবিক্ষত হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভেষজ দিতে পারিব না ?

যাহা হউক, বিন্দুমাধবকে অনেক চেষ্টায় আমার গৃহে আনিলাম। আমার কাছে তাহার সব কথা শুনিয়া তাহার অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকে আবার সংসারী করিতে আমার গৃহিণীর স্বাভাবিক ইচ্ছা যেন জিদে পরিণত হইল। কিন্তু পাছে সে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, সেই ভয়ে আমরা অতি সাবধানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ, আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে পূর্ব্ববৎই বিমলবুদ্ধি আছে। জ্ঞানের অনুশীলনে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। তবে তাহার দুঃখের কারণ কি ?

৩

নাবিক নূতন নদীতে পাড়ি জমাইবার পূর্ব্বে যেমন সাবধানে নদীর অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ্য করে, আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার উত্তমার্দ্ধ তেমনই সাবধানে বিন্দুমাধবকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিলেই আমি তাহার অধ্যয়নের বিস্তারে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইতাম। তাহার কথায় যেন বর্ণের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ ছিল। এমন লোকের জীবনে কি

থাকিতে পারে যে, তাহার জন্য সে আত্মঘাতী হইতে পারে ? সমুদ্রে যেমন মুক্তা প্রবাল থাকে, তেমনই হাঙ্গর কুম্ভীরও থাকে। কিন্তু সে কি ? আমি এক দিন তাহার পরিজনগণের কথা জানিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলাম। পরন্তু সে সেই দিন হইতেই বিদায় লইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। ভাব বুঝিয়া আমি আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতাম না। সে প্রায় প্রতিদিনই চলিয়া যাইতে চাহিত; আমি ও আমার স্ত্রী বিশেষ অনুরোধে তাহাকে নিরস্ত করিতাম।

আমরা লক্ষ্য করিলাম, আমার গৃহে গৃহিণীর অবারিত কর্তৃত্ব এবং আমার সর্ব্ববিষয়ে গৃহিণীর বুদ্ধিতে ও ব্যবস্থায় নির্ভরশীলতা তাহার বিস্ময়ের উৎপাদন করিত। তাহা হইতে গৃহিণী অনুমান করিয়া ফেলিলেন, বিন্দুমাধবের পত্নীই তাহার জীবনে বেদনার কারণ ও কেন্দ্র। বিন্দুমাধবের রোগের নিদান-নির্ণয়ে তাঁহার নৈপুণ্য-পরিচয়ে আমি সত্য সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

দিল্লী গৌরবের রাজধানী—কীর্ত্তির শ্মশান। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সাহজাহানাবাদ—কত রাজধানীই এই দিল্লীর বক্ষে স্মৃতিমাত্র রাখিয়া গিয়াছে! কিন্তু রাজধানী বিলুপ্ত হইলে তাহার স্মৃতি ব্যতীত আরও কিছু থাকে। সৌধে, স্তম্ভে, মন্দিরে, ভগ্নাবশেষে সেই স্মৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে বিন্দুমাধবকে সেই সব দেখাইতে লইয়া যাইতাম। আমার এক জন বন্ধুও প্রায়ই আমাদের সহগামী হইতেন। তিনি—অধ্যাপক সেন। লোকটি দর্শনের অধ্যাপনা করেন—কেশে ও বেশে অমনোযোগে একেবারে দার্শনিক। মধ্যে মধ্যে যমুনার কূলে কুদসিয়া বাগে বৃক্ষতলে বসিয়াই অধ্যাপনা করেন। লোকটা একহারা—লম্বা; মুখে পাইপ; নয়নে সরলতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। একটা রবিবারে আমরা সাহজাহানের কেল্লা দেখিতে যাইব, স্থির হইল। যাইবার পথে আমরা সেনকে গাড়ীতে তুলিয়া লইব। আমরা যখন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহার কন্যা আশা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বেহালা বাজাইতে শিখিতেছে, আর পুত্র অশোক একটা খেলার ট্রাইসিকল লইয়া ব্যস্ত। আমি বলিলাম, "অশোক ও আশা আমাদের সঙ্গে চলুক।" অশোক ট্রাইসিকল ছাড়িয়া আসিয়া বলিল, "হাম যায়েগা ডাক্তার সাহেব।" সে দিল্লীবাসের ফলে হিন্দীটাই বেশী বলিত। সেন বলিলেন, "তবে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইহার জন্যও কি গৃহিণীর অনুমতি লইতে হইবে?" সেন বলিলেন, "নিশ্চয়। সংসারে যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা—কোনও বিষয়ে

তাঁহার ক্ষমতা অস্বীকার করা রাজদ্রোহ।" আমি বলিলাম, "আপনি রাজভক্ত প্রজা বটেন।" তিনি বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার সাহেব, এখন আপনাদের দেখাইয়া না হয় একটু বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু তাহার ফলে শেষে যখন করুণ রস প্রকাশ করিতে হইবে তখন?" সেন গৃহিণীর অনুমতি আনিতে গেলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, বিন্দুমাধব কি ভাবনায় আত্মবিস্মৃত। সেদিন কেল্লায় দাওয়ানী আম, দাওয়ানী খাস, রঙ্গমহল, হামাম, এ সব সে যেন দেখিয়াও দেখিল না। সে কি ভাবিতেছিল। অথচ সে সব সৌধের ইতিহাস সে আমাদের অপেক্ষা ভাল জানিত—তাহার নিকট সে সব সৌধদর্শনের কৌতূহলই স্বাভাবিক। আমি গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "রোগনির্ণয়ে আমাদের ভুল হয় নাই। ঠিক ধরিয়াছি।" আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "খুব যে বড় ডাক্তার! একেবারে M. D.!" তিনি বলিলেন, "সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? তোমার My dear কি আর কেহ হইতে পারে?" সহসা বাহুবল্লরীতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া গৃহিণী চুম্বনে আমার মুখ প্লাবিত করিয়া দিলেন। প্রিয়তমা—প্রিয়তমাই বটেন।

৪

দিল্লীর নিম্নে যমুনা, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নামশেষ। দেখিলে দুঃখ হয়। ধূ ধূ বালুবিস্তারের মধ্যে শীর্ণ জলধারা। এ কি সেই যমুনা, যাহার কূলে বৃন্দাবনলীলা হইয়াছিল?

"তা'র কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল ছায়া দান;
তা'র জলে জলে ছুটে প্রেমের স্মিরিতি,
কল্লোলে বিরহ-গান।"

এ সে যমুনা নহে। তাহার পর যে যমুনার প্রবাহ সাহজাহানের দুর্গমূল প্রক্ষালিত করিত, এ সে যমুনাও নহে। মোগল-দিল্লীর গৌরবের মত সে যমুনাও দুর্গ হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। আছে স্মৃতি। তবুও এ যমুনা—কঙ্কর-কঠিন দেশে স্নিগ্ধ সলিলের ধারা। তাই আমি প্রায়ই নদীকূলে বেড়াইতে যাইতাম—শুষ্ক ও আর্দ্র বালুর উপর দিয়া জলধারার কাছে যাইতাম। সেদিন অপরাহ্ণে বিন্দুমাধবকে সঙ্গে লইয়া আমি নদীতীরে যাইতেছিলাম। পথে বিন্দুমাধব বলিল, "দেখ, ধরানাথ, তুমি কেবলই আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ। আর নহে। এবার আমি যাইব।" আমি বলিলাম, "আমি ধরিয়া রাখি

নাই—অনুরোধ করিতেছি।” সে বলিল, “তোমার ও তোমার স্ত্রীর স্নেহ যত্ন এমন অসাধারণ যে, তোমাদের অনুরোধ বন্ধনেরও অধিক। কিন্তু আমাকে আর অনুরোধ করিও না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে?”

ঠিক সেই সময় কোথা হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া যমুনার বক্ষের বালু উড়াইয়া চারি দিক ধূসর আবরণে আবৃত করিল। বিন্দুমাধব বলিল, “ঐ ঝাপটা বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—ও কোথায় যাইবে?”

আমি বলিলাম, “উহার ত নিরুদ্দেশ যাত্রা। তোমারও কি তাহাই?”

“হাঁ।”

“তোমার কি কোনও কাজ নাই?”

বিন্দুমাধব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “না।”

আমি বলিলাম, “দেখ, অকারণ কৌতূহলের যষ্টি দিয়া আমি তোমার জীবনের রহস্য যবনিকা উত্তোলিত করিতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তোমার মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জগতে কোনও কাজ নাই।”

“বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে কি কাজের কোনও সম্বন্ধ আছে?”

“আছে—কাজই মানুষের জীবন।”

বিন্দুমাধব হাসিল; বলিল, “যে জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহার ত কাজ নাই।”

“সে অবস্থা ব্যাধির বিকার।”

“ব্যাধি! যদি তাহাই বল, তবে সে ব্যাধির কিন্তু কোনও চিকিৎসা নাই। ‘ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি—বৈদ্যে নাহি পান বিধি।’ সে ব্যাধি তোমাদের চিকিৎসার অতীত।”

“আমার চিকিৎসার অতীত ‘অসাধ্য ব্যাধি’র ঔষধও ত দাশরথি প্রেস্‌ক্রাইব করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর বিলাতফেরত ডাক্তার আমি যদি সে প্রেসক্রিপশন গ্রহণ না-ই করি, তবু জানি, স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা এ সব ভেষজে অমন অনেক অসাধ্য ব্যাধি সারে। আর এ ব্যাধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—কাজ।”

নিতান্ত নিরাশভাবে মাথা নাড়িয়া বিন্দুমাধব বলিল, “তোমার মায়াপুরীতে আসিয়া—তোমার আর তোমার স্ত্রীর অযাচিত—অপ্রত্যাশিত স্নেহে আমার

দৃঢ় মতও পরিবর্ত্তন করিবার প্রলোভন হয় বটে; কিন্তু, ডাক্তার, অনেক কিতাবতী কথা কেতাবেই ভাল—জীবনে প্রযোজ্য নহে।"

"তুমি এত নিরাশ হইলে কেন?"

"সে সুদীর্ঘ কথা।"

"সে কথার আলোচনা করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না।"

"তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। চল—আমার জীবনের মত শুষ্ক ঐ বালুবিস্তারে যাই। বিদায় লইবার পূর্ব্বে তোমাকে বুঝাইয়া যাইব—মানুষের জীবন তাহার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বহ হইতে পারে।"

আমরা অগ্রসর হইয়া যমুনার বালুবিস্তারে যাইয়া বসিলাম। বিন্দুমাধব তাহার কথা বিবৃত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

মুখবন্ধ।

নোয়া-পুত্র সেমের বংশধরগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক জগতে Semite বা Semetic আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সেমীয়গণ আরবীয়, ইব্রিয়, আসিরীয়, অরামীয় প্রভৃতি বহু শাখা এবং ইস্রায়েল, য়িহুদি প্রভৃতি নানা প্রশাখায় বিভক্ত। যাহাদিগকে আমরা ইস্রায়েল ও য়িহুদি বলিয়া থাকি, ইহারা সকলে সাধারণতঃ হিব্রু বাইবেলে খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইব্রিয় নামে পরিচিত ছিল। মহাপুরুষ আব্রাহাম, যোসেফ বা ইউসফ ও মুসা আপনাদিগকে ইব্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। এই কারণে আমরা সেমীয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সুবিধার জন্য প্রবন্ধে ইব্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

ভাষাতত্ত্বের সহায়তায় জাতিতত্ত্ব-নির্ণয় এখন অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Prof. Sayce মহোদয় বলেন—"The distinction of language do not follow the distinction of race and whereas it is impossible to change one's race there is no difficulty in changing one's language."। অন্যত্র বলেন, "We can change our language. We can not change our race." বিশেষতঃ প্রাচীন আর্য্য ভাষার সঙ্গে সেমীয় ভাষাপুষ্ট অপ্রাচীন গ্রীক, লাটিন

ইত্যাদি ভাষার তুলনা অসমীচীন। প্রাচীন আর্য্য ভাষার পার্শ্বে জগতে একমাত্র সেমীয় ভাষা দাঁড়াইতে পারে। এই সেমীয় ভাষার ইব্রিয় শাখার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন:—"The Primitive tongue is supposed by some to have been closely allied to the Hebrew."

Major Condor নামক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এমন সত্তরটী ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ভাষায় মূলে এক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও বাক্যকথন Monosyllablic ও Polysyllablic এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিব্বতী, চীনা, তাতারী, জাপানী, বর্ম্মিজ প্রভৃতি মঙ্গোলীয়ান জাতির ভাষা Monosyllabic, এবং আর্য্য, সেমীয়, গ্রীক, রোমান, কেল্ট প্রভৃতি জাতির ভাষা Polysyllabic। জাতিতত্ত্ব (Ethnology) হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর লোক White stock বা race (শ্বেতবর্ণ), Yellow stock (পীতবর্ণ), Black stock (কৃষ্ণবর্ণ), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন হিত্তিয় (Hittite) ও অতি প্রাচীন Accad (আক্কাদ) ও Sumer বা Shinar প্রদেশের Non-Semetic অধিবাসিগণ এবং প্রাচীন এলমীয়গণ (Elamite) yellow stock ভুক্ত।

আর্য্য, সেমীয়, ভূমধ্যসাগরীয় (গ্রীক, রোমান আদি) কেল্ট প্রভৃতি জাতি White race বা stockএর অন্তর্গত। শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্যে ইহাদের বর্ণে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, ইহারা মূলে এক।

ভাষার উচ্চারণগত একতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অপ্রাচীন গ্রীক Athena, Artemis এবং Adonis ইত্যাদি দেবদেবীর সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক অহনা ইত্যাদি দেবদেবীর তুলনা করিবার পূর্ব্বে, ঐ সমস্ত গ্রীক দেবদেবীর মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। পিতা, মাতা, দুহিতা, অর্ভক ইত্যাদি শব্দ সহ Father, Mother, Daughter, Orfan ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণগত সামঞ্জস্য থাকিলেও, ঐ সমস্ত শব্দের বৈদিক প্রাচীন প্রয়োগের অনুসন্ধান আবশ্যক।

পৌত্তলিক কিংবা বহুশক্তিবিশ্বাসিমাত্রই আর্য্যদের জাতি, এবং যে স্থান হইতে পৌত্তলিকতার কোনও প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে, সেই স্থানই আদি আর্য্যনিকেতন, ইহা হাস্যকর কথামাত্র। এ সম্বন্ধে হাস্যজনক একটী কথা স্মরণ হইল। কাঁঠাল খাইবার কায়দা না জানায় এক কাবুলীর দাড়ি গোঁপে খুব আঠা লাগিয়া যায়। কাঁঠালের আঠা দূর করিবার উপায় অনবগত

থাকায় কাবুলীকে শেষে বাধ্য হইয়া শ্মশ্রু আদি কামাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইহার পর যখন কাবুলী হাটে বাজারে বৈষ্ণব শ্রেণীর দাড়ি গোঁপ কামান লোক দেখিত, তখনই বলিত, 'ভাই তোমভি কাঁঠাল খায়া ?'

যে প্রকার একভাষাভাষী লোক পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জাতিত্ব সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ যিহোবা কি ইন্দ্রভক্ত, অগ্ন্যুপাসক কি কোরাণভক্ত জগৎ জুড়িয়া থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে জাতিত্ব অসম্ভব। বরং ইন্দ্র কি যিহোবার ভক্ত ভারতে এবং নিন্দুক ইংলণ্ডে, ইহা রেল-টেলিগ্রাফবিহীন সেই প্রাচীন কালে অসম্ভব ছিল। ভক্ত এবং নিন্দুক, ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী থাকাই সম্ভবপর।

ঋগ্বেদে বর্ণিত বিবাদ বিসংবাদ আর্য্য ও ইরাণী বিবাদ নহে। ইহা আর্য্য ও ইব্রিয় বিবাদের কাহিনীমাত্র। এই বিবাদ, বিসংবাদ Separationএর ফলে এক সম্প্রদায় বহুশক্তিবিশ্বাসী, প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত দিবস, পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসগণনাকারী, বাম হইতে ডান দিকে লিখন-পদ্ধতি গ্রহণকারী, সুরাভক্ত, যজ্ঞে মধুব্যবহারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং তদ্বিপরীতে অপর সম্প্রদায় একশক্তিবিশ্বাসী, সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিবস, নূতন চন্দ্র হইতে নূতন চন্দ্র পর্য্যন্ত মাসগণনাকারী, ডান হইতে বাম দিকে লিখন-পদ্ধতি গ্রহণকারী, সুরাবিরোধী, যজ্ঞে মধুবর্জ্জনকারী ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ই অহি, বল রূপ Evil spiritএ বিশ্বাসী। বহু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও বহু বিষয়ে অনৈক্য আছে। এই White stockএর (শ্বেতবর্ণ) অন্তর্ভূত আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির মধ্যে ভাষা, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কোথায় ঐক্য, কোথায় অনৈক্য, ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। অদ্য ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইলাম।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

বিবাহের আবশ্যকতা।

And the Lord God said, (it is) not good that the man should be alone ; I will make him an help meet for him.—*Genesis, 2—18.*

অর্থাৎ, "সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্যে তাহার অনুরূপ দোসর নির্ম্মাণ করি।" সেমীয় (Semetic) শাস্ত্রমত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিরক্ষার জন্য গোড়াতেই নরের নারী আবশ্যক হইয়াছিল, এবং নারী ব্যতীত নরের একাকী থাকা সঙ্গত বিবেচিত হয় নাই।

বৈদিক যুগেও অবিবাহিত জীবন আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল না। ঋগ্বেদের বহু ঋকে সন্তানকামনা ও পত্নীপ্রার্থনা দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। বৈদিক কালেও যে নরের জন্য নারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, ইহা ৫।৪৬।৮ ঋকের ভারতী, ধিষণা, বরুণাণী, ইন্দ্রানী, অশ্বিনী প্রভৃতি দেবপত্নীদিগের কল্পনার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। আর্য্য-শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

"যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্"।

—বৃহৎপরাশর-সংহিতা ৪।৭০

অন্যত্র—

"অপুত্রকের কোনও লোক নাই"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্চিকা, ১ম খণ্ড।

মুসলমান শাস্ত্র হদিস বলিতেছেন,—বিবাহিত ও অবিবাহিত দুই ব্যক্তিই যদি সমান বিদ্বান, সমান গুণসম্পন্ন ও সমবয়স্ক এবং সমান চরিত্রবান হয়, তাহা হইলে আচার্য্য কার্য্যের জন্য বিবাহিতকেই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

অর্দ্ধাঙ্গিনী। সর্ব্বশাস্ত্রেই নারীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। প্রাচীন ইব্রিয় শাস্ত্রে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী-রূপে পরিচিত।

"They shall be one flesh"—*Genesis 2—24.*

অর্থাৎ, তাহারা একাঙ্গ হইবে। বিবাহকালের বর্ণনায় বৈদিক ঋষি বলিতেছেন,—"জায়া বিশতে পতিম্"। অর্থাৎ, পত্নী পতিতে প্রবেশ করিতেছে, বা তাহারা এক হইয়া যাইতেছে। ১০।৮৫।২৯ ঋক্।

আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রী যে অর্দ্ধাঙ্গিনী-রূপে পরিচিত, তাহা রামায়ণের দ্বারাও বুঝা যায়।

"বেদাদনন্যরূপা পুরুষস্য দারাঃ।" অর্থাৎ, বেদে পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাংশ বলিয়া কথিত।—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ২৪।৩৮।

উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন, অতি প্রাচীনকালে বিবাহপ্রথা ছিল না; মনুষ্যগণ ইতর প্রাণীর ন্যায় মিলিত হইত। মহাভারতের এই উপাখ্যান আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যে বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আলোচনার কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই, সেই বৈদিক যুগের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদে বিবাহের ও বিবাহিত জীবনের, এমন কি, বিবাহের আচার-পদ্ধতির বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে।

অতি প্রাচীনকালে ইব্রিয় জাতির বিবাহ *bena* (বেনা) ও *baal* (বাল)

নামক দুই প্রকার প্রথায় সম্পন্ন হইত। তন্মধ্যে "বেনা" নামক প্রথাই প্রাচীনতর। এই "বেনা" প্রথা আধুনিক কালে ইব্রিয় বা য়িহুদি সমাজ হইতে লোপ হইয়াছে। প্রথমে এই "বেনা"র কথা বলিব। হিব্রু ভাষাতে "বেন" শব্দের অর্থ অপত্য, সন্তান, বংশ ইত্যাদি। পুরুষ মৈথুন ও অপত্যকামনায় নিজ পিতৃগোষ্ঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্যার পিত্রালয়ে গিয়া কন্যা যাচ্ঞা ও বিবাহ করিয়া চিরজীবন তথায় বাস করিত। সন্তানগণ মাতৃকুলের অধিকার প্রাপ্ত হইত।

ইব্রিয় বেনা।

বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর পুরুষকে আমরা ঘরজামাতা বলিয়া থাকি। নারী-যাচ্ঞা হেতু এই শ্রেণীর স্ত্রীকে আমরা "বনিতা" বলিতে পারি। নরনারীর এই প্রকার মিলনে পুরুষ স্বামী বা প্রভুতুল্য, এবং নারী অধীনা বা গৃহিণীরূপে গণ্যা হইত না। ইহাতে নর-নারীর গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইত না; কেবল প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যৌন সম্মিলন দ্বারা অপত্য উৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইহাতে পুরুষকে নারীর ভার-বহন ও তাহাকে নিজগৃহে বহন করার প্রথা ছিল না। প্রায় খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাকোবের (Jecob) ঘরজামাতারূপে বিবাহ (Genesis ২৯ অধ্যায়) এবং যাকোবের স্ত্রী ও সন্তানগণ সম্বন্ধে লাবনের উক্তি "এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, এই বালকগণ আমারই বালক" ইত্যাদি (Genesis ৩১।৪৩) দ্বারা "বেনা" প্রথার প্রমাণ পাইতেছি। আদম ও ইভের বিবাহ নাকি এই "বেনা" প্রথায় (Hebrew Antiquity 12) সম্পন্ন হইয়াছিল। এই কথার পোষকতায় আদি মনুষ্য আদম ও ইভের সম্বন্ধে ঈশ্বরোক্তি লইয়া আমরা আরও একটু আলোচনা করিব।

"Therefore shall a man *leave* his father and his mother, and shall cleave unto his wife"; Genesis 2—24.

উদ্ধৃত leave শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ *Azab*। এই *Azab* শব্দটী অন্য স্থানে (Genesis 39—12, 13) "পরিত্যাগ" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতি-প্রাচীন কালে (Primitive time) ইব্রিয় পুরুষ যে নারীর জন্য পিতৃগোষ্ঠী পরিত্যাগ করিত, তাহা ইহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।৩৪।২,১।৫৬।২,৯।৬৪।২১,৯।৮৫।১০,১১ ঋকে ও অন্যান্য বহু ঋকে আমরা "বেনা" শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিখ্যাত বেদ-ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্য মহোদয় ১।৫৬।২ ঋকে "বেনা" অর্থ "কান্তাপ্রিয়ঃ কাময়মানাঃ" এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কম্" ধাতুর অর্থ ইচ্ছা, সুতরাং সম্ভোগার্থে যে নারীকে গ্রহণ করা যায়, সেই স্ত্রী

আর্য্য বেনা ও বনিতা।

কান্তা, কামিনী। ৯।৬৪।২১ ঋকে যে বেনা শব্দ আছে, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ সুশ্রী পুরুষ, এবং ইংরেজি অনুবাদক গ্রিফিথ friends অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকে যজ্ঞের স্তব বা গানের প্রসঙ্গ আছে। ৯।৮৫।১০,১১ ঋকের "বেনা" শব্দের অর্থ গ্রিফিথ Loving-ones ও দত্ত সাহেব সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া "বেন" নামক কোনও ব্যক্তি মনে করেন। বৈদিক কালে যে স্ত্রীলোকে পুষ্পচয়ন, (১।৫৬।২ ঋক) সোম-সংগ্রহ ও তাহা প্রস্তুত এবং প্রস্তুতশালায় গান করিত, ইহা ঋগ্বেদের ৯।৬৬।৮ ঋকে দৃষ্ট হয়। বৈদিক কালে স্ত্রীলোকে যজ্ঞকর্ম্মও করিত। বেনা শব্দের অর্থ "বনিতা" হইতে পারে কি না, আলোচনাযোগ্য। "বনিতা" শব্দ বন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বন্ অর্থে বাঞ্ছা বুঝায়। যে নারীকে বাঞ্ছা করিয়া গ্রহণ বা বিবাহ করা যায়, সেই নারীকে বনিতা বলিতে পারি। এই প্রকারে বাঞ্ছাকারী নরের নারীসন্নিধানে গমনের আভাস ঋগ্বেদ ১।১০৫।২ ঋকের "অর্থমিদ্বা ও অর্থিন আজায়া যুবতে পতিম্" অর্থী অর্থ নিকটে পায়, জায়া পতিকে নিকটে পায়, ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায়। প্রাচীন দ্রবিড় জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত আছে।

এক্ষণে "বল" নামক বিবাহ-প্রথার আলোচনা করিব। হিব্রু ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় "বল" অর্থে ক্ষমতা, শক্তি, শক্তিবান, প্রভু ইত্যাদি বুঝায়। বল্লভ অর্থে অধ্যক্ষ, নায়ক, পতি ইত্যাদি। হিব্রুতে বালা অর্থে গৃহিণী, সংস্কৃতে ষোড়শী নারী। সম্যকরূপে বহন করা হেতু বিবাহ। নারীর ভার-বহন ও নারীকে গৃহে বহন করার অর্থ বিবাহ। ইব্রিয় জাতির প্রাচীন "বল" নামক প্রথা দুই প্রকার। তন্মধ্যে বরের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব দ্বারা কন্যার আনয়ন ও বরের বাড়ীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া প্রাচীনতর প্রথা। আব্রাহাম-পুত্র ইসহাকের (খৃঃ পূঃ ২২০০) এই প্রকার প্রথায় বিবাহ (Genesis 24) হইয়াছিল।

ইব্রিয় Baal ও আর্য্য বল্লভ।

ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশ হইতে আমরা "Bena" নামক প্রথার পোষক প্রমাণ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঋগ্বেদের যে অংশকে অপ্রাচীন বলা হয়, তাহার (১০ম মণ্ডলের) ৮৫ সূক্তে সূর্য্যকন্যা সূর্য্যার সহিত অশ্বিদ্বয় অথবা সোমের রূপক বিবাহের যে চিত্রটী আছে, তাহাতে আমরা বিবাহসম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য কথা জানিতে পারি। উক্ত সূক্তের ২৩ ঋকের "অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্" দ্বারা কন্যা আনয়ন জন্য, নিষ্কণ্টক ও সোজা

পথের প্রার্থনায় বরের বন্ধুগণের দূরদেশে গমন সূচিত হইতেছে। আব্রাহাম যেমন সবর্ণা কন্যা নিকটে না থাকায় কানান অর্থাৎ পালেষ্টাইন হইতে বহু দূরবর্ত্তী অরাম নহরীয়ম (মেসোপোটেমিয়া) দেশে কন্যা আনয়ন জন্য (Genesis 24—10) লোক পাঠাইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তদ্রূপ বৈদিক কালে সবর্ণা কন্যা নিকটে না থাকায় বিবাহের জন্য বরের বন্ধুগণকে যে কন্যা আনয়ন করিতে দূর দেশে যাইতে হইয়াছিল, উক্ত ঋক দ্বারা তাহা সমর্থিত হয়। রেবেকা-নাম্নী কন্যাকে বাড়ীতে আনিয়া যে প্রকারে ইসহাকের সহিত তাহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, বৈদিক যুগেও সেই প্রকারে (১০।৮৫।২৩ ঋক) কন্যা আনিয়া বরের আলয়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত, ইহা বুঝা যায়। ১০।৩৯।৭ ঋকের "যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্" অর্থাৎ শুন্ধ্যুবনাম্নী পুরুমিত্র রাজার কন্যাকে তোমরা রথে করিয়া আনিয়া বিমদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলে; ১।১১৭।২০ ঋকের "আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী" অর্থাৎ সূর্য্যা সখ্যের হেতু আসিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, ইত্যাদি ঋকেও তাহাই সমর্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়া প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ইহুদিবর শোভাযাত্রাক্রমে কন্যার পিত্রালয়ে যাইত এবং সেই স্থানে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত। Judges 14—8 এবং Matthew 25—5 পদে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাই। আধুনিক কালে যে প্রকারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, এই প্রকার বিবাহের বর্ণনাও ঋগ্বেদের ১০।৪০।১৩ ঋকে উল্লেখ আছে। "কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্" পতিগৃহে যাইবার পথ বিপদসঙ্কুল না হয় নারী এমত প্রার্থনা করিতেছে। বিবাহকার্য্য পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছে বলিয়া "পতি" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ৯।১০১।১৪ ঋকে বর কন্যার নিকট যায় ইত্যাদি দ্বারা কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকার্য্য হইত বুঝা যায়। কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক বরের বাড়ীতে বিবাহকার্য্য সমাধা হওয়া এই প্রাচীনতর প্রথাটি এখনও উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় (রাজবংশী) সমাজে প্রচলিত আছে।

Genesis 6—2 (আদি পুস্তক) পদে যে "Son's of god এবং daughter's of men কথাগুলি আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। উহা অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় জ্ঞাপক কথা মাত্র। ঠিক কোন্ সময় হইতে ইহুদি জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

অসবর্ণ ও সবর্ণ বিবাহ।

আব্রাহাম তৎপুত্র ইসহাকের সঙ্গে অসবর্ণা ও অসগোত্রা পৌত্তলিক কানানীয় কন্যা বিবাহ (Genesis 24—3,4) দিতে এবং ইসহাক তৎপুত্র যাকোবকে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ (Genesis 28—1,6) করিয়াছিলেন। যাকোবের ভ্রাতা এসৌ অসবর্ণা হিত্তিয় জাতীয়া কন্যা বিবাহ (Genesis 26—34) করিয়া পিতামাতার বিরাগভাজন (Genesis 28—8) হইয়াছিলেন। ইস্রায়েলদের ব্যবস্থাকর্ত্তা যিনি অসবর্ণ ও অসগোত্র বিবাহ রহিত (Talmud 59, Exodus 34-16) করিয়া গিয়াছেন; সেই ব্যবস্থাকর্ত্তা স্বয়ং মুসাও কুশিকবংশীয়া অসবর্ণা কন্যা বিবাহ (Numbers 12—1) করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ (Exodus 34—16) হওয়া সত্বেও পরবর্ত্তীকালে য়িহুদী সমাজে অসবর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অচ্ছিন্নত্বক পালেষ্টীয় কন্যার সহিত শিমসোনের বিবাহ (Judges 14) ও দায়ুদ রাজার হিত্তিয় জাতীয়া বৎসেবাকে (2 Samuel 11) গ্রহণ এবং সলোমনের মিশরীয় কন্যা বিবাহ (1 Kings 3) দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। Jacna 8—28 এবং Avesta Vispered 3—18 পাঠে ইহা বুঝা যায়। মনুসংহিতাদি দ্বারা পরবর্ত্তীকালে আমাদের মধ্যে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকিলেও বৈদিককালে সবর্ণ ও অসবর্ণ দুই প্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল। ১০।১৭।২ ঋকের "অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে" বিবস্বানকে "সবর্ণা কন্যা" দেওয়া এবং ১০।৮২।২৩ ঋকের সবর্ণা কন্যার জন্য দূরদেশে গমন দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত ক্ষত্রিয় জাতীয়া কন্যা শান্তার বিবাহ (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১০।৩৩) ও রাজা দশরথের মহিষী শ্রেণী ব্যতীত "বাবাত" ও "পরিবৃত্তা" অর্থাৎ বৈশ্যা, শূদ্রা, শ্রেণীর পত্নীর বৃত্তান্ত (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১৪।৩৫) অসবর্ণ বিবাহের প্রাচীনতম প্রমাণ নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় পঞ্জিকার ১১শ খণ্ডের ইন্দ্রের "বাবাত" শ্রেণীর "প্রাসহা" নাম্নী পত্নীর উল্লেখ এবং ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের শ্যাবাশ্ব ঋষির সহিত রথবীতি রাজার কন্যার বিবাহ উপাখ্যান অসবর্ণ বিবাহের প্রাচীন প্রমাণ।

ক্রমশঃ

শ্রীআজিমউদ্দীন আহম্মদ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ।

প্রবাসী । চৈত্র।—প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়ী' নামক কবিতা। ইহার ছন্দ 'বাঙ্গালা', কিন্তু ভাষা 'চলিত' নয়। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা নহিলে চলে না, প্রতিভা ভাবের যোগ্য ভাষাই বাছিয়া ব্যবহার করে, তাহার একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের সৃষ্টি অসম্ভব, 'বিজয়ী'র ভাষায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল যেন থরে থরে ;
দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।'

এ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীসুকুমার রায়ের 'জীবনের হিসাব' অত্যন্ত দুষ্পাচ্য প্রহেলিকা। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের 'লীলা' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি চারি চরণে সম্পূর্ণ—ইহাতে শিলা কেন বড় হইল, এবং মুক্তা কেন ছোট হইল, এই বিষম বরযাত্রী-ঠকানো প্রশ্ন করিয়া কবি উত্তর দিয়াছেন—

'ক্ষুদ্র যে গো ব্যর্থ নহে জানিয়ে দিতে তাই,
বিশ্বপতি ক্ষুদ্র করে মুক্তা গড়ে ভাই।'

দুটি চরণে তিনটি 'চ বৈ তু হি'—'যে গো' ও 'ভাই'! আর ক্ষুদ্রের কারণ-রহস্যও অত্যন্ত অপূর্ব! ইহা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। এইরূপ আর একটি কবিতা মনে পড়িতেছে—'আজগুবী দুনিয়ার খেলা সর্ষির মধ্যি তাল।' তবে এই সর্ষে-ঘটিত উক্তিতে একটু অদ্ভুত রহস্যের সমাবেশ আছে, শিলা-মুক্তার দ্বন্দ্বে তাহা নাই। শ্রীসীতা দেবীর 'স্বয়ম্বর' একটি আখ্যায়িকা; 'ছোট গল্প' নহে। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'অহর-মজ্দার নামাবলী' উল্লেখযোগ্য। 'পঞ্চশস্যে' দেখিলাম—'এক গেলাস ঘোল আর এক গেলাস কমলা লেবুর রস তুলনা করিলে কমলার রসে ঘোলের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পুষ্টিকর সামগ্রী পাওয়া যায়। এক গেলাস কমলার রস, পোয়ে এক গেলাস খাঁটি দুধের সমান পুষ্টিকর। কলিকাতায় খাঁটি দুধ যেমন দুষ্প্রাপ্য তাহাতে কমলার রস খাইয়া দুধের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। লেবুর মধ্যে যে অম্লরস থাকে তাহা হজমের সহায়তা করে, কমলা লেবুর মধ্যে যে মিষ্টরস থাকে তাহা সহজেই শরীরে গৃহীত হয়, হজম করিয়া লইতে হয় না। শর্করা বা শ্বেতসার কার্বোহাইড্রেট ছাড়া কমলার রসে শতকরা একভাগ প্রোটিন বা পোষাই সামগ্রী আছে। সুতরাং কমলা লেবুর রস মুখরোচক স্বাদু ও পুষ্টিকর একাধারে।' 'আদর্শ গ্রাম' নামক প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি।—'নাড়ায়ণ' ছবিখানির ছাপা দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নাই, চিত্র-পরিচয়ের ব্যাখ্যা দেখিয়া বুঝিতে হয়। নাড়ায়ণ—অর্থাৎ, চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ'। ইহা বলিলেই সকল বলা হইল। ইহাতে রস নাই, তবে কষ আছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবের 'প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব' ও শ্রীপ্রমথনাথ দত্তের 'সমরাঙ্গণে বাঙ্গালী' পড়িয়া বাঙ্গালীর মনে গৌরব-গর্ব্ব উথলিয়া উঠিবে।—এলাহাবাদের শ্রীলালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন যুগের নবীন বাঙ্গালী। সন্তরণে ইঁহার অদ্ভুত দক্ষতা—সন্তরণে লালমোহন বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না।—ইনি এই শক্তি বিপন্নের উদ্ধারে নিয়োগ করিয়া সার্থক করিতেছেন। জলমগ্নের উদ্ধারই যেন ইঁহার জীবনের ব্রত। লালমোহন বাবুর আদর্শ বাঙ্গালীর জীবনে সার্থক হউক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস 'বসন্তে' কতকগুলি শব্দ ছন্দে গাঁথিয়াছেন। মামুলী কথা। বসন্তের 'চরণ-পরশ লভি ফুটিল কুসুমদল'—এই একটি চরণই কবিতা। 'দেশের কথা'য় নানা তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়ার 'বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল'কে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিলাম।—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থের 'প্রথম পত্র' ছড়ার হিসাবে মন্দ নয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশ,—'বিক্রমপুর বীরতারা-নিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের অলসোল্‌স্ কলেজের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ ফেলো হইলেন। তিনি ১৯১৬ সালে গ্রীক-লাটীন ভাষায় অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং পারদর্শিতা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে জনলক্-বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয় হইয়াছেন। দেশে থাকিতেও তিনি কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং এম্-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয়-স্থানীয় হন।'

ভারতী। চৈত্র।—সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পাথর ফাট্ ক'রে বেরিয়ে ছুটে' নামক একটি গল্প। ইহাতে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা আছে। কিন্তু ছেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয়, ফলে তাহাই হইয়াছে।—খোঁড়া কল্পনার গিরি-লঙ্ঘনের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। অপ্রকৃতকে অন্ততঃ প্রকৃতবৎ করিয়া তুলিবার শক্তি সকলের থাকে না। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সৃষ্টি 'জ্যাঠামী'র উপাদানে সম্ভব নহে। অক্ষমতার ঠোকরে 'অ্যানিমিক' আখ্যানবস্তুটি শুধু ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। শ্রীগুরুদাস সরকারের 'কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব' উল্লেখযোগ্য। লেখক অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'আঁধিয়া' গল্পটি মন্দ নহে। বোধ হয় আরও ছোট হইলে ভাল হইত। 'বাহুল্য' ছোট গল্পের মহাশত্রু। ক্ষুদ্র পরিসরে কোনও বিষয়ের বিস্তারই শোভা পায় না, মানায় না। কথার বিস্তার, বর্ণনার বিস্তার, ভাবের আতিশয্য, যাহা এক কথায় সারা যায়, তাহার জন্য এক ঝুড়ী কথার সমাবেশ—ছোট গল্পে আদৌ চলে না। আর, ফ্যানাইবার প্রলোভন সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য দেখিয়া মনে হয়, 'ফ্যানান'ই যেন রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য! শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসন্ত-বিলাপে' পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়াছেন।—

'আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল ?
কেন কিংশুক ফুল চীন বাস গায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল ?'

ইহার আদ্যোপান্ত এইরূপ। এ প্রশ্ন মৌলিক হইতে পারে। শব্দচয়নও সুন্দর। কিন্তু ইহার ভাবের কেন্দ্র কি ?—'বসন্ত-বিলাসে' মধ্যে মধ্যে 'ন্যাকামী' আছে। যথা—'খসে যাক্ ওড়নার কাঁকন পাড়, কুঞ্জের ঝুলনার 'পর।' তা যেন গেল, কিন্তু 'ভারতী'র উপর উড়িয়া পড়ে কেন ? কতকগুলি মিষ্ট কথার গাঁথুনীই কি কবিতা ? শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরের বন্ধু'

নামক গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীসরলা দেবীর 'আহ্বানে' আছে,—'সেদিন তোমাদের দেশী কিলটি পাকিয়ে তোলাবার জন্যে তখনকার প্রয়োজনমত ব্যবস্থাও করেছিলুম—বক্সিং গৎকা লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি সব রকম বীর্য্যোদ্বোধক খেলা শেখাবার ক্লাব স্থানে স্থানে খুলে দিয়েছিলুম।' 'দেশী কিলটি পাকিয়ে তোলবার প্রথম চেষ্টা—'শক্তি-সংঘ' করে। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাড়ীতে তাহাকে স্থান দিয়াছিলেন। যিনি শক্তি-সংঘের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ইহলোকে নাই।—সূচনায় শ্রীমতী সরলা দেবী শক্তি-সংঘকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, শ্রীমতী সরলা দেবীর সাহচর্য্যে নবীন কর্ম্মী যথেষ্ট উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাহাও আমাদের মনে আছে। অনেক দিনের কথা, প্রথম উদ্যমের ইতিহাস বোধ হয় শ্রীমতী সরলা দেবীর মনে নাই। 'দেশী কিলটা পাকিয়ে তোলাবার * * ব্যবস্থা' সেই প্রথম।—ইতিহাসের কথা, তাই একটু টুকিয়া রাখিলাম। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষালের 'পরাজয়' নামক গল্পটি ডোডের 'ফরাসী গল্পের আভাসে' রচিত। অনুবাদ না দিয়া আভাস দিলেন কেন? অনুবাদেই সবটা থাকে না, আভাসে ত 'আসলে'র অনেকটাই উপিয়া যায়।

সুবর্ণবণিক্ সমাচার। চৈত্র।—'জয় কৃষ্ণ কৃপাময়' নামক কবিতায় শ্রীভোলানাথ বড়াল তোটককে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন। ইহা ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালা নয়।

> 'ধনবল্লভ বেদ-বিনীত-গুণ
> গুণহীন হতাখিল ভূ-পিশুন
> পিশিতাশি-নিকৃন্তন নষ্ট-নৃশ
> বৃষভানু-সুতা-প্রণয়াতিবশ'

পড়িলে 'ভার্গব-বিজয়' মনে পড়ে। 'ছুছুন্দরী-বধে'র 'দ্রুহিণবাহন সাধু পুচ্ছ বিতরিয়া'ও না মনে পড়ে, এমন নয়। 'কল-গুঞ্জন খণ্ডিত-দৈত্যমদ' বাঙ্গালায় চলিবে না, চলিতে পারে না। বড়াল মহাশয় অনর্থক পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু বিবাহ ও নারীর অবস্থা' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের পরামর্শমত বিবাহের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'এক্ষণে সগোত্রে বিবাহ হইলে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পিতৃবংশের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দিলেই যথেষ্ট হয়।' ইহাও কি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত? বিবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনেক পরামর্শ আছে। আমেরিকার কোনও কোনও ষ্টেটে আইনের দ্বারা সমাজের রুগ্ন ও অপরাধপ্রবণ মানব মানবীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিবাহই সকল ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নহে। বীজ-নির্ব্বাচনের জন্যই যে সকল বিধি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও সমাজে তাহাদের প্রয়োজন আছে কি না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এখন তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।—ইংরেজী কেতাবে ইউরোপের বিশ্র সমাজ সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছেন, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাপত্র বাঙ্গালার জন্য লিখিবেন না। এ সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে লোক-মতের সৃষ্টি আবশ্যক। তাহার প্রথম ও প্রধান সাধন,—বংশানুক্রম-বিজ্ঞানের প্রচার, সেই বিজ্ঞানের ইঙ্গিত অনুসারে এ দেশে তৎসম্পৃক্ত তথ্যের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিচার। শুধু সগোত্রে বিবাহ দিবার ফতোয়া না দিয়া, কেন সগোত্রে বিবাহ দিলে এ দেশেও 'কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই', তাহা সপ্রমাণ করুন। এ সকল বিষয়ে শুধু বিলাপে ও পরিতাপে ও অযাচিত উপদেশে

কোনও ফল হয় না। শ্রীযতীন্দ্রকুমার সাহা 'সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'য় লিখিয়াছেন,—'কারণ তাঁহাদের স্নেহভঙ্গুরতার ধারণা বহু নিদর্শনের ফলে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ সন্তানের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।' ভাষা ত বুঝাইবার জন্য? এ ভাষায় কি বুঝিব? লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত সামান্য। তাহাও ভাষার আড়ম্বরে ও অস্পষ্টতায় প্রচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিকের 'যোগিনী' এই গর্ব্বে আসরে নামিয়াছেন। এ ভাষায় গল্প ফুটিবে না। শ্রীশিবচন্দ্র শীল 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের গ্লানি পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। তাহাতে সুবর্ণবণিকের কি লাভ? 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্' স্মরণ করিলে হয় না? এক জাতি আর এক জাতিকে পদদলিত করুক, ব্রাহ্মণ হইলেও আমরা তাহা চাহি না। নিম্ন জাতি উন্নত হউক, ইহাও আমাদের কামনা। কিন্তু উচ্চ জাতিকে গালি দিয়া, বা তাহাদিগকে 'মিশ্র জাতি' প্রতিপন্ন করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া যে স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহা অনেক ব্রাহ্মণোত্তমেরও কামনার বস্তু। সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরাকালের ব্রাহ্মণ বর্ণোত্তম হইয়াছিলেন।—পুরাণ, ইতিহাস ঘাঁটিয়া অন্য বর্ণকে নীচু করিয়া কোনও বর্ণ উঁচু হইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। বিংশ শতাব্দীর ভীষণ জীবন-যুদ্ধে 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' অস্বীকার করিয়া বিজয়ী হইবার কোনও আশা নাই।—ইউটোপিয়া এখনও কিছু কাল কল্পনার কল্পলোকেই বিরাজ করিবে। মানব সমাজ বর্ণভেদও বর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু শ্রেণীভেদ, শক্তি-ভেদ, বৃত্তিভেদ, বিশেষতঃ ধনী দরিদ্রের ভেদ, মূলধনী ও শ্রমজীবীর ভেদ কবে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহা আপাততঃ কল্পনারও অগোচর। প্রাচীন ভেদ যদি যায়, নূতন ভেদ তাহার পরিত্যক্ত সিংহাসন বা বৃকাসন অধিকার করিবে। বেদান্তের অভেদ কবে মানব ব্যবহার-ক্ষেত্রে সত্যে পরিণত করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? তত দিন 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' ভিন্ন মানবের গতি নাই। সে যোগ্যতা-লাভের প্রথম সোপান—সংঘের সৃষ্টি, সংহতির সৃষ্টি। বিরোধে ও আক্ষরিক কলহে শক্তিক্ষয় করিলে আমরা সংঘের সৃষ্টি করিতে পারিব না। আগে জাতিভেদ চূর্ণ করিব, তাহার পরে বাঁচিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব, এমন সঙ্কল্প কোনও জাতির পক্ষেই সমীচীন নহে। শ্রীসুবলচন্দ্র দেব 'রেশমে' যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতন তথ্য নাই। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সে সমুদয়ে যাহা নাই, অথবা সে সকল নিবন্ধ লিখিত হইবার পর যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী লেখককে তাহাই লিখিতে হয়। কিন্তু এ দেশে কোনও বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ লেখকই ততটা আয়াস স্বীকার করিতে চাহেন না। ফলে, তাঁহাদের রচনা নিষ্ফল হয়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের 'দোল-পূর্ণিমা' ছাপা হইল কেন? যিনি 'সৃজিত' লেখেন, দোলের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিবার তিনি কে? শ্রীরসময় লাহার 'মরালে'র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ছায়া কি লাল-সায়রের সমর-ক্ষণের মরাল দেখিয়া ছবিখানি তুলিয়াছেন? 'দেখ্‌ছ কি তাই উচ্চ গ্রীবা-ধারি' কবিতা নহে; রসময় লিখিলেও তাহাতে রসের ফোয়ারা ছুটিতে পারে না। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিকের 'অভ্রের খনি-পরিদর্শন' গুরু-চণ্ডালী ভাষায় লিখিত। শ্রীরণেন্দ্রকুমার দত্তের 'মজার আয়েস' ভদ্রসমাজের যোগ্য নহে। সব টানিয়া বোনা যায়, কিন্তু

ইতর-শব্দের টানা পোড়নে রসিকতার জেলে-কাচাও বোনা যায় না। শ্লেষ, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ উচ্চ স্তরের সামগ্রী। শক্তিশালীর কলমেই তাহা ফোটে। অক্ষমের পক্ষে রসিক হইবার চেষ্টা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর হইতে পারে না। রসিকতার উৎকর্ষই উপভোগ্য—অপচার ক্ষুব্ধকারজনক।

মালঞ্চ। চৈত্র।—প্রথমেই 'বর্ষ বিদায়'। শ্রীঋপতিপ্রসন্ন ঘোষ এই 'বিদায়ে' কবিতার অনেক উপাদানকেই কুলায় বাতাস দিয়া বিদায় করিয়াছেন। 'পুরাতনের আক্র ভেদি নবীন মারে উঁকি।' শ্রীমলিনকুমার চক্রবর্ত্তী 'দোলে' আবীর হইতে শশধর পর্য্যন্ত অনেক উপকরণের আমদানী করিয়াছেন; কেবল যাহা আহরণ করিয়া পাওয়া যায় না, সেই 'সুদুর্লভ' কবিত্বের এক কণাও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি যাঁহারা লেখেন, এবং যাঁহারা ছাপেন, এই উভয়ের মধ্যে বাহাদুর কে? বেতালপঁচিশীর বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে অনায়াসে এই প্রশ্ন করিতে পারিতেন। শ্রীমন্মথনাথ মিত্রের 'সরসীর ইতিহাসে' 'নূতন কিছু' আছে। সমস্ত কবিতাটি দুইবার পড়িয়া ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। যে 'নূতনে'র কথা বলিতেছিলাম, তাহা এই,—'সে কি অপূর্ব্ব আকুল পুলকে ছাইল আধেক তনু'—আধেকে পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চ, অপরার্দ্ধে নাই। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে। নূতন নয়? এই চরণের শেষে আছে—'লীলা-চঞ্চল উচ্ছল জলরাশি।' কাহার সহিত ইহার অন্বয়, তাহা বুঝিতে পারি না। 'উচ্ছল জলরাশি'র পুলক, অথবা উহাই পুলকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাও জ... গাঁধা হইয়া গেল! তবে কবিতাটির নাম 'সরসীর ইতিহাস'। অতএব, আঁচে অনুমেয়, উহার তনুই—'উচ্ছল জলরাশি', এবং তাহারই অর্দ্ধেক 'আকুল পুলকে' কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল! কবিতা বটে! কিন্তু এত যুক্তি করিয়া, রামমূর্ত্তি বা ভীমভবানী ভিন্ন আর কে কবিতার রস ভোগ করিতে পারে? 'পল্লীর প্রাণ' এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু 'কমলার পাকশালে বামা' নামক ছবিখানির বাম দিকে দণ্ডায়মানা নারীর চোখ দেখিয়া, কলা-লক্ষ্মীর প্রাণ যে প্রায় কণ্ঠাগত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না! শ্রীঅবনীকুমার দের 'অনন্ত' উল্লেখযোগ্য। ইহা আধ আলো ও আধ ছায়ায় রচিত,—অর্থাৎ, কতক বুঝা যায়, কতক বুদ্ধির অতীত। যেমন—'আমি সৃষ্টি, তুমি স্রষ্টা, অভেদ অমিল জানি নিরন্তর।' 'অভেদ' ও 'অমিলে'র মিল নিশ্চয়ই অসম্ভব। 'হৃদয়ের তালে মোর বিশ্ব-সুর বাজে মহা-মালিকার।' সে 'মহামালিকা' কি বস্তু, যাহাতে 'বিশ্ব-সুর বাজে'? কবিতাও আজকাল স্বপ্রকাশ। উহাকে পাঠকের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য কবিরা কোনও চেষ্টাই করেন না। এমন কি, একটু প্রসাধনের আভাসও অনেকের কবিতায় দেখিতে পাই না। বাল্মীকির স্বতঃ-উদীরিত 'মা নিষাদ' শ্লোকের মত বাঙ্গালার বহু কবিতাই un-touched by hands ; un-touched by brainও কোন নয়? শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্রের 'ষ্টেট-ব্যাঙ্ক' নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি এখনও চলিতেছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র 'বিকাশে' ও শ্রীপ্রমথনাথ দে 'আলো'য় ফুটিয়াছেন।—'বিকাশে' 'কুঞ্জবনে ডাকল কোকিল, গুঞ্জরিল অলি।' কোকিল ত চিরকালই ডাকে, কিন্তু ১৩২৪ সালের শেষ মাসে নগেন্দ্রের ইন্দ্রজালে অলি অর্থাৎ ভ্রমর মুঞ্জরিয়া উঠিল। এতকাল গুঞ্জরিয়া শেষে মকর-কেরের খাতিরে 'গুঞ্জরিল'। ইহাকে তথাকথিত ছাপাখানার ভূতের ভুল বলিতে সাহস হয় না। এ যে মৌলিকতার ও উদ্ভটতার যুগ। ইহার উপর আবার 'অরূপ যিনি দূরে ছিলেন, রূপে দিলেন ধরা।' সুতরাং 'গীতাঞ্জলি' হারিয়া

গেল ! কবি প্রমথনাথ উকীল। তাঁহার মক্কেল আছে ত ? কবিতাটি তাহাদের হাতে না পড়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'মাইজি' একটি চলনসই গল্প—অত্যন্ত অযত্নে লেখা। 'চল্‌তি' ভাষার সঙ্গে—শুধু সাধু নয়—সুসাধু ভাষার চমৎকার 'মিল' দেখে মনে হয়, যেন 'শার্দ্দূলে ছাগলে এক ঘাটে জল খাচ্ছে।' যথা, 'শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল।' শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখটীর 'যুদ্ধ-যাত্রী' যেন বিষম বিদ্রূপ। এ 'রাজার আহ্বান' নয়, মার আক্ষেপ। কবির একটি কথায় আমরাও সায় দিতে পারি,—'পড়ে থাক আজ ছিন্ন বীণাটি'। বাস্তবিক, ভাঙ্গা বীণায় 'ঘ্যান্‌ঘ্যানানী' অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালী কলমের যুদ্ধে অনর্থক ক্ষতবিক্ষত হইয়া, দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া লাভ কি ? শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ভাষার ভাস্কর' নামক কবিতাটি উপভোগ্য। সম্পাদক কিন্তু 'পাষাণ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ; ইহার পার্শ্বেই শ্রীকালিদাস রায়ের অপচার—'বিদায়' সাজাইয়া দিয়াছেন। ইহার এক একটা লাইন পড়া দুষ্কর। 'তব কেশ-তমঃ পিছে করি ব্যথারুণ তোমার বদন।' তার পর, কল্পনার দৌড়ও পক্ষিরাজের মত।

'পাখী যদি না ডাকিত হায় তবে রাত্রি হতো নাকো ভোর,
পক্ষী কিগো সৃষ্টি বিধাতার ঝরাইতে শুধু আঁখিলোর ?'

কালিদাস বিহগবৎসল এজরা বা বিমলাচরণ লাহাকে প্রশ্ন না করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীকে বিব্রত করিতেছেন ––– ? আশ্চর্য্য এই যে, এক জন শিক্ষিত শিক্ষকেরও এই সব 'ন্যাকামী' ছাপাইতে লজ্জা ... আলঙ্কারিক মম্মটের ভাগিনেয় নৈষধচরিত লিখিয়া মামাকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। মামা মম্মট নৈষধ পড়িয়া বলিয়াছিলেন, 'বাপু হে ! দোষ পরিচ্ছেদটা লিখিবার পূর্ব্বে যদি আনিতে, তোমার কাব্য হইতেই সমস্ত উদাহরণগুলি তুলিয়া দিতে পারিতাম, অসংখ্য কাব্য ঘাঁটিয়া মরিতে হইত না। চৈত্রের 'মালঞ্চ' ও কবি কালিদাসের 'বিদায়ে'ও মম্মটের কায় চলিত। সুবাদার মেজর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-ভ্রমণ' উপাদেয় ;—চৈত্রের 'মালঞ্চের' সর্ব্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য রচনা। শ্রীমণিমোহন দত্ত 'কৃষকের ব্যথা'য় আপনার 'ব্যথা'র যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়—

'নিত্য হেরি গ্রামের ঘাটে কত পল্লী-বধূ,
তাদের মুখে তাদের বুকে আছে কতই মধু ;
যখন তারা কলসী কাঁকে ঘোম্‌টা টেনে মুখটি ঢাকে
তখন আমি তাদের পানে চেয়েই থাকি শুধু !
আগুন লেগে প্রাণটা যেন বড্‌ড করে ধূ ধূ !'

ইহা কি ছাপাইবার মত ? মণিমোহন 'তাদের বুকে' মধু দেখিয়াছেন, তাহাও 'মুখে'র সঙ্গে। কবির প্রাণটা পুড়িয়া ছাই হইলে একটু পবিত্র হইতে পারে। চাষারা কবিতা লেখে না, তাহারা নিশ্চয়ই পল্লীবধূদের প্রতি লোলুপ 'শ্যেন-দৃষ্টি' নিক্ষেপ করে না—বাঙ্গালার ধর্ম্মভীরু চাষার মানহানি করিবেন না। পরিণতবয়স্ক সম্পাদকের রুচিও ধন্য। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহের 'টাকা-স্তোত্র' চলনসই, তবে দেশকালের উপযোগী।

স্বাস্থ্য-সমাচার। চৈত্র।—'আলোচনা'র বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা, যশোর জেলা-বোর্ডের পল্লী-স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা, প্লেগ, এবং ব্যবস্থাপক-সভায় মাদক-নিবারণের প্রস্তাবের

সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। 'ডাক্তার বসুর স্যানাটোরিয়ম্ লিমিটেড' বাঙ্গালীর একটি গুরুতর অভাব দূর করিবে। কিন্তু যিনি এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, সেই S. P. Bose Esqr কি অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটী fameর শ্রীমান শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু? শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরীর 'প্রাণিজ খাদ্য' তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত সন্দর্ভ। ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞানের ও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের মত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ হইলে 'সোনায় সোহাগা' হয়। যশোর জেলা-বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযদুনাথ মজুমদারের রচিত ও প্রচারিত, এবং বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলীর অনুমোদিত 'ওলাউঠা' নামক ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি সম্পাদক এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ইহার ও এইরূপ অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্যের 'কাটানটে' উল্লেখযোগ্য। 'বিবিধ সংগ্রহে' যুক্তি-ফৌজ কর্তৃক পরীক্ষিত ও পঞ্জাব গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত 'প্লেগের ঔষধ' মুদ্রিত হইয়াছে। এই চিকিৎসা 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র সম্পাদক মহাশয়ের অনুমোদিত কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। থাকিলে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হইত। 'প্রশ্নোত্তর' মুলতুবী হইল কেন?

সন্দেশ। চৈত্র।—'নকল ধনঞ্জয়' নামক মুখপত্রের ছবিখানি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রঙ্গ প্রভৃতি সকল উপাদানই এখন দুর্ল্লভ। ইউ-রায় এণ্ড সন্স এ সময়েও এমন সুন্দর ছবি ছাপিয়াছেন! 'স্বদেশ' কাঁচা হাতের রচনা। শ্রীকুলদারঞ্জন রায়ের 'জড়ভরত' বেশ হইয়াছে। 'কথাসরিৎসাগর' হইতে সঙ্কলিত 'লোহজঙ্ঘের উপাখ্যান' উপভোগ্য। 'সন্দেশে' প্রাচী ও প্রতীচী, উভয় দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কল্পনার সমাবেশ থাকে। কেবল ইংরেজীর অনুবাদই 'সন্দেশে'র একমাত্র সম্বল নয়। ইহাই প্রকৃত পথ। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুরাতন লেখা' হইতে এবার 'আকাশ' মুদ্রিত হইয়াছে। শিশু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য কেমন করিয়া বিজ্ঞানের কথা লিখিতে হয়, রায় মহাশয় তাহার আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। 'রাবণ রাজার দেশে' শিশুদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী। 'ধনঞ্জয়' পাখীর গল্প বা বিবরণ। সুলিখিত। 'দাশুর কীর্ত্তি' ও 'হিংসুটী' চলনসই গল্প। 'শামুক ঝিনুক' প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি নিপুণ লেখক। বয়স্কগণও এই নিবন্ধে উপকৃত হইবেন, বোধ হয় বলিলে অপরাধী হইব না। প্রকৃতির এ সকল তথ্য— রহস্য আমাদের দেশে এখনও জনসাধারণের, শিক্ষিতসমাজেরও অজ্ঞাত। 'চোর-ধরা' পড়িয়া নিশ্চয়ই 'সন্দেশে'র ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিবে।

প্রতিভা। চৈত্র।—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের '১৩২০ অব্দের বঙ্গসাহিত্য' উক্ত অব্দে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা, এবং মাসিকে প্রকাশিত বিষয়সমূহের সূচী—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। অমূল্যবাবু একটু বাছাই করিয়া, সংক্ষেপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, যোগ্যতর গ্রন্থগুলির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিলে বাঙ্গালী পাঠকের উপকার হইতে পারে। মলাটের সমালোচনায় কোনও বিশেষ লাভ নাই। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন 'সাগরমন্থনে' নানা তত্ত্বের

মন্থন করিতেছেন। আমরা সাধারণ পাঠক, অমৃতের ভিখারী। কিন্তু যে মন্থন, দুর্বোধতার হলাহল উঠিতেছে। কবির ভাষায় বলি,—'বুঝি—যেন—নাহি—বুঝি, ধরিতে ধরি না পুনঃ যায়!'—শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ 'শ্রীরাধা' প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মতের সমর্থন। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'বৈষ্ণব-সাহিত্য' পাকিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরীর 'নূতন ও পুরাতন' চর্ব্বিতচর্ব্বণ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনের 'ইউরোপ-যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী' উল্লেখযোগ্য। আমাদের নদীয়ার এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে গিয়াছিলেন; রাজা রামমোহন রায় এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অগ্রণী নহেন। ইঁহার নাম—ইতি (?) সামউদ্দীন। লেখক বলেন,—'সম্প্রতি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে শিগারফ্ নামা বিলায়ৎ (Shigarf Nama Vilayat) নামক যে একখানি পার্শি গ্রন্থ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এ সম্মান রাজার প্রাপ্য নহে—উক্ত পার্শি গ্রন্থের লেখক 'ইতি সামউদ্দিন' নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকই এ সম্মানের অধিকারী।' সামউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমার পিতার নাম তাজউদ্দিন। নদীয়া জেলার অধীন পাচনর পরগণার কশবা গ্রাম আমার জন্মস্থান। আমি বহুদিন ধরিয়া নবাব মিরজাফরের সেরেস্তায় কার্য্য করিয়া পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পরে মিরকাসীম নবাবী পদ লাভ করিলে আমি নবাব সেরেস্তার কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের অধীন কর্ম্ম গ্রহণ করি। * * * এই সময়ে লর্ড ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে আসিয়া বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার পর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সাহ আলম নিজের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়া এক পত্র ও বহুমূল্য উপঢৌকনসহ কাপ্তেন সুইণ্টনকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন। আমি সম্রাটের পক্ষ হইতে মুন্সীরূপে কাপ্তেনের সহকারী হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। ইংলণ্ডে যাওয়ার পাথেয়স্বরূপ রাজকোষ হইতে সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রী নবাব মনিরউদ্দৌলা আমাকে ৪০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার পথে সুইণ্টনের নিকট শুনিলাম যে, যে উপহার-দ্রব্য ও পত্র লইয়া আমাদের যাইবার কথা, তাহা আদৌ আমাদের সঙ্গে আইসে নাই, লর্ড ক্লাইব সেগুলি রাখিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। যে জন্য যাইতেছি তাহাই যখন ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিল, তখন আমার ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু তখন সমুদ্রবক্ষে, জাহাজ হইতে আর ফিরিয়া আসিবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হইয়াই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডে চলিলাম। এখানে পৌঁছিয়া ক্লাইবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 'আমি ইংলণ্ডে যাওয়ার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণ ঢাকা ও চট্টগ্রামের লস্কর ব্যতীত কোন শিক্ষিত বা ভদ্র বাঙ্গালী দেখেন নাই। সুতরাং সেখানে গিয়া আমি একটী দর্শনীয় বস্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু, যাউক সে কথা। কিছুদিন পরে ক্লাইব ইংলণ্ডে আসিলেন, কিন্তু সম্রাটের পত্র বা উপঢৌকনের কথা একেবারেই গোপন করিয়া ফেলিলেন। আমি যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম, তত দিন সুইণ্টন ও তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু বান্ধব আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে ইংলণ্ডে থাকিয়া তাঁহাদিগকে পার্শি ভাষা শিক্ষা

দিবার জন্ত উচ্চ বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা আমাকে ইংরাজ-বালিকা বিবাহ করিবার জন্তও অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রস্তাবেই আমি সম্মত হই নাই। 'অবশেষে কলিকাতা কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকেঞ্জির সাহায্যে জাহাজের টিকেট সংগ্রহ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলাম। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর চুপচাপ করিয়া ছিলাম। পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল জন্ রাফটন্ (Colonel John Wroughten)এর সহিত পুণায় ও সাতারায় যাই।' সামউদ্দীনের জীবনের আর কোনও কাহিনী 'শিগারফ্ নামা বিলায়তে' নাই। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ কবিতায় ত্রিপদী ছন্দে 'জীবন-প্রবাহ বেয়ে কোথা চলে যায়!'—ইত্যাকার প্রশ্ন করিয়াছেন।—উত্তর—অনধিকারচর্চ্চায়। শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী 'সরস্বতী' প্রবন্ধে প্রমাণ সহ বৈদিক সরস্বতীর পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের 'আগমনী'র সূতিকাগারে বিসর্জ্জন হইলে কোনও ক্ষতি হইত না। 'প্রতিভা'র পুরাতন লেখকগণ কি হাল ছাড়িয়া দিলেন?

উদ্বোধন। চৈত্র।—শ্রীস্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' এবার 'ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানে'র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর তখন অসুস্থ। কালীপূজার দিন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আদেশে সংগৃহীত কালীপূজার উপকরণ দিয়া, 'জয় মা' বলিয়া, ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। পরে অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।—ইহাই বোধ হয় ঠাকুরকে দেবতাবোধে অর্চ্চনা করিবার প্রথম সূচনা।—বিশ্বাসের বস্তু, বিচারের নয়। নিবেদিতার 'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'টলষ্টয়ের আদর্শ' সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ-স্মরণে' উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বরের ফ্যানা এত অধিক যে, বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা চটকে অভিনয়ের মত। সোজা কথা ও সোজা পথ যেন সাহিত্যে বর্জ্জনীয়! বড় বড় কথায়, কাব্যির ছটায়, সমাসের ঘটায় একটা প্রচণ্ড, শুষ্কগন্ধ, শালপাতাবাহী, বাক্যের ঘূর্ণীবায়ুর সৃষ্টিই যেন সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য, এবং শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শনই যেন দার্শনিকতার চরম লক্ষ্য! সোজা কথাও তাহার দোষে বোঝা যায় না। যথা,—'এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার দিক।' ইহাতে অন্বয় পর্য্যন্ত নাই। সমস্তটা পড়িয়া দিশেহারা হইতে হয়, অথচ কোনও একটা নিশ্চিত ধারণা হয় না। রাধাকমল বিবেকানন্দকে উপলক্ষ করিয়া আপনার চিন্তার 'জাঁক' ও ভাবুকতার 'চমক' দেখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং আসল উদ্দেশ্যটি ঘূর্ণবিমোহন সাহিত্যিক কসরতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। স্বামী শ্রীঅমৃতানন্দের 'অজ্ঞান বা মায়া' সুলিখিত সন্দর্ভ। স্বামী শ্রীবাসুদেবানন্দের 'ভারতীয় শিক্ষা' চৈত্রের 'উদ্বোধনে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষের বিশেষত্বহীন 'বাণী-আহ্বান' 'উদ্বোধনে'র যোগ্য নহে। যাঁহারা কামিনী-কাঞ্চনের মায়া কাটাইয়াছেন, তাঁহারাও কাব্যির মায়ায় মুগ্ধ-বদ্ধ!

খ্রীষ্ট যজ্ঞ।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়, খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা বিদ্রূপ প্রচলিত আছে।

এই দেবতা খাওয়ার কথা আমি তুলিয়াছি। Eucharistic Sacrifice উপলক্ষে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয়, উহা খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত—উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়। এতদ্দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়; খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট হইয়া যায়; মানুষ দেবতা হইয়া যায়। আপনারা হাসিবেন ও বলিবেন, একাত্মতা সম্পাদনের এমন সহজ উপায় আর নাই; চিবাইয়া আত্মসাৎ করার মত একাত্মতা পাইবার উপায় আর নাই।

হাসিলে চলিবে না; মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা দেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের এই উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নহে। দেবতাকে আত্মস্থ করিবার এমনই একটা উপায় বহু দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক জন মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed."

আপনারা এই totemএর কথা শুনিয়াছেন। বহু অসভ্য জাতি আপনাকে কোন না কোন জন্তুর বংশধর বলিয়া মনে করে; সেই জন্তুকে আপনার জ্ঞাতি মনে করে; তাহার পূজা করে, এমন কি আচারে ব্যবহারে সেই জন্তুর অনুকরণ করে। সেই জন্তুটার নাম টোটেম; জন্তু না হইয়া গাছপালা বা অন্য কিছু টোটেম হইতে পারে। পুরাণে বর্ণিত নাগ জাতির,

পক্ষিজাতির কথা আপনাদের মনে পড়িবে; বাসুকি, তক্ষক ইত্যাদি নাগের কথা মনে পড়িবে; সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি পাখীর কথা মনে পড়িবে; বালী, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরের, জাম্ববান্ প্রভৃতি ভালুকের কথা মনে পড়িবে। বংশ প্রতিষ্ঠা যে পশু হইতে, বংশধরগণের পূজা পাওয়া সেই পশুর পক্ষে সহজ; পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপে বহু স্থলে পশু দেবতা হইয়া গিয়াছে। পশু এইরূপে দেবত্ব পায়, আবার অন্য দিকে মানুষ ও দেবতা জাতি সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া যায়। ঐ পণ্ডিত বলিতেছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান একটা sacramental meal মাত্র; যজ্ঞের পর যাবতীয় লোকে যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাতে তাহারা দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। পশুবধটা যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান নহে; সকলে মিলিয়া পশুমাংস ভক্ষণটাই প্রধান অনুষ্ঠান—"The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentably confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers."

যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ কালের পণ্ডিতদের এই একটা থিয়োরি—এই থিয়োরির সমর্থনের জন্য বহু দেশ হইতে তাঁহারা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন; চীন হইতে পেরু পর্যান্ত বেড়াইয়াছেন। মতভেদেরও অন্ত নাই। এই টোটেম সম্বন্ধেই কোন পণ্ডিত বলেন, অসভ্য জাতি মাত্রেই টোটেম মানে; এ কালে যাহারা খুব সভ্য, তাহাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষেরাও এক কালে টোটেম মানিত। অন্য পণ্ডিতে টোটেমের প্রসার সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার বলিতেছেন,—"We may say broadly that totemism is practised by many savage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark brown to red. With the somewhat doubtful exception of a few mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic." অর্থাৎ কালা, পিঙ্গলা ও রাঙা মানুষে টোটেম মানে, ধলা ও হলদে মানুষে মানে না। টোটেমের কথা এখন থাক; দেবতা পাওয়ার দৃষ্টান্ত দুই একটা আলোচনা করিব।

মেক্সিকোতে এক কালে নরযজ্ঞ হইত। উহাদের প্রাচীন দেবতাদের নাম উচ্চারণ ভীষণ ব্যাপার। তাহাদের একটি দেবতার নাম ছিল—তেজকাৎলি পোকাস বা ঐরূপ একটা কিছু। বড় লোকের ছেলে ধরিয়া সেই দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইত। কিছুকাল ধরিয়া বেচারাকে দেবতা বলিয়া মান্য করা হইত; সে একাধারে মানুষ ও দেবতা হইত; অবশেষে তাহাকে বধ করিয়া তার মাংস সকলে বাঁটিয়া খাইত। মেক্সিকোতে হুইজি-পুজলি নামে আর একটি দেবতা ছিল; তাহার ময়দার মূর্ত্তি গড়িয়া সকলে খাইত; মনে করিত, দেবতার মাংস খাওয়া হইতেছে। মিশর দেশের প্রধান দেবতা অসিরিসের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। পশু মধ্যে বৃষ অসিরিসের পার্থিব মূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইত। আমাদের গাভী যেমন ভগবতী, মিশর দেশে বৃষ সেইরূপ ভগবান্ ছিলেন। তবে মিশর দেশে এই দেবতাটিকে বধ করিয়া তাহার মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। Encyclopædia of Religion and Ethics এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on the God." গ্রীকদের মধ্যে, রোমানদের মধ্যে এইরূপ দেবতা খাওয়া প্রথা চলিত ছিল কি না, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটিয়াছে। বাদানুবাদের হেতু আছে—কেন না, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা জোরের সহিত বলিতে চাহেন যে, এই দেবতা খাওয়া ব্যাপারটা আমাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান; আর কোন ধর্ম্মে দেবতা খাওয়া নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, উহা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। কাজেই দুই দলে গণ্ডগোল বাধিয়া যায়; সেই গণ্ডগোলের অন্ত হয় না। দেবতার উদ্দেশে পশু বধ, এবং সেই পশুর মাংস ভক্ষণ বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেই পশুটা দেবতা কি না, সেই পশুর মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন কি না, উহার মধ্যে দেবতার real presence আছে কি না, সেই পশু খাইলে দেবতাকে খাওয়া হয় কি না, দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া দেবতার সহিত একতাপ্রাপ্তি ঘটে কি না, ইহা লইয়াই তর্ক উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলিতে চাহেন, এইরূপে দেবত্ব লাভের প্রার্থনা করি, কেবল আমরা। অন্যে কেবল পশু মাংস খায়—উদর পূরণের জন্য; বড় জোর দেবতার প্রসাদ পাইয়া নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে মাত্র। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটা গূঢ় রহস্য,

একটা mystery; অন্য জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ইহার অনুরূপ কিছু থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরা বলিবেন, উহা শয়তানের কারসাজি।

আজি কালি Mithraism লইয়া খুব আলোচনা হইতেছে। এই মিথ্র দেবতা প্রাচীন পারসীদিগের খুব প্রাচীন দেবতা; বেদপন্থীদের প্রাচীন দেবতা মিত্রের সহিত ইনি অভিন্ন। বেদে যিনি মিত্র, আবেস্তা শাস্ত্রে তিনিই মিথ্র। আমি ইহাকে মিত্রই বলিব। বেদে ইনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম; ঋগ্বেদ সংহিতায় ইহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই বরুণ দেবতার চিরসহচররূপে দেখিতে পাওয়া যায়;—মিত্র এবং বরুণ যেন এক জোড়া দেবতা। ভট্টিকাব্যের "ইতঃ স্ম মিত্রাবরুণৌ কিমেতৌ" এই শ্লোকটি মনে করুন। বনবাসী রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া লোকে বলাবলি করিত, এ কি, মিত্র এবং বরুণ কি স্বর্গ হইতে নামিয়া বনে বেড়াইতেছেন? সোমযজ্ঞের প্রাতঃসবনে একটা সোমাহুতি মিত্র ও বরুণ এই জোড়া দেবতাকেই দেওয়া হইত, এ কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহারা মাদকপ্রিয় ছিলেন না; মাদকতা নাশের জন্য তাঁহাদের সোমরসে দধি মিশাইতে হইত। আমরা বরুণকে বরং স্মরণে রাখিয়াছি; তিনি এখন জলাধিপতি ও পশ্চিম দিকের অধিপতি; কিন্তু মিত্রকে আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে মিত্র এবং বরুণের স্থান আরও উচ্চে—বরুণ স্বয়ং অহুর মজ্দ্—অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; মিত্র তাঁহার সহচর, মর্য্যাদায় প্রায় বরুণের সমান। মিত্রদেবের মর্য্যাদা পারসী সমাজে ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি বরুণদেবের পুত্র ও চিরসহচর; পতিত মানবের প্রতি তিনি করুণাময়—মিত্র নামেই তাঁহার পরিচয়;—তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা—Saviour, Redeemer, এবং Mediator হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের সহিত মিত্রদেবতার আপনারা তুলনা করিবেন।

এই মিত্র দেবতার পূজা পারসী সমাজের সীমা ছাড়াইয়া রোম সাম্রাজ্য মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ কাল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের অধ্যাপক Groten Christian Eucharist সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিত্র পূজার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then westward through Gaul across the channel into the land of the Britons. It followed the

Roman army and through the missionary zeal of Roman officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led some modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism". লেখক খ্রীষ্টীয় Divinity শাস্ত্রের অধ্যাপক; তিনি বলিতেছেন, "mistakenly"; কিন্তু অনেক পণ্ডিতে জোরের সহিত বলিতে চাহেন, যে রোম সাম্রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্ট পূজার তুলনায় মিত্র পূজার প্রসার প্রতিপত্তি অধিক ছিল; সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনও প্রথমে মিত্র পূজার পক্ষপাতী ছিলেন; পরে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটেরা আইনের জোরে, গায়ের জোরে, মিত্র পূজা বন্ধ করিয়া দেন। মিত্র পূজা বন্ধ করিয়া দেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মিত্র পূজার বহু অনুষ্ঠান, বহু তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; নতুবা জনসাধারণ মিত্রকে ছাড়িয়া খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিত না।

এই মিত্র পূজায় খ্রীষ্টানদের eucharistic অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে ঋত্বিকেরা রুটি ও সোমরস উৎসর্গ করিতেন। মিত্র পূজার প্রতিপত্তির সময়ে সোমরস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার বদলে আঙ্গুরের রস জলে মিশাইয়া দেওয়া হইত। এই দ্রাক্ষারসই ফেনাইলে মদ হয়। "They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion."

মিত্র পূজায় এই খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান দেখিয়া সেকালের খ্রীষ্টান ফাদারেরা চটিয়া আগুন হইতেন। তাঁহাদের দুই এক জনের কথা শুনুন। জষ্টিন মার্টার বলিতেছেন, "The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated." টার্টুলিয়ান বলিতেছেন, "The devil, by the mysteries of his idol, imitates even the main parts of the divine mysteries. Mithra even celebrates the oblation of bread."

যীশুখ্রীষ্ট কথায় কথায় আপনার রক্তমাংসকে খাদ্যের সহিত, অন্নের সহিত, তুলনা করিতেন; এবং সেই অন্ন যে অমৃতস্বরূপ, তাহাও ঘুরাইয়া বলিতেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অন্ন-ব্রহ্মের কথা আপনাদের স্মরণে আসিবে। খ্রীষ্টের উক্তি—I am the bread of life—আমি প্রাণের অন্নস্বরূপ। He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him—যে আমার মাংস ভক্ষণ করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাতে অবস্থিত হই—উভয়ের একতা সম্পাদিত হয়। Except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.—যে এই মানব-সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে নাই বা রক্ত পান করে নাই, সে মৃত। খ্রীষ্ট এখানে আপনাকে মানবরূপী,—জীবরূপী—বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পুনশ্চ "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life."—যে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, আমার রক্ত পান করিয়াছে, সে অমরতা পাইয়াছে।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। খ্রীষ্টানেরা যে রুটি আর মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা খ্রীষ্টের মাংস আর রক্ত; উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়; খ্রীষ্ট তাঁহাদের দেবতা; জনকেশ্বরে আর তনয়েশ্বরে কোন ভেদ নাই; উভয়েই এক আত্মা। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, ইহা আমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান; অন্য কোন সমাজে যদি উহার অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাকে, তাহা শয়তানের কারসাজি—diabolical parody. প্রশ্ন উঠে, আমাদের বেদপন্থী সমাজে ঐরূপ অনুষ্ঠান ছিল কি না? আবেস্তাপন্থী সমাজে নিশ্চয় ছিল; বেদপন্থী সমাজে ছিল কি না?

এই আলোচনার পূর্ব্বে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। আপনারা মনে করিবেন না, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজের মধ্যেও ছিল, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া আমি বৈদিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি; ইহাতে আমাদেরও গৌরব বাড়িবে। সেরূপ দুরভিসন্ধি আমার কিছুই নাই। তবে আমি এখানে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান আমি কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। সেটা না দেখাইলে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। সেই সাদৃশ্য কোথা হইতে

আসিল, কিরূপে ঘটিল, আপনারা তাহার বিচার করিবেন। আমি এই সাদৃশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত, আর সোমরস দেওয়া হইত। রুটিটা পশুমাংসেরই বদলে দেওয়া হইত; সেই পশুমাংসে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে। রক্ত দেওয়া বেদপন্থীর পক্ষে নিষিদ্ধ; কেন না বেদপন্থীর দেবতা রক্ত খাইতেন না; রক্ত রাক্ষসের প্রিয়। খ্রীষ্টের রক্ত অমরত্ব দিতে পারে; কিন্তু আমাদের সোমরস রক্ত নহে; উহা একবারে অমৃত। উহা পান করিলে অমৃত হওয়া যায়—দেবত্ব পাওয়া যায়। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি বলিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমি সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি; আমি জ্যোতি লাভ করিয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি। এই পুরোডাশ আর সোমরস দেবতাকে দিতে হইত, আর ঋত্বিকেরা যজমান সহিত ইহা ভক্ষণ করিতেন। সোমরস পান ত অমৃত পান; পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এবং খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যের সহিত ইহার কোন মিল আছে কি না, তাহাও বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানটার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক।

খ্রীষ্টজন্মের পর শওয়া তিন শ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমস্ত রোমসাম্রাজ্যে খ্রীষ্ট পূজা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এখনও মিত্র পূজাকে ঠেলিয়া উঠিতে পারে নাই। খ্রীষ্টানেরা সমস্ত সাম্রাজ্যকে কতকগুলি এলাকায় ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; এক এক এলাকা এক এক বিশপের অধীন। রোমের সম্রাট্ কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন এতদিন 'সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান' ছিলেন; তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় মিত্রকে, অন্য পাল্লায় খ্রীষ্টকে, বসাইয়া তুলনা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। খ্রীষ্ট পূজা রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে তর্ক উঠিয়াছে, এই খ্রীষ্টটি কে? ঈশ্বরের সহিত ইঁহার সম্পর্ক কি? ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটে, কিন্তু পিতা পুত্রে সমান কি না? উভয়ে তুল্যমূল্য কি না? পুত্র ষোল আনা ঈশ্বর কি না? ষোল আনা ঈশ্বর হইলে একেশ্বরবাদ থাকে কোথায়? খ্রীষ্টীয় সমাজে ইহা লইয়া দলাদলি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন নাইসিয়া নগরে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিলেন—বহু পূর্ব্বে অশোক যেমন বৌদ্ধ সঙ্গীতি ডাকিয়াছিলেন সেইরূপ—নানা দেশ হইতে খ্রীষ্টান যাজকেরা আসিলেন; হাজার দুই যাজক আসিলেন, তার মধ্যে তিন শতাধিক বিশপ। রাজ-

প্রাসাদের বড় হলে তাঁহারা সারি দিয়া বসিলেন; হলের মাঝখানে উচ্চাসনে বাইবেল রক্ষিত হইল—রত্নখচিত purple robe পরিয়া স্বয়ং কাইসার সিংহাসনে বসিলেন;—আজি তিনি রোমের রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ—pontifex maximus. যাজকগণের ভোট লইয়া তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব মঞ্জুর করিবেন। এক দিকে Ariusএর দল; ইহাঁরা খ্রীষ্টকে ষোল আনা ঈশ্বর বলিতে নারাজ; অন্য দিকে Athanasiusএর দল; ইহাদের মতে খ্রীষ্ট ষোল আনা ঈশ্বর। আথানেসিয়সের জয় হইল। উপস্থিত যাজকগণের কোলাহলে এরায়সের দলের ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া গেল। রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা অনুমোদন করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কাইসারের আদেশ রোমসাম্রাজ্যে প্রচারিত হইল—রোমের কাইসার মানিয়া লইয়াছেন, খ্রীষ্ট পরিপূর্ণ ঈশ্বর; যে রোমান ইহা মানিবে না, সে রাষ্ট্রের শত্রু। এরায়সের রচিত পুঁথিপত্র চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়ান হইল; তাঁহার দলের যে দুই জন বিশপ স্বীকারপত্রে সহী দেন নাই, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত জন কয়েক ইউনিটেরিয়ান ছাড়া সমস্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। যে ইহাতে সংশয় করে, সে খ্রীষ্টান নহে।

নাইসিয়া নগরে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় সমাজের এই স্বীকারোক্তির নাম Nicene Creed; সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহা মানিয়া থাকেন। আপনারা জানেন, ইংরেজেরা রোমের বিশপের এলাকার বাহিরে; ইহাঁরা পোপের অধীনতা কাটিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের আমলে Church of England এর ধর্ম্ম সম্পর্কে মতামত বাঁধা যায়। ৩৯টি ধারায় তাহা বিধিবদ্ধ। উহাই ইংরেজের চার্চ্চের বিখ্যাত Thirty-nine Articles, বিশপেরা এই ধারাগুলি সঙ্কলন করেন; এবং রাণী এলিজাবেথ পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হইলে উহা অনুমোদন করেন। মনে রাখিবেন, ইংরেজদের রাজাও ইংরেজের দেশে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত—Defender of the Faith; তবে ইংরেজদের রাজা প্রজাপ্রতিনিধিদের সম্মতি না লইয়া কিছু করিতে পারেন না। তাই এই ধারাগুলি পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর করিয়া লওয়া দরকার হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টে ভোটের দ্বারা জনকেশ্বরের সহিত তনয়েশ্বরের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, এবং আজি পর্য্যন্ত সেই সম্পর্ক বাহাল আছে।

Nicene Creed স্বীকার করিতেছেন—We believe in one God,

the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Word of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only begotten Son, begotten not made, of the same essence with the Father, the first-born of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.

Church of England মানিয়া লইতেছেন—There is but one living and true God, everlasting, without body parts or passions, of infinite power wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance power and eternity, the Father, the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the Godhead and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, whereof one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.

আপনারা দেখিলেন, ইংলিশ চর্চ্চ অনেকগুলি বিশেষণ স্পষ্টভাবে দিয়াছেন, যাহা Nicene Creedএ নাই, বা অস্পষ্টভাবে আছে। Nicene Creed প্রচারিত হইবার পর উহা আরও পল্লবিত হইয়াছিল; এইরূপ পল্লবিত আর একটা creedএর নাম Athanasian Creed; Church of England এই creedটিও মানিয়া লইয়াছেন; কাজেই উহা এতটা স্পষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক বিশেষণের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অখ্রীষ্টানের পক্ষে সেই তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। আমি যথাশক্তি আমাদের ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিব। ইংলিশ চর্চ্চ বলিতেছেন, There is but one God—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তিনিই God the Father—যো নঃ পিতা জনিতা;—তিনি living God তিনি প্রাণস্বরূপ, স উ প্রাণস্য

প্রাণঃ; তিনি everlasting—অজ বা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত; without body—অমূর্ত্ত বা মূর্ত্তিরহিত;—without parts, কলাহীন বা নিষ্কল, নিরবয়ব, অখণ্ড; without passions—শুদ্ধ, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। এই বিশেষণগুলি একত্র করিলে আমাদের ভাষাতে পাওয়া যায়—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সো বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" —এই বাক্যের প্রায় সকল বিশেষণই খ্রীষ্টানের ভাষায় আছে। নিষ্ক্রিয় বিশেষণটা নাই। খ্রীষ্টানের ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে। দিব্য বা জ্যোতির্ম্ময় বিশেষণটাও এখানে নাই, কিন্তু Nicene Creed মধ্যে আছে। বাহ্যাভ্যন্তরঃ বা সর্ব্বব্যাপী—এটাও নাই। খ্রীষ্টান ইহাতে আপত্তি করিবেন কি না জানি না। তাহার পর বলিতেছেন "of infinite power"—সর্ব্বশক্তি; "of infinite wisdom"—সর্ব্বজ্ঞ—এই দুইটি বিশেষণ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপরিচিত। তার পরে বিশেষণ—of infinite goodness—এখানে goodnessএর অর্থ kindness—it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures—ইহার নামান্তর Grace কৃপা বা করুণা। অদ্বয়বাদী তাঁহার পরব্রহ্মে এই বিশেষণ অর্পণে কুণ্ঠিত হইতে পারেন; কিন্তু রামানুজ স্বামী তাঁহার ব্রহ্মে, তাঁহার বাসুদেবে, অকুতোভয়ে এই বিশেষণ আরোপ করিয়াছেন—"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" "জগতামুপকারায় চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য" তিনি "অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-মহোদধি।" তৎপরে বলা হইতেছে, তিনি maker and preserver of all things, visible and invisible তিনি যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থিতিবিধাতা; অর্থাৎ তিনি ভূতযোনি—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।

জনকেশ্বরের বিশেষণগুলি আপনারা শুনিলেন। ঈশ্বরের সহিত খ্রীষ্টের সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য খ্রীষ্টান সমাজে অনেক গণ্ডগোল হইয়াছে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব পূর্ণ না আংশিক, ইহা লইয়াই বিরোধ। Nicene Creed যে সম্পর্ক চিরকালের জন্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বিখ্যাত Trinity তত্ত্ব, বা ত্রিপুরুষ তত্ত্ব। প্রথম পুরুষ জনকেশ্বর, দ্বিতীয় পুরুষ তনয়েশ্বর, তৃতীয় পুরুষ Holy Spirit. Trinity তত্ত্ব মতে ঈশ্বর এক হইয়াও এই তিন পুরুষ রূপে বিদ্যমান; ইহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ ঈশ্বর, অথচ ঈশ্বর তিন জন নহেন, এক জন। "The three Persons are of the same essence, power and

eternity". Each is God; in each dwells the whole fullness of the godhead. প্রত্যেকেই নিত্য, প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তিমান্। এইখানে এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সমান; আর এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সদৃশ। এক দলের মতে সম্পর্কের নাম homo-ousia—সমাত্মকতা, অন্য দলের মতে নাম homoi-ousia সদৃশাত্মকতা। পিতা ও পুত্র উভয়ের একই essence, substance বা বস্তু। অথচ উভয়ের মধ্যে একটা উপাধিগত ভেদ আছে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর হইতে জাত; সকলের অগ্রে জাত; begotten of the Father, first begotten of the Father. পিতা ঈশ্বর যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা—maker of all things; কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি maker নহেন; সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি begetter মাত্র, জন্মদাতা মাত্র। ইহার মানে এই যে, যাবতীয় ভূতের তিনি নিমিত্ত কারণ মাত্র, কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি নিমিত্ত কারণও বটে, উপাদান কারণও বটে। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, সে মাটি দিয়া ঘট গড়ে; কিন্তু পিতা পুত্রের পক্ষে নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ; তিনি আপনার উপাদান হইতেই পুত্রকে জন্ম দেন।

পিতা পুত্রের জন্ম দিয়াছেন, সকলের অগ্রে জন্ম দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কবে কোন্ কালে জন্ম দিয়াছেন? খ্রীষ্টান উত্তরে বলেন, before all ages অর্থাৎ যখন কাল পর্য্যন্ত ছিল না, সেই কালে। ইহার অর্থ পুত্র পিতার মতই অনাদি ও নিত্য। পিতা যে তারিখে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সেই তারিখের হিসাব দেন, কিন্তু পুত্রের জন্মের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলে তিনি কালাতিগ, কালাতীত, beyond time; যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সেই কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন।

এইখানে পিতা পুত্রে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ। পিতা অনাদি ও নিত্য; পুত্রও অনাদি নিত্য, অথচ পুত্র পিতা হইতে জাত। পিতার যত কিছু উপাধি বা বিশেষণ, সমুদয়ই পুত্রে বিদ্যমান; একটা অতিরিক্ত বিশেষণ পুত্রে আছে,—তিনি পিতা হইতে জাত।

খ্রীষ্টের এই বিশেষণটি দেখিয়া আপনাদের হিরণ্যগর্ভকে মনে পড়িবে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—হিরণ্যগর্ভ জাত হইয়াছিলেন; অথচ তিনি সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি অগ্রজন্মা ঈশ্বর। জন্মমাত্রেই তিনি ভূত সকলের পতি হইয়াছিলেন, ভূতপতি আর

প্রজাপতি যদি এক অর্থে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজাপতিও অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমাদের শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই প্রজাপতিই ভূতসকলের স্রষ্টা—তিনি কামনা করিলেন, আর ভূতসকলের ও প্রজাসকলের সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও খ্রীষ্টান বলেন, তিনি অগ্রজন্মা পুত্র এবং তাঁহার দ্বারাই পিতা ঈশ্বর ভূতসকল সৃষ্ট করিয়াছিলেন—through Him all things were made; খ্রীষ্টের জন্মেই সৃষ্টির আরম্ভ—His everlasting birth is the first step towards creation, and the universe of things owes its origin to Him হিরণ্যগর্ভ যেমন ভূত সকলের পতি, খ্রীষ্টানেরাও খ্রীষ্টকে সেইরূপ ভূত সকলের পতি বলিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের চলিত বিশেষণ our Lord; আর একটা বিশেষণ King,—King of Kings or Lord of Lords; far above all authority and power and every name which is named.

আপনারা দেখিলেন, পিতা ও পুত্র সর্ব্বতোভাবে ও তুল্যরূপে পরিপূর্ণ ঈশ্বর; তবে উভয়ের মধ্যে উপাধিভেদ আছে। উভয়েই অনাদি ও নিত্য হইলেও পিতা জন্মরহিত বা অজ; পুত্র পিতা হইতে জাত এবং অগ্রে জাত। এই ভেদ সত্ত্বেও অভেদ স্পষ্ট করিবার জন্য আরও কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগ হয়। পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছেন; কে কাহা হইতে জন্মিয়াছেন? উত্তরে বলা হয়, God from God—ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর জন্মিয়াছেন; very God from very God—পূর্ণ ঈশ্বর হইতে পূর্ণ ঈশ্বর জন্মিয়াছেন। অতঃপর বলা হয় Light from Light—পিতা জ্যোতিঃস্বরূপ, পুত্রও জ্যোতিঃস্বরূপ। Life from Life—পিতা প্রাণস্বরূপ, পুত্রও প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের সেই সূত্র তিনটি মনে করুন—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ", "প্রাণস্তথানুগমাৎ", "অতএব প্রাণঃ"। ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদের বাক্য অবলম্বনে এই সূত্র তিনটি। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"অথো যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু, সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু, অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু যদিদং বাব তদ্, যদিদং অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ"—যে জ্যোতিঃ দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বের পৃষ্ঠে, সর্ব্বলোকের পৃষ্ঠে দীপ্তিমান্, পুরুষের অন্তঃশরীরে যে জ্যোতিঃ দীপ্তিমান্, সেই পরজ্যোতিই এই জ্যোতিঃ। ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয়, কেন না, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভা দেয়, তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভান্বিত হয়। কৌষীতকি

বলিতেছেন, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব"—আমি প্রাণস্বরূপ ও প্রজ্ঞাস্বরূপ, আয়ুঃস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ; আমাকে উপাসনা কর। ছান্দোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "কতমা সা দেবতা" ? উত্তরে বলিতেছেন, "প্রাণ ইতি হোবাচ"—তিনি প্রাণ। এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আর হইতে পারে না।

এই খ্রীষ্টকে যেমন Son of God বলা যায়, তেমনি ইহাঁকে Son of Man বলা হয়। Nicene Creed এই Son of Man সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতেছেন, Who for our salvation became flesh, and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. এইরূপে সংক্ষেপে খ্রীষ্টের মনুষ্য জীবনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য মানববিগ্রহ ধরিয়া মানবের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং মানবের জন্য প্রাণ দিয়া তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থান করেন, ও পিতার সমীপে উপস্থিত হন। এই জন্য তাঁহাকে Saviour বলা হয়। Saviour শব্দের অনুবাদ আপনারা শুনিতে চাহেন ? তারা-সার উপনিষদে ইহার অনুবাদ পাইবেন—অত্যন্ত পরিচিত ভাষায় অনুবাদ পাইবেন—Saviourএর অনুবাদ তারক ব্রহ্ম।

মানবরূপে বা জীবরূপে ঈশ্বরের অবতরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। যিনি ঈশ্বররূপে অমূর্ত্ত, জীবরূপে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেমন পরিপূর্ণ, তাঁহার জীবত্বও সেইরূপ পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের সহিত তিনি যেমন একাত্মা, জীবের সহিতও তিনি তেমনি একাত্মা। একাধারে তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। মনে করিবেন না, মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণেই তিনি জীবত্ব পাইলেন; তিনি অনাদি জীব। মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণের নাম Incarnation বা মানববিগ্রহধারণ; কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি জীব—কেন না "He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father." তিনি মানবজন্ম গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জীবরূপে পিতার সহিত যুক্ত ছিলেন। মর্ত্ত্যভূমি হইতে তিরোভাবের পরেও তিনি এই জীবত্ব ত্যাগ করেন নাই। এইরূপে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ জীবত্ব তাঁহাতে চিরতরে মিলিত হইয়া আছে। "Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided." এই পূর্ণ ঈশ্বরত্ব এবং পূর্ণ জীবত্বের সম্মিলনে একই Christ; ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহাতে একাধারে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। কখনও তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে নাই বা ঘটিবে না।

ইতর জীবের সহিত এই খ্রীষ্টের সম্পর্ক কিরূপ? জীবমাত্রই ঈশ্বরের পুত্রস্থানীয় হইয়াও পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত; জীবের অপরাধে উভয়ের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধের খ্রীষ্টানী নাম Sin—পাপ। অধ্যাপক ডয়সেন দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টান যেখানে বলেন পাপ, বেদপন্থী সেখানে বলেন অবিদ্যা। খ্রীষ্টান বলেন, এই অপরাধে জীব তাহার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল—এমন কি ঈশ্বরের সহিত জীবের একটা শক্রতা সম্পর্ক—enmity দাঁড়াইয়াছিল। পিতা করুণাময়—তিনি পুত্রগণকে কোলে টানিয়া লইতে চাহেন—নতুবা তাঁহার সোয়াস্তি নাই। জীবের পাপ এমন ভীষণ পাপ যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা মোচন করিতে পারে না; বেদপন্থী বলিবেন, "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পারং তারয়তি"—তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের অবিদ্যার পরপারে তারণ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। খ্রীষ্টান বলিতেছেন—Man's sin was so great that God only could pay it; therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute form of God. He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a *bondman* and appeared in the likeness of man. জীবের তারণার্থ খ্রীষ্ট স্বয়ং জীব সাজিলেন, যাবতীয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, গর্ভাবাস জন্ম মৃত্যু দুঃখ দৈন্য সমুদয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর; I and my Father are one—আমার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য; তথাপি তিনি আপনার সমুদয় ঐশ্বর্য্য হইতে আপনাকে রিক্ত করিয়া ক্ষুদ্র জীব হইলেন। তিনি বড় হইয়াও ছোট হইলেন; তিনি মুক্ত পুরুষ হইয়াও বদ্ধ জীব—bondman—সাজিলেন। এই বদ্ধ জীব বিশেষণটা আপনারা মনে রাখুন। ক্ষুদ্র জীব সাজিয়া তিনি দীন দরিদ্রের মধ্যে জন্মিলেন। তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার উপজীবিকা ছিল না; তাঁহার স্বজনেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল; তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন; রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিল; ইতর জনে তাঁহার অঙ্গে থুৎকার দিল; তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দিল; অপর শিষ্যেরা অন্তিমকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিল,—অবশেষে দুই চোরের মাঝে ক্রুসে চাপিয়া মরণযাতনা ভোগ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতর মানবের মত দারুণ যাতনা ও দারুণতর অপমান সহিয়া এই যে মরণ, ইহাই হইল খ্রীষ্টের আত্মদানরূপ মহাযজ্ঞ। তিনি পূর্ণ জীবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমুদয় মানবের তিনি প্রতিভূ ছিলেন; অতএব. সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে তিনি আপনাকে নরপশুরূপে এই পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিলেন। এ যজ্ঞে তিনিই পশু; মেষের মত তিনি যজ্ঞভূমিতে বধার্থ আনীত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে Lamb of God রূপে—ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট মেষরূপে—পরিচিত করিয়াছিলেন— বহু স্থলে তাঁহাকে মেষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জেহোবার উদ্দেশে মেষ দেওয়া হইত; তিনি সেই মেষপশুরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যজ্ঞিয় পশু। তিনি আপনাকে আপনি আহুতি দিয়াছিলেন—অন্য যাজকের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তিনি একাধারে ঋত্বিক্ এবং পশু,—Priest এবং Victim. সমস্ত মানব তাঁহার যজমান; তিনি তাহাদের ঋত্বিক্ সাজিয়া আপনাকেই পশুতে পরিণত করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। এই আত্মাহুতি কাহার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন—যে পিতা-ঈশ্বরের সহিত তিনি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মৃত্যুর পরে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন; মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই; মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া তিনি তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পিতা-ঈশ্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানবের সেই পুরোহিত মানব-যজমানের পক্ষ হইতে সেই আহুতি পিতার নিকট অদ্যাপি অর্পণ করিতেছেন—চিরকাল অর্পণ করিবেন। এই আহুতি দ্বারা জীবের পাপ মোচন হইল;—ঈশ্বরের ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা দূর হইল—জীব পুনরায় পিতার নিকট পুত্ররূপে গৃহীত হইল। উভয়ের মধ্যে atonement হইল; এই atonement অর্থে at-one-ment অর্থাৎ making at one. খ্রীষ্টানে বলিবেন, ইহা reconciliation; জীবেশ্বরের সন্ধিস্থাপন; বেদপন্থী বলিবেন, ইহা কেবল সন্ধিস্থাপন নহে, ইহা একাত্মতা স্থাপন। যজমান ইহাতে দেবতা হইল; জীব শিব হইল। মনে রাখিবেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই জীবের সহিত শিবের মিলন ঘটিল। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং ঈশ্বর, আহুতির দ্রব্য স্বয়ং ঈশ্বর, এবং উদ্দিষ্ট দেবতাও স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃতই ইহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্—ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হব্যকে ব্রহ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন।

বাইবেলের বর্ণনামতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া-

ছিলেন; লোকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সমাধি শূন্য; কোন কোন ভক্তকে তিনি এই অবসরে সশরীরে দেখাও দিয়াছিলেন। তার পরে তিনি তিরোধান করেন—স্বর্গে আরোহণ করেন। এই ঘটনার নাম Resurrection বা পুনর্জন্মলাভ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই ঘটনা টিকে না—এই ঘটনার পক্ষে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয়, কোন ঐতিহাসিক তাহাতে তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে—এই ঘটনাকে অমূলক বলিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হয়। এই ঘটনাতে প্রতিপন্ন হইল যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয়। যে মৃত্যু জীবের পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই মৃত্যুকে তিনি জয় করিলেন; যিনি অমর, তিনি ত অমর রহিলেন; মরণধর্ম্মী জীবকেও তিনি অমরতা দান করিলেন। ঈশ্বরে যে অমরতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান, ইতর জীবও তাহাতে অধিকার পাইল। এই অমরতার প্রাপ্তি খ্রীষ্টানের salvation বা মুক্তি। এতদ্দ্বারা জীব ঈশ্বরের সমীপস্থ হইল। আমাদের ভাষায় সালোক্য বা সামীপ্য লাভ ঘটিল। ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ বা একবারে ঈশ্বরত্ব লাভ, খ্রীষ্টানের পক্ষে হয় ত বাঞ্ছনীয় নহে;—আমাদের দেশে ভক্তিপথের পথিকেরাও যেমন সাযুজ্য চাহেন না, কতকটা সেইরূপ। অমরতাপ্রার্থী খ্রীষ্টানেরা স্বর্গে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে চান,—একবারে সশরীরে স্বর্গে যাইতে চান। কোনরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে স্বর্গে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। মর্ত্ত্যভূমির জীর্ণবাস ত্যাগ করিয়া বিদেহ মুক্তিতে তাঁহাদের পোষায় না—তাঁহারা একবারে কলার নেকটাই সমেত সশরীরে ঈশ্বরের সালোক্য বা সামীপ্য প্রার্থনা করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথা আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকা মধ্যেও আছে—যযাতি, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির সশরীরে স্বর্গ গমন চেষ্টার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যুধিষ্ঠির প্রায় নির্ব্বিঘ্নে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। বেদপন্থীর এই স্বর্গ কিন্তু নিকৃষ্ট লোক; ইহা ব্রহ্মলোক নহে। বেদের ভাষায় ইহা দেবগণের প্রিয় ধাম; যিনি মোক্ষার্থী তিনি ইহা প্রার্থনা করেন না। যুধিষ্ঠির সশরীরে এই স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম পরিহার সম্ভব নহে। যীশুখৃষ্টও ক্রুসে মরণের পরে এবং সমাধি হইতে উত্থানের পূর্ব্বে একবার অধোভুবনে বা নরকে গিয়াছিলেন—Athanasian Creed ইহা স্পষ্টবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন। সত্যই তিনি নরক দর্শনে গিয়াছিলেন—নতুবা তাঁহার জীবত্ব পরিপূর্ণ হইত না। ক্ষুদ্র

জীবকে যাহা কিছু সহিতে হয়, ঈশ্বরও জীব সাজিয়া সে সমস্তই সহিয়াছিলেন।

খ্রীষ্ট দেবতাটি কে,এখনও তাহা বুঝিতে বাকি আছে কি? খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে খ্রীষ্টের যে সকল বিশেষণ আরোপ করা হয়, আমি যথাশক্তি তাহা এ দেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম—অনুবাদ দেখিয়া আপনারা হয় ত চমকিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিলেন। ফলে আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বলিতে চাহি, আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে জীব বলা হয়, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক। আমাদের দেশে এই সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া যেমন অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় সমাজেও সেই সম্পর্ক বুঝিতে গিয়া সেইরূপ নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ সেই বাদ প্রতিবাদের আলোড়নে কম্পিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টীয় সমাজ শেষ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা একবারে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ না হইলেও অদ্বয়বাদকে ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। খ্রীষ্টান মানিয়া লইয়াছেন, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি সঙ্কল্প মাত্রে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন—God said,Let there be light, and there was light ইত্যাদি। বেদান্তেও 'স ঐক্ষত' 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী এই সকল আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "সঙ্কল্পেনাসৃজৎ লোকান্"—সঙ্কল্প দ্বারাই তিনি লোকসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলে বলে, He made man after his own image—আমরাও বলি, ঈশ্বরই জীব হইয়াছেন; উভয়ের সম্পর্ক বিম্ব-প্রতিবিম্বের সম্পর্কের মত। Image শব্দের বাঙ্গলাই প্রতিবিম্ব। খ্রীষ্ট এক দিকে Son of God হইয়াও স্বয়ং true God, very God, perfect God বা মহেশ্বর বা পরমেশ্বর; অন্য দিকে তেমনি তিনি Son of Man হইয়াও perfect Man, sinless Man বা পুরুষোত্তম। উভয়েই অনাদি নিত্য, উভয়েই সর্ব্বেশ্বর, উভয়েরই ঈশ্বরত্ব পূর্ণ। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন পুরুষ হইলেও এবং উভয়ে সমানভাবে ঈশ্বর হইলেও ঈশ্বর এক বই দুই নহে। There is but one God, but not two Gods. খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশিয়া রহিয়াছে, খ্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলে? খ্রীষ্টীয় সমাজে

নানা বাদ প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়াছি। Arius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন পুত্র, তখন তিনি পিতার পরে জন্মিয়াছেন; তিনি অনাদি নিত্য হইতে পারেন না। Apollonarius বলিলেন, খ্রীষ্ট একাকী এক জন পুরুষ; তিনি হয় পুরাপুরি ঈশ্বর না হয় পুরাপুরি জীব; একা তিনি উভয় হইবেন কিরূপে? বৃহদারণ্যকে তিনি উত্তর পাইতে পারিতেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"; উনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ; "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" পূর্ণ হইতেই পূর্ণ বাহির হইয়া থাকে—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ; Nesturius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন ঈশ্বর, অপিচ খ্রীষ্ট যখন জীব, তখন তিনি এক জন পুরুষ নহেন; এক খ্রীষ্টের মধ্যে দুই জন পুরুষ বিদ্যমান। Eutychius বলিলেন, খ্রীষ্ট এক পুরুষ; তিনি হয় ঈশ্বর, নয় জীব; একাধারে উভয় হইতে পারেন না। খ্রীষ্টীয় সমাজ পরিশেষে এ সকল মতই ত্যাগ করিল—বলিল, না, খ্রীষ্ট একই পুরুষ; তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং জীব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব—জীবেশ্বরে কোন ভেদ নাই। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলিব? ইহার পর যখন খ্রীষ্ট নিজ মুখে বলেন, আমি আর আমার পিতা অভিন্ন;—I and my Father are one.—তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনিই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব?

এই যে ঈশ্বর, যিনি অনাদি নিত্য কালাতীত, যিনি চিরমুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, bondman সাজিয়াছিলেন; তিনি বস্তুতঃ ভূমা হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন; আপনাকে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন—তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া দুঃখ তাপের অধীন হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খ্রীষ্টান বলেন, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তাঁহার বন্ধন একটা অভিনয় মাত্র।

আপনারা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহবাদের কথা শুনিয়াছেন। এই ভাগবত মত খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতে এই মতের সবিশেষ উল্লেখ আছে; মহাভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টজন্মের পরে মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ কথাটা আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই ভাগবত

মতের নাম চতুর্ব্যূহবাদ; রামানুজ স্বামী ইহাকে চাতুরাত্ম্য উপাসনা বলিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টসমাজের Trinity বা ত্রিব্যূহবাদের অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য যে, কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, এই গণ্ডগোলের কথা আপনা হইতেই উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলেন, একই ঈশ্বর ত্রিধা অবস্থিত; তিন পুরুষরূপে অবস্থিত—Father, Son এবং Holy Ghost; অথচ এই তিন পুরুষই সমানভাবে ঈশ্বর। তিন জনই সমানভাবে নিত্য ও শাশ্বত, co-eternal, অথচ পিতা পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন, beget করিয়াছেন, এবং Holy Ghost পিতা পুত্র উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—proceed করিয়াছেন। তর্ক উঠে যে, পুত্র যদি পিতা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়ে নিত্য—co-eternal—হন কিরূপে? উভয়ে সমান ও পূর্ণ ঈশ্বর হন কিরূপে? Arius ও তাঁহার অনুগামীরা এই তর্ক তুলিয়া পুত্রকে পিতা হইতে খাট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বৎসর ধরিয়া তজ্জন্য বিবাদ চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিন পুরুষেরই একাত্মতা ও পূর্ণতা স্বীকৃত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র মতে এক বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহরূপে অবস্থান করেন; ইঁহারা সকলেই পূর্ণ ঈশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ; অথচ এক জন অন্য জন হইতে জাত। কে কোথা হইতে জন্মিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে "পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে"। পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জন্মেন, এই সঙ্কর্ষণই জীব। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন জন্মেন, এই প্রদ্যুম্ন মন; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্মেন, এই অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধকে লইয়া আমাদের এখন প্রয়োজন নাই; বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের সম্পর্ক দেখুন। বাসুদেব পরব্রহ্ম, কিন্তু সঙ্কর্ষণ জীব। পরব্রহ্ম হইতে জীব জন্মিয়াছেন, অথচ সেই জীবও পরব্রহ্ম। রামানুজ স্পষ্ট বলিতেছেন, "সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি", এক জন জীব, অন্য জন ঈশ্বর, জীব ঈশ্বর হইতে জন্মিতেছেন, অথচ উভয়েই ব্রহ্ম, এই একটা মস্ত হেঁয়ালি। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে হেঁয়ালি উঠিয়াছিল, ঠিক্ সেই হেঁয়ালি। বেদবাক্য এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। বেদশাস্ত্র ও বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রায় একবাক্যে জীবকে নিত্য ও জন্মরহিত বলিয়া মানিয়াছেন। জীবের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "ন

জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজঃ অজরোঽমৃতোঽভয়ঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। বেদপন্থী রামানুজ এই সকল বেদবাক্য ও স্মৃতিবাক্য অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি বলিতেছেন, জীবরূপী সঙ্কর্ষণ যে নিত্য, সে বিষয়ে সংশয় করি না। বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি নিত্য। তবে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের যে উৎপত্তি বলা আছে, তাহা অচেতন ভূতোৎপত্তির মত উৎপত্তি নহে। "বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিত-সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে" বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম আশ্রিতবৎসল, তিনি আশ্রিতগণের আশ্রয় হইবার জন্যই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। রামানুজ পরম বৈষ্ণব; পাঞ্চরাত্র মতকে রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাগবতমতে অনুরাগ ছিল না। তিনি এক নিঃশ্বাসে ভাগবত মত উড়াইয়া দিলেন—বলিলেন, বেদমতে জীব নিত্য, এবং পাঞ্চরাত্র মতে জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন; যাহার উৎপত্তি আছে, সে নিত্য হইতে পারে না; অতএব পাঞ্চরাত্র মত বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। এরায়সও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য।

আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টানদের জনকেশ্বরের স্থলে বাসুদেবকে ও আর তনয়েশ্বরের স্থলে সঙ্কর্ষণকে বসাইলে পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রীষ্টীয় মতে কোন ভেদ থাকে না। জনকেশ্বর বাসুদেব স্বয়ং; তিনি আশ্রিতবৎসল; আশ্রিতগণের উদ্ধারের জন্যই তিনি পুত্র খ্রীষ্টকে জন্ম দিয়াছেন। তনয়েশ্বর সঙ্কর্ষণ স্বয়ং, তিনি বাসুদেব হইতে জাত, অথচ বাসুদেব হইতে অভিন্ন। তিনি আবার Son of man, Perfect Man, অতএব তিনিই জীব। জীব ঈশ্বর হইতে জাত, অথচ ঈশ্বরের মতই নিত্য।

খ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। খ্রীষ্টানের ভাষা দিলাম, অপিচ বেদপন্থীর ভাষায় তাহার অনুবাদ দিলাম। কিন্তু খ্রীষ্টের একটা বড় বিশেষণ সম্পর্কে এখনও কিছু বলি নাই। যাবতীয় খ্রীষ্টান একবাক্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিতেছেন—তিনি Word of God. Church of England ইহা মানিয়া লইয়াছেন—the Son which is the Word of the Father. এই বিশেষণটির মূল জোহন 'প্রচারিত সুসমাচার মধ্যে পাওয়া যায়—সেটা আপনারা জানেন; তথাপি আমি আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি। "In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word

was God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made." পুনরায় বলা হইতেছে, "And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth."

মিশনারিদের বাঙ্গালা অনুবাদ "আদিতে বাক্য ছিলেন" লইয়া আপনারা বিদ্রূপ করিয়াছেন; আমি Wordএর বাঙ্গালায় বাক্য বলিব না—আমি বলিব বাক্ বা শব্দ। অমনি আপনারা স্তব্ধ হইবেন। জোহনের অনুবাদে যদি আমি বলি "অগ্রে বাক্ ছিলেন অথবা শব্দ ছিলেন", অমনি আপনারা চমকিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন, এই খ্রীষ্ট তবে ত আর কেহ নহেন; ইনি আমাদের চিরপরিচিত সেই শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতা। বেদপন্থীর সাহিত্য শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ; জোহনের বাক্যে আপনাদের কোনরূপ হেঁয়ালি ঠেকিবে না। শব্দই ব্রহ্ম; শব্দ হইতে লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে; শব্দই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছে; এ সকল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত কথা। জোহনের সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; ইংরেজী Word শব্দের লাটিন অনুবাদ Verbum; গ্রীক অনুবাদ Logos. স্বর্গে তিনি অমূর্ত্ত Logos; মর্ত্ত্যভূমিতে তিনি বিগ্রহবান্ Logos—Word made flesh.—শব্দব্রহ্ম স্থূল দেহ লইয়া অবতীর্ণ। এই Logos নামের পিছনে পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক পণ্ডিত হীরাক্লিটসে এই Logosকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যাহাকে ঋত বলে, ঐ পণ্ডিত Logos শব্দে তাহাই বুঝিতেন; এই ঋত দ্বারা জগৎ ধৃত আছে, উত্তম্ভিত আছে, ইহাই সেই Cosmic Law, যদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ স্বস্থানে ধৃত আছে, গ্রহগণ আপন পথে চলিতেছে। বেদপন্থীর ভাষায় ইহা ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। বৌদ্ধেরাও ইহাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া ত্রিরত্নের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহার অন্য নাম Psyche বা Principle of Life স্টোয়িক-দের হাতে ইনি Reasonএ বা প্রজ্ঞায় পরিণত হইয়াছেন, যে প্রজ্ঞা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরাও কালে ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় বা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ইহুদীদের জমকাল আড্ডা ছিল। সেখানকার ইহুদীরা গ্রীক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহুদীদের একটা পুরাতন সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল; ঈশ্বর বলিলেন, জগৎ হউক, আর জগৎ হইল; এখানে ঈশ্বরের বাক্য হইতে বা শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই শব্দকে তাহারা Memra

বলিত। আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে ইহুদীদের এই Memra গ্রীকদের Logosএর সহিত মিশিয়া গেলেন। এই তত্ত্বের পরিণতি হইল, Philo নামক গ্রীক-ভাবাপন্ন ইহুদীর হাতে। শব্দের সহিত ধর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা মিশিয়া গেলেন; এবং জগতের কর্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব এই প্রজ্ঞাত্মা শব্দ-ব্রহ্মে আরোপিত হইল। Philoর ভাষায় এই শব্দ ঈশ্বর হইতে জাত, সকলের অগ্রে জাত; তিনি আদি জীব, ইতর জীব তাঁহার প্রতিবিম্বরূপী; তিনি ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করিয়া জগদ্বিধান নিয়মিত করেন; প্রজ্ঞা তাঁহার জননী; কোথাও বা তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাত্মা। সুসমাচার প্রচারক জোহন যে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন, তাহাতে কেহ সংশয় করেন না। Philo খ্রীষ্টান ছিলেন না। জোহন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে বসিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টকেই শব্দ-ব্রহ্মরূপে প্রচার করিলেন, এবং শব্দ-ব্রহ্মের সমুদয় বিশেষণই খ্রীষ্টে আরোপ করিলেন। ঈশ্বর যে নরদেহ ধারণ করিতে পারেন, কোন জীব যে ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহুদীর পক্ষে ইহা কল্পনাতীত। জোহন কিন্তু খ্রীষ্টের সেই দিক্‌টাতেই জোর দিলেন। তিনি অগ্রে শব্দরূপে বিদ্যমান ছিলেন; তিনি নরদেহ গ্রহণ করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন; জীবের মঙ্গলের জন্য আপনি জীবলীলার অভিনয় করিলেন। খ্রীষ্টের ক্রুসে আরোহণটাই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ, কেন না ঈশ্বরের জীবত্ব-গ্রহণই আত্মোৎসর্গের ব্যাপার। যে বড়, সে ছোট হইলেই তাহার আত্মোৎসর্গ হইল। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে; সৃষ্টির আদি হইতেই ইহার ব্যবস্থা হইয়া আছে। খ্রীষ্টানের ভাষায় the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was Man. ঈশ্বর যে জীব হইবেন, যিনি নিত্যমুক্ত, তিনি যে বদ্ধ সাজিবেন, ইহা জগৎ সৃষ্টিরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য; ইহাই তাঁহার জগতে আত্মপ্রকাশের নিগূঢ় রহস্য।

আমি তুলনামূলক আলোচনায় বসিয়াছি—পুঁথি ঘাঁটিয়া খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের যে তাৎপর্য্যটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। খ্রীষ্টানের মতে খ্রীষ্ট শব্দস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ,—বেদপন্থীর ভাষায় তিনি শব্দ-ব্রহ্ম, এবং বাগ্‌দেবতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব। মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোন ভিন্ন ভেদ নাই। তিনি

চিরমুক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশার্থ বদ্ধ জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাকে খাট হইতে হইয়াছিল—যিনি মহৎ, তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছিল,—জগতের সম্মুখে আপন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্যই তিনি এইরূপে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় ইহা লীলাকৈবল্য। ইহা জাগতিক বিধান—জগৎসৃষ্টিই এই আত্ম-বিসর্জ্জন। যে সকল ইতর ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান,—ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ ধরিয়া যে সকল ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান—যাহারা স্বকৃত পাপের ভয়ে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে রহিয়াছে, যাহারা সেই পাপের ভয়ে মৃত্যুর বশ হইয়াছে, অমরতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই অগ্রজন্মা আদি জীব এই আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা তাহা-দের পাপ নাশ করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে দেখাইলেন, যে পাপ চিরস্থায়ী নহে; খ্রীষ্টকে জানিলেই, খ্রীষ্টের স্বরূপ জানিলেই, জগদীশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিলেই, এই পাপ থাকিবে না, তখন সে অমরতার অধিকার পাইবে—তাহার স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন খুলিয়া যাইবে। যে নিত্যমুক্ত হইয়াও আপনাকে বদ্ধ মনে করে, বদ্ধবৎ আচরণ করে, সে মুক্ত হইবে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে দারুণ ব্যবধান, সে স্বেচ্ছাক্রমে কল্পনা করিয়াছে, সে ব্যবধান লুপ্ত হইবে। এ জন্য খ্রীষ্টের সহিত তাহার একাত্মতা-স্থাপন আবশ্যক। খ্রীষ্ট মানবলীলায় ক্রুসের উপরে মরণাভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি মরণাভিনয় দ্বারা মরণ জয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সেই যজ্ঞকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। এই যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা একটা অভিনয়, মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন অভিনয়, উহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা সত্য জ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ খ্রীষ্ট যে যজ্ঞিয় পশু সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা—communion—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্ত মাংস খায়—eucharist খায়, খ্রীষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ লইয়া খ্রীষ্ট সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে—যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা খ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, আত্মস্থ করে, খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে প্রেরিত হয়।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়; এই কথা লইয়া আমি আরম্ভ

করিয়াছি। ক্রুসে আরোহণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর রুটি ও মদ ছিল। খ্রীষ্ট বলিলেন, এই রুটি আমার মাংস, এই মদ আমার রক্ত; ইহা তোমরা খাও। এই বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ঐ রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিলেন। পরদিনে তিনি পশু-রূপে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে আহুতি দিলেন। পূর্ব্বদিনের ঐ অনুষ্ঠান পরদিনের যজ্ঞাভিনয়ের rehearsal স্বরূপ। খ্রীষ্টানেরা তদবধি ঐ রুটি ও মদ খাইয়া আসিতেছে; উহাতে সেই যজ্ঞিয় পশুর রক্ত মাংস খাওয়াই হইতেছে—ঐ যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণই হইতেছে। এই ভক্ষ্য দ্রব্যের নাম eucharist; eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তির অনুকূল, বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রাপ্তির অনুকূল, পশুর পক্ষে পশুপতিত্ব প্রাপ্তির অনুকূল। মনে রাখিবেন, খ্রীষ্ট যজ্ঞে পশু হইয়াছিলেন; ক্রুসটাই সেই যজ্ঞের যূপ। যিনি স্বয়ং পশুপতি, তিনি পশু সাজিয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিলেন, পশুরূপে মৃত্যু স্বীকার করিয়া মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন; ইতর পশুরা সেই পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া পশুপতির সহিত একাত্মতা লাভ করিবে; এইরূপে পশু জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আশ্চর্য্য যে, আমাদের দেশেও পাশুপত দর্শনের ভাষায়, শৈব সম্প্রদায়ের ও শাক্তসম্প্রদায়ের ভাষায়, পশু শব্দের অর্থ বদ্ধ জীব, পশুপতি অর্থে ঈশ্বর; পশু জন্ম হইতে অব্যাহতির নাম মুক্তি। খ্রীষ্টানের eucharist সম্বন্ধে খ্রীষ্টানের কথা না শুনিলে আপনারা হয়ত মানিয়াও মানিবেন না; তাই পুনরায় একজন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদের কথা শুনাইতেছি—"The sacrifice of Christ was once offered on the cross"—ক্রুসে আত্ম দান করিয়াই খ্রীষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—ইতিহাসে এই একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। "It is offered, to the Father, and to the Son, and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrific." ঐ যজ্ঞের দেবতা জনকেশ্বর, ঐ যজ্ঞের দেবতা তনয়েশ্বর; ঐ খ্রীষ্ট স্বয়ং একাধারে ঋত্বিক্, পশু এবং দেবতা। তিনি আপনাকেই আপনার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছেন, আবার বলি, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। "On the Cross and in the Eucharist there is one Sacrifice"—ক্রুসের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, eucharist ভক্ষণকালেও সেই যজ্ঞেরই পুনরভিনয় হয়—উভয়ই এক যজ্ঞ। "He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Euchurst." এই হবিঃশেষ ভক্ষণেই মানব খ্রীষ্টের

সহিত মিলিত হয়—জীবেশ্বরে একতা সম্পাদিত হয়। "It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into His body and blood."—মন্ত্রোচ্চারণের পর যখন রুটি ও মদ খ্রীষ্টের রক্ত মাংসে পরিণত হয়, ঠিক তখনই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। "He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever"—ক্রুসের উপর মহাযজ্ঞে তিনি নিজেই ঋত্বিক্ ছিলেন—কিন্তু সেই ঋত্বিক্ কর্ম্ম হইতে এখনও তিনি নিবৃত্ত হন নাই; তাঁহার পিতার নিকট সেই যজ্ঞ আজিও অর্পিত হইতেছে, এবং চিরদিন অর্পিত হইবে।

আজিকার মত আমি এইখানেই ছুটি লইতে চাহি। আজ বৈদিক যজ্ঞের কথা একবারে তুলি নাই বলিলেই হয়। আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা বলিলাম। আমি আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। বেদপন্থী সমাজে বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি দেখাইতে চাহি। আমি দেখাইতে চাহি, এই যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া বেদপন্থী সমাজ ধৃত ছিল; ধৃত ছিল কেন, এখনও ধৃত আছে। এখন শ্রৌতযজ্ঞগুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি, যজ্ঞের দেবতাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি, অথচ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা যজ্ঞকে ধরিয়া আছি; যজ্ঞের তাৎপর্য্য ঠিক রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে যজ্ঞকে ধরিয়া আছি। আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, আমাদের লোকস্থিতি ও লোকযাত্রা আজি পর্য্যন্ত যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই তাৎপর্য্যটি ধরিতে না পারিলে বেদ-পন্থী সমাজে লোকস্থিতির গূঢ় রহস্যটি বুঝা যাইবে না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজের আগাগোড়া যে একটি অবচ্ছেদহীন সূত্র ধরিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেটি ধরিতে পারিবেন না। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ব্যাপারটি একটা symbol; সমাজ মধ্যে আমাদিগকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে, তাহারই symbol. ঐ হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠানটির গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে কয়েক বারে নানা যজ্ঞের বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে শুনাইয়াছি—অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ শুনাইয়াছি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুধের আহুতি দিয়া সেই

দুধ কিঞ্চিৎ খাইতে হয়; পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পুরোডাশ আহুতি দিয়া তাহার অবশেষ খাইতে হয়; পশুযজ্ঞে পশুমাংস আহুতি দিয়া তাহার কিয়দংশ খাইতে হয়; সোমযজ্ঞে সোমরস দেবতাকে দিয়া সোমরসের অবশেষ পান করিতে হয়। ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ। যজমান একা খাইলে চলে না; ঋত্বিক্ ও যজমানে একযোগে খাইয়া থাকেন। এই একযোগে খাওয়াই communion. ইহা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। গৃহস্থের সহিত একদিকে সমাজের অন্যদিকে দেবতার মিলন সাধনই এই communion. এই অনুষ্ঠান বিনা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না—ধরিতে গেলে এই অনুষ্ঠানেই যজ্ঞের সমাপ্তি। এই সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপক তাৎপর্য্য আছে। সামাজিক জীবনে সেই তাৎপর্য্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে সমাজ মধ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। আমি দেখাইলাম, এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান। নানা জাতির মধ্যেই ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠান eucharist ভক্ষণ। খ্রীষ্টানদের মতে এই eucha-rist ভক্ষণের তাৎপর্য্য আমি যথাশক্তি আজ বুঝাইয়াছি। বেদপন্থী সমাজে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে আগামী বারে চেষ্টা করিব।

খ্রীষ্টীয় সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, এবং তাহার বহু পুরাতন বেদপন্থী সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট ধার করিয়াছেন কি না, সে প্রসঙ্গ আমি আদৌ তুলিব না। আমি সাদৃশ্য দেখাইয়াই নিরস্ত হইব। তার পরে আমি দেখাইতে চাহি, এই অনুষ্ঠান অথবা এই অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য্য আমাদের বেদপন্থী সমাজ কিরূপ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই ব্যাপকতা বুঝিবার সুবিধা হইবে। সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম; নতুবা খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। খ্রীষ্টানের নিকট যাহার নাম eucharist, বেদপন্থীর নিকট তাহার নাম ইড়া। এই ইড়ার অর্থ বুঝিতে হইবে। আপনারা জানিবেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে এই ইড়া ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া ভক্ষণে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা। মানবের গার্হস্থ্য জীবন এবং সামাজিক জীবন এমন কি মানবের আধিভৌতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, মানবের পার্থিব জীবন এবং অপার্থিব পারমার্থিক জীবন—এক কথায় সমগ্র মানব জীবনের এই ইড়া ভক্ষণেই সম্পূর্ণতা এবং

সমাপ্তি এবং সার্থকতা। ইহাই আমাদের religion এবং ইহাই আমাদের ethics. এই ইড়া জনপের অর্থ এবং তৎপরতা বুঝাইয়া বেদপন্থী সমাজের ভিত্ত কোথায়, বেদপন্থী সমাজের গাঁথনি কোথায়, তাহা আমি খাড়ির করিতে চাহি। আর একবার মাত্র আপনাদের সমুখে উপস্থিত হইয়া আমি এই পরম তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি অর্পণ করিব। আপনাদিগকে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

স্থাপত্য-শিল্প।

৬

অলঙ্কারযোজনা দ্বারা যে সর্ব্বাবস্থায় কোনও সৌধের সৌন্দর্য্যরক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না,তাহা দেখা গেল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা উদ্দেশ্যহানি ঘটে। এখন চিন্তা করিয়া দেখা যাউক যে, সৌন্দর্য্য কোথায়? রস্কিন্ এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। যদিও এ যুগে সে সব কথা সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে গৃহীত হয় না, তথাপি এরূপ মহান চিন্তাশীল লেখক ও শিল্পীর কথা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা তাঁহার কথার অবতারণা করিলাম। তিনি বলেন যে,—সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ফিরিলে দেখিতে হইবে যে, কোন সৌধে মানুষের ক্ষমতার মহিমা কতটা প্রকটিত, আর সৌধের অংশগুলি প্রকৃতি হইতে কতটা আকৃতিগত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি তিনি একটু বিশেষভাবে বলিয়াছেন। প্রকৃতি-সংস্থানে যাহা আমরা সচরাচর দেখি, সেগুলির আকৃতির অনুকরণকেই রস্কিন্ সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনন্ত প্রকারে আকৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়; কিন্তু সবগুলিই যে সৌন্দর্য্যবিধায়ক হইবে,এমন কোনও কথাই নাই। যে আকৃতিগুলির সহিত আমাদের সতত পরিচয়, স্থাপত্যে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। তিনি উদাহরণস্বরূপ fret workএর কথা বলিয়াছেন; সকলেই ইহা বিদিত আছেন যে, গ্রীক্ স্থাপত্যে fret workএর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; চীনদেশীয় স্থাপত্যেও ইহা আদৃত। সাধারণতঃ পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তুর আকৃতির সহিত ইহার আকৃতিতে কোনও সৌসাদৃশ্য নাই; অমিশ্র অবস্থায় অপ্রকাশ্য বিস্মথ (Bismuth) নামক এক প্রকার ধাতুর দানা

(crystals) বাঁধিতে আরম্ভ হইলে এই আকারের দানা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই হিসাবে রস্কিন্ 'fret করা' অশোভন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথার তেমন যুক্তিবত্তা দেখা যায় না। প্রকৃতই fret অলঙ্কার কি সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বস্থানেই অশোভন? আমি ত এরূপ মনে করি না; বোধ হয়, অনেকেই আমার সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিবেন। সৌন্দর্য্য এরূপ বাঁধাবাঁধি সঙ্কীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; ইহার বাসস্থান অসীম। যদি সাধারণতঃ পরিদৃশ্যমান পদার্থের আকৃতির অনুকরণই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হিসাবে স্থাপত্যের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সমান্তরাল বা তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত সরল রেখার ত স্থাপত্যে কোনও প্রয়োজনীয়তাই দেখি না; কেন না,সাধারণতঃ দৃশ্যমান প্রকৃতি-সংস্থানের মধ্যে সরল রেখার স্থান কোথায়? সমস্তই ত প্রায় চক্ররেখার খেলা। পত্র, পুষ্প, বৃক্ষকাণ্ড, শাখা প্রশাখা,বা তাহাদের শিরা উপশিরার কোন্‌টি সরল? আকাশের কোন্ মেঘখণ্ড, পর্ব্বতের কোন্ অংশ সরল রৈখিক সীমায় আবদ্ধ? অতএব, রস্কিনের নিয়মানুসারে সরল রেখা বা তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ত ব্যবহারই চলে না। কিন্তু ইহাতে কি স্থাপত্যের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না? মুসলমান স্থাপত্যের কথাই আপাততঃ ধরা যাউক। মুসলমান প্রাসাদের গাত্রদেশস্থ যে চতুরস্র বা আয়তাকৃতি ক্ষেত্র গাত্রদেশের শোভাবৃদ্ধি করে, তাহা ত রস্কিনের নিয়মে বিশেষ অসুন্দর হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি প্রকৃত? কোনও সৌধবিশেষের নাম করিতে চাহি না, যে কোনও সৌধই ধরা যাইতে পারে—যেমন দিল্লীস্থ হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রাস্থ ইতিমদ্দৌলার সমাধি ইত্যাদি। রস্কিনের নিয়মানুসারে প্রাচীন গ্রীক্ বা রোম্যান্ সৌধগুলি সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নহে; এমন কি, বহুপরবর্ত্তী রেণাসাঁস যুগের রোম্যান্-শাখান্তর্গত সৌধগুলিও এই বিধির আদেশে বিগতশ্রী হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালী দেশে ব্রামান্টি ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য কর্ত্তৃক কল্পিত ও নির্ম্মিত সৌধগুলির বহির্ভিত্তিতে সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র দ্বারা অলঙ্কার-সম্পাদন যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই রস্কিনের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এই সূত্রটিকে গ্রাহ্য করিবেন না।

সচরাচর দৃষ্ট পদার্থগুলির আকৃতির অনুকরণেই যদি সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়, তাহা হইলে জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির ত কোনও মূল্যই থাকে না। কিন্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির সামঞ্জস্য-বিধানে ও সাবধানতার সহিত ব্যবহার দ্বারা সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনেক স্থলেই ঘটিয়াছে।

জ্যামিতিক ক্ষেত্রমাত্রই যে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, এ কথা আমি কথনই বলিব না; তেমনই সচরাচর দৃষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থের আকৃতির অনুকরণেই যে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইবে, এ কথাও অগ্রাহ্য। যদি কোনও অট্টালিকার বহির্দ্দেশে জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আদর্শস্থলীয় "দাবা" খেলার ছক্ সদৃশ কোনও অলঙ্কারের যোজনা করা যায়,তাহা হইলে তাহা কথনই সুশোভন হইবে না; তেমনই, যদি কোনও স্তম্ভকে লতামঞ্জরী বা স্ক্রু'র আকারে ক্ষোদিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইবে। স্তম্ভের কার্য্য-ভার বহন করা; এই জন্য ইহার নলাকৃতি হওয়া আবশ্যক; লতামঞ্জরীর আকারে স্তম্ভের নির্ম্মাণ করিলে অনেক অর্থব্যয় হইবে সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিবে। যাঁহারা বৃন্দাবনস্থ শেঠজীর মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গিয়োটো (Giotto) কর্ত্তৃক কল্পিত ফ্লরেন্সস্থ ক্যাম্পেনাইল্ (Campanile) যাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার স্ক্রু (screw) আকারের স্তম্ভের কথনই অনুমোদন করিবেন না, কিংবা ইটালীয় গথিক-শাখান্তর্গত মন্ট্রিল্-কেথিড্রেলের, বা বাইজাণ্টাইন্ স্থাপত্যের অন্তর্গত ফেরারা কেথিড্রেলের স্তম্ভ তাঁহাদের তৃপ্তিজনক বোধ হইবে না। বিস্ময়ের বিষয় এই, রস্কিন্ শেষোক্ত কেথিড্রেলের স্তম্ভগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই উক্তির প্রতিকূল।

আমরা দেখিলাম যে, কেবলমাত্র সচরাচর দৃষ্ট স্বভাবজাত পদার্থগুলির আকৃতির অনুকরণ দ্বারাই সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না; ইহার সীমা আরও বিস্তৃত; এবং আরও দেখিলাম যে, সময়ে সময়ে এ প্রকার অনুকরণে সৌন্দর্য্যরক্ষা বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আমার মনে হয় যে, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রকৃতি, বা বিকৃতি, বা তজ্জাতীয় কোনও পদার্থের মধ্যেই নিহিত নহে; ইহা কয়েকটি মানসিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেগুলি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

মানুষ কথনও একই রকম বৈচিত্র্যবিহীন পদার্থ দেখিতে পারে না; তাহার তৃপ্তির জন্য চক্ষু সর্ব্বদা বৈষম্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মনে করা যাউক, একখানি ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করা গেল, এবং তাহার বহির্ভিত্তি বর্দ্ধিতাগ্র-বর্জ্জিত এক অবিচ্ছিন্ন লম্ব ক্ষেত্রস্বরূপ কল্পনা করা হইল; দূর হইতে ইহাকে ঠিক একটি বাক্সের মত দেখাইবে; কিন্তু যদি সেই ভিত্তিগাত্রে বিভিন্নতল-নির্দ্দেশকারী হিসাবে কর্ণিসের যোজনা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা আর বাক্স বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; এবং যদি নীচেকার কর্ণিস্ বা ষ্ট্রীং-(string)-গুলিকে সর্ব্ব উপরের কর্ণিস্ অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে

বাটীটি আরও মনোহর হইবে; এবং প্রত্যেক কর্ণিসের কয়েক ফিট্ নিম্নে যদি ক্ষীণাকারে একটি বর্দ্ধিতাংশের যোজনা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাটীটি আরও মনোজ্ঞ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিলাম যে, মানব-মন এক নিরবচ্ছিন্ন সমতার প্রিয় নহে; বৈষম্যই তাহার প্রীতিকর। কিন্তু বৈষম্য প্রীতিপ্রদ বলিয়া ইহার যথেচ্ছাচার মন কখনই সহ্য করিবে না; সে ইহার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনুসন্ধান করিবে। যথেচ্ছাচারিতা বা বিশৃঙ্খলা যেমন বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অশোভন ও মহানিষ্টকারী, তেমনই ক্ষুদ্র সংঘের মধ্যেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশৃঙ্খলার কোথাও আদর নাই। যেখানে আমরা বিশৃঙ্খলাকে প্রীতিপ্রদ মনে করি, সেখানে আমরা প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলা-বিযুক্ত বৈষম্যকেই বরণ করিয়া লই। এই নিয়মেই কোনও সৌধের বৈষম্যজ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা না দেখি, তাহা হইলে কখনই ইহারা আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে না। পূর্ব্বে উদাহরণস্বরূপ দেখাইয়াছি যে, কর্ণিসের নিম্নে ক্ষুদ্রায়তনের বর্দ্ধিতাংশের যোজনা করিলে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া এইগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন তলে, বা ভিন্ন ভিন্ন তলের ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠে, কর্ণিস্ হইতে যে কোনও দূরত্বে সন্নিবিষ্ট করিলে সৌন্দর্য্যরক্ষার আশা করা যাইতে পারে না; বৈষম্যগুলিকে একটা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। গতিবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এগুলি একটা কেন্দ্রের অভিমুখী; সুতরাং বৈষম্যগুলিকে কেন্দ্রগ স্বরূপ স্থাপিত করা উচিত। সৌধের সহিত মানব-দেহের তুলনা বেশ সঙ্গত। মনে মনে যদি চিন্তা করা যায় যে, কমনীয়কান্তি নারী বা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যথেচ্ছভাবে ও বিভিন্নপরিমাণে শরীরে সংযুক্ত, তাহা হইলে সেই নরনারী-মূর্ত্তি রাক্ষস-রাক্ষসীর মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এ স্থলে বৈষম্য বীভৎসতার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, সৌন্দর্য্যবিধানে শুদ্ধ বৈষম্যের সন্ধান করিলে চলিবে না, তাহাদের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিও বাঞ্ছনীয়।

বিষম অংশ বা খণ্ডগুলিকে মূলের সহিত নানা উপায়ে সংযুক্ত করা যাইতে পারে; মূলতঃ ইহাদের মধ্যে দুইটা শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—ক্রমিক উদগম ও অক্রমিক উদগম। প্রথমটি সাধারণতঃ কোনও সৌধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য; যেমন ভিত্তিগাত্র হইতে কোনও কর্ণিস্ উদগত দেখাইতে হইলে ইহাকে সর্ব্বসময়ে সরলরৈখিক ক্ষেত্র হিসাবে বাহির করিয়া দেওয়া হয় না। মিস্ত্রীরা প্রথমে একটা বক্র ক্ষেত্রের সূচনা করে; ইহাকে তাহারা "হাপর দেওয়া" কহে।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, প্রস্তর-স্থাপত্যে কর্ণিসের এইরূপ "হাপর দেওয়া" সুবিধা-জনক নহে। কিন্তু আধুনিক ইষ্টক-স্থাপত্যে যাহা সরকারী স্থপতি মিষ্টার ক্রাউচের নামাঙ্কিত বলিয়া এ দেশে অত্যধিকপরিমাণে চলিতেছে, তাহাতে আমরা কর্ণিসের ক্রমিক উদ্গমের ব্যবস্থা দেখি না। ইহা সুন্দর, কি অসুন্দর, তাহা আমি বলিতে চাহি না; পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। এইবার আমরা মানবদেহস্থ স্কন্ধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি। দেহ-কাণ্ডের যে স্থান হইতে বাহুর উদ্গম হইয়াছে, তাহা কেমন ক্রমিকভাবে অবস্থিত, একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। বাহু ও স্কন্ধের সীমানির্দ্দেশক রেখাটি বক্র রেখা না হইয়া সরল রেখা হইলে কিরূপ অশোভন দেখাইত, তাহা একটু সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। ঠিক এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উড়িষ্যার স্থপতিরা তাঁহাদের বিমানশেখরের অগ্রভাগটিকে একটী বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন; কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনুষ্য-দেহ-কাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা এই অংশটির নাম রাখিয়াছেন,—"ঘাড় চকড়া"।

সৌধের যে অংশগুলি ক্রমব্যতিরেকে সহসা উদ্গত দেখা যায়, সেগুলির "অক্রমিক" সংজ্ঞা দেওয়া গেল; যেমন কোনও বাটীর গাড়ীবারাণ্ডা।

সৌধের অংশগুলির স্থাপন বা যোজনা আর এক পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহা কি, বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা কি, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে মানবদেহ-কাণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। আমরা দেখি যে, মস্তকের উভয় পার্শ্বেই কর্ণ রহিয়াছে, এবং বক্ষঃস্থলের উভয় দিকেই বাহু রহিয়াছে। এক্ষণে যদি মস্তকের দুই ধারে না হইয়া এক ধারে কর্ণ যোজিত হইত, এবং দুই ধারে বাহু বিন্যস্ত না হইয়া এক ধারে হইত, তাহা হইলে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবের দেহ বিকট আকারের দেখাইত। কর্ণদ্বয় বা বাহুদ্বয়ের পরিবর্ত্তে একটী কর্ণ বা বাহু দ্বারা যে শোভার বৃদ্ধি হয় না, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, মানব-মন অঙ্গযোজনায় বৈপরীত্য দেখিবার প্রয়াসী। বৈপরীত্য শব্দের অর্থ এ স্থলে এরূপ নহে যে, দর্শক অঙ্গটির দিকে ফিরিলে ইহাকে উল্টাভাবে দেখিবেন।

বৈপরীত্য যে সর্ব্বাবস্থায় সৌন্দর্য্যের কারণ নহে, তাহা আমি symmetry ব্যাখ্যা করিবার সময় ইরেকৃথিয়নের উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। মুখে একটী নাসিকার অবস্থানই সঙ্গত; দুইটাতে শোভার বৃদ্ধি বা বিকাশের আশা করিবার কোনও কারণ নাই; কিংবা পদদেশের সন্নিকটে আর একটী মস্তক সন্নিবিষ্ট হইলে দেহের লাবণ্য অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

চক্‌মিলান বাটী যে এত শোভন বোধ হয়, তাহার অন্যতম কারণ,—বৈপরীত্য, বা contrast। অঙ্গনের উত্তর-দক্ষিণে, বা পূর্ব্ব-পশ্চিমে যে কোনও দুই পার্শ্বেই সমোচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী অবস্থিত বলিয়া শোভার বিকাশ হইয়াছে। এক্ষণে মনে করা যাউক, অঙ্গনের সম্মুখে ঠাকুরদালান, এবং তাহার দুই পার্শ্বে অনাবৃত ভূমিখণ্ড বিস্তৃত; অর্থাৎ, সম্মুখস্থ এক সারি প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইলে অঙ্গনে পঁহুছান যায়, এবং এই অঙ্গন বা অনাবৃত ভূমিখণ্ডের বামে বা দক্ষিণে কোনও প্রকোষ্ঠ নাই, এবং সম্মুখেই ঠাকুরদালান অবস্থিত; কোনও অট্টালিকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইলে ইহাকে যে নিতান্ত সৌন্দর্য্যবিহীন দেখাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই।

বৈপরীত্যের কথা বলিতে গিয়া আর একটী বিষয় মনে আসিতেছে; তাহা এই যে, কোনও সৌধের বহির্বর্দ্ধিতাংশ বা mouldingগুলির যোজনায় আমরা যে বৈপরীত্য ভাবের পরিচয় পাই, তাহার সকলগুলির সহিত ক্রমিক উদ্গমের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে স্থির করেন। এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করা যাউক যে, ইংরাজী অক্ষর Sএর আকারের কোনও mouldingএর যোজনা করা গেল; ইহাতে একটী বক্র রেখাকে আর একটী বক্র রেখার উপর উল্টাভাবে স্থাপিত করা হইল। ইহা কিন্তু বৈপরীত্যের উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইবে না; ইহা "ক্রমিক উদ্গম"-বিশেষ। একটী বক্র রেখা হইতে আর একটী বক্র রেখা ক্রমিক নিয়মানুসারে উদ্গত হইয়াছে। একটী বক্র রেখার উপর আর একটী বক্র রেখা স্থাপিত না করিয়া যদি রেখাদ্বয়কে পাশাপাশি স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে যে আকারের রেখা কল্পিত হইবে, তাহাতেই বৈপরীত্য প্রদর্শিত হইবে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; অনেকের ধারণা যে, কোনও বক্র রেখার পার্শ্বে আর একটী বক্র রেখা স্থাপিত হইলেই বৈপরীত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। বৈপরীত্য বা contrast ব্যাপারে দুইটী বা অনেকগুলি একই আকারের বা সমস্থানব্যাপী বক্র রেখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। জ্যামিতিক ভাষায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে, যে বিন্দুতে দুইটী বক্র রেখা মিলিয়াছে, সেই বিন্দু হইতে উভয়ের দুইটী স্পর্শিনী রেখার (tangent) অঙ্কন করিলে যেন তাহারা পাদরেখার (X axis) সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে।

আমরা দেখি যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ছন্দের (Rhythm)

লীলা। দার্শনিক পণ্ডিত Herbert Spencer সর্ব্বপ্রকার গতিকেই * ছন্দানুবর্ত্তিনী (Rhythmical) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য-বিধানে এই ছন্দের রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বের কথা বলিতে আমি ছন্দেরই আভাস দিয়াছি। যদিও এক্ষণে অনেকে সঙ্গীতের তাল মান প্রভৃতির লোপসাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহা দ্বারা ছন্দেরই রক্ষা সাধিত হয়। এই যে ছন্দ, যাহা বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয়; অতএব কোনও বস্তুতে ইহার অভাব দেখিলে যে তাহা অশোভন বোধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কোনও বাটীর বহির্দ্দেশে দেখিলাম যে, স্তম্ভের শ্রেণী চলিয়াছে। ইহাতে আমরা মুগ্ধ হই কেন? মুগ্ধ হই এই জন্য যে, চক্ষুর আরাম হয়; এ আরামের কারণ ছন্দের উত্তেজনা. বা আবেগময়ী শক্তি। মাঝে মাঝে দেখি যে, আমার একবৎসরবয়স্ক শিশু পুত্র অর্থহীন "নানু নানু" শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দের কারণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখি যে, শিশুটি এই শব্দটির পুনঃপুনঃ আবৃত্তিজনিত ছন্দের আবেগময়ী শক্তিতে মুগ্ধ হয়। জ্ঞানহীন ভল্লুককেও এইরূপে আমরা "ঠুমুক ঠুমুক" নাচের ছন্দে আবিষ্ট করাইয়া আনন্দ উপভোগ করি। সঙ্গীতের ছন্দ যেমন সময়ের সমতাজ্ঞাপক, স্থাপত্যের ছন্দও তেমনই স্থানসমতাজ্ঞাপক। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি যে, কোনও সৌধের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার অঙ্গগুলির যোজনা বা অবস্থান ব্যাপারে যেন ছন্দোরক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে।

সাধারণতঃ সরল রেখা অপেক্ষা বক্র রেখা দ্বারা শোভার অধিকতর বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, সরল রেখা দ্বারা দিব্য সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। এ কথার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

সৌন্দর্য্যবিধায়ক বক্র রেখাগুলি নানা আকারের হইতে পারে; বৃত্ত বা বৃত্তাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকারের বক্রতা-নির্দ্দেশক রেখার কল্পনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বৃত্তাংশ অপেক্ষা যে সমস্ত রেখার বক্রতার মধ্যে একটী ক্রমিক ভাব বর্ত্তমান, অর্থাৎ যে সমস্ত রেখা ক্রমশঃ বক্র হইয়াছে, তাহারা অধিকতর সুন্দর। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যস্থাপত্যের উদাহরণগুলির মধ্যে

---

* First Principles. (Edited by William and Norgate)—p. 215.

উড়িষ্যার মন্দিরে উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, এ হিসাবে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তের মন্দিরগুলি অধিকতর মনোজ্ঞ। মুসলমান স্থাপত্যেও এ বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আমেদাবাদস্থ সিদি সায়েদের মস্‌জিদের জানালার কারুকার্য্য যিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। গুজরাটে আরও অনেক প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে যাহা Early Plantagenet এবং Later Plantagenet রীতি বলিয়া কথিত, তাহার জানালাগুলি যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমরা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হিসাবে সরলরৈখিক ক্ষেত্র ও বক্ররৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইব। Westminster Abbey রূপ যে বিশাল ও সুবিখ্যাত সৌধগুলি বহু বর্ষ ধরিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের বিভিন্নাংশে এই দুইটী বিভিন্ন রীতির কেমন সুন্দর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা দ্বারা আমরা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দুইটী পদ্ধতির আপেক্ষিক উৎকর্ষ বেশ বুঝিতে পারি। Westminster Abbeyর Tracery windowর কথা স্মরণ করিতে গিয়া মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় স্থাপত্যের Tree of Jesse নামক এক প্রকার সৌন্দর্য্যবিধায়ক শিল্পকার্য্যের কথা স্মরণে আসিতেছে। দ্রাক্ষাবৃক্ষের ক্রমিক বক্র শাখা প্রশাখা হইতে কেমন কৌশলের সহিত ডেভিড্, সলোমন্ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ ঈশার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পুরাতন বাটী।

১

দিবাবসানে দুই বন্ধু একত্র মাঠ ভাঙ্গিয়া মল্লিকপুর গ্রামের দিকে যাইতেছিল। ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ। পথে লোকালয় বিরল। কেবল ধান্যক্ষেত্র, এবং বহু দূরে মল্লিকপুরের পুরাতন দেবালয়ের শুভ্র চূড়া একটী বৃহৎ বটবৃক্ষের পার্শ্বে সেই গ্রামখানির অতীত ধর্ম্মকাহিনী প্রচার করিতেছিল।

এমন সময় আকাশে একটা পাখী উড়িয়া গেল।

'টি-টি—হুইট্—টি-টি—হুইট্!'

উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। 'ওটা কি পাখী নরেন?'

দ্বিতীয় বন্ধু নরেন্দ্র চিন্তা করিয়া বলিল, 'বোধ হয় চাতক।'

প্রথম বন্ধু বিনোদলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমাদের দেশের মহৎ দোষ যে, কেহ কোনও বিষয়ের ঠিক খবর দিতে পারে না। আমাকে এক জন একটা জঙ্গলা গাছ দেখিয়ে বলেছিল, "এই তমাল।" কিন্তু পরে জানা গেল যে, তমাল আমাদের দেশে খুব কম। যে পাখীটাকে তুমি "চাতক" বলছ, সেটা চাতকও নয়, ভরতপক্ষীও নয়। ওটা বোধ হয় "খঞ্জন" পাখী।'

নরেন্দ্র। তুমি এক জন জীবতত্ত্ববিৎ, আর আমি পাড়াগেঁয়ে মূর্খ। আমি পক্ষিকুলের বড় একটা সন্ধান রাখি না।

বিনোদ। রাখা উচিত। গ্রামের সঙ্গে সহরের বিশেষ তফাৎ এই যে, গ্রামে পশু পক্ষীর বাস বেশী। সহরে মানুষ বেশী। আমার মতে, পশু পক্ষীর সঙ্গে ভাল আলাপ পরিচয় না হ'লে মানুষ চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এরাই নানাবিধ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।

নরেন। (হাসিয়া) আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমি প্রতিবাসীদের খবর ভাল ক'রে সংগ্রহ করব।

উভয়েই যুবা। উভয়েই সুশ্রী। বিনোদলাল এক জন 'বিলাত-ফেরত' প্রতিভাশালী ব্যারিষ্টার। নরেন্দ্র গ্রাম্য জমীদার। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যায় আসে। শৈশবে উভয়ে একত্র স্কুলে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিল।

বিনোদের পিতার সেই গ্রামে সামান্য একটু বিষয়-আশয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিনোদের মাতা কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। তিনি বিনোদকে লিখিয়াছিলেন,—'বাবা, মধ্যে মধ্যে পৈত্রিক ভদ্রাসনটা দেখ, যেন একেবারে ভূমিসাৎ না হয়।' কিন্তু বিলাত হইতে ফিরিয়া তিন বৎসরের মধ্যে বিনোদ তাহা দেখিয়া উঠিতে পারে নাই। একটা কারণ, বিনোদের মাতা বৃদ্ধা। তাঁহাকে দেখিতে বিনোদ মধ্যে মধ্যে কাশীধামে যাইত। আর একটা কারণ, বিনোদের স্ত্রী সিমলা পাহাড়ে তাহার পিতার সঙ্গে থাকিত। বিনোদ সেখানেও বৎসরে একবার করিয়া যাইত। আরও কারণ ছিল। বিনোদের পশার খুব জমিয়াছিল। বন্ধু বান্ধব জুটিয়াছিল। অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয় করিবার পক্ষে কলিকাতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান।

সম্প্রতি নরেন্দ্রের সহিত তাহার খুল্লতাতের হাইকোর্টে একটা মামলা বাধিয়া যাওয়াতে বিনোদের উপর সেই মামলা চালাইবার ভার অর্পিত হইয়া-

ছিল। প্রথম কাজ, সেই গ্রামখানির সীমা নির্দ্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়, উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করা। এইবার সুবিধা পাইয়া বিনোদ নরেনকে সঙ্গে লইয়া মল্লিকপুরে উপস্থিত।

বিনোদ। আমার জন্ম এইখানে, সেটা বোধ হয় শুনে থাক্‌বে। বাল্য-কালের কতকগুলো কথা আমার এখনও মনে আছে। প্রথম, ঐ টি-টি-হুইট্ পাখীর ডাক্; দ্বিতীয় মন্দিরের পাশে ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ। তোমরা ও আমরা যেমন কলিকাতায় তীর্থযাত্রা করি, সেই রকম অনেক গ্রামের পাখী ঐ বটগাছে এসে একত্র হ'ত। তাদের অঙ্গভঙ্গী, নানা রকম কলরব, দ্বন্দ্ব ও সখ্যভাব এখনও আমার বেশ মনে আছে। বোধ হয়, তারা গ্রাম্য-জীবনে বিরক্ত হ'য়ে মধ্যে মধ্যে সেই গাছে সংসারের দ্বন্দ্বময় কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার ক'রে আপনাদের ধন্য মনে কর্ত্ত। এটা অবশ্য জীবের স্বভাব। ক্রমশঃ খুব জমকালোর মধ্যে ঢুকে পড়্‌তে না পার্লে, জীবনের সার্থকতা বুঝা যায় না। তাতে দুই একটা ধাক্কা খেতে হয়, সেও কবুল।

নরেন। সে কথা ঠিক। তৃতীয় জিনিসটা কি?

বিনোদ। কালো একটা বেরাল। তার জীবনের সার্থকতা কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারতুম না। তবে সে চুরী কর্ত্তে খুব মজবুত ছিল। চুরী করা যে পাপ, সে সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু চুরী করা যে খুব বাহাদুরীর কাজ, এবং তার মধ্যে যে বিজ্ঞানের অনেক সত্য নিহিত আছে, তা সে সময় অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। আমাদের পুরাণো বাড়ীতে থাক্‌বার ঘর একটাও আছে ত?

নরেন। আছে। আমি পরিষ্কার ক'রে রেখেছি।

বিনোদ আহ্লাদসহকারে বলিল, 'বেশ!'

২

একটা বিশ্ববিশ্রুত কথা আছে—'স্বর্গ'। অনেকে জন্মভূমিতে সে কথার প্রয়োগ করে। কেন?

ধর্ম্মশাস্ত্র বলে যে, মানব স্বর্গবিচ্যুত কুমার। ঈশ্বরের অংশ। স্বর্গ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু জন্মভূমি বাস্তব—প্রত্যক্ষ পদার্থ। যেখানে জীব জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই তার মুক্তি সম্ভব। যদি বদ্ধাবস্থায় অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, হয় ত এক দিন তাহাকে সেখানে আসিতে হইবে।

ভাঙ্গা ও জীর্ণ বাটীতে আসিয়া বিনোদ তার হ্যাট্ কোটগুলি একটা

পুরাতন সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিল। এক জন ভৃত্য বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর নাম কি রে ?'

ভৃত্য। বনমালী। আমার বাপ্ কর্ত্তার খান্সামা ছিলেন। আপনি আমার দাদাবাবু।

বিনোদ মনে মনে ভাবিল, 'এ লোকটার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। দশ বৎসর পরে রাষ্ট্রতন্ত্রে এটা থাকিবে কি না সন্দেহ।' (প্রকাশ্যে) আমাদের একটা কালো বেরাল ছিল, সেটা কোথায় ?

বনমালী। সেটা নাই। তাহার বাচ্ছা আছে।

বিনোদ। বাচ্ছাটা কোথায় ?

বনমালী। ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ীতে।

নরেন। তুমি কি এই সব কথা নিয়ে সময় কাটাবে ? আমাদের কাছারী-বাড়ী এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ পথ। সেখানে তোমার জন্য সব প্রস্তুত।

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, 'নরেন, তুমি এখন যাও। আমি রাত্রি ন'টার সময় সেখানে গিয়ে খাব। পাল্কী পাঠিয়ে দিও। আমি ততক্ষণ চারি দিকে বেড়াব।

নরেন চলিয়া গেলে বিনোদ তাহাদের পুরাতন বাটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে বসিল। পুষ্করিণীতে জল নাই বলিলেও হয়। পার্শ্বে একটা অদ্ভুত রকম বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ। পুষ্করিণীব পাড়ে বহুবর্ষসঞ্চিত ছাইভস্ম। দুইটী গৃহের কপাট নাই। অঙ্গন আগাছা ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের উদ্যানে ঘোর অন্ধকার, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

বিনোদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কি অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বনমালী। দাদাবাবু! কি খুঁজ্‌ছেন ?

বিনোদ। আমি কতকগুলো চামেলী ফুলের গাছ এখানে লাগিয়েছিলুম, সেগুলো কই ?

বনমালী। সেগুলোর শেকড় আছে, তবে অন্ধকারে বের করা শক্ত।

বিনোদ অবলীলাক্রমে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিল।

'কাল প্রাতঃকালেই এগুলোতে জল দিতে হবে। মরলে স্বর্গে যেতে হয় জানিস্ ?'

বনমালী। হাঁ।

বিনোদ। সেখানেও আমাদের বাসস্থানের এই রকম অবস্থা। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ভট্‌চায্‌ ব্রাহ্মণরা জল দিয়ে তর্পণ করে।

বনমালী। যদি জল শুকিয়ে যায়?

বিনোদ। তুই মস্ত দার্শনিক দেখ্‌ছি! আচ্ছা তোকে ব'লে দিই। জল শুকিয়ে গেলে পুষ্করিণীর সংস্কার ক'রে আবার জল দিতে হয়। তোকে আরও ভাল ক'রে রাত্তিরে বুঝিয়ে দেব এখন। তুই একটা মশারীর যোগাড় কর্‌।

বনমালী। ভট্‌চায্যি মশাইয়ের বাড়ীতে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের দানের সেই মশারী এখনও আছে।

বিনোদ। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, পিতৃশ্রাদ্ধের একটা সার্থকতা আছে। ভট্‌চায্‌ না থাক্‌লে আজ এই মশার উপদ্রব এড়ানো দায় হয়ে পড়্‌ত।

বিনোদ মুক্তপদে একখানা মোটা ধুতি পরিধান করিয়া প্রতিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য খট্টাঙ্গে শয়ন করিয়া গুণ্‌ গুণ্‌ স্বরে দ্বাপরের হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণী একমনে তাহার সহিত একটা পুরাতন চরকায় যজ্ঞোপবীতের সূতা কাটিতেছিলেন। হঠাৎ আগন্তুককে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাবা?'

বিনোদ। আমি ৺হরিনাথ বসুর পুত্র—শ্রীরমানাথ বসু।

ব্রাহ্মণী। ওমা! সে কি কথা!

ভট্টাচার্য্য খট্টাঙ্গ হইতে উঠিয়া বসিলেন।

বহু দিন রাত্রিকালে তিনি খট্টাঙ্গ ছাড়িয়া কখনও উঠেন নাই। পাছে বৃদ্ধকালে কোনও বিপদ ঘটে, তাই ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তোমার উঠে কাজ নাই, শুয়ে থাক, এ আমাদের বিনোদ।'

ভট্টাচার্য্য গর্জ্জিয়া বলিলেন, 'আমার চশমাখানা নিয়ে এস। ওরে বিমলা! কোথায় গেলি রে, পুঁথির মধ্যে চশমাখানা রেখেছি, খুঁজে নিয়ে আয়।'

গর্জ্জনে ভট্টাচার্য্য-গৃহ কম্পিত হইল। একটী ষোড়শী নতমুখে চশমাখানি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার রূপে গৃহের ক্ষীণ দীপালোক উজ্জ্বল হইল।

ভট্টাচার্য্য। বিনোদ, বিনোদ—বাবা নিকটে এস। বিমলার বিবাহের সময় তুমি ৫ শ' টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছিলে, মনে আছে? সেই বিমলা তোমার সম্মুখে। কিন্তু বাবা, বিবাহ এখনও ঘ'টে উঠে নাই।

বিনোদ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিল। বিমলা স্নেহভরা চক্ষুতে বিনোদকে দেখিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ খট্টাঙ্গে বিনোদকে বসাইলেন। বিমলা পান সাজিতে গেল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় এসে নেমেছ? বৌমা কোথায়? মার খবর পেয়েছ?'

৩

বিনোদ। আমি আমাদের পুরাণো বাড়ীতে নেমেছি। রাত্তিরে সেখানেই থাক্‌ব।

বিমলা পান সাজিয়া বিনোদের হস্তে দিল। 'আজ আমাদের বাড়ীতে খেতে হবে।'

কন্যার সগর্ব্ব নিমন্ত্রণ শুনিয়া ব্রাহ্মণ একটু ফাঁপরে পড়িলেন। প্রথমতঃ, বিনোদ বিলাত-ফেরত; দ্বিতীয়তঃ, বিনোদের রসনার উপযোগী আহার তাঁহার গৃহে কোথায়?

কিন্তু বিনোদ তাঁহাকে চিন্তা করিবার সময় দিল না। 'আমি বিলাত-ফেরত', জান ত?'

বিমলা। তাতে কি আসে যায়?

বিনোদ। শুনেছি, স্বর্গে বিলাত-ফেরতের স্থান নাই। যদি থাকে, তবে আমার জন্য খাবার প্রস্তুত কর।

বিমলা। আপনি কি খেতে ভালবাসেন?

বিনোদ। যদি মনের কথা বল্‌তে হয়, তবে আমার পছন্দ—খুব মোটা চালের ভাত, কড়াইয়ের ডাল্, ডাঁটা চচ্চড়ী, কই মাছের ঝাল ও অবশেষে একটু টক্, আর দুটো সন্দেশ।

বিমলা খুব আনন্দিত হইয়া হাসিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'বাবা, আমরা গরীব, বাস্তবিক ও ছাড়া আর কোনও যোগাড় নাই। তোমার কি ও সব ভাল লাগ্‌বে?'

ব্রাহ্মণী। তুমি ছেলেবেলা ওগুলো ভালবাস্‌তে। বোধ হয়, তাই মনে পড়েছে?

বিনোদ। অনেকটা তাই। যখন আমি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে, তখন আমাদের সঙ্গে সেখানে এক জন ভারতবর্ষের লোক ছিল। হঠাৎ সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়্‌ল, তার দুদিন পরেই মারা গেল। মরবার আগে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম্, "দাদা! কিছু খেতে ইচ্ছা হয় কি?" সে সজলনয়নে কণ্ঠ-শ্বাসের জোরে বল্‌লে, "মৌরল্লা মাছের অম্বল।" আমরা অনেক কষ্টে গোটা

কতক ছোট মাছ সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সে বেচারা মরবার সময় ব্যক্ত করলে যে, তাতে মৌরলা মাছের স্বাদ নাই। হয় ত জন্মভূমির মাছটুকু পেলে তার স্বর্গে গিয়ে শান্তি হ'ত, কিন্তু কপালে ছিল না।

ভট্টাচার্য্য। দেখ বাবা! ধর্ম্ম কেমন জিনিস! মরণকালেও সঙ্গ ছাড়্তে চায় না। এটুকু এ দেশের লোক এখনও বুঝ্তে পারে নাই।

ব্রাহ্মণী। ক্রমে বুঝ্বে। এই যে এখন আমরা চরকায় সূতা কাটি, সেগুলি দশ নম্বরের। তার এক বাণ্ডিলের দাম ছিল দু টাকা, পাঁচখানা কাপড় ও তিন খানা শাড়ী হ'ত। এখন তার দাম দশ টাকা। দেশে ধর্ম্ম থাক্লে কি কাপড়ের এত দাম বাড়ে, না হাটে লুটপাট্ হয়? এখন আমরা তুলোর চাষ তুলে দিইছি। বেরালের খাবার মত দুধটুকুও মেলে না।

গৃহিণীর বিড়ালবাৎসল্য দেখিয়া বিনোদের 'কালো বেরালে'র কথা মনে পড়িল।

বিনোদ। মা, আমাদের সেই কালো বেরালের বাচ্ছাটা কোথায়?

মা শব্দ কি মধুর! বিনোদ বোধ হয় মার কথা ভাবিতেছিল, তাই হঠাৎ সেই মধুর কথাটা উচ্চারিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী অশ্রু মুছিলেন।

বিমলা তখন খুব নিকটে আসিয়া বলিল, 'বিনোদ দাদা! সে কালো বেরালটা এখন আমি পুষি। তার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দিইছি। এখন ঘণ্টার জন্য সে চুরী ক'রে খেতে পারে না।'

বিনোদ হাসিল। 'এটা সভ্যতার চরম সীমা। কিন্তু যারা চালাক্ হয়, খুব আস্তে আস্তে ঘণ্টার রব এড়িয়ে চুরী করে। সহরে আমরা সেই জন্য বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধি না। চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।'

বিমলা। এখন সেটা দেখ্তে খুব চমৎকার! আপনি বৌদিদির জন্য সিমলা পাহাড়ে পাঠিয়ে দিন।

বিমলা ইহা বলিয়া তাহার সপুবর্ষলালিত বিড়ালকে বিনোদের নিকট লইয়া আসিল। বোধ হয়, বিনোদের সঙ্গে তাহার কোনও অপূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিল। বিড়াল নিঃশব্দে বিনোদের অঙ্কে গিয়া বসিল।

দ্বন্দ্ব কোলাহলময় সংসারের একটা বিজন কোণে সেই শান্তিময় কুটীরে বসিয়া বিনোদ বহু দিন পরে যে আনন্দ লাভ করিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

নরেন কাছারীবাড়ী হইতে পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিল। বিনোদ ফিরাইয়া দিল। 'বাবুকে বলিও, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আমার খাবার তৈয়ারী হবে।'

তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারের পর বিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের মশারীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। 'আজ রাত্তিরে যদি সেটা একবার দেন, তবে মশার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাই।'

ভট্টাচার্য্য। নিশ্চয়। ব্রাহ্মণী! সে মশারীটা কোথায়?

ব্রাহ্মণী। সেটা লুকিয়ে রেখেছি। আজ কাল এখানে চোরের ভয় খুব।

সেই অন্ধকার রাত্রিতে পিতৃশ্রাদ্ধের মশারী স্কন্ধে, মিষ্টার বসু, এম-এ, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল বিজন আম্রকানন ভেদ করিয়া পুরাতন বাস্তুভিটায় প্রবেশ করিলেন। বনমালী তাহার পুরাতন প্রভুপুত্রের পদসেবা করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিল। মশারী সত্বেও বিনোদের নিদ্রার একটু ব্যাঘাত হইয়াছিল; কেন না, বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল।

৪

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া আমাদের দেশে একটা নূতন বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। বিধবা এবং বৃদ্ধ ৺কাশীধামে আশ্রয় লইয়া থাকে (ব্রাহ্মণ)। পরিবারের রাজা ও রাণী এবং তদীয় পুত্র কলত্র কলিকাতায় বাস করে, এবং মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয় করিতে দেওঘর, মধুপুর, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে ধনুর্ব্বাণ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (ক্ষত্রিয়)। মাতুল, খুল্লতাত প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন দেশে বাস করিয়া নানাবিধ সাধু ও অসাধু উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে (বৈশ্য)। এক দল নীরবে চক্ষু মুদিয়া কলিকাতার বাটী পাহারা দেয়, এবং রোগ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া আনে, এবং রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে (শূদ্র)।

পুরাতন বাস্তুভিটার উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিনোদ তাহার মাতাকে একবার দেশে আসিতে পত্র লিখিল। মিসেস্ বসুর পিতাও সিমলা হইতে 'দিগ্বিজয়ী' কন্যাকে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অচিরাৎ গ্রামে একটা 'হুলস্থূল' পড়িয়া গেল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় চরাচর যেমন শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, সকলে মনে করিল, সেই রকম একটা কিছু অবশ্যম্ভাবী।

বিনোদ ধনশালী। বিনোদের বন্ধু মল্লিকপুরের জমীদার। মামলা জিতিলে নরেন্দ্র বিনোদের সহিত একত্র হইয়া মল্লিকপুর নূতন করিয়া পত্তন করিবে। নরেন চট্টোপাধ্যায় সেই আশায় এখনও বিবাহ করে নাই। সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইবে। যৌথকারবার ও সমবায়-সমিতির সৃষ্টি করা হইবে। গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আসিবে। আর কাহাকেও কুইনাইন খাইতে হইবে না। কৃষির উন্নতিসাধন করা হইবে। গ্রামে অনেক-

গুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। নৈতিক উৎকর্ষের জন্য সকলের চরিত্রের অনুসন্ধান ও আলোচনার নিমিত্ত একটা গুপ্ত সমিতির অনুষ্ঠান করা হইবে। শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষার আগার নির্ম্মাণ করা হইবে। এই রকম নানাবিধ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হইয়া সকলে পথে ও মাঠে কানাঘুষা আরম্ভ করিয়া দিল।

বিনোদ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জমীদারদিগের সম্পত্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়াছিল। উভয় পক্ষের বিবাদের কোনও মীমাংসাই হয় নাই। তবুও সাত দিন ধরিয়া বিনোদ একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এক জন পত্রবাহক একখানা পত্র লইয়া বিনোদের হস্তে দিল।

'টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন ষ্টেশনে বসিয়া আছি, গাড়ী পাল্কী কিছু নাই। যত লোক আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমাকে ঘিরিয়া আছে এবং দৃষ্টিশর বর্ষণ করিতেছে। ভীষ্মদেবের মত আমি শরশয্যায় কাতর।—কোহিনূর।'

দেখিতে দেখিতে ষোল জন বাহক একটা পাল্কী লইয়া ছুটিয়া গেল। দুই ঘণ্টার পর কোহিনূর (মিসেস্ বসু) ভদ্রাসনের নিম্ববৃক্ষের তলে আশ্রয় লইল।

বিনোদ স্ত্রীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এই আমাদের পুরাতন বাড়ী।

কোহিনূর। আমার অনেক দিনের সাধ,—এই রকম জায়গায় এসে দিন কতক কাটাই। চিরজীবন হ'লেও হানি নাই। তবে—

বিনোদ। তবে কি ?

কোহিনূর। তবে আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। আমি যে রকম ক'রে পত্তন কর্‌ব, তাতে তুমি বাধা দিতে পার্‌বে না।

বিনোদ। আমার সে ইচ্ছা মোটেই নাই। ইচ্ছা হ'লে তুমি দোতালা ক'রে নিতে পার।

কোহিনূর। আমি ঐ নিমগাছের উপর একটা ঘর বেঁধে তপস্যা কর্‌ব।

বিনোদ। তাতে আপত্তি নাই। মধ্যে মধ্যে একবার নীচে এসে দেখা দিও। এখন আহারের একটা বন্দোবস্ত কর। সরঞ্জাম প্রস্তুত।

কোহিনূর একখানা বঁটী লইয়া রন্ধনশালায় পটল কুটিতে বসিয়া গেল। বিনোদ একখানা চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ভৃত্য বনমালী মশলা বাটিতেছিল।

কোহিনূর। সে কথাটা কত দূর?

বিনোদ। নরেন ম্যানাকে বিবাহ করিতে রাজি।

ম্যানা কোহিনূরের ছোট ভগ্নী। বিনোদের বড় ইচ্ছা, ম্যানার সহিত নরেনের বিবাহ হয়। তবে প্রকাণ্ড বাধা এই যে, নরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু নরেন্দ্র বলিয়াছে যে, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

কথাটা শুনিয়া কোহিনূর সানন্দে বলিল, 'খুব চমৎকার! আজ নরেনকে খেতে বল।'

বিনোদ। তবে আমি একখানা চিঠি লিখি।

নরেন পত্র লিখিতেছিল। সহসা বনমালী বলিয়া উঠিল, 'বৌদিদির হাত কেটেছে।'

বিনোদ ছুটিয়া গিয়া দেখিল, কোহিনূর লাউ কুটিতে গিয়া তাহার হাত কাটিয়া বসিয়া আছে।

কোহিনূর। এগুলো আমাদের পক্ষে Extinct art। যেমন ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী জপ, আর দিদিমার চর্‌কা। এখন বাকি তরকারিগুলো কোটে কে?

বিষম সমস্যা। বিনোদ তার রুমালখানি ছিঁড়িয়া কোহিনূরের অঙ্গুলিতে জড়াইয়া দিল, এবং জল দিতে লাগিল।

বনমালী ছুটিয়া গিয়া ভট্টাচার্য্য-তনয়া বিমলাকে ডাকিয়া আনিল।

বনমালী। দাদাবাবু! বামুন দিদি এসেছেন, তিনি তরকারী কুটে দেবেন।

বিমলাকে রন্ধনশালার দ্বারে দেখিয়া কোহিনূর বিনোদের হস্ত হইতে অঙ্গুলি টানিয়া লইয়া বলিল, 'আমাকে এঁর সঙ্গে introduce ক'রে দেও।'

বিনোদ। ইনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মেয়ে বিমলা। আমাদের প্রতিবাসী।

৫

কোহিনূর। এত সুন্দরী প্রতিবাসিনী আছে, আগে জান্‌লে আমি তরকারী কুট্‌তে বস্‌তেম না। (বিমলার প্রতি) আমি কে জান?

বিমলা (হাসিয়া)। আমার বৌদিদি।

ইহা বলিয়া সে কোহিনূরের অঙ্গুলিতে জলসেচন করিল।

কোহিনূর। বেশী কাটে নাই, তবে উনি—

বিমলা। বিনোদ দাদা?

কোহিনূর। হাঁ, তোমার বিনোদ দাদা মনে করেছিলেন যে, ভয়ানক কেটে গেছে, এটা তাঁর অপরিসীম ভালবাসার গুণে।

বিনোদ। তবে আমি চিঠিখানি লিখি গিয়ে। তোমরা তরকারী কুট্‌তে আরম্ভ কর।

বিনোদ চলিয়া গেল।

কোহিনূর। তোমার বিয়ে হয় নাই ত?

বিমলা। না।

কোহিনূর। বিয়ে হ'লে প্রথমে আঙ্গুলগুলো অথর্ব্ব হয়ে পড়ে। রুক্ষ হয়ে যায়। ভ্যাসিলিন্ মাখাতে হয়। শেলাই কর্ত্তে গেলে ছুঁচ ফুটে যায়। তরকারী কুট্‌তে গেলে হঠাৎ কেটে যায়। তবে কি জান? যত কষ্ট হয়, ততই দুঃখ উথ্‌লে উঠে, মরণের সাধ হয়। এই যে নিরিবিলি বনে এসেছি, এখানে রোগ শোক হ'লে দেখবার কেউ নাই।

বিমলা সাদরে কোহিনূরের কর তাহার করযুগলে আচ্ছাদন করিয়া বলিল, 'আমি ত আছি।'

অতিশয় স্নেহভরে সেই সত্যবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, নচেৎ কোহিনূরের মত গর্ব্বিতা স্ত্রী তাহাকে কোলে টানিয়া আনিত না।

'আমি তোমার মত এক জন Sister of mercy চাই। দেখ! কল্‌কেতায় ও সিম্‌লা পাহাড়ে তোমাদের মত সুন্দরী, প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়। কেউ কাহাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে না।

বিমলা। কেন?

কোহিনূর। তারা এখনও শেখে নাই। যাদের বংশ খুব পুরাণো, যারা এককালে ধর্ম্মের সঙ্গে সংসার বাধ্‌ত ও ঈশ্বরকে ভক্তি করত, সেই সব লোকের মধ্যে দুটো একটা এখনও পারিজাত গাছের মত এখানে ওখানে পাওয়া যায়। বেশ। তুমি আমাকে তরকারী কোটা আর পূজো অর্চ্চনা করতে শেখাও, আমি তোমাকে সভ্যতার আবরণ শেখাব।

বিমলা। সভ্যতার আবরণ কি বৌদিদি?

কোহিনূর। মনের দুঃখ লুকিয়ে রেখে বাইরে অনেক রকম ভাব ভঙ্গীতে সকলের মন রাখার নাম সভ্যতার আবরণ।

বিমলা ইতিমধ্যে 'বৌদিদি'র চুল খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে বসিয়াছিল। কোহিনূর বলিল, 'আমি এখন এলো চুলেই থাক্‌ব। তুমি তরকারী কুট্‌তে থাক, আর আমি সভ্যতার আবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি।'

বিমলা ক্ষিপ্রহস্তে এক একটা তরকারী লইয়া কুটিল, এবং ক্রমে সেগুলি মশ্‌লা মাখাইয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিল।

কোহিনূর। অনেকে বলে 'সভ্যতা'র ভঙ্গী মুদ্রাদোষ। কিন্তু আমার মতে তা নয়। আমাদের জীবনে একটা গভীর দুঃখ বরাবর থেকে যায়। জীবনের কি কর্ত্তব্য, তা জান্‌তে না জান্‌তেই মরণ এসে পড়ে। কোনও সাধই মেটে না, লাভের মধ্যে যেগুলোকে ভালবাসা যায়, সেগুলো হয় ত দাগা দেয়, কিংবা সংসার ছেড়ে যায়।

এই দারুণ দুঃখের মধ্যে বাইরের মানুষগুলো ভূত প্রেতের মত নৃত্য করে। দাঁত বের করে হাসে। আড়-নয়নে চায়। গদ্য ও পদ্য রচনা করে। বিদ্যার পরিচয় দেয়। এই ভূতোর দৌরাত্ম্য এড়াবার জন্য আমাদেরও অভিনয় শিখ্‌তে হয়। যদি ঈশ্বরের পদতলে পঁহুছানই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে যজ্ঞস্থল থেকে এই ভূতগুলোকে তাড়ানর যে মন্ত্র তাহারই নাম সভ্যতা। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি নির্জ্জনে গিয়ে সাধনা করতেন। এ কালে তা হবার যো নাই। চারি দিকে মানুষের মেলা। তোমাদের দেশে ম্যালেরিয়া হয় ত?

বিমলা (মৎস্য ভাজিতে ভাজিতে)। খুব।

কোহিনূর। তাই এখনও রক্ষা পেয়েছ। যদি কল্‌কেতায় থাক্‌তে, তবে ছত্রিশ জাতির নজর তোমার উপর পড়্‌ত। সে কালে সেই জন্য অবরোধ প্রথা ছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে কোথায়ও রক্ষা নাই। তুমি বাইরে মাঠে ঘাটে বেরোও ত?

বিমলা। খুব।

কোহিনূর। তোমার দিকে কেউ চেয়ে থাকে না?

বিমলা। আমরা যে ব্রাহ্মণ।

কোহিনূর। আমি জানি যে, এক কালে ব্রাহ্মণ দেবতার মত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণের শত্রু হয়। আচ্ছা, জমীদারদের ছেলেরা তোমার দিকে কেউ চায় না?

কোহিনূর দেখিল, দুইখানা মাছ পুড়িয়া গিয়াছে। বিমলার কোমল হস্ত যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল।

কোহিনূর দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বী লইয়া বসিল, এবং বাম হস্ত বিমলার স্কন্ধে রাখিয়া বলিল, 'বোন্‌, তোর মনের কথা আমাকে বল্‌ না। আমিও তোকে একদিন বল্‌ব।'

বিমলা কোহিনূরের স্পর্শে আকৃষ্ট হইল। একবার কোহিনূরের অতুলনীয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই সে 'কোহিনূর'—গিরিগুহার

লুকানো আলোক। তার শেষ কথায় সঙ্গে স্বর্গের সংস্পর্শ ছিল, নচেৎ বিমলার আজ তাহার হৃদয়ের লুকানো কথা বলিবার এত সাধ হইল কেন?

বিমলা। জমীদারদের নরেন বাবু আমার দিকে মাঝে মাঝে চায়।

কোহিনূর। শুধু 'চায়' কেন? ভালবাসে ত? আমি তোমার দিকে চাহি কেন? তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ব ব'লে।

বিমলা। বৌদিদি, মাছগুলো পুড়ে গেল যে।

কোহিনূর। তুই দুখানা পুড়িয়েছিস্‌, আমি সবগুলো পোড়াব। নয় ত ঠিক কথা বল্‌।

বিমলা সলজ্জে ধীরে ধীরে বলিল, 'সে একবার বলেছিল "বাসে", কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে, তা জানিনে।'

কোহিনূর। আচ্ছা, তুই এখন মাছগুলো ভাজ্‌।

●

সন্ধ্যা। বিনোদ চিঠি লিখিয়াছিল। নরেন নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে। বিমলা অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া ও নানা রকম জলখাবার তৈয়ারী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোহিনূর বিমলার চুল নূতন ধরণে বাঁধিয়া দিয়াছিল। বিমলা বাড়ীতে গিয়া মাতাকে বলিল, 'মা! বৌদিদি একটি লক্ষ্মী। তাঁর মত রূপ গুণ মানুষের হয় না।'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'বেঁচে থাকুক।'

ব্রাহ্মণ। ওরাই আমাদের এ দুর্দিনে সহায়। জাত্‌ গেলে কি হয়? দেবতাদের কি জাতবিচার আছে?

ব্রাহ্মণী। তাও কি কখনও হয়। যদি লক্ষ্মী হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জাতে উঠবে।

কোহিনূর ইতিমধ্যে ফুলের টব সাজাইয়া ও রঙ্গীন পর্দ্দা খাটাইয়া পুরাতন বাটী সাজাইয়া লইয়াছিল। সন্ধ্যাদীপ ঘরে জ্বালিয়া কোহিনূর স্বামিসন্নিধানে গেল। বিনোদ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নরেনের মোকদ্দমার 'ব্রীফ' লিখিতেছিল।

কোহিনূর। নরেন মোকদ্দমা জিত্‌বে ত?

বিনোদ। নিশ্চয়। ম্যানার অদৃষ্ট ভাল।

কোহিনূর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া বলিল, 'চল, একবার ছাতে যাই।'

উভয়ে ছাতে গিয়া বসিল।

আকাশে একটা পাখী ডাকিয়া গেল,—'টি-টি-হুইট্'।

বিনোদ (চমকিয়া)। এটা সেই পাখী!

কোহিনূর। তোমার ছেলেবেলার পাখী?

বিনোদ (মুখচুম্বন করিয়া)। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

কোহিনূর। তোমার ডাইরিতে পড়েছিলুম। আচ্ছা, আমাদের গাছে ঐ পাখী বাসা করে না?

বিনোদ (হাসিয়া)। সে আমার বাধ্য নয়।

কোহিনূর। আমার বাধ্য হবে। তুমি যাকে চাও, আমিও তাকে চা'ব। দু' জনে মিলে ডাক্‌লে সে আপনিই এসে পড়্‌বে। এক মন না হলে ঘর সংসার বাঁধে না। এই দেখ!—

কোহিনূর আকাশের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'আয়! আয়! সোনার পাখী আয়!'

বৃক্ষের একটী ডাল হইতে পাখী ডাকিল,—'টি-টি-হুইট্'।

বিনোদ অবাক হইয়া অন্ধকারময় আম্রকাননের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কোহিনূর (সহাস্যে)। দেখ্‌লে ত? তোমার মত মূর্খ জগতে নেই। তুমি যাকে ভালবাস, সে স্বভাবতঃ তোমার কাছে ঘুরে বেড়াবে—নিশ্চয়। আমি তোমাকে সত্যি বল্‌ছি, ও পাখীটার বিয়ে হয় নাই। দু' দিনের মধ্যেই এই গাছে বাসা কর্‌বে। ওর বিয়েতে আমি দু' শো টাকা খরচ কর্‌ব।

বিনোদ কোহিনূরকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, 'আচ্ছা!'—

এমন সময় বাহিরে নরেন আসিয়া ডাকিল, 'বিনোদ!'

স্বামী স্ত্রী ছুটিয়া নীচে গেল।

কোহিনূর তার পোর্টম্যান্টো হইতে 'এসেন্স' লইয়া নরেনের রুমালে সেচন করিল।

'আজ আমার আঙ্গুল কেটে গিয়েছে, তাই 'শেকহ্যাণ্ড' কর্ত্তে পার্‌লুম না। নরেন্‌, কিছু মনে করিও না।'

নরেন্দ্র খুব দুঃখ প্রকাশ করিল। তাহাতে কোহিনূরের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া গেল।

কোহিনূর। কি কোমল মন তোমার! আর উনি একবার একটা উহু দূরে থাক্, আহাও করেন নাই!

বিনোদ। নিজের লোকের জন্য কে আবার দুঃখ প্রকাশ ক'রে থাকে?

কোহিনূর। পরের কাছেই যখন সুখ দুঃখের কথা, তখন আমি নরেনকে নিয়ে পুষ্করিণীর পাড়ে যাই।

উভয়ে গিয়া পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের প্রথম সোপানে বসিল।

নরেনের সহিত ম্যানার বিবাহ এক রকম স্থির হইয়া যাওয়া অবধি কোহিনূর নরেনকে অনেক কথা বলিত। আজ কিন্তু কোহিনূর ধর্ম্মকথা পাড়িল।

কোহিনূর। আচ্ছা নরেন, তোমাদের জমীদারীতে যারা মিথ্যে কথা কয়, তাদের তোমরা কি ক'রে শাস্তি দেও?

নরেন। সেকালে ভটচায্ ব্রাহ্মণরা তাদের একঘরে কর্‌ত। এখন সত্য মিথ্যার বিচার বড় কেউ করে না।

কোহিনূর। এতে কি দেশের মঙ্গল হচ্ছে। আচ্ছা, মিথ্যে বল্‌তে বল্‌তে পশুর মত চেহারা হয়ে পড়ে, তা তুমি দেখছ?

নরেন। না।

কোহিনূর। আমি দেখেছি। আমাদের বেশী বয়স হ'লে মুখের আর তেমন শ্রী থাকে না। মিথ্যা কথা ব'লে কদাকার হয়ে পড়ে।

নরেন। কি আশ্চর্য্য!

কোহিনূর। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আমাদের প্রতিবাসী এক জন ভটচায্ আছেন, তিনি বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র জানেন?

নরেন (সাশ্চর্য্যে)। কেন বলুন ত?

কোহিনূর। তাঁর একটী মেয়ে আজ এসেছিল। তেমন সুন্দরী আমি ত দেখি নাই। নাম্‌টা ভুলে গেলুম—তোমার জানা আছে?

নরেন। একটা মেয়ে সেকালে দেখেছিলেম, কিন্তু তার নাম জানি না।

দূর হইতে বিনোদ ডাকিল, 'খাবার প্রস্তুত'। উভয়ে উঠিয়া গেল।

কোহিনূর পরিবেশন করিতে লাগিল। নরেন্দ্র তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া বলিল, 'চমৎকার রান্না! আপনি যে এত সুন্দর রাঁধেন, তা জানতুম্ না। জন্মে কখনও এমন রান্না খাই নাই।'

কোহিনূর 'হো হো' করিয়া হাসিল, 'তোমাকে খুব ঠকিয়েছি। এ রান্না-গুলি সব ঐ ব্রাহ্মণের মেয়ে বিমলার। আমি কেবল খানকতক মাছ পুড়িয়ে ভেজেছি। 'উনি' পোড়া মাছ ভালবাসেন। যার যেমন সখ।'

নরেনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

৭

বিনোদের অধ্যবসায় ও স্নেহের গুণে নরেন মামলা জিতিয়াছে। আজ মল্লিকপুরে মহা উৎসব ও উল্লাস। প্রজাগণ মুক্তহৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিল।

কারণ, নরেনকে সকলেই ভালবাসিত। অপর সরিকের উৎপীড়নে তাহারা দুই বৎসরাবধি গ্রামখানি ছাড়িয়া অন্যত্র বসতির আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কৃপায় সে কষ্ট তাহাদের পাইতে হইল না।

মামলা জিতিয়া হাইকোর্টে বিনোদের খুব পসার জমিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, মল্লিকপুরের উভয় তরফই বিনোদের 'বাঁধা ঘর' হইয়া গেল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই বেশী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কোহিনূর স্নানের পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিমলা দৌড়িয়া আসিল।

ব্রাহ্মণী কতকগুলি পুরাতন বস্ত্র লইয়া কাঁথা শেলাই করিতেছিলেন। কোহিনূর নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণী। ওমা, এলো চুল কেন? বিমলা! চুল বেঁধে দে। কি সুন্দরই মা লক্ষ্মী আমার!

কোহিনূর। আজ গ্রামে এত ঘটা কিসের মা?

ব্রাহ্মণী। তুমি বুঝি জান না? অমাবস্যার দিন কালীপূজা হবে। ঐ যে জমীদারদের বাড়ীর নরেন, সে মাম্‌লা জিতেছে। নরেনের বাপ আমাদের যজমান ছিলেন, আজ আমাদের কত আহ্লাদ!

কোহিনূর। নরেন কি যজমান নয় মা?

ব্রাহ্মণী (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে)। আজকাল কি লোকের ধর্ম্মে মতি আছে মা?

কোহিনূর। এ পূজার খরচ দেবে কে?

ব্রাহ্মণী। তোমাদের ভটচায্‌ মশায়ই খরচ দেবেন। তাঁর যে কত আহ্লাদ! ছেলেবেলা তিনি নরেনকে কোলে ক'রে মানুষ করেছেন। তবে কি জান মা? প্রজারাই খরচ জুগিয়ে দেবে। তারা সকলে ব্রাহ্মণের বাধ্য।

কোহিনূর। মা! এখনও ঐ ভাব বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে দেশটা ধ্বংসের হাত এড়াতে পারে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে রকম গোলমাল বেধে উঠেছে, আর আমাদের দেশে যেমন ছত্রিশ জাতি ও দলাদলি, এ সময় ধর্ম্মের একটা বাঁধনী

না থাক্‌লে সকলে পরস্পরকে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেল্‌বে। সকলেই যদি নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য ক'রে স্বাধীন হ'তে চায়, তবে আমাদের দেশের এই শেষ।

ব্রাহ্মণী। তোমরা চ'লে গেলে কি আর বাঁধনী থাক্‌বে? আগে সকলে দেশে থাকৃত, তখম দেশের কত শ্রী ছিল!

কোহিনূর। আমরা তাই মনে ক'রেই দেশে এসেছি।

ব্রাহ্মণী। তোমরা থাক্‌তে পারবে না। চারি দিকে দৈন্যদশা, জ্বর জ্বালা, জলের অভাব; বনবাদাড় ও ডোবা, চাষাভূষো লেখাপড়া জানে না, এর মধ্যে থাক্‌বে কি ক'রে?

কোহিনূর। মা! এই প্রজাদের উপার্জ্জনের অংশ নিয়েই ত দেশের অর্থ। সকলে সমান ভাবে থেকে পরস্পরকে সাহায্য কর্‌লে দৈন্যদশা থাক্‌বে না। সকলে মিলে চেষ্টা কর্‌লে জ্বর জ্বালা তাড়ান' আর জলের অভাব দূর কর্‌তে কতক্ষণ! বনবাদাড় ডোবা পরিষ্কার করা দু'দিনের কাজ। এখানে যেমন রোগে আমরা অপদার্থ হয়ে পড়ি, সহরে আর এক রকম রোগ আমাদের ঘিরে ফেলেছে। দশ জনের গোলমালের মধ্যে থেকে সেটা আমরা বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু সেখানে আমাদের কোনও কর্ম্ম নাই, কেবল নিজের আরামের জন্য ব্যস্ত। সেই আরামটুকু লাভ করতে গিয়ে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই, আয়ুঃক্ষয় হয়ে আসে। এ রকম মরার চেয়ে বনবাদাড় ও জ্বর জ্বালার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মরা ভাল। সুস্থ সবল হতে না পার্‌লে, দেশের জল বায়ু ও মাটীর সঙ্গে নাড়ীর টান না থাক্‌লে, আমরা পরস্পরকে ভালবাস্‌ব কি ক'রে? ভবিষ্যতে আমরা একটা জাতি ব'লে মুখ তুলে দাঁড়াব কি করে'?

বিমলা কোহিনূরের চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কথাগুলি শুনিতেছিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন সেও সেই কথাগুলি মধ্যে মধ্যে ভাবিত।

ব্রাহ্মণীকে নীরব দেখিয়া কোহিনূর একটা প্রস্তাব করিল।

'দেখ মা! এই কালীপূজো আমাদের পুরানো বাড়ীতে হ'লে কি হয়? আমি সব খরচ দেব। আমার শাশুড়ী লিখেছেন যে, তিনি তা হ'লে কাশী থেকে আস্‌বেন। কত লাগ্‌বে, দু তিন হাজার টাকা বৈ ত নয়?'

বিমলা। বৌদিদি! দু—তিন—হাজার! এত টাকা ত কখনও শুনি নাই, কেবল বইতে পড়েছি।

ব্রাহ্মণী। লক্ষ্মী মা! তোমার ইচ্ছে আর ভগবানের ইচ্ছে এক।

ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে ব্রাহ্মণকে খবর দিতে গেলেন। বিমলা সেই অবসরে লুকাইয়া 'বৌদিদি'র গণ্ডদেশে একটী ছোটখাট কোমল চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইল।

চুল বাঁধা তখনও শেষ হয় নাই।

কোহিনূর মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বিমলা, সত্যিই তুই নরেনকে ভালবাসিস্?'

বিমলার মুখের কোনও উত্তর না পাইলেও বিমলার কম্পিত অঙ্গুলি কোহিনূরের কেশরাশির মধ্যে নীরবে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ বাহির হইতে স্কন্ধে একখানা গামছা বাঁধিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কোহিনূর চুল বাঁধিতেছে দেখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন না। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বাহিরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বার হইতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! এ কথা কি সত্য?'

কোহিনূর অঞ্চলের এক কোণে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'সত্য! তবে আমরা ত প্রায়শ্চিত্ত করি নাই।'

ব্রাহ্মণ। মা! স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা যদি দেশের ভাঙ্গা পরিত্যক্ত পুরানো বাড়ীতে ফিরে এসে ঈশ্বরী ঈশানীর পূজা কর, এর চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আমি ত শাস্ত্রে খুঁজে পাই নে।

কোহিনূর অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া ভক্তিভরে দাঁড়াইল, এবং ব্রাহ্মণের মুখের দিকে নতনয়নে চাহিল।

'আপনি সকলকে খবর দিয়ে যোগাড় করুন।'

৮

গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, আজ নিশাকালে বসুজা মহাশয়ের পুরানো বাড়ীতে সকলের মঙ্গলের জন্য কালীপূজা হইবে। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলে মাঠে ঘাটে কোলাহল করিতেছিল। যেন সকলের দেহের মধ্যে একটু প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল।

বিনোদ শয্যা হইতে তখনও উঠে নাই। এটা অত্যন্ত অন্যায় মনে করিয়া কোহিনূর বিনোদের গলা টিপিয়া তুলিল।

বিনোদ বাতায়নের মধ্যে সূর্য্যকিরণ দেখিতে পাইয়া সলজ্জে বলিল, 'তাই ত! অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে।'

কোহিনূর তাহার আর্দ্র কেশ অঞ্চলে জড়াইয়া সগর্ব্বে বুঝাইয়া দিল যে, বহুদিন পরে আজ সে প্রাতঃস্নান করিয়াছে!

'আর একটা কথা। তোমার সেই পাখীটি নিমগাছে এসে' বাসা করেছে। কিন্তু একটা মজা দেখ নাই, তার বিয়ে হয়ে গেছে!'

বিনোদ। অসম্ভব! বিশ্বাস হয় না।

'আচ্ছা, তবে দেখ!'

ইহা বলিয়া কোহিনূর অঙ্গুলি দিয়া বৃক্ষের একটা ডালের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। সত্যসত্যই সেখানে দুইটী পাখী বসিয়াছিল

বিনোদ আহ্লাদে হাসিয়া খুন! কোহিনূর বলিল, 'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, আমি আজ কালীপূজোর সংযম করেছি।'

বিনোদ। তোমার এ কালীপূজোটা কি রকম দাঁড়াবে, বুঝতে পাচ্ছিনে। দু তিন হাজার টাকা খরচ হবে কিসে? এ দেশে মুড়ী মুড়কী ছাড়া আর কি পাওয়া যায়?

কোহিনূর। তোমরা কেবল আহারটাই দেখ। তুমি নিজেই খরচ করে দেখ, আমি সন্ধ্যার সময় সব বুঝিয়ে দেব।

তার পরেই কোহিনূর খুব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। বিমলাকে ডাকিয়া আনিল। গ্রামের অনেক কৃষকবধূ আসিয়া জুটিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাহিরে বড় সামিয়ানার নীচে জমীদার ও প্রজাগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উৎসবে যোগদান করিল।

বিনোদের মাতা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে বাটী আরও উজ্জল হইয়াছে। জমীদারদিগের 'বড়' গৃহিণী নরেনের মাতা বিনোদের মাতাকে পুনর্ব্বার দেশে দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া কথা কহিতেছেন।

এমন সময় কোহিনূর আসিয়া বলিল 'মা, পূজোর আয়োজনটা আপনি একবার ক'রে দিন, আমি ত ভাল জানিনে।' ইহা বলিয়া সে 'ক্যাশ'-বাক্সটি শাশুড়ীর পদতলে রাখিয়া দিল।

বিনোদের মা (জমীদার-গৃহিণীকে দেখাইয়া)। ইনি কি বলছেন, তা জান না? নরেন নাকি জাতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার ভগ্নী ময়নাকে বিয়ে করবে?

কোহিনূর। আপনারা কি পাগল হয়েছেন? আমি থাকতে তা হ'তে দেব কেন?

জমীদার-গৃহিণী কোহিনূরের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। এমন লক্ষ্মী বৌ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।'

বিনোদের মাতা আহ্লাদে মুখ ভরিয়া হাসিলেন।

কোহিনূর। আমি নরেনের জন্য ভাল একটী পাত্রী খুঁজে বের করেছি। সন্ধ্যাবেলা তার কথা বল্‌ব।

সন্ধ্যাকালে নরেন্দ্র পুষ্করিণীর পাড়ে সেই অপূর্ব্ব উৎসবের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। নির্জ্জনে তাহার পশ্চাতে আসিয়া কে ডাকিল, 'নরেন!'—

নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, কোহিনূর।

কোহিনূর। নরেন, প্রতিমা দেখ্‌বে এস।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে কোহিনূরের সঙ্গে দেবীমন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

কোহিনূর নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, 'একটা মনের কথা তোমাকে আজ বলব। তুমি সে দিন মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে। এক দিন মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমার ভাই, কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছ।'

নরেন। আমি অপরাধী। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

কোহিনূর। আছে। তুমি দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে, বিমলাকে বিবাহ করিবে?

নরেন্দ্র কোনও কথা কহিল না।

কোহিনূর আবার বলিল, 'বিমলা তোমার স্ত্রী হইলে যত সুখী হব, এমন আর কিছুতেই হব না। আমার এক সময় সাধ হয়েছিল যে, তুমি আমার ভগিনীপতি হও। কিন্তু সে সাধের চেয়ে আরও একটা বড় সাধ আমার হয়েছে। সেটা দেশের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য। নরেন! প্রতিজ্ঞা কর।'

নরেন। আচ্ছা, তাই হবে।

কোহিনূর নরেনকে আরও কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। উভয়ের পবিত্র অশ্রুজল ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার সিক্ত করিল।

মঙ্গল-আরতি হইয়া গিয়াছে। বিনোদ জননীর সহিত মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া। বহু লোকসমাগমের মধ্যে নরেন্দ্র ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। এমন সময় একটী রমণী হীরকের নেক্‌লেস্‌ লইয়া ধীরে ধীরে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য। মা! প্রণাম কর।

কোহিনূর সেই বহুমূল্য হীরকের অলঙ্কার দেবীর চরণে রাখিয়া প্রণাম করিল। অনেকে সেই ব্যাপার দেখিতে আসিল। তখন ব্রাহ্মণ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—'আজ আমাদের পূজা সার্থক।

তোমাদের একটা নূতন সংবাদ দি। আমাদের জমীদার উভয় সরিক মিলে এই গ্রামের উন্নতির জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করেছেন। সে টাকা কৃষকদের জন্য। আর সকলের এক বৎসরের খাজানা মাফ্ ক'রে দিয়েছেন। আরও একটা কথা, আমাদের বসুজা মহাশয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ তাঁর কণ্ঠের বহুমূল্য হার ধর্ম্মের জন্য এই মন্দিরে উৎসর্গ করেছেন। আজ হ'তে এই পুরানো বাড়ীতে নূতন কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন সকলকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হও।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

'সাম্রাজ্য' বা 'একতন্ত্র'।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সাম্রাজ্যের বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক প্রত্নবিদ্যাপারদর্শী প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৯১৩ সালের "The Modern Review" পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের "হিন্দু রাজনীতির সূচনা" নামক রচনা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

গত বৈশাখের "সাহিত্যে" আমরা যে 'সংঘ' বা 'গণতন্ত্রে'র আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেকের বিশ্বাস, সেই রাজ্যগুলি কুটিলধী চাণক্যের কূটজালে স্বাধীনতা হারাইয়া চন্দ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে এবং চন্দ্রগুপ্তই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সম্রাট্। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত ১০২৪ সালের সাহিত্যে, (জ্যৈষ্ঠ, পৃষ্ঠা ১৪৬) এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও Vincent Smith এর ন্যায় বিচক্ষণ ঐতিহাসিকও এই প্রকার মতের পোষকতা করেন। সংঘগুলির পরিণতি সাম্রাজ্য এবং চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সম্রাট্ এই দুইটী মতই ঐতিহাসিক প্রমাণবিরুদ্ধ। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় দ্বিতীয় মতটীর আলোচনা করিব।

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের একতন্ত্রের বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে যুদ্ধব্যাপার হইতেই একতন্ত্রের উদ্ভব হয়। আমাদের 'রাজার' উৎপত্তিও পুরাতন গ্রন্থে এইরূপ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (ঐ. ব্রা. ১।৩।১৪।) লিখিত আছে যে, "অসুরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবগণ স্থির করেন যে 'রাজা' না থাকাই তাঁহাদের পরাজয়ের কারণ। তখন সকলের সম্মতিক্রমে এক জন 'রাজা' মনোনীত হইলেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক রাজা বা 'রাজকৃৎ' ছিলেন (অথর্ব্ববেদ, ৩।৩।৩; ৩।৭।৫)।' 'সমস্ত প্রজার 'সমিতি'

একমত হইয়া তাঁহাকে মনোনীত করিতেন এবং তাঁহার উপাধি "রাষ্ট্রপতি"। 'দলপতি' বা 'জননায়কে'র পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতি' উপাধির ব্যবহারে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ প্রাচীন কালেই 'রাষ্ট্র' বা 'রাজ্য' বোধ সকলেরই নিকট সুপরিচিত ছিল। সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থা দলবদ্ধ ভাবে অবস্থান (tribal stage), সভ্যতার উন্নতি ও স্ফুটতর বিকাশের সহিত 'রাষ্ট্র' বোধ (state conception) উদ্বুদ্ধ হয়। "ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়" ইত্যাদি (অথর্ববেদ ৩।১।৪।) হইতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত প্রজা একত্র মিলিত হইয়া "রাজা" নির্ব্বাচন করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) বর্ণিত বারানসীর পশ্চিমে ভারতরাজ্য, উত্তরে কোশলরাজ্য, যমুনার সন্নিহিত সৌরসেন ও মৎস্যরাজ্য এবম্বিধ রাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থল। মধ্যপ্রদেশে আর্য্যবিজয় ও আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনের ফলে ঐ রাজ্যগুলি ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

রাজ্যস্থাপন ও উপনিবেশ উপলক্ষে আর্য্যগণ যখন দোয়াবে (Doab) অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই সকল অনার্য্য শূদ্রজাতির দৃষ্টান্তে তাঁহারাও রাষ্ট্রনীতিতে সাম্রাজ্যপন্থী হইয়া উঠিলেন। পঞ্জাবে এই অনার্য্য প্রভাব কম ও মগধে বিশেষ প্রবল থাকায়, পঞ্জাবে না হইয়া মগধেই প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। এই সাম্রাজ্যতন্ত্র দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম অংশে অর্থাৎ ইতিহাসপূর্ব্ব বা পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) এই সাম্রাজ্য, বৈদিক আদর্শের মহাভারতে বর্ণিত জরাসন্ধের সাম্রাজ্যের ন্যায় গঠিত হইত। এক জন সম্রাট্, মহারাজ বা রাজচক্রবর্তীর অধীনে আরও অনেক রাজা থাকিতেন। ইঁহাদের সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে স্বপ্রধান ছিলেন এবং উপস্থিতন সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন। দ্বিতীয় যুগের সাম্রাজ্যের গঠনরীতি বিভিন্ন। ইহাকে 'একাধিপত্য সাম্রাজ্য-তন্ত্র' নাম দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বযুগের স্ব স্ব প্রধান রাজগণের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশ এক জনের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য ইহার নাম 'একাধিপত্য' এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের একটী বৃহত্তর সমষ্টির ভিতরে অবস্থানের জন্য ইহার "সাম্রাজ্য" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত রাজ্যতন্ত্রের নাম "মহারাজ্য" এবং দ্বিতীয়টীর নাম "সাম্রাজ্য" দিলে ইহাদের গঠনের তারতম্য বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং এই তারতম্য প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচী বা পূর্ব্বমগধের রাজ্যতন্ত্র "সাম্রাজ্য" ও মধ্যদেশের ও প্রথমোক্ত রাজ্যতন্ত্র "মহারাজ্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) ঐন্দ্রাভিষেক অধ্যায়ের "আসমুদ্রং একরাট্" এই সাম্রাজ্যবোধের আভাস বহন করিয়া আনে। "মহারাজ্য"-বোধের পরিণতি সাম্রাজ্যবোধ এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচ্য বা মাগধ সাম্রাজ্য। শূদ্ররাজ্যগুলি অধিকার করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃতির জন্য মগধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টা ও উদ্যমের চিহ্ন "আসমুদ্রং একরাট্" কথায় রহিয়া গিয়াছে। মগধসাম্রাজ্যই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সাম্রাজ্য। এখন ইহার প্রতিষ্ঠাপনের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

খ্রীঃ পূঃ ৬৫০ হইতে ৩২৫ শতাব্দীতে আর্য্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রস্থানের বিভাগ "মধ্যদেশ" নামে পরিচিত। মনুর সময়ে ইহার উত্তরে

হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে প্রয়াগ ও পশ্চিমে বিনশন। বিনয়পিটকে বর্ণিত আবন্ত-দক্ষিণাপথে মহাকচ্চায়নের গল্প হইতে জানা যায় যে, বৌদ্ধ পালি ধর্ম্মপুস্তক রচনা কালে পূর্ব্বে প্রয়াগ ছাড়াইয়া কাজঙ্গল (কানিংহামের মতে বর্ত্তমান ভাগলপুর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধজাতকে 'মজ্‌ঝিমদেশে'র উল্লেখ আছে। হর্ষচরিত ও পালিজাতক হইতে অবগত হই যে, মধ্যদেশের দক্ষিণে রাষ্ট্রবিভাগের নাম "দক্ষিণাপথ" ও উহার উত্তরে "উত্তরা-পথ"। অঙ্গুত্তরনিকায় প্রচলিত "ষোলস-মহাজানপদে"র উল্লেখ করিয়াছেন—অঙ্গ, মগধ; কাশী, কোশল; বজ্জী, মল্ল; চেতি, বংস; কুরু, পঞ্চাল; মচ্ছ, শূরসেনা; অস্সকা, অবন্তি; গন্ধার, কম্বোজ (Rhys David's Buddhist India দ্রষ্টব্য)। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেশের নাম, কতকগুলি দেশবাসীর নাম; কতকগুলি আবার জাতির নাম, যেমন বজ্জী ও মল্ল। দুইটী পরস্পর সন্নিহিত দেশের নাম একত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার অধিকাংশের বিবরণ পালিজাতক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বজ্জী ও মল্লার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, ঐ তালিকাভুক্ত দেশগুলি বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। জাতকের ভূমিকাতে মাত্র তাহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূল গল্পের ভিতর নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ, অন্ততঃ আর্য্য অধ্যুষিত ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল, এবং সময়ে সময়ে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। মগধের রাজবংশের ন্যায় ঐক্ষাকু বা কোশলরাজ, পঞ্চাল, কাশেয়, আঙ্গক, কুরু, যৌধিন প্রভৃতি রাজগণ রাজ্যশাসন করিতেন। ইঁহাদের উপর কোনও সম্রাট্ ছিলেন না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিলেন এবং কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের একত্র সমাবেশ ও সমষ্টির ফলে একাধিপত্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় আমাদের আলোচ্য।

বুদ্ধের সময় চারিটী প্রধান রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়,—মগধ, কোশল, বংস ও অবন্তি। পালি বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্য হইতে জানা যায় যে, অবন্তীর চণ্ডপ্রদ্যোৎ, বংসের উদয়ন, কোশলের পসেনদি ও তৎপুত্র বিদূড়ভ এবং মগধের অজাতশত্রু ও তৎপুত্র বিম্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য, তাঁহারা পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন। এই সময় নির্দ্ধারণে আমরা পুরাণ হইতে অনেক সাহায্য পাই, তবে পুরাণের প্রমাণ বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। বুদ্ধের সমসাময়িক চারিটী রাজ্যের ভিতর যৌন-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরে কোশাম্বীরাজ উদয়নের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে ইঁহার পিতার নাম শতানীক; ভাসের 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ইঁহাকে লইয়া রচিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাঁহার এবম্বিধ উল্লেখ দৃষ্ট হয়—'চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ও জয়ের' আশা না থাকিলে নৃপতি সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবেন। কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি সুযাত্র ও উদয়নের ন্যায় ক্ষমতা ফিরিয়া পাইতে পারেন।" মজ্‌ঝিমনিকায় এই রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণ মতে প্রদ্যোত অবন্তি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। ভাসের গ্রন্থে তিনি মহাসেন নামে উল্লিখিত। কৌশাম্বীর উদয়ন অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন

এবং এই প্রদ্যোতের আক্রমণের ভয়ে মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহ নগর অনুপদে সজ্জিত করেন (মজ্ঝিমনিকায় দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পসেনদি ও বিদূড়ভ কোশলরাজবংশের রাজা ছিলেন। পুরাণে বিদূড়ভ ক্ষুদ্রক নামে উল্লিখিত। আমরা পুরাণ হইতে জানি যে, বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মগধের রাজা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সিংহলের মহাবংশ আর একটী এবং আমার বোধ হয়, পুরাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ। এই মগধ রাজবংশের উপাধি নগ। বিম্বিসার-বংশের শেষ নৃপতি মহাবংশে নগ-দশক নামে উল্লিখিত। মহাবংশে বিম্বিসারের উপাধি "সেনিয়" অর্থাৎ সেনাপতি। বিম্বিসার বৈশালীর বজ্জীদিগের সেনাপতি ছিলেন, পরে তাহাদিগকে গঙ্গার পর পারে দূর করিয়া দিয়া মগধ অধিকার করেন ও রাজগৃহে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বিম্বিসার পরে অঙ্গ জয় করিয়া মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে বিম্বিসার ৮০,০০০ নগরে আধিপত্য বিস্তার করেন, (মহাবগ্গ দ্রষ্টব্য)। একটী জৈন গ্রন্থমতে তিনি বৈশালী রাজতনয়া চেল্লনার পাণিগ্রহণ করেন ও "নহন-চুন্ন-মূল্য" (স্নান ও গন্ধ মূল্য) স্বরূপ কাশীপ্রদেশ লাভ করেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে এই কাশী লইয়া তাঁহার সহিত পসেনদির বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ হয়, পরিশেষে পসেনদি তাঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন ও ঐ কাশীদেশ দান করেন। মহাপরিনিব্বানসুত্ত হইতে জানা যায়, অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবিদিগকে পরাজিত করেন ও পাটলীগ্রাম দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ করেন। দীঘনিকায় ও মহাবংশমতে উদয়ভদ্র পিতা অজাতশত্রুকে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন; লিচ্ছবি, মল্ল, ও কোশলের কিয়দংশ মগধ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন ও রাজ্যের কেন্দ্রস্থান কুসুমপুর বা পাটলীপুত্রে রাজধানী সংস্থাপন করেন। নাগ-দশক এই বংশের শেষ রাজা। প্রজাসাধারণ এই রাজপরিবারের পিতৃহত্যা প্রভৃতি অসদাচরণে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং এই সুযোগে সেনাপতি শুশুনাগ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ইনি নাগ বংশেরই এক জন, তবে গৌণভাবে সম্পর্কিত। এই শুশুনাগ মগধের অধীশ্বর হইয়া পরে অবন্তি ও কাশীকোশল জয় করেন। পরিশেষে বৎসরাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে শুশুনাগ পঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র কালাশোকের সময় রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মসংঘের অধিবেশন হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৩।২)। এই প্রসঙ্গে বার্ম্মীয় কিম্বদন্তী ও মহাবংশ দ্রষ্টব্য। তাঁহার পরে তাঁহার দশ পুত্র একত্র রাজত্ব করেন। ইহাঁদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া নন্দবংশ মগধের সিংহাসন লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস হইতে অবগত হই যে, এই নবনন্দ একত্র রাজত্ব করেন। এইরূপে নয় জন অথবা দশ জন রাজার একত্র রাজ্যশাসনরূপ শাসনতন্ত্রের আলোচনা বারান্তরে করিব। পুরাণমতে মহাপদ্ম নন্দবংশের প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১০০,০০০ নিযুত সৈন্য বা ধনের অধিকারী ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার আখ্যা "উগ্রসেন" অর্থাৎ প্রচণ্ড সেনার প্রভু। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মগধ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া কাশী-কোশল, অবন্তী এবং কৌশাম্বী রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ইহার পর যখন পুরাণে বর্ণনা দেখি যে, মহাপদ্ম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্ট বোধ হয় তিনি শুধু উত্তর

ভারত এবং দক্ষিণ ভারতেরও অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। অতএব উগ্রসেন মহাপদ্মই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম সম্রাট্, একাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী।

পুরাণমতে মহাপদ্ম শূদ্রামাতার গর্ভজাত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ক্ষৌরকার উপপতির ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি নীচবংশোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য পুরাণকারগণ ঐ সময় হইতে কাল নিরূপণ করিয়া থাকেন, যেমন মহাপদ্মের সিংহাসনারোহণ হইতে পরীক্ষিতের জন্মকাল ১০৫০ বৎসর গত এবং তাঁহার সময় হইতে শেষ অন্ধ্র রাজা পুলুমায়ির সময় ৮৩৬ বৎসর। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই মহাপদ্মকেই Xandrames নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য মোক্ষমূলার অনুমান করেন যে, Xandrames শেষ নন্দের গ্রীক-ভাষান্তরিত নাম [Sanskrit Lit. p. 279]. ক্ষত্রবংশের নামযুক্ত এবং বৌদ্ধ চিহ্ন সম্বলিত কয়েকটি মুদ্রা হইতে মিঃ টমাস্ (Mr. Thomas) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নয় জন নন্দ একত্র রাজত্ব করেন, তাঁহাদের ভিতর ক্ষত্রনন্দ প্রধান ও তিনিই Xandrames [cf. Elphinstone's History of India (1889) p. 151.] নবনন্দের একত্র-রাজত্ব রূপ সাম্রাজ্যভঙ্গের প্রকারবিশেষ ঠিক করিতে না পারিয়া পূজ্যপাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ইতিহাসে নন্দ ও তাঁহার আট পুত্রকে ১০০ বৎসর রাজত্ব করাইয়াছেন এবং চন্দ্রগুপ্তকেই ভারতের প্রথম সম্রাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (cf. Hist. of India, Shastri p. 13)। এই হেতু তাঁহার মতের সাফল্য রক্ষিত হয় নাই। আমি দেখাইয়াছি যে, মহাপদ্মনন্দই ভারতের যথার্থ সর্ব্বপ্রথম একাধিপতি সম্রাট্; চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নির্ম্মিত সাম্রাজ্য হস্তগত করেন ও তাহাতে কেবল পঞ্জাব প্রদেশ যোগ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিকা (Indica), আনাবেসিস (Anabasis) ও প্লুটার্কের (Plutarch) মত এই সিদ্ধান্তের অনুকূল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের আদিতে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার আভাস "আসমুদ্রং একরাট্" (ঐতরেয় ব্রা.) মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার চরম পরিণতি ও সার্থকতা উগ্রসেন-মহাপদ্ম সাধিত ভারতে "ঐকৈশ্বর্য্যং অমাত্যাঃ কারয়েৎ। [Arthashastra, p. 253.] হিমবৎসমুদ্রান্তরমুদীচীনং যোজনসহস্রপরিমাণমতির্য্যক্ চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্" ইহারই শেষ সাফল্য চন্দ্রগুপ্তের "হিন্দুকুশ হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল একাধিপত্য সাম্রাজ্য।" প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত পরে বলিতেন যে, আলেকসান্দার ইচ্ছা করিলেই মগধ জয় করিতে পারিতেন [cf. McCrindle's translation], কিন্তু পোরাস এ সম্বন্ধে আলেকসান্দারকে অন্যরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন [cf. Diodorus Siculus] এবং ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই মগধ সাম্রাজ্যের সমরশালা দিগ্বিজয়ী বীর আলেকসান্দারের সিংহবাহিনীর হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, বিশ্বজয়ী বীরকে মগধের দ্বার হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে, হতাশ-হৃদয়ে ফিরিতে হইয়াছিল।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হৃদয়-শ্মশান।

খ

[বিন্দুমাধবের কথা।]

১

আমার দুর্ভাগ্য কত দিন হইতে আমার অনুসরণ করিতেছিল— বলিতে পারি না। তবে আমার শৈশবেই আমার সহিত তাহার পরিচয়। কেন না, আমি শৈশবে পিতৃহীন এবং জ্ঞানলাভাবধি মাকে ভক্তি করিতে পারি নাই। যে পিতার স্নেহ সম্ভোগ করিতে না পায় এবং মাকে ভক্তি করিতে না পারে, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমি পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিলাম। কখনও ভগবানে বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু সে বিশ্বাসের অভাবও জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে সর্ব্বদাই অনুভব করিয়াছি, আমি কখনও পিতার নিকট হইতে দূরে থাকি নাই। তিনি আমার হৃদয়ে—তিনি আমার জীবন জুড়িয়া—আমি কখনও তাঁহাকে হারাই নাই।

আমার স্বভাবতঃ স্বল্প ভক্তির কমণ্ডলু শূন্য করিয়া আমি পিতার পদেই প্রদান করিয়াছিলাম। মার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট রাখিতে পারি নাই। আমার মাতার হৃদয়ে পুরুষোচিত কঠোরতার আধিক্য ছিল, নারীজনোচিত স্নেহশ্রদ্ধার অভাবই লক্ষিত হইত। সেই অভাব আমি তাঁহার কাছ হইতে লাভ করিয়াছিলাম। মার স্নেহও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় ও কনিষ্ঠা ভগিনীতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল—মধ্যবর্ত্তী আমার জন্য অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই তাঁহার স্নেহ আমার শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বিশেষ যে পিতাকে আমি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতাম, তাঁহার প্রতি মার শ্রদ্ধার অভাব আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক বোধ হইত যে, মাকে আমি কিছুতেই ভক্তি করিতে পারি নাই। মার বিচারে পিতার অপরাধ—তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কেই সম্পত্তির ও পুত্র কন্যার সব ভার দিয়া গিয়াছিলেন; মাকে কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব দিয়া যান নাই। অথচ এই ব্যবস্থায় বাবা মার চরিত্রজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছিলেন—মা যে কিছুতেই কাহারও সঙ্গে বনাইয়া চলিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিয়াই তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ, যাহাই কেন হউক না—

আমি যে পুত্র হইয়া মাতাকে ভক্তি করিতে পারি নাই, তাহাতেই বুঝা যায় —আমি জন্ম দুঃখী।

কিন্তু সে দুঃখ তখন তীব্রভাবে অনুভব করিতে পারি নাই। কারণ, পিতামহী তখন সংসারের কর্ত্রী। পিতামহী সেকালের পাকা গৃহিণী—বাসুকী যেমন বসুন্ধরাকে মাথায় করিয়া আছেন—তেমনই ভাবে সংসার মাথায় করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্বে গৃহে কেহ কখন তাঁহার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিত না—রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে ঠাকুরঘরের সব কাজ স্বয়ং করিয়া সংসারের কাজ করিতেন। ছেলেদের দুধ জ্বাল দেওয়া হইতে কলেজের ছেলেদের ভাত দেওয়া, সব ব্যবস্থা করিয়া—পূজা শেষ করিয়া "স্বপাকে" খাইতেন। বিধবা পুত্রবধূ—আমার মা—তাঁহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রশংসনীয় বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে পিতামহীর স্নেহ ক্ষুণ্ণ হইত না। মনে আছে, মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে দ্বাদশীর দিন প্রাতে বিনিদ্র রজনীর অবসানে তিনি প্রথমেই মাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। মা আসিলে কাকীমাকে ডাকিয়া মার জন্য জলখাবার গুছাইয়া দিতে বলিলেন—বলিলেন, "কাল নিরম্বু আছে—আজ আমি মরিলে আজও ত মুখে জল দিতে পারিবে না।" পিতামহীর এই স্নেহও মার হৃদয়ে ভালবাসার উৎস মুক্ত করিতে পারে নাই। আর পিতামহীর স্নেহমন্দাকিনীর কূলে বাস করিয়া আমি কখনও মার স্নেহের অভাবও যেন বুঝিতে পারি নাই।

যে জন্মদুঃখী সেও সুখের আশা করে। নহিলে আমি সংসারে সুখী হইবার আশা করিলাম কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর সংসারে ছেলে মেয়ের বিবাহ পরম্পরাক্রমে, যেন সংসারের স্বাভাবিক রীতিতে সম্পন্ন হইয়া যায়। তাই যখন আমার পালা পড়িল, তখন আমারও বিবাহ হইয়া গেল। সুন্দরী নাতবৌ লইয়া ঠাকুরমা দুই বৎসর কত আনন্দে রহিলেন—তাহার পর শয্যা লইলেন। সে-ই তাঁহার মৃত্যুশয্যা।

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর সংসার যেন "লক্ষ্মীছাড়া" হইয়া গেল। যিনি সব দিকে, সব কাজে দৃষ্টি রাখিতেন, তিনি নাই; যিনি সংসারের কেন্দ্র ছিলেন, তিনি নাই—সুতরাং সংসার থাকিবে কেমন করিয়া? সংসার যে ভাঙ্গিল—সে জন্যও প্রধানতঃ দায়ী আমার মা। তাঁহার বৈধব্যের জন্য পিতামহী যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে স্নেহে আগুলিয়া থাকিতেন। তিনি কাহারও দোষ

সহিতে পারিতেন না। জেঠামহাশয় বিদেশে ওকালতী করিতেন—জ্যেঠাইমা কালেভদ্রে তথায় যাইতেন—বড় ছেলে মেয়েরা কলিকাতার সংসারেই থাকিত। প্রথম সরিলেন জ্যেঠাইমা। তাঁহার দুই পুত্রের কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার প্রয়োজন। উভয়েই কলেজের ছাত্রাবাসে গেলেন। জ্যেঠাইমা নির্ব্বিরোধী লোক—গোল দেখিয়াই সরিয়া গেলেন—বলিলেন, "আমি কি মেজবৌর সঙ্গে ঝগড়া করিব? শাশুড়ী মরিতে না মরিতে একটা গোল হইলে—আমি বড়—লোক আমারই দোষ দিবে।" মা বলিলেন, "দিদির বরাবরই ইচ্ছা ছিল—স্বাধীন হয়েন; ভাশুর বড় মাতৃভক্ত, তাই এত দিন পারিয়া উঠেন নাই।" জ্যেঠাইমা ঠাকুরমার ছায়ার মত থাকিতেন—তাই তাঁহার স্নেহ হইতে আমিও বঞ্চিত হই নাই। মার ব্যবহারে জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলেন—মনে বড় দুঃখ পাইলাম। জ্যেঠাইমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে যাইয়া বলিলাম, "জ্যেঠাইমা, আমাকে লইয়া চল।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "এও যেমন তোমার বাড়ী—সেও ত তেমনই। যখন ইচ্ছা যাইবে। আমার সুরেন নরেন অন্তিমে মুখে জল দিলে তাহাতেও যেমন তৃপ্তি হইবে, তুমি দিলেও তেমনই হইবে।" আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি চলিলে কেন?" এইবার জ্যেঠাইমা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; বলিলেন, "সে আমার অদৃষ্টের দোষ।" জ্যেঠাইমার গলাটা ধরিয়া আসিল—তিনি গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা তোমরা ত সবই বুঝ। মা মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, সংসার যেন নষ্ট না হয়। আমারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে—তোমার জ্যাঠারও বয়স হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম, মার কথা রাখিতে পারিব। অদৃষ্টের দোষে হইল না—তা—তাহা না হয় না হউক—তোমরা সুখে থাক।"

জ্যেঠাইমা যেমন শান্ত ছিলেন—কাকীমা তেমন ছিলেন না। বিশেষ কাকার উপর মার রাগের ঝালটা অধিক পড়িতে লাগিল। জ্যাঠামহাশয় বিদেশে থাকিতেন—বাবার মৃত্যুর পর হইতে কাকাই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। কাজেই মার সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাপারে কাকার মতান্তর হইত। মা ক্রমে একটু অধিক মাত্রায় "উষ্মা" প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাকা সব সহ্য করিলেন—কাকীমার "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" যুক্তিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। কিন্তু মন ভাঙ্গিলে সংসার জোড়া রাখা বিড়ম্বনা—সেই বিড়ম্বনায় কাকার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। সংসার নামে মাত্র এক রহিল—একান্নবর্ত্তি-পরিবারে অন্নটাই এক রহিল।

ইহার পরই বধূদ্বয়ের সঙ্গে মার মনকষাকষি চলিতে লাগিল। কিন্তু মানুষ একটা অবলম্বন চাহে—বিশেষ দাদা দুর্ব্বল বলিয়া মার আশ্রয় কিছুতেই ত্যাগ করিতেন না—সেই জন্য বড় বধূর সঙ্গে তাঁহার মনের মিল না থাকিলেও "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" হিসাবে বনিত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সংসার অশান্তির আগার হইল।

২

দাদার মত আমার প্রতি মার যেমন স্নেহের আতিশয্য ছিল না—আমারও তেমনই তাঁহার প্রতি ভক্তিভালবাসার আতিশয্য ছিল না। স্নেহের আতিশয্য এবং ভক্তিভালবাসার আতিশয্য উভয়ই মানুষকে দোষবিষয়ে অন্ধ করে। আমার পক্ষে তাহার কোনও কারণ ছিল না। কাজেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কারণে অকারণে মার যখন গোল বাধিত তখন ব্যাপারটা সব জানিতে পারিলে মার দোষের পরিমাণ-নির্ণয়ে আমার বিলম্ব হইত না। সুতরাং সমস্ত ঘটনা যদি স্থির ও ধীর ভাবে আমার গোচর হইত, তবে কি হইত বলা যায় না। কারণ, আমি অশান্তির সংসারে বাস করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম। আমার মনে যে পারিবারিক সুখলাভের বলবতী বাসনাও ছিল, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, আমার স্ত্রীর বিষয়ে আমার বিশেষ দৌর্ব্বল্য ছিল—তাঁহার প্রতি আমার প্রেমের মাত্রাধিক্যই ছিল। তিনি দোষ করিলেও আমি তাহা মনে রাখিতে পারিতাম না। আমার কল্পনা তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া কত সুখাবাস-রচনায় কল্পনাই করিত! তখন আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতিয়া বাহির হইয়াছি—চাকরী আমার পক্ষে দুর্লভ হইত না। চাকরী লইয়া যদি আমি বিদেশে যাইতাম, তবে আর কোনও আপদ থাকিত না। আমার স্ত্রী যদি আমাকে সব কথা শান্তভাবে যথাযথ বলিতেন, তবে হয় ত আমি সেইরূপ একটা ব্যবস্থাই করিতাম।

কিন্তু তাহা হইল না—মাও যত ফুটিতে লাগিলেন, আমার স্ত্রীও তত ফুটিতে লাগিলেন। বিরক্তির বাতাসে—মনান্তরের বারিতে—অশান্তির কিরণে ফুটিলে যেমন হয়, তেমনই হইতে লাগিল। আমার স্ত্রীর লাঞ্ছনাতিক্ত হৃদয় আমার সঙ্গে অপ্রিয় ব্যবহারেই আত্মপ্রকাশ করিত। যেন আমিই তাঁহার সমস্ত দুঃখের কারণ। আমারও জীবন তিক্ত হইতে লাগিল—আমার সুখের স্বপ্ন টুটিয়া গেল—আশার আলো নিবিয়া গেল। চাকরীর সন্ধান না করিয়া

ওকালতী করিবার আশায় আইন-বিদ্যালয়ে নাম লিখাইলাম। হয় ত ভুল করিলাম। কারণ, তখন যদি অশান্তির কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে পারিতাম, তবে হয় ত হৃদয়-শ্মশানে রাবণের চিতার মত অনির্ব্বাপিত বহ্নিদাহে দগ্ধ হইতে হইত না। তাহার পর নিঃসঙ্গ প্রবাসে—কত বিনিদ্র নিশায় সে কাজের বিশ্লেষণ করিয়াছি—তখন মনে হইয়াছে, আমার সে কাজের উদ্দীপক কারণ—অভিমান। হায় অভিমান—তুমি যেমন প্রেমকে মধুর কর, তেমনই তোমার প্রভাবে কত সময় প্রেমও পুষ্পিত হইতে পায় না। তুমি দুঃখের—কোথাও দুঃখের মধ্য দিয়া সুখের পথ বিস্তৃত কর—কোথাও দুঃখেই সব অবসান হয়।

আইন পড়িবার জন্য নাম লিখাইলাম—কিন্তু পাঠে মনোযোগ রহিল না। এমন কি মা ও দাদা কাহারও পরামর্শ লইলাম না বলিয়া তাঁহারাও অসন্তুষ্ট হইলেন। দাদার ব্যবহারে—আমার কাজে ঔদাসীন্যে সে অসন্তোষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত—মার ব্যবহারে তাহা ফুটিয়া উঠিল। মা বুঝিলেন, যাহার পক্ষে একটা বড় চাকরী সুলভ ছিল, সে যে সে পথ মাড়াইল না—সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর "সুপরামর্শে।" ইহাতে মার বিরক্তির আরও একটু কারণ ছিল। পূর্ব্বে সংসারে স্বচ্ছলতাই ছিল—জ্যেঠামহাশয়ের উপার্জ্জন, কাকার বেতন ও ভাড়াটিয়া বাড়ীর ভাড়া সব ঠাকুরমার কাছে আসিত। তিনি সেই আয় হইতে ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চয়েও সমর্থ হইতেন। এখন জ্যেঠামহাশয়ের উপার্জ্জন আর সংসারে আসিত না—মরুনদীর প্রবাহের মত অন্য পথে গিয়াছিল; কাকার বেতনের পরিমাণ অল্প; বাড়ীর ভাড়া ও সঞ্চিত অর্থের সুদ হইতে জ্যেঠামহাশয়ের দুই পুত্রের ছাত্রাবাসের ও কলেজের খরচ দিতে হইত। দাদা চাকরী পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য বেতনে। এ দিকে আয় কম হইল—ওদিকে মার হাতটা "খরচের হাত"—তিনি সংসারের কাজে "গোছ" করিতে পারিতেন না, কাকীমাকেও কাজের ভার দিতে চাহিতেন না; সংসারের ব্যয় বাড়িয়া গেল। তাহার উপর আবার আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি মার স্নেহের আতিশয্য—আদর-যত্ন অপেক্ষা "দেওয়া থোওয়া"তেই অধিক আত্ম-প্রকাশ করিত; সেজন্যও খরচ বাড়িত। সুতরাং আমি চাকরী না লওয়ায় মা বিরক্ত হইলেন।

মার বিরক্তি আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার আরও তিক্ত করিয়া তুলিল—আমার স্ত্রী সেই তিক্ত ব্যবহার তিক্ততর করিয়া আমাকেই দিতে লাগিলেন—আমি সেই গরল পান করিতে বাধ্য হইলাম। আমি চাকরী লইয়া

বিদেশে গেলাম না—ইহাও আমার প্রতি আমার স্ত্রীর অসন্তোষের আর একটা কারণ হইল। তখনই অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি আমার সব ব্যবহারেই কুটিল উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, পাছে বিদেশে গেলে তাঁহার "খেঁতলানি" বন্ধ হয়—তিনি স্বস্তি পাইতে পারেন —সেই জন্যই আমি সকলের কাম্য চাকরী লইলাম না।

আমি সাধারণতঃ অল্প কারণে বিচলিত হইতাম না—সহগুণ অনুশীলনে পুষ্ট করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই অভ্যাসলব্ধ কঠোরতার মধ্যে—মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত—কোমল অংশ ছিল। তথায় সামান্য আঘাতে আমি বিচলিত—ব্যথিত হইতাম, সময় সময় আপনাকে সামলাইতে পারিতাম না। স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম আমার হৃদয়ের সেইরূপ একটি দুর্ব্বল ও কোমল অংশ, আর একটি আমার কন্যার প্রতি স্নেহ। যখন সেই অংশেই আমি পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইতে লাগিলাম, তখন আমার পক্ষে অধ্যয়নে মন দিবার পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশেষ আইন অধ্যয়নে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল না। কাজেই তিন বৎসর পরে যখন পরীক্ষার সময় আসিল, তখন আমি বুঝিলাম—পরীক্ষায় সাফল্যলাভ অসম্ভব। পরীক্ষা দিলাম এবং অকৃতকার্য্য হইলাম।

তখন পরীক্ষা দিতেও আমার আগ্রহ নাই—অসাফল্যের উত্তেজনাও আমার হৃদয়ে সাফল্যলাভ-বাসনা প্রদীপ্ত করিতে পারিল না। তখন আমি সব কাজে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি—যাহাকে লইয়া সুখশান্তির নন্দনরচনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহার নিকট কেবল দুঃখ পাইয়াছি। কেবল তাহাই নহে—আমার ও আমার পরিবারের প্রতি বিদ্বেষবিষোদ্গার তখন আমার স্ত্রীর নিত্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকারণ হইতে ক্রমে সে কাজ অকারণ হইয়াছে—অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আমি যেন বারুদের স্তূপের মধ্যে বাস করিতেছিলাম—কখন কি হয় সেই শঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতাম—আমার স্নায়ুমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার ফলে দুর্ব্বল ও উত্তেজনাশীল হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মারলবরো তাঁহার পত্নীকে লিখিয়াছিলেন, তিনি শত্রুর বিরাট বাহিনীর অপেক্ষা ক্রুদ্ধা পত্নীকে অধিক ভয় করেন। মারলবরো সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই সেই ভয়ে থাকিতে হইত। এ অবস্থায় মানুষের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না—শত্রুরও যেন তাহা বুঝিবার দুর্ভাগ্য না হয়। যাহাকে "কাজের বাহির হইয়া যাওয়া"

বলে—আমি তাহাই হইলাম। আমি তাহা বুঝিতাম—বুঝিয়া দুশ্চিন্তায় আরও পীড়িত হইতাম; কিন্তু প্রতীকার করিবার প্রবৃত্তি প্রজ্বালিত করিতে পারিতাম না। কাজের অভাবে আপনার ক্ষমতা নষ্ট করা—সেও বিষম যন্ত্রণা। আমি সর্ব্বদাই শঙ্কায় উদ্বিগ্ন থাকিতাম—যাহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল বাসনা, তাহাকে দেখিলে ভয় পাইতাম—পাছে আবার বিরক্তির বিস্ফোরক বিদীর্ণ হয়।

৩

এ কথা ত অস্বীকার করিতে পারি না যে, তখনও আমার স্ত্রীর প্রতি আমার প্রেম তেমনই ছিল। নহিলে—কোন্ আশায় আমি তাঁহার প্রিয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম? যে পাড়ের কাপড়—যে সুগন্ধ দ্রব্য—যে বর্ণের চিঠির কাগজ খাম তিনি ভালবাসিতেন, আমার জানা ছিল। আমি গোপনে সে সব সংগ্রহ করিয়া আমার আলমারীতে লুকাইয়া রাখিতাম; কখন তিনি দেখিতে পাইলে লজ্জা পাইতাম—কিন্তু তাঁহার উপহাসব্যঞ্জক দৃষ্টিতে লজ্জার স্থান বেদনা অধিকৃত করিত।

এই সময় আমার শান্তি ও সান্ত্বনা ছিল—আমার তিন বৎসরের কন্যা সুবলা—আর উপন্যাসপাঠ।

পর বৎসর পরীক্ষা দিবার সময় আমি পরীক্ষা দিলাম না। আত্মীয় স্বজনরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; মার বিরক্তি ক্রোধে আত্মপ্রকাশ করিল। আর আমার স্ত্রী?—সে কথা আর মনে করিব না। কিন্তু দূরে জ্যেঠাইমা, বোধ হয়, আমার অবস্থা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। আমি জ্যেঠামহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—বোধ হয় নানা অশান্তির মধ্যে তোমার অধ্যয়নের অসুবিধা হইতেছে; তোমার জ্যেঠাইমার ও আমার ইচ্ছা তুমি বৌমাকে লইয়া আমার কাছে আইস। তোমার সম্মতি জানিতে পারিলে তোমার জ্যেঠাইমা বা আমি এক জন যাইয়া তোমাদের আনিব। আমাদের লইতে আসিলে মার কথার ঝাল সহিতে হইবে জানিয়াও যে জ্যেঠামহাশয় এই পত্র লিখিয়াছিলেন—সে জ্যেঠাইমার জন্য, আর বোধ হয়, মৃত ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়া। কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। এই প্রস্তাবেই জ্যেঠামহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার প্রতি যে সব কথা প্রযুক্ত হইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সে পথ বন্ধ করা সঙ্গত মনে করিলাম। আর এক কথা—জ্যেঠাইমা যখন চলিয়া গিয়াছিলেন,

তখনও আমার দুর্দ্দশা পূর্ণ হয় নাই—এখন আমি সস্ত্রীক তাঁহার কাছে যাইলে আমাদের স্বামিস্ত্রীর অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া তিনি কি মনে করিবেন? এ দুর্দ্দশা আমি জানাইতে পারিব না—আপনার বেদনা আপনি সহ্য করিব—সহানুভূতিলাভের আশাতেও প্রকাশ করিতে পারিব না। জ্যেঠামহাশয়কে লিখিয়া দিলাম, আমি এবার মন দিয়া পড়িতেছি। মিথ্যা কথা লিখিলাম। সংসারে মিথ্যার মধ্যে বাস করিতাম—জ্যেঠামহাশয়ের কাছেও সত্য গোপন করিলাম। যিনি আমার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন—তাঁহার কাছেও মিথ্যা বলিতে হইল।

৪

আমি অশান্তির কেন্দ্র হইয়া অশান্তিময় সংসারে বাস করিতে লাগিলাম। সংসারে অশান্তির ঊর্ম্মিমালা দিন দিন উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাকে ব্যথিত ও পীড়িত করিবার কৌশল আমার স্ত্রী যেন সযত্নে শাণিত করিয়াছিলেন। আমার কন্যার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই স্নেহের স্থানটুকুতেও আমাকে পীড়িত করিতেন। নানা অছিলায় তিনি মুরলাকে আমার কাছ হইতে দূরে রাখিতেন এবং আমারও পর করিয়া তাঁহারই আপনার করিতে প্রয়াস পাইতেন। আমি দার্শনিকোচিত চিন্তায় মনে করিতাম—তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ, মুরলা ত তাহার মার সম্পূর্ণ স্নেহ লাভ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে সে চিন্তা আপনার দৌর্ব্বল্য ও কাপুরুষতা গোপন করিবার আবরণ। আমার কন্যাকে আমার করিবার যে অধিকার, আমি সে অধিকার আয়ত্ত করিতেও সাহস করিতাম না। আর আমি যে মনে করিতাম, মুরলার বিবাহ না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি কর্ত্তব্যবন্ধনে বদ্ধ—সেও কাপুরুষতা। আমি তাহাই মনকে বুঝাইয়া রাখিতাম। কেন না, আমার মনে আশা ছিল—আমার স্ত্রীর প্রতি আমার অনাবিল প্রেম এক দিন জয়ী হইবে, সে দিন আমার স্ত্রী তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। হায় দুরাশা!

এই সময় আমার চক্ষু ফুটিল। সে দিন আমার কন্যা আমার কাছে আসিবার জন্য "বায়না" ধরিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রযুক্ত করিতেছিলেন, তাহাতে বালিকার মতপরিবর্ত্তন না হইলেও, আমি শুনিয়া বুঝিলাম, আমার প্রতি এই ঘৃণার আবহাওয়ার বর্দ্ধিত হইলে—মাতৃমুখে নিত্য আমার নিন্দা শুনিতে অভ্যস্তা হইলে সে কখনই আমাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না। এই

চিন্তায় যত ব্যথা পাইলাম, তত ব্যথা আর কিছুতেই কখন পাই নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, আর কেন? আর কিসের আশায়—কোন্ আকর্ষণে সংসারে থাকিব?

কিন্তু কি করিব—যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি, যে জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া ত সংসারের দ্বারে দাঁড়াইতে পারিব না। আপনার শক্তিতে আপনার জীবনোপায় করিব; আর আমার সংসারের উপর ভার না চাপাইয়া—যেমন করিয়া পারি মুরলার বিবাহের জন্য আবশ্যক অর্থের সংস্থান করিব। সেই সঙ্কল্প লইয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই মফঃস্বলে কোনও স্থানে চাকরী পাইলাম।

আর ফিরিব না—এমন কথা তখনও মনে করি নাই। তবে কবে ফিরিব, তাহাও স্থির করি নাই। "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে—মরণং গোমতী তীরে"—তাহাতেই বা আমার আপত্তি কি?

পত্র লিখিয়া উত্তর লইয়া যাত্রার দিন স্থির করিলাম। কবে ফিরিব, স্থির ছিল না—তাই আপনার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া ও গুছাইয়া রাখিয়া যাইব। ক্রমে সে সব শেষ করিলাম। কখন গৃহত্যাগ করি নাই—পিতার স্মৃতিপূত—বাল্যের খেলাঘর—যৌবনের স্বপ্নমাখা—কত সুখ দুঃখের লীলাভূমি গৃহ—বড় দুঃখে সে গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছিলাম। মনের কোণে ব্যথার কাঁটা যখন তখন বিদ্ধ হইতেছিল।

ক্রমে ষ্টেশনে যাইবার সময় হইল। আমি যাত্রার পূর্ব্বে একবার আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম—একবার সতৃষ্ণদৃষ্টিতে পরিচিত দ্রব্যাদির দিকে চাহিলাম—তাহার পর প্রাচীরে লম্বিত পিতার প্রতিকৃতির নিম্নে মস্তক ন্যস্ত করিয়া প্রণাম করিলাম। মনে হইল, বাবা তাঁহার হতভাগ্য পুত্রের মস্তকে তাঁহার স্নেহকরস্পর্শ দিলেন—সেই স্পর্শে আমার বুকের ব্যথা কমিয়া গেল। আমি অগাধ শান্তি পাইলাম।

আমি মাথা তুলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় "কাল বৈশাখী"র মত আমার স্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করিলেন—আমি যাইবার সময় একটা ঝড়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না কি চাকরী করিতে যাইতেছ?"

আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম, "হাঁ।"

ক্রোধদীপ্ত নয়নের দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আর আমাকে এই নরকবাস করিতে হইবে?"

উত্তরে অনেক কথা বলিতে পারিতাম—কিন্তু তত সময় ছিল না; আর এত দিন যদি সহ্য করিয়াছি, তবে যাইবার সময় আর উত্তর দিবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি পকেট হইতে ঘড়ী তুলিয়া সময় দেখিলাম।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া আমার স্ত্রী সুর আরও একটু চড়াইয়া বলিলেন, "তোমার মত স্বার্থপর আর জগতে আছে কি?"

আমার হাসি আসিল—আমি যে স্বার্থকে পদদলিত করিতে দিয়াছি। আমিই স্বার্থপর! আমি বলিলাম, "যদি এক দিন আমার চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাই বুঝিয়া থাক—তবে আজ দুই কথায় সে স্বভাব পরিবর্ত্তনের আশা কর কেমন করিয়া?"

আমি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলাম।

আমার স্ত্রী বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় তাঁহার ব্যবহারে "নরম" হইব—নহে ত যে চেষ্টায় তিনি কখন সফলকাম হইতে পারেন নাই, আজ তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইবে—আমিও সমানভাবে জবাব দিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথার প্রবাহমুখ মুক্ত করিয়া দিব। আমার হাসিতে ও উত্তরে তিনি জ্বলিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—নিষ্ফল আক্রোশের আতিশয্যে তাঁহার ক্রোধপ্রদীপ্ত নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "তাহা ত বলিবেই। গোষ্ঠীতে কাহারও ত লজ্জা নাই।"

তখনও আমি পিতার প্রতিকৃতির সমক্ষে দাঁড়াইয়া—বিদায়ের কালে সেই প্রতিকৃতি প্রণাম করিতে আসিয়াছিলাম। সেই অবস্থায়—আমি যাহা পবিত্র বলিয়া পূজা করি, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি—আমার জন্য আমার দেবতার লাঞ্ছনা! আমি মনে করিতাম, এত দিন সহ্য করিয়া করিয়া ক্রোধ জয় করিয়াছিলাম। আজ বুঝিলাম, তাহা নহে। দারুণ উত্তাপে তরল পদার্থ যেমন ফুটিতে থাকে, আমার হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য তেমনই ফুটিতে লাগিল। আমি বড় কষ্টে নির্ব্বাক রহিলাম। পাছে আর নির্ব্বাক থাকিতেও না পারি, সেই ভয়ে সবেগে আমার স্ত্রীর পাশ দিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দারুণ তাপে যেমন পদার্থের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এই ব্যাপারে তেমনই আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর ফিরিব না।

নামিয়া যাইতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে সুরলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কবে আসিবে?"

তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলাম। পকেটে আমার

আলমারার ও টেবিলের চাবি ছিল—তাহাকে দিয়া বলিলাম, "আমি আর ফিরিব না। আলমারীতে যাহা কিছু আছে তুমি লইও।"

আমি আর ফিরিব না, শুনিয়া বালিকার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই—পাছে আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না থাকে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাহাকে নামাইয়া দিয়া নিম্নতলে আসিলাম। তখন গাড়ীতে আমার জিনিস তোলা হইয়াছে। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে যাইব?" আমি বলিলাম, "না।"

আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। মা বলিলেন, "পৌছিয়া টেলিগ্রাম্ করিও।" শিয়ালদহে যাইবার কথা—আমি হাওড়ায় যাইয়া প্রথমে যে ট্রেণ পাইলাম, তাহাতেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলাম।

৫

তাহার পর? তাহার পর এই পাঁচ বৎসর লক্ষ্যহীন ভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। লক্ষ্যহীন! কিন্তু এক লক্ষ্য ছিল—আমি মুরলার বিবাহের ব্যয় সংগ্রহ করিব। তাহা করিয়াছি। চারি বৎসরে সে জন্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে কখন অধিক দিন এক স্থানে থাকি নাই। কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্থানান্তরে যাইয়া বাড়ীতে মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া আসিয়াছি। এমনই ভাবে চারি বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়াছি।

তাহার পর—যে লক্ষ্য ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল—জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য—কোনও আকর্ষণ নাই। এই এক বৎসর দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া বেড়াইয়াছি। তীর্থে গিয়াছি শান্তি পাই নাই—মন্দিরে গিয়াছি দেবদর্শনের ইচ্ছাও হয় নাই—কাজের অভাব যেন আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যখন যাতনা দুর্ব্বহ হইয়াছে, তখন পিতার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিখানি মস্তকে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়াছি। তাহাতেই একটু শান্তি পাইয়াছি।

শেষে—দুর্ব্বহ জীবনভার হইতে মুক্তিলাভের আশায় আত্মঘাতী হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাল্যকালের বন্ধু—যৌবনের সখা তুমি—তুমিই আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছ। তুমিই আমার হৃদয়-শ্মশানে চিতানল নির্ব্বাপিত হইতে দিলে না। কেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

২

অতি প্রাচীন কাল হইতে ইব্রিয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাদের অন্যতম শাখা ইহুদীদের মধ্যে এক্ষণেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। নোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী লেমকের (Genesis 4—19) দুই স্ত্রী এবং যাকোব (Genesis 29) ও দায়ুদ রাজার বহু পত্নী ছিল। ইব্রিয়-জাতীয় মহাপুরুষ আব্রাহামের Malkah, Bala ও Phelegash, এই তিন শ্রেণীর পত্নী ছিল। "মালকা" অর্থে (1 Kings 10—1) মহিষী ও Bala বালা অর্থে (1 Kings 17—17) গৃহিণী বা পত্নী, এবং ফেলেগাশ্ অর্থে দাসী-পত্নী। আব্রাহামের জ্যেষ্ঠা পত্নী "সারী" (Genesis 17—15) অর্থাৎ কুলীনা, পরে "সারা" অর্থাৎ মহিষী (Genesis 17—15) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বংশরক্ষার্থ যে "হাজারা"কে (১) (Genesis 15—4, 16—3) আব্রাহাম বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই "হাজারা" জায়া বা গৃহিণী, এবং "কটুরা" নাম্নী পত্নী দাসী-শ্রেণীর (Genesis 25—1, 6) অন্তর্গতা ছিলেন।

বহুবিবাহ।

আর্য্যদের বহুবিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩য় পঞ্চিকা, ১১শ খণ্ড) উত্তমজাতীয়া সবর্ণা পত্নী "মহিষী", মধ্যমজাতীয়া "বাবাতা", এবং অধমজাতীয়া "পরিবৃক্তা" বলিয়া অভিহিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নী থাকার কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭ম পঞ্চিকা, ১১শ খণ্ড) পাঠে অবগত হওয়া যায়।

রাজা দশরথের মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, এই তিন শ্রেণীর (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৪।৩৫) পত্নী ছিল। ঋগ্বেদের ১০।১০৪।৮ ঋকের সপত্নীপীড়ন ও ১০।১৪৫ সূক্তের সপত্নী-বশীকরণ ও দূরীকরণ মন্ত্র ও চেষ্টা দ্বারা প্রাচীন বৈদিক কালের বহুবিবাহ ও সপত্নীদ্বেষের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইব্রিয় নারীর সপত্নীপীড়ন, দ্বেষ এবং যন্ত্রণা দিয়া সপত্নী-দূরীকরণ, আব্রাহাম পত্নী সারা ও হাজারার বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি। রাণী কৈকেয়ী জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দশরথ দ্বারা যে প্রকার রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, আব্রাহাম-পত্নী সারাও তদ্রূপ

(১) "Ha'-ujra'ka" This is thy reward.—*Ranjatus Safa, Page 146.*

আব্রাহাম দ্বারা সপত্নী হাজারার পুত্র ইস্মায়েলকে জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মরুভূমিতে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। রাজা দশরথ যে প্রকার রামচন্দ্রের বনবাসে, তদ্রূপ আব্রাহামও ইস্মায়েলের নির্ব্বাসনে, অসুখী (Genesis 21—11,12) হইয়াছিলেন।

আর্য্য জাতির ন্যায় ইব্রিয় জাতির বিবাহে পূর্ব্বেই বাগ্দান কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। বাগ্দান হইলেই সেই কন্যা অর্দ্ধপত্নীরূপে গণ্যা (Deuteronomy 22) হইত। আবেস্তা গ্রন্থে প্রাচীন পারসীকদের বাগ্দান (Vendedad 15/32—32) প্রথার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাগ্দান।

প্রাচীন ইব্রিয় জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইব্রিয়-কন্যা রেবেকার যৌবনকালে ইসহাকের সহিত (Genesis 24—16) বিবাহ হইয়াছিল। রাহেল ও লেয়া পূর্ণবয়স্কা হইয়া যাকোবের সহিত (Genesis 29) বিবাহিতা হন। প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ ছিল না। যৌবনকালে আর্য্যকন্যার বিবাহ হইত। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।২১,২২ ও ১০।৪০।৯ ঋকে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাচীন পারসীক-কন্যাগণের পূর্ণ বয়সে (Khorda Avesta 49—2) বিবাহ হইত।

বয়স।

ইব্রিয় জাতির বিবাহ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম, এই চারি বারে প্রশস্ত (Smith's Dictionary of the Bible) বলিয়া গণ্য ছিল। দিবাভাগে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। সন্ধ্যা কি রাত্রিতে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত (Genesis 29 ও Matthew 25—6) হইত। "গুরু-শুক্র-বুধেন্দূনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ",—আধুনিক উদ্বাহ-তত্ত্বের এই বচন দ্বারা প্রাচীন আর্য্য জাতির বিবাহ যে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম, এই চারি বারে সম্পন্ন হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। "বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা", উদ্বাহ-তত্ত্বের এই শ্লোক দ্বারা, দিবাভাগে কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য ও অমঙ্গলজনক, তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীনকালে দিবাভাগেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমরা কিন্তু যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইহা সমর্থিত হয় না। কালিদাসের সময়েও যে রাত্রিকালে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহা আমরা কুমারসম্ভবের ৭।৬ শ্লোকে "মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু", অর্থাৎ চন্দ্রমার সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের যোগ ঘটিলে, এবং ৭।৭৫ শ্লোকের "ধ্রুবেণ ভর্ত্রা

বিবাহের লগ্ন ও ক্ষণ।

ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন ; সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য, হ্রাসন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ।" অর্থাৎ, প্রিয়দর্শন পতি ধ্রুব নক্ষত্র দেখিতে বলিলে গৌরী লজ্জাবশে মুখ উন্নমিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলেন, 'দেখিয়াছি'। ইহা দ্বারা বিবাহকার্য্যের আরম্ভ ও শেষ যে রাত্রিতেই হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত, যাহাতে রূপক ভাবে সূর্য্যার বিবাহ-উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বাদশ আদিত্য অর্থাৎ সবিতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, বিষ্ণু মার্ত্তণ্ডাদি সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে অন্য কোনও মূর্ত্তিকে কন্যা-সম্প্রদানকারিরূপে স্থাপিত না করিয়া সবিতাকে কন্যাকর্ত্তৃরূপে পরিচিত করা হইয়াছে, তাহা ১০।৮৫।৯ ঋকের "সবিতাদদাৎ" ও ১৩ ঋকের "প্রাগাৎ সবিতা" দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি। সকলেই জানেন, উদয়ের পূর্ব্ব অবস্থার সূর্য্য-মূর্ত্তিই সবিতা নামে পরিচিত। ১।৩৫।১০ ঋকের "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্বা যাত্বর্বাঙ্। অপসেধন্রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ"। অর্থাৎ, "হিরণ্যপাণি প্রাণদাতা সুনেতা হর্ষদাতা সবিতা অভিমুখ হইয়া আসুন, সেই দেব রাক্ষস ও যাতুধানদিগকে নিবারণ করিয়া প্রতি রাত্রি স্তুতিপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করুন।" ২।৩৮।১ ও ৬।৭১।৪ ঋকের "উদুষ্য দেবঃ সবিতা" এবং ৫।৮১।২ ঋকের দ্বারা বুঝিতে পারি, উদয়ের পূর্ব্ব অবস্থার সূর্য্য মূর্ত্তিই সবিতা নামে অভিহিত। তৎপরে উদয় হইতে (১০।১২৯।১ ঋক) পূষা, ভগ, অর্য্যমা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির আগমনকাল। এই সবিতা কন্যাকর্ত্তৃরূপে পরিচিত হওয়ায় প্রাচীন বৈদিক কালেও বিবাহকার্য্য যে রাত্রিতে, অন্ততঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী "জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়া মুদ্বহেৎনুজা" (উদ্বাহ-তত্ত্ব) অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা থাকিতে অগ্রে কনিষ্ঠার বিবাহ দূষণীয়। ইহুদি জাতির মধ্যেও এই প্রকার প্রথা ছিল। যাকোবের সহিত লেবার বিবাহকালের কথোপকথন—"লাবন কহিল, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য" (Genesis 29—26) ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ।

জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠার বিবাহ অকর্ত্তব্য।

প্রাচীন পারসীকদের মধ্যে বিবাহকালে কন্যাকে কিছু পরিমাণ শুল্ক দান করিবার প্রথা ছিল। আবেস্তা শাস্ত্রে Khord Avesta, 49) ইহার উল্লেখ আছে। আর্য্য জাতির বিবাহকালে বরকে শুল্ক নামে কিছু পরিমাণ অর্থ কন্যাকে দিতে হইত। "কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং

মোহর ও শুল্ক।

ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ। দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে।" (মনু ৯।৯৭) অর্থাৎ, বিবাহার্থ যদি কেহ কোনও শুল্ক দিয়া বিবাহের পূর্ব্বে গতাসু হয়, তবে কন্যা সম্মত হইলে, উক্ত শুল্কদাতার কনিষ্ঠের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে।" মনুসংহিতা-রচনার পূর্ব্বেও শুল্কপ্রদান-প্রথা প্রচলিত ছিল।

"নানুশুশ্রুম জাত্বেতৎ পূর্ব্বেষ্বপি হি জন্মসু। শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥" (মনু ৯।১০০) অর্থাৎ, পূর্ব্ব জন্মেও শুল্কচ্ছলে গোপনভাবে স্বীয় কন্যা বিক্রয় করিবার কথা শুনা যায় নাই।

বিবাহকালে কন্যাকে শুল্ক (মোহর) প্রদান প্রাচীন কাল হইতে ইব্রিয়. সমাজে প্রচলিত আছে। ইহা হিব্রু ও আরবীতে 'মোহর' নামে পরিচিত। বাবেল-বাসী প্রাচীন সেমীয়দের মধ্যেও মোহর দিবার প্রথা (Assyria and Babylon 40) প্রচলিত ছিল। কন্যাকে শুল্ক বা মোহর-প্রদান ব্যতীত বর পক্ষ হইতে ইব্রিয় কন্যার অভিভাবককে উপঢৌকন (Genesis 24—53) দিবার প্রথা ছিল।

ইব্রিয় বর শোভাযাত্রা করিয়া কন্যার পিত্রালয়ে (Genesis Jeremiah 25—10) গমন করিত; সঙ্গে গান বাদ্য (Genesis 31—27) থাকিত। বর কন্যার পিত্রালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে কন্যা-পক্ষ হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক আলোক-হস্তে (Matthew 25-1-10) বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইত।

শোভাযাত্রা।

বৈদিক কালেও আর্য্য বর শোভাযাত্রা করিয়া বিবাহ করিতে যাইত। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৬—১৩ ঋক পাঠ করিলে বুঝা যায়। রামায়ণের যুগেও (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৩।৩৮) বিবাহে গীত বাদ্য হইত।

বৈদিক বিবাহের শোভাযাত্রায় মশাল বা Torch থাকিত, তাহা ১০।৮৫।৮ ঋকের "অগ্নিরা আসীৎ পুরোগব" দ্বারা জানা যায়।

প্রাচীন কালে আর্য্য জাতির বিবাহে বর ও কন্যার সহচর ও সহচরী থাকিত। ইহা কুমারসম্ভব ৭।১৯ ও রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৪।৫ শ্লোক, এবং ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৬,৯ ঋক পাঠে জানিতে পারা যায়। ইব্রিয় বরের সহচর (Judges 14—11) ও কন্যার সহচরী (Matthew 25—1, John 3—29) থাকিত। স্বামীর আলয়ে গমনকালে ইব্রিয়-কন্যার সঙ্গে সঙ্গে দাসী (Genesis—26—11, 29—29) এবং সহচরী (Psalms 45—14) যাইত।

সহচর ও সহচরী

ইব্রিয়-কন্যা বিবাহদিনে স্নান, তৈলমর্দ্দন, নববস্ত্র-পরিধান (Ruth 3—3, Psalms 45—8) করিত। আর্য্য-কন্যাকেও বিবাহের পূর্ব্বে 'অভ্যঞ্জন' বা তৈলাদিমর্দ্দন (১০।৮৫।৭ ঋক) এবং "সূর্য্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্" (১০।৮৫।৬ ঋক) এবং "জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ" (৪।৩।২ ঋক) অর্থাৎ, কন্যাকে উত্তম বসন পরিধান করিতে হইত, ইহা জানা যায়। ইহার বিশদ বর্ণনা কুমারসম্ভবের ৭।৯—১১ শ্লোকেও আছে।

স্নান ও অভ্যঞ্জন, নব-বস্ত্র-পরিধান।

ইব্রিয়-কন্যার কেশবিন্যাসের বর্ণনা Isaiah 3—24 পদ পাঠে অবগত হইতে পারি। ইব্রিয় নর-নারীর নানা প্রকার কেশবিন্যাসের বর্ণনা বাইবেলের বহু পদে দৃষ্ট হয়। বিবাহকালে ইব্রিয়-কন্যার হস্তে একখানি দর্পণ দেওয়া (Isaiah 3—23) হইত। ইহা ধাতু-নির্ম্মিত ছিল। আর্য্য-কন্যাও বিবাহদিনে কেশবিন্যাস করিত। ইহা ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৮ ঋকের "ওপশ" অর্থাৎ কবরী (খোপা) ও কবরীর (ওপশ) কাঁটা বা অলঙ্কার "কুরীর" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। দত্ত মহোদয় 'ওপশ' শব্দের অর্থ—রথের অভ্যন্তরভাগ ও গ্রিফিথ uncertain বলিয়াছেন। উভয়েই বলেন,—'কুরীর' শব্দের অর্থ—কুরীর নামক ছন্দ। ঋগ্বেদের ১০।১৩০ সূক্তে ও অন্যান্য স্থলে অনেক ছন্দের নাম-উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কুরীর' নামক কোনও ছন্দের উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে আমরা বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত একমত। ১০।৮৫।৮ ঋকের "প্রতিধি" শব্দের অর্থ দর্পণ কি চক্রাশ্রয়, তাহা আলোচনা-যোগ্য। যে ঋকে 'ওপশ' ও 'কুরীর' ইত্যাদি সাজ-সজ্জার বর্ণনা আছে, তাহার সংস্রবে চক্রাশ্রয়ের উল্লেখ না হইয়া দর্পণের উল্লেখ হওয়াই সঙ্গত। আর্য্য-কন্যার হস্তেও বিবাহকালে দর্পণ দেওয়া (কুমারসম্ভব ৭।২৬) হইত।

কেশবিন্যাস ও দর্পণ-ধারণ।

"চিত্তিরা উপবর্হণম্ চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্" (১০।৮৫।৭ ঋক) এই ঋকের 'উপবর্হণ' শব্দের অর্থ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় উপঢৌকন ও গ্রিফিথ উপাধান অর্থাৎ বালিশ বুঝিয়া, তাহার অনুবাদে Pillow করিয়াছেন। এই ঋকটি কন্যার বিবাহকালীন সাজসজ্জা-সম্বন্ধীয়। উক্ত ঋকের 'অভ্যঞ্জন' শব্দের অর্থে তৈলাদি-মর্দ্দন বুঝায়। যে ঋকে তৈলাদিমর্দ্দন আছে, তাহার সংস্রবে, কিংবা বিবাহকালে বালিশের (Pillow) কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, বুঝিতে পারিলাম

Saharon ও শেখরী।

না। পরবর্ত্তী অন্যান্য ঋকে পৃথকরূপে উপঢৌকনের উল্লেখ দেখা যায়। 'বর্হ' অর্থে দীপ্তি পাওয়া, কিংবা ময়ূরপুচ্ছ। যাহা উপরে বা ঊর্দ্ধে ময়ূরপুচ্ছাকারে দীপ্তি কিংবা শোভা পায়, তাহাই "উপবর্হণ"। ইহাতে মস্তকের মুকুট বা তত্তুল্য কিছু বুঝায়। সায়নাচার্য্য অন্যত্র (১।১৭৪।৭ ঋকে) "উপবর্হণ" শব্দের অর্থ শয্যা, এবং গ্রিফিথ covering করিয়াছেন। কালিদাস হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় বরের মস্তকালঙ্কার অর্থাৎ "শেখরশ্রী"র উল্লেখ (কুমারসম্ভব, ৭।৩২) করিয়াছেন। ইব্রিয় বর ও কন্যার মস্তকে ও ললাটে বিবাহকালে এক প্রকার মুকুট থাকিত। হিব্রু ভাষায় ইহা "Saharon" (Isaiah 3—18) নামে পরিচিত। ইব্রিয়-জাতীয় ধর্ম্মপ্রচারক আব্রাহামের বংশধর ও অনুসরণকারী হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীদের দ্বারা যে সমস্ত ইব্রিয় ও আরবীয় আচার ব্যবহার ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, বিবাহে এই "Saharon"-এর ব্যবহার তন্মধ্যে অন্যতম। উত্তর-বঙ্গের মুসলমান সমাজে ইহা "সেহেরা" নামে পরিচিত।

সুগন্ধি ব্যবহার।

ইব্রিয়-কন্যা বিবাহকালে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিত। ইহার উল্লেখ Psalms 45—8 Isaiah 3—20 পদে আছে। সুগন্ধি দ্রব্য কোনও আধারে বা কৌটায় (Isaiah 3—20) রাখা হইত। আর্য্য-কন্যা বিবাহে চন্দন ও অগুরু দ্বারা চর্চ্চিত হইত। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে সুগন্ধি দ্রব্য (রামায়ণ, আদি, ৭৩—২১—২২) ব্যবহৃত হইয়াছিল। কালিদাস হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় অগুরু ও কালেয় নামক গন্ধদ্রব্যের উল্লেখ (কুমারসম্ভব ৭।৯—১৫) করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৭ ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধে 'অভ্যঞ্জন' ও তৎপূর্ব্ব ঋকে বস্ত্রাদির উল্লেখ আছে। ঐ ৭ম ঋকে "দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ" কথা দৃষ্ট হয়। 'কোশ' শব্দের অর্থ দত্ত মহোদয় কোশ, এবং গ্রিফিথ Treasury (ধনাগার) করিয়াছেন। কোশ শব্দের অর্থ ধনাগার ও সুগন্ধি পাত্র, দুই-ই হইতে পারে। এ স্থলে সুগন্ধি পাত্রই গ্রহণ করা উচিত। ইব্রিয় ভাষাতেও কোস (Kos) শব্দের অর্থ পাত্র বটে।

ক্রমশঃ।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

———

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। এই সংখ্যায় তিনটি গান ও একটি কবিতা আছে। কবিতা বাঙ্গালা মাসিকে এমনই বদ্ধমূল মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে যে, 'তত্ত্ববোধিনী'র মত বর্ষীয়সী পত্রিকাও 'যেমন-তেমন-চাকরী-ঘি-ভাতে'র মত যেমন-তেমন-কবিতার ঝুমকো-বাউটী-গুজরীপঞ্চমের মায়া অতিক্রম করিতে পারেন নাই! 'আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে' নামক ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম দুই কলি চলনসই। শেষ তিন ছত্র পুরাতনের প্রতিধ্বনি। সর্ব্বশেষ ছত্র পাদপূরণার্থ টানিয়া বোনা। স্বরলিপির 'হরি তোমা বিনা' ইত্যাদি গানেও কোনও বিশেষত্ব নাই। 'মেঘের মালা'র নমুনা—'নীলিমায় সে পড়বে লুটে ঘুরে যাবে এই প্রাণ।' বাস্তবিক, মাসিক-পত্রগুলি যেন কবিতা-রচনার কসরতের ক্ষেত্র হইয়াছে। 'মায়ের রূপে ভরেছে ভুবন' সূচীপত্রের ইঙ্গিত অনুসারে 'প্রসাদী পদচ্ছায়া'। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, ইহাতে 'প্রসাদী নখচ্ছায়া'ও নাই। 'কেশবচন্দ্র ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' সেকালের অনেক কথা আছে। 'নারায়ণ' ইহার কি টীকা করেন, দেখা যাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'রাণাডের স্মৃতিকথা' সুখপাঠ্য। বাঙ্গালা সাহিত্য ইহা দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করিবে। চরিত-বিভাগে বাঙ্গালা-সাহিত্য এখনও অত্যন্ত দীন। বিদেশের মহাপুরুষ ও কর্ম্মীদিগের জীবন-কথা বাঙ্গালায় সঙ্কলিত হইলে আমরা উপকৃত হইব। শ্রীরামানন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৈয়াসিকী ন্যায়মালা'র অনুবাদ করিতেছেন। ইহা 'তত্ত্ববোধিনী'র উপযুক্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ' বহুদিন পূর্ব্বে লিখিত। তাঁহার কৃতী পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাহা পড়িবার অবকাশ দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই প্রবন্ধের ৩১শ পৃষ্ঠার পর—বত্রিশ পৃষ্ঠায়—অন্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—'সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই, আগা।' ইহাও সেইরূপ। 'আকর্ষণে'র আরম্ভটা আছে, শেষটা নাই। আর একটার গোড়া নাই, শেষটা আছে। শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের 'তন্ত্রের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। বেদান্ততীর্থ মহাশয় সুপণ্ডিত, নৈয়ায়িক, এবং তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী। তন্ত্রই তাঁহার জীবনের ব্রত। এরূপ বিশেষজ্ঞের রচিত ইতিহাসে আমরা নিশ্চয়ই তন্ত্রের ধারাবাহিক পরিচয় পাইব।—প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলি,—বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন,—'তন্ত্র মন্ত্রবিশেষ মনূপাসিত বলিয়া পরিচিত; সুতরাং মনুর সময়েও উহা প্রচলিত ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়।' তন্ত্রসারে 'মনূপাসিত' বলিয়া পরিচিত, অতএব মনুর সময়েও প্রচলিত ছিল, এ সিদ্ধান্ত কি প্রামাণ্য? ফ্রান্সের 'রনাঞ্জন' হইতে চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক যে পত্র লিখিয়াছেন, 'তত্ত্ববোধিনী'তে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—'এবারে শীত উত্তর ফ্রান্সে কাটিয়েছি। শীতে কষ্ট কিছুই হয় নি। যাক্, একটা প্রকৃতির ভিন্ন চিত্র দেখা গেল—এ দেশে যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে, কিন্তু কঠোরতারও অভাব নেই। এ দেশের লোকের চরিত্র কঠিন, কষ্টসহিষ্ণু করে তোলবার জন্য প্রকৃতির এই কঠোরতা। এদের সঙ্গে থেকে আমাদের চরিত্রেরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটেছে—কষ্টে আর কাতর হই না। কোন বাধা আর আমাদের বিঘ্ন ঘটায় না—কষ্টে পড়লে মানুষকে কতটা সহিষ্ণু পরিশ্রমী এবং বিলাসত্যাগী হতে হয় তা শিক্ষা করছি। মানুষকে বাঁচতে হলে

তাকে কতটা Struggle করতে হয় তার এই প্রথম শিক্ষা হল। আজকাল পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি বাঁচবার জন্যে নিজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে প্রকাশ রাখবার জন্য চেষ্টা করছে—শুধু যে জাতিগুলি, তা নয়; প্রত্যেক সম্প্রদায়ও নিজের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করছে। সকলেই এখন Egalite (equality) আর Fraternite্র (fraternity) জন্য চেষ্টা করছে। সব চেয়ে যারা নিম্নসম্প্রদায়ের লোক, তাদের উৎকণ্ঠাই বেশী। তারা আর তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তারা সমাজে একটা ভাল জায়গা খুঁজছে। এই ত গেল Social অবস্থা, পলিটিক্যাল জগতেও সমতার দ্বন্দ্ব চলছে। ছোট-বড় অধীন-স্বাধীন সব জাতিই একটা Equal footing খুঁজছে। একটা জাতির কতটা দায়িত্ব, তাকে পৃথিবীতে সম্মান বজায় করে থাকতে হলে কতটা স্বার্থত্যাগ, কত পরিশ্রম করতে হয়, তা এই দেশকে দেখলেই বেশ শেখা যায়। আর আজকাল ফ্রান্সে সব জাতির সমাবেশ—প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু শেখবার আছে—জাতি-চরিত্র-শিক্ষার এক মহাসুযোগ।'

সবুজ পত্র। বৈশাখ। প্রথমে শ্রীরবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রথিত গল্প 'মুক্তি'। ইহা কবিবরের নব-রচিত ছন্দে সহজ কথায় লেখা। ছোট জীবনের ছোট কথা, কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, ইহাই ত মানব-জীবনের বড় কথা। বিশ্বের একটা সনাতন স্মৃতি করুণার লেখায়, চিন্তার রেখায় এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিতা, রূপক, সমস্যা প্রভৃতি নানা উপাদানে 'ভারতবর্ষ' নামক যে প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপসংহার এই—'এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান—এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে, কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠবে তা কে জানে? তবে অমৃত যে একদিন উঠবেই, সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।' তথাস্তু।—'ক্ষত্রিয়'কে ক্ষত্রিয় করিবার কারণ কি? এ বানানের সঙ্গে যে অর্থের সংযোগ আছে! শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 'নব-বিদ্যালয়ে' বেলজিয়মের 'নব-ইউনিভার্সিটী'র এক জন অধ্যাপক Faria de Vasconcellos কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নব-বিদ্যালয়ের পরিচয় অধ্যাপকের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। যাঁহারা দেশের কথা ভাবেন, তাঁহাদিগকে প্রবন্ধটি পড়িতে বলি।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। বৈশাখ। শ্রীজলধর সেনের 'ছোট গল্প' পড়িয়া লেখকের বাহাদুরী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইহা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনে পঠিত' হইয়াছিল! এই প্রবন্ধ জলধর বাবু সম্মিলনে পড়িয়াছিলেন, এবং সত্যেন্দ্র বাবু তাহা 'সম্মিলনে' ছাপিয়া দিয়া জলধরবাবুকে জব্দ করিলেন! জলধর বাবু এই প্রবন্ধে প্রথমে 'গল্পের' 'বৈজ্ঞানিক লক্ষণ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন! তাহার পর ছোট গল্পের চৌহদ্দী বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই লক্ষণ ও চৌহদ্দী তুলনারহিত, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। জলধরবাবু চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই; মধুকরের মত নানা ফুলের মধু সংগ্রহ করিয়া এই ছোট-গল্প-প্রবন্ধচক্রে সংগ্রহ করিয়াছেন; এমন কি, পাঁচকড়ি বাবুর 'কথাটা কি জানো'ও বাদ যায় নাই! তবে জলধর বড় বিনয়ী, তাই 'জানেন' করিয়া দিয়াছেন। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ?' শ্রীমতী সরলা দেবী 'রামপ্রসাদের পদাবলী' প্রবন্ধে প্রধানতঃ গুরু ও গুরুমন্ত্র

সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন. বীজমন্ত্রের রূপবিকাশক শক্তি আছে। লেখিকা বলেন,—'শব্দের রূপবিকাশক শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও আজকাল নানা অনুসন্ধানলব্ধ ফলপ্রাপ্তি হইতেছে। Science classএ বিধিবদ্ধ শব্দের দ্বারা বালির উপর জ্যামিতিক রূপগঠনের experiment অনেক ছাত্রই দেখিয়াছেন। আবার অবিধিবদ্ধভাবে উচ্চারণের দ্বারা কাচের দণ্ড ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়, ইহাও দেখা গিয়াছে। হিন্দুদের রাগ রাগিণীর রূপকল্পনা এবং শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, এই ধারণা যে সমূলক হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এখন আমরা মানিব। অনিয়ত শব্দের দ্বারা যদি কাচের জিনিস ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তবে বেসুরা গানের দ্বারা নারদ একবার অনেকগুলি মনুষ্যদেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন, এ পৌরাণিক কাহিনীও যে সত্য হইতে পারে, তাহা বোধ হয় আমরা এখন স্বীকার করিব। অধ্যাপক Tyndallএর শিষ্যা Mrs. Watts Hughes তাঁর—'Voice Figures' নামক গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের দ্বারা যে নিয়ত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রস্তুত করা যায় তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি একটী ডুগ্‌ডুগীর মত জিনিসের বিস্তৃত চর্ম্মের উপর রঙ্গীন Lycopodiumএর রেণু ছড়াইয়া তাহার সঙ্গে একটী নল সংযুক্ত করিয়া একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রের মুখে ভিন্ন ভিন্ন Pitch ও Rythm সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এই ধ্বনিতে Lycopodium পরাগগুলি স্পন্দিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রচনা করে। ইহার ফলে Lycopodiumএর পরাগের দ্বারা পশু, পক্ষী, সাপ, নদী, পাহাড়, বাড়ী, বৃক্ষ ও ফলফুল রচিত হয়। একবার হঠাৎ তাঁহার গানের ফলস্বরূপ একটী Lily পুষ্প রচিত হইল। তিনি অনেক দিনের সাধনায় ও অধ্যবসায়ে ধরিতে পারিয়াছেন কোন্ নিয়ত-স্বর-সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করিলে পরাগগুলি Lilyর আকার ধারণ করিবে। আমাদের প্রাচীন মন্ত্রশাস্ত্র-বিদগণও এই কথাই বলেন। বিধিমত উচ্চারণের ফলে আকাশে শব্দের দ্বারা বিশেষ বিশেষ রূপের সাধন হয়। সেই বিধি অনুযায়ী ধ্বনিবিন্যাসের দ্বারা তাঁহারা বৈদিক মন্ত্র ও বীজমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যিনি সেই ধ্বনিবিজ্ঞানজ্ঞ তিনিই মন্ত্রদাতা গুরু, যে সে নহে। ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার রূপ গঠিত হয়, এবং সেই রূপে মহাচৈতন্যের চৈতন্যশক্তির অধিষ্ঠান হয়। * * উপসংহারে লেখিকা বলিয়াছেন,—আমাদের ন্যায় সামান্য লোকে যখন গুরুমাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি, গুরুর বদলে অতিবিজ্ঞতার সেবক হইয়া কথায় কথায় বলি,—Gurudomএর প্রশ্রয় দিব না—তখন কখন কখন মনে হয়, হয় ত রামপ্রসাদের ভাষায় আমরা—সোনা ফেলে রাং নিয়েছি, মাটির দরে সোনা বেচেছি।' ইহা কি আঘাতের প্রতিঘাত? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া? এই সংখ্যায় 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-শাখার সভাপতিত্রয়ের অভিভাষণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির 'স্বাগতম্' প্রকাশিত হইয়াছে।

সৌরভ। বৈশাখ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার টলষ্টয় হইতে 'তীর্থযাত্রী'র অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে ভাষার জড়তা আছে, কিন্তু তথাকথিত ছোট গল্পের অপচার অপেক্ষা বিশ্বসাহিত্যের এই সকল সৃষ্টির অর্দ্ধ-পরিচয়ও আমরা সমাজের ও সাহিত্যের পক্ষে হিতকারী ও উপকারী বলিয়া মনে করি। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসের 'বৌদিদি' নামক কবিতার প্রথমার্দ্ধে

'ফাল্গুনে'র ছবি উপভোগ্য। শেষাংশের 'বৌদিদি' টানিয়া বোনা; 'চন্দন' 'কুঙ্কুমে'র কবির যোগ্য নয়। 'নেপালী দরবারে'র প্রথম প্যারায়—'নেপালে প্রায় সকল জিনিসই সস্তা।' তাহার পর, অর্দ্ধপক্ব ইতিহাস।

সন্দেশ। বৈশাখ। 'কয়েকটি রঙিন পাখী' নামক রঙ্গীন ছবিখানি চমৎকার। শ্রীমতী সুখলতা রাও-এর 'আকাশের আলো' নামক কবিতাটি বেশ হইয়াছে। 'তারকাসুর' সুলিখিত পৌরাণিক গল্প। 'নিমন্ত্রণ' চলনসই ছোট গল্প। 'হো' ও হো জাতির উপকথা 'শেয়াল আর কুমীর' সুখপাঠ্য। 'উটপাখী' পড়িয়া সন্দেশের পাঠকেরা যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবে। 'আশ্চর্য্য আলো' সহজ ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'আবোল তাবোল' আমাদের পক্ষে অব্যর্থ বটে। 'সন্দেশে'র পাঠকপাঠিকারাই ইহার যাচাই করিবে। বাহিরের 'প্রাড়বিবাক' এ ক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য!

ভারতী। এই সংখ্যায় 'ভারতী' একচত্বারিংশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল।—দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, সরলা ও হিরণ্ময়ী এই ভারতীর পূজারী ছিলেন। এই 'ভারতী'র পীঠে কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-সাধনার সূচনা। সেই ভারতী! 'ভারতী' পূর্ব্বগৌরবের স্মরণে, পূর্ব্বপথের অনুসরণে ধন্য হউক।—সে স্মৃতির যাহা পরিপন্থী, তাহা বর্জ্জন করিয়া 'ভারতী' আবার নব-ভারতের নূতন আশার ছটায়, মহিমায় মণ্ডিত হউক।—প্রথমে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অরুণিমা'—একখানি ছবি। একটু 'হলুদিমা' আছে; অবশিষ্ট সমস্ত 'শুভ্রিমা'। ইহা বোধ হয় ঈথারে আঁকা, তাই সবটা দেখিতে পাইলাম না। চিত্র বোধ হয় নিরবলম্ব, তাই অরুণিমা ত্রিশঙ্কুর মত পটের মধ্যপথে দোদুল্যমানা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'জয়ধ্বনি' কি ভয়ঙ্কর! ইহা 'কবিতায় কৃত্রিমতা'র জয়ধ্বনি বটে। উদাত্ত ভাবটি কষ্টকল্পনায় অত্যন্ত 'আড়ষ্ট' হইয়া পড়িয়াছে। গুরু-চণ্ডালীর এত সমারোহ, এত বৈভব আর কখনও একত্র দেখিয়াছি কি? স্বেচ্ছাচারিতার 'ডঙ্কার ডিণ্ডিমে' ও 'খুন্-লুণ্ঠন্-রত, ক্রূর-নিষ্ঠুর যত' মুদ্রাদোষের তাণ্ডবে কবি-কল্পনার এমন দুর্ল্লভ বৈভব 'মাঠে মারা গিয়াছে।' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ-সরস্বতী' মুসলমানের কুতব-মিনার। বহুকাল বাঙ্গালা মাসিকে এমন উপভোগ্য রচনা পড়ি নাই। ভূয়োদর্শন, বিচারশক্তি ও অনুশীলনের বৈভবে এই নিবন্ধটি যেমন সমৃদ্ধ, সত্যনির্দ্দেশেও তেমনই সফল হইয়াছে। ইহাতেও মুদ্রাদোষ আছে, কিন্তু 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মমতার ক্ষুধা' সুখপাঠ্য গল্প। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রূপ-রেখা' সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। 'ভাব-রূপকে গোচর করবার শক্তি কেবল বস্তুতে নেই, কিন্তু কেবল রেখাতে আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিতে বাস্তবিকতা নেই বল্লেও চলে। * * বুদ্ধের ভাব-রূপ—চোখ দুটির নত-রেখায়, ঠোঁট দুটির আনন্দের একটু তরঙ্গিত টানে—এখানে সজীব হয়ে দেখা দিয়াছে।' চিত্রকলার অনুরাগীরা এই প্রবন্ধে অনেক ইঙ্গিত ও চিন্তার উপাদান পাইবেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরদিনের দাগা' বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। পদ্য-গল্প অবশ্য নূতন নয়; গল্পগুলির রচনা-রীতি সম্পূর্ণ অভিনব। গল্পটি শেষ করিতে করিতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। অত্যন্ত সহজ ভাবে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মন্মের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকরুণানিধান

বন্দ্যোপাধ্যায় 'লুকানো ছবি' টানিয়া বাহির করিয়া বাজারে জাহির করিয়াছেন। এ উন্মত্ত-প্রলাপ যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'নূতন আলো' নামক ছবিখানির কল্পনায় কবিত্ব আছে। আলো-ছায়ার সমাবেশেও নিপুণতা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' বরযাত্রী ঠকানো প্রবন্ধকে ঠকাইয়া দিয়াছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ম্যালেরিয়া-নিবারণের একটি দৃষ্টান্ত' আমরা সকল বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বৈশাখে' একটি বিষম প্রহেলিকা। ইনি বেশ ছবি আঁকেন—

'আগুনের স্বর্ণবাসে আবরিয়া শীর্ণ কলেবর বৈশাখ এসেছে নামি।'

তার পর, 'এলাইয়া পড়েছে প্রান্তর শুষ্কতার বুকে।' খুব ঘন রূপক। কিন্তু অচল নয়। কিন্তু 'ক্রমে ফুলে মধু আসে।' তার পর, কল্পনার ক্রমবিকাশ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। 'পথের ধূলার তলে অনলের দাহন ঘুমায়।' তার পর, সেই 'দাহন' পরবর্তী পাঁচ লাইন ধরিয়া 'অলক্ষ্য চুমুকে ধরণীর উরসের নিভৃত সকল রস নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া' পান করে। অসম্ভ চটক, কবির কল্পনা ঘটোৎকচী বটে। বাঙ্গালা কবিতায় যাহা দেখা যায় না, অথচ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালার প্রাণ একদিন কবিতায় বঙ্কৃত হইত, সেই 'চাষাকে বৈশাখের রৌদ্রে প্রান্তরে 'পিপাসায় একান্ত অধীর' দেখিয়া ছুটিয়া যাইতে হয়, কিন্তু কবি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অবোধ্য কাব্যি-কুহেলিকার যবনিকা বিস্তৃত করিয়া দিলেন। সত্যই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, 'চাষার নাগাল পালাম না লো সই!' বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব ক্ষুরধার বটে, কিন্তু এমন কবিতার ঘর্ষণে ক'দিন টিকিবে? 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার' মনে আছে ত? এমন কবিকূট রচনা করিয়া আমাদিগকে আশাভঙ্গের বেদনায় পীড়িত করিবার কারণ কি? শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাতা মনু' পড়িয়া বিলাতের উমেশচন্দ্রের জন্য দুঃখ হয়। তাঁহার 'মাতা মনু' ইহার কাছে কোথায় লাগে? রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ' উপভোগ্য। আশ্চর্য্য! আজকাল তাঁহার অনেক লেখাই বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যোত্তমের ও সম্প্রদায়ের রচনার রসস্ফুট হয় না। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'।

প্রতিভা। 'স্বাগতম্' শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের উচ্ছ্বাস। আন্তরিকতা আছে। বৈশাখের 'নব্য-ভারতে' শ্রীরোহিণীকুমার গোস্বামী লিখিয়াছেন,—'তিনি 'পদ্মা পারের' যাত্রীকেই বরণ করিলেন, আর যাহারা 'সাগাপুল' হইয়া আসিয়াছেন—ময়মনসিংহ, কুমিল্লা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু কহিলেন না।' শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের 'সাগর-মন্থন' শেষ হইয়াছে। 'শান্তিঃ! শান্তি! শান্তিঃ!' শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'গায়ক পাখী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নের 'প্রাচীন সঙ্গার' তথ্যপূর্ণ—ইহাই এবার 'প্রতিভা'র মান রাখিয়াছে। 'বনের পাখী' অসম্পূর্ণ। তথ্যনির্দ্দেশেও শিরোনামে কবিতা! ম্যালেরিয়ার কুইনাইন আছে। গৌড়ীয় কবিতা-ব্যাধির ঔষধ নাই।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	৭	নিন্দুক	নিন্দক
৭১	৯	পঞ্জিকা	পত্রিকা
৭৪	২	সর্বনা	সবর্ণা
৭৭	১১	শিমসোল	শিমসোর
৭৫	২৪	পঞ্জিকা	পত্রিকা

সাহিত্য, ২৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

চির-সুন্দরী।

১

নিভৃত হৃদয়-মাঝে একদা জাগিলে কবে—
হে চির-সুন্দরি!
চাহিলে অপাঙ্গে বুঝি, বিশ্বের মালঞ্চ তাই
উঠিল মুঞ্জরি'।
পিক-পাপিয়ার কণ্ঠ দিলে তুমি পূর্ণ করি'
নিজ কণ্ঠ-গীতে;
সৌন্দর্য্য-সম্পদ তব মুষ্টি-মুষ্টি ছড়াইয়া—
দিলে চারি ভিতে।

২

হরিণীর নেত্রে দিলে কজ্জলে আঁকিয়া তব
নয়ন-সুষমা;
তোমার অধর-রাগ দিলে নব কিশলয়ে,
অয়ি নিরুপমা!
কেশগুচ্ছে দিলে রচি'— কলাপীর পুচ্ছভার
চন্দ্রক-মালায়;
তন্বী দেহলতা দিলে মাধবীরে অনুরাগে
হে দেবি, লীলায়!

৩

তব ভাবে মুগ্ধ কবি অন্তরে বাহিরে খুঁজি'
না পায় আভাস!
তুলিকায় চিত্রকর তোমারে চিত্রিতে নারে,
ভাস্কর নিরাশ।
কাব্যে, পটে—কোথা তুমি? মর্ম্মরে গড়িবে কেবা
তোমার প্রতিমা?

কবি-ভাব্য তব রূপ, শিল্পীর অনধিগম্য
তোমার মহিমা!

৪

দিকে দিকে ব্যষ্টি-রূপে তোমারে দেখিতে পাই,
সমষ্টি কোথায়?
সমস্ত জীবন ধরি' করিনু তপস্যা তব,
তবে কি বৃথায়?
কোথা তুমি—কোথা তুমি, জন্ম-জন্ম খুঁজিয়াছি,
কোথা চির-প্রিয়া!
দেখা দাও পূর্ণরূপে, দেখা দাও স্বর্গ-মর্ত্ত্য
হৃদয় ব্যাপিয়া।

৫

অন্তর হইতে এস অন্তরাল ছিন্ন করি'—
হে চির-সুন্দরি।
সর্ব্বেন্দ্রিয় পূর্ণ করি'— সর্ব্বৈশ্বর্য্যে মূর্ত্ত হ'য়ে—
এস বক্ষে ধরি'!
অই স্পর্শে ধন্য হোক্ আমার জীবন-জন্ম—
আমার সাধনা!
অই রূপে মিলে যাক্, চরিতার্থ হোক্ মোর
কল্পনা—কামনা।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত-ঔষধ।

১

উপক্রমণিকা।

অনেক দিন পূর্ব্বে সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে করিয়াছিলাম। যে ভাবে প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা সকলের মনঃপূত হইবে না। কারণ, তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করা একটা যন্ত্রণাময় ব্যাপার। এত কথা পাড়িতে হয় যে, তাহার শেষ

নাই, এবং সেগুলি বুঝাইতে হইলে নিজের অজ্ঞতা প্রবলভাবে অনুভূত হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে প্রবন্ধটি লিখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়াছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনাতে আশাটুকু আবার উদ্দীপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক জন বৃহৎ-পরিবার-বিশিষ্ট বন্ধু বহু বৎসরাবধি ডাক্তারের ও ঔষধের খরচে মহাক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়া একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ও খানকতক বড় বড় পুঁথি সংগ্রহ করিয়া নিজেই চিকিৎসাবিদ্যা-পারদর্শী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার 'হাত-যশ' দেখিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে ঔষধ লইতে যাইতাম। সম্প্রতি একটু 'নক্সভমিকা'র দরকার হওয়াতে প্রাতঃকালে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া ডাকিলাম, 'দাদা, বাড়ী আছ ত?'

বন্ধু। ব্যাপারখানা কি? Constipation?

আমি। ঠিক। একটু Nux দরকার।

বন্ধু। আচ্ছা, তুমি একটু বসিয়া থাক—

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার শয্যাগৃহ হইতে একটি ক্ষুদ্র হার্ম্মোনিয়ম লইয়া তাহার সহযোগে একটা রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। আমার বোধ হইল, যেন আমার শরীরে সেটা Nux Vomicaর কাজ করিতেছে। তিনি সেটা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন, 'আমি ঔষধের বাক্স সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছি।'

আমি (আশ্চর্য্য হইয়া)। 'কেন বলুন ত?'

বন্ধু। অনেক রকম ব্যাধি এবং গোলমাল কেবল গানেই সারিয়া যায়। সুতরাং আমার মতে বাটীর সকলকে ক্রমাগত ঔষধ না খাওয়াইয়া গান শিখানই উৎকৃষ্ট উপায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, হানিমান-পরীক্ষিত অনেকগুলি Mental and moral remedies কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রাগরাগিণীর মত। উভয়ের ফল একই, বরং ইহাতে খরচ কম।

আমি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া যাওয়াতে তিনি Organon, Kent's Materia Medica, Clarke's Materia Medica, Hughes, Farington, Allen প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় পুঁথি বাহির করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাগুলি আমার মনে লাগিতে আরম্ভ করিল।

এমন সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র সুধীর আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর ভয়ানক কোপন স্বভাবের বালক বলিয়া প্রখ্যাত, এবং তর্ক, দ্বন্দ্ব ও কলহে

খুব 'মজবুত'। কিন্তু এবার তাহার ধীর ও নম্র চেহারা দেখিয়া আমি বন্ধুকে বলিলাম, 'সুধীর সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে।'

বন্ধু। হাঁ। পরজ রাগিণী অভ্যাস ক'রে। পূর্ব্বে আমি Ferrum phos, Chamomilla প্রভৃতি নানা রকম ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু পরজ রাগিণীর মত ফল হয় নাই।

আমি। কথাটা বেশ, কিন্তু এ রাগিণীগুলি শেখায় কে?

বন্ধু। দেখিয়া শুনিয়া, সঙ্গীতের কেতাব পড়িয়া অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। নিজের সময় না থাকে, বাটীর মেয়েছেলেদের শিখাইলে চলে। কিন্তু এক জনের বেশী অভ্যাস ভাল না, কারণ সেটা 'Proving'-এর মত দাঁড়াইয়া যায়।

আমি বাটী ফিরিয়া কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে বোধ হইল যে, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ খানিকটা সত্য নিহিত আছে। সেই অবধি মধ্যে মধ্যে কোনও ব্যারামের লক্ষণ হইলে দুই একটা রাগিণী 'গুন্ গুন্ স্বরে' গায়িতাম, এবং উপকার পাইলে টুকিয়া লইতাম।

অবশ্য বলা বাহুল্য যে, আমার Provingsগুলি অতিশয় কাঁচা রকমের; কিন্তু তথাপি এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল-রোগ-শোক-পরিপূর্ণ সংসারে যদি কাহারও উপকার হয়, এই জন্য কথাগুলি এই প্রবন্ধে পাড়িয়াছি। কোনও উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে ইহা আরও সরস হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সঙ্গীত-তত্ত্ব।

(১) উপক্রমণিকা।

(২) সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি।

ক। 'মনের মতো' সুর।

খ। লক্ষণের তারতম্য।

গ। ভাবের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ, এবং একটি উদাহরণ।

(৩) রাগরাগিণীর চেহারা এবং তাহার সহিত Homeopathic Provingsএর সাদৃশ্য।

(৪) রাগরাগিণীর পরিবার—এবং কোন ঔষধের শ্রেণীভুক্ত।

ক। একান্নবর্ত্তী পরিবার।

খ। সধবা ও বিধবা রাগিণী।

গ। রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতির পরিচয়।

ঘ। পোলিটিক্যাল এবং সামাজিক রাগরাগিণী।

ঙ। কোরাস্, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি।

(৫) রাগরাগিণীর সংশোধন। (Principles of Social reconstruction).

ক। মিশ্র রাগিণী, জাতিভেদ।

খ। নূতন রাগিণী।

গ। প্রতিষেধ (antidotes)।

ঘ। Complementary রাগিণী।

(৬) দেহতন্ত্র।

ক। তানপুরা, গলা, পিয়ানো প্রভৃতি।

খ। রাগিণী কোথায় গিয়া পঁহুছে।

গ। আহার প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

ঘ। অনুপান।

ঙ। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ।

(৭) তাল ও ছন্দ।

ক। প্রাকৃতিক রেখা lines, triangles, squares etc—curves and ellipses and circles.

খ। ভক্তিতত্ত্ব।

গ। দুর্ঘটনা—Cramps, Collapse and Convulsions. বিশ্ব-বিরহ। with power to add to their number.

(৮) সঙ্গীত ও অ্যালোপাথি। যদি ক্রমে লিখিতে লিখিতে উৎসাহ বাড়িয়া উঠে, এবং অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হয়, (সম্ভাবনা খুব কম) তবে অবশেষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। সময়-সাপেক্ষ।

২

সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি।

জড়বিজ্ঞান দ্বারা সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করাই সাধারণ উপায়। অর্থাৎ, অমুক সুরগুলি হার্ম্মোনিয়মে কিংবা পিয়ানোতে ধ্বনিত করিলে, এবং সেগুলির মাত্রা ও লয় অমুক ভাবে বিন্যস্ত করিলে, অমুক গান অমুক প্রকারে গীত হয়, এবং তাহার মধ্যে অমুক ভাব বেশ প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাই পাশ্চাত্য

মত। পাশ্চাত্য মতে 'রাগিণী' বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু গানের নাম আছে, এবং সেই গানে অমুক ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, 'রাগিণী' গড়িয়া লওয়া মানবের আয়ত্তাধীন, এবং দশ জনে যদি বলে যে, তাহাতে ভাববিশেষ সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া উচিত। ডাক্তারী ভাষায় আমরা ইহাকে 'অ্যালোপাথি' মত বলিতে পারি। অর্থাৎ, অসুস্থ দেহযন্ত্রকে কতিপয় ঔষধ দ্বারা নির্জীব অবস্থায় পরিণত করিয়া, যদি তাহারই প্রভাবে স্বাস্থ্যের বিকাশ করা যায়, তবে সেই ঔষধগুলি অনেকটা 'সুরে'র কাজ করে। দেহতত্ত্ব লইয়া 'অ্যালোপাথি'র সমস্যা।

কিন্তু আরও একটা মত আছে। 'রাগ' ও 'রাগিণী'র সরঞ্জাম বিশ্বের মধ্যেই আছে, এবং যুগে যুগে তাহার ক্রমবিকাশ হইতেছে। তাহাদের বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তাহার মধ্যে মানসিক লক্ষণই প্রধান। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রাগরাগিণী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, মনের উপর তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রভাব বর্ত্তমান, এবং সেই প্রভাবের গুণে কতকগুলি ভাব স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। যদি মন, কিংবা মনের বশবর্ত্তী হইয়া দেহযন্ত্র কোনও কারণে বিকল অথবা অসুস্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহার লক্ষণাবলী পরীক্ষা করিলে, 'কোন্ রাগিণীর মতো', তাহা স্থির করা যাইতে পারে, এবং হয় ত তাহা দ্বারা মন এবং দেহকে সুস্থ অবস্থায় পরিণত করিবার উপায় বাহির করা যায়।

এ মতের নাম 'হোমিওপ্যাথি' বলিলে চলে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত ইহার পার্থক্য বিশেষরূপে এখনও বুঝান হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র কতকগুলি ঔষধের প্রভাব মানবশরীরে পরীক্ষা করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যে সকল বিশেষ মানসিক লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি রোগেও সেই লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং সেই মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে দেহের বাহ্য রূপও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। এমত স্থলে সেই রোগের লক্ষণানুযায়ী ঔষধ সেবন করিলে, মন এবং দেহের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে।

অ্যালোপাথিক মতে কোনও ব্যক্তিগত লক্ষণের (individualism) বিচার হয় না। রোগীর মানসিক লক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্য গড়িয়া লইতে হইলে ব্যক্তিগত লক্ষণকে চাপিয়া দিতে হইবে, এবং যে রকম করিয়া শরীরকে রক্ষা করিলে দশ জন বলে—'ইহাই স্বাস্থ্য',

তাহাই করা সকলের কর্ত্তব্য। রোগী যদি ফ্লানেল ব্যবহার করিতে না পারে, তাহাকে অভ্যাস করাইতে হইবে, নচেৎ তাহার সর্দ্দি সারিবে না। কুইনাইন খাইয়া যদি রোগীর ধনুষ্টঙ্কার ঘটে, তথাপি ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইনের দরকার। রাগিণীর সম্বন্ধেও তাহাই। আমি যে কয়টা সুর দিয়া বিরহ-যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছি, তাহাই দশ জনের অনুমোদিত, এবং তাহাতেই তোমার বিরহ-যন্ত্রণা ঘটা উচিত, নচেৎ তুমি অসভ্য ও হেয়। তোমার ব্যক্তিগত লক্ষণের মধ্যে বিরহ-যন্ত্রণা না থাকিলেও, ঐ রাগিণীতে তোমার সেই যন্ত্রণা প্রকাশ হওয়া উচিত। অনেকের হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সভ্য-সমাজে তাহাই হইবে।

কিন্তু 'হোমিওপ্যাথি' মতে কুইনাইনের লক্ষণাক্রান্ত রোগীকেই কুইনাইন দেওয়া উচিত। যাহার 'বিরহ-যন্ত্রণা' মনোগত সংস্কারের মধ্যে নাই, তাহার পক্ষে সে যন্ত্রণা অযথাভাবে উত্তেজিত করিলে, তাহার কোনও ফল দর্শায় না, বরং রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা বিকল হইয়া পড়ে। মনস্তত্ত্ব লইয়াই হোমিওপ্যাথির সমস্যা। ব্যক্তিগত লক্ষণ দেখিয়া সে রোগ নির্ণয় করে, এবং সেই লক্ষণের অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উহার মতে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত রাগ রাগিণীর সহিত হোমিওপ্যাথির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং সেই সাদৃশ্য হইতে হয় ত আমরা সঙ্গীততত্ত্বের কিংবা সঙ্গীততন্ত্রের মূলে উপনীত হইতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, যদিও চরক প্রভৃতি ঋষিগণ রোগের মূলে মনের সহিত সুস্থপ্রকৃতি আত্মার সম্বন্ধ বিচার করিয়া গিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী ঔষধেরও বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই ঔষধগুলি কি করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের দেশের ঔষধশাস্ত্রও গুরুমুখী বিদ্যা। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রের বহুলভাবে প্রচার হওয়াতে আমরা তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ। রাগ রাগিণীর 'রূপ' ও 'মানসিক লক্ষণ' অনেক পুঁথিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদের একটা চিত্র আছে। 'হোমিও-প্যাথিক্' ঔষধতত্ত্বেও সেই রকম অনেকগুলি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। রোগীর অবস্থা ও 'রূপ' সেই লক্ষণগুলির অনুযায়ী। রাগিণীর মধ্যে ঋতুর প্রভাব ও শীত গ্রীষ্মের কথা পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বেও তাহা উল্লিখিত

হইয়াছে। রাগ রাগিণীরও যেমন 'ব্যক্তিগত সংস্কার' প্রধান, হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরও তাহাই।

তবে কেহ মনে যেন না করেন যে, রাগরাগিণীর প্রভাব ও হোমিওপ্যাথির প্রভাব একই। আমরা সঙ্গীততত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া কেবল স্থূল ভাবে কতকগুলি লক্ষণের বিচার করিয়া রাগরাগিণীর মূলে উপনীত হইতে চাহি। এবং হয় ত সেই ভাবে বিচার করিলে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। ভ্রমাত্মক উপমান (False analogy) প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু উপমা দ্বারা অনেক সময় (Inductive process) আমরা সত্যের পথে উপস্থিত হই।

সেই জন্য বলা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ আমরা হোমিওপ্যাথিক উপায়ে সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা করিব, এবং সেই আলোচনার মধ্যে অনেক ঔষধবর্গেরও কিংবা অন্য রকম কথার উল্লেখ করিলে ক্ষতি নাই। তবে একটা বিষম প্রমাদ এই যে, ঔষধের প্রভাব যে ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে, রাগরাগিণীর প্রভাব সে ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। সুতরাং কেবল বিচার দ্বারা আমরা সঙ্গীততত্ত্বের মূলে উপনীত হইতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা খুব কম। এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনও গুণগ্রাহী ব্যক্তি স্বীয় মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে আমাদের কাঁচা কথাগুলির মধ্যে দুই একটা পাকা বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত পূর্ব্বসংস্কার অনেক সময় এই পথের বিষম বাধা। অনেকের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনও 'ফল দর্শে না'। কিন্তু যাহাতে 'ফল দর্শে', সেই রকম উপায় অবলম্বন করিলে, দর্শিতে পারে। অনেকের মন রাগরাগিণীর দ্বারা মোটেই টলে না, অথচ তাহারা 'একতরফা' বেসুরা চীৎকার করিয়া পাড়া মাতায়। অনেকের মনে হয় যে, ভৈরব রাগে যেন উষার ভাবসঞ্চার হইতেছে, কিন্তু অনেকের তাহা সন্ধ্যাবন্দনার মত মনে হয়। এই সকল জঞ্জাল সত্ত্বেও সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা অনেকের নিকট হৃদয়গ্রাহিণী হইতে পারে।

ক। 'মনের মতো' সুর।

যেটা যাহার পক্ষে খাটিলে সে আনন্দ লাভ করে, সেটা তাহার 'মনের মতো'। আমরা শাস্ত্রে 'আত্মার' কথা শুনিয়াছি। যদি দার্শনিক ভাবে ভাবিয়া দেখা যায়, তবে মনের আনন্দ সম্পূর্ণ হইলে বোধ হয়, যেন তাহাই

আত্মার প্রতিকৃতি। মনের আনন্দ দেহেরও স্বাস্থ্যচিহ্ন। দেহ, মন ও প্রাণের সাম্যাবস্থা দেখিয়া আমরা 'আত্মা'র ভাব উপলব্ধি করি। আয়ুর্ব্বেদের মতে বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা দৈহিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি। মনের বিকৃতি উপস্থিত হইলে হয় ত তাহাদেরও একটার বিকৃতি হইতে পারে; কিন্তু মনের সেই বিকৃতি সত্বেও যদি দেহের কোনও ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, লোকটা 'অমুক ধাতে'র লোক। সে তাহাতেই সুস্থ থাকে। আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব। অনেকে পরজ রাগিণী শুনিয়া চটিয়া যায়; আর এক জন তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে 'এক্ সুরে' গাহে; আর এক জন 'ডি শার্প্' না হইলে সুরের গোলমাল করিয়া বসে। এই জন্য সকলে বলে যে, সুরের standard সকলের পক্ষে সমান নয়। বিচারের standardও সেই রকম। স্বাস্থ্যের standardও তথৈবচ। ডারউইন ও স্পেন্সার জীব-জগতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত কামপ্রবৃত্তিমূলক; স্ত্রী ও পুরুষের মিলনেচ্ছা। সাংখ্য বলিবেন, প্রকৃতি ও পুরুষের আকর্ষণজনিত প্রভাব। ভক্ত বলিবেন, ঈশ্বর ও জীবের মিলনেচ্ছা, এবং প্রণবের বহু ভাবই সঙ্গীত। কথাগুলি তলাইয়া দেখিলে একই। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সুরের কোনও পরিমাণ নাই। যাহা 'তোমার মনের মতো', তাহা লইয়াই সুর আরম্ভ।

কিন্তু তোমার মনটার লক্ষণগুলি না দেখিলে যেমন ঔষধ নির্ণীত হয় না, সেই রকম তোমার পক্ষে কোন সুর খাটিবে, তাহার নির্দ্ধারণের উপায় তোমারই হাতে।

স্বভাবজ শারীরিক ধ্বনিই যে সুর, তাহা নহে। কোকিলের ধ্বনি তাহার পক্ষে সুর হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার প্রাণবায়ু যাহাতে স্থির হইতে পারে, মন মুগ্ধ হইয়া যাহা অবলম্বন করে, এবং দেহ যাহাতে সুস্থ-ভাব ধারণ করে, তাহাই আমার সুর। চিন্তা করিয়া দেখিলে, জগতে এমন লোক বিরল, যাহাদের দেহ ও মন সম্পূর্ণ সুস্থ। রোগই আমাদিগের চিরন্তন দৈনিক অবস্থা। প্রাণবায়ুর বৈকল্যই তাহার ফল। সুতরাং প্রাণবায়ুর সহযোগে যে ধ্বনি সঞ্চারিত হইলে আমরা তন্ময় হইয়া আনন্দ লাভ করি, তাহাই আমাদিগের পক্ষে সুর। ঔষধ যেমন স্বাস্থ্যলাভের উপায়, সুরগুলিও তেমনই।

যদিও সুরের কোনও standard নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ইহাই যে, মানবের মধ্যে সুর কেমন করিয়া আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। Tennyson

বলেন যে, ইহা একটা বিধি, 'Law'। সেই বিধির অনুগামী না হইলে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। তাহাই সকলে বলেন, এবং দেখিয়া থাকেন যে, চলিত সাতটা সুরই সেই সর্ব্ববাদিসম্মত রাস্তা। পরে দেখা যাইবে যে, সুর যে সাতটাই হইবে, তাহার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ অর্থ আছে। সাতটা ভাঙ্গিয়া একুশটাও করা যায়, কিংবা সাড়ে তিনটি করিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু এই পথটা যে 'মনের মতো', তাহার একটা বাহ্য লক্ষণ দেখা যায়। যে সুর হইতেই আরম্ভ করি না কেন, যদি প্রাণবায়ুর গতিবিশেষের উৎপত্তি করিয়া উচ্চগ্রামে সেই সুরে আবার মিশিতে পারি, তবেই 'মনের মতো' হইবে; নচেৎ নহে। আর একটা কথা, এহেন ঘটনা একটা পরিধির বিকাশ না হইলে সম্ভবে না। অর্থাৎ, চক্রাকারে পূর্ব্বস্থানে উপনীত হওয়া ভিন্ন আর কোনও গতি নাই। যদি বল যে, বক্রভাবে বহুদূর গিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হানি কি? কিন্তু 'কসরৎ' করিয়া দেখুন, সেটা 'মনের মতো' হইবে না। পরিধির মধ্যে একটা কেন্দ্র আছে নিশ্চয়। তাহার সহিত প্রাণশক্তির টানাটানি আছে বলিয়া বেশ বোধ হয়, এবং সুরে থাকিতে হইলে আমাকে গ্রহবর্গের মত সেই কেন্দ্র-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান হইতে হইবে। Plato প্রভৃতি মহাত্মারা এই গতি লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতের মূলে (music of the spheres) উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু আপাততঃ মূলের কথা না পাড়িয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সর্ব্ববাদিসম্মত সুরগুলি আমাদিগের প্রকৃতিগত, নচেৎ আমাদিগের 'মনের মতো' হইল কি করিয়া। আমাদিগের উৎপত্তি সৌরজগৎ হইতে। সেই জগতের যাহা বিধি, তাহা যে আমাদের স্বভাবতঃ 'মনের মতো' হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আরও একটা কথা। এই সুরের পরিধির পথে যখন আমরা কেন্দ্রগত শক্তিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়া যাই, তখন যে ভাবে আমরা অগ্রসর হই, তাহারও মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণ আছে। সাধারণতঃ সা রে রে গ গ ম প্রভৃতি ব্যবধান আমাদের 'মনের মতো'। তাহার ব্যত্যয় হইলে আমাদের ভাল লাগে না। সুতরাং ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য আছে। আমরা বলি যে, ঠিক সেই ব্যবধানমত অগ্রসর না হইলে সুর বেসুরা হইয়া যায়। যেন সুস্থ শরীরে রোগের সঞ্চার হয়। অতএব সুরে থাকিয়া নানাবিধ রাগরাগিণীর সঞ্চার করিতে হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়া অন্য উপায় নাই।

সকলেরই অবস্থা যে কোনও বিশেষ রাগরাগিণীর মত, তাহা বোধ হয়

কেহই স্বীকার করিবেন না, এবং এক জনের শরীরে যে কেবল একই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও ঠিক নহে। কথাটা এই যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুরের যে 'কাঠাম', তাহা বিবিধ রোগের সঞ্চারে বিভিন্ন ভাবে বিকল হইলেও, সেই 'কাঠাম' দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই হোমিওপ্যাথী মত। রাগরাগিণী সম্পর্কেও তাহাই। একই 'ঠাটে' অনেক রকম রাগরাগিণীর সঞ্চার করা যাইতে পারে. কিন্তু 'ঠাট' বেসুরা হইলে তাহাকেই সাম্যাবস্থায় আনিতে হইবে। অন্য ঠাট বাঁধিলে কোনও ফল নাই। সন্ধ্যা যদি সন্ধ্যার ভাব ছাড়িয়া অন্য ভাবে বিবর্ণ হইয়া যায়, ভারতবর্ষে যদি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ-লোকের যদি উদরাময় হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে নূতন 'ঠাটে' বাঁধিয়া সুন্দর ও সুস্থ করিবার কোনও পথ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। একই উপায় —পূর্ব্ব স্বধর্ম্মের কিংবা সুরের সঞ্চার। স্বধর্ম্মে থাকিয়াও ব্যাধির সঞ্চার হয়। অন্যের সংমিশ্রণ তাহার একটি কারণ। কিন্তু পরধর্ম্মের ঔষধযোগে স্বধর্ম্ম কখনও প্রকৃতিস্থ হয় না। 'মনের মতো' হয় না।

খ। লক্ষণের তারতম্য।

সুর এমনই পদার্থ যে, বিশ্বজীবকে স্বভাবতঃ আকর্ষণ করে। সঙ্গীতের যথার্থ বিকাশস্থলে জীব হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া পরস্পরের সহিত সখ্য-সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়। সুরের ভিত্তিই একতা। এই জন্য শাস্ত্র বলেন যে, সুরের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী অপূর্ব্বভাবে নিহিত।

এখন আমরা সুর ছাড়িয়া 'বেসুর' কিংবা ব্যাধির দিকে তাকাইতে পারি। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, সকলেরই একটা ব্যক্তিগত Standard সুর আছে। সেটা তাহার পক্ষে 'সা'। হয় ত Continental Standardএর সঙ্গে তাহার মিল নাই; অর্থাৎ, আমি স্বভাবতঃ যে সুরে গাহিলে আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা হয় ত হার্ম্মোনিয়মের কোনও সুরের সঙ্গে 'খাটে না'। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি 'বেসুরা' হইতে পারি না। তবে 'বেসুরার' ক্ষেত্র কোথায়? তাহার উত্তর ইহাই যে, আমার ব্যক্তিগত Standard বিস্তার করিতে গিয়া যদি 'সা'র সহিত 'রি' 'গ' 'ম' প্রভৃতির সম্বন্ধ ঠিক না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমি বেসুরা। আমারও ভাল লাগিবে না, অন্যেরও লাগিবে না। মনে করুন, একটি শিশুর পা দুখানি খুব ছোট। তাহার পিতামহের পা দুখানি খুব বড়। উভয়ের মিল নাই। তাহাতে, অর্থাৎ Standardএর পার্থক্যে কিছু আসে যায় না। শিশু যদি তাহার স্বাভাবিক ছন্দের বশবর্ত্তী হইয়া পা দুখানি চালাইয়া দেয়, তাহাও

যেমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যলক্ষণপূর্ণ, বৃদ্ধেরও নিজের পা সম্বন্ধে তেমনই। উভয়ে যদি এক সঙ্গে হাঁটিতে চেষ্টা করে, তবে হয় ত এমন একটা ব্যবধান পাওয়া যাইবে যে, বৃদ্ধও মনের আনন্দে শিশুর সহিত হাঁটিতে পারে। কিন্তু উভয়েরই পক্ষে যদি গতিবিস্তারের দোষ থাকে, তবে 'harmony' এবং 'chord', উভয়েরই বিকৃতি হইয়া পড়ে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সুর বজায় রাখিলে বহু ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়। রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব থাকে না, ব্যাঘ্রে ও হরিণে এক ঘাটে জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করে, শাক্ত ও বৈষ্ণব একাসনে বসিয়া হাস্য করে। সুর বিশ্বপ্রেমব্যঞ্জক। সত্য কথা যে কহে, তাহাকে আমরা তৎক্ষণাৎ ভালবাসি, তখন জাতিবিচার করি না। হিংসা-দ্বেষ-শূন্য, কিংবা করুণার ভিখারী অনাথ আতুরের সম্বন্ধেও তাহাই। সুরের প্রধান কর্ম্ম একতা-সংস্থাপন, সত্য-সংস্থাপন, মানবধর্ম্ম-সংস্থাপন। সঙ্গীতে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়, তাহার অর্থ কি?

কিন্তু সুরের বিকৃতি হইলে, যে বিধিবদ্ধ সত্য ও সৌন্দর্য্য, এবং তাহার সমবাদী আভ্যন্তরিক দৈবীবাণী আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহার প্রতিঘাতে একটা মহাক্লেশময় অবস্থার উৎপত্তি হয়। তাহাকেই আমরা ব্যাধি বলি। রাগিণীর অবধি নাই, কিন্তু রাগিণীর মধ্যেও যদি সেই দোষ ঘটে,তবে যে ভাবের রাগিণী, তাহার সেই ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে।

রাগরাগিণীর বিকৃতি হওয়ার অর্থ কি? মনে করুন, মূলতানী নামক রাগিণীতে নিম্নলিখিত সুর কয়টা আছে।

সা রি গ ম, প ধ নি র্সা

যদি আমি উহাকে, সা রি গ ম প ধ নি করিয়া দিই, তবে বেসুরা কোথায় হইল? মূলতানী রাগিণী না থাকুক, অন্য একটা রাগিণী হইতে পারে না কি?

আমি বলিব যে, হইতে পারে না, কেন না, 'ধ' এবং রি (কোমলের) মধ্যে সমবাদিত্ব (harmony) সম্ভবে না। মূলতানীর একটা 'ঠাট্' আছে। এবং তাহার সুরের arrangementএর মধ্যে harmony আছে। গাহিবার সময় যদি কেবল রি, গ, ম,গুলিই বেসুরা হইয়া যায়, তবে ত তাহা স্বতন্ত্র কথা। এটা শারীরিক ব্যাধি (organic)। কিন্তু যদি গ-(কোমল)-কে জোর করিয়া 'গ' (সম্পূর্ণ) করিয়া বসি, তবে কাহারও ভাল লাগিবে না। এটা সম্পূর্ণ স্নায়ুবিকার, প্রাণবায়ুর বিরোধী (Nervous disorder)।

আমাদিগের শরীরেও দেখিতে পাই যে, ব্যাধির দুই প্রকার লক্ষণ আছে।

খঞ্জ, বধির প্রভৃতি হওয়াও এক প্রকার ব্যাধি। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সখ্য ঘটিয়া গেলে পরবর্ত্তিকালে সুরের গোলমাল হয় না। মনে করুন, আমার সেতারের একখানা পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে। সেটাকে যদি তাহার পূর্ব্ব স্থানে সরাইয়া আনা অসম্ভব হয়, তবে অন্য পর্দ্দাগুলিকে ততটুকু সরাইয়া দিলে, 'ঠাটে'র বিকৃতি ঘটে না। এটা অস্ত্রচিকিৎসার মত। কিন্তু Harmony একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুর মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, মন তাহাতে সুস্থভাবে 'ষটস্থ' থাকে। আমাদের নৈতিক ও মানসিক বিকারের দিকে লক্ষ্য না করিলে সেই Harmonyর অভাব বুঝা যায় না।

যাহার যেটুকু স্বাভাবিক লক্ষণ, সেইটুকুর তারতম্য ঘটিলে সে মনে করে যে, তাহার একটা রোগের সঞ্চার হইয়াছে। একটা লোক স্বভাবতঃ খুব বিমর্ষ। তাহার পক্ষে হঠাৎ আনন্দিত হইয়া হাস্যপরিহাস করা রোগের লক্ষণ। কাহারও স্বভাবতঃ ক্ষুধা কম, তাহার হঠাৎ ক্ষুধার সঞ্চার হওয়া রোগের লক্ষণ। এ স্থলে 'বিমর্ষ ভাব' ও 'ক্ষুধাহীনতা'ই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের 'ব্যক্তিগত' লক্ষণ। সকল জাতিরই, সভ্যই হউক কিংবা অসভ্যই হউক, নিজের নিজের বেশভূষার মধ্যে একটা Harmony আছে; সুতরাং জাপানীদিগের ক্ষুদ্র চক্ষু এবং পদতল, এবং তাহাদের চিত্রের জ্বলন্ত রং ও কারিকুরি দেখিয়া আমরা খুসী হই। কিন্তু Harmony রক্ষিত না হইলে তৎক্ষণাৎ আমরা বলি, 'রোগে ধরিয়াছে'। মাথায় টিকি রাখিলে হ্যাট ও নেক্‌টাই, বেসুরা বলিয়া বোধ হয়। টিকি যে 'ঠাটে' সুরে বলে, নেক্‌টাই সে ঠাটে বেসুরা বলিয়া বোধ হয়। রাগরাগিণী সম্বন্ধেও সেইরূপ।

তবে বৈলক্ষণ্য ঘটিলে কিংবা রোগের সঞ্চার হইলে উপায় কি? 'হোমিওপাথি' মতে যে লক্ষণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার উপযোগী ঔষধ দিলেই আবার সুরের সঞ্চার হইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' কেন? উত্তর,—বিষের দুঃখ বিষেই বুঝে। তুমি যদি দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠ, তবে অন্য একটি লোক সেই রকম করিয়া কাঁদিলে তুমি সান্ত্বনা পাইবে। যদি তোমার 'বিরহে'র ব্যামো হইয়া থাকে, তবে অন্য একটি বিরহীর দুঃখ দেখিয়া তোমার বিরহ দূর হইবে। তবে কি ঔষধ এবং রাগিণী রোগের উৎপত্তি করে? তাহার উত্তর যে, রোগের উৎপত্তি করে না, লক্ষণের উৎপত্তি করে, ভাবের উৎপত্তি করে। তোমার ভাবের সহিত যদি সে ভাব মিলিয়া

যায়, তবে Harmonyর গুণে তোমার কুলক্ষণগুলি দূর হইয়া আবার পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য লক্ষণ ফিরিয়া আসে। হোমিওপ্যাথির ভিত্তিই সহানুভূতি। রাগ-রাগিণীর মধ্যে আমরা 'সম্বাদী' ও 'বিবাদী' সুর দেখাইয়া তাহার পরিচয় দিয়া থাকি।

গ। ভাবের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ ও তাহার একটি উদাহরণ।

একটা কোনও ভাববিশেষের উৎপত্তি হইলে দেহযন্ত্র বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। 'কথা' ও 'সুরে'র পরিবর্ত্তন ঘটে। একটু চেষ্টা করিয়া সেগুলি টুকিয়া লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন, সেই অবস্থায় যদি কোনও সুর কিংবা রাগিণী সেই ভাবকে কিঞ্চিৎ কিংবা অতিশয় উত্তেজিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বের সুস্থ অবস্থায় আমার দেহ ও মনকে লইয়া আসে, তবে তাহা একটা Proving অর্থাৎ পরীক্ষার স্থল হইয়া পড়ে। অথবা, কোনও একটি রাগিণীর প্রভাবে যদি আপনার সুস্থ মন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহার লক্ষণগুলি টুকিয়া লইলে অনেকটা 'Proving'এর কাজ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিগত পূর্ব্বসংস্কার বিশেষ-ভাবে জানা উচিত। কারণ, অনেক সময় Secondary actionগুলি আমাদের Primary বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রমে সুরে চৈতন্য হইলে এক জন লোক Medium হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় Proving সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু সঙ্গীতের এক জন Medium পাওয়া শক্ত কথা।

আপাততঃ মোটামুটি একটা ভাব লইয়া দেখিলেই চলিবে। মনে করুন, সে ভাবটা 'বিরহ'। বিরহের অর্থ, মিলনের অভাব। কাহার সহিত মিলন? বিরহ জিনিসটা Action না Reaction?

যদি মিলনের বস্তু (object) আমার কল্পনার মধ্যে না থাকে, তবে দার্শনিক ভাষায় তাহা subjective বিরহ। আমি মিলন চাহি, কিন্তু যাহার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা কি, সেটা ঠিক বলিতে পারি না। ইহাকে আধ্যাত্মিক বিরহ বলিতে পারা যায়। 'বসন্ত ঋতু' বিরহের বিখ্যাত সময়। সূর্য্য উত্তরায়ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমগ্র প্রকৃতির একটা ব্যাকুলতা আমরা লক্ষ্য করি। সে ব্যাকুলতা বিরহ-ব্যাকুলতা কি না, তাহার বিচার করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সে অবস্থা Reaction বলিয়া বোধ হইবে। ষড়ঋতুর মধ্যে জ্বর-ভাবের বিশেষ একটি লক্ষণ পাওয়া যায়—

১। শৈত্য (Chilly stage)—কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস।

২। উষ্ণতা (Heat)—ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ।

৩। ঘর্ম্ম (Sweating)—আষাঢ় হইতে আশ্বিন।

প্রকৃতির এই রকম বাৎসরিক একটা বিরাট জ্বরভাব হইয়া থাকে। আমাদের ইহাতে সাধারণতঃ কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র দেহে যখন দৈনিক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়, তখন ক্লেশটা বেশ বুঝিতে পারি, এবং প্রথম কম্পের পর উষ্ণতা যখন আসিয়া পড়ে, তখন আমরা বলি, Reaction আরম্ভ হইয়াছে। বৃহৎ দেহে সেই রকম Reaction যে হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। কিসের Reaction ? অবশ্য ঋতু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, 'প্রখর সূর্য্যকরের'। দারুণ শীতে প্রকৃতি নির্জীব হইয়া পড়ে, তখন সূর্য্যের অভাব কিংবা বিরহ ঘটিলেও ব্যাকুলতা দেখাইবার শক্তি নাই। বসন্তকালে তাহার Reaction হয়, এবং ক্রমে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে মিলন হইয়া পড়ে। এটা objective বিরহ। সূর্য্য object। বিরহের রাস্তা একটা Elliptical orbit। সূর্য্যের ব্যবধানের তারতম্যে বিরহ ও মিলনের ভাব।

এই যে বিরহ প্রকাশ করিবার রীতি কিংবা বিধি (law), ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, এবং মানবদেহে তাহার লক্ষণ বেশ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক অথবা Subjective বিরহে সেটা অন্য আকার ধারণ করে। তাহা পরে বক্তব্য। ব্যক্তিগত বিরহ, কিংবা objective বিরহ সবিরাম জ্বরের মত। কিন্তু সবিরাম জ্বর সকলই এক প্রকার নয়। লক্ষণগুলি দেখিয়া তাহার ঔষধ কিংবা সুর ঠিক করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত বিরহের কোনও কালাকাল নাই। বার মাসই বিরহযন্ত্রণা চলিতে পারে; কারণ, উহা নায়ক ও নায়িকার অভাবসাপেক্ষ। সেই জন্য বিরহের সাধারণ লক্ষণ—দৈহিক এবং মানসিক—(কারণ, মানবের মন আছে) আমাদিগের দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক যুগে বৈষ্ণব কবিগণ বিরহের কতকগুলি লক্ষণ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বিদ্যাপতি

(বর্ষাবিরহ) 'বরখিয়ে পুন পুন আগি দহন জনু'।	(burning sensation—in spite of rainy showers)
(বসন্ত—ঐ) 'চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই'।	(aversion to cold—which produces burning)
'কোকিল কলরব কর দেই ঝাঁপল কাণ'।	(oversensitiveness to noise)

'অব সব বিষসম লাগয়ে মোই'।	(burning)
'অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা'।	(difficult of breathing dyspnœa)
'অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন রেহা'।	(prostration and anæmia)
'অঙ্গুলকি আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি। হার ভেল অতি ভার'	(œdematic-swelling and sensation of weight)
'বিনা অবলম্বনে উঠিতে না পারই দেখি আয়লু চলি রজনী-অবসানে'।	(extreme prostration and midnight aggravation 1 to 2 A. M)

জ্ঞানদাস

(বর্ষাবিরহ) 'সাম শাঙনে আশা নাহি জীবনে বরখিয়ে জল অনিবার'।	(fear of death)
'বিরহিণী-হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক্'।	(anguish of the heart)
দারুণ বিরহ জর	(excessive heat)

গোবিন্দদাস

'শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে সতত সন্তাপই গাতে'	(aversion to cold air—wants wrapping up)
'অহনিশি উৎপত মোর'।	(lachrymation—before ulceration of cornea)
'ফুকরি রোই ধনি' 'একে বিরহানল, ঘামি গলয়ে তনু'।	(sweating stage—burning continues)

'দিনে দিনে ক্ষীণ তনু' (prostration)
'চন্দন পরশে চমকি ধনী উঠই'। (oversensitiveness to cold)
'শীতল পবন, মোহে নাহি ভায়ত'। (aversion to cold air)

এখন Arsenicএর symptoms (লক্ষণ)গুলি Materia Medica হইতে বাছিয়া বাহির করিলে দেখিতে পাইবেন—

Anxiety—restlessness—prostration—burning—midnight aggravation 1 AM—2 AM—Anguish not from pain of the body—but mental—heart anguish—followed by prostration —burning ameliorated by heat—relieved by warmth—wants wrapping up—Dyspœna—Puffness—heated in walking—During chill thirst for hot drinks, During heat small but frequent drinks of cold water which aggravates symptoms, During sweat large drinks of cold water—lachrymation—conjunctivitis—Fever—chill violent but irregular—ইত্যাদি।

অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, বোধ হয়, উপরোক্ত বিরহের লক্ষণগুলি কবিকুলের কল্পনা। কিন্তু তাহা আমরা বলিতে পারি না। পাঠকবর্গের মধ্যে হয় ত অনেকের বিরহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগের উপর বিচারের ভার ফেলিয়া দিলাম। হয় ত তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিবেন যে, এ কালের বিরহ, উল্লিখিত বৈষ্ণবী বিরহ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। একালের বিরহে হয় ত তৃষ্ণার আধিক্য বেশী, অথবা হাত পা ফুলিয়া উঠে না। কিন্তু পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, প্রকৃতির ক্রমবিকাশে মানবের ব্যক্তিগত লক্ষণের তারতম্য ঘটিয়াছে। সেটুকুর দিকে লক্ষ্য করিলে সন্দেহ মিটিয়া যাইতে পারে। এ কালের বৈষ্ণব (অন্ততঃ এক অংশ) কুক্কুট ও ছাগ প্রভৃতির মাংস আহার করিয়া থাকেন ; রীতিমত মোজা, জুতা ও ফ্লানেলের গলাবন্ধ ব্যবহার করেন, এবং মোটরকারে আরোহণ করিয়া দুই বেলা বায়ুসেবনে কিংবা পলিটিক্সের চর্চ্চা করিতে বাহির হন। এমতাবস্থায় বৃন্দাবনী বিরহ ও কলিকাতার বিরহের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। একটা গাভীকে আর্সেনিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিলে যে লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, একটা রামছাগল কিংবা কুক্কুটের বেলায় ঠিক সে রকম পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু তাহা হইলেও broad symptomsগুলি যায় কোথা ? সেগুলি (১) অতিশয় স্নায়বিক অবসাদ, (২)

অথচ অস্থিরতা, এবং (৩) দ্বিপ্রহর রাত্রিতে লক্ষণগুলির প্রাবল্য। সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা, কিন্তু অধিক জলপানে অরুচি, (৪) মৃত্যুভয় ও হৃদয়ের দারুণ ক্লেশ।

এখন দেখা যাউক, দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় কোন্ রাগিণীর মধ্যে এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। এক জন সেকালের কবি ('কবির দলে'ই বিরহের ছড়া-ছড়ি পূর্ব্বকালে ছিল) অনেক দেখিয়া শুনিয়া বেহাগ রাগিণীতে বিরহের একটা গান বাঁধিয়াছিলেন এবং সেটা বঙ্গদেশে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল একটা typical গান বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

'সখি আমার ধর ধর'—ইত্যাদি এই বেহাগের একতালা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শুনিয়া এক কালে অনেকে বিরহের জলন্ত ছবি অনুভব করিয়াছিল, এবং এমন কি অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত।

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় অনেক রাগিণী গেয়। যেমন পরজ, কিংবা কালাংড়া, কিংবা রামকেলী ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগের মত কোনটারই prostration এবং restlessness নাই। বেহাগের ভয়ানক নির্জীব ভাব। পরজ, কালাংড়া, রামকেলী প্রভৃতি গ হইতে ঋ কোমল রেখ স্পর্শ করিয়া নিম্নে আসে। বেহাগ তাহা পারে না। সে গ হইতে একেবারে সুরের নীচে নিখাদে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়। উঠিবার সময় অনেক চেষ্টা করিয়া উপরের নিখাদে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখান চড়া সুরে উঠিতে গেলে শ্বাসরোধের মত হয়, কম্প হয়, আবার পঞ্চমে আসিয়া বিশ্রাম লয়। পরজও মধ্যরাত্রির রাগিণী, কিন্তু সে ভূপালীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন।

যদি কোনও সঙ্গীতজ্ঞ লোক থাকেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, অন্য কোনও রাগিণী বেহাগের ন্যায় খাঁটী বিরহের ভাব প্রকাশ করিতে পারে কি না। হৃদয়ের দারুণ ব্যথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবসাদ, তৃষ্ণার উদ্রেক, এমন কি, আন্তরিক প্রদাহ, আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে অন্য কোনও রাগিণীতে আছে কি না সন্দেহ। এমন কি, এক জন ভক্ত প্রাণের সেই অসীম ব্যাকুলতা সহ্য করিতে না পারিয়া, 'তুমি বিনা কে প্রভু! সঙ্কট নিবারে' (fear of death) একেবারে গাহিয়া ফেলিয়াছিলেন।

'আর কেহ নাই যে সহায়
এই ভব-অন্ধকারে।

'অন্ধকারে' কেন? Kent এর Materia Medica উল্টাইয়া দেখুন (Ars. relieved by darkness)। অন্ধকার ভিন্ন সে চিত্তব্যাকুলতার শান্তি নাই, অথচ সেই অন্ধকারে এক জন সহায় চাই।

অনেক জায়গায় দেখিবেন, বিরহী ও বিরহিণীর গৃহে দীপ জ্বালিলে তাহারা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শীতল বায়ু চাহে, কিন্তু তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রদাহেও উষ্ণতা পছন্দ করে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নির্জীব ভাব সত্বেও বেহাগের ফল Reaction। খানিকক্ষণ ধরিয়া ভাঁজিলেই শরীরে নব-জীবনের উন্মেষ হয়। পরজ প্রভৃতিতে শক্তির প্রাবল্য থাকিলেও, ফলে অবসাদ। কিন্তু বেহাগে অবসাদের ফলে অবশেষে শান্তি ও উৎসাহ। পরজ গাহিয়া আপনি শীঘ্রই 'এলাইয়া' পড়িবেন, বেহাগে উত্তরোত্তর বল পাইতে থাকিবেন।

Arsenicও তাই। সেই জন্য Cholera caseএ আর্সেনিক Reaction উৎপত্তি করিবার জন্যই প্রযুজ্য। চটাপট্ Arsenic দিলে case খারাপ হইয়া যায়।

যদি রীতিমত পরীক্ষা করিতে চাহেন, তবে আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজেই দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বেহাগ আরম্ভ করুন। যদি আপনি সুরজ্ঞ না হন, তবে কেবল আপনার চেষ্টাতেই 'সকলে' পলাইয়া গেলেও বিরহের উৎপত্তি। আর যদি সুরজ্ঞ হন, তবে 'সকলে' আপনার ন্যায় বিরহে মাতিয়া উঠিবে। কিছুক্ষণ পরেই জলতৃষ্ণা আরম্ভ ও বিষম অবসাদ। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, ছোট ছোট ছেলেপুলে এবং স্ত্রীলোকেরা বেহাগ শুনিয়া শীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমাণে জল পান করে। একটি ছেলে একবার বলিয়াছিল, 'আমার ভয় করছে'। অনেকে অসাড় হইয়া পড়ে। কিন্তু অসাড় হইলে যদি আবার—

স গ প নি

ক্রমাগত ধ্বনি করিতে থাকেন, তবে দেখিবেন যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে বল পাইবে। ২৫ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে আমার একটি বন্ধু এককালে বাস করিতেন। তিনি অধিক অধ্যয়নে রাত্রি জাগিয়া ও বিদেশস্থা নববিবাহিতা স্ত্রীর অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে Nux দিয়া কোনও উপকার প্রাপ্ত হই নাই। মধ্যে Natrum carbও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু একদিন বেহাগ রাগিণীর আলাপ শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়া গেল, এবং তৎপরেই তিনি বি.এ. পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আর্য্য ও ইব্রিয় জাতির বিবাহ।

৩

বিবাহকালে আর্য্য-কন্যার হাতে বালা ও নাকে নথ অবশ্য-ব্যবহার্য্য। হাতের বালা ও নাকের নথ সধবার লক্ষণ। ইব্রিয়দের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ১০।৮৫।৬ ঋকে যে 'ন্যোচনী' শব্দ আছে, দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ দাসী, এবং ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদক Griffith সাহেব *led* অনুবাদ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনেক আলোচনার পর 'ন্যোচনী' শব্দের অর্থ নথ (সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩২০) গ্রহণ করিয়াছেন। হিব্রু বা ইব্রিয় ভাষায় নাকের নথ Nezem (নেজেম) নামে পরিচিত। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে 'ন্যোচনী' নথ হওয়াই সঙ্গত।

ন্যোচনী ও নেজেম।

ঋগ্বেদে আর্য্য-কন্যার ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের নামের অধিক উল্লেখ না থাকিলেও, দেবতাদের পরিধেয় অলঙ্কারের নাম দ্বারা প্রাচীন আর্য্যকন্যাগণ কি কি নামের অলঙ্কার ব্যবহার করিত, তাহা জানিতে পারা যায়। আর্য্য ও ইব্রিয় অলঙ্কারগুলির নাম আমরা তুলনা দিয়া উল্লেখ করিতেছি। যে প্রকার আর্য্যদের বা মরুৎগণের (৫।৫৮।২ ঋক), তেমনই দেবপূজক ইব্রিয়দের দেবগণের (Isaiah 30—22) অঙ্গেও অলঙ্কার থাকিত। বৈদিক কালে নববধূরা পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত (৯।৪৬।২ ঋক) হইয়া স্বামিগৃহে যাত্রা করিত। বরও নানাপ্রকার বসন ভূষণে (৫।৬০।৪ ঋক) সজ্জিত হইত। বৈদিক মরুৎগণের ন্যায় প্রাচীন ইব্রিয় পুরুষগণও নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। ইহা Genesis 41—42, Judges 8—24, 26, এবং 2 Samuel 1—10 পদ পাঠে অবগত হওয়া যায়। যে প্রকার ইব্রিয় বর যাজকীয় সাজসজ্জা দ্বারা (Isaiah 61—10) সজ্জিত হইত, সেই প্রকার আর্য্য বরও 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বিশেষ কোনও শ্রেণীর ঋত্বিকের ব্যবহার্য্য সাজসজ্জা পরিধান করিত।

বসন, ভূষণ।

বৈদিক হাতের বালা বা বলয়, যাহা ঋগ্বেদের ৫।৫৮।২ ঋকে 'খাদি' নামে পরিচিত, হিব্রুতে তাহা 'খাখ' (khakh) নামে (Exodus 35—22) অভিহিত। ইহা প্রাকৃতে 'খাড়ি'; বাঙ্গালায় খাড়ু। পায়ের যে মল ঋগ্বেদের ৫।৫৪।১১ ঋকে ঐ 'খাদি' নামে অভিহিত, তাহাই khaliya (খালিয়া)

নামে (Hosea 2—13) ইব্রিয়দের নিকট পরিচিত। পদদেশের বলয়াকৃতি অলঙ্কার (বর্ত্তমান হাঁসুলি), যাহা ঋগ্বেদে ঐ 'খাদি' নামে (৭।৫৬।১৩ ঋক) উল্লিখিত, ইব্রিয়দের নিকট তাহা 'খাকস' (Songs 1—10) নামে পরিচিত। বৈদিক 'রুক্মা' (৫।৫৪।১১ ঋক) বা গলার চন্দ্রহার, যাহা বক্ষে সুশোভিত হইত, ইব্রিয়গণ তাহাকে 'রাবিদ' (Genesis 41—42) বলিতেন। বৈদিক 'ন্যোচনী' (১০।৮৫।৬ ঋক) অর্থাৎ নথ ইব্রিয়দের নিকট 'Nezem বা নেজেম' (Genesis 24—22, 30) নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের ৫।৫৩।৪ ঋকের 'স্রক্' বা মালার সঙ্গে আমরা ইব্রিয় 'Sharshah' অর্থাৎ মালার (Exodus 28—22) তুলনা করিতে পারি। স্রক্ বা মালা যে প্রকার বৈদিক মরুৎগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার, তদ্রূপ Sharshah ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য (Exodus 28) অলঙ্কার। আধুনিক নোলক ও ইব্রিয় 'নেতিকত' (Judges 8—26) একই অলঙ্কার। বৈদিক 'অৎকান' (৫।৫৫।৬ ঋক) বা রক্ষা-কবচের অনুরূপ ইব্রিয় 'এতসাদা', যাহা যুদ্ধে পতিত শৌলের বাহুতে (2 Samuel 1—10) ছিল, তাহা একই বস্তু। দেবতা মরুৎগণের পবিত্র উষ্ণীষ 'শিপ্র' (৫।৫৪।১১,১।৯।৩,১।২৯।২ ঋক) যাহা বৈদিক কালে ঋষিগণও ব্যবহার করিতেন ; তাহার সঙ্গে ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য পবিত্র উষ্ণীষ (Sanif) সানিফ্ (Isaiah 3—23, Exodus 28—4, Zekria 3—5) সহ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সেলাই-করা চোগা (cloak) জাতীয় পশমী 'শামুল' নামক বৈদিক (১০।৮৫।২৯ ঋক) পোষাক,যাহা আর্য্য বর ও যাজকগণ পরিধান করিতেন ; তাহার সঙ্গে ইব্রিয় বর ও যাজক-শ্রেণীর ব্যবহার্য্য পশমনির্ম্মিত উপরে পরিধেয় চোগা-জাতীয় Simlaa সিমলা (Genesis 9—23, 35—2) নামক পরিচ্ছদের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈদিক "শুল্কাব" (৫।৫২।৯ ঋক) নামক (ঊর্ণা) পশমী বা সূক্ষ্ম জাতীয় বস্ত্রের সঙ্গে ইব্রিয়দের মসলীন (সূক্ষ্ম) জাতীয় 'Sadin' (সাদিন) নামক (Isaiah 3—23, Proverbs 31—24) বস্ত্রের তুলনা করিতে পারি। অতি প্রাচীন য়িহুদী জাতীয় ঐতিহাসিক Josephus নিজ গ্রন্থে (1—216) এই জাতীয় বস্ত্র 'chithone' নামে পরিচিত করিয়াছেন। New Testment-এ ইহা 'chiton' (Mark 14—63) নামে উল্লিখিত আছে। এই Sadin নামক বস্ত্র প্রাচীন বাবেলবাসীর নিকট 'Sindu' সিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকদের নিকট 'Sindon' সিন্দন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce) এবং

আরবীয়দের নিকট 'সন্দুস' 'Sandus' (কোরাণ সুরা দোখান ৫২ আয়েত) নামে পরিচিত। কোরাণ সরিফে ইহা স্বর্গীয় পোষাক বলিয়া কথিত। বৈদিক মরুৎগণের অংসদেশের ভূষণ 'এতা' (১।১৬৬।১০ ঋক) সহ ইব্রিয় যাজক-শ্রেণীর (Genesis 33—4,5) এবং কানান-দেশীয় পৌত্তলিকদের প্রতিমার ব্যবহার্য্য অলঙ্কার 'এদি'র তুলনা চলে।

অঞ্জন ও কজ্জল।

বিবাহকালে আর্য্য কন্যা চক্ষুতে 'অঞ্জন' (১০।১৮।৭) দিত। ইহা ঋগ্বেদে সধবার লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্রিয়-কন্যাও বর কিংবা পতি প্রতীক্ষায় চক্ষুতে কজ্জল ধারণ (2 Kings 9—30) করিত, এই কজ্জল হিব্রুতে Kohl নামে পরিচিত।

সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ।

ইব্রিয় জাতির বিবাহে কন্যা-সম্প্রদান (Genesis 29—23) আবশ্যক ছিল। বৈদিক কাল হইতে আর্য্যদের মধ্যে কন্যা-সম্প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৯ ঋকের "সবিতা দদাত" দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের ১০।৮৫।৩৬ ঋকের "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা" ইত্যাদি বাক্যে পাণিগ্রহণ প্রথার প্রমাণ রহিয়াছে। রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৩।২৭ শ্লোকেও পাণিগ্রহণের প্রমাণ আছে। প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যেও সম্প্রদান-প্রথা (Khorda Avesta 49) ছিল।

গ্রন্থি বন্ধন।

ঋগ্বেদের ১০।৮৫।২৪—২৫ ঋক পাঠ করিলে আর্য্য-বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে গ্রন্থি-বন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইব্রিয় জাতির বিবাহেও গ্রন্থি-বন্ধনের প্রথা ছিল। হিব্রু ও আরবীতে উহাকে 'আকদ' বলে।

অঙ্গুরী ও মালা বদল।

ইব্রিয় বর নিজ হস্তের অঙ্গুরী কন্যার বাম হস্তের তর্জ্জনীতে পরাইয়া দিত। অধুনা আর্য্য বর ও কন্যার মধ্যে পরস্পর মালা বদল হয়।

আশীর্ব্বাদ।

আর্য্য-কন্যাকে বিবাহান্তে "বীরপ্রসবা ভবেতি" (কুমারসম্ভব, ৭।৮৭) অর্থাৎ বীরপুত্রপ্রসবিনী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইত। বৈদিক কালেও "বীরসূর্দেবকামা" (১০।৮৫।৪৪ ঋক) অর্থাৎ, বীর-পুত্র-প্রসবিনী হও, এই প্রকার আশীর্ব্বাদ প্রচলিত ছিল। "রুস্তমের ন্যায় বীর পুত্র হউক" এই বলিয়া প্রাচীন পারসীক জাতির ধর্ম্ম-যাজক বিবাহান্তে দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ (Khord Avesta 49—6) করি-

তেন। এই প্রকারের আশীর্ব্বাদই বিবাহান্তে ইব্রিয়-কন্যাকে প্রদত্ত হইত। পিতা বথুয়েল ও ভ্রাতা লাবন কর্তৃক রেবেকাকে প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ "সহস্র সহস্র লোকের জননী হও, তোমার বংশ আপন বৈরিগণের নগর অধিকার করুক" (Genesis 24— 0) দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি।

বাসরগৃহ।

ইব্রিয় জাতির বিবাহে বাসরগৃহ (Psalms 19—5) থাকিত। ইব্রিয় বাসরগৃহ যে হাস্যামোদের স্থান, তাহা Joel ২—16 ও John 3—29 পদ পাঠে বুঝা যায়। আর্য্য বাসরগৃহের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। "ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং কৌতুকাগারমাগাৎ" কালিদাসের এই বর্ণনাই (কুমারসম্ভব, ৭।৯৪) তাহার প্রমাণ।

বিবাহভোজ ও গো-হনন।

১০।৮৫।১৩ ঋকের শেষার্দ্ধ এই, "অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে"। দত্ত মহোদয় সম্পূর্ণ ঋকের অর্থ করিয়াছেন—"মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়; অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়", এবং ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক Griffith 'হন্যন্তে' শব্দের অর্থ 'Slain' বুঝিয়া, "In *Magha* days are oxen slain, in *Arjunis* they wed the bride", এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি টীকায় বলেন,—বিবাহভোজের জন্য গো-বধ হইত। মঘা ও ফল্গুনী শব্দ ঐ ঋকে নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।১১) "ফল্গুনী ইন্দ্রের নক্ষত্র, ইন্দ্রের অপর নাম অর্জ্জুন, এ জন্য উক্ত নক্ষত্রদ্বয় অর্জ্জুনী নামেও কথিত হয়", এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী-গ্রহণ সঙ্গত কি না, ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, অর্জ্জুনী শব্দ ঋগ্বেদে অন্যত্র কোথায় কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদের অন্যত্র ১।৪৯।৩, ৫।৮৫।২ ঋকে 'অর্জুনি' ও ১।১২২।৫, ৩।৩৯।২, ৭।৫৫।২, ৯।৬৯।৪, এবং ১০।২১।৩ ঋকে 'অর্জুন' শব্দ আছে। দত্ত মহোদয় ও Griffith, উভয়ে তাহার অর্থ আলো, শুভ্র, উষা, এবং উজ্জ্বল গ্রহণ করিয়াছেন। ১০।৮৫।১৩ ঋকের অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী বুঝিতে হইলে, কোন্ ফল্গুনী বুঝিতে হইবে? পূর্ব্বফল্গুনী কি উত্তরফল্গুনী? দুই ফল্গুনীর একত্র উদয় ও আগমন অসম্ভব। প্রাচীন কালে পূর্ব্বফল্গুনীতে বিবাহ প্রশস্ত ছিল না। উত্তরফল্গুনীতে বিবাহ-লগ্ন স্থির হইত। যদি অর্জুনী অর্থে ফল্গুনী সঙ্গত হয়, তবে তাহা বিবাহ-লগ্নের জন্য। বিবাহ-উপঢৌকনের গাভীগুলি বহিয়া লইবার, কিংবা বিবাহ উপলক্ষে গাভীগুলিকে

বধ করিবার শুভক্ষণ মঘা ও ফল্গুনী লগ্নের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা বিচার-সাপেক্ষ। ১০.৮৫।১৩ ঋকের উক্ত 'অঘা' পাঠ গ্রহণ না করিয়া যদি 'মঘা' পাঠ গ্রহণ করা যায়, এবং তাহার অর্থ মঘা নক্ষত্র গ্রহণ করা চলে, তাহাতেও অর্থ সঙ্গত হয় না। প্রাচীন কালে, অন্ততঃ রামায়ণের যুগেও, 'পূর্ব্বফল্গুনী' কি 'মঘা' নক্ষত্রে বিবাহ প্রশস্ত ছিল না। রামায়ণে দেখি, "মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো। ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু॥" (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭১।২৪) অর্থাৎ, অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করুন; অন্যত্র, "উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ। বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ॥" (রামায়ণ, আদি-কাণ্ড, ৭২।১৪) অর্থাৎ, পরশ্ব দিবস উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে, ঐ দিবস বিবাহ অতি প্রশস্ত; যে হেতু মনীষীরা বিবাহ বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কালিদাসও হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনায় "মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু" (কুমার-সম্ভব, ৭।৬) শ্লোকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হরগৌরী কি সীতার বিবাহ পূর্ব্বফল্গুনী কি মঘা নক্ষত্রে হয় নাই। অধিকন্তু প্রাচীন ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ তাহা অপ্রশস্ত বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন কালে মঘা নক্ষত্রে বিবাহ কি বিবাহসম্পর্কিত কোনও কার্য্যই হইত না। রমেশচন্দ্র দত্তও সায়না-চার্য্যের অর্থানুযায়ী সবিতৃ-দত্ত উপঢৌকনের গাভীগুলিকে মঘা নক্ষত্রে সোমগৃহে তাড়াইয়া ও অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফল্গুনীতে গাভীগুলিকে বাহিয়া লইয়া যাওয়া হইলে, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী তিন দিন পর্য্যন্ত বহিয়া কিংবা তাড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনটি শুভদিন কি জন্য আবশ্যক হইত, ইহা সমস্যাপূর্ণ বটে। উপঢৌকনাদি বিবাহ-অন্তে দিবার প্রথা রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৭৪ সর্গে দৃষ্ট হয়। Griffith-এর অর্থানুযায়ী মঘাতে গো-বধ, এবং ফল্গুনীতে বিবাহ কার্য্য হওয়া গ্রহণ করিলে, বর ও অভ্যাগতাদি কি বিবাহ-লগ্নের তিন দিন পূর্ব্বেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইত? অধিকন্তু মঘা নক্ষত্র ত বিবাহ কার্য্যের কোনও শুভদিন বা লগ্ন নহে। গো-বধ জন্য কোনও শুভ লগ্নের আবশ্যক ছিল কি না, তাহাও বিচারযোগ্য। ফলতঃ, 'অঘা' পাঠের পরিবর্ত্তে 'মঘা' গ্রহণ করিয়া, তাহাই বিবাহ কি তৎসম্পর্কিত কোনও লগ্ন সাব্যস্ত হইলে, পরবর্ত্তী অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী-গ্রহণের কোনও সার্থকতা থাকে না, এবং অর্জ্জুনী অর্থে ফল্গুনী বুঝিয়া তাহাই বিবাহ-লগ্ন স্থিরীকৃত হইলে, 'অঘা' অর্থে মঘা-গ্রহণ

নিতান্তই অসমীচীন হইয়া পড়ে। বিবাহ কি তৎসম্পর্কিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার লগ্ন স্থির জন্য তিনটি তিথি নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে যে দেবতাকে 'অপ্বা' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঠিক সেই দেবতা সামবেদে (২।৯।২।৫।১) 'অঘা' নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের 'অপ্বা' ও সামবেদের 'অঘা', উভয়েই পাপ-দেবতা। সামবেদের (২।৯।২।৬।১) 'অঘাহর' অর্থে Sin-Remover। ঋগ্বেদের ১।৪২।৪, ৬।৭১।১০ ঋকের 'অঘশংস' অর্থে অনিষ্টঘাতক, ৮।৪৭।২—৫ ঋকের 'অঘা' অর্থে পাপ ও ১০।১০২।১০ ঋকের অঘা অর্থে Griffith *evil* করিয়াছেন। ৭।১৯।৭ ঋকে অঘা অর্থে পাপ। ১।১৮৯।৫ ঋকের 'অঘা' অর্থে হিংসুক, দুষ্ট, ইত্যাদি।

এক্ষণে ১০।৮৫।১৩ ঋকের 'অঘ' অর্থে পাপ, অনিষ্ট ও অস্ অর্থে ক্ষেপণ, মোচন গ্রহণ করিয়া 'প্রায়শ্চিত্তে বা পাপমোচনার্থ বধ্য গাভীগুলিকে উষার (অর্জ্জুনী) আগমনে বা প্রত্যূষে লইয়া যায়', এই অর্থ করিলে কত দূর সঙ্গত হয়, তাহা বিচারসাপেক্ষ। বিবাহদিনের প্রভাতে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য প্রাচীন কাল হইতে (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭১।২৩,৭২।১১) প্রচলিত আছে।

বৈদিক কালে ব্রাহ্মণ ও মাননীয় অতিথির সেবার জন্য (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ম পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড) গো-বৎসা বা গাভী বধ হইত, জানা যায়। বৈদিক কালে দেবগণের জন্য গাভী আহুতি (Burnt offering) হইত, ঋগ্বেদের বহু ঋকে তাহার উল্লেখ আছে। হিন্দুসন্তানদের বিবাহ কালে নাপিত দ্বারা যে "গোর্গৌ" ইত্যাদি গো-বন্ধন ও তদুত্তরে বর দ্বারা যে মুক্তিবচন আওড়ান হয়, ইহা অবশ্যই কোনও প্রাচীন প্রথার স্মৃতি। গো-বন্ধন হইত কেন? গো-বধ নিষিদ্ধ হইবার পরে কি ঐ মুক্তিবচনের সৃষ্টি হয় নাই?

ইব্রিয় জাতির মধ্যেও গো-বৎস-বধ দ্বারা মাননীয় অতিথির সমাদর হইত। আব্রাহামের তাঁবুতে আগত স্বর্গীয় দূতের সেবায় (Genesis 18—7) গো-বৎস-বধ হইয়াছিল। প্রাচীন ইব্রিয় জাতির বিবাহ-ভোজে (Genesis 29—22) গোবধ (Matthew 22—4) হইত। ইব্রিয় জাতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যজ্ঞে যে গোবধ করিত, তাহা এক হইতে তিন বৎসর বয়স্কা ও সুলক্ষণা Heifer বৎসতরী (Genesis 15—9, Numbers 15—1, Dewteronomy 21—3—6) হওয়া আবশ্যক ছিল। এই প্রকার যজ্ঞে ষাঁড়, কি বৃদ্ধা গাভী, কিংবা অন্য পশুর বধ অবিহিত। আর্য্য জাতির ন্যায় প্রাচীন ইব্রিয়গণও অন্য পশু অপেক্ষা সুলক্ষণা গাভীকে পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। ইব্রিয় জাতির Co-

venant Ark [বা নিয়ম-সিন্দুক, যাহাতে যিহোবা-দত্ত অনুশাসন-প্রস্তর থাকিত, সেই Ark বা সিন্দুকের শকট বহন জন্য অন্য পশু কিংবা ষাঁড় নিযুক্ত না হইয়া "কখনও যোয়ালী বহন করে নাই, এমত দুই দুগ্ধবতী গাভী (I Samuel 6—7) নিযুক্ত হইত।" ঋগ্বেদের ১০।৮৫ সূক্তে বর্ণিত সূর্য্যার রূপক বিবাহের শকট বহন জন্য (১১ ঋক) দুইটি গরু নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই প্রকার বহু আর্য্য আচার-পদ্ধতির সহিত ইব্রিয় আচার অনুষ্ঠানের সৌসাদৃশ্য আছে। পাঠকগণের বিরক্তিভয়ে আর কথা না বাড়াইয়া ক্ষান্ত হইলাম। শেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র ঋক্‌গুলির অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

হৃদয়-শ্মশান।

গ

[ধরানাথের কথা।]

১

কথা শেষ করিয়া বিন্দুমাধব উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও উঠিলাম। কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার দিনান্তের কনককিরণ পান করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। চন্দ্রোদয় হইয়াছে—যমুনার বালুবিস্তারের উপর সে কিরণ আস্তরণের মত বিস্তৃত হইয়া আছে—অদূরে কুদসিয়া বাগে বৃক্ষশাখায় বিনিদ্র ময়ূর কেকারবে আপনার আবাসের সন্ধান দিতেছে; মধ্যে মধ্যে মাথার উপর দিয়া বলাকাশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে—তাহাদের পক্ষাহত পবনে শন্ শন্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

উঠিয়াই বিন্দুমাধব এমন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল যে, তাহার ব্যবহারে আমি একটু শঙ্কিত হইলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার সে আশঙ্কা দূর হইল—'নিগমবোধ' শ্মশানে আসিয়া বিন্দুমাধব স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মানসিক চাঞ্চল্য সময় সময় দৈহিক চাঞ্চল্যেও আত্মপ্রকাশ করে। দৈহিক অবসাদে সে চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। তাই কিছু দূর দ্রুত বালুকাস্তৃত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বোধ হয়, বিন্দুমাধব একটু স্থির হইয়াছিল।

নিগম্বুধি দিল্লীর বৃহৎ শ্মশান—যমুনার বক্ষের উপর অবস্থিত। আমরা যখন তথায় উপনীত হইলাম, তখন দুইটি শব দাহ হইতেছে। দিল্লীর শীতে অগ্নিসেবন সুখজনক—যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছে, তাহারা চিতার কাছে বসিয়া আছে। বিন্দুমাধব একটি চিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "ইহার সকল অশান্তির অবসান হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কে বলিতে পারে?"

"কেন?"

"যদি এই দেহের সঙ্গে সব শেষ হয়—ইহকালের পর যদি পরকাল না থাকে।"

"ইহকালেই সে এত বেদনা ভোগ করিয়াছে যে, পরকালের কল্পনাতেও বিন্দুমাধব যেন শিহরিয়া উঠিল—"পরকাল কি আছে?—থাকিতে পারে?—তুমি বিশ্বাস কর?"

আমি বলিলাম, "প্রমাণে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অনুমানে?"

"অনুমানেই বা বিশ্বাসের কারণ কোথায়?"

"নহিলে ভালবাসিয়া তোমার এ বেদনার নিদান কিরূপে নির্ণয় করিব?"

বিন্দুমাধব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার পর উত্তেজিতভাবে বলিল, "না—ইহার পর আর কিছু নাই—কিছু নাই।"

আমি সে কথায় আর কিছু না বলিয়া বলিলাম, "রাত্রি হইয়াছে—চল,যাই।"

বিন্দুমাধব আপত্তি না করিয়া আমার সঙ্গে চলিল। পথে আমি তাহাকে শান্ত দেখিয়া বলিলাম, "কাজের অভাব তোমাকে আত্মঘাতী করিতেছে—কিন্তু জগতে কি কাজের অভাব আছে?"

সে বলিল, "আমার কাজ!"

"তোমার—আমার সকলেরই কাজ আছে। যে ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত করিয়া তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, সে ভালবাসা কেন অনাথ আতুরকে প্রদান কর না! যে স্নেহের প্রতিদানে পাছে শ্রদ্ধা না পাও—এই আশঙ্কায় সংসার-ত্যাগী হইয়াছ, সেই স্নেহ কেন স্নেহের অভাবে পীড়িতদিগকে দাও না!"

বিন্দুমাধব কোনও উত্তর দিল না।

আমি বলিলাম, "আমি চিকিৎসাব্যবসায়ী—যে জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি দেখিয়া বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন—সেই জরা মৃত্যু ব্যাধির সহিত আমার পরিচয় প্রতিদিনের। আমি দিন দিন

তাহার নূতন—বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মানুষের আরও কত কষ্ট আছে। মানুষ সেবা শুশ্রূষা—ঔষধ পথ্য না পাইয়া পথের পার্শ্বে শৃগাল কুকুরের মত মরিয়া থাকে ; শিশু দুগ্ধের অভাবে প্রাণ হারায়। আমাদের যাহার যেটুকু অবসর—যেটুকু শক্তিসামর্থ্য, তদনুসারে আমরা ত সে অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারি।”

বিন্দুমাধব জিজ্ঞাসা করিল, “তাহাতে কি মানুষ শান্তি পাইতে পারে ?”

আমি বলিলাম, “আমরা স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত—কিন্তু সুখ স্বার্থে নাই ; বোধ হয় পরার্থে তাহা লাভ করা যায়।”

বিন্দুমাধব ভাবিতে লাগিল।

২

স্ত্রীকে সকল কথা বলিলে তিনি বলিলেন, “কোনরূপে বিন্দুমাধবের স্বজনগণের সন্ধান করা যায় না ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন ?”

“কোনও কোনও মানুষের স্বভাব এই যে, তাহারা না হারাইলে কিছুরই মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে পারে না—হারাইলে তবে বুঝিতে পারে। দেখিতেছি, ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই সেই প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে উভয়েরই শিক্ষা হইয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামী যেমন তাহার অভাবপূরণ করা অসম্ভব বুঝিয়া আত্মঘাতী হইতে গিয়াছিলেন—স্ত্রীও তেমনই এত দিনে নিশ্চয়ই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান সম্বল স্বামীর অভাব বুঝিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।”

আমি বলিলাম, “তুমি যে একটা প্রকাণ্ড দার্শনিক হইয়া উঠিলে !”

“দেখিবার চক্ষু থাকিলেই মানুষ দার্শনিক হয়—তোমাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তোমরা দেখ রোগী। এখন সে সব কথা যাক—বিন্দুমাধবের স্বজনগণের সন্ধান করিবার উপায় কি ?”

“উপায়ের মধ্যে এক দেখি, বাঙ্গালার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া।”

“তাহাই কর।”

“তথাস্তু।”

৩

কিন্তু পর দিন প্রাতে আর বিন্দুমাধবকে পাইলাম না। প্রত্যূষে সে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল—তখন একাধিক ট্রেণ দিল্লী ষ্টেশন হইতে

যায়। যাইবার সময় সে আমার দ্বারবানের কাছে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল—

"ধরানাথ, তোমার স্নেহের ও তোমার পত্নীর যত্নের জন্য তোমাদিগকে যে ধন্যবাদ দিয়া যাইতেও পারিলাম না—ইহাতেই বুঝিবে—আমার দুর্ভাগ্য এখনও আমাকে অব্যাহতি দেয় নাই। ইংরাজী একটি কবিতায় পাঠ করিয়াছি—যে জীবনের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শেষে পান্থাবাসে সাদর অভ্যর্থনা পায়, সে সে কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। আমি কিন্তু জীবনের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া বিজন পথে কেবল কষ্ট পাইয়া তোমার পান্থশালায় আসিয়া নূতন জগতের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমার প্রেমসুখসমুজ্জ্বল গৃহে আসিয়া আমি জগৎকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসে লজ্জানুভব করিয়াছি। তোমরা সুখে থাক।

"তুমি যে আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছ—তাহারও কি কোনও কারণ ছিল? কে বলিবে?—জগতে জ্ঞাত অতি সামান্য—অজ্ঞাত অনেক। সে দিন শ্মশানে তুমি আমাকে নূতন কর্ত্তব্যের সন্ধান দিয়াছ। আমি তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। যদি তাহার সন্ধান পাই—যদি তাহাতে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারি, তবে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আরও অধিক মনে করিব।

"তোমাদের আমি কখনও ভুলিতে পারি না।

"স্নেহবদ্ধ বিন্দুমাধব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম—হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিলাম। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমার স্ত্রী বলিলেন, "সন্ধান করিবে না?"

আমি বলিলাম, "করিব। কিন্তু তাহার সন্ধান পাইবে না।"

"কেন?"

"তাহাকে আর সংসারের পিঞ্জরে পুরিতে পারিবে না—সে আর বন্ধনে বদ্ধ হইবে না।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "হয় ত সেই ভাল। কিন্তু আমরা সংসারের মায়ায় বদ্ধ—সংসারের বাহিরে চাহিতেও জানি না; তাই আমাদের মনে হয় সব আশা—সব আকাঙ্ক্ষা—সব কাজ সংসারের কেন্দ্রেই আবদ্ধ; যে সে কেন্দ্র ত্যাগ করে, সে লক্ষ্যহীন হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করে।"

"বিন্দুমাধবেরও তাহাই হইয়াছে। সংসারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া সে কেবল দুঃখই পাইয়াছে। সে দুঃখ এত তীব্র যে, সে আত্মঘাতী হইয়া তাহার দাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এবার সে সংসারের বাহিরে —নূতন কর্ত্তব্যের সন্ধানে গিয়াছে। যদি সফলকাম হয়—তবেই মঙ্গল।"

"তাহাই হউক। যে ভালবাসা বিলাইয়া দিতে না পারিয়া তিনি হৃদয়স্থিত উৎস-বারির বেগে পর্ব্বতের কম্পনের মত বেদনাচাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছেন, সেই ভালবাসা বিশ্বমানবের কল্যাণে প্রযুক্ত হউক।"

"হাঁ—মুক্তির পর যে বন্ধন, সে ত মধুরই—

"যা'র কেহ নাই, তা'র সব আছে।
সমস্ত জগৎ মুক্ত তা'র কাছে।
তা'রি তরে ফুটে রবি শশী তারা
তা'রি তরে ফুটে কুসুম গাছে।"

বিন্দুমাধবের সন্ধান করিলাম; কিন্তু সন্ধান পাইলাম না। সে যেমন অতর্কিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনই অতর্কিতভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু চিহ্ন রাখিয়া গেল আমাদের হৃদয়ে তাহার প্রতি স্নেহে—তাহার দুঃখে সহানুভূতিতে।

আমার স্ত্রী একবার বলিলেন, "তবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হইত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"যদি আবার কখনও সন্ধান পাও।"

"তখন যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব—তখন করিব।"

"সেই ভাল।"

বিন্দুমাধব লিখিয়া গিয়াছিল, আমাদিগকে ভুলিতে পারিবে না। আমরা তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না।

৪

দুই বৎসর কাটিল। বিন্দুমাধবের স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে অপনীত হইল না। ফটো লওয়া আমার একটা সখ ছিল। আমি তাহার একখানি ফটো লইয়াছিলাম। আমরা কত দিন সেই প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহার কথা লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার স্ত্রী বলিতেন—"তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে আমার প্রবল কৌতূহল হয়। মানুষের জীবনে কত ভুলই হয়—আর ভুলের পরিণাম কিরূপ বেদনাদায়ক হইতে পারে!"

দুই বৎসর পরে এক দিন এক জন বাঙ্গালীর গৃহে আমার রোগী দেখিবার ডাক আসিল। ভদ্রলোকটির বড় কয়লার কারবার—কারবারের জন্য তিনি বৎসরে প্রায় আট মাস দিল্লীতে থাকিতেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কখন তাঁহার গৃহে চিকিৎসা করিতে আহূত হই নাই।

যাহার চিকিৎসার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম, সে একটি বালিকা। তাহার অসুখ—বিষণ্ণতা ও তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য। তাহার ম্লানমুখে বিষাদের ব্যাপ্তি দেখিলে দুঃখ হয়—সে বয়সে তাহা একান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আমি বালিকার ব্যাধির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সে যখন শিশু, তখন তাহার পিতা সংসার ত্যাগ করেন; তদবধি বালিকা খেলা ত্যাগ করিয়াছে—তাহার শিশুসুলভ চপলতা অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিষণ্ণভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে বয়সে সাধারণতঃ বঙ্গদেশে মেয়ের বিবাহ হয়, তাহার সে বয়স হইয়াছে; কিন্তু তাহার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার পিতার জ্যেষ্ঠতাত তাহার বিবাহ দিতে সাহস করিতেছেন না। মেয়েটি তাঁহার বড় আদরের—যদি শ্বশুরালয়ে তাহার এই ভাবের জন্য তাহার লাঞ্ছনা হয়। গৃহস্বামী বালিকার মেসো মহাশয় তাহাকে দিল্লীতে আনিয়াছেন—যদি নূতন স্থানে আসিয়া তাহার ভাবান্তর হয়।

আমার কেতাবী বিদ্যার বাহিরে—চিকিৎসকের অভিজ্ঞতায় আমি কখনও এরূপ রোগের সহিত পরিচিত হই নাই। তাহার কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় লোকের কাজের একান্ত অভাব হয় না—মানুষ নিঃসম্বলও হয় না। আমি সে কথা গোপন না করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলাম; সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "আমার মনে হয়, বিবাহের পর প্রেমের ভেষজে—অপত্যস্নেহের ঔষধে এ ব্যাধি দূর হইতে পারে।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু সাধারণতঃ যে অবস্থায় বাঙ্গালীর ঘরে নববধূকে কয় বৎসর কাটাইতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাত ইহার বিবাহ দিতে ভয় পাইতেছেন।"

বিন্দুমাধব!—আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কি মুরলা?"

গৃহস্বামী যেন চমকিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ! আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?"

"বিন্দুমাধব আমার সহপাঠী—বন্ধু। দুই বৎসর পূর্ব্বেও সে আমাকে দেখা দিয়া গিয়াছে।"

গৃহকর্ত্তা কোনও কথা না বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন– গৃহিণীকে সংবাদ দিতে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশদ্বারটি ভেজাইয়া দিলেন। বুঝিলাম, এক জন স্ত্রীলোক দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনি কোথায় বিন্দুমাধবের সন্ধান পাইয়াছিলেন ?"

আমি বলিলাম, "এই দিল্লীতে।"

"সে কি ?"

কি সূত্রে—কিরূপে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ, সে কথা বলিব কি না, ভাবিতে লাগিলাম। গৃহকর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি সংবাদ দিলে একটি পরিবারকে অনন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান বলিয়া দিউন।"

আমি বলিলাম, "এখন আর তাহার সন্ধান জানি না—সে আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।"

"কোথায় গিয়াছে ?"

"তাহা জানি না। সে নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে কয় দিন তাহার বাল্যবন্ধুর গৃহে থাকিয়া গিয়াছে। আর কিছুই জানি না।"

এবার দ্বারান্তরাল হইতে মহিলার মৃদু অথচ কৌতূহলকম্পিত কণ্ঠ শ্রুত হইল, "কেমন করিয়া আমরা তাহার সন্ধান পাইব ?"

আমি বলিলাম, "সন্ধানের কোনও উপায় জানিলে আমি কখনও তাহার সন্ধান লইতে বিরত থাকিতাম না।"

তাহার পর গৃহকর্ত্তাকে আমি বলিলাম, "আজ আমার সময় নাই—পরে আপনাকে তাহার সহিত আমার সাক্ষাতের কথা বলিব। আপনি একবার মুরলাকে ডাকিয়া আনুন।"

মুরলা আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "মা, আমি তোমার বাবার বাল্যবন্ধু—তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বেও একবার আমাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন। তোমাকে আমার বাড়ী যাইতে হইবে।"

বালিকার নয়ন যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কোথায় ?"

"তাহা জানি না।"

বালিকার পাণ্ডুমুখে নিবিড়তর পাণ্ডুতা পরিব্যাপ্ত হইল—তাহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। সে আর কোনও কথা বলিল না।

আমি উঠিলে গৃহকর্ত্তা আমাকে "ফি" দিতে আসিলেন। বড় রাগ হইল ; বলিলাম, "বিন্দুমাধবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা শুনিয়াও আপনি আমাকে 'ফি' দিতে চাহিতেছেন ?"

লোকটি বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "তাহাতে কি ?—ব্যবসা ."

"ব্যবসা করিলে কি মনুষ্যত্ব রাখিতে নাই ?"

"কিন্তু ব্যবসা অমন ব্যবস্থায় চলে কি ?"

"মানুষ হইলে তাহার চলে। কিন্তু যাহারা কয়লার ব্যবসা করিয়া মনের বর্ণটাও সেইরূপ ময়লা করিয়াছে, তাহাদের চলে না।"

তিনি তবুও টাকা লইয়া হাত বাড়াইতেছেন দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলাম,—বলিলাম, "মহাশয়, মুখের উপর বলিতেছি—কিছু মনে করিবেন না ; আপনি একদম উজবেক। এমন কাজ কিন্তু আর কখনও করিবেন না।"

বাড়ীতে আসিয়াই গৃহিণীকে সব কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি মুরলাকে আনিলে না কেন ?"

আমি বলিলাম, "আনিব বলিয়া আসিয়াছি। এখন তাহারা পাঠাইলে হয়।"

"হঁ। তুমি যেরূপ মিষ্ট কথা বলিয়া আসিয়াছ, তাহাতে সন্দেহ হয় বটে। আচ্ছা—আমিই যাইব।"

"সে কি ? তাহারা যদি ভাল ব্যবহার না করে ?"

"না করে—না-ই করিবে। আমার গায় ত ফোস্কা পড়িবে না। আর তাহারাও ত মানুষ বটে। কেন কুব্যবহার করিবে ?"

৫

মধ্যাহ্নের পরই গৃহিণী যখন গাড়ী আনিতে হুকুম দিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ?"

তিনি বলিলেন, "মুরলাকে আনিতে যাইতেছি।"

তিনি তথায় যাইয়া কি উপায়ে বাড়ীর কর্ত্তার কর্ত্তার অর্থাৎ গৃহিণীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন, তাহা জানি না। তবে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুরলাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। আর তিনি বলিলেন, বিন্দুমাধবের আবির্ভাবের ও অন্তর্ধানের সব কথাই তিনি তাঁহাদের বলিয়া আসিয়াছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "পেটে কথা ত থাকিবার উপায় নাই।"

"মনের কথা মনেই আটক রাখিয়াই ত তোমরা যত গোল কর। প্রমাণ—

তোমার বন্ধুটির দুর্দশা। তোমাদের মত আমরাও যদি মনের কথা মনেই রাখি, তবে সংসারে বাস করাই দুষ্কর হইবে।"

"তবে যত পার কথা কও।"

"কথা কহিতে তোমরাও কম নহ। তবে তোমাদের কথা হয় বাজে কথা—নহে ত বাঁকা কথা।"

আমি হারি মানিলাম।

সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে মুরলা আমাদের বাড়ী আসিত—সন্ধ্যার পর গৃহিণী তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাসীর কাছে রাখিয়া আসিতেন।

মাসী মুরলাকে যতই আদর যত্ন করুন না, সে তাঁহার কাছে একটু কুণ্ঠিত ভাবেই বাস করিত, এবং কলিকাতা হইতে তাহার "বড় দাদা" (বিন্দুমাধবের জ্যেঠতাত) সে কবে ফিরিবে জানিতে চাহিলেই লিখিত—"আমাকে লইয়া যাউন।"

আমার স্ত্রী এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি মাসীমার অপেক্ষা দাদাকে ভালবাস। মাসীমা ত তোমাকে খুব স্নেহ করেন।"

মুরলা সরলতার অবতার। সে কোনও ভাব গোপন করিত না—বলিল, "মাসীমা খুব স্নেহ করেন; কিন্তু তবুও আমি বড়দাদাকে যত ভালবাসি, তাঁহাকে তত ভালবাসিতে পারি না।"

"কেন বল দেখি?"

"বোধ হয় মাসীমা আমার মার ভগিনী, আর বড়দাদা আমার বাবার জ্যেঠা বলিয়া।"

বাস্তবিক মুরলার পিতৃভক্তি দেখিয়া আমার কেবল বিন্দুমাধবের পিতৃভক্তি মনে পড়িত—সে বিষয়ে পুত্রী পিতার মনোভাবের উত্তরাধিকারিণী। আমার বসিবার ঘরে বিন্দুমাধবের যে প্রতিকৃতি ছিল, আমি সেখানি দেখাইয়া মুরলাকে বলিয়াছিলাম, "ঐ তোমার বাবার ছবি।" শুনিয়াই মুরলা উঠিয়া সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে মস্তক নত করিয়াছিল—বাহ্যজ্ঞানহতবৎ বহুক্ষণ সেই অবস্থায় ছিল। যখন সে মুখ তুলিয়াছিল, তখন তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে। আমার স্ত্রী তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলে—তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া যেন বুকভাঙ্গা বেদনায় মুরলা বহুক্ষণ কাঁদিয়া যেন কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

এক দিন মুরলা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, আপনার কি মনে হয়? বাবা কি আবার আপনাদের কাছে আসিবেন?"

আমি বলিলাম, "হয় ত আসিবেন। আসিলে আমি তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি আসিবে?"

মুরলা এ প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিল—সে আসিতে নাও পারে, এমন সন্দেহ কি কেহ করিতে পারে? সে বলিল, "আসিব না?"

"আসিবে বই কি। কিন্তু মা, তত দিনে তোমার বিবাহ হইবে। তোমার শ্বশুরবাড়ীর সকলের মত লইয়া তখন তোমাকে আসিতে হইবে।"

মুরলার মুখে বেদনার ও শঙ্কার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কাকা, বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদের কাছে আমি ত বাস করিতে পারিব না!"

আমি তাহাকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য বলিলাম, "সে কি, মা—তাঁহারাই উদ্যোগ করিয়া তোমাকে তোমার বাবার কাছে আনিবেন।"

কয় দিনের মধ্যেই মুরলা আমাদের একান্ত আপনার হইয়া গেল। আমার পত্নীর আন্তরিক স্নেহে সেও তাহার স্বাভাবিক সঙ্কোচ পরিহার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আপনার মনের কথা বলিত। সে সরলভাবে সব কথা ব্যক্ত করিত। তাহাতে আমরা বুঝিতাম, বিন্দুমাধব যেমন তাহার পিতাকে দেবতার আসনে উন্নীত করিয়াছিল, সেও তেমনই তাহার পিতাকে দেবতা মনে করিত। ইহার মধ্যে উত্তরাধিকার কতটুকু ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে তাহার পিতার কথা বলিতে ভালবাসিত—পিতার একখানি প্রতিকৃতি আমার কাছে চাহিয়া লইয়াছিল—আমি তাহার পিতার বন্ধু বলিয়া আমাকে ভালবাসিত—আমার স্ত্রী তাহার পিতার জন্য দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন বলিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। মার প্রতি তাহার আকর্ষণ ছিল না।

৬

কিন্তু মুরলা অধিক দিন দিল্লীতে থাকিল না। সে যে তাহার বড়দাদাকে লিখিয়াছিল—"আমাকে লইয়া যাউন"—সেই কথাতেই তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন, বিন্দুমাধব দিল্লীতে আসিয়াছিল, তখন—যদি কোনরূপে তাহার সন্ধান করিতে পারেন, সেই আশায়—তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিয়াই আমার বাড়ীতে আসিলেন এবং আমি যে বিন্দুমাধবকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছি, সেই জন্য ধন্যবাদের প্লাবনে আমাকে ডুবাইয়া

দিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কখন শোধ করা সম্ভব নহে।"

উত্তরে আমি বলিলাম, "বিন্দুমাধব যে ভাবে আমার কাছে আসিয়াছিল, প্রতিদিন বহু লোক সেই ভাবে আইসে। তাহাদের চিকিৎসা করাই আমার কাজ—সেই জন্যই আমি বেতন পাই। তবে সে আমার বাল্যবন্ধু, সেই জন্য শেষে আমি তাহাকে কাছে রাখিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য—তাই তাহাকে রাখিতে পারি নাই—সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু—ভ্রাতৃবৎ—আপনি আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি বড় লজ্জা পাই।"

তিনি বলিলেন, "কি জান, বাবা, আজ কালকার ছেলে তোমরা—বিশেষ তুমি বিলাতফেরৎ—আমার সঙ্গে পরিচয় নাই—তাই তোমাকে 'আপনি' বলিয়াছি। কিছু মনে করিও না।"

তাঁহার স্নেহ দেখিয়া মনে হইল—বোধ হয়, বিন্দুমাধবও এমনই স্নেহশীল—এ স্নেহ সে দিতে চাহিয়াও দিতে পারে নাই। আর তাহার পত্নী—সে হেলায় কি রত্নই হারাইয়াছে!

বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাত আমার কাছে সব কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "আমার সঙ্গে তাহার আর দেখা হইবে না। যখন মনে করি, সে কত কষ্টই পাইতেছে—তখন বুকের মধ্যে যেন জ্বলিতে থাকে। তখন মনে হয়, তাহার পিতা যে পূর্ব্বেই লোকান্তরে গিয়াছে—সে তাহার সৌভাগ্য-পরিচয়। আমি বড়—আমাকে রাখিয়া সে চলিয়া গেল—সব ব্যথা আমার জন্যই রাখিয়া গেল।"

ইহার পর তিনি আর অধিক দিন দিল্লীতে রহিলেন না। সুরলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিলাম, ভাল ঘর দেখিয়া তিনি সুরলার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করেন। গৃহে যে পরিবেশমধ্যে তাহার বিমর্ষতা উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে পরিবেশ পরিত্যাগ করিলে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহার ব্যাধি দূর হইবার সম্ভাবনা; তাহার পর নূতন সংসারে—পতির প্রেমে ও সন্তানের প্রতি স্নেহে সে সুস্থ হইতে পারে।

তাহার পর বিদায়ের দিন আসিল। সুরলা যাইবার দিন আমার আমার স্ত্রীকে বলিল, "কাকীমা, যদি কখনও বাবার সন্ধান করিতে পারেন, আমাকে জানাইবেন।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "মা, সে কথা তোমায় আর বলিতে হইবে না।"

আমার গৃহ হইতে যাইবার সময় মুরলা আবার তাহার পিতার প্রতিকৃতি-খানিকে প্রণাম করিল; তাহার পর আমাদের কাছে বিদায় লইল।

সে কয় দিনের জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু কয় দিনেই সে আমাদের এত আপনার হইয়াছিল যে, তাহার বিদায়ে আমরা একান্তই আপনার জনের বিদায়বেদনা অনুভব করিলাম। আমার স্ত্রীর মুখভাবে আমি তাঁহার মনের ব্যথা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কোনও কথা বলিলাম না—পাছে সহানুভূতির সঞ্চারে বেদনা অশ্রুর উৎস মুক্ত করে। মৃতসন্তান প্রসূতির স্তন্য বাহির হইতে না পাইয়া যেমন মাতৃস্তনে বেদনা উৎপন্ন করে, বুঝি বন্ধ্যা নারীর স্নেহও তেমনই বাহির হইতে না পারিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

সন্ধ্যার পর ট্রেণ। আমি ষ্টেশনে যাইব শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন—"আমিও যাইব।"

ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় পথে গাড়ীতে তিনি পুনঃ পুনঃ রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

মুরলাকে লইয়া তাহার মাসী পারিজাতের সঙ্গে আমার স্ত্রীর বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার বান্ধবীর নিকট হইতে বিন্দুমাধবের পারিবারিক অনেক কথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

'বৈরাজ্য' বা 'প্রজাতন্ত্র'।

Le Sage বলিয়াছেন—"Truth is a stubborn thing." এমন এক সময় ছিল, যখন সংস্কৃত ভাষার বর্ণজ্ঞানবিহীন স্কচ্ দার্শনিক ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট (Dugald Stewart) বিশেষ গবেষণার সহিত একটী পুস্তকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, গ্রীকবীর আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পরে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রস্তুত! ডব্লিনের আর এক জন বিচক্ষণ আচার্য্য অতিশয় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত মতটীর সমর্থন করেন! (Macdonell—Hist. Sans. Lit. p. 2.)। অন্য দিকে ঐতিহাসিকম্মন্য Keigtley কষ্টস্বীকার করিয়া তাঁহার 'ভারতের ইতিহাস' লিখিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, এবং তাহাতে মত প্রকাশ করিয়াছেন

যে, আলেকজান্দারের পূর্ব্বে ভারতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রই প্রচলিত ছিল, তদ্ভিন্ন শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না (Thom. Keightley Hist. of Ind., 1847. p. 5.)। ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত রীতির প্রবর্ত্তনের সহিত এইরূপ দায়িত্ববোধশূন্য এবং মতগুলি নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইউরোপীয় মনীষিগণ—অন্ততঃ যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে ভারতের পুরাতত্ত্বে প্রামাণিকরূপে পরিগৃহীত—তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, প্রজাতন্ত্র প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক আলোচনায় মনস্বী F. Guizot এর উপদেশবাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—'একটী দেশের সহিত দেশান্তরের প্রত্যেক অংশে সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্য সম্ভবপর নহে; সুতরাং তুলনামূলক সমালোচনায় বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক' (Embassy to the court of St. James in 1840)। আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত, কিন্তু ইহাদের রাষ্ট্রগঠন কতক অংশে পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং ভারতের প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের অপর একটী আধুনিক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সহিত সর্ব্বাংশে তুলনা করা সমীচীন হইবে না। এরূপ স্থলে আমাদের দেখা উচিত যে, বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মূল ও ভিত্তি,—সমুদয় প্রজাপুঞ্জ অথবা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাজ্যশাসনের অধিকার আছে কি না। কারণ, ইহাই প্রজাতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত প্রমাণ।

আরিয়ানের আনাবেসিস্ (Arrians Anabasis) গ্রন্থে দেখিতে পাই, যখন আলেকজান্দার দিগ্বিজয়-সূত্রে নীসা (Nysa) নগরীতে উপস্থিত হইলেন, তখন নীসার নাগরিকগণ আকুফিস (Acuphis) ও ৩০ জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে নিজেদের প্রতিনিধিস্বরূপ আলেকজান্দারের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের নগরটীকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন—"ডাওনিসাসের সময় হইতে আমাদের নগরী স্বাধীন, আমরা কাহারও বশ্যতা স্বীকার করি নাই, এবং আমাদের রাজকার্য্য স্বায়ত্বশাসিত।" আলেকজান্দার তাঁহাদের ও নগরীর স্বাধীনতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং তাঁহাদের রাজকার্য্য, শাসননীতি প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রমূলক কুলীনসম্প্রদায়ের (aristocratic republic) হস্তে নিবদ্ধ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন (E. J. Chinnock, Anabasis p. 244-247)। আনাবেসিসে মল্লীগণ স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (ibid. p. 301)। মেগাস্থিনিসের মতে,-'যদিও কয়েকটী রাজ্যে রাজতন্ত্র একেবারে লোপ পায় নাই, আলেকজান্দারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে অধিকাংশ নগরই প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিল' (Ancient Ind. Megasthenes and Arrian, McCrindle p. 39)। ইণ্ডিকা (Indica) আরও দেখাইয়াছে যে, 'ডাইওনিসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং সংখ্যায় তাঁহারা ১৫৩ জন ছিলেন; তবে এই সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (সম. সাম. ভারত, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ, সমাদ্দার)। কিন্তু অধ্যাপক রীস্ ডেভিড্স্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় যে সকল কুলীন-সম্প্রদায় শাসিত প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাদের বিষয় এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ও সাহিত্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির সহিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সকল প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। (Buddhist Ind. Chap. I.)। এই প্রজাতন্ত্রগুলির সম্যক্‌ আলোচনার অভাব দেখিয়া সহৃদয় Rhys Davids মহোদয় তাহাদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক বিদ্বেষই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, এবংবিধ আলোচনায় যে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির মূলে 'সমিতি'। বৈদিক যুগের আর্য্যসমাজ কতকগুলি 'জন' বা জাতিতে বিভক্ত ছিল। এই সকল জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক সকল 'বিশঃ' নামে পরিচিত, এবং এই নাম হইতেই "বৈশ্য" শব্দটীর উদ্ভব হইয়াছে। 'বৈশ্য' শব্দের অর্থ 'বিশঃ' বা সাধারণ লোকের এক জন। এই সমস্ত বিশঃ একটী স্থানে একত্রিত হইয়া (সম্—ই+ক্তি) রাজ্য ও প্রজাসংক্রান্ত সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, এবং তাঁহারাই 'সমিতি' নামে পরিচিত হইতেন। এই 'সমিতি'তে সমস্ত 'বিশঃ'ই উপস্থিত থাকিতেন ; অন্ততঃ উপস্থিত বলিয়া অনুমিত হইতেন, সুতরাং 'বহু কর্ত্তৃক অল্পসংখ্যকের মনোনয়ন' এবং 'একের দ্বারা অনেকের মত-জ্ঞাপনের প্রথা' (principle of representation) তখনও প্রচলিত হয় নাই।

কিন্তু এরূপ একটী জনবহুল বৃহৎ সমিতিতে রাজ্যশাসনকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া সুকঠিন ; সুতরাং 'সমিতি' হইতে ক্ষুদ্রতর 'সভা'র উদ্ভব হইল। অথর্ব্ববেদে 'সমিতি' ও 'সভা' দুই ভগিনী-রূপে বর্ণিত হইয়াছে (অথর্ব্ব বে. ৭ম. ১২)। সমস্ত 'বিশঃ' 'সমিতি'তে সাধারণভাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন, 'বিশঃ' বা 'অভিজন' কর্ত্তৃক মনোনীত স্বল্পসংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ 'সভা'তে সেই সকল বিষয়ের বিশদ পরামর্শ ও রাজ্য-সংক্রান্ত অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই 'সমিতি' ও 'সভা'য় উপস্থিত সভ্যবর্গ বাগ্মিখ্যাতি লাভের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 'আমার প্রতিপক্ষ যেন তর্কে জয়ী হইতে না পারেন। আমার বিপক্ষের তর্কশক্তি পরাভূত করুন।' 'আমার বক্তৃতায় যেন সকলে প্রীত হন, আমার বক্তব্যে সম্মতিদান করেন।' ইত্যাদি (অথর্ব্ব. বে. ২য়, ২৭)। সুতরাং 'সমিতি'র সার্থকতা 'সভা'য় সম্পন্ন হইল ; জনতা হইতে একের, বহু হইতে অল্পের প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা বলবতী হইল। এই ব্যবস্থাই প্রজাতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এই প্রতিনিধি-প্রথা সমিতিযুগে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, বলা যায় না ; কারণ, 'গ্রামণি' বা গ্রামনেতা নানা ব্যাপারে তাঁহার গ্রামের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তবে সমিতি-যুগের অঙ্কুর সভায় সম্যক্‌ বিকাশ লাভ করিল।

কুরু, অনু, যদু প্রভৃতি এই 'জনাঃ'র দৃষ্টান্তস্থল। ইহারাই সমবেত ভাবে 'পঞ্চজনাঃ' নামে অভিহিত। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, আপনাদিগকে একই আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'পাঁচ জনে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' এই 'পাঁচ জন' 'পঞ্চ-জনে'র স্মৃতি বহন করিতেছে।

'পাঁচ জনে'র আধুনিক অর্থ 'সকলে একত্রিত হইয়া'। পুরাকালে 'পঞ্চ-জন' আর্য্য-অধ্যুষিত ভারতের 'একত্র সম্মিলিত সকলে'র প্রতি প্রযুক্ত হইত (শতপথ ব্রা. ১৩।৫।৪।১৪)। প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের আদিম আভাস ও নিদর্শন আমাদের আধুনিক গ্রাম্য 'পঞ্চায়ত'। হিন্দু জাতির উৎপত্তির সহিত পঞ্চায়তের উদ্ভব, ভারতে বেদের ন্যায় ইহা আবহমান কাল প্রচলিত; প্রজাতন্ত্রমূলক পঞ্চায়ত হিন্দুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক জীবনের প্রতি স্তর, প্রতি অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

'সমিতি' ও 'সভা' স্বায়ত্তশাসনে প্রতিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যহেতু বিভিন্ন প্রকারের স্বায়ত্তশাসন পরিদৃষ্ট হয়। ইতিবৃত্তবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়স্বওয়াল্ (Modern Review) এবং পুরাতত্ত্বপারদর্শী অধ্যাপক ভাণ্ডারকর (Carmichael Lec. IV) এইরূপ অনেকগুলির নাম করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের 'চরণ' ও 'পরিষৎ'; ধর্ম্মাধিকরণসম্পর্কীয় 'সভা' ও 'মন্ত্রিপরিষৎ'; অর্থনীতির 'সম্ভূয়সমুত্থান' ও 'পূগশ্রেণী'; ধর্ম্মবিষয়ে 'সংঘ' (ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন)। গ্রামশাসনে বৈদিক যুগের 'গ্রামণি' হইতে বর্ত্তমান গ্রাম 'পঞ্চায়তে'র, এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, সভাপতি ও সভার অধীনে সংবদ্ধ নগর সমূহ হইতে 'শ্রেষ্ঠী'র উদ্ভব (উত্তর-ভারতের 'নগরশেঠ' ও 'জগৎশেঠ' উপমাস্থল) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই পঞ্চায়ত হইতে কালক্রমে সমৃদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের প্রজাতন্ত্রগুলি আলেকজান্দারকে পদে পদে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মহাভারত ও স্মৃতির অরট্ট আলেকজান্দারের অভিযানের সময়ে পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু কানিংহামের মতে, তাহারাই চন্দ্রগুপ্তের অধীনে পরে গ্রীকগণকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত জয়সওয়াল অরট্টদিগকে পঞ্জাবের আরোড়ে জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ 'ক্ষত্রিয়' নামে যে প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহারা অর্থশাস্ত্রের 'ক্ষত্রিয়'। কিন্তু শ্রীযুক্ত জয়সওয়াল 'ক্ষত্রি', পঞ্জাবের 'ক্ষত্রি' ও সিন্ধুদেশীয় Xathroi অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। মহাভারতে ক্ষুদ্রক ও মালবদের প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গুজরাটের যাদবদিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্র বহু কাল হইতে প্রচলিত ছিল। ইহা 'স্বরাজ্য' বা 'স্বরাট্' নামে অভিহিত হইত। এই 'স্বরাট্' শব্দ হইতেই 'সুরাট' ও 'সুরাষ্ট্র' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারতে কৃষ্ণ যাদব প্রজাতন্ত্রের এক জন অধিনায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কৃষ্ণকে সম্রাট্ ও রাজগণের সভায় উপস্থিত দেখিয়া শিশুপাল যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের 'রাজা' উপাধির অভাব অন্যতম। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ একটী স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, এবং তদানীন্তন রাজগণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। সুরাটের দক্ষিণে ভোজ আর একটী প্রজাতন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সুরাট্ ও ভোজের উল্লেখ আছে। '* * * স্বারাজ্যায়ৈব তে অভিষিচ্যন্তে স্বরালিত্যেনানভিষিক্তান্ চক্ষত * * *'। '* * * রাজা নো ভোজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে ভোজেত্যেনানভিষিক্তান্ চক্ষত * * *'।

ঐত. ব্রা. ৭।৩।১৪। উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্রের শাসনরীতি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বৈরাজ্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। '* * * জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায়ৈব তেঽভি-ষিচ্যন্তে বিরাডিত্যেনানভিষিক্তানা চক্ষত (ঐত. ব্রা. ৭।৩।১৪।)। এই 'রাজবিহীন' রাষ্ট্র বা 'বৈরাজ্য' ও 'স্বরাজ্যে'র প্রজাতন্ত্র-প্রকৃতি স্ফুটতর করিবার জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহাদের সহিত মধ্যদেশ, বিশেষতঃ প্রাচীর (মগধ) সাম্রাজ্যের তুলনা করা হইয়াছে। Rhys Davids তাঁহার Buddhist India পুস্তকে (Chap. I. II) বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এ স্থলে তাহাদের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রজাতন্ত্র-সম্পর্কীয় অনেক ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে। বারান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

এ স্থলে এই প্রজাতন্ত্রগুলির পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রাজনীতিক ব্যবস্থাপকেরা প্রজাতন্ত্রগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন-রীতির প্রতিকূল না হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। আলেকজান্দারের অভিযানের সময় ইঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও সৎসাহসের সহিত স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা স্বাধীন জাতির উচিত ও তাহাদিগেরই পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। একটীর পর একটী আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মগধের প্রধান সচিব বস্সকর এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রজা-তন্ত্রগুলির আত্মরক্ষার অসামর্থ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে চাণক্য আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য প্রথম হইতে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রগুলিকে প্রথমতঃ পদদলিত করিয়া তাহাদের সমষ্টিতে একটী প্রবল বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবেন। ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিয়া, তিনি ভেদ, প্রলোভন, প্রতাপ প্রভৃতি যে সকল অপূর্ব্ব কূটনীতির কুটিল জালে আবদ্ধ করিয়া, নির্ভীক নিষ্ঠুরভাবে এই সকল প্রজাতন্ত্রের সংহার ও মাগধ সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করেন, প্রতীচ্য জগতের 'মেকিয়াভেলী' পরবর্ত্তী যুগের সাম্রাজ্য প্রয়াসীর উপকারার্থ তাঁহার সার্থকনাম কৌটিল্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে, জার্ম্মাণী হইতে উক্ত পুস্তকের সুন্দর সংস্করণ বাহির হইয়াছে (A. Hillebrandt. ; Prof. Dr. Jolly)।

এইরূপে ক্রমে হিন্দু সাম্রাজ্যগুলি লোপ পাইয়াছে। বিক্রম-সংবতের ৩০০ বৎসর পরেও সিন্ধু ও পঞ্জাবে দুই একটি বর্ত্তমান ছিল, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার মালবেরা প্রজাতন্ত্র-শাসনের অধীনে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক-আক্রমণ প্রতিহত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শেষে প্রজাতন্ত্রগুলি হিন্দুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক সমন্বয়-প্রয়াস ও সাম্রাজ্য-কল্পনার গর্ভে অদৃশ্য হইল।

* গ্রীক ইতিহাস পাঠ করিলে গ্রীক প্রজাতন্ত্র ও হিন্দু প্রজাতন্ত্রের মধ্যে এক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়ের একই সময়ে তিরোভাব ঘটে, তবে ধ্বংসের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের সহিত নিজেদের রাষ্ট্র ও সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তন

ও সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিতে না পারায়, গ্রীক প্রজাতন্ত্র বহিঃশত্রু মাসীদোনীয় ও রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল (Grote's History of Greece) কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্র অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। গ্রীস প্রজাতন্ত্রের নাশে সমগ্র দেশ বিজেতার পদদলিত হইল; কিন্তু হিন্দু প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস ও সাম্রাজ্যের উদ্ভবে বিজেতৃগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইল।

সাম্রাজ্য-প্রচেষ্টার অপরিহার্য্য ফল ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের কল্যাণে পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর প্রজাতন্ত্রের মূল স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোত বহিতেছে। ভারতেও ইহার সূচনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে একটী তথ্য ঐতিহাসিকের সম্মুখে উপস্থিত করা অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশে 'সমিতি'র আভাস, 'সভা'র অঙ্কুর, গ্রাম্য 'পঞ্চায়েত'র ফলস্বরূপ স্বায়ত্তশাসন আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। (cf. Public Administration of India—Dr. P. N. Banerjee, Chap. I) বহু বিজিগীষু জাতি বহুবার ভারত-বিজয় করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ প্রজার অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাজ্যশাসন-রীতির মূল ব্যবস্থাগুলি মগধ সাম্রাজ্য, মৌর্য্যসাম্রাজ্য, মুসলমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সকলের ভিতর বরাবর সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় বা পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপর এই ব্যবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক র‍্যাপসন যথার্থই বলিয়াছেন—'Local Government thus forms the very basis of all political systems in India (Ancient India E. J. Rapson, p. 96). Rapsonএর আর একটী কথা—'কতকগুলি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও সেই রাজ্যগুলির একত্র সমন্বয় দ্বারা সাম্রাজ্য গঠিত হইত। স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্যসম্প্রদায় বা পঞ্চায়েতগুলি নিজে-দের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ক্ষুদ্র রাজ্যের ও বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত। সুতরাং সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। তাহাদের ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র পূর্ব্ববৎ চলিত। (ibid. p. 111) এই মতটী শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গত মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উদ্ধৃত করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন!

পরিশেষে ইউরোপীয় স্বায়ত্তশাসন ও আমাদের দেশের পুরাগত স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাশ্চাত্য দেশে একত্রিত কেন্দ্রীভূত শাসন-ক্ষমতা (centralised power) ক্রমে বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে ও বিষয়ে ক্ষীণ করিয়া দিতে দিতে (process of decentralisation) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন লাভ হয়। আমাদের দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রবিষয়ক রীতিনীতি পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদর্শে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং এই আদর্শেই ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভবপর।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মক্কা-ভ্রমণ।

১

১৩১৪ সালে আমি মুসলমান জাতির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কা ও মদিনায় গিয়াছিলাম। আমার এই 'হজ্বনামা'য় তাহারই বৃত্তান্ত লিখিতেছি। যদিও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ আমার এই 'হজ্বনামা'র সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না; তথাপি ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম]।

যদি বঙ্গভাষায় লিখিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীরা মক্কা ও মদিনার কথা এবং মক্কা-মদিনা যাইবার পথের বিবরণ সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এই 'হজ্ব-নামা' ফার্সী ভাষায় লিখিত হইল; সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী-সমাজে ইহার আদর হইবার সম্ভাবনা অল্প। তবে ভরসা এই যে, যদি কখনও কেহ আমার এই 'হজ্বনামা' বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করেন, তাহা হইলে আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।

বঙ্গভাষায় 'হজ্বনামা' লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যাঁহাদের আগ্রহে ইহা লিখিত হইল, তাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু ও ফার্সী। পরন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আমার দখল নাই। বঙ্গদেশে 'মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষা'র আদর আছে বটে; কিন্তু ঐ ভাষার 'আদর-কদর' যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, "হজ্বনামা" আপাততঃ ফার্সী ভাষায় লিখিত হউক।

প্রায় এক বৎসর কাল আমি মক্কা-মদিনায় ছিলাম। তত্রত্য মুসলমান সমাজের সকল স্তরেই মিলিয়া মিশিয়া, ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছি; বুঝিয়াছি; এবং শিখিয়াছি। তাহা হইতে ভারতীয় মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের যাহা জ্ঞাতব্য, তাহাই কেবল এই 'হজ্বনামা'য় লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে এ দেশের লোকের কোনও উপকার হইবে কি না, তাহার বিচারের ভার পাঠকপাঠিকাদিগকে অর্পণ করিলাম।

মক্কা-মদিনার ভ্রমণকাহিনী লিখিবার পূর্ব্বে, 'হজ্ব' সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। ঈশ্বরের বাণী কোরাণ, এবং শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার বাণী হাদিস, চারিটী ধর্ম্মকার্য্যকে 'ফর্জ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-কার্য্য (অর্থাৎ compulsory) বলিয়া ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। প্রথম, নমাজ; দ্বিতীয়, রোজা; তৃতীয়, হজ্ব; এবং চতুর্থ জাকাৎ।

---

* বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম পীর (গুরু) চব্বিশ-পরগণা নিবাসী শাহ সুফী মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিকী সাহেবের ফার্সী ভাষায় লিখিত "হজ্বনামা" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী—নমাজ ও রোজা, সকল মুসলমানেরই পালনীয়। শেষ দুইটী—হজ্জ ও জাকাৎ, ধনবান মুসলমানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানমাত্রই—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে, নিয়মিতভাবে নমাজ পড়িতে ও রোজা করিতে বাধ্য। যাঁহারা ধনবান মুসলমান, তাঁহাদের পক্ষে নমাজ ও রোজা সম্বন্ধীয় আদেশ ত অবশ্য-পালনীয় বটেই; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে জাকাৎ ও হজ্জের আদেশও পালন করিতে হয়।

যে সকল মোস্‌লেম উপদেষ্টা, মোসলমানদিগকে ধন-দৌলতের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ দান করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, মুসলমানদিগের পক্ষে যদি ধন-দৌলত অনাবশ্যক বিবেচিত হইত, তাহা হইলে হজ্জ ও জাকাৎ তাঁহাদের 'ফর্জ' হইত না। কারণ, গরীব হওয়াই যদি মুসলমানদিগের সম্মানের বিষয় হইত, তাহা হইলে, মুসলমানদিগের জন্য চারিটী ফরজ নির্দ্দিষ্ট হইত না, নিশ্চয়ই দুইটী ফরজের ব্যবস্থা হইত।

মুসলমানদিগের নমাজ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথম, ওক্তিয়া নমাজ। প্রত্যহ পাঁচবার এই নমাজ পাঠ করিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একবার; মধ্যাহ্ন-তপন যখন পশ্চিমাকাশে চলিয়া পড়ে, তখন একবার; অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে একবার; সূর্য্যাস্তের সময় একবার; এবং রাত্রিকালে একবার। এই নমাজ মসজিদে উপস্থিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে পড়াই উত্তম। নিজ নিজ বাড়ীতে পড়িলেও দোষ হয় না।

দ্বিতীয়, সাপ্তাহিক নমাজ; অর্থাৎ জুমার নমাজ।—প্রত্যেক শুক্রবারে এই নমাজ পাঠ করিতে হয়। পাড়ার, গ্রামের ও মহাল্লার প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানই স্থানীয় জামে মসজিদে সমবেত হইয়া, দ্বিপ্রহরের সময়, এই নমাজ পড়িতে বাধ্য। এই নমাজের প্রারম্ভে খোৎবা-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয়, দুই ঈদের নমাজ। এই নমাজ ফর্জ নহে; ওয়াজেব। প্রায় ফরজের তুল্য। এক মাস রমজানের রোজার পরবর্ত্তী দিন প্রথম ঈদ। ইহাকে ঈদ-উল-ফিতর বলে। দ্বিতীয়, ঈদ্ বকর-ঈদ। সাধারণতঃ লোকে ইহাকেই অজ্ঞতাবশতঃ বকরি-ঈদ্ বা বক্‌রীদ বলিয়া থাকে। ইহার আর একটী নাম, ঈদ-উল-আজ্‌হা। এই ঈদল-আজ্‌হার দিন, মক্কায় হজ্জ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার নমাজ আছে; তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চান্দ্র মাসের হিসাবে মুসলমানদিগের বৎসর গণিত হয়, এবং দ্বাদশ মাসে

মুসলমানদিগের বৎসর ধরা হয়। দ্বাদশ মাসের নাম যথা মোহাররম, সফর, রবিউল্-আউওল্, রবিউল্-আখের, জমদিউল্-আউওল, জমদিউল্-আখের, রজব, শাবান, রমজান, শউয়াল, জিল্কদ্ ও জিলহিজ্জা। ত্রিশ দিনের অধিক, এবং ২৯ দিনের কম কোনও মাসই হয় না। মোট ৩৬০ দিনে বৎসরের গণনা হয়। ইহার মধ্যে ১০০ দিন রোজা করিতে হয়। তন্মধ্যে রমজান মাসের ৩০ দিন (কখনও কখনও ২৯ দিনও হইয়া থাকে), এক মাস ফর্জ রোজা, এবং অবশিষ্ট ৭০ দিনের রোজা নফল। ধর্ম্মশাস্ত্রে, প্রত্যেক মাসে ছয়টীর হিসাবে, এবং মোহাররম মাসে দশটী নফল রোজা করিতে হয়।

'জাকাৎ' সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যবস্থা এইরূপ যে, যাহারা ধনবান, তাহাদের সঞ্চিত ধনের ৪০ অংশের একাংশ গরীবদিগকে দান করিতেই হইবে। রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসের মধ্যে যে কোনও এক দিন, ঐ অর্থ দান করিতেই হয়। যাহারা কারবারী, তাহাদের গৃহে অথবা গুদামে মৌজুদ মালের (বাজার দরে) মূল্য ধরিয়া, তাহার মধ্য হইতে উক্ত ৪০ অংশের একাংশপরিমাণ টাকা দান করিবার ব্যবস্থা আছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের এই ব্যবস্থা ও আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহার শাস্তি অতি ভয়ানক। ইসলাম-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জাকাৎই সদ্ব্যয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কেবল জাকাৎ দিয়াই ধনবানের পরিত্রাণ নাই; তাঁহাকে হজ বিধিও পালন করিতে হয়। আমাদের দেশে অধুনা কংগ্রেস, কন্ফারেন্স প্রভৃতি বিভিন্ন নামের কত সভাসমিতি হইয়াছে, এবং হইতেছে। কিন্তু আবহমান কাল হইতে 'ইসলাম' এই 'কংগ্রেসে'র সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু যাহারা ধনবান নহে, তাহারা যদি পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় হজ ব্রত পালন করিবার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে পুণ্যের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে। হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, "হজ-ব্রত-পালনেচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, পরে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্টপরিমাণে ভূসম্পত্তি রাখিতে হইবে, পরে নিজের সঙ্গে সেই পরিমাণ অর্থ লইতে হইবে, যে পরিমাণ অর্থ সঙ্গে থাকিলে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন-কালের মধ্যে কাহারও দ্বারস্থ বা গলগ্রহ হইতে না হয়। ভিক্ষুকের জন্য হজ 'ফর্জ' হয় নাই।"

মক্কা-ভ্রমণকাহিনী বা হজ-যাত্রা-কাহিনীর পাঠকগণের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। এইবার কথারম্ভ করি।

অদ্য ৫ই রমজান (২৭শে আশ্বিন, ১৩১৪।) আমি আজ পাঁচ দিন 'ফর্জ'

রোজার উপবাস পালন করিতেছি। গত কল্য দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমি এ বৎসর নিশ্চয়ই হজ্জ-ব্রত-পালনার্থ মক্কায় গমন করিব। সে কারণ শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে, অদ্য হইতে প্রতিবেশী, আত্মীয়, পরিবারবর্গ, পরিচিত ব্যক্তি প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইতে আরম্ভ করিলাম। যদি ভ্রমক্রমে কখনও কাহারও অন্তরে ব্যথা দিয়া থাকি, প্রত্যেকের নিকট সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। যদি আমার অন্তরে কেহ কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যথা দিয়া থাকে, শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে তাহাকেও ক্ষমা করা আবশ্যক; এই জন্য যথাসাধ্য সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিলাম। এই ভাবে ১৬ই রমজান (৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার) পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন কাটিয়া গেল।

১৭ই রমজান (৯ই কার্ত্তিক) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, পুত্র, কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি পরিবারভুক্ত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাড়ীর বাহির হইলাম। এই সময় শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে, হজ্জ-ব্রত-পালনের 'নিয়ত' অর্থাৎ 'মনন' সম্পন্ন করিলাম। মৃত্যুকালে যে ভাবে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয়, এই সময়ও সেই ভাবে বিদায়-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা-পালনে কোনও ত্রুটী করিলাম না। বেলা দশটার সময়, মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলযোগে কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

২৯শে রমজান (২১শে কার্ত্তিক) পর্য্যন্ত, দীর্ঘকালের জন্য প্রবাস-যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সকল ক্রয় করিতে, বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্রাদি লিখিয়া শেষ বিদায় লইতে, এবং কলিকাতাস্থিত আত্মীয়বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শেষ বিদায় লইতেই কাটিয়া গেল।

১লা শওয়াল পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নমাজ পড়া হইল। কেহ হাসিমুখে, কেহ অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার নিকট বিদায় লইলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। রাত্রি প্রায় আটটার সময়, আমার বাসার সম্মুখে একখানি ভাড়া-গাড়ী আসিয়া লাগিল। জানা গেল, ঐ গাড়ী কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী, এবং আমার প্রধান ভক্ত গোলাম হোসেন কাসেম আরিফের। আরিফ সাহেব আমাকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আমি প্রায় প্রস্তুতই ছিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ীতে উঠিলাম, এবং হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

ক্রমশঃ।

অনুবাদক—আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

আলোচনা।

'বিলাসী'র পরিচয়।

ইদানীং 'বাঙলা' সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্প একঘেয়ে হইলেও গল্প ত বটেই। গল্প যদি গল্পই হয়, তবে ত কোনও কথাই থাকে না; কিন্তু বর্ণনের চেয়ে গর্জ্জনের ভাগ বেশী হইলে স্বভাবতঃই আপত্তি উঠে। গত বৈশাখের 'ভারতী'তে উক্ত লেখকের 'বিলাসী' গল্প বাহির হইয়াছে। গল্পটী আত্ম-কাহিনী। কাহিনীর আখ্যানভাগ এই,—মৃত্যুঞ্জয় মিত্র এক পল্লীগ্রামের প্রান্তে আম কাঁঠালের বাগানে একটা 'পোড়ো' বাড়ীতে একা থাকিত। বাগানের ফলকরের আয়ে তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা স্বচ্ছন্দভাবে চলিত। সে নিজে রাঁধিয়া খাইত। লেখাপড়াতেও সে অবশ্যই অমনোযোগী ছিল না, দুই ক্রোশ দূরে এক ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। গল্পের বক্তা তাহাকে চিরদিনই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছেন! মৃত্যুঞ্জয়ের 'বাপ-মা ভাই-বোন' কেহই ছিল না। গাঁজাখোর, গুলিখোর ইত্যাদি বিশেষিত তাহার এক 'জ্ঞাতি খুড়া' ছিলেন। খুড়া তাহার খোঁজ লইতেন না, কিন্তু তাহার বাগানখানির দিকে তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মৃত্যুঞ্জয় তিন মাস কাল রোগে ভুগিল; কিন্তু যদিও সে গ্রামের অনেককে অনেক দিন অর্থসাহায্য করিয়াছিল, তথাপি গ্রামের কোনও ভদ্র ব্যক্তি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিল না। স্বার্থপর খুড়ার ত কথাই নাই। কিন্তু বিশ্বমানবের প্রতিষ্ঠাভূমি এই বিধাতার রাজ্যে—যেখানে বেদিয়, ডোম, চণ্ডাল, মালবৈদ্য প্রভৃতি উদার-হৃদয় ব্যক্তির অভাব নাই, সেখানে—একটা লোক বিনা সেবা-শুশ্রূষায় শুকাইয়া মরিতে পারে না। কাজেই বিলাসী নামে এক সাপুড়ের মেয়ের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার ফলে মৃত্যুঞ্জয় বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া যখন উঠিল, তখন সে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেই! অর্থাৎ, সে বিলাসীকে 'নিকা' করিল, এবং তাহার 'হাতে ভাত' খাইতে লাগিল। এ সংবাদে সে গ্রামের তাবৎ ভদ্রলোক চটিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানবাড়ীতে গেল, গিয়াই মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে শিকল লাগাইয়া বিলাসীকে বেদম প্রহার করিল, প্রহারের চোটে আধ-মরা করিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন শয্যাগত মৃত্যুঞ্জয় আর কি করিবে? সে বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ দ্বারে উপর্য্যুপরি সবলে পদাঘাত করিল, আর শ্রাব্য ও অশ্রাব্য কত কি বলিল। তাহার পর কিরূপে, কত দিন পরে, এবং কাহার সাহায্যে রুগ্ন মৃত্যুঞ্জয় ঘরের বাহিরে আসিল, তাহা কল্পনায় বুঝিতে হইবে। তথাপি মৃত্যুঞ্জয় ঘরের বাহির হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত; নতুবা বৎসরখানেক পরে গ্রামের ক্রোশ দুই দূরে মাল-পাড়ায় একটা কুটীরের দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। মৃত্যুঞ্জয়কে যখন দেখা গেল, তখন সে মালবৈদ্যের ব্যবসা করিত, অর্থাৎ পয়সা লইয়া লোকের বাড়ীতে সাপ ধরিত, যে সে গাছের শিকড় বিক্রয় করিয়া পয়সা রোজগার করিত। লোক ঠকাইয়া পয়সা লইতে বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিত, বাধাও দিত; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় 'নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না'। যাহা হউক, শেষে

এক দিন এক গোয়াল বাড়ীতে সাপ ধরিতে গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কামড়াইল। মৃত্যুঞ্জয় মরিল। বিলাসীই বা বাঁচিবে কিরূপে? বাঁচিলে ত আর 'ট্র্যাজিডী' হয় না! কাজেই সে সাত দিনের মধ্যে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিয়া সতী-লোকে যাত্রার 'ফ্যাশান'টা বুঝি তখনও উঠে নাই।

ইহাই হইল গল্প। কায়স্থ-সন্তানের সহিত মালবৈদ্য-কন্যার বিবাহ সমাজধর্ম্ম ও সামাজিক রুচির তরফ হইতে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, রূপ ও গুণের মোহের হাত এড়াইতে কয় জন পারে? যাহা সত্য ও স্বাভাবিক, তাহার চিত্র সংস্কারের চক্ষে যতই কুৎসিত হউক, আধুনিক গল্প-উপন্যাস এত বাঁধা ধরা নিয়ম মানে না। এই বাঁধা ধরা নিয়ম না মানিবার হেতুবাদে কেহ কেহ যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা জানি। সম্প্রতি কোনও প্রবীণ সাহিত্যরথী ইহাকে 'সাহিত্যের বলবান লক্ষণ' বলিয়াছেন। কিন্তু 'নীতি-ধর্ম্মের কিংবা সাহিত্যের বা সমাজের তরফ হইতে কোনরূপ অনুরোধ, উপরোধ, গঞ্জনা কিংবা লাঞ্ছনায় এখন কোনও কাজ দেখিবে না'—এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অদৃষ্টবিধাতার দোষ দিয়া মূক হইয়া থাকা কদাচ সঙ্গত নহে। গল্প-উপন্যাসে বিশিষ্ট সমাজের বিধি-নিষেধ না মানা দোষের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু কোনও সমাজের রূপ বিকৃত করিয়া দেখাইবার অধিকার কোনও ঔপন্যাসিকের নাই। তিনি তাঁহার কল্পনার নিকটা ঢাকিয়া রাখুন, এমন কথা বলিতেছি না; আমরা তাহার পূর্ণ রূপ দেখিতে চাহি। গল্প উপন্যাসের আত্মপ্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খেয়ালের রাজ্যেও বস্তুর বৃদ্ধি আছে, পুষ্টির আশা নাই। মালবৈদ্যকে, কায়স্থের কেন, ব্রাহ্মণেরও মাথায় তুলিতে পার; অধমেও উত্তমের গুণের অভাব নাই, তাহা দেখাইতে পার; কিন্তু গায়ের জোরে উত্তমকে ঠেলিয়া নামাইয়া অধমকে ঠেলিয়া তুলিলে লেখকেরই চিত্তবিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির জাতীয় সাধনার কথা ভাবিতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও দেখিতে হয়। মালবৈদ্যের কন্যা সেবাধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় কায়স্থ-সন্তানের জীবনরক্ষা করিয়া সমাজে সেবাধর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া দিল, বেশ কথা। কিন্তু ইহাতেই কি গল্পলেখক পল্লীবাসী ভাবৎ লোকের উপর চটিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিবেন? 'বিলাসী'র লেখক তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এক জনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ সাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু এ কালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' কতগুলি পল্লীর সহিত লেখকের পরিচয় আছে, জানি না; কিন্তু আমাদের পল্লীবাসী পাঠক সহজেই বুঝিবেন, পল্লী সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান কত দূর সঙ্কীর্ণ। আমরাও পল্লীগ্রামে লালিত পালিত হইয়াছি, সমগ্র ভারতের না হউক, কয়েকটা জেলার বহু পল্লীগ্রামের সহিত আমাদেরও পরিচয় আছে, সহরেরও অভিজ্ঞতা আছে। আমরা এমন পল্লীগ্রাম একটাও দেখি নাই, যেখানে রোগ বা অন্য রূপ বিপদে উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু কেহই কাহারও খোঁজ লয় না, বা কিছুমাত্র সাহায্য করে না। অনেক ক্ষেত্রে পাড়াশুদ্ধ লোকও জুটিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় দাতা ও পরোপকারী ব্যক্তির সেবার অভাব পল্লীগ্রামে হয় না। তবে যদি মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর ন্যায় কোনও নীচকুলোদ্ভবা রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে সে যতই

উদারহৃদয় হউক, স্বভাবতঃই সাধারণের বিরক্তিভাজন হয়। ইহাই সাধারণ পল্লীসমাজের অবস্থা। পল্লীর সকল ব্যবস্থাই ভাল, আর সহরের সকল ব্যবস্থাই মন্দ, এমন কথা অবশ্যই আমরা বলি না। দোষ পল্লীসমাজেও আছে, সহরেও আছে। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রীতির নিদর্শন পল্লীসমাজে এখনও যে পরিমাণে আছে, সহরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। সহরের কৃত্রিম সভ্যতা দিনে দিনে পল্লীসমাজকে জয় করিতেছে, মানবসভ্যতার আদর্শকে খর্ব্ব করিতেছে। সে সকল কথার আলোচনার স্থান ইহা নহে। তথাপি লেখকের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সহরে বাড়ীর পাশে বাড়ী—কেহ কাহারও খোঁজ লয় না; রোগে ভুগিয়া ডাক্তার ডাকিলে রোগ যতই উৎকট হয়, ডাক্তারের 'ভিজিট' ততই বাড়ে; জড়ী-বড়ীর দেশের পল্লীসমাজেও সহরের পাশ-করা ডাক্তারদের এই অত্যাচার দেখা যাইতেছে। সহরে মরিলে সহজেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি না, জানি না; কিন্তু পল্লী-সমাজের আদর্শে পাঁচ জনের সহিত ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে, এবং আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইলে, 'মিউনিসিপালিটী'র মেথরের গাড়ীতে গঙ্গাতীরস্থ হইতে হয়, সহরের এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আর পল্লীগ্রামে? বাসী-মড়া গ্রামে পড়িয়া থাকিলে দেবসেবা হয় না, এই সংস্কারে সমাজের 'অশিক্ষিত' ব্যক্তিরাই গ্রাম হইতে শীঘ্র মৃতদেহ সরাইবার ব্যবস্থা করে। দুই জন ওজর করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেও আর পাঁচ জন স্বেচ্ছায় এ কাজ করে। ইহা এই কলি-যুগেরই কথা।

'বিলাসী'র লেখক পল্লীগ্রামের হিন্দু বিধবাগণকেও অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। কোনও ব্রাহ্মণ-বিধবার পদস্খলন অসম্ভব নহে। পল্লীগ্রামেও নহে, সহরেও নহে। পল্লী-গ্রামের কোনও 'ছোট বাবু' না হয় বার-ইয়ারী পূজা বাবৎ কিছু দান করিয়া, বা ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহার বিপথগামিনী বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে 'চল' করিয়া লইলেন, আর সহরের 'ছোটবাবু' সমাজকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বিপথগামিনী বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া মোটর-গাড়ীতে বসিয়া সময়ে এবং অসময়ে হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়া, পতিতাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? অর্থদণ্ডটাই বেশীর ভাগ। কিন্তু ঐ অর্থদণ্ডই ত পাপকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। পল্লীবাসী যে ছোটবাবুর অর্থবল নাই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া যাহাতে বিপথে যাইতে না পারে, সেই চেষ্টাই করিতে হয়।

'বিলাসী'র লেখক গল্প লিখিতে বসিয়া এক একটী সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোনও সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন নাই; 'বোধ করি', 'মনে হয়' প্রভৃতি কথার আশ্রয়ে উপদেশের ঢাকঢোল পিটিয়াছেন। তাঁহার একটী সমস্যা এই,—ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরাণীকে বিবাহ করিয়া মেথর হয়, কিন্তু মেথর ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ হয় না কেন? ইহা জাতিবিচারের কথা। জাতিবিচার অর্থে উচ্চ নীচকেই বুঝায়। জাতি-বিচার হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দোষ যাহাই থাকুক, রূপজ মোহের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য, এ ব্যবস্থার কেন, পৃথিবীর কোনও উন্নতজাতির সমাজের কোনও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। সমাজে থাকিয়াই উচ্চ হইতে গেলে সমাজের বিধি-

ব্যবস্থাগুলিও না মানিলে চলে না। সকল সমাজই এ বিষয়ে একমত। সমাজের অপেক্ষা হৃদয়-জয়ের আনন্দই যদি বেশী গৌরবের বস্তু হয়, তবে সমাজের বিধিব্যবস্থাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সমাজের বিধিব্যবস্থা মানিয়াও কি হৃদয়-জয়ের আনন্দ পাওয়া যায় না? 'আমার মনে হয়, দেশের নর নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি'তে—দেহসর্ব্বস্ব প্রেমের ভাগাড়ের দিকে যে শকুনির দৃষ্টি প্রখর, তাহার হৃদয়-জয়ের আনন্দের গৌরব বাড়াইয়া তুলিবার জন্য পরলোকে যে অক্ষয় স্বর্গলাভের ব্যবস্থা আছে, এমন 'সুসমাচার' এখনও পাওয়া যায় নাই। আর, বিলাসীকে যাহারা উপহাস করিয়াছিল, 'সাপুড়ের মেয়েটী যখন একটী পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিয়াছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও' চোখে দেখিতে না পাইলেও, তাহারা যে পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করিতেছে, 'বিলাসী'র লেখক তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই ; পারিবার আশাও নাই। তবে আর গল্প লিখিতে বসিয়া মামুলী বাজে কথা আওড়াইয়া লাভ কি? লেখকের মতে টিঁকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নহে। টিঁকিয়া না থাকাও যে চরম সার্থকতা নহে, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' বলিয়াছেন,—'মোহে পড়িয়া ভবিষ্যৎ ভুলিয়া হিন্দু যদি ধর্ম্ম, সমাজ, কুলাচার প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ না করিয়া ডোম-মেথর-সাপুড়ে বিবাহ প্রবর্ত্তিত না করিল, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া কি ফল?—শরৎবাবুর এই বিষম ভাবনা ; কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজ, এবং ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধও এই প্রকার দুর্নীতির প্রচারকেও কাটাইয়া টিঁকিয়া থাকিবে। অবৈধ ক্ষণিক প্রণয়ের কথা অরুণতাপসী ধরিয়া নিরেস কাগজে নিরেস ভাষায় 'বটতলা' হইতে ছাপা হইত। এখন প্রচারকেন্দ্র— একমাত্র প্রবেশ।'

লেখকের আর একটা সমস্যা—শিক্ষাসমস্যা। মৃত্যুঞ্জয়কে প্রতিদিন চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে হইত, কাজেই সে তৃতীয় শ্রেণীর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। ইহাতেই শিক্ষাসঙ্কটের কথা উঠিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, 'চার-ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই।' ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, লেখক সেগুলাকেও সহর মনে করেন। তাহা করুন ; কিন্তু কোনও গল্পলেখকের অভিযোগে সরকার বাহাদুর প্রতি গ্রামে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন না, দেশের বার্ষিক আয় ব্যয় দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুত্রকে 'উচ্চশিক্ষা' দিবার জন্য অনেক পুত্রের পিতা বা অভিভাবক পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হন, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না ; কিন্তু তথাপি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে যে সকল ছাত্রাবাস আছে, উহাতে যত ছাত্র থাকে, তাহাদের তুলনায় পুত্রের শিক্ষার জন্য যাঁহারা সহরবাসী হন, তাঁহাদের সংখ্যা কত অল্প, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। লেখক ইহাকে 'বাজে কথা' সাব্যস্ত করিয়াছেন। তথাপি শক্তটা কেনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহাকেই বলে গল্পের। তাহার পর বর্ণ কতটুকু, দেখা যাউক। গল্পের গোড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের বচ্ছল অবস্থার কথাই দেখা যায়, তথাপি সে যে গ্রামের স্কুলে পড়িত, সেই স্কুলেই না থাকিয়া প্রতিদিন 'চার-ক্রোশ পথ হাঁটা' ত্যাগ করে নাই কেন, তাহার কোনও

কারণ গল্পটীর মধ্যে নাই। যে মৃত্যুঞ্জয় একটা লোকের—হউক সে বিলাসী, বা বিমলা, বা বিনোদিনী—গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে পারিয়াছিল, দোকানের খাবার কিনিয়া ইহাকে উহাকে খাওয়াইত, কত ছাত্রের বেতন দিত, সে আমবাগানে 'পোড়ো' বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত কেন? বিলাসীর পিতাকে বাগানে রাখিলে, এবং বাগানের ফলকর বন্দোবস্ত করিবার সময় নিজে বৎসরে দুই এক মাস বাগানে থাকিলে তাহাকে অবশ্যই চিরদিন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে হইত না। কিন্তু লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের পঠদ্দশাতেই বিলাসীর দ্বারা তাহার হৃদয় তিল তিল করিয়া জয় করাইবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রটা ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কি সুন্দর চরিত্রাঙ্কন! লেখক সাপুড়ের মেয়েটীকেও যেখানে সেখানে টানাটানি করিয়াছেন; বিলাসীকে এতই পতিগতপ্রাণা করিয়াছেন যে, যখন গ্রামের বহু লোক তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখনও সে নিজের প্রাণকে তুচ্ছবোধ করিয়া রুগ্ন পতির আহারের জন্য ব্যস্ত। নতুবা বিলাসীকে সতী সাজান হয় না। ইহাকেই বলে—অপূর্ব্ব সৃষ্টি! বিলাসী যাহার হৃদয় তিলে তিলে জয় করিয়াছিল, এবং যে জয়ের আনন্দে লেখক গল্প লিখিতে বসিয়া পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ের মূল্য কতটুকু? বিলাসীকে লাভ করিবার আগে মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় কেমন ছিল? 'দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না'। তাহার পর—বিলাসীকে পাওয়ার পর—মৃত্যুঞ্জয় 'নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না'। বলা বাহুল্য, তখনও তাহার বাগানখানি স্বার্থপর খুড়া দখল করে নাই। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নদীর জলের মত যাহার হৃদয় নীচের দিকেই নামিয়া আসে, তাহাকে পল্লীসমাজ ঠেলিয়া তুলে না। কি অবিচার!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তি।

১

এক সময় মাষ্টার মহাশয় দু' পাঁচ টাকা গ্রাহ্যই করিতেন না; মাষ্টারের বন্ধুদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি এখনও তাঁহার নিকট অন্ততঃ দু' এক টাকাও না ধারেন। কিন্তু তাগাদার অভাবে সে টাকা তামাদী হইতে বসিয়াছে জানিয়াও তিনি তাগাদা করিয়া কাহারও মনে লজ্জা দিতে লজ্জিত। এ হেন মাষ্টারকে আজ কি না সামান্য চারিটী টাকা দেনার জন্য এত কথা শুনিতে হইল! ইহা কি তাঁহার প্রিয় ছাত্র সুশীলের প্রাণে সহ্য হয়!

কাজেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল সে যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার এ দেনা পরিশোধ করিবেই করিবে। উঃ! আজ যদি তাহার সেই অনেক দিনের জমান টাকা কয়টা থাকিত, তাহা হইলে কেহ কি তাহার সম্মুখে মাষ্টার মহাশয়কে এত করিয়া বলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও যে আবার মা (কাকীমা) ধার লইয়াছেন। যাহা হউক, কাল সে যেমন করিয়াই পারুক, মাষ্টার মহাশয়ের গত মাসের পাওনা মাহিনাটা আনিবেই আনিবে।

সুশীল মাষ্টারের বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া সমবেদনা পরিপূর্ণ ক্ষোভমিশ্রিত স্বরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি অমন লোকের কাছে ধার করেন কেন?"

মাষ্টার আপনার প্রতি ধিক্কারপূর্ণ দুঃখের মৃত হাসি হাসিয়া বলিল, "কি করি বল্, অভাবে মানুষ সব-ই করে।"

"বেশ ত, আপনিই না হয় অভাবে পড়েছেন, কিন্তু 'ও' ত এমন কিছু অভাবে পড়েছে ব'লে বোধ হয় না, যা'র জন্যে এমন ক'রে ব'লে গেল।"

"তা ব'ল্লে চল্‌বে কেন? ও পাবে।"

"তা' পেলেই বা—আপনিও ত কত লোকের কাছে পাবেন, কৈ, আপনি ত কাউকে এমন ক'রে বলেন না—আর ও এমন ক'রে ব'ল্‌বে কেন?"

নিজের মনে যাহা উচিত, সে কথা বলিতে সুশীল কখনও ভয় পাইত না। এমন কি, সে এই মাষ্টারটিকে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী ভয় করিলেও উচিত বলিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতেও ছাড়িত না। মাষ্টার ইহা বেশ বুঝিতেন; এই জন্যই আজ তাহার তর্ক এই স্থানেই বন্ধ করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "ও পাবে, তা ও যদি বলে ত আমি আর কি কর্‌ব বল্?" সত্য সত্যই সুশীলের তর্ক বন্ধ হইল—সত্যই ত, তাহার টাকা শোধ করা ভিন্ন তিনি আর কি করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আজ ত ১৫ই, দাদা মাইনে পাবে—কাল আমি যেমন ক'রেই হোক্, আনবই আন্‌ব। আর কাকাবাবু খালি বলেন, "ওরা ভাড়াটা দিক্, তবে দোবো; আজ আমি এখনি গিয়ে ব'লছি—" এই বলিয়া সে নিজের বইগুলি গুছাইয়া লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন মাষ্টার বলিলেন, "না রে—ঝগড়া করিস্‌নে, শেষকালে আবার মারধোর খাবি, একেই ত—"

"হ্যাঁ, মার খাবে না আরও কিছু—আপনার এখন দরকার পড়েছে, দেবেন না কেন? নৈলে আপনি ত এক সময় অম্‌নিই বাড়ীতে গিয়ে পড়িয়ে এসেছেন—

তখন ত কৈ কিছু বলতেন না—" বলিতে বলিতে সুশীল ক্ষুদ্র মেসের একটী অর্দ্ধমলিন সিট্ ত্যাগ করিয়া চটী জুতার শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র বিভূতিভূষণ ওরফে 'মাষ্টার মশাই' বেচারী বালিশে হেলান দিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিল,—সেই এক দিন গিয়াছে! যখন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন। তখন সে কি না করিয়া বেড়াইয়াছে? অপর বিষয় যেমনই হউক, কিন্তু একটী বিষয়ে তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী,—এই চৌদ্দ বৎসরের সুশীল, তাহার এই সখের ছাত্রটী! হায়! কে জানিত, আজ তাহাকে এই ছাত্রের নিকটেই সামান্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ইহারই জন্য লজ্জায় সে আর সুশীলের বাড়ী মাথা গলাইতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

বিভূতির প্রকৃত সঙ্গী বলিতে যে ছিল, তাহার নাম ফকীর। বোধ করি ফকীরের অবস্থাটা কতকটা তাহারই মত বলিয়াই বিভূতি তাহার হৃদয়ে বন্ধু-ভাবে স্থান পাইয়াছিল।

আজ সন্ধ্যার পরে ফকীর আসিলে বিভূতি তাহাকে সঙ্গে লইয়া ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে বেড়াইতে চলিল; উদ্দেশ্য—যদি দারিদ্র্যের অপমানজনিত ক্ষুব্ধ হৃদয়টা বন্ধুর মিষ্ট বাক্যালাপে কিছুক্ষণের জন্যও প্রফুল্ল থাকে। বিশেষতঃ, আজ আর তাহাকে দত্ত-বাড়ীর 'প্রাইভেট্ টিউটারীর রেগুলার এটেন্‌ডেন্স্' দিতে হইবে না—সে ছাত্রের অসুখ করিয়াছে।

সার্‌পেন্‌টাইন্ লেনের একটী মোড় পার হইয়াই সুশীলের দাদা সন্তোষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে বোধ হয় নিজেদের ইভ্‌নিং ক্লাবে যাইতেছিল। বিভূতি মন হইতে লজ্জাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া জড়িতকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া নম্রভাবে বলিল, "সন্তোষ! শোন ভাই—আজ মাইনেটা পেয়েছ কি? যদি পেয়ে থাক, তা হ'লে কাল যাতে আমাকে দেওয়া হয়, কাকাবাবুকে বোলো না ভাই—এক ভদ্দর লোক পাবে—বড় তাগাদা ক'চ্ছে।"

সন্তোষ মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে কোনও আফিসে কেরাণীগিরী করে। ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্তই যাহার বিদ্যার শেষ, এমন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে আজকালকার

দিনে ইহাই কি যথেষ্ট নহে ? যাহা হউক, এই ১০৲ টাকার ভিতর সে কোনও মাসে ১০৲ টাকা, কোনও মাসে বা খুব জোর ১২৲ টাকা নিজের অভিভাবক কাকাবাবুর হাতে দিয়া বাকী টাকা নিজের হাতখরচের জন্য রাখে। এ মাসে সে একটী ভাল জামার অর্ডার দিয়াছিল, সুতরাং এবার সে কাকাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, ৮৲ টাকার বেশী দিতে পারিবে না। এখন বিভূতির কথা শুনিয়া বোধ করি কাকার এ মাসের আর্থিক অবস্থাটার কথা ভাবিয়াই বলিল, "হাঁা, মাইনে পেয়েছি বটে, কিন্তু কাল তোমাকে দেওয়া হয় কি না, ঠিক বল্‌তে পারি না।" বিভূতি লজ্জিত হইয়া বলিল—"আচ্ছা, তবুও একবার 'কাইগু্‌লি' তাঁ'কে ব'লো। বিশেষ দরকার।" "আচ্ছা, ব'ল্‌বো এখন"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল ; একটীও বাজে কথা বলিল না।

এই সময় বিভূতির হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যেন করুণ সুরে বলিয়া উঠিল, হায়, সময় কি পরিবর্ত্তনশীল ! এমন এক দিন ছিল, যখন এই সন্তোষ বিভূতিকে কত সম্মান করিয়া চলিত। পিতৃমাতৃহীন অসহায় ভাইটীর পড়া বলিয়া দিবার কেহ ছিল না দেখিয়া সন্তোষ আহ্লাদের সহিত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহার মাষ্টারী করিত বলিয়া সে কতই না কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাকে লজ্জায় ফেলিত। আর আজ ?

ফকীর তাহাকে মৌনভাবেই খানিক পথ চলিতে দেখিয়া বলিল, "একেবারেই যে চুপ কর্‌লি ?—বল্‌, তার পর কি হ'ল। ভাবনা ত আছেই, তাই ব'লে সব সময় ভাবা ত ঠিক্ নয়।"

"না, ভাব্‌ব আর কি" বলিয়া বিভূতি "তার পর" কি হইল, তাহাই বলিতে লাগিল।—

৩

রাত্রিকালে আহারে বসিয়া সন্তোষ প্রদীপের আলোকে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে কাকীকে বলিল, "দেখ কাকীমা, তোমাদের জ্বালায় আমার রাস্তায় বেরুন দায় হ'য়ে পড়্‌ছে দেখ্‌ছি—"

কাকীমা বলিলেন, "কেন রে, কি করেছি আমরা তোর্ ?"

"তা' ত বটেই—আজ আমি কতকগুলি ভদ্দর লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইছিলুম, এমন সময় তোমাদের সাধের মাষ্টারটী মাইনের তাগাদা কর্‌লে, ব'ল্লে—'কি হে আজ না তুমি মাইনেটা পেয়েছ ? যা হোক্, কাল যেন আমার গত মাসের মাইনেটা দেওয়া হয়, ব'লো তোমার কাকাকে।" তার পর

সন্তোষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তাই ছাই তাদের কাছ থেকে আমাকে একটু তফাতে ডেকে বল্, তা নয়, তাদের সাম্‌নেই তাগাদা! কেন, টাকা দিলে কি আর অন্য মাষ্টার পাওয়া যায় না?"

সুশীলও দাদার পাশে আহার করিতেছিল। সে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র হইলে কি হয়, দাদাকে চিনিতে তাহার কিছুমাত্র বাকী ছিল না। যে দিন হইতে মাষ্টার ম'শায় মাহিনা লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, দাদা যে সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে, ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। এখন দাদার কথা শুনিয়া সে কোনও মতেই দাদার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মনে মনে বলিল,—সব মিথ্যে, মাষ্টার মশায় কখনই এমন ক'রে এ কথা বলেন নি—এতে যে তাঁর নিজেরই বেশী অপমান। এইরূপ ভাবিয়া সে দাদার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিল, "কোন্ জায়গায় এ কথা বলেছেন তিনি?"

ভ্রাতার প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া দাদা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিল। বাম হস্তে ভাইয়ের মাথায় একটী মাঝারি রকমের চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি?"

মাষ্টারের হাতে মার খাইলে তাহার মনে কোনও কষ্ট বা রাগ হয় না, কিন্তু তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি দাদা আজ অনেক দিনের পরে তাহার গায়ে হাত তোলায় সে রাগে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাস আবার কি, তুমি মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছ।"

দাদা আর নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই ভাইকে আচ্ছা করিয়া দু' এক ঘা দিতে গেল। কাকীমা—"ওঠ, তোর আর খেতে হ'বে না" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে সুশীলের দুই বগলে হাত দিয়া তাহাকে দাঁড় করাইলেন। সুশীল আর অধিক মার না খাইলেও, দাদা যে আবার সক্‌ড়ী-হাতেই তাহাকে মারিতে আসিল, এই কথা ভাবিয়া রাগে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। সে চীৎকার করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু মাষ্টার ম'শায়ের উপদেশগুলি মনে পড়ায় আর তাহা পারিল না—কে যেন জোর করিয়া তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল।

তাহার পর আহারান্তে সন্তোষ—"কাল গিয়ে লাগিও, আমাকে মেরেছে" বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কাকী বুঝিলেন, আজ রাত বারটার পূর্ব্বে সে বাড়ী ফিরিবে না।

এতক্ষণ সুশীল গুম্ হইয়া বসিয়াছিল; এখন দাদা বাহির হইয়া গেলে কাকীর

মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আমি বল্‌বই ত, দেখো তুমি, আমি নিশ্চয়ই বল্‌ব।"

কাকী সন্তোষকে ভাল রকমই চিনিতেন, বলিলেন, "না বাবা, আর বলা-বলিতে কাজ নেই—আবার মারধোর কর্‌বে শেষে—ওর সঙ্গে কে পার্‌বে, বল্‌ ?"

দাদার উপর রাগ করিয়া সুশীল রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা মা, তুমি জান না—কেন শুধু শুধু তাঁর নামে দোষ দেবে ? তুমি কি মনে কর, দাদা যা ব'ল্‌লে— সব সত্যি ; তিনি কি সেই রকম লোক ?"

কাকীর একটী ছেলে হইয়া মরিয়া যাইবার পর, সুশীলের বিধবা মা যখন তাহাকে তিন বছরেরটী রাখিয়া মারা যান, তখন হইতেই কাকী তাহাকে লইয়া মানুষ করিতেছেন। এখন সুশীলের শেষ কথা শুনিয়া বিভূতির হাসিমাখা মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপস্থিত দুরবস্থার কথাও মনে পড়ায় তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, "সে কি আর আমি বুঝিনি রে—কি করি বাবা, আমারও যে কপাল ভাঙ্গা, ঐ বাড়ীটী আছে ব'লেই ত যা হোক্‌ ক'রে খেয়ে না খেয়ে সংসারটী চলে যাচ্চে—ওঁর যদি চাকরী থাক্‌ত—" একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুশীলের মুখ পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন—"তুই বিভূতিকে আমার নাম ক'রে বলিস্‌, ওরা ভাড়াটা দিলেই দোবো—আর এ সব কথা কিছু বলিস্‌নে, মনে কষ্ট পাবে—"

সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, তা হ'বে না—টাকা কাল চাই-ই।"

মা বলিলেন, "তবে তুই ওকে বলিস্‌, আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না।"

আর সুশীল দমিল না, বলিল—"আচ্ছা, আমিই বল্‌ব।"

৪

পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়া গেল, তথাপি আজ সুশীল আসে না কেন ? তবে কি বেচারী টাকার জন্ম জিদ্‌ করায় মার খাইয়াছে, কিংবা টাকা না পাওয়ায় লজ্জায় আজ আর পড়িতেও আসিবে না ? ইত্যাদি নানা চিন্তায় বিভূতি ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষটা সে আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ছাতে আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য রহিল রাস্তার উপর—কখন সুশীল আসিবে। হঠাৎ সিঁড়ি হইতে চটীর চট্‌চট্‌ শব্দ তাহার কাণে গেল। কি জানি, কেন তাহার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস

করিয়া উঠিল—সে যে এতক্ষণ তাহারই আশাপথ চাহিয়াছিল! তাড়াতাড়ি বিভূতি ছাত হইতে নামিয়া আসিল; দেখিল, আগন্তুক ফকীর। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার পর, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ আবার প্রফুল্ল হইল;—সে দেখিল, সুশীলও আসিতেছে। কিন্তু আজ তাহার মুখখানি এত ভার কেন? সে যেন মনে মনে কত কি ভাঙ্গা গড়া করিতেছে। তবে কি টাকা—না না, সে যে বই রাখিয়াই পাঁচটী টাকা তাহার হাতে দিল; তবে কি? বিভূতি কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

টাকা পাঁচটী তাহার হাতে দিয়াই সে বলিল, "কাল আপনি দাদাকে টাকার কথা বলেছিলেন?" বিভূতি তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ—কেন রে?"

এ কি! তবে কি দাদার কথাই সত্য নাকি! সত্য হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ সে মায়ের কাছে মুখ দেখাইবে কি করিয়া—ছিঃ ছিঃ, মাষ্টার মশাই যে এ কাজ করিতে পারিবেন, এ ধারণা যে তাহার মনে এতটুকুও স্থান পায় নাই। সে অল্প রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"যা' হোক্ যা বলেছেন, আর কক্ষণও আপনি দাদাকে মাইনের তাগাদা করবেন না—দাদা ত আপনাকে মাইনে দেয় না।"

হা অদৃষ্ট! তাহার নাম তাগাদা! মাষ্টার লজ্জিত হইয়া বলিল, "না না, তাগাদা আর এমন কি করা হয়েছে।"

"না হয়নি আবার! পাঁচ জন ভদ্দর লোকের সামনে যে রকম ক'রে বলেছেন, তারই নাম ত তাগাদা।"

কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় হইলেও মাষ্টারের এখন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি? কে বল্লে, আমি তাকে লোকের সাম্‌নে তাগাদা করেছি?"

"করেছেন ত। দাদা বল্লে ত, সে ক'জন ভদ্দর লোকের সঙ্গে কথা কইছিল, আপনি গিয়ে বলেছেন—'কি হে, আজ না মাইনে পেয়েছ, যা হোক্ কাল যেন আমার মাইনেটা দেওয়া হয়'—"

এতক্ষণে বিভূতির মুখে হাসি ফুটিল, বলিল, "তুই ভুল শুনেছিস্ গাধা কোথাকার!"

তবে কি তাহার ধারণাই সত্য—তাহাই হউক, তাহা না হইলে সে আজ বাড়ী ফিরিবে কোন্ মুখে! সে কহিল, "হ্যাঁ, আপনি এ কথা বলেছেন, দাদা বল্লে—"

এইবার বিভূতির ছাত্রের প্রতি অল্প রাগ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আজিকার পূর্ব্বের ঔদ্ধত্যের কথা মনে পড়িল। রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"সে ব'লেছে—তুই শুনিছিস্?"

শুধু শুনিয়াছে! সে এ কথা বিশ্বাস না করায় তাহাকে যে মার পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছে, সেই কথাটাই তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মাষ্টারের মন এতই সরল যে, এ কথা তিনি বিশ্বাসই করিতে পারিতেছেন না। এ হেন মাষ্টারের চরিত্রে দোষারোপ করিতে দাদার মুখে একটু আট্‌কাইল না? ছিঃ ছিঃ, ইহাতে তাহার যে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে। মুহূর্ত্তে এই কথাগুলি মনের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া দাদার প্রতি রাগে অন্ধ হইয়া সে জোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"হাঁ, আমি শুনিছি—আমি ভজিয়ে দেব, চলুন।"

বালক নিশ্চয় ভুল করিয়াছে—কি শুনিতে কি শুনিয়াছে। ইহাও কি সম্ভব! এরূপ মিথ্যা বলিয়া সন্তোষের লাভ কি? আর, সে এ কথা বলিবেই বা কি করিয়া? যাহা হউক, কিন্তু তাহার ছাত্রের পক্ষে এরূপ ভুল করা ত বড় অন্যায়! না, এরূপ কাজে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। বিভূতি এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় ফকীরও বলিয়া উঠিল, "না না, খোকা, তুমি ভুল শুনে থাক্‌বে—এ কথা সে কি বল্‌তে পারে? আমি ওর সঙ্গে ছিলুম, তোমার দাদা হয় ত সেই কথা বলেছে। ছিঃ, তুমি কি হে, তোমার দাদা এ কথা শুন্‌লে বল্‌বে কি?"

সে যে এই কথার জন্য, ঠিক্ এই কথারই জন্য, মার পর্য্যন্ত খাইয়াছে, আর ইহারা বলিতেছেন, সে ভুল করিয়াছে—ইহা কি ভুল করিবার কথা! যাহা হউক্, মার খাওয়ার কথাটা বলিলে বোধ করি ইহারা আর অবিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু এ কথা সে বলিবে কেমন করিয়া? প্রথমতঃ, লজ্জা। কিন্তু বিনা দোষে সে মার খাইয়াছে শুনিলে মাষ্টার মশাই যে অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন সুতরাং সে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "না—আমি ভুল ক'রিনি।"

মাষ্টার আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "এবার মার খাবি কিন্তু।"

বালক শক্ত হইয়া বলিল, "বেশ ত, মারুন না।"

তাহার এরূপ ঔদ্ধত্য মাষ্টার আর কোনও মতেই মার্জ্জনা করিতে পারিল না। জীবনে এ ভাবে তাহার সুমুখে এ কথা বলা, সুশীলের এই প্রথম। ইহার উপ-

যুক্ত শাসনের বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহার কান মলিয়া তাহার বইগুলি তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বালক গুম্ হইয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৫

সুশীল বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিল, দাদা আফিস্ হইতে বাড়ী আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সবেমাত্র আহারে বসিতেছে; দেখিয়াই তাহার গা জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "চল না, আজ একবার দেখি, কাল যে বড় তাঁর নামে দোষ দিচ্ছিলে"—এই বলিয়া তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

ভ্রাতার মূর্ত্তি দেখিয়াই দাদা দমিয়া গিয়াছিল। কাল তাহার কি যে মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কাল হইতে তাহার মনে যে তিলমাত্র শান্তি নাই। সে স্তব্ধ হইয়া সুশীলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

মা বাহিরে আসিয়া ছেলের মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্যাপারটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন; তাড়াতাড়ি সুশীলের হাত ধরিয়া নম্রভাবে স্নেহের কণ্ঠে বলিলেন, "তুইও যেমন বাবা, ওকি সত্যি ব'লেছে রে, এই এতক্ষণ ও আমায় ব'ল্‌ছিল, সব মিথ্যে কথা—দেখ্‌লে তুই মাষ্টারের নিন্দে শুনে কি করিস্।" সুশীল মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না, ও কথা আমি শুন্‌ব না—আমিই বুঝি শুধু শুধু দু'দিক থেকে মার খেয়ে মর্‌ব? আজ আমি মাষ্টার ম'শায়কে গিয়ে ঐ কথা ব'ল্‌তে তিনি বিশ্বাসই কর্‌লেন না, শেষকালে আমি জোর ক'রে ব'ল্‌তে আমাকে মার্‌লেন—তবু ত আমি মায়ের কথা বলিনি।" মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "চুপ কর্ বাবা, চুপ কর্।"

কাণ্ডটা যে এত সহজে মিটিয়া যাইবে, এ ধারণা সন্তোষ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভাগ্যে বিভূতি সুশীলের কথা বিশ্বাস করে নাই! তাহা না হইলে সে তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিত না। আর ধন্য তাহার কাকামাকে! কৈ সে ত তাঁহাকে বলে নাই, সে কাল যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা—অথচ কাকীমা কেমন ভাবে এত বড় কাণ্ডটা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন। কাকীমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল!

এই সময় কাকীমা নিজের আঁচলে বালকের মুখখানি মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "যাই হোক্, সন্তোষ! তোর তামাসার জন্যেই কিন্তু সুশী আমার দু'দিক থেকে মার খেলে—এবার কিন্তু ওকে একটা ভাল জামা তৈ'রী ক'রে দিতে হ'বে।"

সন্তোষ এত বড় একটা সঙ্কোচের হাত হইতে অনেকটা নিঃসঙ্কোচে পরিত্রাণ পাইয়া ভ্রাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই চল্ আমার সঙ্গে, আমি যে কাপড়ের জামা করতে দিয়েছি, তোকেও তাই দোব।"

সুশীল গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

৬

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘটনার পরে সুশীল আর সে বিষয়ে কোনও কথা তুলে নাই, তবে মাষ্টার ম'শায় এক দিন কেবল ওরূপ ভুল করিলে তাহার ফলে যে কত কি ঘটিতে পারে, এই সম্বন্ধে তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু এ কথা সে সন্তোষকে ব'লে নাই —কি জানি, সে যদি ইহার জন্য ভাইকে মারধোর করে!

সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই দিন হইতে সন্তোষ যেন একেবারেই মাষ্টারের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। পূর্ব্বে বরং দেখা হইলে অন্ততঃ দু' একটাও কথা কহিত, কিন্তু আজ কাল সে তাহাকে রাস্তার এ ফুটে চলিতে দেখিলে, ও ফুট দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। তাহার কারণ কি? বিভূতি এমনই কি অন্যায় কাজ করিয়াছে, যাহার জন্য সে তাহাকে এত ঘৃণা করে?

এ বিষয়ে বিভূতি অনেক ভাবিয়াছে, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। এক দিন রাত্রিতে সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, হয় ত বা সে দিন সে সুশীলকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলে, সুশীল বাড়ী গিয়া নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, আর সেই কথা সন্তোষও শুনিয়াছে।

আজ শনিবার। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় সন্তোষ আফিস্ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; সঙ্গে বোধ করি তাহারই আফিসের দুই তিন জন ভদ্রলোক ছিলেন। বহুবাজারের মোড়ের কাছে বিভূতিকে আসিতে দেখিয়াই সন্তোষ তাড়াতাড়ি ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বিভূতি ডাকিল, "কি হে সন্তোষ যে, কেমন আছ?" সন্তোষ যেন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মাথা হেঁট করিয়া কোনও গতিকে উত্তর করিল, "কেটে যাচ্ছে এক রকম।" এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি আবার আফিসের বন্ধুদের সঙ্গে আসিয়া মিলিল। এই সময় সন্তোষের মুখ চোখের অবস্থা এমন হইল যে, এক জন বলিয়া উঠিল, "কি হে, মহাজন না কি?"

সন্তোষ শুষ্কমুখে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

* * * *

কিছুক্ষণ হইল, সুশীল বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আকাশে কয়েকটী তারা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্তের ফুর্‌ফুরে বাতাস দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। আজ মেসের অধিকাংশ লোকই বাড়ী গিয়াছেন। বিভূতির ঘরে কেবল সে আর ফকীর বসিয়া সন্তোষের কথাই কহিতেছিল, এমন সময় সন্তোষ, আজ অনেক দিনের পরে, একেবারে ঝড়ের মত সেই ঘরে ঢুকিয়া বিভূতির প্রায় মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া এক দমে বলিতে লাগিল, "হাঁ হে বাবু, তুমি কি একেবারে মস্ত নবাব হ'য়ে পড়েছ যে, ম'শায়কে রাস্তায় দেখ্‌তে পেলেই চোরের মতন ঘাড় গুঁজে রাস্তা চল্‌তে হ'বে? - কেন, আমি তোমার কি ক'রিছি বল ত? নয় ত তোমার নামে মিথ্যে ক'রেই দু'টো কথা ব'লেছিলুম, আর সুশে সে কথা বিশ্বাস ক'রেনি ব'লে তাকেও না হয় একটা চড় মেরেছিলুম—সে আমার ভাই, তার গায়ে হাত তোলবার কি আমার অধিকার নেই?"

বিভূতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বল্‌ছ হে তুমি, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" সন্তোষ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, 'তা' আর পার্‌বে কেন, বেশ মজায় আমার ওপর নিজের আধিপত্যটা খাটিয়ে যাচ্ছ কি না। বেশ, আমি মিথ্যে ব'ল্‌তে তোমার যদি এতই রাগ হ'য়েছিল, ত তুমি কোন্ আমায় দশ ঘা—মেরেছিলে—এমন চুপ ক'রে, যেন কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি এম্‌নি ক'রে থাক্‌বার কি দরকার ছিল? আমি কিন্তু আর তোমায় দেখে অমন ভয়ে ভয়ে পথ চল্‌তে পার্‌ব না—না কখনও পার্‌ব না—"

এতক্ষণে ফকীর ও বিভূতি ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

গল্প-সাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী।

ইদানীং বাঙ্গালায় কতিপয় সাহিত্যসেবক যুগ-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন পথে চলিতেছেন, যেখানে তাঁহাদের নিজেদেরই প্রাণ সাড়া দিতেছে না; কারণ, যুগের পরিবর্ত্তনের চেয়ে মতের পরিবর্ত্তনের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য বেশী। বর্ত্তমানে তাঁহারা যে তত্ত্বের দরিয়ায় ভেলা ছাড়িয়াছেন, সে ভেলা বানচাল হইবার আশঙ্কা পদে পদে,—দরিয়ার বিক্ষোভ দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। সমুদ্রে পাড়ি দিতে হইলে সমুদ্রের অবস্থা ও ভেলার ব্যবস্থা দুইই অনুকূল হওয়া আবশ্যক। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে ইহা লক্ষ্য করা উচিত।

পরিবর্ত্তন জগতের ধর্ম্ম, জগৎবাসীর ধর্ম্ম। বাঙ্গালী জগৎছাড়া নহে; বাঙ্গালীর পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী পরিবর্ত্তন-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। ভবিষ্যতে কি হইবে, এবং কি হইবে না, তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন, কিন্তু আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের চলাচলের চেয়ে আকাশের কুসুমের দিকেই যে সকল অজ্যোতিষীদের লক্ষ্য বেশী, তাঁহারা যে কল্পনানেত্রে ভবিষ্যতের সুখের পট—ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ দেখিয়া, আত্মবিস্মৃত হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে * দিয়াছি। বিষয় ও চরিত্রাঙ্কন লইয়াই—উপন্যাসকে 'উপন্যাস' ভাবিয়াই উক্ত উপন্যাসের আলোচনা করিয়াছি; অনাবশ্যকবোধে তত্ত্বের কথা বলি নাই। এখন শুনিতেছি, উহার মধ্যে নাকি এমন একটা প্রচণ্ড তত্ত্ব আছে, যাহার জন্য সম্প্রদায়বিশেষের নিকট উক্ত পুস্তকের এত আদর।

বাহ্য রূপ দেখিয়াই সাধারণে বস্তুর দর কষে, কিন্তু বাহ্য রূপই বস্তুর সর্ব্বস্ব নহে। যে ব্যক্তি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বেড়ায়, ঘরে হয় ত তাহার অগাধ ধন আছে; আবার যে ব্যক্তি বাহিরে বাহিরে সমৃদ্ধির অভিনয় করে, ঘরে হয় ত তাহার দারিদ্র্যের সীমা নাই। এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি উঠিতে বসিতে দেশের কথায় মাতিয়া উঠেন, লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁহার মমতা নাই, দরিদ্রের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় গলে

* সাহিত্য—ভাদ্র, ১৩২৪।

না, মজ্জমান ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' বলিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এ রকম ঘটনা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। 'ভদ্রতা'র খাতিরে সে কথা এ প্রসঙ্গে 'ধামা-চাপা' দিলাম।

যে গ্রন্থকে আমরা উপন্যাস বলিয়াই তরল সাহিত্য ভাবি, তরল সাহিত্য ভাবিয়া তত্ত্বকথা ভাবি না, হয় ত তাহা তত্ত্বের পাকা ইমারত। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই: আমরা যখন ব্যক্তিকেই—আসল কি নকল—চিনিতে পারি না, তখন ব্যক্তির স্বার্থশূন্য দানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ছায়া দেখিয়া 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' মনে করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। অভ্রান্ত তত্ত্ব-জ্ঞানীদের কথা স্বতন্ত্র। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক-রূপে যদি তাঁহার উপন্যাসে ভারতীয় চিন্তার উৎস খুলিয়া দিয়া থাকেন, ভালই ত। আজ তাঁহার প্রাণের কথা অবুঝের দল বুঝিতে না পারিলেও, পরবর্ত্তিকালে তাহাদের বংশধরেরা বুঝিবেই, এই সান্ত্বনায় ঔপন্যাসিক অবিচল থাকিতে পারেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকাব্যে কবিসুলভ বহু তত্ত্বকথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি তত্ত্ব-প্রচারী গীত অবুঝ (নির্ব্বোধ) ও সবুঝ (বুদ্ধিমান তত্ত্বজ্ঞানীর) দলকে সমভাবেই আনন্দ দিয়াছে। বাকীগুলি লইয়াই যত গণ্ডগোল। অবুঝ দলের মতে সেগুলি একেবারেই 'নিধুর টপ্পা'। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, সেগুলিও তত্ত্বের আমসত্ব। অর্থাৎ সে সকলই জীবাত্মা ও পরমাত্মার টানাটানি। কোন্ কথাটী সত্য? কল্পনা-জগতে টপ্পার স্থান নাই, তত্ত্ব-জ্ঞানীরা সপ্রমাণ করিতে পারেন কি? টপ্পা কি শুধু বাস্তবেরই গাছে ফলে? কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে কবি সকল ক্ষেত্রে inspired হন না, aspiredও হন। বাঙ্গালার অন্যতম বরেণ্য কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অবশ্যই inspirationএর ফলপ্রসূত নহে, যদিও অলঙ্কারের গুণে কাব্য হিসাবে তাহা অমর ও অক্ষয়। কবি এ জগতের মায়ামোহ ঠেলিয়া তুরীয়জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই, সাধারণ মানুষের দশ দশা আছে, কবিও সকল ক্ষেত্রে দুর্দ্দশার হাত এড়াইতে পারেন না। কি কাব্যসাহিত্যে, কি গল্পসাহিত্যে, কবি কোথায় কোন্ দশাকে আশ্রয় করিয়া 'আত্মপ্রকাশ' করেন, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না!' ও নিধু বাবুর 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে!' এই দুইটী গীতের কথাই ধরা যাউক। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উভয়

গীতেই বাহির করা যায়। পরমাত্ম-সম্বন্ধী প্রেমের ঘোষণা করিলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ রূপ কল্পনা করিলে, 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ' টপ্পা-টারও সুরুচিপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়। 'প্রাণেশ্বর' বা 'প্রাণেশ্বরী' শব্দে রুচি-বাগীশদের ঘোরতর আপত্তি থাকিলেও, 'প্রাণ' অবশ্যই উপেক্ষণীয় নহে। আর 'মহীমণ্ডল'? 'বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন' করিবার স্থানই ত মহীমণ্ডল! নিধু বাবুর আর একটী প্রসিদ্ধ গীত—'অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা?' ইহার পাশে রবিবাবুর 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?' গীত-টীকে বসাইলে একই ভাবের দ্যোতনা দেখা যায় না কি? ইহাতেও বিরহ, উহাতেও বিরহ। দ্বিতীয়টী অপার্থিব প্রেমের আকুলতা হইতে পারে, কিন্তু প্রথমটী যে পার্থিব প্রেমেরই আবিলতা, এমন কথা কেহ হলপ লইয়া বলিতে পারেন না। উক্ত গীতের রচনাকালে নিধু বাবুর মনে পরমার্থজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল কি না, আজ তাহা কে বলিতে পারে? ইহার এবং উহার বিরহের মধ্যে প্রভেদ,—একটীতে কবি সরলভাবে প্রণয়পাত্রের নিকট আনু-গত্য স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছেন; অপরটীতেও কবি আত্মসমর্পণ করিতেছেন, প্রণয়পাত্রের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু এমনই ভাবে, যেন আত্মমর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রথমের কবি বলিতেছেন, 'ওগো, আমার প্রাণ ত তোমারই হাতে। আমায় রক্ষা কর,—তুমি আমারই হইয়া আমার জীবন রক্ষা কর।' দ্বিতীয়ের কবি আত্মবলিদানে অনিচ্ছুক, হৃদয়-সর্ব্বস্বের নিকট মাথা নত করিতে নারাজ, অথচ প্রেমের জ্বালায় মাথা নত না করিলে বিরহটা মাঠে মারা যায়। তাঁহার কথা, 'বড় জোর বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, আমার যাহা কিছু আছে, সকলই তোমাকে 'উইল' করিয়া দিয়া, বাউল সাজিয়া বরং বিরহের তপ্তশ্বাসে দহিব, তবু মরিব না, মরিব না।' তথাপি প্রথমটী খাঁটী টপ্পা, আর দ্বিতীয়টী একেবারেই পরমার্থসঙ্গীত! কেন? 'মাঝে মাঝে' কোনও কোনও ধর্ম্মমন্দিরে এই ভাবে টপ্পায় তত্ত্বকথা ভাবিতে গেলে তত্ত্বজ্ঞান শিকায় উঠে, মনের মধ্যে তত্ত্বের খিচুড়ী টগ্‌বগ্‌ করে। কবি প্রতি-ভার অবতার হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কল্পনার দাস। কবি যখন কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন ইন্দ্রিয়লালসা তাঁহার চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার না হইতেও পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া গীতিকবিতার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। গল্প-সাহিত্যের সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই বক্তব্য। কবি কোথাও নিজেকে নিধুর মত সহজেই ধরা দেন, কোথাও বা স্বয়ং অন্তরালে

বাহিরের কৌতুক দেখেন। কল্পনার রাজ্য সেই একই। যেখানে সেখানে তত্ত্বের দোহাই দিতে গেলে লোকে শুনিবে কেন?

'ঘরে বাইরে'র কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বে বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে সবুজ-পত্রের সম্পাদক মহাশয় এই উপন্যাসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও প্রতিধ্বনির বিরাম নাই। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথার উত্তর দিব? বিশেষতঃ যিনি 'ওগো, তোমরা কবিকে চেন নাই, আমরা চিনিয়াছি' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, সে রকম সাহিত্যরসিকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবুর মতে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে এত বড় একটা তত্ত্বকথা থাকিলে গ্রন্থখানিকে—তাহার অন্যান্য ত্রুটী সত্ত্বেও—বাঙ্গালী আমরা আমাদেরই ঘরের জিনিস বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারিতাম। তুলনায় এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্যকল্পনাই রূপক। রূপ হইতে রূপকের উৎপত্তি হইলেও, ভাবেও রূপকের স্থান আছে। কাচের সহিত মণির, বা রজ্জুর সহিত সর্পের, বা তুষারধবল গিরিশৃঙ্গের সহিত ধ্যানী মহাযোগীর যে সাদৃশ্যকল্পনা, তাহার উৎপত্তি রূপে, ভাবে নহে। কিন্তু যখন একটা মানুষের সহিত একটা দেশের সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, তখন উভয়ের সাদৃশ্য রূপের বাহিরে ভাবের গণ্ডীতে পড়ে। রূপেই হউক, আর ভাবেই হউক, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর তুলনা করা যায়, তাহাদের বস্তুগত, গুণগত, বা ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া সাদৃশ্য দেখাইতে না পারিলে রূপক হয় না, রূপকথা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের জলবায়ু বা গাছপালা বা কীট পতঙ্গ বা পাহাড় পর্ব্বতের সহিত অবশ্যই একটা মানুষের রূপগত সাদৃশ্য দেখান যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের সমষ্টিগত কর্ম্মজীবনের সহিত উপন্যাসের কোনও নায়কের কর্ম্মজীবনের সাদৃশ্য দেখাইলে যে ভাবগত রূপকের সৃষ্টি হয়, শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু সেই শ্রেণীর রূপকের কথা বলিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত নিখিলেশের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের, সন্দীপের সহিত নবীন ইউরোপের ও বিমলার সহিত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সাদৃশ্য আছে, বা নাই।

রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ সমাজধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মকে ছাড়িয়া বিশ্বধর্ম্মের দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়াছে। প্রাচীন ভারত আত্মপ্রীতির সহিত পরপ্রীতির

সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছিল। যে রকম সহিষ্ণুতা মানুষকে কর্ত্তব্যবিমুখ করে, নিখিলেশের মত জড়ভরত করে, প্রাচীন ভারত সে রকম সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্ব্বস্বময় করিয়া, সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্র নহে। প্রাচীন ভারত নিখিলেশের মত আত্মরক্ষায় অত্যধিক ঝোঁক দেয় নাই। প্রাচীন ভারত যে স্বজনরক্ষার মহিমা প্রচার করিয়াছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহারই ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যে দেশরক্ষার মন্ত্রের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই ভারতীয় আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর সন্দীপের চরিত্র। উহাতে ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার পূর্ণ রূপ ফুটে নাই। ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার সমদর্শনের অভাব আছে, জাগতিক প্রীতির সহিত দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য নাই। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিজের শ্রীবৃদ্ধি করিব, ইহাই ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার মূল মন্ত্র। বর্ত্তমানে জর্ম্মাণ জাতি অক্ষরে অক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় (Patriotism) স্বাদেশিকতাকে পৈশাচিক পাপ বলিয়াছেন। উৎকট স্বার্থের উত্তেজনা পাপ ত বটেই; কিন্তু স্বাদেশিকতায় ইউরোপ ইন্দ্রিয়লালসায় ছটফট করিতেছে বলিলে, ইউরোপের যথার্থ চিত্র আঁকা হয় না। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য অতি তীব্র বলিয়াই, ইউরোপের এত কালের জাতীয় সাধনা শুধু তাহাকে সন্দীপের মত কামোন্মত্ত করিয়াছে বলিলে, ইউরোপের প্রতি ত অবিচার করা হয়ই, অধিকন্তু যে স্বাদেশিকতায় ভারত আজ জাগিয়াছে, তাহারও প্রতি সুবিচার করা হয় না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমরা ইউরোপের যে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইতেছি, সন্দীপের মত ইন্দ্রিয়লালসায়—উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তির আঁস্তাকুড়ে—তাহার উদ্ভব অসম্ভব। যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পাপের কারণ আছে, ঔপন্যাসিক কি শুধু তাহার জঘন্য পাপের দিকটারই সৌন্দর্য্য দেখিবেন? যদি দেখেন, তবে আমরা বলিতে বাধ্য, সে ঔপন্যাসিক সত্যের পূর্ণ রূপ দেখেন নাই। তাহার পর বিমলা। এক দিকে কবিবরের চিত্রিত ঝুঁটা ইউরোপ, অপর দিকে কবিকল্পিত প্রাচীন ভারত, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ভারতের কুৎসিত মূর্ত্তি—ভোগবিলাসিনী ঐ বিমলা। ঘরমুখো বাঙ্গালীকে—যাহারা বিশ্বধর্ম্মের অপেক্ষা দেশধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে—ইউরোপ বা প্রাচীন ভারতের সহিত পরিচয়স্থাপন করিতে হইলে ইতিহাসের

পাতা উল্টাইতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতকে চিনিবার বহু সুযোগ তাহাদের আছে। বিমলাকে কামোন্মত্ত সন্দীপের গ্রাস হইতে কাড়িয়া লইয়া নিখিলেশের ক্রোড়ে বসাইতে পারিলে তাহাদের অনেকেই সুখী হইতে পারে, কিন্তু দেশ ও কাল বুঝিয়া তাহাদিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের লক্ষ্য যাহাই হউক, এবং যে দিকেই হউক, বর্ত্তমানে তাহার ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার দিন, স্নেহলতার মত নহে, সীতারই মত। বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মজীবন বিমলা-জীবনের মত মলিন নহে। 'বন্দে মাতরং' মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর বাণী আজ অসমুদ্রহিমাচল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দেশ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে নবীন ভারত জাগিয়াছে, বিরোধের মধ্যে মিলন চাহিতেছে, স্থির ভাবে বিশ্বরাজ্যে সে তাহার স্থান খুঁজিতেছে,—ফুলটা বিমলার মত নহে। নবীন ভারতের ভাব আরও ব্যাপক, কিন্তু পবিত্র।

ইহা ত গেল রূপকের ব্যাখ্যা, বা রূপকথা। কবিবর রবীন্দ্রনাথ মূক-মুখে ভাষা দিবার পক্ষপাতী হইলেও, এ তত্ত্বের প্রচারে অদ্যাপি মূক। তিনি তাঁহার কোনও রচনার উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না, বলেন—তিনি জাল বুনেন। সে কথা সত্য হইলে, সে জাল সফরীর আশ্রয় হইতে পারে, আমরা কদাচ সুখী হইতে পারি না। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ যে বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, আমরা তাঁহারই দান যোগ্য চাই।

রূপকের ভিত্তিতে 'ঘরে বাইরে' সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও, 'ঘরে বাইরে'র একটা উদ্দেশ্য আছে। 'ঘরে বাইরে'র উদ্দেশ্য—আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি—ব্যক্তিকে বিশ্বের দিকে টানিয়া আনা। ব্যক্তিও উপেক্ষার বস্তু নহে, বিশ্বও উপেক্ষার বস্তু নহে; কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্যক্তি তাহার সমাজধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে বিশ্বের বাজারে বিশ্বমানব হইবে? Individualismএর অর্থ Microcosm হয় হউক, ব্যক্তি তাহার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতে পারে, খুঁজুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সে তাহার পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারে না। ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যক্তির পূজা যদি দোষাই না হয়, তবে সমাজের পূজাও দোষাই হইতে পারে না; কারণ, ব্যক্তি ত সমাজেরই অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটী কথা মনে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার।" ব্যক্তি আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের ফলে গৃহে আলো জ্বালিতে

পারে, কিন্তু তাহাকে পরিবার, সমাজ ও দেশের যে ধাপগুলি বহিয়া উঠিতে নামিতে হইবে, সেই সিঁড়ি যদি অন্ধকার থাকে, তবে সে আলোর সার্থকতা কতটুকু? রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে আমরা ব্যক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই, বিকাশ দেখি না। বিমলার ও বিনোদিনীর চরিত্রে যদি ঔপন্যাসিক আমাদিগকে ব্যক্তির আত্মবিকাশ দেখাইবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালী অবশ্যই বলিবে, 'উহা আমার ঘরের ছবি নহে, উহা অনন্ত কাল বিলাতী ফ্রেমে বাঁধা থাকুক, আমি উহা চাহি না।' বিনোদিনীকে কুহুহৃদয়ে কাশীধামে পাঠাইয়া দিয়া, এবং বিমলাকে বাহিরের পাপ হইতে জোর করিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া যদি কবিবর ব্যক্তির আত্মবিকাশের একটা সোজা পথ বাহির করিয়া থাকেন, তবে 'বিকাশ' শব্দের অর্থের গোলে পড়িতে হয়। বিমলা বা বিনোদিনীর মত কেবল জন্মাধিকারে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম। এই মনুষ্যত্বলাভের জন্যই মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধীন হইয়া গীর্জ্জায় বা ব্রহ্মমন্দিরে, মসজিদে বা চণ্ডীমণ্ডপে যায়। ব্যর্থ-প্রণয়মূলক নভেল পড়িয়া মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব জানিতে পারা গেলে, ব্যক্তির আত্মবিকাশের বা আত্মোন্নতির পথ সরল হইলে, জগতে পাপ পুণ্যের মধ্যে ব্যবধান থাকে না; শ্লীলতার বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, ভোগবিলাসে, ইন্দ্রিয়ের সত্য উপভোগে ডুবিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিকাশের অর্থ যাহাই হউক, সাহিত্য যুগে যুগে আমাদিগকে আত্মোন্নতির পথ দেখাইতেছে; বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মানবজাতির হিতের জন্য কতই নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন; আর ঔপন্যাসিক তাহারই এক কণা সংগ্রহ করিয়াই 'সাহিত্যে যুগধর্ম্ম' ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইলে কাহার না হাসি পায়?

পরিশেষে, যাঁহারা ব্যক্তির নামে গলিয়া যান, আর সমাজের কথায় আগুন হন, তাঁহাদিগকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোষ এই —বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার

না করায় সব বৃথা হয়।' এ বিষয়ে যাঁহাদের মতভেদ নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য,—ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজের পূজা করা; যাহাতে সমাজশক্তি দুর্ব্বল না হয়, এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যের সেবা করা। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে জীবনের বিশ্লেষণ চাহেন, জীবনের সৃষ্টি চাহেন না। আবার পাপ-জীবনের বিশ্লেষণেই তাঁহার দক্ষতা অপার।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যাসপাতি ও নবন্যাস।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত।]

ফলে ন্যাসপাতি ও সাহিত্যে নবন্যাস, উভয়ই প্রায় একরূপ বলিয়া 'মালুম' হয়। অধিক দূর 'উপমেয় উপমান' টানিয়া একটা উদ্ভট কাণ্ড করিতে চাহি না, ন্যাসপাতি খাইয়া ও নবন্যাস পড়িয়া যাহা বোধ হয়, তাহাই বলিলাম। মিষ্টাম্ল, জলীয়, জ্বরের মুখে মুখ-রোচক, চিবাইতে ও চুষিতে ভাল;—ন্যাসপাতি চাটনীতে চলে। ন্যাসপাতি আহারকালে উপাদেয়, কিন্তু আসল আহার্য্য নয়; নিছক ন্যাসপাতি খাইয়া মানুষ বাঁচে না; নয় কাহণ ন্যাসপাতি চিবাইলেও ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না;—কেবল দাঁত টকিয়া যায়।

নবন্যাসে ন্যাসপাতির সব কয়টী গুণই বিদ্যমান;—মধুর, মোলায়েম, জলে ও অম্লে ভরা, নবন্যাস অধ্যয়নে উপাদেয়, কিন্তু আহার্য্য নয়; উহা মুখরোচক, আবার অম্ল-বিত্তর উত্তেজক! ন্যাসপাতি আহারের অপেক্ষা পানের অধিকতর মুখপ্রিয় 'পরম রমণীয়' চাট; নবন্যাসে "নিমকী গোছের" নেশা হয়। জ্বর-বেতার-জিহ্ব পীড়িত জনের নিকট ন্যাসপাতির নেহাত আদর; যৌবন-জোয়ারের তরন্ত গাঙ্গে ভাসন্ত তরী ও উড়ন্ত পাল্ যুবক যুবতীর কাছে, নবন্যাস "নির্ব্বাণ-মুক্তি"। ন্যাসপাতিতে রসের ন্যায় কষও আছে; নবন্যাসে "রস কষ" অবশ্য দুইই আছে। এদের উভয়েরই মধ্যে সার না থাকুক, শাঁস পর্য্যাপ্তপরিমাণেই আছে; কিন্তু সে শাঁস খাইবার নয়, চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেলিবার। শাঁস আছে, আঁসও আছে; কিন্তু আঁটি বড়-একটা নাই; যদি একটু থাকে, তাহা আঁসেরই একটা জটিল "জড়িবুটী"।

ন্যাসপাতি যখন একটা ফল, তখন অবশ্যই তাহার প্রয়োজন আছে;

নবন্যাস যখন সাহিত্যের অন্তর্গত, তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রয়োজনীয়। তবে, প্রয়োজন প্রয়োজন হইলেও, প্রয়োজনমাত্রেই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। ন্যাসপাতি নিত্য প্রয়োজনীয় নয়; উহার সাময়িক আবশ্যকতা। নবন্যাসেরও তাই। ন্যাসপাতি চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেল, কিন্তু গিলিও না। নবন্যাস পড়িবে, পড়; কিন্তু, তাহাতে পড়িও না। আত্মস্থ ও অনাসক্ত থাকিয়া উহা উপভোগ করিতে পার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ও আসক্ত হইলেই বিপন্ন হইবে। মুখপ্রিয় পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণ বড় বেশী। কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি অনিষ্ট ঘটায়। ন্যাসপাতির মুখ-প্রিয়তার মত নবন্যাসের মনোজ্ঞতা আছে, কিন্তু একের অতিরিক্ত আদরে যেমন উদর বিগড়ায়, অপরের অনিয়মিত অধ্যয়নে তেমনই মস্তিষ্ক মারা পড়ে।

নবন্যাসের নানারূপ ব্যাখ্যা। নবন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য নিশ্চয়ই উচ্চ দরের। কিন্তু ন্যাসপাতি প্রস্তুত করিতেও প্রকৃতি দেবীর প্রচুর শিল্প-নৈপুণ্য লাগিয়াছে। তবুও ন্যাসপাতি ন্যাসপাতি বই আর কিছুই নহে। নবন্যাসের বিশ্লেষক তাহাতে বিবিধ বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন; তাহার অণু পরমাণুর ভিতর হইতে এক একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিতে পারেন। নবন্যাসিক নিজে যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সমালোচক তাহা 'সবেজমীনে' খাড়া করিতে পারেন; এ সবই সত্য। এ সবই আবার শিল্প-নৈপুণ্য। শিল্পীর শিল্প, যে পক্ষেই হউক, সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবল শিল্প-নৈপুণ্যে আর তাহার প্রশংসায় প্রকৃত সংসার চলে না, জীবন-যুদ্ধোপযোগী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী শিক্ষা হওয়া সম্ভবে না।

হইতে পারে, নবন্যাস কোনও কালে পূর্ণতায় পঁহুছিবে; অথবা কোনও কোনও স্থলে প্রায় পঁহুছিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ নবন্যাস নিঙড়াইয়া, প্রধানকল্পে, কি পাওয়া যায়?

পাওয়া যায় রমণী-হৃদয়। রমণী-হৃদয় নিশ্চয়ই অতি উত্তম পদার্থ। কিন্তু কেবল হৃদয়ই রমণীর যথাসর্ব্বস্ব নয়। পরন্তু নবন্যাসে অখণ্ডভাবে রমণী-হৃদয়ের সবখানিও পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কেবল সেই অংশটী, যে অংশটী নিয়া প্রেম করিতে হয়। রমণী-হৃদয়ের এই অংশ নবন্যাসের অধিনায়ক, উপপাদ্য ও একান্ত বিষয়ীভূত। তা এখনকার ইংরেজী বা ফরাসী নবেলই হউক, আর বাঙ্গালা নবন্যাসই হউক। রোমান্টিক বা রিয়ালিষ্টিক নবেলই হউক। মনোবিজ্ঞানের যতই বড়াই কর, আর মানব-প্রকৃতি-বাদের

যতই লড়াই কর,—তোমার অসীম লম্বাই চৌড়াই ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও উহা প্রেমের অভিনয় বই আর কিছুই নয়। আর সেই পিরীতই বা কি? প্রণয়, প্রেম, পরশমণি, ভালবাসা;—পূত, পবিত্র, উচ্চ, উত্তম। কিন্তু তাহাকে যত উচ্চেই উঠাও, আর তাহাতে যত পবিত্রতাই মিশাও,—তাহা সর্ব্বথা শারীরিক,—শরীরের সহিত মনের যতটা সম্বন্ধ, তাহা (উপন্যাস কর্ত্তা কুষ্ট হইলে) সেই পরিমাণে মানসিক; তাহা মোটের উপর যুবক যুবতীর দৈহিক সম্বন্ধের স্বপ্ন, সোপান, সাধ, সোহাগ, বা আকাঙ্ক্ষা, এবং উত্তেজনা;—তাহা পরেও নহে,—পরিণয়ের পূর্ব্বেই প্রেম করা। কিন্তু কেবল প্রেম ও পরিণয়ে মনুষ্য-জীবনের সব লেঠা চুকিয়া যায় না; লেঠা সবে আরম্ভ হয়। অথচ নবন্যাসের কথা সেইখানেই শেষ। প্রথমতঃ, প্রণয়; তাহার পর পরিণয়; বস! নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত প্রকৃত জীবনে আরও অসংখ্য ব্যাপার আছে, তাহা নবেলিষ্টের নিকট অতি সাধারণ, অতএব উপেক্ষিত। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ব্রত, নিয়ম, বিনয়, নম্রতা, দৃঢ়তা, দয়া দাক্ষিণ্য, সম্ভ্রম-জ্ঞান, এ সবই নবন্যাসিকের হিসাবে, রমণী-জীবনে অতি তুচ্ছ, সাধারণ; সুতরাং সহজসাধ্য, তৃণাপেক্ষাও লঘু! নবেলী নায়ক নায়িকার যাহা কিছু কঠোর কর্ত্তব্য ও জীবনের কার্য্য, তাহা ভালবাসা (Sexual love) ও তাহার আনুষঙ্গিক ভাব, আর ভাবুকতা। বিদেশীয়, বিজাতীয় ও বীভৎস ভাবে ভোর হইয়া, দু' দশ বার, "হরিবোল" দিলে, বা "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিলেই, কিস্তিমাৎ। কোনও কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। নবেল হিন্দুপন্থী! ঔপন্যাসিক আর্য্যভাবে ভোরপুর! আমরা এ আর্য্যামীকে অবজ্ঞা করি। এরূপ হুজুগে হিঁদুয়ানী আমরা চাই না। ইহা প্রবঞ্চনার নামান্তর, নহে ত খাঁটী প্রবঞ্চনা। কিন্তু ইহাও তবু আধুনিক নবন্যাসের নির্ম্মল ও উৎকৃষ্ট অংশ। অধিকতর অপকৃষ্ট অংশের কথা আজ আর কিছু বলিলাম না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা।—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। সর্ব্বপ্রথমে 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র একাদশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণ। হীরেন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে অনেক কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনা বাঙ্গালীর অবশ্যকর্ত্তব্য। হীরেন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য—'প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে

—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভগ্ন হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, রাণাডে, গুরুদাস, ভাণ্ডারকর, প্রফুল্লচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিপাদ্যের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মক্ষিকের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বালম্ব বলিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প, নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান।' ইহার আনুষঙ্গিক আর একটা বড় কথা আছে। বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন বা সাধন করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না; বাঙ্গালীর 'ভাব'কেও আমাদের শিক্ষার 'লক্ষ্য'—সাধনার বস্তু না করিলে, শিক্ষা এ দেশে কখনও মানুষ গড়িতে পারিবে না। শুধু 'শিক্ষা' নয়, ছাত্রজীবনে শিক্ষিত বিষয়ের 'অনুশীলন' চাই। পৃথিবীর যে সকল দেশ মানুষ গড়িয়াছে, এবং গড়িতেছে, তাহারা শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হয় না, ছাত্রের জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যাহাতে মুদ্রিত হইয়া যায়, অনুশীলনে দেশাত্মবোধ যাহাতে জাতির উত্তরপুরুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। আমরা বুঝি, জাতীয় ভাষায় জাতীয় ভাবের সাধনাই জাতীয় শিক্ষা। বিদেশী ভাষায় বন্ধ্যা শিক্ষার প্রভাব-বিস্তার জাতীয় কল্যাণের কারণ হইতে পারে না।—এ দেশে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় এই যে, যাঁহারা শিক্ষার নায়ক, এবং যাঁহারা শিক্ষার ফলভাগী, তাঁহাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য নাই। পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—স্বাধীনতার বরপুত্রের সৃষ্টি। এ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি গোলামীর বরপুত্র সৃষ্টি করিতেছে। সত্য, সাহস, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, জাতির কল্যাণে আত্মবিসর্জ্জনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশী ভাবে, তত্ত্বে, অবদানে শ্রদ্ধা, জাতির স্বার্থেই আত্মবুদ্ধি, আধুনিক শিক্ষিতে দেখিতে পাই না। ইহার কারণ, আমাদের তোতাপাখীরা রাম-নাম শিখিবারও অবকাশ পায় না, রামদেব নাম মুখস্থ করিয়াই ডিপ্লোমা পায়। যাহা আমাদের জাতীয় কল্যাণের সাধন হইতে পারে, তাহাই আমাদের শিক্ষা-বিভাগের পক্ষে বিভীষিকার বস্তু। এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে যাহা হইবার, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।—'শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী' হীরেন্দ্র-

নাথের পূর্ব্ব-কথিত প্রতিপাদ্যের পরিশিষ্ট।—'আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আগমপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন।' কিন্তু বিদেশীর ভাবধারা ও চিন্তাস্রোতই যে জাতির জীবনের অবলম্বন, তাহাদের সমাজে 'ঐরূপ শক্তিধরে'র উদ্ভব—'নিয়মের ব্যতিক্রম' সম্ভব হইতে পারে, স্বাভাবিক নিয়মে এমন ও আশা করা যায় না।—হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণে শিক্ষাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহা অবশ্য অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্য অত্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ ভাষার কথাও কহিয়াছেন, কিন্তু তাহা এক বিন্দু। আমাদের সাহিত্যে কামের—দুর্ব্বল, রুগ্ন, কুৎসিত কামের ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ হইতেছে। কামায়নে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে। নীতি মুমূর্ষু। সদাচার পৈশাচিক তাণ্ডবে পিষ্ট। লালসা ও রিরংসার দৃষ্টিই 'আর্ট' হইয়া উঠিয়াছে। যিনি এই নূতন পূজার বড় যজমান, যিনি তাঁহার 'নারায়ণে'র মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনে রতি ও মদনের যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের আঁস্তাকুড় ঘাঁটিয়া পুরোহিত খুঁজিয়া আনিতেছেন, এবং 'ঘনপিশিতপিণ্ড' ও 'সাসব-চষক'-তুল্য 'লালারিস্র মুখে' ঠাকুর-ঠাকরুণের জন্য তথাকথিত 'আর্টে'র নৈবেদ্য রচনা করাইতেছেন, সেই চিত্তরঞ্জন যে সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সেই সম্মিলনের সভাপতি বেদান্ত-রত্ন হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে সাহিত্যের এই ভীষণ, ভয়াবহ, কুৎসিত কুষ্ঠের কথা তুলিলেন না! ইহা যে সাহিত্য-বিগ্রহের গলিত কুষ্ঠ, 'আর্টে'র 'ক্যান্সার', বাস্তবের রক্তদুষ্টি, তাহা নব-ভাবের ভাবুক, জাতীয়তার সাধক, সাহিত্যের পথভ্রান্ত পথিক চিত্তরঞ্জনকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না? যে কামের কলুষ-বন্যায় বঙ্গ-সাহিত্য ডুবু-ডুবু, বাঙ্গালা ভেসে যায়, তাহাও বেদান্তরত্নের দার্শনিক-দৃষ্টি অতিক্রম করিল! সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের অভিভাষণ শুধু 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'র প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ইহা দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাচ্য, দুঃসহও বটে। মনে পড়ে, শশাঙ্কমোহন যখন কবিবর নবীনচন্দ্রের কলিকাতার আবাসে, কবিবরের সহধর্ম্মিণীর 'ধবলবহলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টি'র স্নেহকিরণে দীপ্ত হইয়া তাঁহার কিশোরের উচ্ছ্বাস 'সিন্ধুসঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইতেন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ!' সেই কিশোর কবি পাকিয়া শুকাইয়া এমন 'ঝুনো' হইয়াছেন যে, তাঁহার গদ্য অভিভাষণেও দন্তস্ফুট করিবার যো নাই! শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী কবিতায় 'নবজীবন ভিক্ষা' করিয়াছেন। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' আমাদের দেশে পুরাতন গান গাহিয়া ভিক্ষা করিবার প্রথা আছে। ভিক্ষার এই নূতন গান শুনিয়া মনে হইতেছে, সে পদ্ধতিই প্রশস্ত! ইনি উপসংহারে খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিয়াছেন,—'ওগো নবীন জীবন লইতে মাগিয়া ওগো এসেছি।' 'মাগিয়া' কেন, 'কাড়িয়া' বলিলেই সঙ্গত হইত! এক কুড়ী 'ওগো'ই ইঁহার কবিতার প্রধান সম্বল। শ্রীআবদুল কালাম মোহম্মদ শামসুদ্দীনের 'বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'আমার বাংলা' কবিবর গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। ইহাতে কবিত্ব অল্প, কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। সে হিসাবে ইহা সার্থক হইয়াছে। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'মনসা-মঙ্গল' ও পৌরাণিক মনসা' সুলিখিত, সুচিন্তিত সন্দর্ভ। শ্রীকেদারনাথ সেনের 'ইউরোপে বেদান্তের

প্রতিকার' প্রবন্ধে লিয়োনার্দোর সমৃদ্ধি আছে, বস্তুতঃ প্রতীচ্য সেবাধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। চিকিৎসাই প্রতীচীর একমাত্র সেবাধর্ম্ম নহে।

উদ্বোধন। জ্যৈষ্ঠ। স্বামী বিবেকানন্দের 'সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ' স্বামীজীর The Ideal of a Universal Religion' নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতার অনুবাদ—ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। 'আমি এমন একটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মানসিক অবস্থার লোকের উপযোগী হইবে—ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম সমভাবে থাকিবে।' এই মত-সংঘর্ষের যুগে স্বামীজীর আর একটি উক্তি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়,— 'আমরা যেমন স্বভাবতঃই একত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেইরূপ আমাদিগকে বৈষম্যও স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকৃত সত্য। * * * প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্ম, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেই, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যত প্রকার সত্যের উপলব্ধি করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া আর কিছুই নহে।' ইহারই সহজ অনুবাদ—'যত মত, তত পথ।' কালিদাসও তাই বলিয়াছেন, 'ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে।' আমার অনুভূত সত্যই সত্য, আর সব মিথ্যা, এই বুদ্ধিই ভেদের সৃষ্টি করে। স্বামীজীর উপদিষ্ট ভিত্তির উপর পরমত-সহিষ্ণুতা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতের ধর্ম্মভাবের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব। স্বামী অভূতানন্দের 'ঈশ্বর-চৈতন্ত ও জীব-চৈতন্ত' এবং স্বামী বাসুদেবানন্দের 'ভারতের শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য সুচিন্তিত নিবন্ধ। শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্তের 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায়' আলোচনার যোগ্য। আমাদের মনে হয়, গেটে যেমন সেক্সপীয়রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে কোনও প্রতিভাশালী, শক্তিধর, সৌভাগ্যবান সমালোচক গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালীকে—হয় ত বিশ্বমানবকে বুঝাইয়া দিবেন। উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা উচ্চ স্তরের শক্তিশালী সমালোচকের অপেক্ষা করে। সাময়িক কুহেলিকা কোনও মহাকবিকে বুঝিবার চিরন্তন অন্তরায় হইতে পারে না। সমালোচনার—ব্যাখ্যার রশ্মিপাতে সে কুহেলিকার তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। তবে তাহা কালসাপেক্ষ হইতে পারে।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'সাহারা রাগ' ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না। বঙ্গদেশের সাহারাই জাতির গান হউক, সাহানার মায়া ভুলিয়া যাও। 'বক্তব্য' জাতির জীবনের উপযোগী, কিন্তু রচনা ভাবের অনুরূপ হয় নাই। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্প ও শিল্পী' প্রবন্ধে অনেক তথ্যের সমাবেশ আছে। অবনীন্দ্র বাবুর মত এই যে, শিল্প ও শিল্পী, উভয়েই স্বাধীন; 'চারি দিকে কুসুম অবয়দণ্ডী, তারই ফাঁকে ফাঁকে সে [শিল্পী] মনোরাজ্যের খেয়াখরে এক একবার সাথীর সঙ্গে খেলে নিচ্ছে—গণ্ডির মধ্যে গণ্ডিছাড়া খেলা।' তথাস্তু! কিন্তু anatomy, perspective প্রভৃতি এই 'গণ্ডির মধ্যে গণ্ডিছাড়া খেলা'তেও প্রচুরপরিমাণে না দেখা যায়, এমন নহে। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদশাজাদী'

পড়িয়া মনে হইল, মানুষের ঘাড়ে যেমন খুব চড়ে, তেমনই কবিতাও 'চড়ে'। চমৎকার শব্দ-চয়ন, খুব অনুপ্রাসের ঘটা, কিন্তু কৃত্রিমতার সবই আড়ষ্ট বলিয়া মনে হয়। 'রূপসী' ছন্দের খাতিরে 'রূপ্‌সী' হইয়াছে। ভবিষ্যতে 'রূপ্‌সী'ও হইতে পারে। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।' গুরু-চণ্ডালীর ভেজালেই আজকাল কবি-প্রতিভার ওজন করিতে হয়। সে হিসাবে 'বাদশাজাদী' বেশ দরে ভারী। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ের সম্মান' কবিতার রচিত গল্প। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনে-মনে' চলনসই সুদীর্ঘ গল্প। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অকর্ম্ম' অকর্ম্মই বটে। একই রীতি যে সকলের অনুসরণীয় হইতে পারে না, নবীন কবিরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন ছন্দে নূতন ধরণে যে পদ্য-গল্প লিখিতেছেন, তাহাকে ভ্যাঙ্‌-চাইবার জন্য নিশ্চয়ই অনুকারীর পল্টন কলম শানাইতেছে। 'চল্‌তী ভাষা' ও 'বাঁকা ছন্দে'র অনুকরণ ইতিমধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বপ্নসুন্দরী' চমৎকার প্রহেলিকা। ভাষা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সেই ভাষার ঠোঙ্গায় সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাব ফেরী করিতেছেন, তাহা বোধ হয় 'পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে লাগে ধন্দ!' 'চাঁদ-চামরের চুম' কি বল দেখি? ইন্দ্রনাথ 'বঁটাইয়া' দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাকেও 'কুড়ুলিয়া' দিয়াছেন। যথা, 'সব "শীতলে" দিল চুম্ দিয়ে!'

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীবরদানন্দীর অঙ্কিত 'বাসক-সজ্জা'। সুন্দরীর ছবি। 'ভারতীয় চিত্রকলা'র নমুনা নহে। অথবা তাহা সঙ্গতির পথে বিবর্ত্তিত হইতেছে। হয় ত পায়ের অঙ্গুলি নিখুঁত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে 'প্রাচীন ভারতী চিত্রকলা'র চিরকেলে চক্ষুঃশূল 'anatomy'র প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাহার ফলে চিত্রখানি 'ভারতীয়' হইলেও, outlandish হয় নাই। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যের 'ঘাস তাজা রাখিবার উপায়' গৃহস্থের উপকারে লাগিবে। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চষা' সুখপাঠ্য। শ্রীসুকুমার রায়ের 'নৈবেদ্য নেয়ম্' সুপথ্য, বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভাটনেয়ার বৃক্ষ' ঠাকদি চোলাবৎ চারণের অনুবাদ। শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'দিদির দুঃখে' বিশেষত্ব নাই। চারুর 'দেশের কথা' বেশ হইয়াছে। সকল দেশের লোক দেশের সংবাদ রাখে, কেবল আমরাই বড় বড় খবরের কারবার করি, দেশের খবর রাখি না। 'প্রবাসী' 'দেশের কথা'য়, 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেশবাসীকে দেশের কথায় অভ্যস্ত করিতেছেন। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'ই জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র শ্রেষ্ঠ রচনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার। জ্যৈষ্ঠ। 'গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যরক্ষা' সময়োচিত উপদেশ। আমাদের 'ঋতুচর্য্যা'র সহিত তুলনা করিলে আরও ভাল হইত। শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্যের 'বাসক বা বাকস' আরও সুসম্পূর্ণ হইতে পারিত। 'মানব-দেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য' চলিতেছে। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'স্বাস্থ্য ও বয়োদয়' এ মাসের 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এরূপ প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত হইলে সাধারণের অধিকতর উপকার হইতে পারে। 'হৃদ্‌রোগ ও তাহার গৃহচিকিৎসা'য় 'ভগ্ন-হৃদয়ে'রা উপকৃত হইবেন। জ্ঞানের অভাবেই আমরা অনেক সময়ে অনিচ্ছায় অপথে যাই, এবং কষ্ট পাই। এইরূপ

প্রবন্ধে সাধারণে পথ চিনিতে পারে। 'স্বাস্থ্য-সমাচার' আমাদিগকে নানা তথ্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতেছে।—'স্বাস্থ্য-সমাচার' কবে বাঙ্গালার প্রত্যেক পল্লীতে প্রবেশ করিবে?

সৌরভ। জ্যৈষ্ঠ।—ঢাকার 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'অভিভাষণ' সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সারগর্ভ। মল্লিক মহাশয়ের বাঙ্গালা রচনা আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই।—তাঁহার বিবৃতির সার্থকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অল্প পরিসরে মল্লিক মহাশয় বাঙ্গালীকে অনেক তত্ত্বের ও তথ্যের পরিচয় দিয়াছেন, অনেক বিষয় বুঝাইয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—'যদি পর্য্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার সমাবেশই বিজ্ঞানতত্ত্বের প্রধান সহায় হয়, ভারতবাসীর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের ভগবান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে, এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। অনেক দিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৃত্তি অনেক সময়ে বৃথা ব্যাপারে নিয়োজিত হইতেছে। * * এই বুদ্ধিচালন নিয়মিত করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে আগুয়ান হইতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বিজ্ঞান-জগতে আমাদের স্থান অধিকার করিতে পারিব। জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব।' তাঁহার আশা সফল হউক।

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য।

যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সে দেশ পৃথিবীর সভ্যজাতির সমক্ষে একরূপ নগণ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস আছে—কিন্তু, তাহা "লিখিত" ইতিহাস নহে। কতকটা উপাদানের অপ্রচুরতায়, কতকটা অনুসন্ধিৎসু উপাদান-সংগ্রহকারীর স্বল্পসংখ্যকতায়, আর কতকটা উপযুক্ত উপাদান-ব্যাখ্যাতার একরূপ অভাবে, তাহা এ যাবৎ সম্যগ্‌ভাবে লিখিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। প্রায় শতাধিক বৎসর হইতে চলিল—ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে—কিন্তু, অদ্যাবধি ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই—হইতে পারে নাই। কেবল সম্প্রতি ঐতিহাসিক চিত্রের রেখাপাত হইতে পারিয়াছে—কবে যে সেই চিত্র সম্পূর্ণ হইবে বা হইতে পারিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। তবে বিধাতার অনুগ্রহ ভরসা করিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। নিজকে, জাতিকে, দেশকে সম্যক্ চিনিতে আরম্ভ করিতে হইলে এ যাবদ্ লব্ধ উপাদানের সাহায্যেই সম্প্রতি ইতিহাস রচনা করিয়া তাহার বিস্তার করিতে হইবে, আবার ক্রমে ক্রমে নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তদনুযায়ী পরিবর্ত্তনাদির বিধান করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার উপাদান সংগৃহীত হইলে ইতিহাস-রচনার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, এরূপ মনে না করিয়া, দেশের লুপ্ত ইতিহাসের প্রারব্ধ উদ্ধারচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চালাইতে হইবে। স্বদেশের ইতিহাস না জানিলে কাহারও উচ্চ শিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ব্যবস্থা আছে যে, প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হয়। আমরা বঙ্গবাসী—মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বের সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেই আমরা কে কতটা জানি বা জানিবার ইচ্ছা করি? ইহা আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল বিদেশীয়

মনীষী আমাদের পথ-প্রদর্শক রূপে উপাদান-সংগ্রহে প্রথমতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। বিগত এক শতাব্দীর চেষ্টায় যে সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তদবলম্বনে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যে যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—সংখ্যায় তাহা নিতান্ত কম হইলেও—সে সকলের উপর নির্ভর করিয়াই, দেশে পুরাতত্ত্ব পাঠের কুতূহল অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও জ্ঞান" ("Ancient Indian History and Culture") সম্বন্ধে এম্. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আশা করি, বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ দলে দলে অগ্রসর হইয়া ভারতের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য, এই বিষয়ে এম্. এ. পড়িতে যাইবেন। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

যে দেশের "লিখিত" ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কলন-ব্যাপারে প্রাচীন লেখের সর্ব্ববিধ চর্চ্চার প্রয়োজন যে কত অধিক, তাহা সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে বলা বাহুল্য। তবে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সভাসমিতিতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার-কার্য্যে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহায়তার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা পাওয়া কঠিন হইবে—এই জন্য তাহার বিবরণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সম্বন্ধে একটি দোষের বা কলঙ্কের কথা কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—তাহা এই যে, বিচার-তর্ক-বহুল ইতিহাস লিখিবার শক্তি বা প্রতিভা তাঁহাদের ছিল না, অর্থাৎ তাঁহাদের "Critical historical sense" এর অভাব ছিল। কিন্তু এই অখ্যাতি বিচারসহ কি না, তাহা বিবেচ্য। যাঁহারা বহু-বিচার-পরিপূর্ণ দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যাদি-সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্বাসীকে বিস্ময়াপ্লুত করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের ঐতিহাসিক প্রতিভা ছিল না—ইহা সকলে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। কিন্তু, কি অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা স্বদেশে সংঘটিত নানা ঘটনাবলীর ধারাবাহিক-বর্ণনাত্মক তথাকথিত ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই, তাহা বলা কঠিন।

পুরাণ-গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন যুগের রাজবংশের ও শাসনকারী রাজবৃন্দের পারম্পর্য্য লিখিত পাওয়া যায় সত্য, কবি কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন সত্য, সত্য বটে মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিত

নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং 'মহাবংশ' 'দ্বীপবংশ' ও বৌদ্ধ অবদানাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ পাওয়া গিয়াছে সত্য,—কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যাহাকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস বলা যায়, এইগুলি সেরূপ ইতিহাস-গ্রন্থ নহে। প্রাচীন ভারতে কোনও হেরোডোটস্ বা থিউসিডাইটস্, লিভি বা ট্যাসিটস্ ছিলেন না বলা যাইতে পারে। কাযেই "লিখিত" ইতিহাস না পাইবারই কথা, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে ইতিহাস-উদ্ধারের নানা প্রকার উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব নাই। যত প্রকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধান ভাবে গৃহীত হইতে পারে—প্রথমতঃ, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনগণের প্রাচীন সাহিত্য, দ্বিতীয়তঃ, পাষাণে ও ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ লিপিমালা, প্রাচীন মুদ্রা ও মোহর, এবং তৃতীয়তঃ, গ্রীশ্, রোম ও চীন প্রভৃতি দেশের পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। উত্তর কালে আবিষ্কৃত প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও যে ইতিহাসের উপাদান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ও প্রাদেশিক সভাসমিতি ও অনুসন্ধান-সমিতি-সমূহের চেষ্টায় উত্তরোত্তর উপরি-উল্লিখিত সর্ব্ব প্রকার উপাদানের ও নিদর্শনের সংগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তাঁহাদের অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ উত্তরাপথে ন্যূনকল্পে দুই সহস্র ও দক্ষিণাপথে দশ সহস্র প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও প্রাচীন যবন বা গ্রীক্‌জাতীয়গণের শাসিত এশিয়া মাইনর আসাইরিয়া,মিশর প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত অনেক প্রাচীন লিপি ভারতীয় প্রাচীন লিপির বহু পূর্ব্বে রচিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকে—তথাপি আমাদের নিকট ভারতীয় প্রাচীন লেখমালার মূল্য প্রতীচ্য দেশের লেখমালার মূল্য হইতে অনেক অধিক ; কারণ, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্যগ্‌ভাবে লিখিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদানই হইবে এই সকল প্রস্তর ও ধাতুপট্টে ও প্রাচীন মুদ্রায় ক্ষোদিত লিপিমালা। তাই পাষাণপন্থিগণ এই সকল পাষাণ আশ্রয় করিয়া কার্য্যে ব্রতী আছেন। নিপুণভাবে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকসমাজের দৈনন্দিন অবস্থা, সেই সময় প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি, লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বিষয়ের আভাস পাওয়া গেলেও, তাহাতে রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বড় একটা উল্লেখ লক্ষিত হয় না। পৌরাণিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে রাজবংশের ও রাজনামের পর্য্যায় বা তালিকা পাওয়া গেলেও—তৎপাঠে তাঁহাদের রাজত্বকালের পরিমাণ ও রাজত্বের পারম্পর্য্য বিশুদ্ধভাবে জানা

যায় না। অনেক সময় তাহাতে সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে পূর্ব্বাপর করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রকার দোষ সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীন লিপির সাহায্যে দূরীভূত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের ইতিহাস, অনেক কাল পর্য্যন্ত উপাদান ও নিদর্শনের আবিষ্কারের অভাবে, ঘোর-তমসাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু গিরিগাত্রে ও পাষাণময় ও ধাতুময় স্তম্ভে, এবং তাম্রাদি ধাতু ফলকে অশোকাদি সম্রাটের অনুশাসন লিপি প্রভৃতির আবিষ্কারের পরে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-কার্য্যে মনীষিগণ ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের প্রধান অতীত ঘটনার, অর্থাৎ চাণক্যমতি-পরিগৃহীত মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়া পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান-কার্য্য অধিকতর সুকর করিয়া দিয়াছে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের ত্রয়োদশ শিলা-লিপি পাঠে, ভারত সম্রাটের সমসাময়িক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, মেশিডোন ও এপিরাস এই পঞ্চ দেশের "যবন রাজগণে"র নাম জানিতে পারায়, গ্রীশ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে এই রাজগণের সমসাময়িক মৌর্য্যনরপতি অশোকেরও রাজত্ব কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন মালবদেশের দশপুরে আবিষ্কৃত শিলালিপির সাহায্যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন লিপির সাহায্যেই বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, চেদিসংবৎ, হর্ষসংবৎ প্রভৃতি অব্দ ও সংবতের কালনির্ণয় হইয়াছে। ইহা ত অল্প কথা। ভারতের, প্রাচীন শিল্পকলা, বাস্তুবিদ্যা, সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহিত্যের প্রাচীনতা, ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ-নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রাচীন লেখমালা সহায়তা প্রদান করে।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন লেখসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ কয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহাতে উল্লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে ভারতীয় লোক-ইতিহাস-রচনায় ও রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য-নির্দ্দেশে কতদূর সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করা যাউক। কতকগুলি লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অতীত ঘটনার অবিমিশ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে গৌণ ভাবে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা অন্য কোনও দানাদি-সৎক্রিয়াসম্বন্ধীয় কোনও কথা উল্লিখিত নাই তাহাও নহে। কিন্তু তাহা লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উদাহরণরূপে এই প্রকার কয়েকটি প্রধান লিপির উল্লেখ করা হইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগের কলিঙ্গাধিপতি

মহারাজ শ্রীখারবেলের উদয়গিরিতে হাতিগুম্ফার প্রস্তর লিপিতে কলিঙ্গরাজ তাঁহার রাজত্বের প্রথম ত্রয়োদশ বর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কলিঙ্গের প্রজাগণের হিতার্থে এই জৈন নরপতি কি কি কল্যাণকর কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন—তিনি কত বার উত্তরাপথে বিজয়-অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—দক্ষিণাপথের আন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল—ইত্যাদি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখই এই প্রাকৃত-ভাষায় রচিত গুহা-লিপির উদ্দেশ্য। মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের প্রয়াগ স্তম্ভে উৎকীর্ণ অগুপ্ত-গুণরাশি গুপ্ত-সম্রাট্ ভারতীয় নেপোলিয়ন চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের বিজয় প্রশস্তিকে আমরা এই শ্রেণীর লেখমালার মধ্যে গণনা করিতে পারি। গুপ্ত সম্রাটের প্রধান প্রধান বিজয়ের কথা ভবিষ্যদ্ বংশীয়গণের স্মরণ-পথ হইতে অপসৃত না হয়, এই জন্য সেই সমস্ত অবদান-কথা এই পাষাণ-প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গুপ্তরাজবংশের রাজনাম-তালিকা, উত্তরাপথের কোন্ কোন্ দেশে সম্রাটের বিজয়-নিশান উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম, কোন্ কোন্ প্রত্যন্ত নৃপতির সহিত গুপ্তরাজের কিরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল তাহাদের নাম, এবং দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক অবস্থা ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিষয়ের নানা তথ্য এই প্রস্তরলিপি পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। এই সংস্কৃত-লিপির রচয়িতা মহাকবি হরিষেণের রচনা-পটুতা পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে অলঙ্কারের প্রভাব কতটা বর্ত্তমান ছিল, এবং সংস্কৃত-গদ্য-রচনা তখনই কতদূর উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণও এই প্রশস্তি হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ যেন অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপনাকালে এই প্রাচীন লেখের মূল্য বিস্মৃত না হন। শিবের পাদ-পঙ্কজ ব্যতীত যিনি কখনও মানুষের পাদপ্রান্তে মস্তক অবনত করেন নাই বলিয়া দর্পিত ছিলেন, হূণাধিপতি সেই মিহিরকুলের গর্ব্ব যিনি খর্ব্ব করিয়াছিলেন, সেই নরপতি যশোধর্ম্মের মন্দোসর বা দশপুরের বিজয়স্তম্ভ-যুগলও এই শ্রেণীর লিপির অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের উপকারার্থ রাজার, রাজপুরুষের বা অন্য কোনও কারুণিক ব্যক্তির কার্য্যাবলী যে সব লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকেও এই শ্রেণীতে আনা যাইতে পারে, যথা সুরাষ্ট্রের সুদর্শন-হ্রদের সেতুসংস্কার-সম্বন্ধে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের

গির্ণার-প্রস্তর-লিপি। দেবমন্দিরের নিকট পুষ্করিণী-খনন, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্গগত রাজার সমাধি-নির্ম্মাণ, পথিমধ্যে পথিকের আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্তির সুবিধার জন্য বড় বড় যানপথের সঙ্গমস্থলে ভাণ্ডার-গৃহ-স্থাপন, দুই রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ, রাজপত্নীর স্বর্গগত পতির শ্মশানাগ্নিতে তনুত্যাগ, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, রাজ্যের রক্ষণ ও আক্রমণসম্বন্ধে রাজনৈতিক সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি নানা বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া বহু বহু লেখ রচিত হইয়াছিল। এই ত গেল পার্থিব বা ঐহিক উপকারবিষয়ক কতকগুলি লিপির কথা। এখন আর এক শ্রেণীর লিপির উল্লেখ করা যাইতেছে—ইহা অপার্থিব বা পারমার্থিক বা পারলৌকিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পার্থিব-বিষয়ক লিপির সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রণোদনে ধর্ম্মার্থদানাদির নিদর্শনরূপে রচিত লিপির সংখ্যাই অধিক। এই শ্রেণীর অন্তর্গত লিপির মধ্যে মৌর্য্যরাজ অশোকের ধর্ম্মলিপিই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ব-পর-রাজ্যে ধর্ম্মলিপির প্রচার করিয়া তিনি ধর্ম্মের অনুশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মমহামাত্র-নামে ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া প্রজাবর্গের চরিত্র-নীতির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উত্তরে গান্ধার—দক্ষিণে মহীশূর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, পশ্চিমে সুরাষ্ট্র, এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভারতবর্ষে তিনি যে ধর্ম্মোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রজাবর্গের ঐহিক ও পারত্রিক হিতসুখ লক্ষ্য করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে; তাঁহার "ধর্ম্মবিজয়ের" প্রভাব সুদূর গ্রীক্ বা যবনগণের রাজ্যমধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। "অংতিয়োক" (Antiochus II of Syria), "তুরময়" (Ptolemy Philadelphus of Egypt), "অংতিকিনি" (Antigonus of Macedonia), "মক" (Magas of Cyrene) ও "অলিকসুন্দর" (Alexander of Epirus) এই পঞ্চ যবনরাজের রাজ্যে অশোকের ধর্ম্মদূত-গণ যাইয়া ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিতেন। আর ভারতের অতি দক্ষিণের চোর-চের-পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া তাম্রপর্ণী বা সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মযাজকগণ "সদ্ধর্ম্মের" প্রচার করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধের আভাস এই সকল প্রস্তর-লিপির সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি নূতন লিপির আবিষ্কারের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। এসিয়া মাইনরে প্রাপ্ত মিটরিয়রাজবংশের একখানি অতি প্রাচীন লেখ হইতে

জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৩৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে, এই সুদূর পশ্চিমের হিটাইট জাতীয় রাজগণ যে আর্য্যনামধারী ছিলেন, কেবল তাহা নহে—পরন্তু তাঁহারা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-বরুণ-মিত্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজাও করিতেন। বৈদিক আর্য্যগণের সঙ্গে সে কালের এসিয়া মাইনরের এই মিটন্নিরাজবংশের রাজগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সম্প্রতি পরিষ্কাররূপে না জানিতে পারা গেলেও এরূপ আশা করা যায় যে, এই পশ্চিম প্রদেশে যে সমস্ত স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তথায় প্রাচীন-লেখাদি প্রত্নতত্ত্বের উপাদান ভবিষ্যতে অনেক আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। মনীষিগণ বিশ্বাস করেন যে, উপযুক্ত অনুসন্ধান-চেষ্টায় পুরাতত্ত্বের এই উর্ব্বর ক্ষেত্র যখন ফলপ্রসূ হইতে থাকিবে, তখন প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের পূর্ব্বসম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত অশোক অনুশাসনের কোনও স্থানেই সম্রাট নিজের নাম অশোক-রূপে প্রকাশ করেন নাই—তিনি নিজকে "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" বলিয়াই সর্ব্বত্র অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" ও মৌর্য্য নরপতি অশোক অভিন্ন ব্যক্তি কি না তাহা লইয়া বিগত ৭৫ বৎসর মধ্যে পণ্ডিতগণের মধ্যে বড় তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে নিজামরাজ্যে আবিষ্কৃত মাস্কি-অনুশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল যে, রাজা সেই লিপিতে নিজকে "দেবানং পিয়স অসোকস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দেব-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ও অশোক এক ব্যক্তি কি না—এই তর্কের অবসান হইয়া গেল। কাজেই এরূপ লেখের মূল্য যে কত তাহা বলা যায় না।

ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিভিন্ন-সম্প্রদায়-ভুক্ত শ্রমণ বা উপাসকগণ ধর্ম্মশাস্তা বুদ্ধ ও বর্দ্ধমানের স্মরণার্থ শাঁচি, ভরহুত, ভিল্‌সা, রাজগৃহ, নালন্দা, তক্ষশিলা, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে কত স্তূপ, কত চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর উড্ডীন রাখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও তত্তৎস্থানলব্ধ প্রাচীন প্রস্তর লিপির সাহায্যে জানা যায়। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া লুম্বিনী গ্রামে মহারাজ অশোক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথায় পূজা দান করিয়াছিলেন, এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ উত্থাপন করিয়া দিয়া তাহাতে লিপি উৎকীর্ণ করাইয়া এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে হেতু—"হিদ ভগবং জাতেতি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে"—এই পুণ্যস্থানে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—অতএব এই লুম্বিনী-

গ্রামকে উদ্বলিক করা হইল, অর্থাৎ এই গ্রামের অধিবাসিগণকে রাজগ্রাহ্য করাদি দিতে হইবে না। আবার বুদ্ধের শরীর-নিধান-বার্ত্তা স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রাচীন লিপি সম্পাদিত হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে ১৫ খৃষ্টাব্দে মথুরায় মহাক্ষত্রপ রাজূলের দুহিতার প্রদত্ত স্তূপলিপির কথা উদাহৃত হইবার যোগ্য। নেপালে আবিষ্কৃত পাডরিয়া-লিপি হইতে যেমন বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামের প্রাচীন অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে—সেইরূপ পিপ্রাওয়াতে বুদ্ধের সগোত্র শাক্যগণের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রদত্ত বুদ্ধ-শরীর-নিধান-পেটিকা ও তৎস্থিত লিপির আবিষ্কার হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধের বাল্য-লীলা-ক্ষেত্র কপিলবস্তুর অবস্থান পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। মৌর্য্যাধিকারের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথে যে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ও যাঁহাদের আধিপত্য প্রায় শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—সেই শুঙ্গরাজবংশের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একমাত্র ঐতিহাসিক চাক্ষুষ প্রমাণ ভারহুত স্তূপের এক তোরণদ্বারের নির্ম্মাণ-বিজ্ঞাপক লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার জলন্ত উদাহরণ বর্ত্তমান বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নানাঘাট গিরিবর্ত্মের গুহাতে উৎকীর্ণ দক্ষিণাপথপতি আন্ধ্ররাজ রাজমহিষী নায়নিকার আদেশে সম্পাদিত প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত প্রস্তর লিপি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবস্থা-বর্ণনা-সম্বন্ধে এই লিপিই প্রাচীনতম। রাজমহিষী অগ্ন্যাধেয়, অন্বারম্ভনীয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, গবাময়ন, গর্গত্রিরাত্র, আঙ্গিরস ত্রিরাত্র, অপ্তোর্য্যাম প্রভৃতি কত কত যজ্ঞ ও সত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং সেই সেই যজ্ঞে ও সত্রে বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গো, ধেনু, শকট, রথ, সৎপট্টা, গ্রাম প্রভৃতি কত কত বহুমূল্য সামগ্রী দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই নানাঘাট-লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাস-লেখকগণের নিকট এই লিপির মর্য্যাদা ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই লিপির প্রথম শিক্ষা এই যে, প্রাচীন আন্ধ্র নরপতিগণ অপর্য্যাপ্ত দানাদি-দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের বর্ষাবাসের সুব্যবস্থা ও তাঁহাদের আহার আচ্ছাদনের নানারূপ সুবিধা বিধান করিয়া থাকিলেও—আপনারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যগণের সভ্যতার মূল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম—তাঁহাদের এইরূপ উক্তি যে যুক্তিযুক্ত নহে—এই নানাঘাট-লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এক কথা এই যে, কৃষ্ণ পূজা যে খৃষ্টাব্দের

পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল—"নমো সংকংসন বাসুদেবানং"—নানাঘাট-লিপির নান্দীতে উল্লিখিত এই উক্তিই তাহার প্রমাণরূপে উদাহৃত হইবার যোগ্য। বুদ্ধের, বোধিসত্ত্বগণের, জৈন ঋষি বর্দ্ধমান ও জৈন তীর্থঙ্করগণের প্রতিমাস্থাপনাদি ধর্ম্মকার্য্যে কনিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি শকনরপতিগণও যে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতেন, তাহার প্রমাণও প্রাচীন লেখমালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর এক কথা এই যে, পূর্ব্ব কালে ভূমির দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর বিধানের জন্যই প্রায় অধিকাংশ তাম্রশাসন সম্পাদিত হইত। সেগুলি যে কেবল রাজার সম্পাদিত, তাহা নহে; প্রজার মধ্যে কেহ রাজদরবারে ভূমিপ্রার্থী হইয়া তাহা যথামূল্যে ক্রয় করিয়া ভূমিদানপত্র তাম্রফলকে দলীলরূপে রাজার আদেশে সম্পাদন করিয়া লইতে পারিতেন। রাজার বা রাজবংশের পরিচয় ব্যতীত এই সমস্ত তাম্রশাসনাদি হইতে রাজ্যশাসনপ্রণালীরও অনেক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণরূপে এই স্থানে আর একটি অচিরাবিষ্কারের কথা উল্লিখিত হইতেছে। গুপ্ত-যুগে বাঙ্গালা দেশ কোন্ রাজার শাসনাধীন ছিল—গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত সে কালের বাঙ্গালার অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির কিরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল, বাঙ্গালা দেশই বা তখন কি ভাবে শাসিত হইত, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এ যাবৎ বড়ই দুরূহ ছিল। কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন-পঞ্চকের পাঠোদ্ধার করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, সে কালের বাঙ্গালা দেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল, এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিপতিগণ গুপ্ত সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। বাঙ্গালার বিষয়পতিগণ (District officers) আবার ভুক্তিপতিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই তাম্রশাসন-পঞ্চক হইতে আর এক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এত কাল মনে করিতেন যে, স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল, তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত মত, তাহা এই নবাবিষ্কৃত লিপিপঞ্চকের সাহায্যে জানা গিয়াছে। স্কন্দগুপ্তের পরেও ন্যূনকল্পে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত উত্তরাপথে গুপ্ত-প্রভাব অব্যাহত ছিল, তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বিষয়পতিগণ সপরিষৎ 'বিষয়' বা জেলার ও নগরের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহার আভাসও এই প্রাচীন লিপিপঞ্চক হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সে কালের ভূমির মূল্য, ভূমির পরিমাপ-প্রণালী, ভূমির বিক্রয়-প্রথা, ভূমির সত্ত্ব-নির্ণয়, পুস্তপাল বা দলীলরক্ষকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই সমস্ত

লিপির সাহায্য না লইলে চলিবে না। তাম্রাদি-শাসনের সম্পাদন-বিধি স্মৃতি-শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে—সেই-শাস্ত্রীয়-রীতি-অবলম্বনে যে সমস্ত শাসন সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দাতা ও প্রতিগ্রহীতার বংশপরিচয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবদান ও কীর্ত্তিকথার অনেক পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতীতের ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া না হউক—প্রাচীন ভারতবাসিগণ রাজাই হউক, আর প্রজাই হউক, সকলেরই ইতিহাস-রচনার অনেক উপাদান এই সমস্ত পাষাণ-লিপিতে ও ধাতুপট্ট-লিপিতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরপুরুষগণ এই সমস্ত হইতেই অতীতের চিত্র আঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিব। এই কার্য্য যে কত কষ্টকর, তাহা অনুসন্ধিৎসুমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে আরও একটী কথা না বলিয়া থাকা যাইতেছে না। ইতিহাসের ও তদ্রচনার লক্ষ্য কি? একাদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা-অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার অভিভাষণে বিশদরূপে প্রদান করিয়াছেন। তদীয় মতের অনুসরণ করিয়া বলা যাইতেছে যে, অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিয়া তদ্দ্বারা "মনুষ্যের সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা" ইতিহাসের লক্ষ্য। অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিতে হইলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। "সত্য"-তথ্য-সঙ্কলন যদি ইতিহাস-রচনার লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে সত্যের উদ্ধার-কার্য্য বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রমাণের উদাহরণ দ্বারা তথ্য-নির্দ্ধারণ-প্রথাকে আমরা বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। এই প্রণালীতে কেবল কল্পনার স্থান নাই। বিচার-নিষ্ঠ অপ্রমাদী প্রাড়্‌বিবাকের ন্যায় প্রমাণাবলীর সম্যক্ অবধারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের উদ্ধার করিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকৃষ্ট ও অনন্য পন্থা অবলম্বন না করিয়া, কেবল কল্পনা ও অপ্রামাণ্য দলীলের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বা হইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে নাই, পারিবেও না। সমালোচকের তীব্র কশাঘাত তাঁহারা কেমন করিয়া অতিক্রম করিবেন? বাস্তবিক তাঁহারা অনেক স্থলে উপকারের ছলে দেশের অপকারসাধন করিতেছেন। সুতরাং কেহ তাঁহাদের যথেচ্ছ ইতিহাস-উদ্ধার-চেষ্টার নিন্দা করিলে আমাদের কোনও দুঃখ বা ক্ষোভ নাই; কিন্তু দেশ-বিদেশে যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হইয়া যথারীতি অনুসন্ধানে

ব্যাপৃত থাকিয়া সত্যের উদ্ঘাটন কার্য্যে ব্রতী থাকেন, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারীর কেবল নিন্দা করিতে হইবে বলিয়া, যাঁহারা সেই সকল উদ্যোগী পুরুষগণের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী; কেন না, তাঁহারা দেশের অতীতের চিত্র দর্শন করিয়া নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করিতে বিমুখ। আমার মনে হয়, সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানকারিগণই ভারতীয় প্রাচীন-ইতিহাস-রূপ নিবিড় অরণ্যে আশার পথরেখা নির্ম্মাণ করিতেছেন। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদান—প্রাচীন লেখমালা। এই সমস্ত লেখের মূলানুগত পাঠ ও ব্যাখ্যাকার্য্যে যে যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণ হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তন্মধ্যে আমরা জার্ম্মেণীর বুলাহর, কিলহর্ণ, লুডারস্ ও হুলস্, ফ্রান্সের সেনার ও সিল্‌ভ্যান্ লিভি, ইংলণ্ডের ফ্লিট্, হুরণ্‌লি, পার্জ্জিটার, টমাস, র‍্যাপ্‌সন্ ও স্মিথ, বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারকার ও ভগবান্ লাল, এবং আমাদের বাঙ্গালার রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মহাত্মার নাম স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বিশু মল্লিকের অধঃপতন।

১

মানভূম জেলার কঞ্চুকী নামক গ্রামের উত্তরে কতকগুলি জঙ্গল এবং পর্ব্বত দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'রাজবংশী মাল' নামক জাতির বাস। রাজমহলের 'মাল পাহাড়িয়া' ইহাদেরই এক শাখা বলিয়া জনশ্রুতি। তাহারা পর্ব্বতের উপরে থাকিতেই ভালবাসে। কদাচ সমাজভ্রষ্ট হইলে তাহারা পর্ব্বত হইতে নিম্নে দণ্ডস্বরূপ বিতাড়িত হয়। ইহার নাম 'অধঃপতন'।

কিন্তু পর্ব্বতের উপরে থাকিয়াও তাহারা নিম্নভূমিতে কৃষিকার্য্য করে। ধান কাটিয়া তাহারা পর্ব্বতের মধ্যভাগে 'খামার' বাঁধে, এবং তখন যুবক যুবতীগণ একত্র হইয়া গান গায়। মালজাতি ধনুর্ব্বিদ্যায় খুব দক্ষ, সেই জন্য তাহাদিগের আবাসভূমির সন্নিকটে হিংস্র পশুর দৌরাত্ম্য খুব কম।

লেখাপড়ায় মালজাতির একটা আন্তরিক 'টান্' আছে। কঞ্চুকী গ্রামে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একটা 'প্রাইমারী', এবং তৎপরে একটা 'মিড্‌ল ভার্ণাকুলর' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি, সেখানকার জমীদার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছিলেন। ক্রমে সেই গৃহে এক জন দেশীয় খ্রীষ্টান মিশনরীর বিধবা স্ত্রী একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন। তাহাতে নানাবিধ পর্ব্বতীয় জাতির বালিকাগণ 'কথামালা', 'যীশুখ্রীষ্টের উপাখ্যান' প্রভৃতি বহি লইয়া পাঠ করিত। সেই খ্রীষ্টান্ 'গুরুমা'র নাম 'এলিজাবেথ্ জগৎতারিণী'। অর্থাৎ, পূর্ব্বে তাঁহার নাম জগৎতারিণী ছিল, পরে 'এলিজাবেথ' যুক্ত করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাহাড়িয়া বালিকাগণ তাঁহাকে হয় ত 'গুরুমা' কিংবা 'এলিজারাণী' বলিয়া ডাকিত। রাজবংশী মালজাতির মধ্যে প্রায় সকলেই গুরুমার শিষ্য ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

এলিজারাণীর খুব শান্ত মূর্ত্তি, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তাঁহার স্নেহের গুণে পাহাড়িয়া বালিকাগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। অনেকে শনিবারে পর্ব্বতের উপর প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার গৃহেই রাত্রিযাপন করিত, এবং পর দিন প্রাতঃকালে নিম্নভূমিতে পুষ্প আহরণ করিয়া দল বাঁধিয়া গৃহে ফিরিত।

এলিজারাণীর গৃহ একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। দস্যুভয়ে তিনি পর্ব্বতের নিম্নভাগে প্রস্তর কাটিয়া, একটা গুহায় বাস করিতেন। সেটাকে 'ট্রেঞ্চ' বলিলেও চলে। হঠাৎ তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সুকঠিন। তাহার ছাতের উপরিভাগ এত পিচ্ছিল যে, দাঁড়ান অসম্ভব। পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগ হইতে কেহ সেখানে আসিতে পারিত না। কণ্টকপূর্ণ। যেখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত, সেটা কূপের মত, এবং তাহার পার্শ্বেই তাঁহার সুসজ্জিত গৃহ। গৃহে যাইতে হইলে তিনটী ছোট ছোট পগার পার হইতে হয়, এবং যে সেতুর উপর দিয়া সেগুলি পার হওয়া যায়, তাহা সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামিনী টানিয়া লইতেন, সুতরাং কাহারও পক্ষে 'বৈতরিণী' পার হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িত।

গৃহের অভ্যন্তর সুসজ্জিত। খানকতক চেয়ার, দুইখানি টেব্‌ল, এমন কি একখানা কৌচ্ পর্য্যন্ত মধ্যভাগে স্থাপিত। মেজে খুব শুষ্ক ও মার্জ্জিত, এবং 'ডাইনিং-রুমে'র মধ্যে অনেক রকম ছোট বড় বাসন। সেই ঘরই 'উপাসনা-গৃহ'। অর্থাৎ, খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া আসিবার পূর্ব্বে গুরুমা সেই ঘরে উপাসনা সারিয়া লইতেন।

আজ গুরুমা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্রী 'উতি'কে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। উতি, মণ্ডলের কন্যা। তাহার 'যাদুমাখা' চক্ষু বলিয়া সকলে তাহার 'উতি' নাম দিয়াছিল। উতি কালো, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। চক্ষুর গুণে কালো দেখাইত না।

বার বৎসর পর্য্যন্ত উতি পাহাড়ে নাচিয়া ও গান করিয়া বেড়াইত। ছোট ছোট কুরঙ্গ ও বনের পাখী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সকল যুবককেই উতি ভালবাসিত। ক্রমে উতি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে সকলের চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। লেখাপড়ার গুণেই হউক, কিংবা কোনও দৈবযোগেই হউক, উতির গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া গিয়াছিল। সকলে মনে করিল, উতি কাহাকেও গোপনে ভালবাসে। কিন্তু সেই সৌভাগ্যবান যুবক কে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। সকলের অজস্র দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সত্বেও উতি কাহারও দিকে চাহিয়া মনের গোপন কথা কাহাকেও কখনও বলে নাই। অনেকে মনে করিত, উতির টান চরণ মল্লিকের দিকেই বেশী। চরণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী। বিস্তীর্ণ চাষ ও গাভীপূর্ণ গোয়াল। কুঞ্চিত কেশ, সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী চরণ মল্লিকের অঙ্কেই উতি শোভা পাইবে, তাহাই সকলের ধারণা। আর একটা কথা, যুবক চরণ কহিত, 'উতি ছাড়া আমার কোনও স্ত্রী অদৃষ্টে লেখা নাই।'

কিন্তু উতির 'ফুন' (সখী) মন্দুরা গোপনে কাহাকেও বলিয়াছিল যে, চরণের কনিষ্ঠ বিশুকে উতি ভালবাসে। বিশু বাঁশী বাজায়, গান করে, একটু লেখাপড়া জানে। চরণ লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই। আর একটা কথা, উতি মধ্যে মধ্যে বিশুর সঙ্গে অনেক কথা কহে, সে কথার অর্থ নাই। যে কথার অর্থ নাই, সে নিশ্চয় প্রণয়ের কথা। এই রকম কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মন্দুরা গুরুমার নিকট উতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিত।

সে কথাগুলির তথ্যনির্ণয় করিতে আজ এলিজারাণী উতি ও মন্দুরাকে ডাকিয়াছিলেন।

২

সেতু পার হইয়া উতি ও মন্দুরা গুরুমাকে প্রণাম করিয়া কৌচে বসিল। গুরুমা তাহাদের লইয়া প্রথমে উপাসনাগৃহে গেলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে, সকলে চা ও বিস্কুট খাইয়া, একটা পুরাণো হার্ম্মোনিয়মের সুর-সহকারে গান করিল। বর্ষাকাল। মুষলধারায় মেঘের জল পর্ব্বত ও কানন ভাসাইয়া নিম্নভূমির দিকে ঘোর-রবে ছুটিতেছিল।

অন্য দিন উতি উপাসনার গান গায়, আজ একটী প্রেমের গান গায়িল। সে গানটা গুরুমা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। গুরুমা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া

গেলেন। ভরা যৌবনে প্রেমের গান স্বতঃই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু এ বাঙ্গালা গান উতি শিখিল কোথায়? এ যে একটা পুরাণো সুর, এখনও এ পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রচারিত হয় নাই! তাই গুরুমা এলিজারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, —'উতি! এ গান শিখিলি কোথায়?'

উতি। গুরুমা, আমার বেশ বোধ হয় সুরগুলো উড়ে আসে। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। যখন আমার কানের কাছে আসে, তখন নতুন বলে' বোধ হয়।

গুরুমা। এটা যে কীর্ত্তনের সুর। শ্রীরাধার প্রেমের কথা। ও সব তোর গাওয়া উচিত নয়।

উতি। কেন গুরুমা? আমার যে বড় ভাল লাগে। আমার বেশ বোধ হয়, আমি দু চার বৎসর পরে ম'রে যাব। ঐ গানগুলোই আমাকে সে কথা বলেছে।

গুরুমা। কি সর্ব্বনাশ! তুই গানের ঐ কথাগুলো কোথায় পেলি?

উতি। পদাবলীতে পড়েছি।

গুরুমা। কি ভয়ানক! তোর যে যৌবনের সময়! পাপে আচ্ছন্ন হ'বার সময়। যিনি পাপীদের জন্য নিজের রক্ত দিয়েছিলেন, তিনিই কেবল বিপদের সময় ত্রাণ করবেন। আর কেউ পারবে না।

মন্দুরা। পাপ কি গুরুমা? যদি যৌবন তাঁর পায় সঁপে দিই, তবে পাপের গোড়াটাই ত নষ্ট হয়ে গেল। উতি কখনও পাপ করবে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

উতি তাহার মনের কথা মন্দুরার মুখে পাইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া দিল।

গুরুমা। আমিও এক সময় বষ্টমী ছিলাম লো, কিন্তু যৌবন তাঁর পায়ে সঁপতে পারিনি। অন্তরে যৌবন সঁপে দেওয়া বড় শক্ত কথা। আচ্ছা, উতি তুই কি সেই খারাপ উপন্যাসগুলো এখনো পড়িস্? ওতে চরিত্র বিগ্‌ড়ে যায়।

উতি। আমার ওগুলো পড়্‌তে বড় ভাল লাগে। আমাকে বিশু একখানা পাঁচ শ' পাতার বই এনে দিয়েছে, তার মধ্যে সব কথা আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের কথা, জগতের কথা, ঈশ্বরের কথা, প্রেমের কথা। মানুষের মন কি ক'রে চারি দিকে ছুটে, কি ক'রে আমরা আত্মহারা হই, কি ক'রে আমাদের অধঃপতন হয়, পরে কত কাঁদি, যা হারিয়েছি, তা আর হাত বাড়িয়ে

পাইনে, দুঃখে বুক ভেঙ্গে যায়! সমুদ্রের মত বুক তোলাপাড় হয়, কখনও বোধ হয়, এগুলো সাম্‌লাবার বল আমার আছে; আর কখনও বোধ হয় যে, আমার কোনই শক্তি নাই। তখন কাতর হয়ে হতাশ হয়ে পড়ি।

দস্যুরা ব্যগ্রচিত্তে উতির কথাগুলি শুনিতেছিল।

এলিজারাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি একত্র জাগিয়া উঠিল। তিনিও এক সময় এই সব চিন্তা করিয়াছিলেন, তবে এত কথা ব্যক্ত করেন নাই। জীবের আবর্ত্তন, অসভ্য জাতির উন্নত সোপানে আরোহণ ও তাহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, সকলই স্বাভাবিক। বাস্তবের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয়। হৃদয়ে শোক না পাইলে কোনও ধর্ম্মেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না।

তবে গুরুমা উতিকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বড় আশা ছিল, উতি ভবিষ্যতে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাঁহার পদে অভিষিক্তা হইবে। কিন্তু উতির আবেগপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমার বড় সাধ, তুমি শিগ্‌গির বিয়ে ক'রে ঘরকন্না কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। এই বন্য জাতির যাতে জ্ঞান ও ধর্ম্মে মতি হয়, সেই আশায় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আচ্ছা, উতি! আমাকে মন খুলে বল ত, তুমি কাহাকে ভালবাস, চরণকে, না বিশুকে?

উতি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিল, 'দু জন্‌কেই।'

গুরুমা। তাও কি কখনও হয়? সত্য বল। তুমি ত কখনও মিথ্যা বল নাই!

উতি। সত্য কথা গুরুমা! আমি এ পর্য্যন্ত ঠিক কর্‌তে পারিনি।

সেই সরলা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুমা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

গুরুমা। দেখ, একটা কথা বলি। চরণের ধর্ম্মবল ও বাহুবল, দুই-ই আছে। তুমি তার উপর অবলম্বন ক'রে নির্ভয়ে থাক্‌তে পার। বিশুর চরিত্র নাই। সে গীতা পড়ে, ডাকাতের দলে মেশে। সে জন্য তার উপর তোমার ঘৃণা হয় না?

উতি দেহ উন্নত করিয়া উঠিয়া বসিল, 'না! সেই জন্য আমার তার উপর মায়া বেশী। যার সহায় ঈশ্বর, তার জন্য ভাব্‌বার দরকার নেই। যার কেউ

সহায় নেই, তারই জন্ত প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে। যীশু ত পাপীদের জন্তই রক্ত দিয়েছিলেন, গুরুমা।'

এলিজারাণী প্রমাদের সূত্রপাত বুঝিতে পারিয়া আর কোনও দ্বিরুক্তি করিলেন না।

৩

পার্ব্বতীয় বায়ুর কঠোর স্বননে বন কাঁপিতেছিল। বড় বড় পাদপ নত হইয়া প্রস্তর চুম্বন করিতেছিল। আকাশ ঘোর কাল'। কাননে পথ জনশূন্ত।

অর্দ্ধেক পথ পার হইতে না হইতে ঘোর বর্ষা আরম্ভ হইল। উতি মন্দুরার হাত ধরিল।

'তুই ভয় পেয়েছিস্?'

মন্দুরা। না, খানিক দূরে আমাদের একটা খামারবাড়ী আছে, চল্, সেখানে যাই।

অদূরে কুটীরখানি বিদ্যুদালোকে মধ্যে মধ্যে প্রতিভাত হইতেছিল। দুই সখী তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝড় বহিল। ক্রমে আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। রাত্রি তখন এক প্রহর। আকাশ চন্দ্রালোকে ভরিয়া গেল।

উভয়ে দেখিল, অদূরে মাথায় মোট বহিয়া এক জন লোক ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া যাইতেছে।

মন্দুরা উতির দিকে চাহিয়া বলিল, 'বোধ হয় বিশুদাদা।'

উতি বলিল, 'ডাক।'

মন্দুরা তাহাদের পার্ব্বতীয় ভাষায় ডাকিল, 'উই—ই—ই!'

পথিক ফিরিয়া দাঁড়াইল, 'এখানে তোরা কারা?'

মন্দুরা। উতি, আর মন্দুরা।

বিশু কুটীরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রেতে তোরা এখানে?'

মন্দুরা। আমরা গুরুমার ওখানে গেছিলাম।

বিশু। তোদের কাপড় যে সব ভিজে?

উতি। তা হোক! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বিশু। সে অনেক কথা, দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি আর এ দেশে থাক্‌ব না। বর্দ্ধমানে যাচ্ছি।

মন্দুরা। বর্দ্ধমানের রাস্তা ত এটা নয়?

বিশু। (হাসিয়া) আমি উতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, তাই এ পথে এসেছি।

উতি। দাদার সঙ্গে ঝগড়া কেন হল?

বিশু। আমি ডাকাতের দলে মিশি বলে'। সে দিন কঙ্কণীর হাটে ডাকাতী হয়ে গেছে। সকলে নাকি বলে যে, আমি বাঁশী বাজিয়ে তাদের বিগ্‌ড়ে দিইছি। অথচ আমি বরাবর তাদের কত মানা করেছিলেম। শুন্‌ছি নাকি দারোগা আমাকে ধরবার জন্ত বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উতি! এ দেশে থাক্‌লে আমার জেল্ হবে নিশ্চয়। আমি প্রমাণ দিতে পার্‌ব না। তার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভাল। তবে যাবার আগে তোর সঙ্গে—

উতি। বিদায় নিতে এসেছিলে? তুমি কি পাষাণ!

বিশু। উতি! আমার জীবনের মধ্যে একটা ভাবনা, সেটা কেবল তোর জন্ত। তুই দাদাকে বিয়ে কর্‌লে সে ভাবনাটা যায়। উতি, প্রতিজ্ঞা কর—

উতি। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা কর্‌ব, কিন্তু আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।

বিশু। রাখ্‌ব।

উতি। মন্দু, তুমি সাক্ষী।

তাহার পর উতি বিশুর হাত হইতে মোট কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'আমি তোমাকে একলা যেতে দেব না—সঙ্গে যাব, পরে তোমার মনটা ভাল হ'লে তোমার দাদাকে বিয়ে কর্‌ব।'

বিশু। আমার মন বেশ আছে।

উতি। তুমি বিগ্‌ড়ে যাচ্ছ। যখন পালানো ভিন্ন উপায় নাই, তখন আমিও তোমাকে একলা বিপদে পড়্‌তে দেব না, সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব, চোখের উপর রাখ্‌ব—

সেই যাদুমাখা চক্ষু! তাহার মধ্যে কত সাধ! কত জীবন-মরণের কথা! বিশু বলিল, 'উতি! আমার পাপের ভার বহিবার শক্তি এখনও তোর হয় নাই। আমার জীবনে অনেক বিপদ ঘটবে, আমি পাগল হয়ে যাব, কিংবা সন্ন্যাসী হব।'

উতি মুখ ফিরাইয়া বিশুর কাপড়ের মোট মাথায় লইল।

মন্দুরা কাঁদিল। উতিও কাঁদিতেছিল।

উতি মন্দুরাকে বলিল, 'সই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়। অন্ততঃ একবার হবে, কেন না তুই আমার প্রাণের সই। সকলের যাতে মঙ্গল হয়, তাই করিস্।'

ইহা বলিয়া বিশু ও উতি সেই নৈশ বায়ুর মধ্যে প্রস্তরপথ ভাঙ্গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্দুরা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্দুরা উভয়ের বিচ্ছেদে কাঁদিল। মন্দুরা বিশুকে ভালবাসিত, কিন্তু সে কথা উভিকে বলে নাই। উভি তাহার প্রাণ। উভির হাতে বিশুকে সমর্পণ করিয়া মন্দুরা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়ের গভীর স্তরে যে গ্রন্থি আজ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার ক্লেশে সে অধীর হইয়া কাঁদিল।

আর চরণ? সে পর দিন সকল কথা শুনিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'যে উভিকে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে, সে আমার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে।'

কিন্তু ভবিতব্য অনিবার্য্য। তন্ন তন্ন করিয়া বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও পাওয়া গেল না। ডাকাতী মোকদ্দমার 'বিশু সর্দ্দারে'র নাম 'ফেরারী'-ভুক্ত হইল। সকলে বলিল, 'বিশুর অদৃষ্ট খুব ভাল, কেবল জেলের হাত এড়ানো নয়—কঞ্চুকীর রাণীকে নিয়ে বাজার ক'রবে।'

৪

উভি ও বিশু বর্দ্ধমানে না গিয়া প্রয়াগধামে চলিয়া গিয়াছিল। বহুজন-সমাকীর্ণ কুম্ভমেলায় তাহারা একটা কুটীর বাঁধিল। বিশু বাঁশী বাজাইত, উভি গাহিত। সেই বংশীস্বরে ও গানে অনেকে মোহিত হইয়া কেহ বস্ত্র, কেহ টাকা দিয়া বাষ্পভারাক্রান্তনয়নে ফিরিত।

পারসী থিয়েটরের ম্যানেজার আবদুল খাঁ তাঁহার 'ইন্দ্রসভা'র জন্য এক জন সুগায়ক ও এক গায়িকা খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ বিশু ও উভির বাঁশী ও গান শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব ও বিলক্ষণ মাধুর্য্য আছে। তিনি উভয়কে ডাকিয়া লইয়া থিয়েটরের দলভুক্ত করিয়া দিলেন।

খাঁ সাহেবের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইল,—'সম্প্রতি নেপাল হইতে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর জাতীয় একটী যুবক ও যুবতী কুম্ভমেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে; তাহারা স্বদেশীয় ভাষায় প্রেমের গান গায়। আসুন! কর্ণকুহর তৃপ্ত করিবার এমন সুযোগ আর ঘটিবে না।'

দলে দলে লোক আসিয়া জুটিত এবং 'কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া যাইত'। বিশু অনেক টাকা পাইত। 'প্রাইমা ডোনা' মতিজানের আদর কমিয়া গেল।

মতিজান ইরাণী যুবতী, সুগায়িকা ও হাস্যময়ী। সে উভিকে ডাকিয়া বলিল, 'হে কিন্নরী! তোমার ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, আধ-আধ, আবেগপূর্ণ কি রকম একটা সুর আছে, সেটা আমাকে পাগল করিয়াছে। আমাকে শিখাইয়া দাও।'

উভি উর্দ্দু কথা কহিতে শিখিয়াছিল। হাসিয়া বলিল, 'বিবিজান! এগুলো

জংলা। এর ওস্তাদ উনি। (বিশুকে দেখাইয়া)। বাঁশীর সঙ্গে না শিখলে ঠিক কসরৎ হবে না। হার্ম্মোনিয়মে এগুলো বেরোয় না।'

বিশু মতিজানের সঙ্গে বসিতে নারাজ, কিন্তু উতি আবদার করিয়া বলিল, 'ওকে শেখাতেই হবে। একে ত আমাদের আশ্রয়-দাত্রী, তার উপর মনটা খুব সরল।'

গান শুনা খুব সহজ। কিন্তু শিখাইয়া শুনা একটু সঙ্গীন রকম। স্বহস্ত-রোপিত চারা গাছের ফুলের মত। ইরাণী যে কণ্ঠস্বরে সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিত, সেটুকু সাধা গলা; তার মধ্যে বৈষ্ণবী ভাব সঞ্চারিত হইয়া এমন একটা অপূর্ব্ব সুর দাঁড়াইয়া যাইত যে, বিশ্বেশ্বর তন্ময় ও স্তম্ভিত হইয়া শুনিত।

প্রত্যূষে উতি রাঁধিবার যোগাড় করিতে গিয়াছে। বিশু বাঁশী লইয়া একটা সুর সাধিতেছে। হঠাৎ ইরাণী শয্যাত্যাগ করিয়া আলুলায়িতকেশে ও শ্লথবসনে বিশুর গৃহে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিশু অবাক হইয়া তাহার রূপ দেখিতেছিল।

নিশাকালে ইরাণী একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার ভাবে সে বিভোর। ইরাণী বলিল, 'তুমি কোন্ সুর বাঁশীতে বাজাচ্ছ?'

বিশু। তা জানিনে।

মতিজান। ওটা ভৈরবীর কীর্ত্তন। আমাদের ভৈরবীর সঙ্গে, তোমাদের কীর্ত্তন মিশিয়া গিয়াছে।

এই 'আমাদের', 'তোমাদের', ও মিশামিশির কোমল কথায় বিশুর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'এখন উপায়?'

মতিজান। অনিবার্য্য! দাঁড়াও, আমি গাই।

মতিজান গুণ গুণ করিয়া গাহিল। প্রভাতের ভাঙ্গা গলায় ভৈরবী কি মধুর! মতি বলিল, 'আমি রাত্রিতে স্বপ্নে গেয়েছিলেম। এখন সুরে গাচ্ছি।'

বিশু পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল, 'আমার হৃদয় যে শূন্য বোধ হ'চ্ছে।'

মতিবিবি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। 'তোমার ত প্রেমের লোক আছে, আমার কেউ নাই। তোমাদের ঐ প্রেমটুকু সুরে লইয়া আমি হৃদয় পূর্ণ করি। সেই জন্য তোমাদের ঐ অপূর্ব্ব সুরটুকু শেখ্‌বার জন্য আমি পাগলিনী।'

আরও কি মাথামুণ্ড সে বলিল, তাহা বিশু শুনিল না, সে সহসা বলিল, 'তুমি আমার প্রাণের মধ্যে এসে পড়েছ।'

মতি আত্মহারা হইয়া বলিল, 'তুমি আমার হৃদয়ে, প্রত্যেক রক্তকণায়, শিরায় শিরায়, নিঃশ্বাসে, শ্রবণে ও নয়নে—ঐ দেখ প্রভাতসূর্য্য উঠ্ছে, যদি বিশ্বাস না হয়, আমার তারায় তোমার প্রতিবিম্ব দেখ!'

ইহা বলিয়া ইরাণী বিশ্বেশ্বরের মুখ তাহার কোমল করতলে বদ্ধ করিয়া স্বীয় নয়নের সম্মুখে লইয়া আসিল।

'আমি তোমাকে এই মহামেলায় কুড়িয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের রাজ্যে কেহ কারও নিজস্ব নয়। আমার অধিকার, প্রেম। প্রেমে তোমাকে কিন্‌ব। আমি সকলের চেয়ে বেশী দর দিয়াছি। তুমি পরখ ক'রে দেখ, জগতে তোমাকে সকলের চেয়ে কে ভালবাসে।'

ইরাণী বিশ্বেশ্বরের বুকে তাহার মস্তক রাখিয়া কাঁদিল।

বিশুর হৃদয়-শোণিত উন্মাদের ন্যায় ছুটিতেছিল। প্রেমের দর সে কি করিয়া বুঝিবে? বঙ্গ জাতি যখন হাটে যায়, তখন রাঙ্গা কাপড়গুলি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কিনিয়া আনে। জীবের আবর্ত্তনে কথারই দর বেশী। কথা—কথা—কেবল কথা! সে কথার কেবল একই উত্তর—প্রতিদান।

তিন মাসও কাটে নাই! কূটস্থের পদতলে বিশু উতিকে লইয়া বলীয়ান ছিল, কিন্তু আজ মোহে পড়িয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

বিশু বলিল, 'মতি, কেঁদ না, তুমি আমার হাত ধ'রে যেখানে খুসী নিয়ে যাও, আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!'

রন্ধনশালায় উতি ডাকিল, 'বিশু, শিগ্‌গির এস, আমার হাত পুড়ে গেছে।'

৫

এক বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশু মতিজানকে লইয়া নিরুদ্দেশ। খাঁ সাহেব উতিকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আবার ঘোর বর্ষাকাল। বলরামপুর ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইয়া অনাথিনী উতি পার্ব্বতীয় পথ বাহিয়া চলিতেছিল। দীর্ঘপথ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। তাহার দৃষ্টি জগতের দিকে নাই। জগৎও উতির দিকে চাহিল না!

রাত্রি আটটার সময় এলিজারাণী তাঁহার স্কুলে বসিয়া বাইবেলের একটা অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুদালোকে দেখিলেন যে, এক জন রমণী তাঁহার দ্বারদেশে পড়িয়া গেল। এলিজারাণী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ও?'

উতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, 'গুরুমা! আমি আপনার উতি।'

শুরুমা শশব্যস্তে উতির দেহ উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। উতির সেই যাদুমাখা নয়নে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে। অনাহারে শীর্ণা। শুরুমা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, উতির সন্তানের সম্ভাবনা।

শুরুমা শোকাতুরা হইয়া বলিলেন, 'উতি! তোর এ দশা কেন? বিশু কোথায়?'

উতি। বিশুকে শয়তানে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুরুমা! আমি তাকে রক্ষা করতে পারি নি। জগতে শয়তানের বলই বেশী। ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করতে পারেন না। আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছিলেম, কিন্তু আমাদের উভয়কেই অন্ধ ক'রে শয়তান তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

শুরুমা। উতি, এ কি?

উতি। ঐ কেবল আছে। বিশুর সন্তান আমার জঠরে। কিন্তু শুরুমা!

শুরুমা। কি, বল!

উতি। আমাদের বিয়ে হয় নি।

উতি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। শুরুমা শিহরিয়া উঠিলেন। এখন উপায়? এমন মহাসমস্যা শুরুমার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নাই।

শুরুমা মন্দুরাকে খবর দিলেন। মন্দুরার সঙ্গে চরণ আসিল।

সেই রাত্রিতেই উতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। উতির জ্বর হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, সঙ্কটাপন্ন। কঞ্চুকীর ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'জোর তিন দিন।'

চরণ তাহা শুনিয়া পাগলের ন্যায় উতির শয্যার নিকটে গিয়া বসিল। 'উতি! আমার প্রাণের উতি! তুই যদি ছেড়েই গেলি, তবে বিশুকে বিয়ে কল্লিনি কেন?'

উতি শীর্ণমুখে ও জ্বলন্ত চক্ষে হাসিয়া বলিল, 'চরণ! তাকে অনেক চেষ্টা ক'রেও রাখ্তে পারি নি। সেই শোক বুকে বিঁধেছে। জগতে ঈশ্বর বলে' কিছু নেই। তোমরা সব মিথ্যা কথা ব'লে ভুলিয়ে রাখ। আমি কি পাপ করেছিলেম যে, সেও গেল, আর এই অভাগাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে' আমিও চল্লেম। জগতের এ কেমন ধারা রীতি?'

ইহা বলিয়া উতি সদ্যোজাত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

শুরুমা। ছি! প্রলাপ বকিও না।

চরণ উগ্রস্বরে বলিল, 'প্রলাপ নয়। কথার মধ্যে অনেক সত্য আছে। কিন্তু আজ আমি বুঝিয়ে দেব। উতি! তুই শান্ত হ! ঐ যে সন্তান, ও

আমার! আমি বেঁচে থাক্‌তে ওকে কেউ মার্ত্তে পার্‌বে না। তুই বিশুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলি যে, ফিরে এসে আমাকে বিয়ে কর্‌বি, তা আমি তৈরী আছি। আমি বরাবর জানি, আমার অদৃষ্টে আর কোনও স্ত্রী লেখা নাই।'

চরণ ভূমিতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, 'গুরুমা, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আমাদের বিবাহ দাও।'

উতির মুখ শান্তিপূর্ণ হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, 'দাও'!

প্রস্তরময় গৃহে সেই মুমূর্ষুর কণ্ঠজাত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন দেবলোক হইতে নামিয়া আসিল। গুরুমা বলিলেন, 'মন্দুরা, তুমি সাক্ষী, আমি উভয়ের বিবাহ দিলাম।'

তার পর ধর্ম্মগ্রন্থ হস্তে গুরুমা উভয়কে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

চরণ উতিকে শিবিকায় বহন করিয়া পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল। সেখানে গৃহ সুসজ্জিত করিল। নিজের হস্তে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশুসন্তানকে পান করাইল। গ্রামের যুবক ও যুবতীবৃন্দকে ডাকিয়া বলিল, 'তোরা ধীরে ধীরে বনের আড়ালে বাঁশী বাজা, খুব কোমল সুরে! আমার আজ বাসর। আমার জীবনের সাধ মিটেছে। সাধ এক দিনেও পূরে, অনেক দিনেও মিটে। আমার সকল সাধ এক দিনেই মিটেছে। আমি স্ত্রী পুত্র এক দিনেই পেয়েছি। আমি বিশুকে রেগে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তার জন্ত কেঁদে সারা হয়েছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। তোরা বাঁশী বাজা। আর, মন্দুরা, তুই গান কর।'

পাগলের মত চরণ উতির দিকে চাহিল। উতির যাদুমাখা চক্ষুর যাদু লইয়া আত্মা কোথায় গিয়া আশ্রয় করিল, তাহার ঠিক খবর জগতে কেহ দিতে পারিল না। শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মন্দুরা তাহাকে বুকে লইল।

'ওরে আমার বুকের ধন, আমার শিগ্‌গিরই দুধ হবে, তোকে তার অর্দ্ধেক দেব। তুই কাঁদিস্‌নে।

৬

সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মন্দুরার সহিত উতির অগ্রজ পিতমের সেই সাত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, এবং ছয় বৎসর হইল, মন্দুরার একটী কন্যা হইয়াছে। শৈশবে ভাই ভগ্নী মন্দুরার দুগ্ধ বাঁটিয়া খাইত। উতির পুত্রসন্তান দক্ষিণ স্তন ও মন্দুরার কন্যা বাম স্তন পান করিত। এখন তাহারা পর্ব্বতে ছুটাছুটী করে।

চরণ উতির দেহ গিরিশৃঙ্গে লইয়া গিয়া একটি সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শুরুমা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহা ফুলে সাজাইয়া দিতেন।

এ বৎসর বড় শীত পড়িয়াছিল। গিরিশৃঙ্গ মধ্যে মধ্যে তুষারাবৃত হইত।

চরণ গৃহে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। সান্ধ্য শীতে সে আজ অত্যন্ত কাতর। কিন্তু উতির সন্তান 'বিরণ' লুকাইয়া তার মাতার সমাধিস্থলে চলিয়া গিয়াছে। সে ফুলের লোভে মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইত।

আজ হঠাৎ দেখিল, সেখানে এক জন দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসীর মত লোক বসিয়া। সে ভয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল, এমন সময় সন্ন্যাসী বলিল, 'ভয় নাই। এস।'

বিরণ। তুমি ডাকাত! আমার মার মন্দিরের ফুল চুরী কচ্ছ?'

সন্ন্যাসী। এই সমাধি তোমার মার?

শিশু। হাঁ।

সন্ন্যাসী। তুমি উতির সন্তান?

বিরণ। হাঁ।

সন্ন্যাসী। তোমার পিতা কে?

বিরণ। চরণ।

সন্ন্যাসী। কখনই না। তোমার পিতার নাম বিশ্বেশ্বর।

শিশু সতেজে বলিল, 'সে ত ডাকাতের সর্দ্দার! আমার বাবা এ দেশের পাহাড়ের রাজা। সেই ডাকাত আমার মাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার নাম মুখে এন না।'

সন্ন্যাসীর চক্ষে জল আসিল। 'ওরে বুকের ধন, একবার কোলে আয়। সংসারের সব বন্ধনই গিয়াছে মনে করেছিলেম, কিন্তু তা যায় নি। সেই জন্য আবার এ পুরাণো তীর্থস্থানে ফিরে এসেছি। এখানকারই জলবায়ুর মধ্য দিয়ে আমি চলে যাব। জগতের স্বদেশ দিয়ে স্বর্গের স্বদেশে যাব। যাঁর কাছে যাব, তিনি তোর মার বুকের মধ্যে তোকে রেখে গিয়েছিলেন, একবার সে মণিমালার সূত্রটুকু ধরতে এসেছি।'

শিশু স্নেহের আকর্ষণে বিশ্বেশ্বরের কোলে গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে বুকে ধরিয়া চরিতার্থ হইল।

বিরণ অনেক ক্ষণ পরে বলিল, 'আমার বড় শীত করছে।'

বিশু তাহার মোট হইতে একখানা শাল বাহির করিয়া বলিল, 'যা, সন্তান! তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। এই মোট এখানে রেখে গেলাম। আট বছর

পূর্ব্বে তোর জননী এই মোট মাথায় বয়ে' আমাকে রক্ষা করবার জন্ত সংসার-সমুদ্রে ভেসেছিল। সে ডুবে গেছে। তুই ভেসেছিলি বলে' তোকে এরা কুড়িয়ে পেয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ মিটেছে।'

এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর সেই পুরাণো মোট সমাধির উপর স্থাপন করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনতর হইয়া আসিল। বিশু হৃদয়ভেদী স্বরে ডাকিল, 'উতি—উতি—উতি!—'

বিরণ ভয় পাইয়া বলিল, 'বাবা, কেঁদ না, তুমিই আমার বাবা, বুঝতে পেরেছি। আমি স্বপ্নে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে পেতুম।'

অদূরে মন্দুরা বিরণকে অন্বেষণ করিতেছিল। হঠাৎ 'উতি'র নাম শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

বিশু পাগলের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া বলিল, 'মন্দুরা, ও আমাকে বাবা বলেছে। আমার জন্মের সাধ মিটেছে। ওকে চিরদিন দেখ। আমার আজ অধঃপতন শেষ।'

তখন সন্ন্যাসী সেই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। আঁধারে আর দেখা গেল না। পদতলে সুবর্ণরেখা বর্ষার নূতন জল লইয়া গর্জ্জন করিতেছিল। সন্ন্যাসীর দেহ তাহাতে মিশিয়া গেল। মন্দুরা বিরণকে বুকে করিয়া সেই পর্ব্বতশিখরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গৌড়-প্রসঙ্গ।

"গৌড়" এই নাম কত পুরাতন, তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে, সুপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে "গৌড়" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—

অরিষ্ট-গৌড়-পূর্ব্বে চ। ৬।২।১০০ (১)

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই সূত্রের ভাষ্য করেন নাই। ভট্টোজী

---

(১) এটী স্বরপ্রক্রিয়ার সূত্র। ইহার অর্থ ও উদাহরণ;—"পুরে পরে অরিষ্টগৌড়পূর্ব্ব-সমাসে পূর্ব্বমন্তোদাত্তম্। অরিষ্টপুরম্। গৌড়পুরম্।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

"অরিষ্ট গৌড় ইত্যেবংপূর্ব্বে সমাসে পুরশব্দ উত্তরপদে পূর্ব্বপদমন্তোদাত্তং ভবতি। অরিষ্ট-পুরম্। গৌড়পুরম্।"—কাশিকা।

দীক্ষিতের "প্রৌঢ় মনোরমা" গ্রন্থেও এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈয়াকরণ-কেশরী হরদত্ত মিশ্র "পদমঞ্জরী" গ্রন্থে, এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত নাগেশ ভট্ট "শব্দেন্দুশেখরে" এই সূত্রটীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কিন্তু "গৌড়" শব্দের এখানে কি অর্থ, সে বিষয়ে কোনও আলোচনা করেন নাই। "গৌড়" শব্দের অর্থ সর্ব্ব-জন-বিদিত, ইহা মনে করিয়াই এই দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিত সে বিষয়ে কিছু লেখা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। "গৌড়" শব্দের অর্থ দেশ-বিশেষ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ প্রসিদ্ধ নাই। পাণিনির সূত্রেও এই প্রসিদ্ধার্থক "গৌড়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এই গৌড় দেশ কোথায়, বোধ হয়, এ কথা কোনও বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। সেদিনও বঙ্গের কলকণ্ঠ কোকিল মাইকেল গাহিয়া গিয়াছেন,—

"বিরচিব মধুচক্র 'গৌড়'জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমিই গৌড় দেশ—ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু অধুনা ইহার বিরোধী একটী মত প্রচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি কাশীর "চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা"য় (Chawkhambha Sanskrit Series) কবিতার্কিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" "বিদ্যাসাগরী" টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হইয়াছে যে, "বঙ্গদেশকে গৌড় দেশ বলিয়া কোনও প্রামাণিক পণ্ডিতই উল্লেখ করেন নাই।" (২) যাঁহারা এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সুপণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের কথা আদরণীয় হইতে পারে না ; গৌড় দেশের বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করায়, এই গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয়েরা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

১। রাঢ় দেশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত। ইহার সংস্কৃত নাম, রাঢ়া। এই রাঢ়া, বা রাঢ় দেশ গৌড় দেশের অন্তর্গত, ইহা "কৃষ্ণমিশ্র-যতি"-প্রণীত "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকের অহঙ্কারের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় ;—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"—দ্বিতীয় অঙ্ক।

গৌড় রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, সেখানেও রাঢ় দেশ উপমা-রহিত।

---

(২) "গৌড়দেশত্বেন বঙ্গদেশস্তু প্রামাণিকৈঃ কুত্রাপি পরিগণনং ন কৃতম্।"—চৌখাম্বার "খণ্ডনখাদ্য"-ভূমিকা—৫ পৃষ্ঠা।

২। বঙ্গদেশে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশে কুল্লূক ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কাশী-বাস-কালে "মন্বর্থমুক্তাবলী" নামে মনুসংহিতার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকার উপক্রমে নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে কুল্লূক লিখিয়াছেন,—

"গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।"

গৌড় দেশে বরেন্দ্রীভূমিতে সুজনগণের বন্দনীয় নন্দনবাসি ("নাম্নী") নামক কুলে শ্রীমান্ দিবাকর ভট্টের তনয় কুল্লূক ভট্ট উৎপন্ন হইয়াছেন।

৩। কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে—একটী মন্দিরের পরেই—প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর একটী শিবালয় আছে। এই শিবালয়ের মধ্যে, প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের উপরিভাগে প্রস্তরফলকে বঙ্গাক্ষরে দুইটী শ্লোক লিখিত আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটী এই,—

ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্রগৌড়ভূমীন্দ্রভাবিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্।"

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র গৌড় ভূমীশ্বরেব ভাবিনী শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অনেকে এই শ্লোকের প্রথম চরণটী "ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্ররামকান্তস্য ভামিনী". এইরূপ পাঠ করেন; কাহারও মতে, ঐ অংশের পাঠ "বঙ্গভূমীন্দ্রবারেন্দ্র-রামকান্তস্য ভামিনী", এইরূপ। কিন্তু এই দুইটী পাঠই কল্পিত। আমাদের উদ্ধৃত পাঠই কাশীর উক্ত ভবানীশ্বর-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। বঙ্গের বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের "কাণাভট্ট" শিরোমণি রঘুনাথ সম্বন্ধীয় একটী কবিতায় গৌড়ের উল্লেখ আছে।

অভাগ্যঃ গৌড়দেশস্য কাণো যত্র শিরোমণিঃ।

গৌড় দেশ ভাগ্যহীন, কেন না, সেখানকার শিরোমণি কাণা।

এই কবিতাংশ আমরা কাশীতে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। ইহাতে নবদ্বীপকে গৌড় দেশের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

৫। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের সপ্তম পটলে বঙ্গদেশ ও গৌড়দেশ নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে।

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো মযা প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥"

"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥"

সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত স্থানের নাম বঙ্গদেশ; এই দেশ সমস্ত সিদ্ধির প্রদর্শক। বঙ্গদেশের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড় দেশ নামে খ্যাত। এই গৌড় দেশ সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ।

যদিও এই শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে বঙ্গদেশ ও গৌড়দেশ বিভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি এই দুইটীই এখন বর্ত্তমান বঙ্গের অন্তর্গত। এই দুইটী দেশ পরস্পর সন্নিহিত হওয়ায়, এবং অনেক সময়ে একই রাজার অধীনে শাসিত হওয়ায়, অনেক স্থলে কেবল "বঙ্গদেশ" অথবা কেবল "গৌড়দেশ" বলিয়া দুইটী দেশই উল্লিখিত করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

তাম্রশাসনে বহু স্থলে বঙ্গদেশকে গৌড় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা তাম্রশাসন ব্যতিরিক্ত অন্য স্থলে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিলাম।

আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতে লিখিত আছে,—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা গৌড়মৈথিলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

সারস্বত (৩), কান্যকুব্জ, উৎকল, গৌড়, এবং মৈথিল, বিন্ধ্যাগিরির উত্তরদেশবাসী এই সকল ব্রাহ্মণ "পঞ্চ গৌড়" নামে বিখ্যাত।

বল্লাল চরিতে বিন্ধ্যের দক্ষিণদেশবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ "পঞ্চদ্রাবিড়" নামে অভিহিত হইয়াছেন। আনন্দভট্ট-প্রণীত "বল্লালচরিত" বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল সেনের জীবনচরিত। এই গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ সন্দিহান ছিলেন। এই জন্য এই গ্রন্থের উপর তত দূর নির্ভর করা যায় না। পরন্তু "পঞ্চ গৌড়" ও "পঞ্চ দ্রাবিড়" এইরূপ বিভাগ অমূলক নহে। বর্ত্তমান সময়েও কাশীতে এইরূপ বিভাগের কথা শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চ গৌড়ে"র অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হন। বোধ হয়, উত্তরাপথে বিশেষ বিশেষ সময়ে গৌড়ের অধিক প্রাধান্য ছিল, এই কারণে সমগ্র উত্তরাপথের ব্রাহ্মণগণ "গৌড়" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দাক্ষিণাত্যেও দ্রাবিড়ের প্রাধান্যবশতঃ সকল ব্রাহ্মণকেই "পঞ্চদ্রাবিড়ে"র অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তর-ভারতে মারোয়াড়ী ব্রাহ্মণগণই "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ "গৌড় ব্রাহ্মণ"

(৩) কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও পঞ্জাবের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সারস্বত ব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

নামে প্রসিদ্ধ নহেন। কাশীতে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, যেমন বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর এক সময়ে যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজপুতানা প্রদেশের কোনও রাজা তান্ত্রিক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইবার অভিপ্রায়ে গৌড় হইতে ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহূত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে বিখ্যাত। কয়েক জন সুপণ্ডিত গৌড়-ব্রাহ্মণের নিকটও আমরা এ কথা শুনিয়াছি। বঙ্গদেশে বহু কাল হইতে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার; বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শান্তিস্বস্ত্যয়নে সুনিপুণ, এখনও এ কথা অন্য দেশের লোকের নিকট সুবিশ্রুত। কাজেই এই রূপ কারণে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের দেশান্তরে আমন্ত্রণ, একেবারে অসম্ভব নহে। বিদেশেই দেশের নামে পরিচয় দিতে হয়। কাশীতে অথবা অন্য দেশে বাঙ্গালী-দিগকে "আমরা বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতে হয়; নিজের দেশে বা গ্রামে এরূপ পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বে যে সকল গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য রাজপুতানায় আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশে স্বদেশ "গৌড়ে"র নামে পরিচিত হইতেন; এই পরিচয় হইতে তাঁহারা ক্রমে "গৌড়-ব্রাহ্মণ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

দক্ষিণাপথবাসী আচার্য্য দণ্ডী তাঁহার "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতি-(style)-র বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা-প্রসঙ্গে দণ্ডী এক স্থানে "গৌড়ী" রীতিকে পূর্ব্বদেশীয় রচনাপদ্ধতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; (৪) অন্য এক স্থলে তিনি গৌড়দেশীয়গণকে পূর্ব্ব-দেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৫) ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আচার্য্য দণ্ডী পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত দেশবিশেষকে গৌড় বলিয়া জানিতেন। পূর্ব্বোক্ত কারণেই মারোয়াড়ী ব্রাহ্মণগণের "গৌড় ব্রাহ্মণ"রূপে প্রসিদ্ধি হইয়াছে, ইহা আচার্য্য দণ্ডীর উক্ত উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। "গৌড়-ব্রাহ্মণ" এই নামমাত্র দেখিয়া বঙ্গের বাহিরে একটা গৌড় দেশের কল্পনা করিলে, আচার্য্য দণ্ডীর উক্তি অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে।

এখানে "গৌড়" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, বোধ হয়, অনুচিত হইবে না। এই দেশে অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হয়, এই জন্য 'গুড়ের

---

(৪) "পৌরস্ত্যা কাব্যপদ্ধতিঃ"—১ম পরিচ্ছেদ, ৫০ শ্লোক।

(৫) "ইতি কাব্যেঽপি পৌরস্ত্যা বহ্বোজস্বিনীর্গিরঃ।"—১ম পরিচ্ছেদ, ৮০ শ্লোক।

দেশ' এই অর্থে 'গৌড়' এই রূপ নাম হইয়াছে। (৬) পূর্ব্বে আমরা পাণিনির যে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সূত্রের উদাহরণ "গৌড়পুর" এইরূপ হইবে। কাশিকা ও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই উদাহরণই দেওয়া হইয়াছে। "গৌড়পুর" এই শব্দটীতে "গৌড়" শব্দের অন্তোদাত্তত্ব-বিধানের জন্য পাণিনি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, পাণিনির সময়ে "গৌড়পুর" শব্দটী প্রসিদ্ধ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় নগরের নামের শেষে "পুর" শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "গৌড়পুর" এই নাম গৌড় দেশের নগরেরই হওয়া সম্ভব, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এখন মালদহ জেলায় গৌড়ের যে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ "গৌড়" কি প্রাচীন সময়ে, অন্ততঃ পাণিনির আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত,—"গৌড়পুর" নামে বিখ্যাত ছিল? 'পুর' শব্দ অনেক নগরেরই নামের অন্তে সংযুক্ত ছিল, এই জন্য 'গৌড়' শব্দটাই নগরের বিশেষত্বজ্ঞাপক; সংক্ষেপে উচ্চারণের অনুরোধে, কেবল "গৌড়" শব্দই প্রযুক্ত করা হইত; এই রূপে পরবর্ত্তী কালে নগরের নাম কেবল "গৌড়"রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে উচ্চারণ করিবার জন্য আধুনিক নামগুলিও অনেক সময়ে অসম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও এ রীতি অপ্রচলিত ছিল না। নামের এক দেশের দ্বারাও সমগ্র-নাম-বোধ্য অভিপ্রেত বস্তুর বোধ হইয়া থাকে, ইহা মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকায় লিখিয়াছেন। তিনি প্রমাণরূপে "নামৈকদেশগ্রহণে নামগ্রহণম্" এই ন্যায়টীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৭) কাশিকা-কার লিখিয়াছেন,—প্রত্যয় না হইলেও, পূর্ব্ব পদ এবং উত্তর পদের বিকল্পে লোপ হইয়া থাকে। যেমন, দেবদত্ত এই স্থলে দেব ও দত্ত, এই উভয়েরই পর্য্যায়ক্রমে লোপ হইয়া, কেবল "দেব" অথবা কেবল "দত্ত" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। (৮) ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, পতঞ্জলি এইরূপ এক দেশের প্রয়োগের কথা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) সেই স্থলে কৈয়টোপাধ্যায়-প্রণীত

---

(৬) গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়ঃ। গুড়+অণ্=গৌড়ঃ। 'তস্যেদম্"। অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১২০।

(৭) কিরাতার্জ্জুনীয়, ১ম সর্গ, ২৪ শ্লোক।

(৮) বিনাপি প্রত্যয়েন পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্বিভাষা লোপো বক্তব্যঃ। দেবদত্তঃ দত্তঃ দেব ইতি বা: কাশিকা; ৫।৩।৮৩।

(৯) অথবা পূর্ব্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্যথা দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। মহাভাষ্য; ১।১।১ আঃ।

মহাভাষ্য-প্রদীপে এই কথাই সমালোচিত হইয়াছে। (১০) মহাভাষ্যের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় আহ্নিকে ভগবান্ পতঞ্জলি এইরূপ স্থলে—প্রত্যয় না হইলেও পূর্ব্ব এবং উত্তর পদের বিকল্পে লোপের বিধান করিয়াছেন; মহাভাষ্য-প্রদীপে এই ভাষ্যপংক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১১) অতএব "গৌড়পুর" এই নামই পরিবর্ত্তিত হইয়া, কালে কেবল "গৌড়"-রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

এই গৌড় দেশের জনসাধারণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা "গৌড়ী" প্রাকৃত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বররুচির "প্রাকৃত-প্রকাশে" "গৌড়ী" প্রাকৃতের উল্লেখ নাই। আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে "গৌড়ী" প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। (১২)

সংস্কৃত কবিতার রচনাপদ্ধতিকে "রীতি" বলে। (১৩) বামনের মতে, এই রীতি তিন প্রকার, বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া বা গৌড়ী, এবং পাঞ্চালী। (১৪) সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ চারি প্রকার রীতি স্বীকার করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে লাটীও একটী স্বতন্ত্র রীতি। (১৫) বাগ্‌ভটালঙ্কার ও সরস্বতী-

(১০) অধ্যবেতি। কথং পুনর্দেবদত্তশব্দে সংজ্ঞাত্বেন বিনিযুক্তে একদেশঃ প্রযুজ্যতে। ন হ্যসৌ সংজ্ঞাত্বেন বিনিযুক্তঃ। নচৈকদেশাৎ স্বর্থাবাপস্য সমুদায়স্য বাচকত্বমুপপদ্যতে। প্রতীয়মানস্য প্রত্যায়কত্বানবাদ্ভূচ্ছার্থামাপস্যৈব বাচকত্বাৎ। এবং তর্হি অব্যুৎপাদিতেভ্যো বয়স রূপাঃ সংজ্ঞাবিনিয়োগকালে বিনিযুক্তা এব। লোপস্তু বর্ণানাং সাধুত্বং মাত্রমিত্যাখ্যায়তে।—কৈয়ট।

(১১) অপ্রত্যয়ে তৌ খেষৈঃ। দেবদত্তো দত্তঃ। মহাভাষ্য অপ্রত্যয় ইতি। প্রত্যয়া-ভাবেঽপি পূর্ব্বোত্তরপদয়োরন্যতরস্য বা লোপ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে তু পূর্ব্বপদলোপ উদাহরণ-মাত্রম্।—কৈয়ট।

(১২) শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।

যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥—১ম পরিচ্ছেদ, ৩৫ শ্লোক।

(১৩) বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। ৭—৮ সূত্র, প্রথমাধিকরণ, ২য় অধ্যায়,—কাব্যালঙ্কারসূত্র।

বৈদর্ভাদিকৃতঃ পন্থাঃ কাব্যে মার্গ ইতি স্মৃতঃ।

রীঙ্ গতাবিতি ধাতোঃ সা ব্যুৎপত্ত্যা রীতিরুচ্যতে। ২৭। ২য় পরিচ্ছেদ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ।

(১৪) সা ত্রিধা। ৯। সা চেয়ং রীতিস্ত্রিধা ভিদ্যতে বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি—১ম অধিকরণ, ২য় পরিচ্ছেদ।

(১৫) পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ। উপকর্ত্রী রসাদীনাং সা পুনঃ স্যাচ্চতুর্ব্বিধা॥ বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা। ১—২। সাহিত্যদর্পণ, ৯ম পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠাভরণে ছয় প্রকার রীতি স্বীকৃত হইয়াছে। (১৬) সকলেই গৌড়ী রীতি স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য দণ্ডী নিজে দাক্ষিণাত্য; তিনি স্বদেশীয় বৈদর্ভী রীতিকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্য রীতির সহিত বৈদর্ভী রীতির তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই; একমাত্র গৌড়ী রীতির সহিতই বৈদর্ভী রীতির তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। (১৭) ইহা দ্বারা অন্য রীতি অপেক্ষা গৌড়ী রীতির প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। প্রাচীন কালে গৌড়ী রীতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা আমরা বাণভট্টের রচনা হইতেও বুঝিতে পারি। বাণভট্টের রচনাপদ্ধতির পর্য্যালোচনা করিলে, তিনি কাশ্মীরী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের গৌড় দেশে মৃত্যু হইয়াছিল। বাণভট্ট লিখিয়াছেন,—গৌড়াধিপ স্বগৃহে নিরস্ত্র অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করিয়াছিলেন। (১৮) এই কারণে গৌড় দেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল না। তাই তিনি হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বিভিন্ন দেশের রচনাপদ্ধতির উল্লেখ-প্রসঙ্গে গৌড়দেশীয় রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥—প্রথম উচ্ছ্বাস—৭ শ্লোক।

গৌড়দেশীয় রচনাপদ্ধতিতে অক্ষরের অর্থাৎ শব্দের আড়ম্বর আছে। "অক্ষর-ডম্বরঃ" এই কথাটুকু ছোট হইলেও, ইহার মধ্যেই তীব্র অনাদরের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।—কেবল অক্ষরের আড়ম্বরই আছে, অর্থগৌরব বা অলঙ্কার, কিছুই নাই। দণ্ডীও গৌড়ীয় রীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অন্য-দেশীয় অভিমানী লেখকেরা অবসরমত গৌড়ী রীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও, গৌড়দেশীয় কোনও লেখক অন্য দেশীয় রচনাপদ্ধতির প্রতি কোনরূপ অনুচিত উক্তি করিয়াছেন, এরূপ আমরা জানি না। ইহা গৌড়দেশীয় লেখক-গণের প্রশংসার কথা, সন্দেহ নাই।

কাব্যপ্রকাশ-কার মম্মট-ভট্টের মতে রীতি ত্রিবিধ। কিন্তু তিনি ইহার নাম

---

(১৬) বৈদর্ভী সাথ পাঞ্চালী গৌড়ীয়াবন্তিকা তথা।
লাটীয়া মাগধী চেতি ষোঢ়া রীতির্নিগদ্যতে॥ ২৮

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ২য় পরিচ্ছেদ, বাগভট্টালঙ্কারের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১৭) কাব্যাদর্শ—প্রথম পরিচ্ছেদ—৪০—১০১ শ্লোক।

(১৮) ...তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ॥ হর্ষচরিত—ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

"রীতি" স্থলে "বৃত্তি" রাখিয়াছেন। বামন যাহাকে 'বৈদর্ভী রীতি' বলিয়াছেন, মম্মট তাহাকে "উপনাগরিকা বৃত্তি" বলিয়াছেন; বামনের "গৌড়ী রীতি" কাব্যপ্রকাশে "পরুষা বৃত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। "পাঞ্চালী রীতি" কাব্যপ্রকাশে "কোমলা বৃত্তি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, এই কোমলা বৃত্তির নাম "গ্রাম্যা বৃত্তি"। কাব্যপ্রকাশের নবম উল্লাসে ৮০—৮১ কারিকায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই কাব্যপ্রকাশেও গৌড়ী রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই; ইহার নামান্তর কল্পিত হইয়াছে, এইমাত্র।

যদিও কোনও কোনও লেখক গৌড়ীয় রচনাপদ্ধতির নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তথাপি নিরপেক্ষ আলঙ্কারিকগণ গৌড়ী রীতির উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের বিখ্যাত টীকাকার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নাগেশ ভট্ট দাক্ষিণাত্যদেশীয় ছিলেন। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই নাগেশ ভট্ট কাব্যপ্রকাশের টীকা কাব্যপ্রদীপের কাব্যপ্রদীপোদ্দ্যোত নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই কাব্যপ্রদীপোদ্দ্যোত গ্রন্থে প্রসাদ ও ওজোগুণের অভিব্যঞ্জক-বর্ণযুক্ত রচনাপদ্ধতিকে "গৌড়ী" বলা হইয়াছে। (১৯) এই গ্রন্থের মতে, গৌড়ী রীতি রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসের উপযোগিনী। (২০) গৌড়ী রীতি রৌদ্র ও বীর রসের উপযোগিনী, ইহা বাগ্‌ভটালঙ্কারেও স্বীকৃত হইয়াছে। (২১) অন্য একটী আলঙ্কারিক-কারিকাতেও গৌড়ী রীতি রৌদ্ররসের উপযোগিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (২২)

গৌড়ী রীতি শৃঙ্গার রসেরও উপযোগিনী। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী গৌড়ী রীতিতেই লিখিত। এই গীতগোবিন্দের পদলালিত্যে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ চিরমুগ্ধ। সম্প্রতি প্রতীচ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের হৃদয়ও জয়দেবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ম্যাকডনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দকেই সংস্কৃত ভাষার রচনামাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুত

(১৯) প্রসাদৌজোব্যঞ্জকবর্ণবতী গৌড়ী—৮ম উল্লাস, ৩৭ কারিকাব্যাখ্যা।

(২০) এষা গৌড়ী রীতী রৌদ্রবীরবীভৎসেষু—" ৭৫ কারিকাব্যাখ্যা।

(২১) "গৌড়ী বীররসে চ রৌদ্ররসে"—৩ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(২২)—"গৌড়ীং রৌদ্রে কুর্য্যাৎ যথা বইবেবোচিতং সুকবিঃ।"

৮ম উল্লাসের ৭৪ কারিকাব্যাখ্যায় কাব্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে উদ্ধৃত কারিকা।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতে, কালিদাসও গৌড়ী রীতির অনুসরণ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন; ভবভূতির কবিতাও গৌড়ী রীতিতে রচিত। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার গৌড়ী রীতিতে রচিত হইয়াছে। যেখানেই রচনাকে সতেজ ও সুন্দর করিবার প্রয়োজন, সেই স্থলেই সর্ব্বদেশীয় কবিগণ গৌড়ী রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত তাম্রশাসন-রচনাতেই গৌড়ী রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। নেপালের রচিত প্রাচীন কবিতাতেও গৌড়ী রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। "পুরশ্চর্য্যার্ণব" নামক নেপালে রচিত প্রাচীন গ্রন্থের প্রারম্ভের হৃদয়গ্রাহিনী কবিতাগুলি গৌড়ী রীতিতেই রচিত। কাশীর বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কমলাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাগা ভট্ট নামে প্রসিদ্ধ বিশ্বেশ্বর ভট্ট রায়গড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজীর অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ভট্টবংশ কাশীতে অতিশয় সম্মানিত। এখনও কাশীতে অধ্যাপক-বিদায় হইলে প্রথমে ভট্টবংশের পূজা হইয়া থাকে। কমলাকর ভট্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে "নির্ণয়সিন্ধু" নামে এক নিবন্ধ রচনা করেন। নির্ণয়সিন্ধু-রচনায় রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের সহায়তা গৃহীত হইয়াছিল, ইহা গ্রন্থের উপক্রমে লিখিত "আলোচ্য তত্ত্বমথ তীর্থকৃতাং পরেষাম্" এই শ্লোকাংশ হইতে জানিতে পারা যায়। এই নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে স্থলবিশেষে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের অভিমতের উল্লেখ-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ "গৌড়" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (২৩) বঙ্গের বাহিরে কাশী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে প্রধানতঃ এই নির্ণয়সিন্ধুর মতানুসারেই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

(২৩) যথা দুর্গোৎসবপ্রকরণে—

"কেশসংস্কারদ্রব্যাণি দদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে। পক্কতৈলং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংযমহেতবে॥ পট্টডোরমিতি গৌড়পাঠঃ।"

"তত্রাপি ঘটিকাতো ন্যূনত্বে পরা ন কার্য্যা। ব্রতোপবাসনিয়মে ঘটিকৈকাপি যা ভবেদিতি দেবলোক্তেরিতি গৌড়াঃ। দাক্ষিণাত্যাস্তু পূর্ব্ববচনমদৃষ্ট্বা যুগ্মবাক্যাৎ পূর্ব্বাং কুর্ব্বন্তি।"

"নন্দিকা প্রতিপত্তিথিরিতি মৈথিলাঃ বর্জ্জিতি গৌড়াঃ।

"কেচিৎ তু মুহূর্ত্তমাত্রেতি বচনাত্ততো ন্যূনত্বে পরা নেত্যাহুঃ। গৌড়া অপ্যেবম্।"—ইত্যাদি।

হৃদয়-শ্মশান।

ঘ

[পারিজাতের কথা।]

১

ঘটনাচক্রে সত্য যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে সত্য প্রতিপন্ন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সুতরাং আমি যদি আজ বলি, পতির প্রতি প্রেমের প্রাবল্যই আমার ভগিনী পারুলের সকল দুঃখের কারণ—তবে অনেকে হয় ত সে কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। আমি কিন্তু জানি, তাহাই সত্য; এবং সে কথা আমি যেমন জানি তেমন আর কেহ জানে কি না সন্দেহ।

কিন্তু প্রেমের যে উদারতা প্রেমাস্পদের সব ত্রুটীও অবহেলা করিতে পারে, যাহাতে পত্নীকে আপনার সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া—মান অপমান অবহেলা করিয়া পতির সুখবিধানেই জীবন উৎসৃষ্ট করিতে শিখায়—পারুলের প্রেমে সে উদারতার অভাব ছিল। তাহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, সন্দেহ; দ্বিতীয়, স্বামীকে একান্তই আপনার পাইবার অধিকার-সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস। এই দুইটি কারণ পরস্পরকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই যে সন্দেহ ইহা আমাদের বংশানুক্রমে লব্ধ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রকৃতিতে বিজড়িত। আমার মা ইহা তাঁহার মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পাইয়াছিলাম। আমাদের মাতামহ বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন—অসামান্যা সুন্দরী পত্নীর সৌন্দর্য্য ও চিত্তরঞ্জন ব্যবহারও তাঁহাকে গৃহেই আকর্ষণকেন্দ্র রচনা করাইতে পারে নাই। তাঁহার সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য মাতামহীর যে সন্দেহসঞ্জাত শঙ্কা ছিল তাহাই আমাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ। আমার বাবা ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার প্রতি মার সন্দেহের কারণ বড় ঘটিত না; ঘটিলেও বাবা সে দিকে দৃষ্টি দিতেন না—তাহা আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। তাই মার পক্ষে তাহা অসুখের কারণ হয় নাই। আমার স্বামী আমার এই দৌর্ব্বল্যটুকু একান্তই "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" হিসাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বন্যায় ভাসাইয়া দেন। কিন্তু পারুলের ভাগ্যে তাহা হয় নাই। বিনয়মাধব অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকায় তাহার এই দৌর্ব্বল্যটুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিত এবং তাহার প্রতি অকারণ সন্দেহে ব্যথিত হইত। ফলে পারুলের যে মান রঙ্গব্যঙ্গের বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারিত তাহা অপগত হইতে না পারিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিত; স্ত্রীর মান

স্বামী অপমান মনে করিলে যাহা হয়, তাহাই হইত, দুই জনেরই মন ভার হইয়া থাকিত।

তাহার পর স্বামীকে একান্ত তাহারই পাইবার অধিকার-সম্বন্ধে তাহার ধারণার কথা বলিব। প্রথম প্রণয়-বিকাশ-কালে, নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রেমাকুলতার সময় সকল স্ত্রীই মনে করে, স্বামী একান্ত তাহারই। যাহার জন্য সে পরিচিত পুরাতন ত্যাগ করিয়াছে—যাহার প্রতি প্রেমের প্রগাঢ়তায় সে পিতামাতাকেও পর ভাবিয়াছে—যে স্বামী তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব, বুঝি পরকালেরও সম্বল, যে স্বামী একাধারে সখা ও দেবতা, যে স্বামীর সামান্য সুখের জন্য সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে, সেই স্বামী তাহারই। স্বামীর যে জীবনে ও সংসারে আরও আকর্ষণ থাকে; স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য যে স্বামীর আরও বহু কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম, তাহা বুঝিতে স্ত্রীর বিলম্ব হয়। প্রথমে তাহা বুঝিতে অস্বীকার করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; তাহাই প্রেমের পরিচায়ক। এই যে ভাব, পারুলের পক্ষে ইহাও প্রবল হইবার বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বাবা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতাইয়াছিলেন। সে সংসারে বাবা আর মা। কাজেই সংসারে আরও দশ জনের প্রতি পুরুষের কত কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, বৃহৎ সংসারে আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক সময় অবহেলা না করিলে যে সংসারের যন্ত্র অবাধে চলিতে পারে না, এ সব বুঝিবার সুযোগ আমরা বাল্যকালে—পিতৃগৃহে পাই নাই। সে হিসাবে আমাদের শিক্ষারই দোষ ছিল। শেষে সংসারের যে অভিজ্ঞতায় সে ত্রুটী সংশোধিত হয়, পারুল সে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদের স্বামিস্ত্রীতে মনোমালিন্যে তাহার হৃদয় এমনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে অভিজ্ঞতার শিক্ষার প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। যে নম্রতায় শিক্ষার পথ সুগম হয়, সে নম্রতা সে পরিহার করিয়াছিল। তাহার অভিমান আপনার প্রতি অবহেলা মনে করিয়া বিরূপ বিন্দুমাধবও ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহাকে সে শিক্ষা দেয় নাই। তাহার শাশুড়ীর ত সে শিক্ষা দিবার যোগ্যতাই ছিল না। এক জন তাহাকে সে শিক্ষা দিতে পারিতেন, দিতেও ছিলেন। তিনি তাহার দিদিশাশুড়ী। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষালাভের সুযোগ হইতেও পারুলকে বঞ্চিত করিয়াছিল। সে তাহার ভাগ্য-দোষ। দ্বিতীয়তঃ—সে খানিকটা লিখাপড়া শিখিয়াছিল এবং শত শত উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। সেই সব উপন্যাসের অসম্ভব আদর্শের কুজ্ঝটিকায় সে বাস্তবকে বিকৃত দেখিত; সে মনে করিত, যে প্রেম

তাহার কল্পিত আদর্শের অনুরূপ নহে, তাহা প্রেমই নহে! বিন্দুমাধবের সঙ্গে তাহার মনান্তরের কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি যখনই বলিয়াছি, "সংসার কল্পনার নন্দন নহে—এখানে সবই মনের মত হয় না। যাহা পাই তাহাতেই সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিতে হয়।" তখনই সে বলিয়াছে, "দিদি, ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি কোনও কালে এক মত হইতে পারিব না। সবতাতে গোঁজামিল চলে, স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধে চলে না।" এ বিষয়ে তাহাকে বুঝান আমার সাধ্যাতীত ছিল।

বিষে বিষক্ষয় হয়, কথাটা সত্য কি না জানি না; তবে বিষে যে বিষের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বিন্দুমাধবও মনে করিত, যে প্রেম তাহার দোষানুসন্ধান করে, এবং যে স্থানে তাহার কোনও অপরাধই নাই, সে স্থানেও দোষ কল্পনা করে, সে প্রেম প্রেমই নহে; সুতরাং তাহার প্রতি পারুলের ব্যবহার প্রেমের অভাবই প্রকাশ করে। যে স্থানে প্রেম নাই, সে স্থানে প্রেমের ভাণ কেবল যন্ত্রণা; সুতরাং সে আপনাকে পারুলের জীবন হইতে যথাসম্ভব দূরে লইতেই চেষ্টা করিত।

শাশুড়ীর ব্যবহারে যত বিরক্তি ও বেদনা, পারুল সে সকলের জন্য বিন্দুমাধবের উপরই অভিমান করিত, এবং বিন্দুমাধব সে অভিমানকে অবহেলা মনে করিত।

২

পারুলের শাশুড়ীর ব্যবহারে যে বেদনার কারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মেয়েলী কথায় যাহাতে "ঘর পোড়ানী পর ভুলানী" বলি, তিনি সেই শ্রেণীর লোক। বাহিরের লোকের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার যেমন চমৎকার, ঘরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার তেমনই আপত্তিজনক। শাশুড়ী, যা, ননদ, কাহারও সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেন নাই; বধূদ্বয়ের সঙ্গেও নহে। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে স্নেহ যেন উপচিয়া পড়িত। পারুলের বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয়, সেই পরিচয়ের সূত্রেই বিন্দুমাধবের সঙ্গে পারুলের বিবাহ হয়। আমি তাঁহার এক মেয়ের সঙ্গে স্কুলে এক সঙ্গে পড়িতাম, স্কুলের গাড়ী আমাকে লইয়া তাহাকে লইতে যাইত, এবং তাহাকে নামাইয়া তবে আমাকে নামাইতে আসিত।

এক দিন নর্ম্মদা তাহাদের বাড়ীর দরজায় নামিয়া যাইবার পরই আর একখানা গাড়ীর সঙ্গে আমাদের স্কুলের গাড়ীর ধাক্কা লাগিল, একখানা চাকা

ভাঙ্গিয়া গেল। স্কুলের গাড়ীর ঘোড়াটা অত্যন্ত বৃদ্ধ, নহিলে একটা বিভ্রাট ঘটিত। কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নামিয়া পড়িতে হইল। সহিস ভাড়া গাড়ী আনিতে গেল, আমরা কয়টি মেয়ে নর্ম্মদাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীর লোকরা আদর করিয়া আমাদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং জলযোগ না করাইয়া বাড়ী ফিরিতে দিলেন না। সে দিন বিন্দুমাধবের পিতামহীর ও জ্যেঠাইমার আদর যত্নে আমরা এক দিনেই যেন তাঁহাদের আপনার হইয়া গেলাম। ঠাকুরমা আমাকে বিশেষ আদর করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "যেন ঘর আলোকরা মেয়ে।"

নর্ম্মদা তাহার মার বড় আদরের মেয়ে, তাহার "বন্ধু" বলিয়া তাহার মাতা আমাকেও স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন—নর্ম্মদা আমাদের বাড়ী যাইতে লাগিল; ও আমি তাহাদের বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিলাম। নর্ম্মদার অন্যায় আব্দার-গুলিও তাহার মা সহ্য করিতেন, যখন তখন সে আমাকে যেরূপ মূল্যবান উপহার দিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে বাবা একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "এ সব বাড়াবাড়ি কেন?" কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তিনি আপত্তি স্পষ্ট করিয়া জানাইতে পারিলেন না। মা বলিলেন, "আর কয় দিনই বা. দুই জনেরই বিবাহের বয়স হইল। তাহার পর কে কোথায় থাকিবে!" বাল্যসঙ্গীদিগের বিস্মৃত কথা স্মরণ করিয়া মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু আমাদের বিবাহের পরও সে ঘনিষ্ঠতার অবসান হইল না। আমার শ্বশুরবাড়ী পাড়াতেই হইল—নর্ম্মদা প্রায়ই বাপের বাড়ী আসিত ও থাকিত। কাজেই আমাদের উভয়ে প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত।

এই সময় বিন্দুমাধবের বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল। রূপবান, ধনশালী, বিদ্বান যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অনেক মেয়ের বাপই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু নর্ম্মদা ধরিয়া বসিল, আমার ভগিনীর সঙ্গে বিবাহ দিতেই হইবে। নর্ম্মদার মতেই তাহার মাতার মত। ঠাকুরমা প্রস্তাব শুনিবা মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কেন না তিনি "গোরার" (তিনি বলিতেন গোরো) বড় পক্ষপাতী ছিলেন—বলিতেন, "ধোপ কাপড়ের নেকড়াও ভাল।"

ছেলের পক্ষ হইতেই যখন প্রস্তাব আসিল, তখন তাহাতে আর কথা কি? বাবা ও মা উভয়েই সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। কেবল বাবার এক মাসীমাকে বলিলেন—"বৌ, কুটুম্বিতায় কিন্তু সুখ হইবে না।" মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" তিনি বলিলেন, "তোমার বেহাইনের মুখে হাসি নাই।

যে লোক হাসে না, তাহার মন ভাল হয় না।" মাসীমার কথা শুনিয়া মা হাসিলেন, সে কথায় আর কেহ মন দিল না।

পারুলের সঙ্গে বিন্দুমাধবের বিবাহ হইয়া গেল।

৩

বাবার মাসীমার কথা কত সত্য তাহা আমরা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। যে ঝি পারুলকে "ঘর করাইতে" গিয়াছিল, সে-ই আসিয়া মাকে বলিল, "সবই ভাল, মা। কেবল তোমার বেহাইন বড় দেমাকে, আর চালচলন কথাবার্ত্তা যেন পুরুষ মানুষের মত।" মা বলিলেন, "তোর যেমন কথা!" সে বলিল, "তবে তাও বলি, মা, সে জন্য ভাবনা নাই—যে দিদিশাশুড়ী আছেন! নাতি নাতনী নাতবৌ নিয়ে যেন ষষ্ঠীবুড়ীর মত সদাই আনন্দে আছেন। মাটীর মানুষ, কিন্তু সংসারটি যেন হাতের তেলোয় করে রেখেছেন।" তাহাই বটে। দিদিশাশুড়ীর স্নেহে ও যত্নে শাশুড়ীর ভাবের অভাবটা পারুল প্রথম প্রথম অনুভব করিতেই পারিত না।

কিন্তু অল্প দিনেই সেটা সপ্রকাশ হইল। প্রথম প্রেমের প্রবল আকর্ষণে তাহারা স্বামিস্ত্রী যতই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, ততই তাহাতে দিদিশাশুড়ীর আনন্দ আর শাশুড়ীর বিরক্তি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ছেলে পর হইয়া যাইতেছে, এইরূপ আশঙ্কায় বধূর প্রতি শাশুড়ীর বিরক্তি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। যে ছেলে স্বভাবতঃ বড় আপনার ছিল না, বড় ছেলের ব্যবহারের সঙ্গে যাহার ব্যবহারের তুলনা করিয়া তিনি বরাবরই তাহাকে একটু "পর" ভাবিতেন, সে ছেলে যে অতি সহজেই একেবারে পর হইয়া যাইতে পারে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কিন্তু সংসারে শাশুড়ীরই একাধিপত্য, বড় মা' তাঁহার ছায়ার মত; তাই শাশুড়ীর বিরক্তি ব্যবহারে ও মনের ভাবেই ফুটিয়া উঠিত, আর কিছু করিতে পারিত না।

তবুও সেই ব্যবহার পারুলকে ব্যথিত করিত। আর তাহার ব্যথা অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীর উপরই পড়িত। স্বামী কেন তাহার প্রতীকার করেন না? প্রতীকারের পথ যে কত কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ তাহা সে বুঝিত না। সে যৌবনের দোষ—প্রেমের অবিচার—অনভিজ্ঞতার অপরাধ। কিন্তু সাধারণতঃ যুবক স্ত্রীর এই "অপরাধ" অপরাধ বলিয়া মনে করে না, তাহা অভিমানের নামে পরিচিত হয়, এবং প্রেমের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করে। অভাগিনী পারুলের ভাগ্যে কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তাহার এই অভিমান, অকারণ কোপ বিন্দু-

মাধব অন্য ভাবে গ্রহণ করিল; সে ভাবিল তাহাকে সত্য সত্যই ভালবাসিলে পারুল তাহাকে ভুল বুঝিত না—প্রেমের অভাবজনিত তাচ্ছল্যেই পারুল তেমন করিতেছে। কোনও কোনও ফলের ত্বক বিস্বাদ কিন্তু শস্য মধুর—যে ত্বক ফেলিয়া দিয়া শস্য গ্রহণ করিতে না জানে, সে ফলটিকেই বিস্বাদ মনে করে। বিন্দুমাধবেরও তাহাই হইল। সেও অভিমান। কিন্তু সে যেমন পারুলের অভিমানের মর্য্যাদা না বুঝিয়া তাহাকে অবহেলা মনে করিল, পারুলও তেমনই তাহার অভিমানের স্বরূপ না বুঝিয়া তাহা অপমান মনে করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল—কেন এমন হয়?

এ দিকে পারুলের ব্যবহারে বিন্দুমাধবের মনে সর্ব্ব বিষয়ে বিরক্তিভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল; জীবনে যেন তাহার আর কোনও আকর্ষণ রহিল না—আকাঙ্ক্ষার আর যেন কোনও উত্তেজনা রহিল না। সে ইচ্ছা করিলে ভাল চাকরী পাইতে পারিত—চেষ্টা করিলে আইনের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিত; সে চাকরী লইল না—পরীক্ষায় সাফল্যলাভের চেষ্টা করিল না। ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইলেন তাহার মা—কারণ, তাঁহার খরচের হাতটা কিছু অতিরিক্ত দীর্ঘ; বিশেষ নর্ম্মদাকে সদরে ও গোপনে তিনি অনেক টাকা দিতেন, সেই সব টাকা সে বাপের বাড়ীতে খরচ করিত—মা ও মেয়ে উভয়েই বলিতেন—টাকা নর্ম্মদার শ্বশুর আর স্বামী দিয়া থাকেন। মার বিরক্তি কিন্তু বিদ্ধ করিতে লাগিল পারুলকে—কথার যন্ত্রণা তাহাকেই সহ্য করিতে হইত। সেই যন্ত্রণায় সে কেবলই ভাবিত, পুরুষ মানুষের কাজে—অর্থার্জ্জনে—যশের জন্য আকাঙ্ক্ষার এত অভাব কেন? ইহার মধ্যে—অন্তঃসলিলা ফল্গুর জলধারার মত কিছু নাই ত? সন্দেহের বীজ যদি একবার হৃদয়ে পতিত হইবার সুযোগ পায়, তবে সৌধের উপর বটবৃক্ষের বীজের মত অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া আশ্রয়-স্থানটি শত মূলের বেষ্টনে বেষ্টিত করে। পারুলের তাহাই হইল।

এই সময় পারুলের অবস্থা দেখিয়া আমি এক দিন তাহার নিষেধ অবহেলা করিয়া বিন্দুমাধবের সঙ্গে তাহার পারিবারিক কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। মহিলাসমাজে হাস্যপরিহাস—এমন কি, অধিক বাক্যব্যয়ও বিন্দুমাধবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আকাশের এক কোণে বাত্যার শব্দ শুনিলে বিহগ যেমন ভীতিচকিত হইয়া দ্রুত পলায়ন করে, আমার কথা আরম্ভ হইতেই সে তেমনই ভাব প্রকাশ করিল—বলিল, "দেখুন, পৃথিবীতে কতকগুলা

ব্যাপার নিতান্ত যাহার সে ছাড়া আর কেহ ঠিক বুঝে না। 'যেখানে অন্তের লেখা ব্যথাও তথায়।' সে সব কথার আলোচনা কাহারও সঙ্গে করা যায় না।" আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

সে কথা যখন পারুলকে বলিলাম, তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দিদি, তুমি কেন অপমানিত হইতে গেলে?" আমি বলিলাম, "ইহাতে অপমান কি?" উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! বিন্দুমাধবের স্বভাব বিবেচনা করিয়া সে কথায় বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না—আমি বলিলাম, "ইহা হইতেই পারে না।" তখন সে বলিল, সে বিন্দুমাধবকে স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য ও স্ত্রীলোককে উপহার দিবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছে! আবার তাহার বেদনাবিক্ষত হৃদয়ে ক্ষারনিক্ষেপ করিবার জন্য বিন্দুমাধব বাছিয়া বাছিয়া তাহারই পছন্দমত জিনিস কিনিয়াছে। যে পাড়ের শাটী সে পছন্দ করে, যে লেসটি সে ভালবাসে, যে রকম চিঠির কাগজ সে ব্যবহার করে, যে গন্ধদ্রব্য তাহার প্রিয়, বিন্দুমাধব সেই সবই কিনিয়াছে। বিন্দুমাধব লুকাইবার চেষ্টা করিলেও সে সব পারুলের সন্দেহতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম—তবুও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পারুলকে বলিলাম, "হয় ত তুই ভুল দেখিয়াছিলি।" সে বলিল, "আপনার চোখকে অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া, দিদি?" তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া—যেন আপনার মনে বলিল, "যদি দেখিয়াও অবিশ্বাস করিতে পারিতাম!" এই কয়টি কথায় তাহার হৃদয়ের যে বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। আমি তাহাকে আমার বক্ষে টানিয়া লইলাম। দুই ভগিনীতে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন অবস্থায় স্ত্রীলোকের আর কি সান্ত্বনা থাকিতে পারে?

৪

যখন এইরূপ অবস্থায় পারুল স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইল, মনে করিল—তাহার সুখের আশাদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে—তখন সে সংসারে জুড়াইবার একটু স্থানও পাইল না। সংসার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরমার মৃত্যুতে পারুলের পক্ষে স্নেহের আশ্রয় নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর জ্যেঠাইমা চলিয়া গিয়াছিলেন। কাকীমা একটু তফাৎ তফাৎই থাকিতেন। শাশুড়ী তাহার উপর বিরক্ত। যা'র মনে যাহাই থাকুক, মুখে তিনি শাশুড়ীরই

আনুগত্য করিতেন। কারণ তাঁহার স্বামী সর্ব্বতোভাবে মার উপর নির্ভরশীল এবং শাশুড়ীর আনুগত্যে সুখ না থাকিলেও শান্তির উপায় ছিল। তবুও মানুষ স্নেহ ভালবাসার একটা অবলম্বন সন্ধান করে। তাই সে স্নেহে কন্যাকেই আঁকড়িয়া ধরিল। তাহার মধ্যে হারাইবার আশঙ্কাটা প্রবল ছিল—তাই সে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে—পাছে হারায় এমনই ভাবে—কন্যাকে সর্ব্বদা আপনার কাছে রাখিত। তাহার এই "আধিক্যেতা"য় তাহার শাশুড়ী বলিতেন, তিনি কি বিন্দুমাধবের সৎ মা যে, তাহার মেয়ে তাঁহার কাছে আসিলে ছোট বৌ বিরক্ত হয়? তাহার সতর্কভাব এই ব্যাখ্যায় পারুল ব্যথা পাইত; কিন্তু তেমন ব্যথার কারণ তাহার জীবনে এত ঘটিয়াছিল যে, সেটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত মনে করিত না। গুরুতর ব্যথার কারণ ঘটিল অন্য দিকে। তাহার স্নেহে বিন্দুমাধব অন্যরূপ উদ্দেশ্যের আরোপ করিত। সে মনে করিত, পাছে সে কন্যাকে লইয়া—কন্যাকে ভালবাসিয়া একটু সুখ পায়, সেই জন্য পারুল কিছুতেই মুরলাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহার প্রতি শত্রুতা সাধিবার জন্যই পারুল তাহার কন্যাকে তাহার পর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে বিন্দুমাধব যে বেদনা পাইত, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন পারুল তাহা বুঝিতে পারে নাই।

বিদ্যুতে বিদ্যুতের মত স্নেহে স্নেহ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পারুলের এমনই অদৃষ্ট যে, তাহার স্নেহে মুরলা যত আকৃষ্ট হইত, বিন্দুমাধবের স্নেহে তদপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইত। হয় ত বিন্দুমাধবের স্নেহ নিবিড়তর—কিন্তু সে বিচার কে করিতে পারে? পিতার স্নেহ—মাতার স্নেহ, কোন্‌টি বড়? এখন মনে হইতেছে মুরলার পিতৃভক্তি—সেও উত্তরাধিকারের ফল। যত দিন গিয়াছে, তত আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, বিন্দুমাধব যেমন তাহার পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে—মুরলাও তেমনই বিন্দুমাধবকে দেবতা মনে করিয়াছে।

কন্যার প্রতি পারুলের স্নেহসতর্কতাই বোধ হয় বিন্দুমাধবকে শেষ ভুল করিতে উত্তেজিত করিল—গৃহত্যাগী করিল।

৫

সে দিন আমি বিন্দুমাধবের বাড়ীতে ছিলাম। আমি কলিকাতায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাহার মাতা আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি আমাকে যেমন যত্ন ও আদর দেখাইতেন, পারুলের তেমনই নিন্দা করিতেন। কিন্তু আমি

কখনও তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই—পাছে তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করেন, এবং পারুলের দিদির উপর বিরক্তি তাঁহাকে বধূর প্রতি আরও বিরূপ করে; আর সেই সময় আমরা দুই জন অনেক কথার আলোচনা করিতে পারিতাম। পারুলের কথা প্রায়ই দুঃখের কথা, কিন্তু সে কথা শুনিতে—তাহার সঙ্গে কাঁদিতেও যে সুখ। গৃহিণী আমাকে বলিতেন, "আমার সোনার সংসার ছাই হইয়া গেল। ছেলে ত সন্ন্যাসী। তুমি তোমার ভগিনীকে একটু ভাল উপদেশ দাও।"

সে দিন যাইয়া শুনিলাম, বিন্দুমাধব চাকরী করিতে যাইতেছে। পারুলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "শুনিয়েছি।" কি চাকরী, কোথায় চাকরী, সে কিছুই জানে না।

বিন্দুমাধব চলিয়া গেলে আমি ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "না হয়, আজ থাক। ছোট বৌমা ত একা থাকিবে। আমি বেহাইনকে খবর দিতেছি।" ছোট বৌমার প্রতি তাঁহার এইরূপ স্নেহপ্রদর্শনে হাসি আসিল। কিন্তু আমি রহিয়া গেলাম।

রাত্রিকালে আমরা দুই ভগিনী আর মুরলা এক শয্যায় শয়ন করিলাম। বিন্দুমাধবের যাওয়া অবধি মুরলা কেবলই কাঁদিতেছিল। আমি তাহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হইতেছিল না। পারুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "মেয়ের সবতা'তেই বাড়াবাড়ি, চোখে একেবারে সাঁতার-পানি। যেন কাহারও কেহ কখন বিদেশে চাকরী করিতে যায় না!" আমি বুঝাইলাম, "আচ্ছা, আমরা কালই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিব। কেমন মুরলা?" মুরলা বলিল, "মাসীমা, বাবা আর ফিরিবেন না?" আমি বলিলাম, "ছিঃ! মা, অমন কথা বলিতে আছে?" সে বলিল, "বাবা আমাকে বলিয়াছেন। এই দেখ আলমারীর চাবি দিয়া গিয়াছেন। আমাকে সব জিনিস লইতে বলিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া সে চাবি আমাকে দিল।

বালিকার কথায় আমার আশঙ্কা হইল। তাহার সেই "আমাকে বলিয়াছেন" কথাটায় বিশ্বাসের যে প্রগাঢ়তা ছিল, তাহা সত্যসত্যই অসাধারণ। যদি তাহাই সত্য হয়? আলমারীতে বিন্দুমাধব কোনও পত্র রাখিয়া যায় নাই ত? আমি পারুলকে বলিলাম, "চল; দেখি।"

কৌতূহল নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতেছিল। সে উঠিল। মুরলাও আমাদের সঙ্গে চলিল। পার্শ্বের ঘরে যাইয়া পারুল

বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল, আমি চাবি লইয়া আলমারী খুলিলাম। যে সব জিনিস—কাপড়, লেস, চিঠির কাগজ, খাম, গন্ধদ্রব্য—পারুলের সন্দেহবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, সে সব আলমারীতে! আমি বিস্মিতভাবে ফিরিয়া তাহাকে বলিলাম, "এ কি—এ সব কি বিন্দুমাধব তোরই জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল?" সে কথা কহিল না—কহিতে পারিল না। এত অল্পক্ষণে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল! বোধ হয় সে আপনার ভ্রমাপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ভ্রমের বিষম ফলের বিষয় চিন্তা করিয়া আপনার অপরাধের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। এখন উপায় কি?

মুরলা তখন তাহার পিতার শূন্য শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। তখন পারুল তাহার ভ্রান্তিহেতু বেদনাকাতর পতির সেই শয্যায় পড়িয়া কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম; বলিলাম, "আমি ত বলিয়াছিলাম, এ সন্দেহ মনে স্থান দিবার কারণ নাই। কালই তুই একখানা পত্র লিখিয়া দিবি।" সে মুখ তুলিতে পারিল না—বলিল, "কোন্ লজ্জায় পত্র লিখিব?"

তাহার পর সে শান্ত হইল। তখন আমাদের মনে আর একটা শঙ্কার উদয় হইল—সত্যই কি বিন্দুমাধব ফিরিবে না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া মুরলা ঘুমাইয়া পড়িল, আমরা দুই ভগিনীতে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহাকে হারাইবার আশঙ্কা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই, আজ তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনায় যখন তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি সহসা অন্তর্হিত হইল, তখন পারুল বুঝিল, সে তাহার হৃদয়ের কতখানি পূর্ণ করিয়াছিল—স্বামী স্ত্রীর জীবনের কতখানি পূর্ণ করিয়া থাকেন—স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীর জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অনুভূতি। এই-টুকুই সে এত দিন বুঝিতে পারে নাই।

৬

পরদিন আমি পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, দিনের মধ্যে দুই বার সংবাদ লইলাম—বিন্দুমাধবের কোনও সংবাদ আইসে নাই। তাহার পরদিনও যখন কোনও সংবাদ আসিল না, তখন তাহার বাড়ীর লোক উদ্বিগ্ন হইলেন; শঙ্কিত হইয়া পারুল আমাকে লিখিল, "দিদি, একবার আসিও।" আমাকে যাইতে হইল।

বিন্দুমাধব তাহার যে ঠিকানা দিয়া গিয়াছিল, সেই ঠিকানায় টেলিগ্রাফ

করিয়া জানা গেল, সে তথায় যায় নাই। আর তাহার কাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানি পত্র পাইলেন—"বিন্দুমাধব কোথায়? সে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছে, সে সংসার ত্যাগ করিয়া গেল। আমাকে তাহার কন্যাকে দেখিতে বলিয়াছে। এ কি হইল?" তিনি লিখিয়াছেন, বিন্দুমাধবের এই কথায় আজ তাঁহার মনে পুরাতন বেদনা নূতন হইয়া উঠিয়াছে, বিন্দুমাধবের পিতা মৃত্যুকালে তাঁহাকেই তাঁহার পুত্র কন্যার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিন্দুমাধবের কথায় আমার মনে হইতেছে, আমার মৃত ভ্রাতা যেন লোকান্তর হইতে আমাকে তিরস্কার করিতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে সংসারে তাহার এমনই অসহ্য বেদনার কারণ হইল যে, তরুণ যৌবনে বিন্দুমাধব সংসারত্যাগী হইল?" অপরাধ তাঁহারই। তিনি ত তেমন করিয়া তাহাদের দেখিতে পারেন নাই!

তখন আর সন্দেহ রহিল না যে, বিন্দুমাধব সত্য সত্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিন্দুমাধবও কোনও দিন মনে করে নাই, তাহার প্রতি তাহার মাতার অধিক স্নেহ ছিল। কিন্তু এখন তাহার মাতা সহসা মাতৃস্নেহের বন্যা দেখাইয়া পারুলকে তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহা মনে করিলে আজও অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়। কথায় কথায় তাহার লাঞ্ছনা চলিতে লাগিল।

বিন্দুমাধবের জ্যেঠতাত সত্য সত্যই বিদেশে ব্যবসার জাল তুলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মুরলাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু পারুলকে বিন্দুমাধবের গৃহত্যাগের জন্য অপরাধী না করিয়া পারিলেন না। তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন, "সেই দেশে ফিরিলাম, যদি দুই দিন পূর্ব্বে ফিরিতাম! না জানি সে কত কষ্টই পাইয়াছে, কত কষ্টই পাইতেছে!" জ্যেঠাইমা মুখে পারুলকে কোনও কথা বলিতেন না। কিন্তু জ্যেঠা মহাশয়ের ও জ্যেঠাইমার বেদনার মৌন তিরস্কার পারুলের কাছে শাশুড়ীর প্রকাশ্য কুব্যবহারের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর বোধ হইত। তবে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া যেন অবহেলার অপরাধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্যই সংসারের সব ভার লওয়ায় পারুলের পক্ষে শাশুড়ীর প্রকাশ্য লাঞ্ছনার মাত্রা কমিয়াছিল।

কিন্তু এ সব বেদনাও সে সহ্য করিতে পারিত। তাহার অসহনীয় বেদনার কারণ যেদিক হইতে আসিল সেই দিক রক্ষা করিবার জন্যই সে প্রাণান্ত চেষ্টা

করিয়া আসিয়াছিল। যাহার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, যাহাকে একান্তই আপনার করিয়া রাখিবার জন্য সে স্বামীকেও হারাইয়াছে, সেই কন্যাই তাহার পর হইয়া গেল। এবার আর কেহ তাহাকে পর করিয়া লইল না, সে আপনি মার পর হইতে লাগিল। একে ত যে পিতার প্রতি তাহার ভালবাসা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, মাতাকে সে সেই পিতার গৃহত্যাগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, তাহাতে আবার পরিবারের আবহাওয়া মার প্রতি স্নেহের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সকলেই বলিত, পারুলের দোষেই বিন্দুমাধব চলিয়া গিয়াছে।

কেবল ইহাই নহে, বালিকার অবস্থাও পারুলের পক্ষে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। বিন্দুমাধবের গৃহত্যাগের পর হইতেই যেন তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও বিষণ্ণভাব বালসুলভ চাপল্যের ও আনন্দ-প্রিয়তার স্থান অধিকৃত করিল। সে খেলা ছাড়িয়া দিল, অনেক সময় একাকী বসিয়া কাঁদিত। সময় সময় দূরে বা অদূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে চমকিয়া উঠিত, বুঝি বিন্দুমাধবের কণ্ঠস্বর! পরক্ষণেই ভুল বুঝিতে পারিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত—তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত। তাহার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধিও যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমা তাহাকে কত যত্ন করেন, কিন্তু সে কোনও দিন তাঁহাদের কাছেও কোনও জিনিস চাহিয়া লয় নাই। এক দিন জ্যেঠাইমা সে কথা বলিলে সে অশ্রুসজল নেত্রের দৃষ্টি তাঁহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিয়াছিল, "যাহার বাবা নাই, তাহাকে কি আব্দার করিতে আছে!" এই কথা শুনিয়া পারুল সে দিন সারাদিন কাঁদিয়াছিল।

এখন তাহার ক্রন্দনই সার—যাহার জীবন বেদনাকীর্ণ তাহার অশ্রু ব্যতীত আর কি সম্বল থাকিতে পারে? বেদনার উৎসে যে অশ্রুর উদ্ভব, তাহা যাতনার তরল বহ্নিদাহ।

এমনই দুঃখে পারুলের দিন কাটিতেছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেবল তাহার দুঃখ দেখিয়াই বহিয়া যাইতেছে। তাহার প্রেমেও বেদনা—স্নেহেও বেদনা। কতবার আমি তাহাকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও আমার সঙ্গে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে কোথাও যায় না; বলে "আমার পাপে যে মন্দির হইতে দেবতার অন্তর্ধান হইয়াছে, সেই শূন্য মন্দিরে বেদনা যাতনা লাঞ্ছনার কণ্টক

বকে লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই আমার শাস্তি। আমি সেই নিয়তিনির্দ্দিষ্ট শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইব কেমন করিয়া?" আজ সন্দেহের অন্ধকারমুক্ত হৃদয়ে সে বিন্দুমাধবের প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। যে প্রেম অবহেলার অভিমানে বিন্দুমাধবকে সংসারত্যাগী করিয়াছে, তাহার প্রেম যে সে প্রেমের পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে না! আর সেই প্রেম সে পাইয়া ইচ্ছা করিয়া হারাইয়াছে! যে প্রেম স্বর্গের সুধা, সেই প্রেম সে অবহেলায় ফেলিয়া দিয়াছে!

এই দুঃখের উপর আবার কন্যার জন্য উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। সে উৎকণ্ঠার কারণও যে তাহার কর্ম্মফল তাহাতেই তাহার দুঃখের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কবে তাহার দুঃখের অবসান হইবে, কবে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে? সে ভুল করিয়াছিল, কিন্তু এত দিনের এই দুঃখেও কি সে ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? এত দিন আমরা বিন্দুমাধবের কোনও সন্ধানই পাই নাই। কিন্তু এবার আমাদের আশায় আবার অবলম্বন হইয়াছে; হয় ত তাহার সাক্ষাৎ পাইব, পারুল তাহাকে আপনার ভুল বুঝাইবার সুযোগ পাইবে। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না?

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

'অভিজাতশাসন' বা 'কুলীনতন্ত্র'।

আষাঢ়ের 'সাহিত্যে' আমরা 'প্রজাতন্ত্রে'র বিষয় সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্রমূলক 'কুলীনতন্ত্রে'র উল্লেখ করিয়াছি। মেগাস্থিনিস, সিকুলাস্ প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ নীসাকে এবংবিধ কুলীনতন্ত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কুলীনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিব। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, স্মৃতি ও সাহিত্য, এবং অপরাপর বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর, জয়াসওয়াল, প্রভৃতি আধুনিক এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অদ্য এক জন প্রথিতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চিন্তার ফল পাঠকের সমীপে উপস্থিত করিব।

ভূতপূর্ব্ব Lord Chancellor Viscount Haldane ইংলণ্ডের সুধীসমাজের শিরোমণি। তিনি উভয়ে সধুরে মণ্ডিত পণ্ডিত। ইউরোপের তীব্র সভ্যতা ও সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে

সমুদ্ভাসিত, আবার ভাবুকতার মাধুর্য্যে, দার্শনিকতার সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, জাতীয়তার গৌরবে সুশোভিত। বর্ত্তমান যুগের Janus, দুই দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কর্ম্মবহুল সুদীর্ঘ গত জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ আদর্শ আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতের 'The Eton Review' হইতে তাঁহার উপদেশের সার সঙ্কলন করিলাম।

প্রবন্ধটীর নাম Democracy and the training of the Coming Generation, 'প্রজাতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ পুরুষের শিক্ষা।'

আমার বোধ হয়, এ দেশের কোনও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই, কি মূলধনী, কি শ্রমজীবী, কেহই জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে শক্তিসঞ্চয়ের পক্ষে শিক্ষার প্রভাব ও উপযোগিতা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য শিক্ষার প্রচার সম্বন্ধে সকলেরই একটা ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে House of Lordsএ যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের পর, দশ জনের ভিতর মাত্র এক জন বালক রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাহার ফলে অযথা ও অস্বাভাবিক শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। কারণ, পরিচালনার শক্তি বা নায়কত্ব করিবার ক্ষমতা অনুসারেই লোকে সম্মান, অর্থ প্রভৃতি পাইয়া থাকে। কিন্তু পরিচালনার শক্তি মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে, মানসিক বৃত্তি আবার শিক্ষাসাপেক্ষ। ব্যবহারশাস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষকতা, বাণিজ্য, রাজ্যশাসন, সেনাবিভাগ সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়, এবং ক্রমে যত দিন যাইতেছে, তত স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, মানসিক উৎকর্ষের উপরই আমাদের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে এবং মনের উন্নতি সাধনের চেষ্টাই আমাদের কর্ত্তব্য ও যোগ্যকর্ম্ম। "On earth, there is nothing great but Man ; in Man there is nothing great but Mind." পৃথিবীতে মানবই শ্রেষ্ঠ, মানবের ভিতর আবার মনই শ্রেষ্ঠ।

আমরা অবশ্য আমাদের বালক বালিকাদিগকে মানসিক শক্তিতে সমকক্ষ করিয়া দিতে পারি না, কারণ, প্রকৃতিদেবী তাহাদিগকে অসমান করিয়া গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তিলাভের অনুকূল শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান ভাবে সুগম করিয়া দিতে পারি। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ সামাজিক অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করা। সমস্ত বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিবে কি না, এরূপ একটা অনিশ্চয়তা জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বজাতিকে পৃথিবীর সমক্ষে পূজিত, সম্মানিত করে, কিন্তু প্রতিভা সাধারণতঃ লুক্কায়িত থাকে, শিক্ষা ও সাধনার সাহচর্য্যে ফুটিয়া উঠে। শিক্ষা সকলের পক্ষে অধিগম্য করিতে হইবে, এবং সমবেত শ্রেষ্ঠ মনীষা ও প্রতিভার সাহায্যে জাতীয় জীবন গড়িতে হইবে।

এইরূপে শুধু মনীষার আবিষ্কার ও প্রয়োগে যে সম্প্রদায়গত জীবনেরই উৎকর্ষ ঘটিবে, তাহাই নহে, শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম পরস্পরের অনুকূল হইয়া উঠিবে, এবং ক্রমে শারীরিক শ্রমেরও সম্মান বাড়িবে। তড়িতবিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে,

তাহাতে আশা হয় যে, অনতিকালমধ্যে অল্প ব্যয়ে শ্রমজাত ব্যবসায়গুলি খুব উন্নতি লাভ করিবে। কলকারখানায় এইরূপ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বিশেষ আবশ্যক হইবে। কিন্তু কল-কারখানা দেখিবার জন্য বিচক্ষণ পরিচালকের প্রয়োজন। মানসিক শ্রমের সাহায্যেই শারীরিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত ও যথার্থ সুফলপ্রসূ করিতে পারা যায়। মূলধন অথবা কায়িক শ্রম এই দুইটির কোনটারই উপর আধুনিক ধনলাভ নির্ভর করে না। মূলধন বাজারে ধার করা যাইতে পারে, কায়িক শ্রমও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র প্রয়োজন, পরিচালনা শক্তির, পৃথিবীর আপাততঃ মূল্যবিহীন বস্তুনিচয়কে মহামূল্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত করিবার উপযোগী মানসিক শক্তির। সামান্য ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোপরি অবস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পর্যান্ত একটা স্তর বাঁধিতে হইবে। কে উচ্চে, কে নিম্নে, মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মানসিক উৎকর্ষের দ্বারাই তাহার নিরূপণ করা হইবে। প্রজাতন্ত্রের ভিতরে আবার একটা কুলীনতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, মানসিক বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ লইয়াই এই বুদ্ধি ও মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের গঠন করিতে হইবে। "The democratic community will contain within itself an aristocracy, but this will be an elite of talent, an aristocracy of intellect."

শ্রমজীবী সম্প্রদায় (The Labour Party) কিছু দিন পূর্ব্বেও অতি সঙ্কীর্ণ আদর্শের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব বস্তুতন্ত্রের প্রতিই তাঁহাদের বেশী প্রীতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতন্ত্রের মোহ তাঁহারা কাটাইয়া উঠিতেছেন। আজ তাঁহারা মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবিগণের সাহায্য ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। আজ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মানসিক শক্তির নিকট সকলেই নত, মানসিক বৃত্তি হইতে বিযুক্ত শারীরিক শ্রমের মূল্য অতি সামান্য। এতাবৎকাল ধরিয়া যে সকল তথাকথিত সার্ব্বভৌম ভাবের পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা দূরে সরাইয়া ফেলিতে হইতেছে। সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী বর্ণাশ্রমবিভেদ অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু মনীষার আদর্শে বর্ণাশ্রম বিভাগ, শুধু স্বাভাবিক নহে, জাতীয় জীবনের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই পৃথিবীর সার নহে, অতীন্দ্রিয়েরও অবহেলা যুক্তিযুক্ত নহে। "Man requires bread, but he does not live by bread alone. The spiritual is not less real than the material" বস্তুতন্ত্রের সেবায় যাহারা অতীন্দ্রিয় শক্তি বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে, তাহারা আত্মবঞ্চনায় লিপ্ত। জীবন ধারণের পক্ষে অন্নের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু কেবল অন্ন দ্বারাই কি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব? বাস্তব অপেক্ষা মানসিকের শক্তি কি কিছুমাত্র কম? সুখের বিষয়, শ্রমজীবিসম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জ্ঞান অর্থাৎ মনের ক্ষমতাই যথার্থ শক্তির নিদানস্বরূপ। যে দিন বুদ্ধিজীবিগণের অধীনে বিজ্ঞানের উপর উক্ত সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিন হইতে তাহাদের উন্নতির সকল বিঘ্ন দূর হইবে। একটী সম্প্রদায় বিশেষের উল্লেখ করিলাম মাত্র; কিন্তু যে দিন, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, জ্ঞানের প্রভাব, শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে, মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের (intellectual aristocracy) সৃষ্টি হইবে,

যে দিন লোকে বুঝিবে 'The spiritual alone in the real." মানসিক শক্তিই সার ও সত্য, সে দিন আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কেহ কণ্টক হইতে পারিবে না।'

উপরে উদ্ধৃত উপদেশটি পড়িবার সময়, হিন্দু আমরা, আমাদের মনে জ্ঞানবৃদ্ধ Solomon এর উক্তিটি জাগিয়া উঠে—'There is no new thing upon the earth.' পৃথিবীতে নূতন কিছুই নাই; পুরাকালে, অতীতে যাহার নিদর্শন নাই, এমন কোনও ঘটনা বর্ত্তমানে ঘটে নাই (Ecclesiastes ; 9, 10)। প্লেটো যথার্থ বলিয়াছেন, জ্ঞান স্মৃতিরই নামান্তর (*c.f.* Plato's Phædo)। সোলোমানের উক্তি 'All novelty is oblivion" (Eccles, 1. 11) অযথা বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি এক এক দেশ হইতে নষ্ট হইয়া দেশান্তরে প্রচলিত হয়। লুপ্তবিষয়ের পুনরুদ্ধার চেষ্টাই জ্ঞানচর্চ্চা। আদর্শের নাশ নাই। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যে ভাবের ভাবুক, যে সাধনার সাধক, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের পবিত্র জীবনের ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম ব্যাপারের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপটী যে আদর্শের মূর্ত্তিমান সাক্ষিস্বরূপ, আজ পাশ্চাত্যের এক জন মনস্বী জগতের সমক্ষে সেই আদর্শ লইয়া উপস্থিত।

আর্য্যধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের মূলভিত্তি ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠা। সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, বৈভিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রস্ফুট। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও প্রকট, আরও শক্তিশালী। ক্ষত্রিয় জাতি রাজ্যের শাসক কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় জাতির উপদেষ্টা ও কর্ণধার (মনু। Carmichael Lec. I.) এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যই প্রাচীন ভারতের 'কুলীনতন্ত্র' বা 'অভিজাতশাসন'।

এখন ব্রাহ্মণ কাহাকে বলিব? বেদ বলিতেছেন, ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐহিক বিষয়নিচয়ের অসারতাজ্ঞাপক, পারমার্থিক তত্ত্বের অভিব্যক্তিকে সংক্ষেপে ব্রহ্মনাম দেওয়া যাইতে পারে। অতএব, প্রকৃত জ্ঞানই ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ বিধাতার উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন (মনু ১ম অ। ৯৪)।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

(মনু, ১ম অ, ৯৬।)

প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানের আদর ছিল ও তদানীন্তন জ্ঞানীগণ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সে সময়ের ব্রাহ্মণ্য পরিবারগত ছিল না (accident of birth) ব্রাহ্মণের সন্তান বেদ অর্থাৎ জ্ঞান বিদ্বেষী বা বেদহীন হইলে ব্রাত্যসংজ্ঞা লাভ করিতেন (মনু ২অ। ৩৯), ব্রাহ্মণের পদবী বা সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতেন। আবার বেদজ্ঞ বিদেশীয় বা ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের আসনে পূজিত হইতেন। আমাদের শাস্ত্রে বহু যবনাচার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় শাখিসুত বিশ্বামিত্র বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বশিষ্ঠের সমকক্ষ হইয়া উঠেন (মহাভা.)। সুতরাং ভারতের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বা কুলীনতন্ত্র জ্ঞানের আদর ও জ্ঞানীর কর্তৃত্বের পরিচায়ক। ইহাই Haldaneএর intellec-

tual aristocracy। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যায়, শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা বংশপরম্পরাক্রমে অধস্তন পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণের পুত্রের জ্ঞানার্জ্জনের যেরূপ প্রবৃত্তি ও উৎসাহ, অব্রাহ্মণের বংশধরের সেরূপ দেখা যায় না। এইরূপে কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব পরিবারগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও অধিকাংশ স্থলে সুফলপ্রদ। স্বনামধন্য ডাক্তার জনসন্ সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে পরিশ্রম ও প্রতিভার বলে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন। কিন্তু তিনিও আভিজাত্যের উপকারিতা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার এক বন্ধু সংবাদ আনিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট এক ধনবান্ দরজিকে ব্যারনেট্ করিয়াছেন। শুনিয়া জনসন্ বলিলেন—"The Government can easily make him a Viscount to-morrow and a Peer of the Realm, the day after. But they can never make him a gentleman (Boswell's Johnson, p. 155)। ব্রাহ্মণবংশধরগণ অভিজাত ও এই অভিজাতশাসনই 'কুলীনতন্ত্র'। বাহুবলে বলীয়ান বিজয়ী ক্ষত্রিয় নরপতি হইতে কায়িক পরিশ্রমে অদ্বিতীয় শ্রমজীবী সকলেই এই কুলীনতন্ত্রের নিকট নতমস্তক, কারণ জ্ঞান ও মনীষার প্রভাব সর্ব্বত্র অজেয়। এই ভাবের উদ্দীপনায় Pericles বলিয়াছিলেন 'বাহুবলে বর্ব্বর-বিজয়লব্ধ বীরকীর্ত্তি অপেক্ষা এথেন্সের সুধীসমাজের নেতৃপদবী আমার অধিক প্রার্থনীয় (Grote's History of Greece Vol. III.)। এই আদর্শের প্রেরণায় নেপোলিয়ন অষ্টারলিট্স্ জয় অপেক্ষা ফ্রেঞ্চ একাডেমীর সভাপদ বেশী গৌরবের বিবেচনা করিয়াছিলেন (Abbot's Life of Napoleon p. 301)। ভারতের বর্ণাশ্রমতন্ত্র ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার বলে সঞ্জীবিত, যুগ যুগান্তর ধরিয়া শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজিও সজীব, আজিও পূজিত। পুরাতত্ত্ব বিমুখ সংস্কারকের চক্ষে এই ব্রাহ্মণশীর্ষ বর্ণতন্ত্র যতই বিসদৃশ বোধ হউক, ঐতিহাসিক ইহার মর্য্যাদা বুঝেন এবং জানেন যে, যত দিন না ঐহিকের সাধনায় পারত্রিকের আহুতি পড়িবে, তত দিন ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত কুলীনতন্ত্রের অভেদ্য স্বরূপ বাহত।

Lord Haldane যথার্থই বলিয়াছেন, ইউরোপ এত দিন জ্ঞান ও মনীষার প্রভাব পূর্ণভাবে স্বীকার করে নাই। বাহুবলই প্রথমতঃ পূজনীয় ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বেও আভিজাত্য বা blue blood নির্দ্ধারিত করিতে হইলে বলা হইত 'আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বিজেতা William Iএর সহিত আসিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে Saxonদের হস্তে প্রাণ দিয়াছিল (Chronicles of Froissart p. 78)। আমেরিকায় অভিজাত বলিতে Sovereign Dollarএর অনুগৃহীত Railway Kings বুঝাইত। তাহার পর পাশ্চাত্যের আভিজাত্য আর এক স্তর নিম্নে নামিয়া পড়ে। রক্তের শীতত্ব অপেক্ষা অর্থের প্রাচুর্য্যই অধিকতর পূজনীয় হইয়া উঠিল। কাঞ্চন কৌলীন্যের নিকট বংশগৌরব মস্তক নত করিল। Carlyle তীব্র ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন—"The aristocracy of the feudal parchment has given place to the aristocracy of money bags" (French Revol. Vol. II. p. 293)। ইমার্সন বার বার এই দিকে তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটী কার্লাইল বা ইমার্সন স্রোতের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের

কাঞ্চন কৌলীন্যের উপাসনা ও আনুসঙ্গিক ইহলোক সর্ব্বস্বতার বন্যা উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইল। ধর্ম, ভগবদ্ভক্তি ভাসিয়া গেল। প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্র বিজ্ঞানগর্ব্বিত জার্ম্মানীর বরপুত্র প্রকাশ করিলেন—'পাশ্চাত্য জগৎ ধর্ম্ম মানে না, মানে মাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম' "There was only one Christian and He was crucified" (Bernhardi, Germany and Next War)। ইহলোকই সার ও সত্য, পশুবলই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পশুবলের মাহাত্ম্য প্রচার ও তাহার সাহায্যে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াও একচ্ছত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাহার ফলে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—মানবী-প্রচেষ্টা ও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মন্ত্রের ধ্বংস, ঐহিক পশুবলধর্ম্মী ও জ্ঞানমনীষার সমন্বয়সাধকের অগ্নিপরীক্ষা। এই যুদ্ধই পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ইউরোপ বুঝিয়াছে, কাঞ্চনকৌলীন্য তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই নূতন ভাবের অভিব্যক্তি Viscount Haldaneএর intellectual aristocracy—প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যশাসিত অভিজাতশাসন বা কুলীনতন্ত্র।

দশাবিপর্য্যয়ের সহিত আজ পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান ও মনীষা শাসিত কুলীনতন্ত্রের প্রার্থনা করিতেছে। আর আমরা 'নবধা কুললক্ষণে'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেছি। ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ (শঙ্করের বিদ্যা ও চৈতন্যের ভক্তি, উভয়ই জ্ঞানের রূপভেদ মাত্র) চণ্ডালতুল্য ও ভক্তিযুক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণোত্তম স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা এখন ইউরোপের পরিত্যক্ত ঐহিক আদর্শের চেষ্টায় ধাবিত। ইউরোপ যাহা চাহিতেছে, তাহা দূরে পরিহার করিয়া, ইউরোপ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সন্ধানে ছুটিয়াছি। প্রাচী ও প্রতীচীর আদর্শ কি চিরকালই বিভিন্ন থাকিবে? কবি ভবিষ্যদ্রষ্টা। যথার্থই বলিয়াছেন—'The West is the west, the East is the east and the twain shall never meet' (Rud. Kipling.)

গত মাসের Manchester Guardianএ রাসিয়ার কবি লিও টলষ্টয়ের পুত্র লিয়া টলষ্টয়ের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখি টলষ্টয় বলিয়াছেন—'সেদিনের সভ্য পাশ্চাত্য জাতিরা যখন যুগপ্রসিদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতীয়গণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্মযাজক (missionary) পাঠাইবার প্রস্তাব করে, তাহাদের প্রস্তাবের ধৃষ্টতায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।" হায় টলষ্টয়! তুমি জান না, পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ হতভাগ্য আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা। আমাদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সব হারাইতে বসিয়াছি। বুঝি বা কিছু দিন পরে মনীষাচালিত কুলীনতন্ত্রের, intellectual aristocracyর আদর্শও পুনরায় প্রতীচ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ।

আমরা প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদ হইতে মূলের প্রত্যেক শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত অনুবাদ করিয়া পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিব। রমেশবাবুর অনুবাদে মূলাতিরিক্ত বহু শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ায় ইহার প্রকৃত অর্থবোধে বাধা পড়ে। তিনি কোনও কোনও স্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা যে যে স্থলে অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্ত মূলাতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে বন্ধনীর অন্তর্গত করিয়া দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, এই সূক্ত হইতে বৈদিক যুগের যে যে জ্ঞানলাভে আমরা সমর্থ হই, তাহা মন্তব্যরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। যে ঋষি এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি প্রাচীন কালের কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরূরবা ও উর্ব্বশী এই সূক্তের ঋষি বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান করি, ইহার প্রকৃত রচয়িতার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরূরবার নাম বেদে প্রাচীন ঐতিহাসিক পুরুষরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ।

১০।৯৫

পু। হে ঘোরা (অর্থাৎ নিষ্ঠুরা) জায়া! মনের দ্বারা অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার কথায় মন দাও)। এস, অদ্য বাক্য মিশ্রণ করি (অর্থাৎ কথোপকথন করি)। আমাদিগের দুই জনের মনন সকল অনুদিত নহে (অর্থাৎ মনে নানা প্রশ্ন উদিত হইতেছে)। ইহারা পরে ও অদ্য সুখকর (হইবে)। ১

উ। এই বাক্য দ্বারা আমরা কি (লাভ) করিব? উষাদিগের অগ্রবর্ত্তিনীর মত (অর্থাৎ যে সকল উষা দেবী চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ আর ফিরিয়া আসেন না) আমি তোমার অতীত হইয়াছি। হে পুরূরবা! পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি দুঃখে ধারণীয় বায়ু সদৃশ হইয়াছি। ২

পু। (বিজয়) শ্রীলাভের নিমিত্ত ইষুর আধার হইতে ইষু নিক্ষেপ করি না; শতধন গো (শত্রুর নিকট হইতে) জয় করি না। অবীর কর্ম্মেও আমাকে উদ্দীপিত করে না; ধুনিগণ উরু (দেশে) শব্দকে চেতনা দেয় না (১)। ৩

(১) সায়ন ধুনি অর্থে বলেন—সেনা; উরু অর্থে বিস্তীর্ণ সংগ্রামক্ষেত্র। সায়ন-সম্মত অর্থ:—"বিস্তীর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে সেনা সকল সিংহনাদ ছাড়ে না।" আমাদের মতে ধুনি অর্থে

হে উষা! শ্বশুরকে ধন, অন্ন প্রদানকারিণী সেই (উর্ব্বশী) যখন সকামা হইতেন, অন্তি-গৃহ হইতে অন্তে প্রবেশ করিতেন।......৪

উ। ....হে পুরূরবা! সপত্নীহীনা আমাকে প্রীতা করিতে। তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম; হে বীর! তখন (তুমিই) আমার দেহের রাজা ছিলে। ৫

পু। যে সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্নআপি, হ্রদেচক্ষুবৎ গ্রন্থিনী, (ও) চরণ্যু (নামধেয়া গাভী ছিল), সেই সকল আভরণযুক্তা, অরুণবর্ণা (গাভীসকল তোমার নিকট হইতে) নড়িত না। (এই) ধেনু সকল (নবপ্রসূতা) গাভীর মত দোহনার্থ (আর) শব্দ করে না (১)। ৬

উ। হে পুরূরবা! এই লোকে (তোমার) জন্মকালে দেবী সকল আগমন

ক্রমযুক্ত বাধা যত্ন, এবং উরু অর্থে উরুদেশ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে উরুগায়ন্ বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু উরুলোক যজ্ঞের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান গেল।—

সু। মর্ত্তঃ। দয়তে। সনিষ্যন্

যঃ। বিষ্ণবে। উরুগায়ায়। দাশৎ। ৭।১০০।১

অর্থ:—যে মর্ত্ত্য ধন ইচ্ছা করে, (সে) দাতা, উরুগীত, বিষ্ণুকে শীঘ্র হবি প্রদান করুক।

[সায়ন-মতে উরুগায়ায় অর্থ—বহুভিঃ কীর্ত্তনীয়ায় বিষ্ণবে। আমাদের মতে, উরুদেশের লোকের দ্বারা গীত।]

বি। চক্রমে। পৃথিবীং। এষঃ। এতাম্

ক্ষেত্রায়। বিষ্ণুঃ। মনুষে। দশস্যন্।

ধ্রুবাসঃ। অস্য। কীরয়ঃ। জনাসঃ

উরুক্ষিতিং। সুজনিমা। চকার। ৭।১০০।৪

অর্থ:—ইনি (অর্থাৎ বিষ্ণু) এই পৃথিবীকে ক্ষেত্র নিমিত্ত মনুকে প্রদান করিতে বিক্রম (প্রকাশ) করিয়াছিলেন। হে জনগণ! ধ্রুবগণ তাঁহার স্তবকারী। (তিনি) উরুক্ষিতি (ও) সুজন্মাদিগকে করিয়াছেন।

উরুং। যজ্ঞায়। চক্রথুঃ। উঁ। লোকম্। ৭।৯৯।৪ অর্থ:—(হে ইন্দ্র বিষ্ণু)! যজ্ঞের নিমিত্ত (তোমরা) উরু লোক করিয়াছ।

(১) সায়ন-সম্মত অর্থ:—যে সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্নআপি, ও হ্রদেচক্ষু (চারি জন অপ্সরা সখী ছিল) গ্রন্থিনী চরণ্যু অর্থাৎ সন্দর্ভবতী বিচরণশীলা উর্ব্বশী, (তাহাদের সহিত চলিয়া গিয়াছেন); অথবা, সুজূর্ণি চরণ্যু (অর্থাৎ সুজনগামিনী, বিচরণশীলা, উর্ব্বশী) শ্রেণি, সুম্নআপি, হ্রদেচক্ষু ও গ্রন্থিনী (এই চারি জন অপ্সরা সখীদিগের সহিত) গমন করিয়াছেন। সেই আভরণযুক্তা, অরুণবর্ণা (অপ্সরোগণ) (পূর্ব্ববৎ) গমন করে না। (নবপ্রসূতা) গো সদৃশ ধেনু সকল দোহনার্থ শব্দ করে না।

করিয়াছিলেন, এবং স্বর্গীয়া (বা, গমনশীলা) নদী সকল ইহাকে (অর্থাৎ তোমাকে) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মহৎ রণে দস্যু-হত্যার নিমিত্ত দেবগণ তখন তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৭

পু। (দেবতাদিগের) সহায়ভূত মানুষ (আমি) রূপ-ত্যাগকারিণী, অমানুষী অপ্সরাদিগের মধ্যে যখন ক্রীড়া করিতাম, তখন (তাঁহারা) আমার নিকট হইতে মৃগীর মত পলায়ন করিতেন; তাঁহারা রথে যুক্ত অশ্বের মত দৌড়াইতেন। ৮

যখন মর্ত্ত্যে (আমি) অমৃতা অপ্সরাদিগের মধ্যে স্পর্শ লাভ করিতাম, বাক্য ও কর্ম্ম সকলের দ্বারা স্পর্শ হয় নাই। তাঁহারা পক্ষিগণের মত স্বীয় তনু অলঙ্কৃত করেন; জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠলেহনশীল অশ্বের মত ক্রীড়া করেন। ৯

হে উর্ব্বশি! যিনি বিদ্যুতের মত ঝক্‌-ঝক্‌ করিয়া গমন করেন, (যিনি) আমার মনোমত কামনা সকল পূর্ণ করেন, (সেই তোমাতে) দেবভক্ত, সৎকর্ম্মী, সুজাত (পুত্র) জন্মিয়াছিল। (তাহাকে) দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর। ১০

উ। হে পুরূরবা! সেই শুক্র আমাতে ধারণ করিয়াছিলে, যাহাতে গোপালনের জন্য (পুত্র) জন্মিয়াছে। বিদুষী (আমি) তোমাকে সকল দিন (কর্ত্তব্য) শিক্ষা দিতাম। (কিন্তু) হে অভুক! (১) আমার (কথা) শুন নাই। হে অভোক্তা! (এক্ষণে) কি বলিতেছ? ১১

পু। জাতপুত্র কবে পিতাকে (দেখিতে) ইচ্ছা করিবে? (পুত্র জন্মিয়াছে) জানিয়াই (আমার) অশ্রু চক্রের মত গড়াইতেছে। কে এক-মনো-বিশিষ্ট দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে? যে হেতু এক্ষণে (তোমার) শ্বশুরকুলে অগ্নি (তোমার জন্যই) প্রজ্বলিত হইল (অর্থাৎ পুত্র ছিল না বলিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল)। ১২

উ। (তোমার) অশ্রু চক্রবৎ গড়াইতেছে। তোমায় বলি, স্ত্রীর নিমিত্ত মনঃপীড়ায় ক্রন্দন করিতে নাই। যাহা তোমার আমার নিকট (আছে), তাহা তোমায় প্রেরণ করিব। গৃহে প্রত্যাগমন কর। হে মূঢ়! আমাকে পাইবে না। ১৩

পু। প্রিয়া দূরে চলিয়া গেলে অদ্য সুদেব (পুরূরবা) অনাবৃত হইয়া পতিত হউক। নিয়ে নির্ঋতির ক্রোড়ে শয়ন করুক। তৎপরে ইহাকে বেগবান্ ব্যাঘ্র ভক্ষণ করুক। ১৪

(১) অভোক্তা বা সন্ন্যাসী।

উ। হে পুরূরবা! মরিও না, পতন ইচ্ছা করিও না। অশুভ ব্যাঘ্র সকল তোমাকে ভক্ষণ না করুক। স্ত্রীসম্বন্ধীয় সখ্য সকল থাকে না; ইহাদিগের হৃদয় সকল অরণ্য-ব্যাঘ্রদিগের মত। ১৫

যখন মর্ত্ত্যদিগের মধ্যে বিচিত্র রূপ (ধারণ করিয়া) শরৎকালের চারি রাত্রি বিচরণ করিয়াছিলাম ও বাস করিয়াছিলাম, দিবসে একবারমাত্র জলের বা ঘৃতের বিন্দু পান করিতাম। তাহার দ্বারাই তৃপ্ত হইয়া ইহাতে (মর্ত্ত্যলোকে) বিচরণ করিতাম। ১৬

পু। অন্তরিক্ষবিচরণকারিণী, উদকের নির্ম্মাত্রী উর্ব্বশীকে বাস করিতে ইচ্ছুক (অর্থাৎ ভোগেচ্ছু আমি) বশে আনয়ন করি। সুকৃতের দাতা তোমাকে নিকটে আসুন। ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। ১৭

উ। হে ঐড়! এই দেবগণ তোমাকে এই (কথা) বলিয়াছেন—ইঁহারা সকলে যেমন (তুমিও) সেইরূপ মৃত্যুবন্ধু হইবে। তোমার পুত্র দেবতাদিগকে হবি দ্বারা যজন করিতেছেন। তুমিও স্বর্গে (সোমপানে) আনন্দিত হইবে। ১৮

মন্তব্য:—সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক-লিখন-প্রণালীর বীজ এই সূক্তে উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে প্রাচীন কালের যে সকল জ্ঞান ইহা হইতে লাভ করিতে পারি, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে মানুষ বলিলে মনুবংশীয় বুঝাইত। উর্ব্বশীকে দেবলোকবাসিনী, অমানুষী, অমৃতা ও অপ্সরী বলায়, তিনি মনুবংশীয়া ছিলেন না, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু পুরূরবা মানুষ ও মর্ত্ত্য। তবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দস্যুহত্যার জন্য দেবলোকেই লালিত ও পালিত হন। সেই জন্য তিনি বাল্য ও যৌবন কালে অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। অপ্সরোগণ নিজ নিজ দেহ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতেন; তাঁহারা এত ক্ষিপ্র দৌড়াইতে পারিতেন যে, পুরূরবাও ধাবনে তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন; তাঁহাদিগকে বিচরণকালে চঞ্চলা সৌদামিনীর মত দেখাইত। কবির এইরূপ বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন।

উর্ব্বশীর সহিত দেবলোকেই পুরূরবার বিবাহ হয়। দেবলোকের বিবাহ আজন্মস্থায়ী ছিল না অনুমান করি। দেবলোকে বিবাহের কি নিয়ম ছিল,

যদিও তাহার কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু ঘটনাবলী দৃষ্টে উহার কিছু সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

যখন উর্ব্বশী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, তখন শরৎকাল। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া চারি দিন মাত্র অবস্থান করেন। এই চারি দিন শুধু জলের বা ঘৃতের বিন্দু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। মর্ত্ত্যলোকের উষ্ণ জলবায়ুর জন্ম উর্ব্বশী অপর কিছু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিংবা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। উর্ব্বশী পুরূরবাকে এক স্থলে বলিয়াছেন, "বিদুষী আমি তোমাকে সকল সময় কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতাম। কিন্তু হে সন্ন্যাসী মহাশয়! আমার কথা শুন নাই" ইহা হইতে অনুমান করি, উর্ব্বশী দেবলোকের বিবাহ-নিয়ম জানিতেন, এবং পুরূরবাকে তাহা বলিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। ইহা হইতে মনে হয়, দেবলোকের নিয়ম অনুসারে উর্ব্বশীর গর্ভসঞ্চার প্রকাশ পাইলেই তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এই কথাই তিনি সর্ব্বদা পুরূরবাকে বলিতেন।

মর্ত্ত্যলোকে চারি দিন মাত্র বাস করিয়াই উর্ব্বশী দেবলোকে চলিয়া যান। ইহার পর পুরূরবা বোধ হয় আর দেবলোকে গমন করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার দেবলোকে আগমনের কারণ কি? এই সূক্ত হইতেই জানা যায়, উর্ব্বশীর নিকট স্বীয় পুত্র ভিক্ষা করাই তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। উর্ব্বশীকে পুনরায় স্বীয় গৃহে আনয়ন করিবার চেষ্টাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদিগের কথোপকথন হইতে জানা যায়, তাঁহাদের বিবাহকালে পুরূরবার পিতা জীবিত ছিলেন, এবং উর্ব্বশী অন্ন ও ধন দ্বারা শ্বশুরের সেবা করিতেন। তাঁহাদের বাটীতে নানা প্রকার গৃহ ছিল—তাহাদের মধ্যে দুইটী নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়:—অস্তি ও অস্ত। গৃহে অনেক গাভী ছিল; অরুণবর্ণা গাভীই লোকে ভালবাসিত। ঐ সকল গাভীকে নানা আভরণে সজ্জিত করা হইত। পুরূরবা নিজ ভবন উর্ব্বশী বিহনে কিরূপ আনন্দহীন হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্ম বলিতেছেন যে, উর্ব্বশীকে গৃহপালিত গাভীগণ এতই ভালবাসিত যে, তাঁহার নিকট হইতে নড়িত না, এবং আনন্দধ্বনি দ্বারা গৃহ মুখরিত করিত। কিন্তু তাঁহার অদর্শনে উহারা এত ম্রিয়মাণ হইয়াছে যে, দোহনকালেও শব্দ করে না। তিনি নিজে উর্ব্বশী বিহনে এতই উৎসাহহীন হইয়াছেন যে, শত্রুজয়ে আর বহির্গত হন না; গান বাদ্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদেও তিনি আনন্দ প্রাপ্ত হন না।

উর্ব্বশী প্রথম তাঁহাদের পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে কথোপকথনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহাতে কোনও লাভ নাই; তাঁহাকে পুরূরবা আর প্রাপ্ত হইবেন না। পুরূরবার নির্ব্বন্ধাতিশয় নিমিত্ত যখন পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ কথা হইতেছে, উর্ব্বশী ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য পুরূরবার দেবলোকে জন্মের কথা তুলিলেন। দেবগণ যে তাঁহাকে দস্যু-হত্যার জন্য যত্নপূর্ব্বক লালন পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন পুরূরবা দেবলোকে অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার ক্রীড়ার কথা বর্ণনা করিলেন। পাছে এই বর্ণনায় উর্ব্বশীর মনে কিঞ্চিৎমাত্র ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়, এই ভয়ে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, উর্ব্বশী ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার প্রণয়পাত্রী ছিল না। উর্ব্বশীকে তিনি একান্তমনে ভালবাসিয়াছিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় পুরূরবা পুত্রের কথা তুলিলেন। উর্ব্বশীর যে গর্ভ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দেবভক্ত, সৎকর্ম্মী পুত্রের আশা করিয়াছিলেন। যাহাতে ঐ পুত্র রক্ষিত হইয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়, এই প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে উর্ব্বশী স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার গর্ভে পুরূরবার পুত্র জন্মিয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র পুরূরবার নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। "কবে ঐ পুত্র পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে"—ইহাই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে যে উর্ব্বশী রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর প্রীতি-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সেই জন্য তিনি বলিলেন, "কে একমনো-বিশিষ্ট দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে?" পুরূরবা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার পুত্র না থাকায়, তাঁহার অবর্ত্তমানে কে পিতৃকুলে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবে, এই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। উর্ব্বশীর নিকট নিজ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া, উর্ব্বশীকে শ্বশুর-কুলের মঙ্গলার্থিনী জানিয়া বলিলেন, "এক্ষণে (তোমার) শ্বশুর-কুলের অগ্নি (তোমার জন্যই) প্রজ্বলিত হইল।" পুরূরবাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া উর্ব্বশীর মনও একটু ব্যাকুল হইল। তিনি পুরূরবাকে বুঝাইতে লাগিলেন। "স্ত্রীর জন্য কাঁদিতে নাই; কারণ, তাহাদের হৃদয় বন্য ব্যাঘ্রের মত। তাহাদিগের সহিত সখ্য চিরদিন থাকে না। তোমার পুত্রকে আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তুমি আমাকে পাইবে না। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।" পুরূরবা উর্ব্বশীর নিকট এইরূপ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলে, শান্ত না হইয়া, বরং আরও কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয়া চলিয়া গেলেই তিনি নিম্নে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ব্যাঘ্রসঙ্কুল কোনও পর্ব্বতে দেখা হইয়াছিল। সে কালে

বিশ্বাস ছিল, যাজ্ঞিক, দেববিশ্বাসিগণ মৃত হইলে আকাশে পিতৃ (অর্থাৎ যম) লোকে গমন করেন, এবং পাপিগণ নিম্নে অন্ধকারময় নির্ঋতি লোকে গমন করে। পর্ব্বতের খদই প্রকৃতপক্ষে নির্ঋতি লোক। পুরূরবা তথায় পতিত হইলে, ব্যাঘ্রগণ তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিবে। এই কথায় উর্ব্বশী বড়ই ভীতা হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্ত মরিও না; পর্ব্বত হইতে পড়িও না। ব্যাঘ্রগণ তোমায় ভক্ষণ না করুক।" মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, ইহা বুঝাইবার জন্ত তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মর্ত্ত্যলোকে যে চারি দিন বাস করিয়াছিলাম, সে কয় দিন দিবসে একবারমাত্র জলবিন্দু পান করিতাম।" পুরূরবা তথাপি তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আসিবার জন্ত অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী বলিলেন যে, "দেবগণ তোমাকে মৃত্যুবন্ধু করিবেন, বলিয়াছেন; তোমার পুত্র সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে যজ্ঞ করে। অতএব যখন তুমি পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গে আসিবে, তখন আনন্দে কালযাপন করিবে।"

দেবতাদিগের দেশকে অমরলোক বলে। ঋগ্বেদের সায়ন-সম্মত ব্যাখ্যার মতে, ৩৩ জন দেবতার মধ্যে ১১ জন দিব্যলোকে, ১১ জন অন্তরিক্ষে, এবং ১১ জন পৃথিবীতে আছেন। অতএব, পৃথিবীতেও দেবলোক আছে। এই দেবগণ বসু নামে বিখ্যাত। বসুগণ যেখানে বাস করেন, তাহাই অমরলোক। ইহাকে অমরলোক বলিত কেন? মনে হয়, যেখানে বার মাস অত্যন্ত শীত, সেখানে জীব জন্তু মরিয়া পচিয়া যায় না, সেই দেশকেই বৈদিক যুগে বোধ হয় অমরলোক বলা হইত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবজন্তু মরিলে অল্প কালের মধ্যেই পচিয়া যায়; সেই জন্ত উহাকে মর্ত্ত্যলোক বলা হইত। হিমালয়ের পর পারে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক অবস্থিত; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেখানে মৃতদিগের দেহ অগ্নিসংকার না করিয়া রক্ষা করা হইত। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে অগ্নিসংকার প্রভৃতি উপায় দ্বারা মৃত দেহ নষ্ট করা হইত। উর্ব্বশী-পুরূরবা সূক্তে দেখি, দেবগণ পুরূরবাকে আশ্বাস দিয়াছেন—তাঁহারা যেমন, তিনিও সেইরূপ মৃত্যুবন্ধু হইবেন। ইহার দুই অর্থ হইতে পারে; মৃত্যু, অর্থাৎ যমের তিনি মিত্র হইবেন; কিংবা মৃত্যুর সহিত তাঁহার দেহ যুক্ত হইয়া থাকিবে। ইহা হইতে মিশরদেশীয় মমীর কথা মনে হয়।

ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই, পিতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া পিতৃ-

লোকে নীত হইয়াছেন; অপর কেহ কেহ অগ্নিদগ্ধ না হইয়াই যমলোকে গমন করিয়াছেন। (১) শেষোক্ত পিতৃগণ বোধ হয় পৃথিবীর দেবলোকবাসী ছিলেন। অনুমান করি তাঁহাদের মধ্যে অগ্নিসংকারের প্রথা প্রচলিত ছিল না। মৃত হইলে দেহকে রক্ষা করা হইত। এইরূপ অবস্থায় দেহ রক্ষিত হইলে, মনে হয়, মৃত্যুবন্ধ নাম দেওয়া হইত। শীতপ্রধান দেবলোকেই ইহা সম্ভব ছিল!

পুরূরবাকে ঐড় নামে অভিহিত করায়, তিনি ইড়ার পুত্র, এইরূপ ধারণাই প্রথম হইয়া থাকে। কিন্তু ঋগ্বেদে ইড়াকে কোথাও মনুর কন্যা বা পুত্র বলা হয় নাই। যত দূর দেখা যায়, বৈদিক যুগে তিনটী বাক্‌দেবীর মধ্যে ইড়া অন্যতমা। ইড়ার পদে মনু প্রথম অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে। এই সকল হইতে অনুমান করি, পুরূরবা ইড়দেশের লোক বলিয়া ঐড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইড় ও উরু দেশ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতরূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

মল্লারিসেবক

প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে মধ্য-যুগে ভারতবর্ষে অনেক প্রকার রহস্যপূর্ণ উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে কল্পনার অপ্রতিহত প্রভাবে কতকগুলি উপাসনা এতই অদ্ভুত-কর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বিস্ময় ও হাস্যরস উভয়ই যুগপৎ আবির্ভূত না হইয়া যায় না। ঐ যুগে উদ্ভাবিত উপাসনাসমূহের মধ্যে অনেকগুলির মূলে বেদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্বকীয় উপাস্য দেবতার মোক্ষদাতৃত্ব এবং সৃষ্টিসংহার-কর্তৃত্ব-স্থাপনের অভিপ্রায়ে উপাসকগণ বেদমন্ত্র উপন্যস্ত করিয়া অনুকূল ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা "মল্লারি-দেবের" উপাসক সম্প্রদায়ের মত বিবৃত করিব।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে "অনুমল্ল" নামক নগরে একবিংশতি দিবস বাস করিবার পর নিজ সমীপে সমাগত

---

(১) যে। অগ্নিদগ্ধাঃ। যে। অনগ্নিদগ্ধাঃ

মধ্যে। দিবঃ। স্বধয়া। মাদয়ন্তে। ১০।১৫।১৪

যে সকল (পিতৃগণ) অগ্নিতে দগ্ধীভূত, (ও) যাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ হন নাই, (তাঁহারা) দিবালোকে স্বধা দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত হন।

তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ, তোমরা প্রভাত-সময়ে যে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান কর, উহা কি বেদসম্মত? অনন্তর ব্রাহ্মণগণ স্বকীয় উপাসনার সমস্ত বিবরণ শঙ্কর-সমীপে প্রকাশিত করিলেন।

হে স্বামিন্! আমাদের বংশানুক্রমে এই উপাসনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ভগবান্ পরমেশ্বর মল্ল-নামক অসুরকে নিহত করিয়া লোকে মল্লারি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জগদুৎপত্তি-স্থিতি-কারণ তাঁহার সেই মূর্ত্তি এই স্থলেই আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি রহিয়াছে। আমরা প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার বাহনস্বরূপ কুক্কুরের বেশভাষা-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ কুক্কুরের মত কণ্ঠে বরাটিকা-ধারণ এবং ভুক্ ভুক্ শব্দ করিয়া ত্রিকালেশ্বর ভগবান্ মল্লারির প্রীত্যর্থ স্তবাদি পাঠপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছি। তাঁহার অনুগ্রহে প্রতিদিন আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমস্ত জগৎ তাঁহারই উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, আমরা এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত আমরা কিছুই চাই না; কারণ, তিনিই সর্ব্বাত্মক। বেদেও মল্লারির সর্ব্বব্যাপকত্ব ও তদ্বাহনের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—"শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ"। অতএব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ আচারের কিছুতেই অন্যথা করিবার যো নাই। তুমিও শিষ্যগণের সহিত পরম মুক্তির উপায়স্বরূপ আমাদের এই আচার গ্রহণ কর, তোমার ধারণের উপযুক্ত বরাটিকা এখনই দিতেছি। এই কথা শুনিয়া আচার্য্য স্বামী বলিলেন,—হে মূঢ়াত্ম! তোমার মত সঙ্গত নহে, মল্লারি জগতের কারণ, এ কথা বেদবিরুদ্ধ; সুতরাং স্বীকার্য্য নহে। বেদে কুক্কুর-বাহন মল্লারি নামক রুদ্রাংশবিশেষ প্রসিদ্ধ আছেন, সত্য; কিন্তু "শ্বভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার স্তব বিহিত হয় নাই, একাদশ রুদ্রের স্তব করা হইয়াছে। কারণ, উহার পূর্ব্ব-বাক্যে রুদ্রের স্তব বিহিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী "শ্বভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যেও তাঁহাদেরই সর্ব্বব্যাপকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্বপতি শব্দের অর্থ, শ্যাব, শবল প্রভৃতি বৈবস্বত-বংশ-সম্ভব কতিপয় ব্যক্তি। অথবা, শ্বপতি অর্থাৎ কুক্কুরের বিক্রমার্জ্জিত মাংসভোজী, অর্থাৎ ব্যাধ। অথবা শ্বপতি শব্দের অর্থ—শ্বমাংসভক্ষণশীল চাণ্ডাল। অতএব, মন্ত্রের অর্থ—যে সকল রুদ্র কুক্কুরের এবং চণ্ডালেরও হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপক রুদ্রদিগকে নমস্কার করি। ইহাতে কুক্কুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই। কুক্কুর নিকৃষ্ট পশু, তাহাদের স্পর্শে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে মৃত্তিকা-স্নানের বিধান আছে; তোমরা তাহাদের বেশভাষা-রূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছ কেন? তোমরা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মরহিত

হইয়া পুরুষপরম্পরায় এই বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ; অতএব, তোমাদের ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমাদের জন্য যে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইবে, তাহাও স্থির করিতে পারি না। তোমাদিগকে দর্শন করিলেও সূর্য্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব, তোমাদের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনই কর্ত্তব্য। শঙ্করের মুখে এই কথা শুনিয়া মল্লারি-ভক্তগণ পাপ-পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই, একমাত্র শঙ্কর-করুণাই ভরসা,এই মনে করিয়া আচার্য্যের চরণতলে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় নিপতিত হইয়া অনুনয় করিতে লাগিল। তখন শঙ্করাচার্য্য তুষ্ট হইয়া পাপীদিগকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ করিবার জন্য পদ্মপাদাচার্য্য ও হস্তামলক প্রভৃতি শিষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন। অনন্তর আদিষ্ট শিষ্যগণ কুক্কুরবেশধারীদিগের শিরোমুণ্ডন, মহানদীতে স্নান, অযুত মৃত্তিকা-স্নান প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন, এবং কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণ্য-মার্গের পথিক করিলেন। তখন সেই অনুমল্লপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য স্বামীর মুখ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য হইল, এবং স্নানাদি-সৎকর্ম্মশীল হইয়া পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইল।

যেখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঘেউ-ঘেউ, ভুগ্-ভুগ্ প্রভৃতি অপূর্ব্ব প্রাতঃ-কৃত্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই অনুমল্লপুর বর্ত্তমান সময়ে কোথায় কি নামে পরিচিত? মল্লারিদেবের আকৃতিই বা কেমন? তথাকথিত বর্ণনায় তিনি কুক্কুরবাহন, এইমাত্র পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাঁহার হস্তপদাদি-বিন্যাসের বিবরণ কিছুই জানা যায় না। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ বটুক-ভৈরব সারমেয়-সমন্বিত বলিয়া আপদুদ্ধার-স্তবোক্ত ধ্যানে কথিত হইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারে বটুক-ভৈরবের প্রয়োগে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার ধ্যান উক্ত হইয়াছে; ইহাদের কোনটিতেই কুক্কুরের কথা নাই। সুতরাং বেদোক্ত মল্লারিই তন্ত্রে আসিয়া বটুক-ভৈরব-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা স্থির করা সমস্যার বিষয় হইয়াছে। কুক্কুরবাহন মূর্ত্তি পাইলে, ঐতিহাসিকগণ উহাকে তন্ত্রোক্ত দেবতা অথবা বেদোক্ত দেবতা বলিয়া স্থির করিবেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

মল্লারিদেবের অদ্ভুত উপাসনা-প্রণালী কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এই মত বিলুপ্ত হইয়াছে, এইমাত্রই বুঝা যায়। এই উপাসনা প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল; সুতরাং পৃথিবীর অন্যত্র উহার প্রচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ভাস্কররায়-কৃত সৌভাগ্য-ভাস্করে (১) মল্লারির কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভাস্কর-বর্ণিত মল্লারি কুক্কুর-বাহন নহেন, তিনি অশ্ব-সমারূঢ়। ভাস্করের মতে, "মণিমল্ল" নামক দৈত্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ শিব পৃথিবীতে অশ্বারূঢ়-রূপে সমাগত হইয়া "মল্লারি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই আবার "মার্ত্তণ্ড-ভৈরব" নামেও কথিত হইয়াছেন। এই বিষয়টি মহারাষ্ট্র দেশে "তন্ত্রচিন্তামণি" নামক তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। মল্লারি ত্রিপুরাদেবীর উপাসক ছিলেন, এ কথাও মল্লারি-মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

ভালবাসার আর এক ধারা।

(Another way of Love—by *R. Browning.*)

১

বসন্ত হয়নি অবসান,
ভরা বসন্তের শোভা যদিও অতীত;
শেষের গোলাপগুলি সেরা সেরা যত
তখনো হয়নি বিকশিত
যুবা এক মোর পরিচিত
(কহিব না কি নাম তাহার,
উৎসুক শ্রবণ তাহে কা'র ?
সময়ে তা হইবে প্রচার)
মনোভাব মনে আচ্ছন্ন,
অধরে হাসির আধ ভাণ
যেন ক্লান্তি-দুঃখ-জড়িত,
কহিলা গভীর স্বরে পুরুষ-উচিত—
"ভাল যদি নাহি লাগে বসন্ত তোমার,
রুচি আর নাহি রয় তাহাতে আমার,
অধিক কি আছে তায় তা'র ভাবিবার ?"

(১) সৌভাগ্য-ভাস্কর ১৫৮ পৃঃ; বোম্বে নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত।

২

এস সখা, কহি, নিরালায়,
সত্য বটে, শুধু প্রেম, বৈচিত্র্য-বিহীন,
বিষম বিরাগ আনে পুরুষের মনে
নবরঙ্গে, এ বসন্ত, দীন ;—
বক্ষে তা'র কোরক নবীন
রহে যাহা আজো অবশেষ,
সেগুলির হইলে উন্মেষ,
অভিনব মাধুরীর লেশ
মাঝে তার আসিবে কেমনে—
কিসে তা'রা তুষিবে তোমায় ?
সৌরভে, না আবীর-আভায় ?
যথাপূর্ব্বং—যথাপূর্ব্ব—সে ত সেই হায় !
তবে যাও—যাই ভাবি অন্য কি অধিক—
মধুকুঞ্জ, তব চয়ে, শ্রীহীন যে দিক্,
এখন তা' করি যদি ঠিক—তাই ঠিক

৩

তার পর, কৌতুক-বিলাসে,
কুসুম-গৌরবে যদি বসন্ত আমার
হয় শেষে সুষমায় পূর্ণ সমুজ্জ্বল,—
ফুলে ফুলে ফুল্ল চারিধার,
নাহি শঙ্কা কণ্টক-পীড়ার—
শুধু দল নিবিড় কোমল,
শুধু পুষ্প মধু চল-চল,
যজ্ঞে যথা সুধা সুমঙ্গল
সুমধুর, চমকে চঞ্চল—
তখন কৌতুক-অভিলাষে,
বসন্ত যদি সে ভালবাসে
বিরাগ নাহিক যাঁর সে রূপে সে বাসে ;—
অথবা, বুঝিয়া রীতি পুরুষ-লুতার,
নিবারিতে নব জাল, করে ব্যবহার
কীটন্ন ঔষধি—তা' সে করিবে বিচার।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা—প্রথম বর্ষ ; প্রথম সংখ্যা ; বৈশাখ। এই নবপ্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রখানি 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা এম্. এ. বি. এল্., মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি. এ. প্রভৃতি কয়েক জন মুসলমান সাহিত্যিকের উদ্যোগে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টিসাধনকল্পে কলিকাতায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নানাবিধ অবস্থা,—উন্নতি ও অবনতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামধন্য মৌলভী আবদুল করিম বি. এ. সমিতির সভাপতি, খাঁ বাহাদুর মৌলভী আহসান্ উল্লা এম্. এ. ও 'মোহাম্মদী' ও 'আল্-এসলামে'র সুযোগ্য সম্পাদক মৌলভী মোহাম্মদ আকরম খাঁন সহকারী সভাপতি, এবং মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি. এ. সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় দুই বার 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে'র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্. এ, বি. এল্. সভাপতির আসনে বরিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহুসংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক প্রখ্যাতনামা হিন্দু-সাহিত্যিকও সভায় আগমন করিয়াছিলেন।' সমিতির উদ্দেশ্য,—'(১) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টিসাধন। (২) আরবী, পারসী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ-প্রকাশ। (৩) প্রাচীন মুসলমান-বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। (৪) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের পীর ও সাধু পুরুষদিগের (ওলীদিগের) জীবনী-সংগ্রহ ও প্রকাশ। (৫) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ-সংগ্রহ। (৬) বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে মাসিক, সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রের বহুল প্রচার। (৭) সদ্গ্রন্থের প্রচারকল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহপ্রদান। (৮) সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন।'

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদও এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মুসলমান সাহিত্য-সমিতি দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে মাসিকপত্রাদির বহুল প্রচার, সদ্গ্রন্থের প্রচারে উৎসাহদান ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টাকে আপনাদের উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত করিয়া সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ সমিতির শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধনে সাহচর্য্য করিলে, উভয় পক্ষের চেষ্টায় পবিত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মৈত্রীবন্ধন আরও সুদৃঢ় হইতে পারে।

মুসলমান সাহিত্য-সমিতি বাঙ্গালায় 'জাতীয়তা'র জটিলতম সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এই জন্য সাহিত্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। ইহাই 'বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব-স্থাপন ও সংহতি-প্রতিষ্ঠার সুপ্রশস্ত পথ। বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান এক মায় দুই

সন্তান। হরি-হরের মত হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ে বাঙ্গালার 'গণ'-বিগ্রহ গঠিত হইয়াছিল। আমাদের ধর্ম্মগত ভেদের মধ্যে রাজনীতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অভেদ ছিল। আমরা এক দেশে বাস করি, এক দেশমাতার অন্নে ও স্তন্যে পুষ্ট হই, আমাদের রাজনীতিক স্বার্থ অভিন্ন, আমরা একই আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় মুক্তির পথে যাত্রা করিয়াছি। বাঙ্গালার মুসলমান ও হিন্দু একই ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত চেষ্টায়, প্রতিভার দানে ও রাজার আনুকূল্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। আমরা বহু বার বলিয়াছি,— 'নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?' বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে পারে না। সার্ব্বভৌমিক হিন্দী যেমন বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষণীয় হইলেও মাতৃভাষা হইতে পারে না, উর্দ্দুও তেমনই বাঙ্গালী মুসলমানের উপজীব্য হইলেও মাতৃভাষা হইতে পারে না। চট্টগ্রামের শ্রীযুত আবদুল করিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালার মুসলমানকে ইহা বুঝাইয়া আসিতেছেন। সে দিনও প্রসিদ্ধ সুলেখক মৌলভী আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'সাহিত্যে' বাঙ্গালার মুসলমানকে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া বরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের পুরুষপরম্পরার বাসভূমির—জন্মভূমির ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই ভাষাকে বিবিধ উপায়ে পুষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা আমরা যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তি ও উভয় পক্ষেরই সৌভাগ্যসূচক বলিয়া মনে করি।—তাঁহাদের পুণ্যব্রত সফল হউক, মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধ হউন, হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা বিশ্বে নন্দিত ও বন্দিত হউক। ইহা অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ত খুঁজিয়া পাই না।

'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র 'নিবেদনে' লেখক লিখিয়াছেন,—'জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক। আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি এমন সাহিত্য, যাহাকে দণ্ডযন্ত্র (lever) রূপে অবলম্বন করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারিব' ইহাই জাতীয় জীবনের বড় কথা। এই বড় কথাটিকে ছোট মনে করিয়াই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছি। সাহিত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আমরা যদি আবার জাতিস্মর হইতে পারি, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদিগকে ভিক্ষাভাণ্ড-করে বিশ্বের দরবারে ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ বাঙ্গালার শুভ দিন—বাঙ্গালার মুসলমান এই মূল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

লেখক বলেন,—'প্রথমতঃ, আমরা চাই—আমাদের * * গৌরবে অমর কীর্ত্তিগাথা বাংলা বীণার সুরে গাহিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ভাবের উদ্দীপনা, কর্ম্মের প্রেরণা আনিতে। তাই চাই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। দ্বিতীয়তঃ, আমরা চাই—বঙ্গীয় মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে অক্ষয়-সেতুস্বরূপ। বাঙ্গালী মুসলমান এই সেতুর অভাবে তাহার অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইতে পারিতেছে না। আমাদিগকে এই সেতু গড়িতে হইবে। বাঙ্গালায় কত পীরের আস্তানা, কত স্তূপ, কত

প্রাচীন-বংশ-প্রবাদ, কত লৌকিক কিংবদন্তী, কত প্রাচীন পুঁথি তাহাদের অতীত কাহিনী বলিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে! শ্রোতা কোথায়? আমরা চাই—সেই সকল কাহিনী শুনিতে ও শুনাইতে। তাই চাই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। তৃতীয়তঃ, আমাদিগকে আমাদের ঘরের ভাল জিনিসগুলির বিষয় আমাদের প্রতিবেশীদিগকে জানাইয়া তাহাদের মন হইতে আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা দূর করিতে হইবে।'

লেখকের তৃতীয় নিবেদন সম্বন্ধে আমাদের অকপটে বক্তব্য এই যে, মুসলমানদিগের সম্বন্ধে 'হীন ধারণা' বাঙ্গালী হিন্দুর নাই। হয় ত আমরা 'সুস্পষ্ট ধারণা'য় বঞ্চিত, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও, রাজনীতিক স্বার্থ-সংঘাতের পূর্ব্ব যুগেও, বাঙ্গালা দেশে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধে হীন ধারণা ছিল না।

তাহার পর লেখক বলিয়াছেন,—'চতুর্থতঃ, যেমন চাষের প্রথম অবস্থায় খাদ্য-শস্যের চারার সহিত আগাছা জন্মিয়া শস্যের চারাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, সেইরূপ প্রত্যেক সাহিত্য-যুগের প্রারম্ভে অনেক অসার গ্রন্থের প্রচার হইয়া থাকে। আমরা চাই—এই সমস্ত অসার গ্রন্থকে সমালোচনা দ্বারা দূর করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রকে পরিষ্কার করত সৎ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে।'

ইহাও আবশ্যক। সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অপথের পথিক হইয়েছে। মুসলমানের সাহিত্য-প্রচেষ্টা সূচনা হইতে এই বিষয়ে অবহিত হইলে সাহিত্যের যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে।

এই পত্র-প্রচারের ৫ম উদ্দেশ্য,—'লোকলোচনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মুসলমান কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে সাহিত্য-ব্রতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা। এরূপ পত্রের প্রয়োজন আছে, নিবেদনে তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীমহাম্মদ মোজাম্মেল হকের 'আত্মহব' নামক কবিতাটি সুলিখিত। অন্ততঃ ইহা বুঝিবার জন্য গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। আশা করি ইহার উদ্দীপনা ব্যর্থ হইবে না। এই সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়—'দ্বিতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ'। মোহাম্মদ শহীদুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন,—'আমাদের শিক্ষার পথে প্রথমেই ভাষা-সমস্যা আসিয়া পড়ে। আরবী আমাদের ধর্ম্মভাষা, পারসী আমাদের সভ্যভাষা, উর্দ্দু আমাদের ভারতীয় আন্তর্জাতীয় ভাষা, ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই পাঁচ ভাষারই সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর সম্বন্ধ আছে। তাই আমরা আমাদের ছেলেপুলেদিগকে ছোটবেলা হইতেই একেবারে পাঁচ কলমে মুন্সী করিতে চাই।' কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। ইহার ফলে মুসলমান শিক্ষার্থী কোনও ভাষাই ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। লেখক এই বিষম সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'কি স্কুল কলেজের ছাত্র, কি মাদ্রাসার ছাত্র, সকলেরই পক্ষে বিদ্যারম্ভ হইবে বাংলা ভাষায়। আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্ত্তায়, ভয়-ভালবাসায়, চিন্তা-কল্পনায় ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না।' তাহার পর লেখক ইতিহাসের

উদাহরণ দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই ; শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্ম্মভাব, আর কতকগুলি শব্দ। তাই আন্‌ওয়ারী, ফারদৌসী, সাদী, হাফেজ, নিজামী, যামী, সানাই, রুমী-প্রমুখ কবি ও সাধক-বুলবুলকুলের কলতানে আজ ইরানের কুঞ্জ-কানন মুখরিত! যে দিন ওয়াইক্লিফ ল্যাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যত দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণিতে জর্ম্মাণভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণির জাতীয়জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত, আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্থানী আলেমগণ উর্দ্দু ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ, তফ্‌সীর, ফেকা, হদীস, তসওফ্, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবী, পার্সী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইস্লামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারি জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত, আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম্মগ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয়, ইত্যাদি রূপ প্রলাপ-উক্তি করিতে ছাড়েন না।' তাই লেখক ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন,—'স্কুলের ন্যায় যে পর্য্যন্ত বাংলার মাদ্রাসায়ও বাংলাভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা যাইবে না। যে পর্য্যন্ত আরবী-পারসী-জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না।'

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—'হিন্দুর রামায়ণ আছে ; মুসলমানের "আমীর-হামজা" আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে ; মুসলমানের "কাসাসোল-আম্বিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে ; মুসলমানের 'মারফতী-গান' আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে ; মুসলমানের "পদ্মাবতী" আছে। আবদুল গফুর সিদ্দিকী হাজারের বেশী মুসলমানের লেখা পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। ** এই পুঁথি-সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। এখনও মাঠের মাঝি হইতে গৃহস্থের বৌ ঝি পর্য্যন্ত তাহাদের দিনের হাড়ভাঙ্গা কাজ সারিয়া পুঁথি শুনিতে বসে।' লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন,—'দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ন্যায় কে আমাদের এই পুঁথি-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?' মুসলমান সম্প্রদায়ের এই নব উদ্যোগ অচিরে তাঁহাদের অভীষ্ট ঐতিহাসিকের সৃষ্টি করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।

লেখক 'পুঁথির ভাষাকে অতীত যুগের জীবকঙ্কালের ন্যায় কেবল রাখিয়া দিবার' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সাধু ভাষায় 'খাঁটী বাঙ্গালায় মুসলমান সাহিত্য রচনা' করিবার পক্ষপাতী। লেখক মুসলমানকে অনুরোধ করিয়াছেন,—'আমাদের মিলনের শত বাধার মধ্যে আর এই

ভাষার বাধা আনিও না।' লেখক হিন্দুকেও অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হন নাই ;—'ভাই হিন্দু, তোমার নাটক নভেলের মধ্যে মুসলমানের, শুধু মুসলমানের কেন, হিন্দু মুসলমানের, বাদশাহ বেগমদিগের কালীমাখা মূর্ত্তি কালীমাখা কল্পনার দ্বারা আঁকিয়া, আর তাহার ভগ্নহৃদয়ে বেদনা দিও না।' এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। মিলনের মঙ্গল-মুহূর্ত্তে পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া কোনও লাভ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলি, 'তথাস্তু'। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের স্বার্থের অনুশাসন ইতিহাসের সত্যকে নিশ্চয়ই লুপ্ত করিতে পারিবে না। ঐতিহাসিক সত্যেও আমাদের উভয় জাতির স্বার্থ আছে। সে স্বার্থের মূল্যও জাতীয় জীবনে অল্প নহে। জাতীয় জীবনে হিন্দুরও কলঙ্ক আছে ; মুসলমানেরও কলঙ্ক আছে। সে সকল কলঙ্ক ছড়াইয়া কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ নাই। বিশেষতঃ, এই ভেদ-ভিন্ন দেশে যাহা হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রতিকূল ও সদ্ভাবের পরিপন্থী, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহা দেশের কল্যাণকামী অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসই থাকিবে। আশা করি, উভয় পক্ষ এই সার-সত্য স্মরণ করিয়া, সংঘ-বদ্ধ হইয়া মিলনের পথে মুক্তির তীর্থে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

লেখক বলিয়াছেন,—'এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী।' লেখকের এ 'ফতোয়া' আমরা—হিন্দু কখনই স্বীকার করিব না। রামমোহনের যুগে হিন্দু যে সাহিত্যের পত্তন করিয়াছিল, খ্রীষ্টানীর বিরোধই তাহার ভিত্তি ছিল। বাঙ্গালী হিন্দু খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী নহে, তবে তাহারা খ্রীষ্টানধর্ম্মের সহিত অধিক পরিচিত বটে। খ্রীষ্টপন্থীর রচিত ইংরেজী সাহিত্য ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রচারের প্রভাবে ইংরেজীনবীশ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই খ্রীষ্টধর্ম্মের যে পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কোনও পক্ষেরই আন্তরিক অনুরাগের ফল নহে।

মুসলমানী বাঙ্গালা সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন,—'তাহা নানা প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। * * * এখন মৌলানা, মৌলভী ও পণ্ডিত, যিনি বঙ্গভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু লিখিতেছেন, তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন।' ইহা আশার কথা বটে। বাস্তবিক, 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র ভাষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত—আশান্বিত হইয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (Style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘসিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাঁই "সবুজপত্রে"র সম্পাদক প্রমথ বাবু। ইঁহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইঁহারা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না। "সাহিত্য" পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইঁহারা প্রাচীনপন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয়কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইঁহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব?' লেখক রবিবাবুকেও এই দলের অন্তর্গত মনে

করেন। কিন্তু রবিবাবু বিষয়বিশেষে বিভিন্ন রচনা-রীতির প্রয়োগ করেন। তিনি বাউলের গানের ভাষায় 'ভাজে'র ছবি আঁকেন নাই। তিনি চলিত সহজ ভাষার পক্ষপাতী হইলেও, স্বয়ং বক্তব্য ও ভাবের গুরুত্বে আপনার ভাষা বাছিয়া লন। লেখক 'সাহিত্য'কে 'সাবেক দলে' ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহা আমরা শিরোপার মত শিরোধার্য্য করিলাম। 'সাহিত্য' নিশ্চয়ই 'ভাষা'র 'পরিবর্ত্তন' সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বিকৃতি ও প্রাদেশিকতা, অপপ্রয়োগ, বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজী রচনা, অবোধ্যতা, ইংরেজী রচনা-রীতির অনুসরণে সৃষ্ট নিরর্থক জটিলতা, ভাবের ব্যভিচার, ভাষার অপচার—এক কথায় মাতৃভাষায় অসিদ্ধ ও বিদেশী ভাষার ভোরপুর, খোসখেয়ালী, যথেচ্ছাচারীর অত্যাচার সাহিত্যেও অসহ্য; 'সাহিত্যে'র অসহ্য। 'সাহিত্য' যত দিন বাঁচিবে, তত দিন এ বিষয়ে সে যেন এইরূপ অসহিষ্ণু হইয়াই থাকিতে পারে। লেখকের বিশ্বাস, কালে কলিকাতার ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিবে। আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। অবশ্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে আলোচনার স্থান নাই। লেখক মুসলমান লেখকগণকে মধ্য-পথ অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ অবশ্য মন্দ নহে। তিনি যে ভাষার পরামর্শ দিয়াছেন, সে ভাষা কিন্তু সাধু ভাষা।

'বড় গাছের তলায় ছোট গাছের মত যদি আমরা শুকাইয়া মরিতে না চাই, তবে আমাদিগকে বড় হইতেই হইবে। এই বড় হইবার জন্য সাহিত্য চাই।' হিন্দু মুসলমান উভয়কেই আমরা এ কথাটী মনে রাখিতে বলি।

লেখক উপসংহারে প্রশ্ন করিয়াছেন,—'আসিবে কি সে দিন, যে দিন বাঙ্গালার মুসলমান তাহার স্পেনীয় মূর বা আরবীয় সারাসেন ভ্রাতৃগণের ন্যায় ধর্ম্মে মহীয়ান্—জ্ঞানে গরীয়ান্ হইয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাহারও নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিবে?' আমরা আমাদের মহাকবির ভাষায় বলি,—'আসিবে, সে দিন আসিবে!'

ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'আঁধার যুগের আরব' সুলিখিত সন্দর্ভ। মরুচারী আরব কবির সুখদুঃখলাঞ্ছিত কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তালেবউদ্দীন আহাম্মদের 'যক্ষের ধন' নামক গল্পটী মন্দ নহে। 'T'র ঠকামী' এরূপ পত্রের যোগ্য নহে। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের হাফেজ হইতে অনুদিত 'প্রেমবন্ধন' উল্লেখযোগ্য। শেখ ফজলল করিম 'অন্তিম পিপাসা' নামক পদ্য-গল্পে সহজ ভাষায় যে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। ইনি কবিতার প্রসাধনে আরও অবহিত হইলে ভাল হয়। 'ভাল জল—টল-টল' পাদপূরণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'টল-টল' বিশেষণ যেমন নিরর্থক, তেমনই অস্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, অষ্টম শ্লোকটী বর্জ্জন করিলে কবিতাটীর কোনও ক্ষতি হইত না। কাজী আবদুল অদুদের 'ভুল' নামক গল্পে ৫১ পৃষ্ঠায় শম্ভুর চাচা ও তাহার বাঁদী শম্ভুর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে উপসর্গের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ছাপাইবার যোগ্য নহে। বিবি সারা তয়ফুরের 'কোর্ত্তীত' নামক অনুদিত ক্ষুদ্র সন্দর্ভটী আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকে পড়িতে বলি। সম্পাদক 'মুর্শিদী গান' ও 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া লুপ্তরত্ন-উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সুফল ফলিবে। 'কোরক' দেখিয়া 'সাহিত্যে'র 'কবিতা-কুঞ্জ' মনে পড়িল। হায়! সে 'কবিতা-কুঞ্জ' শুকাইয়া গিয়াছে! এখন শুধু মনে হয়,—'তে হি নো দিবসা গতাঃ!'

ভারতী।—আষাঢ়। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্রোতের মুখে' নামক ছবিখানির ব্যাখ্যা সঙ্গে নাই। থাকিলে ভাল হইত। ইহার বিশিষ্টতা এই যে, অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র ছাপ ইহাতে অত্যন্ত অল্প। কেবল বৃদ্ধের অঙ্গুলির বঁড়্শীর ভাবে সে 'পদ্ধতি'র সংস্কার—সে উদ্ভটতার ছায়া খুঁজিয়া পাওয়া যায়। চিত্রের নারী প্রাচ্য, নরের মুখে একটু 'সেমিটিক' আমেজ। অবনীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ও প্যাটেণ্ট চিত্রকলা-পদ্ধতিও ক্রমে স্বভাবের ও বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা' গল্প-গল্প। Modern বালগোপালের ছবি। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষের 'আর্ট ও কবিত্বে'র প্রতিপাদ্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। রসের অখণ্ডতা, নির্লিপ্ততা, 'বিশ্ব-বস্তুর সীমাগুলিকে আকুল মনের উপর তুলে নিয়ে তার মধ্যে অসীমের সুর বাজিয়ে তোলার নাম কবিত্ব' প্রভৃতি ছোট ও বড় শব্দ ও বাক্যগুলি 'সম্পূর্ণ মৌলিক' হইলেও অত্যন্ত গুরুপাক। এই রকম রচনা 'কবিত্ব', অথবা 'আর্ট', কিংবা উভয়ের খিচুড়ী, তাহা বলিতে পারি না। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ কাল নব্য বাঙ্গালী মনের ভাবের শিশি চাকিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ জটিল জালের বস্তার ভাষার, কবিত্বের, আর্টের, দর্শনের ও এই সকলের সমাহারের 'খলোপোষ' বুনিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'একটা কিছু করো' এত শীঘ্র এমন সার্থকতা লাভ করিবে, তাহা কে জানিত! শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'খেয়ালের খেসারৎ' নামক আখ্যানটি আরও ছোট—বাহুল্য-বর্জ্জিত হইলে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিত। পিসীমা 'তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে ছিটকে দূরে চলে গেলে'ই যথেষ্ট হইত। 'আৎকে না উঠলে'ও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষণিক মিলন' শীর্ষক কবিতায় বিশেষত্ব নাই। পিক 'দ্বিধা-ভরে কুকারিয়া' উঠে? সে 'দ্বিধা' কি? দ্বিতীয় শ্লোকেই যতিভঙ্গ। পরে আর চারি পাঁচটা আছে। 'তপ্ত ললাটে দিনু এঁকে চুম্বন?' একেবারে চুম্বনের 'মিলন'!—গরম ললাটের উপর গরম অধরের বর্ণে চুম্বনের পাকা ছবি আঁকা হইয়া গেল। ইহাও বাঙ্গালায় নরনারীকে ডাকিয়া শোনান হইতেছে, এবং শুনিবারও লোক জোটে! শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ইতিপূর্ব্বে জলে অনেক আলি-পনা দিয়াছেন; এবার হাতে-কলমে 'জলের-আল্পনা' ধরিয়াছেন। অসমাপ্ত। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'হাত-ফেরে' আখ্যানবস্তু Realistic বটে; নূতনও বটে। তবে মনে হয়, যেন বাঙ্গালীর জীবনে বিদেশী গল্প-কল্পতরুর একটা ডালের কলম বাঁধা হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'স্বাধীন ত্রিপুরার ঠাকুরগণ' দেশবাসীকে যুগ-ধর্ম্মে দীক্ষা দিক। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'মাসকাবারি'র 'সমাজচ্যুতদের কথা' ও 'পল্লী-সভ্যতা' আলোচনার যোগ্য। মিথুন-রাগের উপাসনা সকলে করিয়া উঠিতে পারিবে না, কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজিতকুমার অল্প পরিসরে অনেক চিন্তার বস্তু সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচীর 'কলঙ্কিনী' সমবেদনায় স্নিগ্ধ, মানবতায় পবিত্র। পাপের পঙ্কে শতদল পদ্মের মত তাঁহার 'কলঙ্কিনী' ফুটিয়াছে। 'পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে?'—সত্য। কবি উপসংহারে বলিতেছেন,—

'একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি

সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর স্বর্গেরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে।
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার তবে!'

'এক দণ্ড পূর্ব্বে' তিনি 'পল্লী-কলঙ্কিনী তারা'কে কেন 'কলঙ্কের ডালি' ভাবিয়াছিলেন, এবং 'মনে মনে গালি পাড়িয়াছিলেন', তাহার কারণও আমরা এই কবিতায় পাইয়াছি।—কবির চিত্ত তখন পিশিতপিণ্ডের লালসায় কলুষিত ছিল,—তিনি নির্লজ্জ হইয়া দেখিতেছিলেন, এবং দেখাইতেছিলেন,—

'রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে;'
'আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্যভঙ্গী ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের!'
'দাঁড়াইল স্নানশেষে তীরপ্রান্তে বিচিত্র বসনে
উচ্ছ্বলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।'

মানস-ব্যভিচারে কবির মন 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'র উদাহরণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পীবরযৌবনশালিনীর প্রতীকে লালসার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। শুভ-মুহূর্ত্তে সৌভাগ্যক্রমে 'অধীরা চণ্ডালকন্যা' তাঁহার মানস-নেত্রে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া-রূপেণ সংস্থিতা', তাঁহারই দিব্য-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দিয়াছিল। 'বাহুমৃণালের ললিত লাবণ্যভঙ্গী' যে 'আনন্দের ইঙ্গিত' করে, সে আনন্দে ও 'রমণীর বিপুল গৌরব'-অনুভূতির আনন্দে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাহুমূলের ইঙ্গিতে যে 'আনন্দ' সূচিত হয়, তাহা কবিতার বিষয় নহে। শিক্ষিত সুকবিরাও আজকাল উচ্চদরের উপাদানে খেউড়ের সৃষ্টি করিতেছেন।—কবি 'কলঙ্কিনী'র কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন; তাঁহার কবিতার পূর্ব্বোক্ত কলঙ্করেখাগুলি কি তিনি মুছিয়া ফেলিবেন না?

প্রবাসী।—আষাঢ়। শ্রীগগনেন্দ্র ঠাকুরের 'বর্ষায়' চিত্র নয়, চিত্রের আভাস। ছাপায় ছবিখানি যেন বর্ষার জলে ধুইয়া গিয়াছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য মন্দ নয়। বাঙ্গালীর একঘেয়ে জীবনের একটা সখ আঁকিবার বস্তু বটে। মেছুড়ের কাঁধের রক্তের দাগটা যে একখানা লাল গামছাও হইতে পারে, এই অনুমানের জন্য আমরা কাহাকে ধন্যবাদ দিব? গগনবাবুকে, অনুমান খণ্ডকে, না কল্পনাসুন্দরীকে? 'মালা' রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প। রবিবাবুর কলম হইতে 'পাগলা ঝোরা'র মত গল্প ঝরিতেছে। আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অল্প, ভাবের ধারায় গল্পটি পুষ্ট হইয়াছে। একটু রোমান্টিক, একটু আধ্যাত্মিকও বটে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'কবিত্বের ত্রিধারা' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল ও অধ্যাপক্ উইফেলের জন্য লেখা হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইতেছে, এ গম্ভীর, গুরুতর গবেষণা আমাদের মত 'জোলা' পাঠকের জন্য নহে। 'কালো হ্ময়ং নিরবধিঃ' বটে, কিন্তু ব্যক্তির সম্বন্ধে 'নিরবধি কালে'রও একটা 'অবধি' আছে। এ বয়সে আর মাথায় রাখিয়া মাসিকপত্রের প্রবন্ধ পড়িবার উপায় নাই।—প্রত্যক্ষ ভাবে,

সোজা কথায়, রূপক বাদ দিয়া, উপমার বদলে উপমেয়টাকেই সাদা কথায় ফুটাইয়া তুলিয়া বক্তব্য বুঝাইবার পদ্ধতিটা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইল। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী 'সোণার বাংলা দেশে' কয়েকটি সত্য কথা বলিয়াছেন। শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'হতচ্ছাড়া' চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু 'কোটা অমৃত দেশলাইয়ের কারখানা'র সংবাদ দিয়াছেন। 'আমাদের দেশে এই দেশী দেশলাইয়ের বিস্তার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।' লেখক কারখানার ঠিকানা ছাপিলে ভাল হইত। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'কবি এ, ই'র সাহিত্যের আদর্শ' আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। সেদিন যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গদ্যের নকলে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী 'গৌরী' লিখিয়াছেন। ছন্দটি দুরূহ। খোদ রবীন্দ্রনাথকেও পাদপূরণ করিতে হইতেছে। দুই একটি চরণ বেশ,—'কোঁকড়া ঘন কেশের রাশি কিছে পাখীর বাসা।' কিন্তু 'চোখের অরুচির অবার্থ আরাম' অত্যন্ত উৎকট,অসহ্য। 'হায়দ্রাবাদে উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে প্রকাশ,—'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সকল পুস্তক ভাষান্তরিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে উর্দ্দু ভাষা স্কুলকলেজপাঠ্য গ্রন্থাবলীতে বাঙ্গালাকে ছাড়াইয়া শীঘ্রই অগ্রসর হইবে। * * * ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার পাঠ্য সব পুস্তক প্রায় অনুবাদিত হইয়াছে; বোধ হয় জুলাই মাসে পুস্তক ছাপা হইয়া যাইবে। তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইংলণ্ড, গ্রীস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রস্তুত হইয়াছে। বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিবিজ্ঞান জুলাই মাসে শেষ হইবে। সরকারী অনুবাদ-কর্ম্মালয় ছাড়াও অপর অনেকে পুস্তক ভাষান্তরিত করিতেছে। একটি লোক এরিষ্টট্‌ল ও তাঁহার তর্কবিজ্ঞান বিষয়ক দুই ভাগের পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা কি করিবে?' লেখক 'সাহিত্য-পরিষৎ'কে আহ্বান করিয়াছেন। 'পরিষদে ত-গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে'ও বলিয়াছেন। 'গৃহবিবাদ' না থাকিলেও একটা পরিষদে সব কাজ হইতে পারে না। এ জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা আবশ্যক। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। দেশের কৃতবিদ্যমণ্ডলী সংঘ-বদ্ধ হইয়া এ ব্রত পালন করুন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ' হিতকারী ও মনোহারী সন্দর্ভ। 'দেশের কথা' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা আছে।

পুরুষ-যজ্ঞ।

খ্রীষ্ট-যজ্ঞের কথা বলিয়াছি। খ্রীষ্ট-যজ্ঞে হবিঃশেষের নাম ইউকেরিষ্ট। যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; উহা খাইলে দেবতাকেই খাওয়া হয়; দেবতাকে আত্মস্থ করিলে দেবতার সহিত ঐক্য ঘটে। ঐ দেবতাটি কে? ইনি স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হইলেও অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতারূপে অনাদি নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আবার পরিপূর্ণ জীব—যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব। তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করিয়াছেন; এবং সেই যজ্ঞে আপনাকেই পশুরূপে—মেষরূপে—কল্পনা করিয়া জীবহিতার্থ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইউকেরিষ্ট সেই পশুর রক্ত ও মাংস—উহা খাইলে ইতর যজমান দেবতার সহিত একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করিয়া অমরতা পায়। কেন না, খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃত স্বরূপ।

এখন বেদপন্থীর যজ্ঞে আসিব। বেদপন্থীর যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হইত—ইষ্টি যাগে মাংসের বদলে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত। সোমযজ্ঞে সোমরস দেওয়া হইত। যজ্ঞবিশেষে সোমরসের বদলে সুরা বা আর কিছু দেওয়া হইত। এখন প্রশ্ন যে, এই সকল দ্রব্যে কোন দেবতার অধিষ্ঠান হয় কি না? সে কোন্ দেবতা? সে দেবতার সহিত যজমানের সম্পর্ক কি?

প্রথমে সোমরসের আলোচনা করিব। ইহুদির দেবতা জেহোবা রক্তপ্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্ট মেষস্বরূপ হইয়াছিলেন; মেষরূপেই আপনার রক্ত দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা যে সুরাপান করেন, ঐ সুরা খ্রীষ্টের রক্ত। সোমরস কিন্তু দেবতার রক্ত হইতে পারে না, কেন না, বেদপন্থীর দেবতা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুযজ্ঞে পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য; রাক্ষসদের জন্য উহা বেদির পার্শ্বে উৎকরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সোমরস রক্ত নহে, তবে উহা অমৃতস্বরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোম-যজ্ঞ প্রসঙ্গে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সোমপানে অমরতা পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, সোম রসের পরিবর্তে ক্ষত্রিয়েরা বট অশ্বত্থ প্রভৃতির রস পান করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে সোম পানই হইত। কেন না, এই যে বটবৃক্ষ, ইহা পরোক্ষভাবে সোমেরই স্বরূপ। ক্ষত্রিয় "সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সেই বটের রস পান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেকের পর ক্ষত্রিয় রাজা সুরা পান করিতেন। রাজার

হাতে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র দেওয়া হইত। "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ" এই মন্ত্রে রাজার হাতে দেওয়া হইত। এই মন্ত্রে সুরাকেই সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। বলা হইতেছে, অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য তোমার অভিষব হয়; তোমার স্বাদু ও মাদক ধারার দ্বারা এই রাজাকে পূত কর। পানান্তে রাজা সেই সুরাশেষ তাঁহার কোন বন্ধুর হাতে দিতেন। এক পাত্রে সুরাপানে উভয়ের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইত। সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরা দেওয়া হইত; বিধিমতে সন্ধান বা fermentation দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিয়া সেই সুরা দেওয়া হইত। এই যজ্ঞের দেবতা ছিলেন, অশ্বিদ্বয় সরস্বতী আর ইন্দ্র সুত্রামা। অধ্বর্য্যু আগুনে দুধ ঢালিয়া দিতেন; তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা সেই সঙ্গে সুরা ঢালিয়া দিতেন। সুরাহুতির মন্ত্র—"যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীষু, সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য, তেন জিন্ব যজমানং মদেন, সরস্বত্যশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিং স্বাহা" এই মন্ত্রে সুরাকে স্পষ্টতই সোমস্থানীয় বলা হইয়াছে। কালক্রমে এই যজ্ঞেও সুরাপান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুরার পরিবর্ত্তে দুধ চলিবে। দ্বিজাতিসমাজে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে—সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচের হত্যাপরাধে শুক্রের অভিশাপে সুরা অপেয় হইয়াছে, এই পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্র শাস্ত্র কিন্তু সুরাকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র দ্বারা সুরাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সুরাপানের ব্যবস্থা করিলেন। সুরা-শোধনের জন্য একেবারে ব্রহ্মের দোহাই দেওয়া হইল। "বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি, তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু"—এইরূপে দোহাই দিলে আর কি ব্রহ্মহত্যার পাপ থাকিতে পারে? তান্ত্রিকদিগের সুরাশোধনের আসল মন্ত্রটি বৈদিক মন্ত্র—"হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ, হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ, নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ, অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।" এই মন্ত্রটি ঋক্‌বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে আছে। ইহার ঋষি স্বয়ং বামদেব, যিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই ঋকের নাম হংসবতী ঋক্। যাবতীয় ঋক্‌মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের পরেই বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক হংসমন্ত্রের বা অজপামন্ত্রের মূল এই হংসবতী ঋক্। ঐ মন্ত্রে যে হংসের কথা উল্লেখ হইতেছে, সেই হংস এককালে হয়ত আদিত্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে প্রায় একবাক্যে তিনি

ব্রহ্ম অর্থে গৃহীত হইয়াছেন। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়াছেন। মন্ত্রটির অর্থ, এই যে হংস বা ব্রহ্ম, তিনি দ্যুলোকে আছেন, অন্তরিক্ষে বাস করিতেছেন, হোতারূপে বেদিতে উপবিষ্ট আছেন, অতিথিরূপে গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আছেন, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেখানে রহিয়াছেন, ব্যোমে অবস্থিত আছেন, সত্যে অবস্থিত আছেন, অপ্‌সমূহ হইতে ইহার জন্ম, গো অর্থাৎ বাক্য হইতে ইহার জন্ম, অদ্রি হইতে ইহার জন্ম, সত্য হইতে ইহার জন্ম, ইনি সত্যস্বরূপ। তান্ত্রিকেরা এই মন্ত্রে সুরাশোধন করিলে সুরা একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। খ্রীষ্টান যাজক মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবামাত্র সুরা যেমন খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়, সেইরূপ। সোম যেমন অমরতা দেন, সুরাও তেমনি অমরতা দিয়া থাকেন।

এখন আপনারা খ্রীষ্টপন্থীর সুরাপানের সহিত বেদপন্থীর সোমপানের আর তন্ত্রপন্থীর সুরাপানের সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টানেরা যেমন দেবতাকে আত্মসাৎ করেন, বেদপন্থীও সেইরূপ করেন। এই যে সোম, ইনি স্বয়ং এক জন দেবতা, দেবগণের মধ্যে ইনি এক জন রাজা। সোম যজ্ঞে সোম ক্রয় করিয়া যখন যজ্ঞশালায় আনা হয়, তখন তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানই দেওয়া হয়। যজ্ঞশালায় তাঁহাকে রাজার মত উচ্চ আসনে রাখা হয়। রাজা অতিথি রূপে যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আতিথ্য ইষ্টি যজ্ঞ করা হয়। সোম যাগের পূর্ব্ব দিনে যখন তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া মহাবেদির উপরে হবির্ধান মণ্ডপে রাখা হয়, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য পশু যাগ করিতে হয়। সোম যজ্ঞে এই দেবগণের রাজা সোমকেই ভক্ষণ করা হইতেছে। স্পষ্টই বলা হইতেছে—"সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষয়ামি।" এখন আপনারা খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের সহিত বেদপন্থীর দেবতা ভক্ষণের তুলনা করুন।

খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট ত অনাদি নিত্য বাগ্‌দেবতা। সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক কি? আমার সঙ্গে আসুন; চমকাইবেন না। আমাদের বেদসাহিত্যে সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি। বাগ্‌দেবতাই সোম আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে নানা স্থানে সোম আহরণের আখ্যায়িকা আছে। কোন পাখী দেবতাদের জন্য সোম আনিয়াছিল; সেই পাখীকে শ্যেন বা সুপর্ণ বলা হইতেছে। কোথাও বলা হইতেছে শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ দূরদেশ হইতে সোম আনিয়াছেন। কোথাও

বলা হইতেছে তার্ক্ষ্য পক্ষী সোম আনিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, গায়ত্রী সুপর্ণী হইয়া সোম আনিয়াছেন; তার্ক্ষ্য অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। বেদের এই তার্ক্ষ্য পুরাণের গরুড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র বলা হইতেছে, দেবতারা সোম আনিবার জন্য বেদের ছন্দগুলিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ছন্দেরাই পাখী বা সুপর্ণ সাজিয়া সোম আনিতে উপরে উঠিলেন। প্রথমে জগতী উঠিলেন, পরে ত্রিষ্টুপ্ উঠিলেন; তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শেষে গায়ত্রী উঠিলেন। সোম গন্ধর্ব্বদের মধ্যে ছিলেন। কৃশানু নামক গন্ধর্ব্বের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গায়ত্রীরূপা সুপর্ণী দুই পা এবং মুখ দিয়া সোমকে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। অতএব যে পাখী সোম আনিলেন, তিনি গায়ত্রী, আর কেহ নহেন। এই গায়ত্রী কিন্তু ছন্দের মধ্যে প্রধান; তিনি ছন্দসাং মাতা। এই অর্থে তিনি বেদবাক্যের প্রধান, স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। সোম ক্রয় উপলক্ষে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। বাগ্‌দেবী দেবগণকে বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীপ্রিয়, আমাকেই তোমরা পাঠাও, আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিব। এই বলিয়া বাগ্‌দেবী নগ্না কুমারীরূপে সোম আনিতে গেলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে বঞ্চনা করিয়া সোম লইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অভিনয়ে সোম যজ্ঞে একটি ছোট গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবীর স্থানীয়। মনে রাখিবেন 'গো' শব্দের একটা অর্থ 'বাক্য' বা 'বাক্'। সোমাহরণ সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান পাইলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা এই কয়েকটা উপাখ্যানকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছেন, কদ্রু এবং সুপর্ণী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। বেদের এই সুপর্ণী পুরাণে বিনতা হইয়াছেন। এই বিনতারই পুত্র গরুড়। কদ্রুর জয় হইয়াছিল; সুপর্ণী তাঁহার দাসী হইয়াছিলেন। কদ্রু বলিলেন, তৃতীয় দ্যুলোকে যে সোম আছেন, তাঁহাকে যদি আনিতে পার, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন করিব। বেদের ছন্দগুলি এই সুপর্ণীর সন্তান। মায়ের আদেশে ছন্দেরা সোম আনিতে উঠিল; জগতী পারিল না, ত্রিষ্টুপ্‌ও পারিল না, কনিষ্ঠা গায়ত্রী সমর্থ হইলেন। দুই পা এবং মুখ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সোমকে নামাইয়া আনিলেন। পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু সোমকে আটকাইলেন। তখন দেবতারা বাগ্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাগ্‌দেবী গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিলেন। গায়ত্রী এই সময় রোহিণী বা রক্তবর্ণ মৃগীর রূপ ধরিয়াছিলেন;

তদনুসারে রক্তবর্ণের গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হয়। এখানে বাগ্‌দেবী ও গায়ত্রীকে ভিন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু উভয়েই সোম আনয়ন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবীই সোম আনেন। এখন বাগ্‌দেবীর সহিত সোমের সম্পর্ক আপনারা বুঝিতে পারিলেন। অমৃতস্বরূপ সোমকে পূর্ব্বে কেহ জানিত না; স্বয়ং বাগ্‌দেবতা তাঁহাকে দেবগণের জন্য আনয়ন করেন। তাহার পর মনুষ্যেরাও তাঁহাকে পাইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষ্ট স্বয়ং বাগ্‌দেবতা—Word become flesh. তিনিও স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপন্থী যজমান যেমন সুরাপান করিয়া অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেইরূপ সোম পান করিয়া অমরতা পান। সোমপান কালে তিনি বলেন, "বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু"—বাগ্‌দেবী প্রীত হইয়া সোমরসে তৃপ্ত হউন; আবার বলেন, "দেবকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, মনুষ্যকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, পিতৃকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি"—দেবকৃত পাপের তুমি বিনাশ কর, মনুষ্যকৃত পাপের বিনাশ কর, পিতৃকৃত পাপের বিনাশ কর—পুনরায় বলেন—"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্, কিং নূনমস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ, কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য"—আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি, জ্যোতি পাইয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি; আমরা অমর; মর্ত্ত্য পাপে আর আমাদের কি করিবে? যিনি সোম পান করেন, স্বয়ং বাগ্‌দেবী আসিয়া তাঁহাকে অমরতা দেন। তিনিই ত সোমকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমের কথা বলিলাম। এবার পুরোডাশের কথা বলিব। পুরোডাশ আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাইতে হয়। কয়েক খণ্ডে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। এক এক ভাগ এক এক ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সকল ভাগের নাম ইষ্টি যাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পুরোডাশের একটা খণ্ড থাকে, যাহা যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে খাইয়া থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছি, ইড়া ভক্ষণই যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। এই ইড়া-ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে, যজ্ঞ সার্থক হয়। খ্রীষ্টানের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণে নানাবিধ খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম breaking of the bread; খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের সহিত ভোজন কালে রুটি ভাঙ্গিয়াছিলেন, ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, This is My body which is broken for many for the

remission of sins. তদনুসারে খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে রুটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে যজমানদিগকে বাঁটিয়া দেন। খ্রীষ্টানেরা এই রুটি ভাঙ্গার গভীর তাৎপর্য্য দিয়াছেন। জাবহিতের জন্য খ্রীষ্ট আপনাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ডিত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. পুনশ্চ—Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, Consecration and Invocation—ভক্ষণের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করিয়া রুটি উৎসর্গ করিতে হয়। সম্প্রদায় ভেদে মন্ত্রের ভিন্নতা আছে; কেহ বা বাগ্‌দেবতারূপী খ্রীষ্টকে আহ্বান করেন, কেহ বা Holy Ghostকে আহ্বান করেন; কেহ বা Trinityকে আহ্বান করেন। অনেকের মতে এই আহ্বান মন্ত্র পাঠের পরই দেবতার আবির্ভাব হয় ও রুটি মাংসে পরিণত হয়। খ্রীষ্টপন্থীর যজ্ঞে যেরূপ, বেদ-পন্থীর যজ্ঞেও ঠিক তদনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র, উহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ড অগ্নীৎ ভক্ষণ করেন; ইহার নাম ষড়বত্ত। আর এক খণ্ড চারি অংশে ব্রহ্মা হোতা অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ এই চারিজনে ভক্ষণ করেন; ইহার নাম চতুর্দ্ধাকৃত ভাগ। আর দুই খণ্ড ব্রহ্মা ও যজমান যজ্ঞ সমাপ্তির পর ভক্ষণ করেন, উহা ব্রহ্মার ভাগ ও যজমানের ভাগ। এইরূপে পুরোডাশকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার নাম পুরোডাশের অবদান; ইংরেজিতে fraction বা breaking. এই সকল ভাগ ব্যতীত যজমান ও ঋত্বিক্ সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য একটা ভাগ থাকে, উহার নাম ইড়া। ইড়া রাখিবার জন্য একখানি কাঠের পাত্র থাকে; উহার নাম ইড়াপাত্র। পূর্ণমাস যাগে অধ্বর্য্যু পুরোডাশের খণ্ড কাটিয়া লইয়া সেই ইড়াপাত্রে রাখেন। প্রথমে ইড়াপাত্রে একটু ঘি ঢালা হয়; সেই ঘিয়ের উপরে দুইখানা পুরোডাশ হইতে দুই খণ্ড কাটিয়া রাখা হয়; আবার একটু ঘি ঢালা হয়। এইরূপে নীচে উপরে ঘি মাখান পুরোডাশ খণ্ডের নাম ইড়া। অধ্বর্য্যু হোতার আঙুলে ঘি মাখাইয়া দেন। হোতা সেই আঙুল দিয়া আপনার ঠোঁট মাজেন। অধ্বর্য্যু হোতাকে ইড়াপাত্র ধরিতে দেন। যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে ইড়াপাত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন। হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রে ইড়া দেবতাকে সমীপে আহ্বান করা হয়। মন্ত্র

পাঠের নাম ইড়ার উপহ্বান ; ইংরেজিতে Invocation. এই আহ্বানের পর ইড়াদেবী পুরোডাশ খণ্ডে আবির্ভাব করেন। তৎপরে আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলিয়া ইড়া ভক্ষণ করেন। ইড়াদেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপন্থীয় ও বেদপন্থীয় অনুষ্ঠানে কতটা মিল তাহা দেখিলেন।

এই ইড়াদেবতাটি কে? ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্ট স্বয়ং যজমান, স্বয়ং পশু, স্বয়ং দেবতা—বাগ্‌দেবতা—Word of God. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "যজমানো বৈ পুরোডাশঃ"—এই যে পুরোডাশ, ইহা যজমানই ; পুরোডাশ আহুতির দ্বারা যজমান আপনাকেই আহুতি দিতেছেন। আপনার নিষ্ক্রয়রূপে তিনি পশু দিতে পারিতেন ; কেন না, "পশবঃ পুরুষঃ", পশুগণই পুরুষস্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যস্থানীয়। এখানে যজমান সেই পশুর পরিবর্ত্তে পুরোডাশখণ্ড দিতেছেন। অতএব সেই পুরোডাশখণ্ড বা ইড়া পশুস্থানীয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণই আবার বলিতেছেন, "পশবো বৈ ইড়া"—এই যে ইড়া, ইহা ত পশু। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টরূপী পশুর মাংস, এই ইড়াও সেইরূপ যজমানরূপ পশুর মাংস। ভাল কথা, হোতা তবে মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতাকে আহ্বান করিলেন? এই দেবতারও নাম ইড়াদেবী। আপনারা এই ইড়াদেবীকে চেনেন কি? আশ্চর্য্য হইবেন, ইড়াদেবী স্বয়ং বাগ্‌দেবতা ; সমস্ত বৈদিক সাহিত্য এককালে ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। যে মন্ত্রে ইড়াকে আহ্বান হয়, সেই মন্ত্রটি শুনুন—হোতা ইড়াদেবীকে ডাকিতেছেন :—

"সুরূপবর্ষবর্ণে এহি"—অয়ি দেবি, তোমার রূপ সুন্দর, বর্ণ সুন্দর, বর্ষণ-শক্তি (বা উৎপাদন-শক্তি) সুন্দর ; তুমি এখানে এস। "ইমান্ ভদ্রান্ দুর্য্যান্ অভ্যেহি"—আমাদের এই সজ্জিত যজ্ঞগৃহের অভিমুখে এস। "মামনুব্রতা নি উ শীর্ষাণি মৃড্‌ঢ্বম্"—আমরা যে ব্রত লইয়াছি, তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া আমাদের শীর্ষে কল্যাণ অর্পণ কর। "ইড়ে এহি, অদিতে এহি, সরস্বতি এহি"—ইড়া তুমি এস, অদিতি তুমি এস, সরস্বতি তুমি এস। রন্তিরসি, রমতিরসি, সূনরীরসি,"—তুমি আনন্দময়ী, তুমি আনন্দদায়িনী, তুমি সুন্দরী। "জুষ্টে জুষ্টিং তে অশীয়"—তোমার পূজা করি, তুমি আমাদিগকে প্রীতি দাও। "উপহূতে উপহবং তে অশীয়"—তোমাকে আমরা ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া লও। "সত্যা আশীরস্ত যজ্ঞস্য ভূয়াৎ"—এই যজ্ঞে যে আশিষ চাহিতেছি, তাহা সত্য হউক। "অরেড়তা মনসা তচ্ছকেয়ম্"—স্থির মনে তাহার শক্তি লাভ করিব। "যজ্ঞো দিবং রোহতু, যজ্ঞো দিবং গচ্ছতু, যো

দেবযানঃ পন্থা তেন যজ্ঞো দেবান্ অপ্যেতু”—এই যজ্ঞ দিব্যলোকে আরোহণ করুক, দিব্যলোকে গমন করুক, দেবগণের যে পথ আছে, সেই পথে দেবগণের সমীপে চলুক। “অস্মান্ ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু”—যিনি বলবিধাতা ইন্দ্র, তিনি আমাদের বলবিধান করুন। “অস্মান্ রায় উত যজ্ঞাঃ সচন্ত”—আমরা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করি, আমরা যজ্ঞ লাভ করি। “অস্মাসু সন্ত আশিষঃ, সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্তিঃ মঘোনী”—অয়ি ইড়া, তুমি আমাদের প্রিয়া, তুমি বিঘ্নঘাতিনী, তুমি কল্যাণদায়িনী; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হউক।

এই মন্ত্র হইতে ইড়াদেবীর মাহাত্ম্যের কিছু পরিচয় পাইলেন। ইঁহার আর দুইটী নাম পাইলেন—অদিতি এবং সরস্বতী। দেখা যাক, ইড়াদেবীর আর কোন নাম আছে কি না? ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে ইড়ার নাম ছড়াইয়া আছে। পশুযাগ প্রসঙ্গে আপ্রী মন্ত্রের কথা বলিয়াছি। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ করিতে হয়। পশু যাগে এগার জন দেবতার উদ্দেশে এগারটি প্রযাজ যাগ হয়। প্রত্যেক প্রযাজের পূর্ব্বে হোতা যে মন্ত্র পড়েন, তাহার নাম আপ্রী মন্ত্র। দেবতা এগার জন, কাজেই মন্ত্রও এগারটি। ঋগ্বেদের যে সূক্ত মধ্যে এইরূপ এগারটি আপ্রী মন্ত্র থাকে, তাহাব নাম আপ্রী সূক্ত। ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দশটি আপ্রী সূক্ত আছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি বড় বড় ঋষি আপ্রী সূক্ত প্রচার করিতেছেন; আপ্রী সূক্তের প্রচারে যেন বিশেষ বাহাদুরী আছে। যে যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, তিনি তাঁহারই আপ্রী সূক্ত ব্যবহার করিতেন, অন্যের করিতেন না। ইহাতেও আপ্রী সূক্তের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আপ্রী সূক্তের এগার মন্ত্রের এগার দেবতা। অষ্টম দেবতার বেলায় কিন্তু তিনটি নাম একযোগে দেখা যায়—ইড়া, ভারতী, সরস্বতী। গোটাকয়েক আপ্রী মন্ত্র শুনুন। “ইড়া সরস্বতী মহী, তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ, বর্হিঃ সীদন্তু অস্রিধঃ”—এই মন্ত্রটি মেধাতিথির। “ভারতীড়ে সরস্বতি, যা বঃ সর্ব্বা উপব্রুবে, তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে”—এইটি অগস্ত্যের। “আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা, ইড়া-দেবৈর্ম্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ, সরস্বতি সারস্বতেভির্বাক্, তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু” —এটি বশিষ্ঠের। এইরূপ দশটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রেই ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই তিনটি নাম পাইতেছেন। ইহাদিগকে “তিস্রো দেব্যঃ” বলা হইতেছে, অথচ ইহারা তিনে এক। কেন না, এক একটি মন্ত্র এক এক দেবতারই উদ্দিষ্ট। ইঁহার মধ্যে ভারতীর এবং সরস্বতীর নাম আজি পর্য্যন্ত আপনাদের সুপরিচিত। এই দুই নামই বাগ্‌দেবীর নাম। ইড়াদেবীকে

আপনারা ভুলিয়াছেন, কিন্তু ভারতী ও সরস্বতী যদি বাগ্‌দেবী হন, তাহা হইলে ইড়াও বাগ্‌দেবী। অতি প্রাচীন কালে হয়ত ইঁহারা পৃথক্ দেবতা ছিলেন; কালে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে সরস্বতী বহু স্থলে নদীর নাম। এখন সরস্বতী নদী লুপ্ত, কিন্তু এককালে ইনি বেগবতী ছিলেন। একালে যেমন গঙ্গার মাহাত্ম্য, সেকালে সেইরূপ সরস্বতীর মাহাত্ম্য ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে সরস্বতীতীরে ব্রহ্মবাদীরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠার সহিত বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, একদা ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবষ নামে একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিল; সে দাসীপুত্র এবং অব্রাহ্মণ। ঋষিরা তাহাকে মরুভূমিতে খেদাইয়া দিলেন। পিপাসার্ত্ত কবষের মুখ হইতে ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। মন্ত্র শুনিয়া স্বয়ং সরস্বতী মরুভূমিতে স্রোত ফিরাইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন এবং কবষের পিপাসাশান্তি করিলেন। তদবধি কবষ ঋষি হইলেন। কবষের মন্ত্রগুলিও সোমযজ্ঞে স্থান পাইল। এই মন্ত্রগুলির নাম অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্র। সোমযজ্ঞের দিন প্রত্যূষে যখন 'একধনা' নামক জল আনা হয়, তৎপূর্ব্বে হোতা এই মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। যে সরস্বতীর এই মাহাত্ম্য, সেই সরস্বতী উত্তরকালে বেদবাক্যের দেবতা বা বাগ্‌দেবতা বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাহার পর ভারতী। ইনি হয় ত ভরতবংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই ভরতবংশের কীর্ত্তি বর্ণনায় আমাদের সাহিত্য পূর্ণ। কালিদাসের প্রসাদে দুষ্মন্তপুত্র সর্ব্বদমন ভরতের নাম কে না জানে! ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঋষি দীর্ঘতমা দুষ্মন্তপুত্র ভরতকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক করিয়াছিলেন; আরও দেখিবেন, তিনি পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া একশ ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের দিলীপ মহাবল পুত্র রঘুর সাহায্যেও শতক্রতু হইতে পারেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, মনুষ্য যেমন হস্ত দ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ম্ম পূর্ব্বে বা পরে কেহ করিতে পারেন নাই। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়াই মহাভারত। অধিক কি বলিব, এই ভরতের নাম হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভরতবংশের কুলদেবতা ভারতী ক্রমে বেদপন্থীর প্রধান দেবতা হইয়াছেন। সরস্বতীর ও ভারতীর পরে ইড়াদেবী। ঋগ্বেদে ইঁহার একটা বিশেষণ মনুষ্বতী বা মানবী। এই বিশেষণটি কিরূপে আসিল, তাহার সন্ধানের জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে যাইতে হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পটি বলিব।

আপনারা বৈবস্বত মনুর নাম জানেন। কালিদাসের ভাষায় ছন্দের মধ্যে যেমন প্রণব, রাজাদের মধ্যে তিনি সেইরূপ আদ্য রাজা ছিলেন। সেই মনু একদিন প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুইতেছিলেন। হাতের কাছে একটি মাছ আসিল। মাছ বলিল, মাছে মাছ খায়, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অসময়ে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু মাছটিকে তুলিয়া জলের জালায় রাখিলেন। মাছ ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন কুলায় না, তখন একটা খালে ফেলিলেন। খালে যখন কুলায় না, তখন সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে জলপ্লাবন ঘটিল। মাছের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মাছ নৌকার নিকট ভাসিতেছিল; তাহার শিঙে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মাছ নৌকা টানিয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, এই মাছই পুরাণের মৎস্যাবতার। জলপ্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল; মনু একা বাঁচিলেন। কালে জল নামিয়া গেলে মনু জলের উপরেই যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞে যাহা আহুতি দিলেন, তাহা হইতেই বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মিল। এই কন্যার নামই ইড়া। মনুকন্যা বলিয়া ইঁহার নাম মনুবতী বা মানবী। ইড়া মনুকে বলিলেন, আমি তোমারই কন্যা, তোমার যজ্ঞেই আমি জন্মিয়াছি। অতঃপর তুমি আমাকেই যজ্ঞে আহুতি দিবে। সেই যজ্ঞ হইতে নূতন প্রজা জন্মিবে। মনু তাঁহাকে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলেন। তাঁহা হইতে নূতন প্রজা জন্মিল; মনুর বংশ রক্ষা হইল। এই বংশই মানব বংশ। তদবধি যজ্ঞে ইড়ার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞে যে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়, সেই পুরোডাশের অংশই ইড়া। তাহাতে ইড়াদেবী বর্ত্তমান থাকেন; মানবেরা তাহা ভক্ষণ করে। মনুকন্যা ইড়ার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বেদে তাঁহার নাম ঐড় পুরূরবা। পুরাণের মতে পুরূরবার পিতা বুধ; বুধের পিতা সোম। এই সোম সেই রাজা সোম, যিনি দেবগণের অমৃত। অতএব, এই ইড়াদেবী হইতেই সোম বংশের বা চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যে বংশে দুষ্মন্তপুত্র ভরত জন্মিয়াছিলেন। ভরত বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ইড়াদেবী যে সেই বংশের কুলদেবতা ভারতীর সহিত মিলিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইড়াদেবীর কয়েকটি নাম পাইলেন। ইড়া আহ্বানের মন্ত্রে পাইয়াছেন অদিতি এবং সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে পাইলেন ভারতী ও সরস্বতী। বেদপন্থী তাঁহার দেবতাকে শত নামে, সহস্র নামে, ডাকিয়াও তৃপ্ত হন না। ইড়াদেবীর আর নাম আছে কি? যাস্কের 'নিরুক্ত' খুঁজিয়া দেখুন। এই নিরুক্ত খানি বৈদিক ভাষার

dictionary। ইহার আরম্ভে নিঘণ্টু মধ্যে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ বা synonym দেওয়া আছে। 'বাক্' শব্দে আসিয়া দেখুন। সাতান্নটি প্রতিশব্দ দেখিবেন। সাতান্নটি লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। গোটাকতক বাছিয়া লইব। 'বাক্' বা বাক্যের প্রতিশব্দ—শব্দ, স্বর, ঘোষ, বাণী ইত্যাদি। তাহার পরে দেখুন—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে এই তিন নাম একযোগে পাইয়াছেন। তাহার পরে দেখুন, সুপর্ণী—এই সুপর্ণী গায়ত্রী বা বাগ্‌দেবীরূপে সোম আনিয়াছিলেন। অতঃপর ইড়া যে বাগ্‌দেবী, তাহাতে আপনাদের সন্দেহ থাকিল না। তাহার পর কয়েকটি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। একটি নাম অদিতি। ইড়ার এই নাম আগেই ইড়ার আহ্বান মন্ত্রে পাইয়াছেন, অথচ এই অদিতি এখন দেবগণের মাতা। তাহার পর শচী—ইনি এখন ইন্দ্রপত্নী, বেদে ইনি যজ্ঞক্রতুরূপিণী। তাহার পর স্বাহা—ইনি অগ্নির পত্নী। তাহার পর দেখুন গৌরী—ইনি এখন মহেশ্বরপত্নী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখা যায়। এই উমা হৈমবতী হিমালয়কন্যা পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং ইঁহারই নামান্তর গৌরী। নিরুক্তকার গৌরীতে আসিয়া থামেন নাই; আর একটি নাম দিয়াছেন মেনা বা মেনকা; ইনি গৌরীর জননী। সর্ব্বশেষে নাম মহী বা পৃথিবী, গো এবং ধেনু। পৃথিবী যে গাভী, তাহা প্রসিদ্ধ; কালিদাসের 'দুদোহ গাং স যজ্ঞায়', এবং 'দুদোহ গো-রূপ-ধরামিবোর্ব্বীম্' মনে করুন। বাগ্‌দেবীও যে গাভীরূপিণী, তাহা বহু দিন হইতে স্বীকৃত হইতেছে। চলিত ভাষাতেই গো-শব্দে বাক্য বুঝায়। সোম যজ্ঞে একটী গাভী দিয়া সোম কিনিতে হয়, আগেই বলিয়াছি। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবী। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"বাচং ধেনুম্ উপাসীত। তস্যাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ।"—বাগ্‌দেবতাকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে; তাঁহার চারিটি স্তন, স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার। স্বাহাকার এবং বষট্‌কার দেবগণের উপজীব্য; হন্তকার মনুষ্যের এবং স্বধাকার পিতৃগণের। প্রাণ তাহার পক্ষে বৃষস্থানীয় এবং মন বৎসস্থানীয়। বাগ্‌দেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই গাভী আমাদের ভগবতী হইয়াছেন। স্বয়ং বাক্‌পতি গো-পতি বা গো-পালরূপে গো-গোপ-সংবাবৃত হইয়া গো-লোক বা বাঙ্‌ময় বিশ্বভুবন জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্থানান্তরে ইহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আপনারা দেখিলেন, এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বময়ী। বেদ-

পন্থী ইহাকে ভুলিতে বা ছাড়িতে পারেন না। আরও উচ্চে উঠিয়া আমাদের শাস্ত্র প্রায় একবাক্যে বলিতেছেন, 'বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম'—বাক্‌ই ব্রহ্ম—"The Word is God". পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এইখানে একটু খট্‌কায় পড়িয়াছেন। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে ব্রহ্মশব্দ ঈশ্বরবাচক; বাক্যকে একবারে অনাদি নিত্য ঈশ্বরে পরিণত করা অখ্রীষ্টানের পক্ষেও সম্ভব, ইহা মনে করিতেই বোধ করি খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের খট্‌কা লাগে। ঐ পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের মন্ত্র মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্মণ মধ্যে, ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্যই বুঝায়, স্পষ্টরূপে ঈশ্বর বুঝায় না। সুসমাচার প্রচারক জোহনের এত পূর্ব্বে ব্রহ্মনামক বাক্যকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে পরিণত করা হইয়াছে, ইহা মনে করিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। ফলে কিন্তু বাক্‌ই যে ঈশ্বর, শব্দই যে ব্রহ্ম, ইহা বেদপন্থীর পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত পুরাতন কথা। হীরাক্লিটসের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদপন্থীর নিকট ইহা অত্যন্ত পরিচিত কথা। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ইতিহাসটা ব্যাপিয়া, অন্ততঃ ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডল সঙ্কলনের পূর্ব্ব হইতে আজি পর্যান্ত,এই তত্ত্ব বেদপন্থীর অধ্যাত্ম জীবনকে নিয়মিত করিয়া আছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রধান দেবতা প্রজাপতি; কিন্তু মন্ত্র সংহিতার মধ্যে প্রজাপতির তেমন প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলে চারিবার মাত্র প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ সংহিতায় কিন্তু আর একটি দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম বৃহস্পতি—নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি—ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদবাক্যের পতি। উত্তরকালে ইঁহার নাম হইয়াছে বাচস্পতি। তাহাতে বুঝাইল যে, বাক্‌ বা বেদবাক্যই ব্রহ্ম। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে, তাহাতে বৃহস্পতি স্বয়ং বলিতেছেন, যেন অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন, এই যে বাক্‌, যাহা সৃষ্ট পদার্থের নামকরণে প্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহা কোন্‌ গুহার মধ্যে নিহিত ছিল! কোন্‌ প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল! "উত ত্বঃ পশ্যন্‌ অদদর্শ বাচম্‌, উত ত্বঃ শৃণ্বন্‌ ন শৃণোতি এনাম্‌"—লোকে ইহাকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। "উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে, জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ"—পত্নী যেমন শোভন বাস পরিয়া পতির নিকট যায়, ইনিও তেমনি প্রেমভরে নিজের দেহ প্রকাশ করেন। বৃহস্পতি স্বয়ং বাকের পতি, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভাষাই সমুচিত। এই যে বাক্‌, ইহা বিশেষতঃ বেদবিদ্যা। বৃহস্পতিই বলিতেছেন—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌,

গায়ত্রং ত্বো গায়তি শকরীষু, ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং, যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ”—এই বাক্ হোতার মুখে ঋক্‌রূপে বাহির হইয়া যজ্ঞকে পুষ্ট করেন; উদ্গাতার মুখে শকরী সামরূপে গীত হন; অধ্বর্য্যুর মুখে যজুর্ম্মন্ত্ররূপে যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন; ব্রহ্মা এই বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করেন। অতএব এই ‘বাক্’ অর্থে বিশেষতঃ বেদবাক্যকেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের ভাষায় এই বেদবাক্য “মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্” অর্থাৎ সেই মহাভূত ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় প্রজাপতি প্রজারূপে বহু হইবার কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মরূপ ত্রয়ী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদবাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে প্রথমে সমীরিত হইয়াছিল, বেদপন্থী ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বলা হইয়াছে, “অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা”—স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইলেও এই বাক্ নিত্য; ইঁহার আদিও নাই, নিধনও নাই। খ্রীষ্টানদিগের জনকেশ্বর হইতে উৎপন্ন তনয়েশ্বরের—খ্রীষ্টের বা শব্দরূপী ঈশ্বরের—নিত্যত্বের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই “যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ” বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়াছেন; পরন্তু বলিয়াছেন, “যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে”—যিনি বেদবাক্য দ্বারা অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানেরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শব্দরূপী পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারায় সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদপন্থীও বলেন, শব্দ হইতেই সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ কোনরূপ শরীরধারী দেবতা মানেন না, চলিত অর্থে ঈশ্বরও মানেন না। অথচ তাঁহারা এই বেদবাক্যকে নিত্য এবং অপৌরুষের বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদবাক্য মূর্ত্তিহীন শব্দরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছেন; এই শব্দ ঋষিদিগকে দেখা দেন এবং মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঋষিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। বেদবাক্যই বাগ্‌দেবতা বা ব্রহ্ম। বেদমন্ত্রের সারভূত যে গায়ত্রী মন্ত্র, উহাকেই বিশেষতঃ বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম; এই ছন্দ সুপর্ণীরূপ ধরিয়া সোম বা অমরতা আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ছন্দের মধ্যে প্রধান, তিনি “ছন্দসাং মাতা”। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমরা প্রাত্যহিক সন্ধ্যোপাসনার সময়ে “আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং, গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ” এই মন্ত্রে

গায়ত্রীকে 'ছন্দসাং মাতা' এবং ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া আবাহন করিয়া থাকি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ জোরের সহিত বলিতেছেন, 'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ; বাগ্ বৈ গায়ত্রী, বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ"—সমস্ত ভূত যাহা কিছু বিদ্যমান, এ সমস্তই গায়ত্রী; গায়ত্রীই বাক্, বাক্ই সমস্ত ভূত; গায়ত্রীই বাক্‌রূপে সকল ভূতের নাম দেন এবং সকলকেই রক্ষা করেন। গায়ত্রী ছন্দের যে মন্ত্রটিকে আমরা বেদবাক্যের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, এইজন্য উহাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয়। এই জন্য গায়ত্রীর নামান্তর সাবিত্রী। বিশ্বামিত্র ঋষি উহা প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তদবধি আজি পর্য্যন্ত উহাই বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক বালক উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তদবধি যাবজ্জীবন এই মন্ত্রের জপে বাধ্য থাকে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"স যামেব অমূং সাবিত্রীম্ অন্বাহ এব এব সা"—সেই আচার্য্য বালককে যে সাবিত্রী মন্ত্র দান করেন, সেই সাবিত্রী মন্ত্রই বিশেষতঃ গায়ত্রী। "এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা"—এই গায়ত্রী আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই গায়ত্রীতে সমস্ত জগৎই প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণের উপাখ্যান ঋক্‌সংহিতা মধ্যে পুনঃ পুনঃ আছে। উহার গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, বিষ্ণুর তিন পদ এই লোকত্রয়কে বা সমস্ত প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্যাপিয়া আছে, এই তাৎপর্য্য এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই তিন পদ ব্যতীত বিষ্ণুর আর একটি চতুর্থ পদের বা পরম পদের কথা ভূয়োভূয়ঃ শুনা যায়, যে পদ পরম ব্যোমে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত, লোকে বিদ্যমান। এইরূপে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু চতুষ্পাদ। গায়ত্রী ছন্দের কিন্তু তিনটি মাত্র চরণ; গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপ দৃঢ় করিবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, ভূমি অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক ইহাই গায়ত্রীর প্রথম পদ, ঋক্ যজুঃ সাম ইহাই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ, প্রাণ অপান ব্যান ইহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ; কিন্তু উহার উপরেও আর একটি তুরীয় বা চতুর্থ পদ আছে, যাহা "পরোরজা" অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত।

এই বাগ্‌দেবতার ব্রহ্মস্বরূপত্ব সম্বন্ধে যদি এখনও আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডল হইতে একটি সূক্ত আপনাদিগকে আমি শুনাইতে চাহি। এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। আজি পর্য্যন্ত শরৎ কালের দেবীপূজায় উহা আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা ঐ সূক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সূক্তের ঋষির নাম বাক্। তিনি

অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারক জোহনের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি হীরাক্লিটাসের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, তিনি আপনাকে বাক্ অথবা শব্দ-ব্রহ্মরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের এই পুরাতনী ঋষিকন্যা বাক্ জোরের সহিত বলিতেছেন—

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি,
অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ,
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি,
অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা,—

আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; মিত্র এবং বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি; ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও, আমি ধরিয়া রাখিয়াছি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি,
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ,
অহং জনায় সমদং কৃণোমি,
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ,—

আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি, আমিই দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্,
মম যোনিরপ্স্ব অন্তঃ সমুদ্রে,
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা,
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি,—

আমি ঊর্দ্ধভাগে পিতা দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি; দ্যুলোককেও আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি।

অহম্ এব বাত ইব প্রবামি,
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা,
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা,
এতাবতী মহিমা সম্বভূব,—

বিশ্বভুবন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর

পরে, দ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আমি আমার মহিমাদ্বারা সম্ভূত হই।

ইহার চেয়ে জোরের ভাষা হইতে পারে না; ইহার চেয়ে স্পষ্ট কথা হইতে পারে না। মেরীগর্ভে জীবরূপে অবতীর্ণ শব্দরূপী খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। তাহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে অম্ভৃণ-কন্যারূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, আমিই বিশ্ব ভুবনের নির্ম্মাণকর্ত্রী—অহং ব্রহ্মাস্মি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে দার্শনিক অদ্বৈতবাদ খুঁজিয়া পান নাই; এই সূক্তটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে।

ইড়াদেবীকে আপনারা চিনিলেন। ইনি বেদপন্থীর সনাতনী বাগ্‌দেবী। শ্রৌতকর্ম্মের সহিত ইড়াভক্ষণ অনুষ্ঠান এখন অপ্রচলিত; ইড়াভক্ষণে ইড়াদেবীকে—বাগ্‌দেবীকে—ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করা হইত। ইড়া সর্ব্বদেবময়ী; সকল যজ্ঞেই ইড়াভক্ষণ বিহিত ছিল। যজ্ঞান্তে যজমান বিষ্ণু-পদ পাইতেন। ইড়াদেবীর নাম পর্য্যন্ত আপনারা ভুলিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌দেবীকে বেদপন্থী ভুলিতে পারেন না। তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া বেদপন্থীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদপন্থীকে আমি মোটের উপর nominalist বলিয়া জানি। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, দেবতার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর নাই; কোন রূপ নাই। যে কোন পদার্থের, যে কোন conceptএর বা ideaর একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে, সেই পদার্থই দেবতা। যাহা কিছু object of thought, তাহাই দেবতা। যে বাক্যে সেই conceptএর তাৎপর্য্য বা connotation পাওয়া যায়, সেই বাক্যই—সেই predicationই,—দেবতার মন্ত্র; অতএব দেবতা মন্ত্রাত্মক। ইহা চূড়ান্ত nominalism. জগতে যাহা কিছু মননযোগ্য বা object of thought আছে বা থাকিতে পারে, তাহাই দেবতা এবং যে দেবতাকে যে নাম দেওয়া যায়, সেই নামই সেই দেবতার শরীর। এই অর্থে দেবতামাত্রই শব্দময়ী, বর্ণময়ী। যাহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা দেবতার নামকেই দেবতার তুল্যমূল্য ধরিয়া লইয়াছেন। এমন কি, সত্যভামা ঠাকুরাণী তুলাদণ্ডে তাঁহার হরির মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়িলে, রুক্মিণী তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, হরির চেয়ে হরির নামের গুরুত্ব অধিক। বেদপন্থীর এই nominalism শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারে চরম সার্থকতা পাইয়াছে। ও এই

একাক্ষর শব্দটির প্রাচীন অর্থ—হাঁ; আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইত, ওঁ অর্থাৎ হাঁ,—আছে। ব্রহ্ম আছেন এ বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ ছিল না, তাঁহারা এই ওঁ অক্ষরটিকেই ব্রহ্মের সব চেয়ে ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি। তন্ত্রপন্থী দার্শনিকও বেদপন্থীর এই nominalism গ্রহণ করিয়াছেন। ওঙ্কারের অনুকরণে তিনিও x, y, z, বা ক খ গ বা হিং টিং ছট্ ইত্যাদি অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নাম বা বীজমন্ত্র দ্বারা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নামের সুবিধা এই যে, সাধক নিজের স্বভাব ও মেজাজ অনুসারে যে কোন সঙ্কেতে যে কোন সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য্য আরোপ করিতে পারেন —আপনার মনের মত করিয়া আপনার দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্ত হন না। তন্ত্রপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক; তিনি প্রত্যেক নামকে একটা রূপ দিয়া realise করিতে চাহেন, রূপের জগতে টানিয়া আনিয়া দেবতার সহিত মেলা মেশা কারবার করিয়া রসসম্ভোগ করিতে চাহেন। তিনি এখানে আর্টিষ্ট। প্রত্যেক নামের, প্রত্যেক দেবতার, তিনি একটা রূপ কল্পনা করিয়াছেন; সেই নামের যে তাৎপর্য্য বা connotation তিনি দিতে চাহেন, তদনুযায়ী রূপ কল্পনা করিয়াছেন। সেই রূপ ধ্যান করিয়া তিনি তৃপ্তি পান। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ঝগড়ায় কোন লাভ নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীর বাগ্‌দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তন্ত্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাত্মিকা—অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে ইহাঁর দেহ নির্ম্মিত; প্রতি অঙ্গে কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষর বসাইয়া ইহাঁর শব্দময়—বর্ণময় —দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে—অতএব ইনি পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃ-স্থলা। ইনি ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা—ইহার মস্তকে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। এ সেই সোমকলা, বাগ্‌দেবী স্বয়ং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা, এক হাতে অক্ষমালা, এক হাতে বিদ্যা, চতুর্থ হাতে সুধাঢ্য কলস,—অমৃতপূর্ণ কলস—ইহাও সেই সোমকলস, যাহা অমৃতরসে পূর্ণ। ইনি ত্রিনয়না—বিশদপ্রভা—আপীনতুঙ্গস্তনী। এমন রূপ আর হয় না। এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বময়ী;—যে কোন দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পূজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন—আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিন্যাস করিয়া আপনার স্থূল দেহকে বাগ্‌দেবতার বাঙ্ময় দেহরূপে কল্পনা করেন;

আপনার অন্তঃশরীরের ও চক্রে চক্রে ঐরূপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দেহকেও বাগ্‌দেবীর বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। তন্ত্রমতে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। বাহিরের দেহে ও অন্তর্দেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগ্‌দেবীর শব্দময় বাঙ্‌ময় দেহ রচনার নামই মাতৃকা ন্যাস। এইরূপে পূজায় বসিলে পূজকের সহিত বাগ্‌দেবতার অভিন্নতা কল্পিত হয়; জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য কল্পিত হয়। বৈদিক যজ্ঞে ইড়াভক্ষণের অভিপ্রায় যজমানের সহিত বাগ্‌দেবতার—শব্দব্রহ্মের—ঐক্য সম্পাদন। তান্ত্রিক পূজারও সেই একই অভিপ্রায়। খ্রীষ্টান তাঁহার বাগ্‌দেবতাকে গ্রীকদের নিকট ধার করিয়া লইয়াছেন; তাঁহাকে মূর্ত্তি দিয়া খ্রীষ্ট বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই শব্দব্রহ্ম-তত্ত্বকে অধিকদূর চলাইতে পারেন নাই। বেদপন্থী যাহা ধরেন, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন।

এতক্ষণে আপনারা ইড়াভক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। হাসিবেন না, ইড়াভক্ষণ খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের অনুরূপ অনুষ্ঠান। ইড়াভক্ষণে বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্‌দেবতার সহিত সাযুজ্য স্থাপন হয়, অমৃত ভোজন ঘটে; সোমপানেও যে ফল, ইড়া ভক্ষণেও সেই ফল। ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না—ইড়াভক্ষণেই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। পুরাকালে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কতটা স্থান জুড়িয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে আমি এ পর্য্যন্ত খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু এখন খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে কথায় কথায় যজ্ঞ সম্বন্ধে উপাখ্যান দেখিবেন। সকলেই যজ্ঞ করিতেছে। রাজারা করিতেছেন, ঋষিরা করিতেছেন, অঙ্গিরোগণ করিতেছেন, আদিত্যগণ করিতেছেন, পিতৃগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ, সকলেই যজ্ঞ করিতেছেন। এমন কি গাভীগণ ও বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিতেছে। যজ্ঞ লইয়া দেবগণের সহিত অসুরগণের কেবলই বিবাদ হইতেছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ অসুরগণকে পরাজয় করিতেছেন। দেবতারা যজ্ঞকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যজ্ঞ আপনি আসিয়া ধরা দিতেছেন; দেবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিতেছেন। মনু যজ্ঞ করিয়া লুপ্ত মানববংশ রক্ষা করিতেছেন। সংবৎসররূপী অর্থাৎ কালরূপী প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছেন; ঋতুগণ ও মাসগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছেন। প্রজাপতির ইচ্ছা হইল, আমি একা আছি, বহু হইব। তিনি

তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া আপনার প্রাণের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখিতে পাইলেন। সেই দ্বাদশাহ যজ্ঞকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সেই যজ্ঞ করিলেন; তাহাতেই তিনি বহু হইলেন ও প্রজাপতি হইলেন। দেখাদেখি ইন্দ্র দ্বাদশাহ যজ্ঞ করিলেন; তাহাতে তিনি দেবগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রজাপতি এককালে গৃহপতি হইয়াছিলেন; দেবগণও যজমান হইয়া প্রজাপতির সহিত একযোগে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহাদের চিত্তি স্রুক্ হইয়াছিল, চিত্ত আজ্য হইয়াছিল, বাক্য বেদি হইয়াছিল, ধ্যান বর্হিঃ বা কুশ হইয়াছিল, জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল, বিজ্ঞান অগ্নীৎ হইয়াছিল, প্রাণ হব্য হইয়াছিল, সাম অধ্বর্যু হইয়াছিল, বাচস্পতি হোতা হইয়াছিলেন, মন মৈত্রাবরুণ হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ। স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন। মনে রাখিবেন, যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোন দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট্ পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন। কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছিলেন? যজ্ঞদেবতার উদ্দেশেই আহুতি দিয়াছিলেন। প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞদেবতা, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কোন ইষ্টলাভ থাকিতে পারে না; তিনি সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা লীলা-কৈবল্য। আপনারা বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের কথা শুনিয়াছেন—সেই পুরুষ সূক্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুষ্ঠিত এই আদিম যজ্ঞের—এই পুরুষ যজ্ঞের—সবিশেষ বিবরণ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন পুরুষ; এক জন Person, যাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে, কামনা মাত্রে, তপস্যা মাত্রে, এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে পুরুষ, তাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি, সহস্র পদ। বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন এবং তাহার উপরেও আরও দশ অঙ্গুলি ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্বভূত তাঁহার একপদ মাত্র, তাঁহার অন্য তিন পদ বিশ্বভূত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। যাহা কিছু আছে, যাহা ছিল বা হইবে, তাহা লইয়াই এই পুরুষ। অথচ এই সমস্তই তাঁহার এক পদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি বিরাট্‌রূপে জন্মিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন; এবং জাত হইয়াই সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমস্তকে আক্রমণ করিলেন এবং অতিক্রম করিয়া রহিলেন। তিনিই অগ্রজন্মা পুরুষ; তখন কোথাও কোন দেবতা ছিল না, ঋষি ছিল না, মনুষ্য ছিল না, অথচ সেই ভাবী পুরুষেরা কোথা

হইতে আসিয়া সেই অগ্রজন্মা বিরাট্ পুরুষকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে চমকাইবেন না; সৃষ্টিঘটনা কালাতিগ ঘটনা; এখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত মিশিয়া থাকে। যজ্ঞে পশু আবশ্যক; সেই পুরুষকেই তাঁহারা পশু করিলেন। "তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ, তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে"—ঋষিগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ সেই অগ্রে জাত পুরুষকেই পশুরূপে প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। "দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্"—দেবগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই পুরুষকেই পশুরূপে বন্ধন করিলেন। সেই যজ্ঞ সর্ব্বহুত যজ্ঞ। যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই সেই পুরুষ; সেই সর্ব্বরূপ পুরুষকেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল; সেই পশুকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুতি দেওয়া হইল। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্রাগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে জন্মিল। আরণ্য এবং গ্রাম্য পশুগণও উৎপন্ন হইল। ভাবী জীবগণের হিতার্থ বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—আপনাকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন;—ভাবী জীবেরা, ভাবী দেবগণ ও ভাবী ঋষিগণ, যজমান ও ঋত্বিক্ হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে তাঁহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞের সম্পাদন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যজ্ঞের কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবেন। ইহাই বিশ্বমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞ, কেবল যজ্ঞের জন্যই, অন্য কামনা বর্জ্জন করিয়া কেবল যজ্ঞের জন্যই, এই প্রথম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্"—এখন যে যজ্ঞ করা হয়, সে সেই আদিম যজ্ঞেরই অনুকরণে।

বিরাট্ পুরুষের এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে, "কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্"—এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ কি ছিল, প্রতিমা কি ছিল, উহার সম্বন্ধ কি ছিল? "আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থম্; যদ্ দেবা দেবম্ অযজন্ত বিশ্বে"—বিশ্বমধ্যে দেবতারা যজ্ঞ পুরুষের যে যাগ করিয়াছিলেন, তাহার আজ্য কি ছিল, পরিধি কি ছিল, ছন্দ কি ছিল, শস্ত্রই বা কি ছিল? বলা হইতেছে, "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভি-

স্থত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ”—বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে। “ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে”—সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া সেই বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। “চা কৢপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যাঃ, যজ্ঞে যাতে পিতরো নঃ পুরাণে”—সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। “পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষসা তান্, য ইমং যজ্ঞম্ অযজন্ত পূর্ব্বে”—পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এখনও যেন মানসচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতই এই সৃষ্টি-যজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞ ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্‌পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞিয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্ঞিয় পশুর দেহ; যাবতীয় জীবের হিতার্থ ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে—অন্নরূপে—নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ করিয়া সেই বিরাট্‌পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট্ পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন; অথচ তিনি নষ্ট—নিহত—হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার। বেদপন্থী সমাজে অগ্নিচয়ন বলিয়া একটা সংবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্য বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে একটি বেদি গাঁথা হইত, তাহার নাম চিতি। ইটের পাশে ইট বসাইয়া, ইটের উপর ইট থাকে থাকে সাজাইয়া, এই চিতি

নির্ম্মিত হইত। তজ্জন্ত বহু ইষ্টকের প্রয়োজন হইত। এই চিতির মধ্যস্থলে উত্তর বেদি গড়িয়া সেখানে অগ্নির স্থাপনা হইত; এবং সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। কোথাও বা সংবৎসর ধরিয়া সত্ররূপে অগ্নিচয়নের অনুষ্ঠান হইত। অনুষ্ঠান ভেদে এই অগ্নি নানাবিধ নাম পাইত। কোথাও নাম সাবিত্র অগ্নি; কোথাও বৈশ্বসৃজ অগ্নি; কোথাও বা চাতুর্হোত্র অগ্নি; কোথাও নাম নাচিকেত অগ্নি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে অন্য অগ্নির সহিত নাচিকেত অগ্নির চয়নের বিস্তৃত বিবরণ আছে। নাচিকেত অগ্নির প্রসঙ্গ আপনারা কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদ মধ্যে পাইয়াছেন। মৃত্যু নচিকেতাকে এই অগ্নিচয়নে ইষ্টকের সংখ্যা ও ইষ্টক স্থাপনের প্রণালী এবং অগ্নির তাৎপর্য্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার নামেই এই অগ্নির নাম হইবে; যে তিন বার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিবে, সে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিবে ও পরম শান্তিলাভ করিবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেই উপাখ্যানটির উল্লেখ আছে। আর এক অগ্নির নাম আরুণ-কেতুক অগ্নি—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের আরম্ভেই ইহার সবিস্তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। উত্তর বেদির স্থানে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালা হইত; তাহার উপর পদ্মের পাতা, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মফুল বিছাইয়া একখানা পদ্ম পত্রে সোণার পাতের উপরে সোণার পুরুষ মূর্ত্তি রাখা হইত; তাহার পার্শ্বে একটা কূর্ম্ম—কাছিম—রাখা হইত। অতঃপর সেখানে অগ্নি রাখিয়া অগ্নির চারিদিকে ইট সাজাইয়া চিতি প্রস্তুত হইত। এই অগ্নির নাম আরুণকেতুক অগ্নি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জলময় ছিল। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে বিখ্যাত নাসদাসীয় সূক্তে এই জলের কথা আছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে, অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।" সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল, আমি সৃষ্টি করিব। এখানেও তৈত্তিরীয় আরণ্যক নাসদাসীয় সূক্তের দোহাই দিয়া বলিতেছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—অগ্রে কাম উৎপন্ন হইল, উহা মন হইতে বীজরূপে প্রথমে জন্মিল। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি-কামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজাপতির মানসপুত্র মনসিজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন। সে কথা যাক্। সৃষ্টি কামনা করিয়া প্রজাপতি তপস্যা করিলেন ও আপনার শরীর কম্পন করি-

লেন। শরীর হইতে কতকগুলি ঋষি জন্মিল—একদল ঋষির নাম অরুণকেতু। প্রজাপতি দেখিলেন, জল মধ্যে একটি কূর্ম্ম - কচ্ছপ—চরিতেছে। প্রজাপতি সেই কূর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখনই জন্মিলে? কূর্ম্ম বলিল, না, আমি আগে হইতেই আছি; এই বলিয়া কূর্ম সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষের মূর্ত্তি ধরিল। এই তিনটি বিশেষণেই আপনারা ইহাকে চিনিতে পারিবেন; ইনিই পুরুষসূক্তের বিরাট্ পুরুষ। এইখানে নারায়ণের কূর্ম্মাবতারের মূলও পাইবেন। প্রজাপতি বলিলেন, তাহা হইলে তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর। তখন সেই পুরুষ অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া এদিকে ওদিকে ছিটাইতে লাগিলেন। এক এক দিকে এক এক দেবতা জন্মিল—আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা জন্মিল। সেই জলের বিন্দু হইতে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মিল। ফলে ঐ যে কূর্ম্মরূপী পুরুষ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতির মধ্যেই ছিলেন, প্রজাপতির সৃষ্টিকামনার পর তিনি বাহিরে আসিলেন মাত্র। প্রজাপতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপসংহারে বলিতেছেন—বিধায় ভূতানি বিধায় লোকান্, বিধায় সর্ব্বান্ প্রদিশো দিশশ্চ, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য, আত্মনা আত্মানম্ অভি সংবিবেশ—সত্যস্বরূপ অগ্রজন্মা প্রজাপতি ভূতসকল ও লোকসকল বিধান করিয়া দিক্ বিদিকের সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইংরেজিতে বলিলে তিনি বিশ্বজগৎকে transcend করিয়াও তাহাতে immanent রহিলেন।

আরুণকেতুক নামক অগ্নির চয়ন অনুষ্ঠান প্রজাপতি কর্ত্তৃক সেই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের অনুকরণ। উত্তর বেদির নীচে যে জল ঢালা হয়, উহাই সেই সৃষ্টির পূর্ব্বতন কারণ সলিল; পদ্মপত্রস্থ বা সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট হিরণ্ময়-বপুঃ পুরুষ কারণসলিলশায়ী নারায়ণ; পার্শ্বে কাছিমটি কূর্ম্মরূপী বিরাট্ পুরুষ। এই বিরাট্ পুরুষ স্বদেহ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠিত পুরুষ-যজ্ঞ। চিতির মধ্যে উত্তর বেদিতে যে অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ অগ্নিই প্রজাপতির তৈজস রূপ; বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনি জগতের যাবতীয় কর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন। অগ্নির চারিদিকে ইট বসাইয়া যে চিতি নির্ম্মিত হয়, তাহা প্রজাপতির স্থূল দেহ—বিশ্বজগৎরূপ স্থূল দেহ; ইটগুলি সেই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—কূর্ম্মপুরুষনিক্ষিপ্ত কারণসলিলের বিন্দু হইতে উৎপন্ন জাগতিক লোকসকল বা ভূতসকল। অরুণকেতু ঋষিগণের নামানুসারে ঐ অগ্নির

নাম আরুণকেতুক অগ্নি। ঐ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে পুরুষ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ এই অগ্নিচয়নের থিয়োরি আরও ফলাইয়াছেন। ঐ অগ্নি বৈশ্বানর অগ্নি—জগতের যাবতীয় কর্ম্মের বা যাবতীয় ঘটনার প্রেরক। ঐ চিতি প্রজাপতির স্থূল দেহ—উহা প্রজাপতির দেহ বটে; শতপথ বলেন, উহা যজমানের দেহও বটে—কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। উহা আবার সংবৎসরের দেহ, অতএব কালস্বরূপ; প্রজাপতিই সংবৎসর, সংবৎসরই কাল। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান সংবৎসর ধরিয়া চলে। প্রজাপতির সৃষ্টিকর্ম্ম কাল ব্যাপিয়া চলিতেছে; উহার আদি নাই, অন্ত নাই। চিতিটিকে শ্যেনপাখীর আকার দেওয়া হইত। এই শ্যেনপাখী ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে সমর্থ; আপনাদের মনে থাকিবে, এই শ্যেনপাখী একদা কোন্ ঊর্দ্ধলোক হইতে সোমরূপী অমৃত আনয়ন করিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছেন, চিতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই যে অগ্নি, ইনি জগৎ-কর্ম্মের প্রেরক বৈশ্বানর অগ্নি; ইনিই প্রজাপতির স্বরূপ। শতপথ বলেন, ইনি আবার যজমানেরও স্বরূপ; কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। ইহাতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতির আত্মাহুতি; তাহা জীবযজ্ঞে যজমানেরও আত্মাহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই আত্মাহুতিকে আমরা মৃত্যু বলি; এই আহুতির বিরাম বা অন্ত নাই; মৃত্যুরও বিরাম বা অন্ত নাই। প্রজাপতি আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন; যজমানও আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন। প্রজাপতি মৃত্যুস্বরূপ; যজমানও মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুর অন্ত নাই, কেন না এই মৃত্যু দ্বারাই অমরতা পাওয়া যায়। প্রজাপতি মৃত্যুঞ্জয়—যজমানও মৃত্যুঞ্জয়ী। খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রসঙ্গ আবার মনে করিবেন।

বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞের স্থান আমি আপনাদিগকে দেখাইতে চাহি। ইষ্টি যাগাদি যজ্ঞ বটে; ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রাচীনতর কালের অনুষ্ঠান; আরও প্রাচীন কালের survival. ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল অনুষ্ঠান সমাজে চলিত হইয়াছিল—যাজ্ঞিকেরা উহাতে নূতন তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগকে সেই নূতন তাৎপর্য্যই মানিতে হইবে; এবং এই তাৎপর্য্য অনুসারে যজ্ঞকে খুব ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। ইহা টাইলার সাহেবও মানিয়াছেন। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম—খৃষ্টমত প্রচারের সময়েও কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম। খ্রীষ্ট-যজ্ঞের সহিত

পুরুষ-যজ্ঞের সাদৃশ্য তুলনা করিবেন। ওয়েবারের মত বিদেশী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশী খ্রীষ্টান এই সাদৃশ্য কতকটা দেখিয়া চমকাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ব্যাপকতা দেখিতে পান নাই। খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্ঞের পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন—সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণে ইতর জীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে। খ্রীষ্টান এই একত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র; তাহার অধিক কিছু নহে। বেদপন্থীর মতে পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, যিনি বড় তিনি ছোট হইয়াছেন, যিনি অমৃত তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না, যে সে নিজে সেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর—তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই; অতএব সে চিরমুক্ত; অথচ তাহাকে বদ্ধ সাজিয়া সংসার-যাত্রা চালাইতে হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্যু স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন ব্যাপিয়া পশুর মত যূপবদ্ধ থাকিয়া পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্, যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্, অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্ বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনম্,—মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চরম পরমায়ু একশ ষোল বৎসর ধরিলে প্রথম চব্বিশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মধ্যের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে করা যাইতে পারে। আবার বলা হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান ভোজন করে, তাহাই এ যজ্ঞে দীক্ষা; বাল্যে যে খেলাধূলা করে, তাহাই উপসদ্; যৌবনে যে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ; আর বার্দ্ধক্যে যে তপস্যাদি করে, তাহাই দক্ষিণা; পরিশেষে মৃত্যুই তাহার অবভৃথ স্নান। ছান্দোগ্য বলেন, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে মানবজীবন সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—"অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংহিতমসি"—অহে সূক্ষ্ম প্রাণধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তর কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এই দেবকী-

নন্দন কৃষ্ণটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্লবিত করিয়া গীতাশাস্ত্ররূপে তাঁহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একালের অনেক পণ্ডিতে বলেন, যজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই আধুনিক কালে উপনিষদের এবং গীতাশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এ সব বাজে কথায় আপনারা কাণ দিবেন না। ঋক্‌মন্ত্রের প্রচার কালেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য কতটা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমি উপস্থিত করিয়াছি—সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা সমর্থন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন মর্ম্মগত বিরোধ নাই; আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।

এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতামধ্যেই বলিয়াছেন—"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতেই তোমাদের কামনার পূরণ হইবে। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"—যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষ রূপে সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্"—যজ্ঞের যাহা হবিঃশেষ, তাহাই অমৃত; সেই অমৃত ভোজনে সনাতন ব্রহ্ম লাভ হয়। অধিক কি বলিব, "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞ? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্ম্মার পুরুষ যজ্ঞ, অন্য পক্ষে ইহা ইতর মানবের জীবন যজ্ঞ; একটা অন্যটারই প্রকারভেদ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ঘোর আঙ্গিরসেরও এই উপদেশ—তাঁহার ক্ষত্রিয় শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও এই উপদেশ। উপনিষদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরম তৃপ্তি পান, তাঁহারা এখানে অবধান করিবেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন, যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্—যে কর্ম্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তপস্যা, তোমার পূজা, তোমার পানভোজন পর্য্যন্ত তুমি যজ্ঞরূপে আমার উদ্দেশে অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তন্ত্রশাস্ত্রও এই বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"; মনে রাখিবেন যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান।

যজ্ঞ নানাবিধ—"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ"—কাহারও নিকট দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ, কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনই কাহারও নিকট যজ্ঞ। কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপরসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন; আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ। কে কাহার উদ্দেশে কোন্ দ্রব্য আহুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলিতেছেন—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"—এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম; ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিক্ সাজিয়া আহুতি দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে।

জীবনের কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ; ত্যাগের পর যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহারই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই হবিঃশেষ ভোজন, অতএব অমৃতভোজন; "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উঁচু হইয়া পড়ে—নীচের পরদা হইতে উঠিয়া অত্যন্ত উঁচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই—বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই—এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরিয়া আছি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন। মনুষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটা ঋণে বদ্ধ হইয়া জন্মে, ইহা মানবজন্ম সম্বন্ধে অতি প্রাচীন থিয়োরি। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে।" উত্তরকালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্য-বিধাতা; পিতৃগণ তাহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করি-তেছে; পশু পাখী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার জীবন রক্ষার সাহায্য করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণ আছে। এই

পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া জীবনযাত্রাটা দুষ্কর। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণশোধের চেষ্টা করিতে হইবে। এক একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তদ্ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপাখীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং যজুঃ সাম বা, তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্ততঃ একটি ঋক্ একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই, কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞকয়টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, "পঞ্চ বা এতে

মহাযজ্ঞা সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে”—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি দেব-যজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট culture এর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, “সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভূ তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাঁহারা ঋষি হইলেন। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋক্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্ম্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সাম মন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।” এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় খোদাই করিয়া রাখা উচিত।

মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন—মানুষ অন্য পশুর মত খায়, লাফায় ও ঘুমায়, এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করে। আপাততঃ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা—পরের জীবন নষ্ট করিয়া আপন জীবনের রক্ষা। প্রাণিবিদ্যা বা biology বিদ্যামতে মানবজীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ জীবনে কোন রস নাই, কোন গৌরব নাই। মানব-জীবনকে পশু জীবনের উপরে রাখিতে হইলে জীবনে সম্পূর্ণ উল্টা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম্মকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের জীবনের সহিত মিলাইয়া সমঞ্জস করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের ভাষায় যে বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বজগতে সর্ব্বকর্ম্মের

প্রেরণা করিতেছেন, সেই অগ্নি মানবের প্রাণকেও জীবনের কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন, মনে করিতে হইবে। এই বৈশ্বানর অগ্নিকেই অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে উত্তর বেদিতে আহরণ করিতে হয়—ইনিই বিরাট্ পুরুষরূপ প্রজাপতির প্রাণ, অতএব জীবেরও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন, "স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ অগ্নিরুদয়তে"—সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানরই জীবদেহে প্রাণাগ্নিরূপে উদিত হন। ইহারই প্রসাদে তুমি "অৎসি অন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্"—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় দর্শন করিতেছ। এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই যাবতীয় জীব অন্নের অন্বেষণে, ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে, ছুটিতেছে ; এবং সেই প্রাণাগ্নিতেই সেই অন্নের, সেই ভোগ্য বস্তুর, সমর্পণ করিতেছে। ইহা এক রকম নিত্য অগ্নি-হোত্রের ব্যাপার ; প্রাণিমাত্রকেই আপন দেহে এই অগ্নিহোত্র অহরহঃ সম্পাদন করিতে হইতেছে। "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রমুপাসতে"—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন স্তন্যের জন্য মাতার নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত এই অগ্নিহোত্রের সমীপে উপস্থিত হয়। বিশ্বরূপ প্রজাপতির দেহ ব্যাপিয়া এই অগ্নি সঞ্চরণ করিতেছেন ; প্রাণি-দেহের অগ্নিতে অন্নাহুতি হইলে সেই বিশ্বরূপী প্রজাপতির উদ্দেশেই আহুতি হয়। "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে, তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি, যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি"—অহে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, এবং তুমিই জীবরূপে জন্মগ্রহণ কর ; সকল প্রাণ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ; সকল প্রজা তোমার উদ্দেশে বলি আনিয়া উৎসর্গ করিতেছে। প্রাণের ভিতরে নিত্য আকাঙ্ক্ষার ও বাসনার আগুন জ্বলিতেছে, তাহার তৃপ্তি আবশ্যক—ইহা তাহার নিত্য অগ্নিহোত্র। পশুধর্ম্মী মানুষ ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কেবল একটা biological need মনে করিবেন না। তাহা সেই অগ্নিহোত্রের আহুতি—ইহার নাম প্রাণাগ্নি-হোত্র। জীবনরক্ষার জন্য শেয়াল কুকুরের মত অন্নের গ্রাস গিলিয়া গলাধঃ-করণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই ; কিন্তু ঐ পাশবিক কর্ম্মকে নিত্য সম্পাদ্য অগ্নিহোত্ররূপে দেখিলে উহাতে আর পাশবিকতার লেশ থাকে না, উহা মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত হয়। ছান্দোগ্য বলিতেছেন, "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ হোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি, প্রাণস্তৃপ্যতি"—ভক্তের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা

হোমদ্রব্য ; প্রাণায় স্বাহা বলিয়া সেই ভাতের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হইবে ; "সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি" ; এইরূপে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব আত্মায় আহুতিরূপে অর্পিত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী উপনিষৎ মন্ত্রটিকে আরও স্পষ্ট করিতে চাহেন। অন্নগ্রাস গ্রহণের মন্ত্র হইবে—"প্রাণে নিবিষ্টঃ অমৃতং জুহোমি, প্রাণায় স্বাহা"—আমি প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিতে যে আহুতি দিতেছি, ইহা অমৃতাহুতি ; এই যে অন্ন, ইহা অমৃত। প্রাণ অপানাদি পাঁচ প্রাণের উদ্দেশে ঐরূপ পাঁচটি আহুতির পর সমাপ্তিতে, বলা হইবে, "ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়"—আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করুক। অনুষ্ঠানরত গৃহস্থেরা এখনও ভোজনকালে এইরূপে পঞ্চগ্রাস লওয়ার প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। কিংবা কখনও ইষ্টিযাগ করিয়া ইড়া ভক্ষণে দরকার কি ? প্রত্যহ উদরপূরণের জন্য অন্ন ভোজনেই আমরা ইড়া ভক্ষণের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারি। অন্নের প্রত্যেক গ্রাসই ইড়া ; অন্ন ভোজনের ব্যাপারটা নিতান্ত উদরপূরণের ব্যাপার মনে না করিয়া উহাকে আমরা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্ঞে বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্পিত হবিঃশেষ ভক্ষণ মনে করিলে, বিশ্বহিতার্থে নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষ যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ রাখিবার উপায় রূপে মনে করিলে, কর্ম্মটা পাশবিকতার স্তর হইতে একবারে মানবিকতার স্তরে উঠিয়া পড়ে।

এ দৃষ্টান্ত একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। আসল কথা এই :—আমার এই যে জীবন, ইহা বৈশ্বানর অগ্নির চয়নব্যাপার মাত্র। সারা জীবন ধরিয়া ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া, আমি পুরুষ যজ্ঞের চিতি নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার ; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই ত পুরুষ যজ্ঞ, এ ত বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণ ; কেননা বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমান, আমিই ঋত্বিক্ এবং আমিই দেবতা এবং আমার সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ বা আত্মাহুতি। বেদপন্থী এই জীবনযজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন ; এত বড় করিয়াছেন যে, পশ্চিমের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদের ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা

কৌতূহলী, তাঁহারা Eggeling সাহেবের শতপথ ব্রাহ্মণের এবং Keith সাহেবের তৈত্তিরীয় সংহিতার অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গের ভূমিকা দেখিবেন। জীবনযজ্ঞ পুরুষযজ্ঞেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের ব্যাপার। প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু প্রতি অর্পণ করিতে হইবে; বেদপন্থীর প্রতি তাঁহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—দান ধ্যান হইতে আহার নিদ্রা নাচা কোঁদা সকল কর্ম্মই কেবল স্বভাব-প্রেরিত জৈব কর্ম্মরূপে না দেখিয়া সেই এক দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। তন্ত্রের ভাষায়, যাহা কিছু করিবে, তাহা জগন্মাতার পূজারূপেই করিবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম পূজারূপে অর্পণ করিলে পূজক খাট হন না, ইহাতে তিনি আপনাকে বড়ই করেন; কেন না পূজামাত্রই আত্মপূজা, পূজক নিজেই নিজের দেবতা। তন্ত্রমতে মানসপূজার স্তবটি স্মরণ করুন,—

আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ, শরীরং গৃহং,
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ,
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ, স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরঃ,
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তৎ তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।

অহে শম্ভু, আমিই তুমি, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। আমার মতিই তোমার পত্নী পার্ব্বতী। আমার প্রাণসকলই তোমার সহচর ভূতগণ; আমার শরীরই তোমার গৃহ। আমি যে বিষয়োপভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, ইহাই তোমার পূজা। আমি যখন নিদ্রা যাই, তখন তোমাতেই সমাধি লাভ করি। পৃথিবীতে পা ফেলিয়া এদিক্ ওদিক্ যে ভ্রমণ করি, ইহাতে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। আমি যে কিছু কথা কহি, তাহা তোমারই স্তব। আমি যে যে কর্ম্ম করি, সে সকল ত তোমারই আরাধনা। দেখিবেন, আঙ্গিরস ঘোর ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তন্ত্রও তাহারই অন্য ভাষায় পুনরুক্তি করিতেছেন।

আমিই তুমি, এর চেয়ে বড় কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। ফলে আমিই বিশ্বকর্ম্মা; বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণের কাদামাটি আমার হাতেই রহিয়াছে; সেই মশলা দিয়া আমার জগৎ আমার ইচ্ছামত আমি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারি। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—পৃথিবীর ধূলিকে আমি ইচ্ছামত মধুতে পরিণত করিতে পারি। এই জন্য বেদপন্থী আপনাকে খুব বড় করিয়া

দেখিতে অভ্যস্ত। জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি বড় করিয়া দেখেন ; প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাকেই খুব বৃহৎ করিয়া দেখিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁহার হাতে যে পরশ পাথর আছে, তাহার স্পর্শে মাটি সোণা হইয়া যায়। নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে তাঁহার সুখ নাই। এই জন্য লৌকিক ব্যবহারেও যে কোন অঙ্কের গায়ে দশ বারটা শূন্য বসাইতে তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। তাঁহার দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে, সর্ব্বত্র তাঁহার এই অভ্যাসের—লোকে বলিবে এই বদ-ভ্যাসের—পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে লোকে এইজন্য হাসে ; কিন্তু তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানেন, এবং জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই সেই পরিমাণে বড় করিয়া দেখেন। আপনারা Individualism বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে এই বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা—নৈসর্গিক প্রবৃত্তির মুখে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে বড় করা—যাবতীয় নিয়মের ও সংযমের আচারের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; রোমান রাষ্ট্রনীতি মতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্য জীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিম দেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে ; ফলে বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি সকল গার্হস্থ্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে, কিন্তু বেদপন্থার স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে, আমি যত বড়, অন্য কেহ তত বড় নহে—হইতে পারে না। বটেই ত, আমিই ত বিশ্বকর্ম্মা। তুলাদাঁড়ির এক পাল্লায় আমাকে রাখিলে ও অন্য পাল্লায় ব্রহ্মাণ্ডকে রাখিলে আমারই গুরুত্ব অধিক হয়। বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই—পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা—আমার অন্তরের ভিতরে এই যে আমি, সেই আমি পুত্র বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়া-ছেন, "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহার চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দস্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইহার সোয়াস্তি হইতে পারে

না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে, সকলেই আমার পর, আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই করিতেছে—বাহিরে যে জড়জগৎ ভোগের জন্য বিস্তীর্ণ আছে, তাহাকে টানিয়া ছেঁচিয়া নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত রস নিঃশেষে পান করিবার চেষ্টায় আছে। আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic processএর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার আবর্জ্জনায় ক্লেদে জগৎটা পূর্ণ হয় এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই cosmic processএর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic processকে পরাভূত করিয়া ethical processকে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম। ১৮৯৩ সালে শেলডোনিয়ান থিয়েটারে দাঁড়াইয়া হক্সলী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence." পুনশ্চ, "moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process." পুনশ্চ, the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it." চারি বৎসর পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া ঐ cosmic process সম্বন্ধে জন্ মর্লী বলিয়াছিলেন—"Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid." প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে; নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিতেছে; ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে, সে কেবলই না—না—না—না বলিতেছে। মানুষ বিরোধের দ্বারা ভোগের পথে চলিতে গেলেই সেই মানুষটা প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, না—না—না—না, ও পথে না—ও পথে না। ইনিই সেই আসল মানুষ প্রজাপতি, যিনি চরতি গর্ভে অন্তঃ। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বব্রহ্ম

আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে গিলাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে জগতে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ এবং ত্যাগের দ্বারা মিলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই—এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি individualism. কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু এই মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বন্ধন আবশ্যক—বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত মিলনের সম্বন্ধ পাতাইয়া সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে—যমনিয়মের সহস্র বন্ধনে ভিতরের নৈসর্গিক পশুটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—সংসারের যূপস্তম্ভে সেই পশুটাকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপন্থীর সহিত খ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় আশ্চর্য্য মিল আছে, আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা কিন্তু মনুষ্য জীবনকে দুইটা কুঠরিতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; একটা secular, temporal, আর একটা religious, spiritual—এবং এই দুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। সাবেক রোমানের জীবন ছিল একটা কুঠরিতে নিবদ্ধ; খ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে। খ্রীষ্টীয়সমাজ আত্মরক্ষার জন্য রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতে গিয়া এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আজি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। ভুবন বিজয়োদ্যত ইসলামের জয়ধ্বজাকে পিরিনীসের ওপারে ঠেলিয়া দিয়া চার্লস মার্টেল খ্রীষ্টীয় সমাজকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে রোমের বাবাজী পোপ যেদিন চার্লস মার্টেলের বংশধর বড় চার্লসের—শার্লমেনের—মাথায় রোমের কাইসারের মুকুট পরাইয়া রাষ্ট্রপালের সহিত ধর্ম্মপালের একটা অস্বাভাবিক সন্ধি স্থাপন করিলেন, সেই দিন এই বিরোধের বীজ বপন হয়; উভয়ের মধ্যে সন্ধি টেকে নাই; ফলে কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে হাজার বৎসর জুড়িয়া একটা মর্ম্মগত বিরোধ খ্রীষ্টপন্থীর জীবনের এক অংশকে অন্য অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপ আজ বালক বালিকার ও বৃদ্ধ বনিতার রুধিরের হ্রদে স্নান করিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভোগমত্ত রতিকামের উপর দাঁড়াইয়া ইউরোপের সভ্যতা ছিন্নমস্তাবেশে আপনার

রক্ত আপনি পান করিতেছে। ভারতবর্ষে বেদপন্থীর জীবনে এইরূপ দুইটা বিরোধী কুঠরি থাকিতে পারে না। বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা ব্যাপার, একটা যজ্ঞ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ,—কুরুক্ষেত্রের লড়াই হইতে দাঁতনকাঠির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মকে একই পর্য্যায়ে ফেলাইতে বেদপন্থী বাধ্য আছেন—ইহাতে ক্ষোভ করিলে বা উপহাস করিলে চলিবে না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির ভিতরে ধর্ম্ম আটকান আছে, বলিয়া হাসিলে চলিবে না। ফলে ইউরোপের আশ্রিত অবাধ competitionএর পরিণামই ঐরূপ ভয়ঙ্কর। আজকাল competitionএর স্থানে co-operation বসাইবার যে ধূয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কুলাইবে না; ভিতরের পশুটা দাঁত বাহির করিবেই। চাই একবারে ষোল আনা sacrifice—যাহার অর্থ যজ্ঞ বা ত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মা চরিতার্থ হইবে; এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভেই প্রকৃত individualism. ভারতবর্ষে বেদপন্থীর individualismএর স্বাতন্ত্র্য এই আত্ম সমর্পণে।

আপনারা পুরাণে ঋষিগণের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহু-সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবন-যাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভাবিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের বাধা হয় নাই। তিনি কখন ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং, যখন ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্যদান করিয়াছেন। চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন;—কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তুষ্ট হন

নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়া-রূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানায় লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশবিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য, তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; পরপীড়নের আশঙ্কায় আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পরাইয়া বিদ্যালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবী রূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সরস্বতী রূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। অগ্নিপত্নী স্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মকে আহুতি রূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রপত্নী শচীরূপে তিনি সেই যজ্ঞক্রতুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই দেবমাতা অদিতি—স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন। "অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ",—অদিতিই দক্ষ প্রজা-পতির দুহিতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন; সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণ চক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথ-ক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষ্ণুর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমবৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই ধূলি উৎপন্ন প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, পঞ্চ মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর, হবিঃশেষরূপে সেই ইড়াভোজন মাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি;—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্—
বন্দে মাতরম্।

হৃদয়-শ্মশান।

৬

[ধরানাথের কথা।]

১

বিন্দুমাধবের দগ্ধ হৃদয়ের দাহবিবরণের বিবৃতি আমার দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল। আমাকেই তাহা শেষ করিতে হইবে।

মুরলা চলিয়া গেল—কিন্তু যে কয় দিন সে দিল্লীতে ছিল, সেই কয় দিনেই আমাদিগকে স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার সহিত তাহার কাকীমার পত্র-ব্যবহার চলিত। কোনও কারণে তাহার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইতেন।

কয় মাস পরে যখন বিন্দুমাধবের জ্যেষ্ঠতাতের পত্র পাইলাম, আমার পরামর্শমত তিনি মুরলার বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন, কয়টি সম্বন্ধ উপস্থিত, তিনি সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাহেন, তখন আর সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি কলিকাতায় যাইব। এত দিন কলিকাতায় যাই নাই, যাইতে আর ইচ্ছা ছিল না—কেন না, তথা হইতে দুঃখের স্মৃতি লইয়াই আসিয়াছিলাম; কিন্তু এবার যাইব। গৃহিণী বলিলেন, তিনিও যাইবেন। কলিকাতার সঙ্গে আমার দুঃখের স্মৃতিই জড়িত বলিয়া তিনিও এত দিন বঙ্গদেশে আত্মীয় স্বজনদিগের দর্শন-সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। উভয়েই যাইব বলিয়া ছুটী লইলাম।

আমি কলিকাতায় আসিলে মুরলার বিবাহের জন্য বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আমি বাছিয়া একটী পাত্র পছন্দ করিলাম। ছেলেটির যেমন রূপ, তেমনই গুণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকরী পাইবার চেষ্টা করিতেছে। সংসারে এক মা ছাড়া আর কেহ নাই। রেলে একটা বড় চাকরী খালি ছিল। আফিসের যিনি 'বড় সাহেব', তিনি যখন বড় হইতে পারেন নাই, তখন আমি অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—আমার লোককে চাকরীটি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাজেই সেই পাত্রের সঙ্গে মুরলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতেও বেগ পাইতে হইল না।

বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের অনুরোধে আমাদের দুই জনকে মুরলার বিবাহ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে হইল।

সেই সময়ের মধ্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিন্দুমাধবের গৃহে মহিলাদিগের পরিচয় হইল। তিনি বিন্দুমাধবের মাতার সম্বন্ধে বলিলেন, "কি ঝাঁঝ! অমন ছেলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তবু ঝাঁঝ কমে নাই! আর বৌর নিন্দা, সে যেন বর্ষার নদীতে বান আসিয়াছে!"

আর বিন্দুমাধবের স্ত্রী? গৃহিণী বলিলেন, "দেখিয়া দুঃখ হয়; কি ভুলই করিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "বুঝিতে না পারিলেই ভুল হয়।"

"বুঝে নাই বা কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মত বুদ্ধির অভাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "এ বুদ্ধি পুরুষ মানুষের না থাকিলেও চলে; কেন না, তোমরা যাহা কর, তাহাই সাজে; কিন্তু আমাদের যে না থাকিলে চলে না! যাহারা লতার মত অবলম্বন না পাইলেই মাটীতে লুটায়, পদদলিত হয়, তাহাদের লতার মত নরম হইতে হয়। মান বল, অভিমান বল, যতটা সহে, ততটাই ভাল; তাহার অধিক হইলেই সর্ব্বনাশ। যেখানে মান থাকে না, সেখানে মান যে কেবল অপমান।"

"কিন্তু সে বুঝটাই যে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।"

"স্বামী থাকিতে শাশুড়ীর যে ব্যবহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল—এখন যে তাহার দশ গুণ কুব্যবহার সহ্য করিতে হইতেছে! যাহার বলে বল, তাহাকেই যদি হারাইলাম, তবে আর থাকিল কি?"

"মেয়েটিও তাহার পর হইয়াছে।"

"পর হইলেও এত দিন ত তাহাকে বুকে ধরিয়াই ছিল—এখন সে ত পরের ঘরে চলিল। এখন কেমন করিয়া, কি লইয়া বাঁচিবে!" বলিতে বলিতে বিন্দুমাধবের অভাগিনী পত্নীর দুঃখ মনে করিয়া গৃহিণীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় আসিয়াই দাদার জামাইবাড়ীতে গিয়াছিলাম। এখন আমার দ্বারা স্বার্থহানির আর কোনও সম্ভাবনাই নাই, কাজেই বৌদিদি মুখে অত্যন্ত আত্মীয়তা করিলেন। এমন কথাও বলিলেন, "তুমি আসিয়া বাসা করিয়া আছ, সে কি ভাল দেখায়? কি করিব বল, বাড়ী ছোট—মানুষ কচিকাচা

লইয়াই জায়গা হয় না, নহিলে আমি ছোট বৌকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতাম। না হয় গরীবের বাড়ী গরীবের ভাতই খাইতে।"

দাদার মেয়ে মানু—মার মত কথার ঝুড়ী বাহির করিল না বটে; কিন্তু তাহার আন্তরিক যত্নে আমি আকৃষ্ট হইলাম। তাহার ছেলে মেয়েদের দেখিয়া দাদার কথা মনে পড়িল, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ইহাদিগকে লইয়া কত আনন্দে থাকিতেন। আর তাহা হইলে আমার পক্ষেই কি কলিকাতা প্রবাস হইত? আমি কি বাঙ্গালার সঙ্গে এমন ভাবে সকল-সম্পর্ক-শূন্য হইতে পারিতাম?

আর মা—তিনি আমার জন্য উদ্বেগ, আশঙ্কা ও কষ্ট ভোগ করিয়াই গিয়াছেন। আমার সাফল্যের আনন্দ লাভ করিতে না করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তাই আমার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়াছে। কাহার আকর্ষণে আর আকৃষ্ট হইব?

২

আবার চাকরীতে যাইয়া বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের পত্রে মুরলার যে সংবাদ পাইতাম, তাহাতে বুঝিতাম, আমার কথাই ফলিয়াছে। নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়া, প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে মুরলার হৃদয় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার সে বিষন্ন ভাব দূর হইয়াছে—শরীরে যেমন, মনেও তেমনই নূতন সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বিকশিত হইয়াছে; জানিয়া সুখী হইলাম।

আমরা স্বামী স্ত্রী প্রায়ই মুরলার কথার আলোচনা করিতাম। এক দিন আমি বলিলাম, "বিন্দুমাধব যদি আর একবার ফিরিয়া আসিত, তবে হয় ত তাহাকে আবার সংসারের বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিতাম। কি দুঃখেই বেচারা জীবন কাটাইল!"

গৃহিণী বলিলেন, "আর তাহার স্ত্রী—তাহার দুঃখ যে আরও অধিক!"

"অধিক?"

"হাঁ। বিন্দুমাধবের ভুল এখনও ভাঙ্গে নাই, কিন্তু তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। তাহার দুঃখ অভিমানের বেদনা নহে, আত্মগ্লানির দহন।"

"তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে?"

"ভাঙ্গে নাই?—স্বামীকে হারাইয়াই যখন সে বুঝিয়াছিল, জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়াছিল, স্বামীর প্রতি তাহার সন্দেহ অকারণ, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বামীর ভালবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিল। তাহার পর যদি মনের কোণে কোথাও ভুলের একটু অবশেষ

থাকিয়া থাকে, তোমার কাছে বিন্দুমাধবের বিবৃত বিবরণ শুনিয়া তাহাও গিয়াছে। এখন আছে বুকপোরা বেদনার জ্বালা—আত্মগ্লানির মুর্ম্মুরদাহ।"

এমন আলোচনা আমরা প্রায়ই করিতাম। আমার স্ত্রী মুরলার পত্র পাইলে, আমি বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের জামাতার পত্র পাইলে, এমন আলোচনার কারণ ঘটিত। এইরূপে দুই বৎসর কাটিল। ইহার মধ্যে বিন্দুমাধবের জামাতা কার্য্যব্যপদেশে তিন চারিবার দিল্লীতে আসিয়াছিল, এবং আমার কাছেই থাকিয়া গিয়াছে। সেও আমাদের কত আপনার। স্নেহ কি সম্বন্ধ দেখিয়া আত্মপ্রকাশ করে? সে যে সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে পারে। বিশেষ 'পর' যত আপনার হয়, আপনার জন অনেক সময় তত আপনার হয় না। কারণ, পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা অনাবিল স্নেহের, তাহাতে স্বার্থহানির শঙ্কা নাই, ঈর্ষ্যার বিকৃতি নাই।

৩

তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার শয়নকক্ষে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাসপাতালে যাইলাম। রোগী আসিয়াছে; যাহারা আনিয়াছে, তাহারা জিদ করিয়া বলিয়াছে, ডাক্তার সাহেবকে তখনই সংবাদ দিতে হইবে, রোগী তাঁহার বন্ধু। আমার বন্ধু! ব্যস্ত হইয়া যাইয়া দেখিলাম, বিন্দুমাধব। এত দিন যাহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম, আজ তাহাকে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলাম—তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া।

ক্ষীণকণ্ঠে বিন্দুমাধব আমাকে বলিল, "তুমি আমাকে নূতন জীবনের সন্ধান দিয়াছিলে, তাই মরিবার পূর্ব্বে একবার তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলাম।"

বিন্দুমাধবকে শয্যায় তুলিয়া পরীক্ষা করিলাম—ডবল নিউমোনিয়া, ফুসফুসের প্রদাহ যেরূপ, তাহাতে বাঁচিবার আর আশা নাই। চিকিৎসায় ফললাভের আশা অল্প, কিন্তু শুশ্রূষা হইতে সে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য খাট ধরিয়া তাহাকে আমার গৃহে আনিলাম। সংবাদ পাইবামাত্র গৃহিণী আসিয়া সেই শয্যার পার্শ্বে বসিলেন—আমাকে বলিলেন, "মুরলাকে আর তাহার মাকে খবর দাও, টেলিগ্রাফ কর।" তাহাই করিলাম।

যাহারা বিন্দুমাধবকে আনিয়াছিল, তাহারা তাহার শিষ্য। বিন্দুমাধব সন্ন্যাসীও নহে, গুরুও নহে, তবু তাহার শিষ্য জুটিয়াছিল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, সে তেমনই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আমি

সব সংবাদ জানিতে পারিলাম, এই দুই বৎসর সে নানা তীর্থে অনাথ আতুর প্রভৃতির সেবার ও চিকিৎসার জন্য অনুষ্ঠান করিয়াছে; সেই কাজেই সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহাতে সে শান্তিও পাইয়াছিল, নহিলে আমার কাছে তাহার কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন?

এবার সে অমরনাথে গিয়াছিল; ফিরিবার পথে পীড়িত হইয়া পড়ে। মরিবার পূর্ব্বে সে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাই তাহার গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিয়াছে।

পর দিন প্রভাতে রোগীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, জীবনের মেয়াদ দিনে গণিতে হইবে, আর সময় নাই। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তিনি বলিলেন, "যদি জীবনের আশা না-ই থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না, সব কথা বল। মরিবার পূর্ব্বে বিন্দুমাধব আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে ক্ষমা করিবার সুযোগ লাভ করুন; আর সে—" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আপনাকে সামলাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "আর সে, সে যদি জানিতে পায়, স্বামী মরিবার পূর্ব্বে তাহার অপরাধের স্বরূপ বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, তবে সে দগ্ধ হৃদয়ে তবুও একটু শান্তিলাভ করিতে পারিবে। আর বিলম্ব করিও না।"

আমি যাইয়া বিন্দুমাধবের কাছে বসিলাম। তখন তাহার কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে সব কথা বলিলাম। তাহার স্ত্রীর ভুল, সেই ভুলের জন্য তাহার মনস্তাপ, সব কথা যখন আমি বলিতে লাগিলাম, তখন তাহার মুখে বা দৃষ্টিতে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। বোধ হয়, সে আপনার আশা ও নিরাশা সব জয় করিয়া উচ্চ লক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছিল।

শেষে আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার পর তুমি বোধ হয় তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করিবে?" তখন সে ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "আমি.ত অনেক দিনই ক্ষমার গঙ্গোদকে অভিমানের ও অপরাধের মলিনতা ধৌত করিয়া দিয়াছি। আমিও যে অপরাধী।"

তাহার পর যখন আমি মুরলার কথা বলিতে লাগিলাম, তখন কিন্তু বিন্দুমাধবের সে নির্ব্বিকার ভাব আর রহিল না—শান্ত সরোবরে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। মুরলার বেদনা, তাহার বিমর্ষ ভাব সব বিবৃত করিয়া আমি যখন বলিলাম, দাম্পত্য জীবনের সুখে সে সুখী হইয়াছে, তখন বিন্দুমাধব যেন নিশ্চিন্ত হইল; একটা দীর্ঘশ্বাসে তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্যের অবসান হইয়া গেল।

তখন আমি বলিলাম, "তাহাদের আসিতে টেলিগ্রাফ করিব?"

বিন্দুমাধব অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "আর কেন?"

কিন্তু আমি যখন বলিলাম, "আমার স্ত্রীর পরামর্শে আমি টেলিগ্রাফ করিয়াছি", তখন সে আর কোনও কথা বলিল না—একবার শুশ্রূষানিরতা আমার পত্নীর দিকে চাহিল, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৪

পর দিন জীবনের মেয়াদ দিন হইতে ঘণ্টায় নামিল; বিন্দুমাধবের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। আমি উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলাম, বিন্দুমাধবকে বাঁচাইতে পারিলাম না; যাহাদিগকে আসিতে বলিয়াছি, বিন্দুমাধবের সঙ্গে কি জীবনের শেষ সময় তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না? এই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিবার পূর্ব্বে কি তাহারা আসিতে পারিবে না? আমার উদ্বেগ বোধ হয়, আমার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল; তাহা দেখিয়া বিন্দুমাধব ম্লান হাসি হাসিল, সে হাসি যেন জগতের সব বন্ধনকে, মানুষের সব দৌর্ব্বল্যকে উপহাস।

দিন কাটিল—সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইল। মধ্যরাত্রিতে ট্রেণ পঁহুছিবার কথা। আমি কেবল ঘড়ী দেখিতে লাগিলাম, আর বিন্দুমাধবের অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

বিন্দুমাধবের স্ত্রীকে লইয়া তাহার জ্যেঠামহাশয় আসিলেন। কিন্তু মুরলা? আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ডাকগাড়ী পরে কলিকাতা ছাড়িয়া আগে দিল্লীতে পঁহুছে; বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয় সেই ট্রেণে আসিয়াছেন। কিন্তু মুরলার সে বিলম্ব সহে নাই—যে ট্রেণ আগে ছাড়ে, সে সেই ট্রেণে রওনা হইয়াছে; টেলিগ্রাম পাইয়া মার জন্যও অপেক্ষা না করিয়া রওনা হইয়াছে। বিন্দুমাধবের জ্যেঠামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাকে দেখিতে তাহার বাড়ী গিয়াছিল—তখন টেলিগ্রাম পাইয়া সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে ট্রেণ যে পর দিন সকাল না হইলে দিল্লীতে পঁহুছিবে না, কাকাকে তাহা দেখিতেও দেয় নাই। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম, আরও সাত ঘণ্টা!

তখন বিন্দুমাধবের দেহ হইতে জীবনীশক্তি দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে—ঔষধ দিয়া কি তাহার গতি শ্লথ করা যায়? তবুও আমি চেষ্টা করিলাম। আর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম,—জ্ঞান লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ করাইব।

যখন রাত্রি শেষ হইল, তখন আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বিন্দুমাধবকে বলিলাম, "তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন।" বিন্দু-মাধব ইঙ্গিতে জানাইল—"আর কেন?" আমার স্ত্রী তাহার মুখে উত্তেজক ঔষধ দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমার ভিক্ষা—বারণ করিবেন না।" বিন্দুমাধব আর আপত্তি করিল না—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া জানাইল—তিনি যদি বলেন—তবে তাহাই হউক।

আমার স্ত্রী উঠিয়া যাইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিলেন; আমি রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিলাম—কি জানি, মানসিক চাঞ্চল্যের বেগে কি হয়।

বিন্দুমাধবের স্ত্রী আসিয়া তাহার পদতলে বসিলেন—আজ কত দিনের কত ব্যথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—আজ স্বামীকে লাভ করা, সে ত কেবল হারাইবার জন্য। বুকভাঙ্গা ব্যথার অশ্রু বিন্দুমাধবের চরণে পতিত হইতে লাগিল।

বিন্দুমাধব চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে এক দিন আমাকে বলিয়াছিল, সে কখনও ভগবানে বিশ্বাস করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সেই মতই অবিচলিত ছিল কি না, জানি না; কিন্তু মনে হইল সে যেন জপ করিতেছে।

সেই সময় কম্পিত—কাতর কণ্ঠে "বাবা!" বলিয়া ডাকিয়া ঝড়ের মত বেগে মুরলা কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম—বিন্দুমাধবও চাহিয়া দেখিল। আমি বলিলাম—"মুরলা।"

মুরলা মরণাহত পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই বার রোগীর ক্ষীণগতি নাড়ীতে চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিলাম। বিন্দুমাধব একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিল—মা! কথা ফুটিল না। সে নিস্তেজ দেহের সমগ্র শক্তি সঞ্চিত করিয়া একখানি হাত তুলিয়া মুরলার মস্তকে দিল। তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বেদনার উৎস হইতে সেই দুই বিন্দু স্নেহাশ্রুতে তাহার হৃদয়-শ্মশানের দাহজ্বালা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে?

* * * *

তাহার পর সব শেষ হইল। যে নিগমবুধি শ্মশানে দাঁড়াইয়া এক দিন সে মৃত্যুকেই মুক্তি মনে করিয়াছিল, সেই শ্মশানে তাহার শবদাহ করিয়া যখন চিতায় জল দিলাম, তখন মনে হইল—

"কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল;
ধরাদগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভগ্ন হৃদয়ের হাহা।

লহ, লহ, বন্ধো, মরণ সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

শ্মশান হইতে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন মুরলা তাহার কাকীমার ক্রোড়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে—বিন্দুমাধবের পত্নী পাষাণপ্রতিমার মত বসিয়া আছে, সে যেন বাহ্যজ্ঞানহতা—তাহার নয়নে অশ্রু নাই—মুখে কোনও ভাবের বিকাশ নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি শঙ্কা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সমাপ্ত।

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার।

নবান্ন প্রথা।

প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে নবান্ন উৎসব প্রচলন ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (২য় খণ্ড, ৩য় প্রঃ পাঃ ৫ম ব্রাহ্মণ) ইহা আগ্রয়ণ নামে পরিচিত। নবান্ন উৎসব বৎসরে তিন বার সম্পন্ন হইত। প্রাচীন ইব্রীয়গণ নবান্ন উৎসব না করা পর্য্যন্ত নূতন শস্যের অন্ন ভোজন (Exodus 22—29, 23—19, Leui 23—10, 11) করিত না। এই নবান্ন উৎসব তাহাদিগকেও বৎসরে তিন বার (Exodus 23—16, 17) করিতে হইত।

নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা।

আর্য্যদের ন্যায় ইব্রীয় জাতিও শাস্ত্রানুসারে যাজক দ্বারা আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা ও নূতন গৃহে প্রবেশ (Deut 20—5) করিত।

অক্ষক্রীড়া বা পাশা খেলা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। Proverbs 16—33 পদে ইহার উল্লেখ আছে। হিব্রু ভাষায় পাশা "পুর" নামে পরিচিত। প্রাচীন আর্য্যগণ যে অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, ইহা ঋগ্বেদের ১।৪১।৯ ঋক ও ১০।৩৪ সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। ১০।৩৪ সূক্তে অক্ষক্রীড়ার অপকারিতা বর্ণিত আছে।

পাদুকা ব্যবহার।

আর্য্য জাতির ন্যায় ইব্রীয় জাতির মধ্যেও ধর্ম্মমন্দিরে কি পবিত্র স্থানে এবং পিতা মাতার মৃত্যুতে পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ (Exodus 3—5 Joshua 5—15, Ezekiel 24—17) ছিল।

সংস্কৃতের উপানৎ বা উপানহ, যথা উপ—উপরি+নহ্—বন্ধন করা সহ হিব্রু ভাষার পাদুকাবাচক "নাল" শব্দের সাদৃশ্য আছে।

অধিকার সমর্পণ।

প্রাচীন কালে কোনও ইব্রীয় পুরুষ আপন স্বত্বাধিকার বিক্রয় ব্যতীত অপর ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলে সেই সমর্পণের সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্বরূপ তাহাকে আপন পাদুকা স্বত্বাধিকার গ্রহীতাকে অর্পণ করিতে হইত। ইহা মহাত্মা মুসার বিধি। Deut 25—9, 10 পদ পাঠে ইহা জানা যায়, রাজর্ষি দায়ুদের প্রপিতামহ বোয়সের অধিকার ক্রয় বৃত্তান্ত (Ruth 4th chapter) হইতে ইহা ভালরূপে অবগত হওয়া যায়। রামচন্দ্র আপন রাজ্যাধিকার ভরতকে সমর্পণ বা ত্যাগ কালে তৎসম্পর্কে যে আপন পাদুকা ভরতকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কি উদ্দেশ্যে তাহা বিচারসাপেক্ষ। ক্ষত্রিয়ের তরবারই সম্বল। তাহাই অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। বিশেষতঃ স্বর্ণ পাদুকা বনবাস কালে ব্যবহার অসম্ভব। অবশ্যই ইহা ভরত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ভরতকে পাদুকা সমর্পণ সম্পর্কে (অযোধ্যাকাণ্ড ১১৩।১৪—২০) "সন্ন্যাস" শব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যেও যে অধিকার ত্যাগের সাক্ষ্য স্বরূপ আপন পাদুকা গ্রহীতাকে অর্পণ করিতে হইত, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে রথ ও বিষাক্ত তীর ব্যবহার।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ যুদ্ধে বিষাক্ত তীর ব্যবহার (৬।৭৫।১৫ ঋক) করিত। ইব্রীয় জাতিও বিষাক্ত তীরের ব্যবহার (Genesis 27—3, 48—12, Job 6—4) জানিত। বৈদিক কালে যুদ্ধে রথের ব্যবহার (৬।৬৭।২৬—৩১ ঋক) ছিল। ইব্রীয় ও সিরিয়াবাসিগণের যুদ্ধ রথের বৃত্তান্ত Joshua 8—2,8, Judges 4—3, 1 Samuel 13—5, 1 Chronicles 18—4 পদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

দাসত্ব-প্রথা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল। দাস দাসীগণ ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় হইতে সংগ্রহ হইত। দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা পর্য্যন্ত প্রচলন ছিল। বাইবেলে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগে আর্য্যগণও দাস দাসী রাখিতেন। আর্য্য সমাজে দাস দাসী বিক্রয় (১।৯২।৭—৮ ঋক ও ৮।৫৬।৩ ঋক) পর্য্যন্ত হইত। ইহারা যে অনার্য্য ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বৈদিক যুগেই এই দাসগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম পদ্ধতিতে আর্য্য সমাজে গৃহীত (৮।৫১।৯, ১০।৮৬।১৯ ও ১০।২০।১২ ঋক) হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ইব্রীয় দাসগণও ইব্রীয় সমাজে স্থান প্রাপ্ত

(Joshua 9—27) হইয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরের জল ও কাঠ বহনরূপ পরিচর্য্যা কার্য্যে ইহারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেরূপ আর্য্য মাত্রই শ্বেতবর্ণ নহেন, তদ্রূপ অনার্য্য মাত্রই কৃষ্ণবর্ণ নহে। যে প্রকার আর্য্য সমাজের পরিচর্য্যাকারী কোনও কোনও শূদ্রের উপাধি 'দত্ত', তদ্রূপ ইব্রীয় সমাজের পরিচর্য্যাকারী ভিন্ন জাতীয় দাসদের উপাধি 'নদীনীয়' (Ezra 8—20)। 'দত্ত' ও 'নদীনীয়' উভয় শব্দ একার্থজ্ঞাপক। হিব্রু ও আরবীতে 'নদীনীয়' শব্দের পূর্ব্বের 'ন' অক্ষর ব্যাকরণের কায়দা হেতু প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীন তামিল জাতির মধ্যে বা দক্ষিণ ভারতে দাসত্ব-প্রথা অজ্ঞাত (Early Histories of India by V. Smith 441) ছিল। অথচ উত্তর ভারতের প্রাচীন তক্ষশিলায় প্রকাশ্য, বাজারে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় (Early History of India by V. Smith 154) হইত।

দেবর দ্বারা বংশ রক্ষা।

প্রাচীন ইব্রীয় সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভাবে কনিষ্ঠ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশ রক্ষা (Genesis 3:—7, 8 Deut 25/5—10) হইত। বৈদিক যুগেও আর্য্য সমাজে এই প্রথাটী বিদ্যমান (১০।৪২।২ ঋক) ছিল।

দত্তক পুত্র।

প্রাচীন আসিরীয়াস ও ইব্রীয় সমাজে অপুত্রক লোকে 'দত্তক' পুত্র গ্রহণ (Genesis 15/2—3) করিত। বৈদিক কাল হইতে আর্য্য সমাজে দত্তক পুত্র গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তরাধিকার।

বৈদিক কালে আর্য্য সমাজে পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাগণ পৈত্রিক সম্পত্তির কিছুই (২।৩১।১ ঋক) পাইত না। প্রাচীন ইব্রীয় সমাজেও পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাগণ কিছুরই অধিকারিণী (Genesis 21—10, 31—14, Numbers 27/1—11) হইত না।

পশু পালন ও গো-দোহন।

বৈদিক যুগে বিশেষ কোনও বাঁধা বাঁধি নিয়ম না থাকিলেও প্রায়ই আর্য্য কন্যাগণ পশু-পালন ও গো-দোহন কার্য্য (৯।৯৭।৪৭ ঋক) সম্পন্ন করিত। ইব্রীয় সমাজেও কন্যাগণের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। ইহার উল্লেখ Genesis 29/9—10, Exodus 2/16—17 ও কোরাণ সুরা কসস্ ২৩ আয়েতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বস্ত্র বয়ন।

প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় কন্যাগণ যে প্রকার গো-দোহনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিত, সেই প্রকার তৎকালে বস্ত্র-বয়ন কার্য্যও তাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রাচীন আর্য্য নারীর বস্ত্র বয়ন কার্য্যের

উল্লেখ ঋগ্বেদের ২.৩৮, ২।৩৮।৪, ৫।৪৭।৬ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইব্রীয় ও অরামীয় কন্যাগণের বস্ত্র-বয়নের বর্ণনা Judges 16—14, Exodus 35—25, 2 Kings 23—7, Proverbs 31—13, 21, 25 পদে দৃষ্ট হয়।

যব-ভর্জ্জন।

আর্য্য কন্যাগণ প্রস্তরখণ্ডের উপর যব-ভর্জ্জন (১।১১২।৩ ঋক) করিত। ইব্রীয় কন্যাগণও ঐ প্রকার প্রস্তরখণ্ডের উপর যব-ভর্জ্জন কার্য্য সম্পন্ন (1 Samuel 8—13, Leui 2—5 ও 1 Chron 23—29) করিত।

জল বহন।

বৈদিক কালে আর্য্য নারীগণ জল আনয়ন জন্য কলস লইয়া কূপ সন্নিকটে যাইতেন। ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ ১।৫৫।৮, ১।১৯১।১৪ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ইব্রীয় নারীগণ সাংসারিক প্রয়োজনের জল বহন জন্য কূপ সন্নিধানে দলে দলে সমাগত হইতেন, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা, আলাপ প্রসঙ্গ, হাস্য পরিহাস হইতে থাকিত। এই প্রকার চিত্রের বর্ণনা রেবেকা (Genesis 24/11—30) ও মিদিয়ন কন্যার (Exodus 2/16—19) জল বহনের প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি। জল বহন জন্য কূপ সন্নিধানে সমাগত সমরীয়া নারীর নিকট হইতে খ্রীষ্টের জল পান (John 4/7—15) বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন।

জলদান।

আর্য্য জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে জলদান মহা পুণ্যজনক কার্য্য। ইব্রায় জাতিও জলদান মহা পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস রাখিতেন। Psalms 143—6, Proverbs 25—25, Matthew 10—42 পদ পাঠে ইহা অবগত হইতে পারি।

কূপোদক পান।

আরবীয় ও ইব্রীয় জাতি নদ নদী অভাবে কূপোদকই পান করিত। বৈদিক আর্য্যগণও যে কূপোদক পান করিত,তাহার আভাষ ১।৩০।১, ১।৫৫।৮, ১।১৯১।১৪ ঋক পাঠে পাওয়া যায়। • •

চর্ম্মাধার।

প্রাচীন ইব্রীয়গণ চর্ম্মাধারে দধি, সুরা, মধু, তৈল ইত্যাদি রাখিত। Leui 11—32, Job 41—20, Isaiah 22—24 পদ পাঠে ইহা অবগত হইতে পারি। বৈদিক কালে আর্য্যগণও নানা প্রয়োজনে চর্ম্মাধার ব্যবহার করিত। ঋগ্বেদের ১।২৮।৯, ৪।৪৫।৩ ঋকে 'সোম', ১।১৯১।১০ ঋকে 'সুরা', ৬।৪৮।১৮ ঋকে 'দধি', ৮।৫।১ ঋকে 'মধু', ৯।৬৮।২৯ ঋকে 'সোম রস' রাখার জন্য চর্ম্মাধার ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে। এই চর্ম্মাধার ঋগ্বেদে 'দৃতি' ও হিব্রু বাইবেলে 'চুদ' নামে পরিচিত।

প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে প্রমাণাভাবে কোনও লোক দোষী কি নির্দ্দোষ, অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা তাহার নির্দ্ধারণ হইত। সীতার অগ্নি পরীক্ষাই তাহার সাক্ষ্য। প্রাচীন ইব্রীয় সমাজেও এই প্রথাটীর প্রচলন (Leui 18—21, 2 Kings 23—10) ছিল।

অগ্নি পরীক্ষা।

আর্য্যগণ প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি দেবতা কি পীঠস্থানের উদ্দেশ্যে শ্মশ্রু ও মস্তকে কেশ রাখিয়া আসিতেছেন। ইব্রীয় সমাজেও যে প্রথাটী প্রচলিত ছিল, তাহা সমুয়েলের কেশ রাখার বৃত্তান্ত (1 Samuel 1—11) হইতে অবগত হইতে পারি।

ধর্ম্মার্থে কেশ রাখা।

বশিষ্টদেব 'কপর্দ্দ' (৭।৩৩।১ ঋক) ও তৃৎসুগণের (৭।৮৩।৮ ঋক) 'জটা'র কথা হইতে বৈদিক যুগে যে ঐ প্রকারেও কেশবিন্যাস প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যেও এই প্রকারের কেশবিন্যাস প্রচলন (Jacua 9—10) ছিল। মুসার সময় হইতে ইব্রীয় সমাজে এই প্রকারে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় কেশবিন্যাস নিষিদ্ধ (Leui 19—27) হয়।

কপর্দ্দ বা জটা।

আরবীয়, আসিরীয়, ইব্রীয় জাতি শ্মশ্রু রাখিত। বাবেল ও নিনেভী প্রভৃতি প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত নগর খনন করিয়া যে সমস্ত দেব-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শ্মশ্রুযুক্ত (Babylon & Ninevah 23—26) দৃষ্ট হয়। বৈদিক ঋষিগণও যে শ্মশ্রু রাখিতেন, তাহা ইন্দ্রের (২।১১।১৭ ঋক ও ১০।২৩।১ ঋক) ও পূষার (১০।২৬।৭ ঋক) শ্মশ্রু কল্পনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

শ্মশ্রু রাখা।

চার্ব্বাক-যুগ-আগমনের বহু পূর্ব্বে সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ঋণ পরিশোধ না করা মহা পাপ ছিল। ঋণ শোধ জন্য বৈদিক ঋষিগণ দেবগণের নিকট প্রার্থনা (২।২৩।১৭, ২।২৭।৪, ২।২৮।৯ ঋক) করিতেন। প্রাচীন পারসীক সমাজেও এই ভাবটী বিদ্যমান (Vendidad 3—147) ছিল। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি ঋণদায় মহাদায় (Leui 25/39—41, 2 Kings 4—7) বলিয়া জানিতেন।

ঋণদান ও ঋণশোধ।

আর্য্যগণ যে প্রকার অমাবস্যা ইত্যাদি তিথি বিশেষে যাত্রা কি কর্ম্মাদি বন্ধ রাখেন, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয়গণও অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে কর্ম্মাদি বন্ধ (Amos 8—5) রাখিতেন।

তিথিবিশেষে কর্ম্মাদি বন্ধ।

ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষাদান কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল।

শিক্ষাদান। তাঁহারা বিনা বেতনে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। ইহুদীয় যাজকগণও প্রাচীন কালে বিনা বেতনে শিক্ষাদান (Micha 3—11) কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সমাধি ও দাহ। বৈদিক যুগে আর্য্য জাতির মধ্যে দাহ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে সমাধি প্রথারও প্রচলন (১০।১৫।১৪, ১০।১৮।১০—১২ ঋক) ছিল। পক্ষী দ্বারা শব ভক্ষণ প্রথার আভাষও ঋগ্বেদের ১০।১৬।৬ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইহুদীয় সমাজে সমাধি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে দাহ প্রথারও (Amos 6—10) প্রচলন ছিল। শৌলের দেহ দাহ (1 Samuel 31—32) হইয়াছিল। প্রাচীন এলম দেশীয় লোকের মধ্যে সমাধি প্রথার প্রচলন (Ezekiel 32—24) ছিল। প্রাচীন পারস্য সম্রাট Cyrus ও Dariusএর শরীর কবর দেওয়া (Ninevah and its Remains 2—220) হইয়াছিল।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

বৈরাগী।

১

স্বরূপ বৈরাগীর মেয়ে পরাণী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যখন স্বামীর পরিত্যক্ত মণিহারীর বাজরা মাথায় তুলিয়া লইল, তখন প্রতিবাসী অভিরাম দাস কণ্ঠীবদলের আশায় নিরাশ হইয়া নরোত্তম দাসের কথায় মনঃসংযোগ করিল।

পরাণীর বাপ ছিল না, মাও ছিল না, ঘরে শুধু বুড়ী আয়ী ছিল। বাপের মা নয়, মায়ের মা। অল্প বয়সে মা বাবা গেলে আয়ীই জামাই-বাড়ীতে আসিয়া পরাণীকে মানুষ করিয়াছিল। আয়ীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, বিধবা পরাণী কণ্ঠী-বদল করিয়া পুনরায় সংসারধর্ম্ম করে। এই বয়সে মাথায় মোট করিয়া তাহার হাটে বাজারে যাতায়াত কি ভাল দেখায়? পরাণী কিন্তু কণ্ঠীবদলের চেয়ে এই কাজটাকেই ভাল বলিয়া পছন্দ করিল।

পরাণীর স্বামী চিন্তামণি বৈরাগী ঘরজামাই হইয়াছিল। সে জাতি-ব্যবসায় ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য মণিহারী জিনিসের ফেরী করিয়া বেড়াইত। চিন্তামণির মৃত্যুর পর পরাণী স্বামীর বৃত্তি গ্রহণ করিল।

আয়ী কিন্তু ইহাতে বড় গোল বাধাইল। এমন সোমত্ত বয়সে হাটে বাজারে

যাওয়ার যে কত বিপদ্, আয়ী তাহা জানিত। বুড়ী ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। পরাণী কিন্তু সে প্রতিবাদে কাণ দিল না। সে হাটের দিন খুব সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া আসিত। তার পর একখানি ধোপদস্ত থান কাপড় পরিয়া, নাসাগ্রে একটী সূক্ষ্ম রসকলি কাটিয়া, দোক্তা-ভরা পান গালে দিয়া মোট মাথায় কৃষ্ণনগরের হাটের দিকে যাত্রা করিত। পথিকেরা এই ষোড়শী পসারিণীর মত্তগজেন্দ্রগতিদর্শনে মুগ্ধ হইত; যুবকেরা তাহার দিকে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে থাকিত; বৃদ্ধেরা হুচোট খাইত; আর গ্রামের অনেক লোক, শুধু পরাণীকে নয়, বুড়ীকেও ছি ছি করিত।

গ্রামের লোকের নানা অনুযোগ শুনিয়া বুড়ী এক দিন রাগিয়া পরাণীকে বলিল, "দেখ্ পরাণী, তুই যদি এমন মোট মাথায় ক'রে হাটে বাজারে যাবি, তা হ'লে আমি তোর হাতের জল পর্য্যন্ত খাব না।"

পরাণী বলিল, "তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাই আয়ী, এই দু'কোশ পথ ভেঙ্গে এসে আমাকে আর জল টল তুলতে হয় না।"

আয়ী রাগিয়া বলিল, "আমি এবার মাথামুড় খুঁড়ে মরবো পরাণী।"

পরাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি তোমায় তুলসীতলায় গোর দিয়ে নিশ্চিন্দি হব।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া আয়ী বলিল, "তুই আবার হাঁসচিস্ লা ছুঁড়ী?"

পরাণী বলিল, "কি করি আয়ী, আমার যে কান্না আসচে না।"

আয়ী মাথা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এখন কান্না আসবে কেন, কিন্তু এর পর দেখবি। তখন এই বুড়ীর কথা ফল্‌বে।"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "পরে কাঁদতে হবে ব'লে এখন থেকে তার আখড়া দেব নাকি?"

আয়ী রাগে ফুলিতে লাগিল। কোনও উত্তর করিতে পারিল না, শুধু কঠোরদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আয়ীর রাগের বৃদ্ধি দেখিয়া পরাণী হাস্য সংবরণ করিল; বলিল, "তা হ'লে তুমি কি করতে বল আয়ী?"

রাগে ভ্রূকুটি করিয়া আয়ী বলিল, "লোকে কত কথা কইচে, এর পর আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে।"

পরাণী এবার রাগিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন দেবে? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি? নিজের গতর খাটিয়ে খাব, তাতে লোকের কি?"

পরাণীর রাগ দেখিয়া আয়ী একটু নরম হইল; ধীর কোমল স্বরে বলিল, "পোড়া লোকের স্বভাবই ঐ, শুধু ছুতো খুঁজে বেড়ায়।"

পরা। আমি এমন ছুতোর কাজ কি ক'রেছি?

আয়ী। করবি আবার কি, তবে এই বয়স নিয়ে কি হাটে বাজারে যাওয়া ভাল দেখায়?

পরা। আমি তো হাটে বয়স বিক্রী করতে যাই না, জিনিস বিক্রী করতে যাই।

আয়ী। যে জন্যেই হোক, যাস্ তো। তুইই বুঝে দেখ্ না, এতে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলতে পারে কি না।

পরাণী একটু চুপ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বেশ, কাল থেকে যদি হাটে যাই, তবে আমার নাম পরাণীই নয়। ঘরে প'ড়ে উপোস দিয়ে ম'লেই যদি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তাই করবো।"

আয়ী ব্যগ্রস্বরে বলিল, "ও আবার কি কথা পরাণী, বালাই, ষাট!"

পরাণী রাগে গুম হইয়া রহিল। আয়ী বলিল, "নিজের গোঁ ছেড়ে দে, আমার কথা শোন্।"

পরাণী বলিল, "তোমার আর কি কথা? সাঙ্গা তো?"

আয়ী বলিল, "সাঙ্গা কেন, কণ্ঠিবদল। আমাদের জাতে তো আছে।"

পরাণী বলিল, "সে যারা ভেকধারী বোষ্টম, তাদের ঘরে আছে। আমি জাত বোষ্টমের মেয়ে।"

আয়ী স্নেহের স্বরে বলিল, "আরে আমার জাত রে! জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?"

পরাণী বলিল, "জাত নিয়ে ধুয়ে খাব না তো কি বাপ ঠাকুর্দার মুখে কালী দেব?"

আয়ী বলিল, "না, হাটে গিয়ে নিজের মুখে বেশ ক'রে চূণ-কালী মাখবি। আমার তো মরণ নাই, তাই ব'সে ব'সে এই সব দেখতে হচ্চে।"

পরাণী কোনও উত্তর করিল না। আয়ী উঠিয়া দেরেকে ঝুলান জপের ঝুলী পাড়িতে পাড়িতে বলিল, "পরাণী, আমার কথা শোন্। আজও অভিরাম এসেছিল। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।"

পরাণী বুঝিল, এই যুক্তিগুলা অভিরামেরই। সুতরাং আগে তাহার মুখ বন্ধ করিতে না পারিলে আয়ীর তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

২

বালির কাগজের ছেঁড়া খাতাখানা সম্মুখে ধরিয়া অভিরাম সুরের সহিত নরোত্তম দাসের কড়চা আবৃত্তি করিতেছিল,—

"রাম নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে,
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্য জন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ কর সার,
কৃষ্ণ বিনে সংসারের গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু।"

অভিরাম একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাগজখানা চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইল। হায়, মায়ারূপী স্ত্রী পুত্র কন্যা আসিয়া তাহার সংসার-বৃক্ষকে এক দিন এমনই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, অভিরাম ভাবিয়াছিল, "হা গোবিন্দ! এ মায়া মোহ হ'তে আমায় উদ্ধার কর, মহা পাতকী আমি, আমায় পথ দেখাও।" কিন্তু গোবিন্দ যে দিন তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, সহসা একটা কালের ঝড় আসিয়া অভিরামের সংসার-বৃক্ষের ডালপালাগুলা নির্ম্মূল করিয়া দিল, সে দিন বিশাল প্রান্তরে শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইয়া অভিরাম শোকবিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "হা গোবিন্দ, এ কি করিলে?" আগে যে অভিরাম স্ত্রীপুত্রকেই সাধনপথের প্রধান কণ্টক স্থির করিয়াছিল, এখন সেই কণ্টক উন্মূলিত হইল, মায়ার বন্ধন খসিয়া গেল; কিন্তু সে পথ দেখিতে পাইল না। সমগ্র বিশ্বটাই যেন তাহার শ্মশান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ মহাশ্মশানে বসিয়া রুদ্র কাপালিক কপালমালিনীর সাধনা করিতে পারে, কিন্তু অভিরামের মত সাধক ভক্তির কোমল সুরে তাহার প্রেমের দেবতাকে কিরূপে ডাকিবে?

চিত্তকে দৃঢ় করিয়া অভিরাম জপে বসিত, কিন্তু মন জপে বসিতে চাহিত না; দুইটা মালা না ঘুরিতেই যেন কাহার কলহাস্যপূর্ণ মুখখানি দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিত। অভিরাম জোর করিয়া চোখ দুইটা মুদ্রিত করিত। কিন্তু স্মৃতি শত চক্ষু প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইত, ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে; প্রদীপের সম্মুখে এক তন্বঙ্গী যুবতী দেড় বছরের ছেলেটীকে কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। ছেলে ঘুমাইতে চাহিতেছে না; মা তাহাকে জোরে কোলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথায় মৃদু চাপড়াইতে চাপড়াইতে, হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে, ঘুমপাড়ানোর সুরে বলিতেছে,—"আয় রে আয়, আমার

সোনার যাদু ঘুম যায়।" ছেলে মাথা নাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; মা মুখে তাহাকে তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু চোখ দুইটা দিয়া স্নেহের অমৃতধারা উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে। ছেলে অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলিতেছে, "আ-বা-বা-বা।" মা তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "হাঁ, হাঁ, সে এখন জপে বসেছে, তোর তরে কি ভগবানকেও একটু ডাকবে না?" ছেলে কিন্তু ভগবানকে ডাকিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে বা-বা-বা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "এমন ছেলেও তো দেখিনি" বলিয়া মা তাহাকে ধমক দিল। অভিরাম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ব্যস্তভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। অভিরাম মালাটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল। হায় দেবতা! তোমার মায়ার এ কি কঠোর বিদ্রূপ!

অভিরাম দিনরাত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিত, "হে দীনদয়াল, মায়ার বন্ধন যখন ছেদন করিয়া দিয়াছ, তখন মনের এই মোহটুকু কাটাইয়া দাও ঠাকুর! দাবদাহে বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, তাহার শুষ্ক মূলটুকু আর থাকে কেন?"

কেন যে থাকে, তাহা অভিরাম জানিত না, কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্যামী জানিতেন। তিনি জানিতেন, বর্ষার স্নিগ্ধধারাসম্পাতে এক দিন এই দগ্ধ বৃক্ষের নীরস মূল সরস হইয়া উঠিবে; বসন্তের মৃদুমলয়স্পর্শে নবীন শিহরণ অনুভব করিবে। তখন আবার এই বৃক্ষ নবোদ্গত শাখাপ্রশাখায়, নবীন পত্রপুষ্পে সুভূষিত হইয়া শ্যামসৌন্দর্য্য বিস্তার করিবে।

গ্রামের ঘরে ঘরে নামগানই অভিরামের জীবিকা ছিল। নামগান করিয়া গৃহস্থদিগের নিকট যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সকালে উঠিয়া করতাল লইয়া নামগানে বাহির হইত, এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘরে ফিরিত। তার পর স্নান ও ইষ্টপূজা-সমাপনান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিত। গ্রামের কোনও বাটীতে যে দিন ক্রিয়াকর্ম্ম থাকিত, সে দিন আর তাহাকে পাক করিতে হইত না; ব্রাহ্মণ কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণের সহিত অভিরামের নিমন্ত্রণও বাদ যাইত না। শুধু বাসগ্রামে নয়, পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানা গ্রামেও অভিরামের যাতায়াত ছিল।

সে দিন কেশবগঞ্জে নামগান করিয়া ফিরিতে একটু বেশী বেলা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইতেছিল; রাস্তার ধূলাগুলা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পায়ে ঠেকিতেছিল। পথ প্রায় জনশূন্য; কচিৎ দুই এক

জন হাটুরিয়া ভিজা কাপড় গায়ে দিয়া শূন্য বাজরা মাথায় ঘরে ফিরিতেছিল। সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন পথে অভিরাম একা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বৈরাগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। আবার ডাক আসিল, "এ দিকে বৈরাগী ঠাকুর, এ দিকে।"

রাস্তা হইতে অল্প দূরে একটা শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণীর তীরে দুইটা গাছ—অশ্বত্থ ও বট জড়াজড়ি করিয়া স্থানটাকে ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছিল। অভিরাম দেখিল, সেই ছায়াময় স্থানে বৃক্ষতলে এক স্ত্রীলোক। সে স্ত্রীলোক তাহাদেরই গ্রামের স্বরূপ দাসের মেয়ে পরাণী। অভিরাম বিস্ময়পূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল, এবং নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, পরাণী?"

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "হাঁ, আমি। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

অভিরাম গাছতলায় ঘাসের উপর বসিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কেশবগঞ্জে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুই পরাণী, তুই এখানে?"

পরাণী বলিল, "আমি কেষ্টনগরের হাটে গিয়াছিলাম।"

অভিরাম একটু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "হাটে?"

সম্মুখবর্ত্তী বাজরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরাণী সহাস্যে বলিল, "আমি যে মণিহারীর দোকান ক'রেছি।"

অভিরাম একবার পরাণীর দিকে, আর বার বাজরার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। পরাণী বলিল, "আজ যে তালপাকা রোদ, তার উপর এই ভারী মোট, একটু না জিরিয়ে আর পারলাম না। কিন্তু মোট নামিয়ে এক বিপদে পড়েছি, তুলে দেবার লোক পাই নি। একা মেয়েমানুষ কি এত বড় মোট তুলতে পারি?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিরাম বলিল, "এ সব কি তোর কাজ পরাণী?"

ঈষৎ হাসিয়া পরাণী বলিল, "সে তো তুমিও বল, আমিও বলি, কিন্তু পেট তো সে কথা শোনে না।"

অভিরাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া পরাণীর কাণের পাশে চুলগুচ্ছের দোল দিয়া গেল। গাছের খুব উঁচু ডালে বসিয়া একটা পাখী উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, কট-ই-ক্ অ-ল্। অভিরাম ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল মাঠের দিকে চাহিল।

পরাণী উঠিয়া কাপড়টা বেশ গুছাইয়া পরিল, এবং আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া অভিরামের দিকে চাহিয়া বলিল, "মোটটা তুলে দাও দেখি।"

অভিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাঁধের গামছাখানা কোমরে বাঁধিয়া বলিল, "ওটা আমি নিচ্ছি।"

পরাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু।"

সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অভিরাম ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "দোষ কি পরাণী?"

পরাণী দুই হাত দিয়া মোটের একটা পাশ ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "নাও, তুলে দাও।"

অভিরাম আর কিছু না বলিয়া মোট তুলিয়া দিল। মোট লইয়া পরাণী আগে আগে চলিল, অভিরাম তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। যাইতে যাইতে পরাণী বলিল, "আমার সঙ্গে তোমাকে আস্তে আস্তে যেতে হচ্চে। কিন্তু রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, আমার একা যেতে কেমন ভয় করে।"

অভিরাম কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে চলিল। আরও কিছু দূর গিয়া পরাণী বলিল, "একা হ'লে তুমি এতক্ষণ বাড়ী পঁহুছাতে পারতে। তোমার দেরী হ'য়ে গেল।"

অভিরাম বলিল, "তা হোক্।"

সেই দিন বাড়ী পঁহুছিয়া অভিরাম দেখিল, তাহার প্রাণের উপর দিয়া একটা ঝড় চলিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে তাহার মনের বৃত্তিগুলা এমন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা দুষ্কর।

অপরাহ্নে অভিরাম বৈষ্ণবগ্রন্থগুলা পড়িয়া তাহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া বৈরাগ্যসূচক পদগুলা বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় জপ ও বন্দনার শেষে অভিরাম দেখিল, তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে, মনের নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু পরাণীর জন্য একটু করুণা-মাত্র জাগিতেছে।

পর দিন অভিরাম পরাণীর আয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল যে, পরাণীর এরূপ হাটে বাজারে যাওয়া ভাল নয়। কণ্ঠীবদল করিয়া পুনরায় সংসারী হওয়া উচিত।

আয়ী অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিল, "তা বাছা, ও হতভাগা মেয়ে কি আমার কথা শোনে? তুমি একটু বুঝিয়ে দেখ না।"

অভিরামের বুকটা ধড়-মড় করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আরশীর কাছ হইতে পলাইয়া আসিয়া নরোত্তম দাসের কড়চা খুলিয়া বসিল, এবং জোরে জোরে পড়িতে লাগিল,—

"রাম নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে,
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে।
যায় রে মনুষ্যজন্ম গেল রে বহিয়ে,
কি কর পামর মন কৃষ্ণ না ভজিয়ে।"

"রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ,
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।"

কাগজখানা কপালে ছোঁয়াইয়া অভিরাম অন্য পদ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় পরাণী হেলিতে দুলিতে আসিয়া ডাকিল, "বৈরাগী ঠাকুর!"

অভিরাম মহাজনপদাবলী হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সবিস্ময়ে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী আবদারের সুরে বলিল, "আমাকে নাম শোনাবে বৈরাগী ঠাকুর?"

পরাণী অভিরামের সম্মুখে একটু দূরে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অভিরাম হতবুদ্ধি হইয়া শুধু বিস্ময়স্তব্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী সহাস্যে অথচ তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখচো?"

দৃষ্টি নত করিয়া অভিরাম ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে এ বিদ্রূপ কেন পরাণী?"

পরাণী বলিল, "নাম শুনতে চাওয়া কি বিদ্রূপ?"

অভিরাম বলিল, "সত্যই কি তুমি সেই জন্য এসেছ?"

"তবে কি তোমার সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে এসেছি?"

অভিরাম শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "ছিঃ পরাণী!"

পরাণী কিন্তু এ তিরস্কারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না; সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি কেন বৈরাগী ঠাকুর? তোমারও তো কণ্ঠীবদল দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

অভিরাম বিরক্তিপূর্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরাণী বলিল, "কি দেখচো? আমার রূপ?"

অভিরাম একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ রূপ ক'দিনের জন্য পরাণী?"

সহাস্যে পরাণী বলিল, "যে ক'দিন থাকে।"

অভিরাম বলিল, "বড় বেশী দিন থাকে না, দু'দিন মাত্র। তার পর—"

পরাণী বলিল, "তার পর কি? মাটীর দেহ মাটী হবে, না?"

পরাণী হাসিয়া উঠিল; অভিরাম ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে পরাণী পুঁথিগুলার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলা তোমার বৈরাগ্যের দপ্তর নাকি?"

অভিরাম বলিল, "এ সব মহাজনপদাবলী।"

"ওতে কি লিখচে? মেয়ে মানুষগুলাই যত আপদ, পায়ের বেড়ী, পথের কাঁটা, আর পুরুষগুলি সব সাধু সন্ন্যাসী, না?"

অভিরাম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পরাণী বলিল, "একটু শোনাও না।"

অভি। ও সব তোমার ভাল লাগবে না।

পরা। তোমার ভাল লাগে?

অভি। ভাল লাগে ব'লেই পড়ি।

পরা। শুধু পড়? টিয়ে পাখীর মত?

অভিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলে কি? এ তো পরিহাসের কথা নয়, এ যে অন্তরের কথা, অনেক উচ্চশিক্ষার কথা! সত্যই তো, শুধু টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি করিয়া কি হইবে? সে যে আজীবন এই সকল উপদেশ আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, আবৃত্তি করিয়া লোককে শুনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু ফলে কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। প্রথমে এই সকল মহাজনবাক্যকে যেরূপ জীবিকার সহায়স্বরূপে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল, এখনও ঠিক তাহাই আছে। এই সকল উপদেশের একটী অক্ষরও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, ইহার একটী আদেশও সে পালন করে নাই। একটা অব্যক্ত যাতনায় অভিরামের বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো বৈরিগী ঠাকুর?"

অভিরাম অশ্রুকাতর দৃষ্টি তুলিয়া পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। সবিস্ময়ে দেখিল, পরাণীর মুখে আর হাসি নাই; তাহার হাস্যচঞ্চল মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে, চঞ্চল দৃষ্টির মধ্যে তিরস্কারের ভীষণ তীব্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাতরস্বরে অভিরাম বলিল, "আমায় মাপ কর পরাণী, আমি ঘোর পাতকী।"

অভিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। পরাণী আবার হাসিয়া উঠিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি বৈরিগী ঠাকুর, কেঁদে ফেল্লে যে?"

অভিরাম কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি অতি হতভাগ্য পরাণী, আমার উদ্ধার নাই।"

পরাণী বলিল, "তোমার উদ্ধার আছে কি না, সে কথা তোমার উদ্ধার-কর্ত্তাই জানেন। তবে কণ্ঠীবদলের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার কাছে যেও; আয়ীকে মিছে জ্বালিও না।"

পরাণী উঠিয়া ধীরগম্ভীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল। অভিরাম স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। দিবার আলোক নিবিয়া আসিল; সন্ধ্যার অন্ধকারে গৃহপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন হইল। উঠানের আমগাছে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিল। অভিরাম চমকিত হইয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার কি হবে গোবিন্দ!"

৪

অভিরামের মুখ বন্ধ করিয়া পরাণী যে শুধু নিশ্চিন্ত হইল, তাহা নহে, মনের ভিতর বেশ একটু গর্ব্বও অনুভব করিল। তাহার এমন একটা ঐশ্বর্য্য আছে, যাহাতে অনেকেই ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারস্থ হইয়া তাহার কৃপা ভিক্ষা করে, তাহার রূপ-যৌবনের পদে আপনার সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিবার জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু হৃদয়ের অসামান্য দৃঢ়তার প্রভাবে সে লোকের সেই সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে, দাতার অযাচিত সর্ব্বস্ব দানকেও অকাতরে ফিরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনই তাহার হৃদয়বল, এতই তাহার চিত্তের দৃঢ়তা।

চিত্তের এই কঠোর দৃঢ়তায় অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া, লোকের নিন্দা গ্লানিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরাণী পুনরায় মোট মাথায় হাটে বাজারে যাতায়াত করিতে লাগিল। আয়ী হতাশচিত্তে পরাণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে হরিনামে মনঃসংযোগ করিল।

আয়ী কিন্তু বিধাতার নিকট মৌরসী পাট্টা লইয়া সংসারে আসে নাই। আর সকলের ন্যায় সেও মেয়াদী দলীল লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং পরাণী এক দিন হাট হইতে ফিরিয়া দেখিল, আয়ীর দলীলের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহারই নোটিস দিবার জন্য জ্বর ও অতিসার নামক দুই পেয়াদা উপস্থিত হইয়াছে। পরাণী বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

পরাণী ঔষধ খাইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল। স্বামী কিন্তু তুলসী-তলার মাটী আর গঙ্গাজল ছাড়া অন্য ঔষধ খাইতে চাহিল না। পরাণী হাট বাজার বন্ধ করিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। তার পর স্বামী যখন অন্তরে তাহার চিন্তা ও মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোকের চিন্তার অতীত স্থানে চলিয়া গেল, তখন পরাণী যেন সংসার শূন্য দেখিল। সে উঠানের ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভিরাম ও অন্যান্য স্বজাতীয়গণ আসিয়া বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। স্বামীর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য পরাণী দশ টাকা খরচ করিয়া বৈষ্ণবভোজন করাইল। দধি-চিপীটক-সংযোগে স্ফীতোদর বৈষ্ণব-বৃন্দ পরাণীর ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পরাণী শূন্যগৃহে বসিয়া আপনার অসহায়-অবস্থা-স্মরণে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, অভিরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ছিঃ, এক দিন যে তাহারই দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সে গর্ব্বের সহিত যাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহারই নিকট আজ ভিক্ষা চাহিবে? পরাণী ভাবিল, অসহায়ের সহায় ভগবান্; ভগবানকে ছাড়িয়া সে কেন মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে! পরাণী ভগবানের উপরেই নির্ভর করিয়া চিত্তে দৃঢ়তা আনিল, এবং পুনরায় মোট মাথায় হাটে যাতায়াত করিতে লাগিল।

ভগবানের উপর নির্ভর করিলেও পরাণী কিন্তু পূর্ব্বের মত কেনা বেচা করিতে পারিল না। খরিদ্দার জিনিসের দর করিতে করিতে মুখের দিকে চাহিলেই পরাণী যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত; কেহ হাসিয়া কথা কহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; জিনিসের মূল্যাধিক্যের জন্য কেহ তাহার বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিলে পরাণীর ইচ্ছা হইত, সে বাজরা শুদ্ধ জিনিস সেই-খানে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়। কিন্তু ঘরে পলাইলে চলিবে কেন? বাজরা আছড়াইলে খাইবে কি? সুতরাং এই সাময়িক উত্তেজনা দমন করিয়া সে অসীম ধৈর্য্যসহকারে দোকানদারীতে মন দিত। বিরক্ত হইলেও সে আগেকার মতই নিয়মিতরূপে হাটে যাইত; সস্তা দরে জিনিস কিনিয়া চড়া দরে বেচিবার চেষ্টা করিত; খরিদ্দারের সমক্ষে পাঁচ পয়সার জিনিসকে তিন আনায় কেনা বলিয়া শপথ করিতেও ছাড়িত না। তবে আগে পরাণী যে কাজটা প্রবল আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিত, এখন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কোনরূপে

তাহা চালাইয়া যাইত। এক এক সময় ভাবিত, "দূর হোক, না খেয়ে মর্‌তে হয় সেও ভাল, তবু এমন ঝকমারীর কাজ আর করবো না।"

ইহার উপর পাড়ার ছোঁড়ারা বঁড়শী, সূঁচ, সূতা, সাবান, চিরুণী কিনিতে আসিয়া যখন বাজে গল্প পাড়িয়া বসিত, এবং তিন পয়সার জিনিস কিনিতে আসিয়া তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করিত না, তখন অগত্যা পরাণীকে কখনও মিষ্ট সুরে, কখন বা একটু চড়া গলায় তাহাদের এই সময়ের অপব্যবহার-টুকু স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। সেই সঙ্গে নিজের ঝকমারীর কাজের বোঝাটা ক্রমশঃ কত ভারী হইয়া উঠিতেছে, তাহাও নিজে ভাবিয়া লইত।

সকলেই আসিত, আসিত না শুধু অভিরাম। পরাণী ভাবিত, "তার কি আসবার আর মুখ আছে? বেড়ালতপস্বী সেজে পরাণী বোষ্টমীর সঙ্গে এসেছ চালাকী করতে!"

দৈবাৎ কোনও দিন হাট হইতে ফিরিবার সময় পরাণী একটু ঘুরিয়া অভিরামের বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইত। বাহির হইতে উঁকি দিয়া দেখিত, অভিরাম সর্ব্বাঙ্গে গোপীচন্দনের ছাপ পরিয়া, তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া তদ্গত-চিত্তে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে,
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে কৃষ্ণে দিব মন,
কব হায় হেরব শ্রীবৃন্দাবন।"

পরাণীর মনে হইত, এটা যেন নেহাৎ ফাঁকা প্রার্থনা নয়; ইহার সঙ্গে যেন তাহার অন্তরের বাস্তব যোগ আছে, এবং সে যোগে অনেকখানি কান্না অভিরামের কণ্ঠা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পরাণীর মনে হইত, এই সময় যদি সে একবার কঠোর বিদ্রূপের স্বরে ডাকে—বৈরিগী ঠাকুর! মনে উঠিলেও পরাণী কিন্তু ডাকিত না, ডাকিতে সাহস হইত না। সে ডাকে পাছে অভিরামের এই তন্ময়তাটুকু নষ্ট হইয়া যায়; পাছে সে তেমনই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলে—"আমি ঘোর পাতকী পরাণী, আমি ঘোর পাতকী!"

পরাণী মোট মাথায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অভিরামের আকুল-কণ্ঠোচ্চারিত প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনিত; তার পর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সে স্থান ত্যাগ করিত। সে জোরে পা ফেলিত না, পদশব্দে যদি অভিরামের ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়; যদি তাহার এই আকুল প্রার্থনার সূক্ষ্ম সুরটুকু প্রার্থিতের কাণে গিয়া পঁহুছিতে বিলম্ব হয়।

একটু দূরে গেলেই কিন্তু পরাণীর মনের এই সঙ্কোচটুকু তিরোহিত হইয়া যাইত, সে আপনার মনে আপনি হাসিয়া বলিত, "মর্ পোড়ারমুখী, এই বেড়ালতপস্বীর আবার তপ জপ, আর সেই তপ জপকে এত ভয়!" পরাণী খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া পদশব্দে নির্জ্জন পল্লীপথ শব্দিত করিয়া চলিয়া যাইত।

৫

ঝড়ের বেগে গাছটা খুব খানিক ওলট-পালট খাইয়া আবার যেমন স্থির হইয়া দাঁড়ায়, অভিরামও তদ্রূপ মোহের ধাক্কায় খানিকটা লুটোপুটি খাইয়া শেষে বৈরাগ্যের জোরে মনটাকে খাড়া করিয়া লইল। আবার সে নামকীর্ত্তন, ভিক্ষা ও জপ আহ্নিক লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু রোগ সারিলেও দৈহিক দুর্ব্বলতাটুকু সারিতে যেমন অনেক দিন লাগে, সেইরূপ অভিরামের মোহ-মুক্ত চিত্তের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা রহিয়া গেল, সেটুকুর শান্তির জন্য অভিরাম জপ আহ্নিকের মধ্যে চিত্তটাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল।

অভিরাম সাধ্যপক্ষে পরাণীর বাড়ীর দিকে যাইত না। দৈবাৎ পথে দেখা হইলে, লোকে সাপ দেখিয়া যেমন বিশ হাত দূরে ছুটিয়া পলায়, অভিরামও সেইরূপ ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। পরাণী কৌতুকের হাসি হাসিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে ডাকিত, "বৈরিগী ঠাকুর, ও বৈরিগী ঠাকুর।" সে বিদ্রূপপূর্ণ আহ্বানে অভিরাম লজ্জিত হইত, কিন্তু ফিরিয়া চাহিত না।

তার পর পরাণী যখন অনেকটা অগ্রসর হইত, তখন অভিরাম সহসা দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নির্নিমেষনেত্রে পরাণীর মত্তগজেন্দ্রগতির দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, "হায় রক্তমাংসগঠিতা নারী, সত্যই তুই মহামায়ার অংশ। নতুবা শ্যামসুন্দরকে ছাড়িয়া তোর এই নশ্বর সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত এত আকৃষ্ট হয় কেন?" অভিরাম নশ্বর-সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরাইতে না পারিয়া আপনার উপর আপনি রাগিয়া উঠিত। তাহার ইচ্ছা হইত, সাধু বিল্বমঙ্গলের মত সর্ব্বনাশের মূল চোখ দুইটাকে উপড়াইয়া ফেলে। হায় প্রভু, রমণীর রূপলাবণ্য ছাড়িয়া কবে এই দৃষ্টি দুইটাকে তোমার চরণে নিবদ্ধ করিতে পারিব?

হৃদয়ে গভীর বিষাদ ও আত্মগ্লানি লইয়া অভিরাম ঘরে ফিরিত, এবং সংসারটাকে দূরে সরাইয়া, সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিত। কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিত না; কোথা

হইতে পরাণী আসিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাকে যেন বিশ ক্রোশ ব্যবধানে টানিয়া আনিত।

অভিরাম কাঁদিত; মাথা কুটিত; পরাণীকে জোর করিয়া ভুলিয়া, মনে জোর আনিয়া, আবার শ্যামসুন্দরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিত। সংসারের সংস্রব, দেশের মায়া ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর কি না, এ কথাটাও মাঝে মাঝে ভাবিত।

এইরূপে অভিরাম যখন এক দিকে পরাণী এবং অন্য দিকে শ্যামসুন্দরকে রাখিয়া উভয়ের মধ্যে কাহারও উপরই মনঃস্থির করিতে পারিতেছিল না, তখন গ্রামের লোকে তাহার নামের সহিত পরাণীর নামটা জড়াইয়া উভয়ের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল, যাহা শুনিয়া শুধু পরাণী নয়, অভিরাম পর্য্যন্ত ভীত স্তম্ভিত হইল।

গ্রামের মধ্যে নবীন প্রবীণ অনেকেই পরাণীর কৃপাপ্রার্থী ছিল, কিন্তু তাহার মুখের মিষ্টি হাসিটুকু ছাড়া যখন আর কোনরূপ কৃপার প্রত্যাশা দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা এই যুবতী বৈষ্ণবকন্যার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন বয়সে এত রূপ যৌবন লইয়া যে হাটে বাজারে যাতায়াত করে, মিষ্ট কথায় চটুল হাস্যে খরিদ্দারের মন মুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে কি এতটা ধৈর্য্যধারণ—চরিত্রের এত দূর দৃঢ়তা সম্ভব? সুতরাং এই ধৈর্য্যের অন্তরালে, এই অস্বাভাবিক দৃঢ়তার আবরণের ভিতর এমন একটা কিছু রহস্য আছে, যাহা দ্বারা সে সকলেরই অকাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারে। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের সেই গুপ্ত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য এই গুহ্য রহস্যের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সকলকে দেখাইয়া দিল যে, অভিরামের সহিত অবৈধ প্রণয়ই পরাণীর এই দৃঢ়তার মূল!

বুদ্ধিমান্‌দিগের গবেষণার এই অত্যাশ্চর্য্য ফল শুনিয়া লোকে শুধু বিস্মিত হইল না, তাহারা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ছি ছি, যে অভিরামকে তাহারা নিতান্ত নিরীহ বলিয়াই জানিত, তাহার এই কাজ! তাহার লম্বা টিকী ও ছিটে-ফোঁটার ভিতর এত দুরভিসন্ধি লুকান ছিল! গ্রামের অনেকেই অভিরামের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। মেয়েরা তাহার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল; যুবকেরা তাহার টিকী ছিঁড়িয়া, জপের ঝুলি মালা কাড়িয়া লইয়া উত্তম মধ্যম দিবার সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিল; বৃদ্ধেরা কলির পূর্ণ আবির্ভাব-দর্শনে শঙ্কিত হইল।

পরাণী শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। খবরটা কেন উঠিল, কে তুলিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। রাগে দুঃখে তাহার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। গ্রামে বাহির হওয়া তাহার যেন দায় হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিলেই যুবকেরা হাসে; বৃদ্ধেরা ভ্রূ কুঞ্চিত করে; মেয়েরা দড়ী কলসী সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দেয়; আর ছেলের দল হাত তালি দিয়া গাহিতে থাকে,—

বোষ্টমী লো সই, তোর বোষ্টম ঠাকুর কৈ?

পরাণী রাগে জ্ঞান হারাইয়া সত্বঃ সত্বঃ গ্রামের লোকগুলার মুখাগ্নি করা যায় কি না, তাহাই ভাবিতে থাকে।

সে দিন হাটবার। পরাণী মোট লইয়া হাটে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন সে বেচা কেনায় আদৌ মন দিতে পারিল না। ভরা হাটে খরিদ্দারের দল যখন দোকানে ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন সহসা সে ব্যস্তভাবে দোকান তুলিয়া মোট বাঁধিয়া ফেলিল। পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, এরই মধ্যে উঠলে যে?"

"মাথা ধরেছে" বলিয়া পরাণী মোট মাথায় তুলিল। জনৈক রসিক ক্রেতা বলিয়া উঠিল, "বোষ্টম ঠাকরুণের রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?"

তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরাণী দ্রুতপদে হাট ত্যাগ করিল।

গ্রামে ঢুকিতেই পরাণী দেখিল, এক পাল ছেলে তাহার আগে পিছে দাঁড়াইয়া হাত তালি দিয়া গাহিতে লাগিল,—বোষ্টমী লো সই, তোর বোষ্টম ঠাকুর কৈ?

রাগে পরাণী দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিল; তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বাড়ী ঢুকিয়া পরাণী এমনই রাস্ততার সহিত মোটটাকে ধপ্ করিয়া দাওয়ার উপর ফেলিল যে, সে আঘাতে মোটের ভিতরকার ভঙ্গুর কাচের জিনিসগুলা যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এ জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার রহিল না। মোট ফেলিয়াই সে দ্রুতপদে অভিরামের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল। অভিরাম উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছিল। কাল একাদশী গিয়াছে, সুতরাং ক্ষুধার তাড়নায় অভিরাম একটু সকাল আহ্নিক জপ সারিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিল। উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া, কতকগুলা বাঁশ কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিয়া সে তামাক সাজিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল,—

"দীনের দিন গেল হে হরি,
আমি ভজন সাধন কখন করি ; দিন গেল হরি।"

এমন সময়ে পরাণী উগ্রমূর্ত্তিতে আলুথালু বেশে আসিয়া ডাকিল, "বৈরিগী, বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম চমকিত হইয়া শঙ্কিতদৃষ্টিতে পরাণীর দিকে চাহিল। পরাণী ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তোমার মতলবখানা কি বল দেখি?"

শঙ্কাজড়িতস্বরে অভিরাম উত্তর করিল, "আমি কি করবো পরাণী?"

পরাণী গলা সপ্তমে চড়াইয়া বলিল, "কি করবে? আর কিছু না পার, ঘাটপুকুরে ঢের জল আছে, গিয়ে ডুবে মর।"

পরাণী অবসন্নভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। অভিরাম এক হাতে হুঁকা, অপর হাতে কলিকাটা ধরিয়া, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। একটু দম ফেলিয়া পরাণী একটা আঙ্গুল উঁচু করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আর কিছু কত্তে না পার, তোমার ঐ ঝুলি মালা সব জলে ফেলে দাও। নিজে যাই কর, ধর্ম্মের মুখে আর চূণ কালি দিও না।"

অভিরাম নিরুত্তর। পরাণী বলিল, "যদি কণ্ঠীবদলেরই এত সাধ হ'য়ে থাকে, তবে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বল। দেশে আমি ছাড়া কি মেয়েমানুষ নাই? রূপ যৌবন কি শুধু আমারই আছে? তবে সকলে মিলে শুধু আমার পিছনেই কেন এত লেগেছ বল দেখি?"

পরাণীর চোখ দুইটায় জল টলটল করিতে লাগিল। অভিরাম হুঁকা কলিকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ডান হাত দিয়া গলার মালাছড়া মুঠা করিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এই তুলসীর মালা ছুঁয়ে বলছি পরাণী, আমি এর বিন্দুবাষ্পও জানি না।"

পরাণী তীব্র ভ্রূকুটী করিল। অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বাস হ'লো না?"

জোর গলায় পরাণী উত্তর দিল, "না।"

অভিরাম হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। পরাণী তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে বলিল, "আমি বিশ্বাস করলে কি হবে, পাঁচ জনের মুখে তো সরা চাপা দিতে পারব না?"

অভিরাম বলিল, "আমি তার কি কত্তে পারি?"

দৃঢ়স্বরে পরাণী বলিল, "কিছু কত্তেই হবে।"

অভিরাম জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী বলিল, "হয় তুমি গাঁ ছেড়ে যাও; নয় বল, আমি যাই।"

একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অভিরাম বলিল, "গাঁ ছাড়তে হয়, আমিই ছাড়ব। কিন্তু তাইতেই কি লোকের জিব থেকে নিস্তার পাবি? তার চেয়ে—"

কথাটা বলিতে গিয়া আটকাইয়া গেল। পরাণী কিন্তু সে অমুক্ত কথাটুকু উক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "তার চেয়ে আমি কণ্ঠীবদল করি, কেমন, না?"

"সেইটাই কি ভাল নয়?"

"আরও ভাল হয়, যদি কণ্ঠীবদলটা তোমার সঙ্গেই হয়।"

মুখ নীচু করিয়া অভিরাম বলিল, "আমি ছাড়া কি আর লোক নাই?"

গর্জ্জন করিয়া পরাণী বলিল, "কিন্তু এমন সাধু লোক আর দু'টী নাই। তা নৈলে গাঁয়ে এত লোক থাকতে তোমার সঙ্গেই বা আমাকে এমন ভাবে জড়াবে কেন?"

পরাণী দেখিল, অভিরামের মুখখানা মরা মানুষের মুখের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। পরাণী ইহাতেও দমিল না; সে আরও উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ বৈরিগীঠাকুর, হরিনাম কত্তে হয় কর, কিন্তু এমন চিতে বাঘ সেজে পরের মেয়ের উপর নজর দিয়ে বেড়িও না। মুখে হরি হরি বলবে, আর মনে মনে পরের বৌ ঝির মুখখানা ভাববে, তার চেয়ে—"

অশ্রুকাতরকণ্ঠে অভিরাম বলিল, "পরাণী!"

পরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "দরকার হয়, কণ্ঠী-বদল করবো, কিন্তু তোমার মত চিতে বাঘের সঙ্গে নয়।"

সদম্ভপদক্ষেপে উঠান কাঁপাইয়া পরাণী চলিয়া গেল। অভিরাম স্তব্ধ নিঃসংজ্ঞভাবে বসিয়া রহিল।

যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন উনান নিবিয়া গিয়াছে, ভাতের হাঁড়ীর ভাতগুলা গাঁজিয়া উঠিয়া পাঁকের মত হইয়াছে। অভিরাম হাঁড়ীটা নামাইয়া রাখিয়া হাত ধুইল, এবং ঘরে গিয়া চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। ঘরের পিছনে তেঁতুল গাছে বসিয়া একটা পাখী চীৎকার করিতে লাগিল—কটি-ই-ক্ জ-ল্।

৭

আঘাতের পরিবর্ত্তে যদি প্রতিঘাত পাওয়া যায়, অহেতুক তর্জ্জিত ব্যক্তি তর্জ্জনের উত্তরে যদি প্রতিতর্জ্জন করে, তাহা হইলে আর ক্ষোভের কোনও কারণ থাকে না; সঙ্গে সঙ্গে দেনা পাওনা মিটিয়া যায়। কিন্তু প্রহৃত ব্যক্তি

যদি নিঃশব্দে প্রহার-যাতনা সহ্য করে, কঠোর তর্জ্জনের উত্তরে যদি শুধু সকাতরদৃষ্টিতে আপনার আহত অন্তরের ব্যথাটুকু জানাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ক্ষোভের আর অবধি থাকে না। সকল ক্রোধ, সকল দুঃখকে অতিক্রম করিয়া আহতের সেই নীরবতারূপ যাতনাটুকুই মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে থাকে।

গ্রামে যে জনরব উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে অভিরাম যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে পরাণীর কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আপনার ক্রোধাগ্নিতে আহুতি দিবার মত আর কাহাকেও যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন সে এই নিরীহ লোকটীর উপরেই আপনার ঝাল ঝাড়িয়া আসিল। ভাবিল, ইহাতেই বুঝি মনের জ্বালাটা অনেক কমিবে। কিন্তু কম হওয়া দূরে থাক, অভিরামকে তিরস্কার করিয়া আসিবার পর পরাণীর অন্তর্দ্দাহ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল; এই নিরীহ লোকটীর অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাহার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আর সেই ক্ষোভটুকু মনের ভিতর যেন কাঁটার মত খচ্-খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। পরাণীর অশান্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইহার উপর অভিরামের সেই তিরস্কার-বিবর্ণ মুখ, সেই কাতরতাপূর্ণ জলভরা দৃষ্টি আরও গোল বাধাইয়া দিল। বিড়াল-তপস্বীর সেই গোপীচন্দনের ছাপভরা মুখ, যাহাকে পরাণী কখনও প্রসন্নতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, সেই বিশ্রী মুখখানা, সেই গোল গোল চোখ দুইটা যে মনের উপর এমন জাঁকিয়া বসিতে পারে, ইহা পরাণী কখনও ভাবে নাই। কিন্তু যাহা কখনও ভাবে নাই, আজ তাহাই ঘটিতে দেখিয়া সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পরাণী ঘরে আসিয়া রাঁধিল, কিন্তু খাইতে পারিল না। দুই চারি গ্রাস খাইয়াই ভাতগুলা ফেলিয়া দিল। রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সে একাই থাকিত, কিন্তু আজ যেমন একা বোধ হইতে লাগিল, এমন এক দিনও হয় নাই। গ্রামের লোকদের কুটিল দৃষ্টিগুলা যেন বিভীষিকার মত বোধ হইতে লাগিল। পরাণী সারা রাত্রি ছটফট করিয়া কাটাইল। ভোরের সময় যখন একটু তন্দ্রা আসিল, তখন শুনিতে পাইল, অভিরাম অন্য দিনের মতই রাস্তা দিয়া ভজনের সুরে গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে,—

"জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, হরি, জগতজনপালন।
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি, শ্রীনাথ, দীননাথ দীনতারণ॥"

আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগন্ত অবস্থায় সে সুরটা পরাণীর কাণে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

পর দিন পরাণী অভিরামের বাড়ীতে গিয়া দেখিল, অভিরাম একটা বড় গাঁঠরী বাঁধিতেছে। পরাণী ডাকিল, "বৈরিগী ঠাকুর!"

অভিরাম ফিরিয়া চাহিল। পরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "গাঁঠরী বাঁধছ যে? কোথায় যাবে?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া অভিরাম উত্তর করিল, "মনে করেছি, শ্রীধামে যাব।"

"আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"তোকে?"

"হাঁ, আমাকে। পারবে না?"

"না।"

"কেন?"

মুখ নীচু করিয়া অভিরাম বলিল, "আমি মহা পাতকী পরাণী, আমার পাপ মন এখনও আমার বশ নয়।"

স্নেহের হাসি হাসিয়া পরাণী বলিল, "কিন্তু এই পাপ মন নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছ?"

অভিরাম বিস্ফারিতদৃষ্টিতে পরাণীর মুখের দিকে চাহিল। পরাণী মুখ নামাইয়া ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমার মাপ কর বৈরিগী ঠাকুর, আমি না বুঝে তোমাকে অনেক মন্দ কথা বলেছি।"

প্রফুল্লকণ্ঠে অভিরাম বলিল, "তুই আমার শিক্ষাদাতা গুরু।"

পরাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অভিরাম পুনরায় গাঁঠরী বাঁধিতে লাগিল। পরাণী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কি হবে বৈরিগী ঠাকুর?"

মুখ না তুলিয়াই অভিরাম বলিল, "গোবিন্দ আছেন।"

পরাণী থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "আমি মেয়েমানুষ, আমার তত নির্ভরের ক্ষমতা নাই বৈরিগী ঠাকুর। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

অভিরাম বলিল, "আমি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট; আমার কাউকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নাই।"

তীব্রস্বরে পরাণী বলিল, "একটা অনাথাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নাই, অথচ এক জন অনাথাকে কলঙ্কসাগরের মাঝে ফেলে গোবিন্দের কৃপা পাবার আশায় বৃন্দাবনে ছুটবার ক্ষমতা আছে?"

নতমুখে জড়িতস্বরে অভিরাম বলিল, "ব্রজের রজে গড়াগড়ি দেব, এ যে আমার অনেক দিনের সাধ পরাণী ?"

পরাণী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "আর আমারও সাধ, আমি তোমার সঙ্গে কণ্ঠীবদল করবো।"

অভিরাম শিহরিয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া পরাণী বলিল, "এখন বল, বৃন্দাবনে যাবে, না আমাকে ঠাঁই দেবে ?"

অভিরাম গাঁঠরী ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং পরাণীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তোকেই ঠাঁই দেব পরাণী, কিন্তু আর কণ্ঠীবদল নয়; তুই গুরু, আমি শিষ্য; আমি বাপ, তুই মেয়ে; তুই মা, আমি ছেলে; মান অপমান, স্তুতি নিন্দা সব মাথা পেতে নিয়ে, এইখানে ব'সে শ্রীগোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করি। আর আমি বৃন্দাবনে যাব না পরাণী।"

পরাণী উপুড় হইয়া পড়িয়া অভিরামের পায়ের ধূলা লইল; হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার মনের ভিতরেই যে বৃন্দাবন বৈরিগী ঠাকুর !"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

আর্য্য উপনিবেশ।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৩০০ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিব। এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা প্রকট নহে সত্য, কিন্তু ইতিহাস বুঝাইতে সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, ও জাতিগত উন্নতি বা অবনতির অনুশীলনের উপযোগিতা, রাজনীতির সংবাদ সংগ্রহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সময়ের এই প্রকার ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ধর্ম্মও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সূত্রযুগের গ্রন্থাবলী—বোধায়ন, গৌতম, আপস্তম্ব প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক। দ্বিতীয়তঃ, মৌর্য্য-পূর্ব্ব যুগে নিবদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য।

দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপনই এই যুগের প্রধান ঘটনা। ভারতের দক্ষিণাংশ "দাক্ষিণাপথ" নামে পরিচিত। একটি বৈদিক ঋকে (ঋ. বে. ১০।৬১।৮) দক্ষিণে নির্ব্বাসিত এক ব্যক্তি "দক্ষিণাপদ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই দক্ষিণাপথ বলিতে সে সময়ের আর্য্য অধ্যুষিত প্রদেশের দক্ষিণে বুঝাইত। ব্রাহ্মণযুগে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সীমানির্দ্দেশক বিন্ধ্যমালা অতিক্রম করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভীম "বৈদর্ভ" অর্থাৎ বিদর্ভরাজ নামে বর্ণিত। [ঐ. ব্রা. ৩৪।৯]। এই বিদর্ভ বা 'বেরার' বিন্ধ্য পর্ব্বতের

ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [ঐ. ব্রা. ১৭·১৮ ; সাংখ্যায়ন-শ্রৌত-সূত্র, ১৫।২৬।] ঋষি বিশ্বামিত্রের গল্পে দেখিতে পাই যে, শুনঃশেপের দত্তকরূপে গ্রহণ ও তাহার দেবরাত নামকরণে অসন্তোষ প্রকাশ করায় বিশ্বামিত্র তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্রকে আর্য্যঅধ্যুষিত প্রদেশের "প্রান্তে" নির্ব্বাসিত করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ হইতে আরও জানিতে পারি যে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব প্রভৃতি "দস্যু"গণ বিশ্বামিত্রের এই পঞ্চাশৎ পুত্রেরই বংশধর। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্র, পুলিন্দ ও শবর মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী জাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে তাহাদের ঠিক বাসস্থান না জানিতে পারিলেও, আর্য্যগণ যে এই সময়ে বিন্ধ্যের দক্ষিণে অবস্থিত এই সকল অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পাণিনি (৬০০ খ্রীঃ পূঃ) তাঁহার সূত্র সমূহে ভারতের প্রাচীন ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত স্থান ও নদী সাধারণতঃ পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতে তিনি কচ্ছ (৪।২।১৩৩), অবন্তি (৪।১।১৭৬), কোসল (৪।১।১৭১) ও কলিঙ্গের (৪।১।১৭৮) উল্লেখ করিয়াছেন। অশ্মক (৪।১।১৭৩) ভিন্ন নর্ম্মদার দক্ষিণে আর কোনও প্রদেশের উল্লেখ পাণিনিতে নাই। সুত্তনিপাত একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ। ইহাতে [সু. নি. ৯৭৬-৭] দেখি যে ব্রাহ্মণগুরু বাভরিন, কোসলদেশ পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিনপথে (দক্ষিণাপথে) অস্মক (অশ্মক) রাজ্যে গোদাবরীর তটস্থ গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্ব্বাচিত করেন। বাভরিন তাঁহার ষোড়শ শিষ্যকে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শিষ্যগণের উত্তরাভিমুখে যাত্রার মার্গও যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে [সু. নি. ১০১১—৩]। তাঁহারা প্রথমে মূলক প্রদেশ পটিট্ঠান নগরে উপনীত হন, তথা হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে যাত্রা করেন।

পাণিনি, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, দাক্ষিণাত্যে কেবলমাত্র অশ্মকের নাম করিয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে) পাণিনির "জনপদ-শব্দাৎ-" (৪।১।১৬৮) সূত্রের বার্ত্তিক করিবার সময় ("পাণ্ড্যোর্ ড্যণ্") "পাণ্ড্য" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। "কম্বোজাদিভ্যো—" সূত্রের বার্ত্তিককালে কাত্যায়ন চোড়, কড়ের ও কেরলের নাম করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকে দেশবাচক, জাতিবাচক ও রাজবাচক। কিন্তু পাণিনি ইহাদের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং পাণ্ড্য, চোড় ও কেরল পাণিনির সময়ে খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর আদিতে আর্য্যগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাত্যায়নের সময় তাঁহারা ইহাদের পরিচয় লাভ করেন। মৌর্য্য শক্তির অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সিংহল বা প্রাচীন তাম্রপর্ণির বিষয়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অশোকের দুইটী অনুশাসনে ইহা "তম্বপনি" এবং মেগাস্থিনিস কর্ত্তৃক "তপ্রোবনে" নামে কথিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে চোড়, তামিলে চোর, ও তেলুগুতে চোলরূপে অভিহিত। ঐ দেশের অধিবাসীবর্গও ঐ নামে উক্ত। এই চোরজাতি হইতে তস্করার্থ সংস্কৃত চোরশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দস্যু বা দাসশব্দের উৎপত্তিও এইরূপ। ইহার প্রকৃত

ও প্রাথমিক অর্থ কাস্পিয়ান অধিত্যকার অধিবাসী ডাহি (Dahae)* জাতি, কিন্তু বৈদিক যুগে "পরধনাপহারী" অর্থে প্রযুক্ত হয়। অনার্যজাতির নামসূচক 'দস্যু' শব্দের ন্যায় 'চোর' শব্দও ঘৃণিত তস্করের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। বেদে পরদ্রব্যাপহারক বুঝাইতে তস্কর, তয়ু, স্তেন, পরিপন্থিন্ শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, কিন্তু কোথায়ও 'চোর' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থেই ইহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [তৈ. আ. ১০।৬৫]। কিন্তু কাত্যায়নের ব্যুৎপত্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পাণ্ড্যগণ আর্য্যজাতীয়, চোল বা চোরের ন্যায় অনার্য্য নহে।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি, মেগাস্থিনিসের বর্ণিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পাণ্ড্যগণ কৃষ্ণের দুহিতা পাণ্ডিয়ার (Pandæa) বংশধররূপে উক্ত। 'পাণ্ডিয়া সৌরসেনগণের রাজ্য হইতে চলিয়া যান। মেথোরা বা মথুরা, এবং ক্লিসোবোরা বা কৃষ্ণপুর সৌরসেনগণের প্রধান নগরী ছিল। প্রস্থান কালে পাণ্ডিয়া পিতা কৃষ্ণের নিকট হইতে ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত ও সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ প্রাপ্ত হন।' মেগাস্থিনিসের উক্তি হইতে অসার জনবাদের অংশ পরিত্যাগ করিলেও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। বেশ বোধ হয় যে, উত্তর ভারতে মথুরার সন্নিহিত জাতিবিশেষ পাণ্ডুনামে অভিহিত হইত এবং ইহাদেরই এক অংশ দক্ষিণ ভারতে অভিযান করে ও তথায় বসতি করিয়া পাণ্ড্য নামে পরিচিত হয়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক 'পাণ্ডোর্ড্যণ' হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পাণ্ডুশব্দ ক্ষত্রিয়জাতিবাচক ও দেশবাচক। উত্তর ভারতের এই পাণ্ডুজাতির বংশধরগণই দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া "পাণ্ড্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। টলেমি (Ptolemy) তাঁহার ভারতের ভূগোলে (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পাণ্ডিয়ন বা পাণ্ড্যরাজ্য এবং পঞ্জাবের পাণ্ডওয়ি প্রদেশের নাম করিয়াছেন। পাণ্ডওয়িগণ পাণ্ডুজাতিরই নামান্তর। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ বরাহমিহির (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে) মধ্যদেশে অবস্থিত পাণ্ডুগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বরাহমিহির বর্ণিত মধ্যদেশস্থ পাণ্ডুগণই মেগাস্থিনিসের সময় মথুরার সন্নিকটে বাস করিত। মেগাস্থিনিসের উক্তি যে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যগণ উত্তর ভারতের যমুনা ও মথুরার নিকটবর্ত্তী পাণ্ড্যগণের সহিত সম্পর্কিত—প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি ও টলেমির মতে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যগণের প্রধান নগর মোদোরা অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদ্রাসের মদুরা। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারতের পাণ্ড্যগণ যখন দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা স্বীয় আদিম বাসস্থলের রাজধানী মথুরার অনুকরণে নূতন বসতিতে নূতন পুরী মথুরা স্থাপন করেন। পুরাতন নগর ও প্রদেশের নামে নূতন পুর ও দেশের নামকরণ ঔপনিবেশিকগণের সর্ব্বজনবিদিত রীতি।

উত্তর ভারতের আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে গমন, উপনিবেশ স্থাপন ও পুরাতন আবাসের নামানুসারে মথুরা বা মথুরা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত অধিকার ও তথায় উপনিবেশ করিয়া, সিংহলে উপস্থিত হন ও আর একটী মদুরা স্থাপন করেন।

* Hillebrandt, Vedische Mythologie, 1.95 ; E. Kuhn's Zeitschrift, 28-214.

তথা হইতে পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে Eastern Archæpelago অভিযান করেন এবং উপনিবেশের চিহ্নস্বরূপ আরও একটী চতুর্থ মদুরার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্য্যগণ দক্ষিণ ভারতের টিনেভেলি (Tinnevelly) জেলা হইতে সিংহলে উপস্থিত হন। এই টিনেভেলি জেলায় তাম্রপর্ণি নদী প্রবাহিত। সিংহলের আর একটী নাম তাম্রপর্ণী। বলা বাহুল্য, সিন্ধু বা ইন্দাস্ নদীর নাম হইতে সিন্ধু বা সিন্দ্ দেশের ন্যায় তাম্রপর্ণি নদীর নাম হইতে সিংহলের তাম্রপর্ণি নামের উদ্ভব হইয়াছে। টিনেভেলি হইতে সিংহলের উত্তর পশ্চিমাংশে অবতরণই স্বাভাবিক। এইজন্য ঐ অংশই সমগ্র দ্বীপের ভিতর সুসভ্য, শিক্ষিত, প্রাচীন ও জনবহুল; এইখানেই কলব Kalawa অবস্থিত।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের রীতি অভিন্ন। পুরাকালে আর্য্যগণ ক্ষত্রিয় জাতির কর্তৃত্বাধীনে আফগানিস্থান ও পঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং ঐ সকল ক্ষত্রিয়জাতির নামে নূতন বাসস্থানের নামকরণ করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি আর্য্যগণ বিদেঘ মাঠবের অধীনে সদানীরা পূর্ব্বে করতোয়া অতিক্রম করিয়া বিদেহে উপস্থিত হন। বিদেঘ মাঠবের নাম হইতেই বিদেহ নাম উৎপন্ন। পাণিনির 'পঞ্চালানাং নিবাসো—' ইত্যাদি সূত্র ইহারই প্রমাণস্বরূপ। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও ক্ষত্রিয়জাতীয় নেতৃস্থানীয় পণ্ড জাতি হইতে পাণ্ড্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাণ্ডক্য অর্থাৎ দণ্ডকাধিপতি ভোজ ব্রাহ্মণকন্যার উপর অত্যাচার করেন ও সেই পাপে বন্ধু ও ভৃত্যবর্গের সহিত বিনষ্ট হন। মহাভারত ও হরিবংশে ক্ষত্রিয় ভোজের উল্লেখ আছে, কৌটিল্যে তিনি দণ্ডক বা মহারাষ্ট্রের অধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। চাণক্য মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর শেষভাগ)। তাঁহার বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তরের ভোজগণ অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র অধিকার করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ সুত্তনিপাতে পটিট্ঠান বা নিজামরাজ্যের পৈঠানের নাম আছে। কিন্তু ঐল পুরূরবার রাজধানী পটিট্ঠান বা প্রতিষ্ঠান নামে উত্তর ভারতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আর একটী স্থান আছে। [Wilson, Vishnu-Purana, III. 237 বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্ (BSPS. Ed.) ৫১ পৃঃ।] বেশ বুঝা যায়, উত্তর ভারতের ঐলজাতি দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন কালে, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নামে গোদাবরীর তীরে আর একটী স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। ঔপনিবেশিকগণ সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের একাধিক জাতি ও পরিবারগণের দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় জগ্গয়াপেট বৌদ্ধ স্তূপে প্রাপ্ত তিনটী অনুশাসনলিপি ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মাঢরীপুত্র শ্রী-বীরপুরুষদত্তের সময়ে উৎকীর্ণ। রাঘবের রাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশ হইতে উদ্ভূত। পুরাণেও উত্তর ভারতের ইক্ষ্বাকু রাজবংশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ উত্তরের ইক্ষ্বাকুগণই যে দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত কৃষ্ণা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। [Luders List of Brahmin Inscrr.] Nos. 1202-4.

আর্য্যগণ প্রধানতঃ দুইটী মুখ্য কারণে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হন। প্রথমতঃ রাজ্যজয়, দ্বিতীয়তঃ আর্য্যসভ্যতার প্রচার। বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুগণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও স্বকীয় আর্য্য সভ্যতার প্রচারকল্পে যথেষ্ট যত্ন করিতেন। মহাভারত ও রামায়ণে দেখি, ব্রাহ্মণ ঋষি অগস্ত্য সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যমালা অতিক্রম করিয়া আর্য্য অভিযানের পথপ্রদর্শন করেন। [মহাভা. ৩।১০৪ ; রামা. ৩।১১।৮৫]। দক্ষিণপথে রামের পঞ্চবটীতে উপস্থিতির বহু পূর্ব্বেই দুই যোজন দূ'র বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে অগস্ত্যের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যের অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহে অনার্য্য দ্রাবিড়গণের ভিতর সভ্যতা প্রচার করেন। তামিলগণ সেই প্রাচীন স্মৃতির সম্মানে অগস্ত্যকে তমিরমুনি নামে অভিহিত ও তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অগস্ত্যের মহাপ্রস্থানের চিহ্নস্বরূপ টিনেভিলি জেলার একটী পর্ব্বত এখনও অগস্তির (Agastier) নাম বহন করিতেছে। [Caldwell, Intro., ১০১। ১১৯] সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণগুরু বাভরিন বহু শিষ্যপরিবৃত হইয়া গোদাবরী তটে অশ্মক রাজ্যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন। পূর্ব্বে তিনি কোসলদেশে শ্রাবস্তিতে ছিলেন, পরে আর্য্যসভ্যতা প্রচারসূত্রে শিষ্যগণসহ ৬ শত মাইল অতিক্রম করিয়া গোদাবরী তীরে উপনীত হন। রামায়ণে দেখি যে, রাম দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ তপস্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রমে বাস ও যজ্ঞাদি করিতেন। অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ও যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, কিন্তু বানরগণ ব্রাহ্মণগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অনার্য্য রাক্ষসগণেরও কেহ কেহ ব্রাহ্মণভক্ত ও আর্য্য-সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, যেমন রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ—"নতু রাক্ষস-চেষ্টিতঃ" [রামা. ৩।১৭।২২]। অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন ও আর্য্যসভ্যতার প্রচারকল্পে ঋষিগণ সর্ব্বত্র পুরোগামী ছিলেন। রামায়ণ ব্যতীত অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থও ঋষিগণের এই মহৎ কার্য্যের সাক্ষ্যদান করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের প্রতি অভিশাপের উপাখ্যান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বিশ্বামিত্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ মন্ত্রচরিতা ঋষির বংশধরগণও নির্ভীকভাবে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিতেন ও অনার্য্য নারীবিবাহ ও অনার্য্যজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের দ্বারা আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করিতেন।

আর্য্যগণ কোন্ পথে দাক্ষিণাত্যে অভিগমন করেন? তাঁহারা প্রধানতঃ স্থলপথে যাত্রা করেন, কিন্তু কতকাংশে জলপথ ব্যবহার করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাভরিনের পক্ষে স্থলপথ বর্ণিত হইয়াছে। বাভরিনের শিষ্যগণ গোদাবরী তীর হইতে মূলকরাজ্যে পটিট্‌ঠানে উপস্থিত হন, তথা হইতে ক্রমান্বয়ে মাহিস্সতি (মহেশ্বর), উজ্জয়িনী, গোনদ্ধ, ভেদিসা, বনসহবয় ; কোশাম্বী, সাকেত, সাবট্‌ঠি (কোশলের রাজধানী) ; সেতব্য, কপিলবৎথু ও কুসিনার ; পাবা, বেসালী (মগধের রাজধানী ; সর্ব্বশেষে তাঁহারা পাসাণক চেতিয়ে উপস্থিত হন। আর্য্যগণ উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিবার সময় ঠিক ইহার বিপরীতমার্গ অবলম্বন করেন। উপরি উক্ত মার্গ হইতে বেশ জানা যায় যে, আর্য্যগণ বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে উপস্থিত হন ; পূর্ব্ব দিক ঘুরিয়া যাইবার কোনও প্রমাণ নাই। অশ্মক হইতে আর্য্যগণ

আর কতদূর অগ্রসর হন, তাহার আভাস নিজামরাজ্যের রাইচুর জেলার লিঙ্গসুগুর তালুকে প্রাপ্ত অশোকের মাস্কি অনুশাসন ও মহীশূরে চিতলদ্রুগ জেলায় প্রাপ্ত তিনটী অনুশাসন লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মথুরা জেলায় প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর কয়েকটী জৈন অনুশাসনও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত অনুশাসনই আর্য্য পালিভাষায় লিখিত, সুতরাং আর্য্যগণ যে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অশ্মক হইতে রাইচুর ও চিতলদ্রুগের ভিতর দিয়া আর্য্যগণ মহুরায় উপস্থিত হন। তামিল ব্রাহ্মণগণের বৃহচ্চরণ শাখায় মন্নদ্রু ও বোলন্ত বিভাগদ্বয়ের স্থান পরিবর্ত্তন প্রণালী এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল।

জলপথে আর্য্যগণ সিন্ধু হইতে কচ্ছ, তথা হইতে সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়াড়, ভৃগুকচ্ছ (বর্ত্তমান ভ্রুচ্), এবং পরিশেষে বোম্বাইএর থান জেলায় সূর্পারক বা সোপারায় উপনীত হন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বোধায়ন ঋষিসম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সিন্ধু, সৌবীর এবং সুরাষ্ট্রের অধিবাসীবর্গ দাক্ষিণাত্যবাসীদের ন্যায় মিশ্র জাতি; আর্য্যগণের উপনিবেশ চেষ্টাই ইহার কারণ। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে তাঁহারা সোপারা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্রকূল ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী কোনও দ্বীপ প্রভৃতির উল্লেখ নাই। সুতরাং জলপথ ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না।

ভারত ও সিংহলের যে স্থানেই আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন, আর্য্যধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতিনীতির সহিত তাঁহারা আর্য্যভাষাও অনার্য্যগণকে শিক্ষা দেন। এক সময়ে উত্তর ভারতে অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল (*cf.* Kittel, Kannada-English Dictionary) পরে আর্য্যভাষা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করে; আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্য অধিকারের সময় আর্য্য পালি ও অনার্য্য দ্রাবিড়ি কিছুকাল একত্র সমান ভাবে বিরাজ করে, কিন্তু পরিশেষে অনার্য্য দ্রাবিড়িই জয়ী হয়, পালিভাষা লোপ পায়। সিংহলে আর্য্য পালিভাষা অনার্য্য সিংহলি ভাষাকে বিনষ্ট করে। আর্য্যভাষায় সংঘাতে অনার্য্যভাষার ধ্বংসই স্বাভাবিক ও সঙ্গত *; উত্তর ভারত ও সিংহল দৃষ্টান্তস্থল। দাক্ষিণাত্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে —পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব। †

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

* Sir George Grierson, Linguistic Survey of India.

† Prof D. R. Bhandarkar, Carmichæl Lecture I.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ।—শ্রীসারদাচরণ উকীলের অঙ্কিত 'আকাশ-বাসরে' চিত্র-প্রবেশকা। ইহা কি? মেঘ ও সৌদামিনী? পুরুষ ও প্রকৃতি? সজল-জলদ-নীল পুরুষ জাগ্রত, গৌরী নারীর নয়ন মুদিত। নারীর স্থিতি-ভঙ্গী সুন্দর। পুরুষের চোখে বিষাদের ছায়া; মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল নয়, বরং তাহার বিপরীত। চিত্রকরের উদ্দেশ্য কি? মিলনেও বিরহের শঙ্কা? না সংসারটাই দুঃখময়—বিষণ্ণ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক? নারীর বিহ্বলতা—কতকটা সুখের সুপ্তির মত। মিলনের আনন্দে আত্মবিসর্জ্জন? মনে মনে এমন অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যাহা ধরিবার ছুঁইবার বস্তু নয়, তাহার ভাল মন্দ বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায় কি? চিত্রকর পুরুষকে এমন সুদীর্ঘ হস্তের অধিকারী করিয়াছেন যে, দূরবর্ত্তিনী নারীকে বেষ্টন ও আলিঙ্গন করিয়াও তাহা একটু বাঁচিয়াছে। বড়াল কবি লিখিয়াছিলেন,—

'শত নাগিনীর পাকে জড়াও আমায়,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ দুর্ব্বল হিয়া!'

আমরা এখনও কবিকে জিজ্ঞাসা করি, ক' গজ মৃণাল-বাহু ও কর-পদ্ম হইলে এ সাধ মিটিতে পারে? প্রত্যেক পাকে কত-ফুট হাত দরকার? এত দিন পরে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল! চিত্রকর তাহা আঁকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন! শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আসন' পদ্যগল্প—একটা স্মৃতির চর্চ্চা। বর্ণনা Realistic। আট বছর বয়সের ভূমিকা, ষাট বছর বয়সের উপসংহার। সবকটা ক্ষীণ—অস্পষ্ট। ছন্দটা বড় দুরূহ। একটু একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

'যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।'

ইহার উপর আর কথা চলে না। বাঙ্গালা দেশে কবির ভাগ্যে 'নোংরা' সমালোচন একবারেই জুটে নাই, এমন কথা আমি বলিতে না পারি, কিন্তু ইহাও স্থির যে, এত অ-নোংরা, শুচি, সমালোচন এ দেশের কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। এত স্তুতি, এত স্তব, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, এত অন্ধ সমালোচনা, এত স্তাবকের হনুকরণ ও সমালোচকের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন্ কবি লাভ করিয়াছেন? 'তবু ভরিল না চিত্ত?' বাঙ্গালী যে 'রাজা ও রাণী'র রাণীর মত ক্রমাগত বলিতেছে,—'একান্ত তোমারই আমি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশের ভালবাসায় অত্যন্ত অবিশ্বাসী। অতএব, অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে ভাল দিকটা বলিয়াই উপসংহার করি—'আসনে'র একটি উপমা বড় সুন্দর। পাগল মেয়েটিকে কাঁধে তুলিয়া লইল। কবি উপমা দিয়াছেন—

'ভোলানাথের জটায় যেন ধুতুরো ফুলের কুঁড়ি।'

রবীন্দ্রনাথ উপমায় রাজা। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা' আমরা সাবধানে পড়িয়াছি। লেখক ভাষায় বীরবলের নকল করিয়াছেন। কিন্তু এক জনের রচনা-রীতিকে

আঁকড়াইয়া লাভ কি? তাহার ওস্তাদী তথ্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। ইহা শুধু আক্ষেপ, তথ্যে প্রতিষ্ঠিত পরামর্শ নয়। লেখক অনেক শুনি শোনা কথা ওস্তাদীর তবকে মুড়িয়া আমদানী করিয়াছেন। আজকাল নবীন লেখকদের আত্মপ্রত্যয় ও দেশের লোকের বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নিদারুণ অপ্রত্যয় ও অবজ্ঞা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এটা শতাব্দীর দৃষ্টি, না বিশ্ববিদ্যালয়ের দান, না আমাদের পোড়া কপালের ফল, তাহা বলিতে পারি না। লেখক এক স্থলে অম্লানবদনে লিখিয়াছেন,—'উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এটা মানবার মতো মন আর বুঝবার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই!'—ভাগ্যে এক জনের ছিল! ভাগ্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই 'অনেকে'র দলে না পড়িয়া মননক্ষম মন ও ক্ষুরধার বুদ্ধি পাইয়াছেন! নতুবা এই বাঙ্গালা দেশের 'অনেকে'র এইরূপ মানসিক দুরবস্থা ও বৌদ্ধিক দুর্গতির কথা আমরা জানিতেই পারিতাম না। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা' যাঁহার আলোচ্য, দেশের শিক্ষার ইতিহাসের সেদিনকার কথাও তাঁহার অজ্ঞাত! লেখক বলেন,—'আমরা যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়ে তুলেছিলেম সেটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে। উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি। জাতীয় শিক্ষাকে আমরা সেদিন শিক্ষার দিক থেকে মোটেই দেখিনি—দেখেছিলেম সেটাকে পলিটিক্সের দিক থেকে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না সে অভাবটা আমরা সেদিন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করিনি; সেখান থেকে যে পলিটিক্স করা চলবে না—এইটে ছিল আমাদের জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সত্যকার ভিত্তিটা। * * * দ্বেষের ওপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা খাড়া করেছিলেম সেটা স্থায়ী হয়ে আমাদের সফলতা দান করতে পারল না। কৃতকার্য্য হবার যে রাস্তা—সেটা পরের ওপরে বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে নেই, সেটা আছে আপনজনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে। পরের উপরে দ্বেষে হয় মানুষের শক্তির বাজে খরচ; এক ভালবাসাই মানুষকে সক্ষম [সমর্থ?] করে গুরুভার বহন করতে।' উত্তেজনা যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ব্যর্থ, নিষ্ফল এবং সকল সঙ্কল্পের হন্তারক, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। উত্তেজনায় জগতে অনেক বড় কাজ হইয়াছে, এবং বিশ্ব এখনও অনেক বড় কাজের সাফল্যের জন্য 'উত্তেজনা'র প্রতীক্ষা করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশ্ববিপ্লব—ফরাসী বিদ্রোহ কি একটা 'উত্তেজনার ফল নয়? 'উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি'—এটাও সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা গ্র্যাজুয়েটে মনুষ্যত্বের দৈন্য আমরা তখন যেমন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি, আর কখনও তেমন করিয়াছি কি? 'পলিটিক্সের দিক থেকে'ও শিক্ষাকে দেখিবার সময় আসিয়াছে। 'পলিটিক্স' হাড়ী-ডোম নয়, শিক্ষার সঙ্গেও তার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিশেষতঃ, পরাধীন, বিজিত প্রজার শিক্ষা 'পলিটিক্সে'র নাগপাশে আদ্যোপান্ত বাঁধা। যে 'পলিটিক্স' আমাদের শিক্ষাকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিয়াছে, সে পলিটিক্সের অধিকৃত ক্ষেত্রে প্রজার পলিটিক্স যদি মাথা তুলিতে না পারে, তাহা হইলে, 'আপন জনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে' প্রবন্ধ 'লেখা যেতে পারে', কিন্তু সে শিক্ষা কখনও 'মানুষ'-প্রসূ হইবে না। যাঁহারা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ গড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই 'পরের উপর দ্বেষে মানুষের শক্তির বাজে খরচ' করিয়াছিলেন, লেখক-চক্রবর্ত্তীর এ উক্তি সর্ব্বথা উদ্ধত অসাধুতা ও অন্ত-

পরিচয়ে নিরেট অনভিজ্ঞতার ফল। লেখক অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিলে বুঝিবেন,—পলিটিক্সের ঝাঁজেই—আমাদের নয়, অন্য পক্ষের—জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অঙ্কুর ঝলসাইয়া গিয়াছে। লেখক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য কলম ধরিয়াছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়, এবং যে 'নীতি' সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই নীতি এ দেশে যেরূপ মানবের আবাদ করিয়াছে, সেরূপ মানবের দেশে পলিটিক্স কৃপা না করিলে কোনও শিক্ষাই বাঁচিতে পারে না, বাঁচে না, বাঁচিবে না। আমি চাই কেরাণী; আমি চাই 'ঐ জাতীয় উদার বংশ'। আমার শিক্ষার ব্যবস্থাও তদনুরূপ। আমি তাই আমড়া গাছের আবাদ করিয়াছি। তুমি আমার আমড়া-গাছে ল্যাংড়া পাইবার আশা করিতে পার না। প্রকৃত সমস্যাই এই। প্রেমের মহিমা, গৌরব, কবিত্ব আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু যে দেশে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়' পাঠ্যপুস্তক হইতে চিরনির্ব্বাসিত, সে দেশে শুধু প্রেমে মানুষ গড়িতে হইলে যে আত্মারাম সরকারের হাড় চাই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের ভাগাড়ে তাহার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ। ইকনমিক্সের সঙ্গেও 'সাধারণ শিক্ষা'র একটা সম্বন্ধ আছে। তাহাও 'জাতীয়-শিক্ষা'র প্রতিকূল। যে মানব-সমবায় লইয়া আমাদের সমাজ, তাহার সহিতও শিক্ষার সাফল্যের সম্বন্ধ আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রতিকূল।—এই মানব-সমবায়ের চূড়ামণিরা 'উত্তেজনা'র সময়ে না হইয়া, খুব ভাটার টানের সময়েও যদি কোনও প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা কখনই পালন করিতেন না। কারণ, গত দেড় শত বৎসরের পরবশতায়, আমাদের আত্মবশতার সমাধি হইয়া গিয়াছে। আত্মবশ না হইলে কোনও জাতি জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। জীবনীশক্তি হারাইলে জাতি বর্ত্তমানকেই সম্বল করে। অতীতে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের উপাদানে ভবিষ্যৎ গড়িতে পারে না। আপাতরম্য লাভে যে জাতির এমন প্রবল আগ্রহ, সে জাতি 'ভালবাসার ভিতর দিয়ে'ও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এই জন্য সেই পলিটিক্স আবশ্যক, যে পলিটিক্স এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিশ্চয়ই তাহার ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে, নতুবা দেশে এত আত্মদ্রোহী, এত জয়চাঁদ, উমিচাঁদ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর, এত বিনু, তিনু, সুরেন, নরেন, নকড়ি, ছকড়ি দেখিতে পাইতাম না। আদ্যোপান্ত প্রেমের ওড়োন-পাড়োন দিয়া বুনিলেও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের থান অমনই জেলেকাচায় পরিণত হইত; খাসা মলমল হইতে পারিত না। 'পরের উপর দ্বেষে'র সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যায়। 'পরের উপর দ্বেষ'টা যে অত্যন্ত মন্দ, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি, নীতিবোধেও তাহা পড়া গিয়াছে। অত বড় কটু বস্তুটার অবশ্যই আমরা সমর্থন করিব না। কিন্তু 'পরের প্রতি দ্বেষ' যেমন মন্দ, 'পরের প্রতি অতি-ভক্তি'ও তেমনই সাংঘাতিক। আপনার প্রতি অখণ্ড, অন্ধ, আত্মবিস্মৃত অনুরাগ চাই। তাহাতে পরের প্রতি অনুরাগের লেশমাত্র থাকিবে না। আগে আপনার প্রতি অনুরাগে সম্পূর্ণ—ষোল আনা সিদ্ধি, তাহার পর পরের প্রতি দ্বেষ বা অনুরাগের বিচার। যাহারা আত্মবশ, আপনাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সে বিচার শোভা পায়। যে পরের অনুরাগী, পরের অনুকারী, পরের দ্বারে ভিখারী, নিজস্বে বিরাগী, আত্মদম্ভে

অন্ধ, এবং আপাতলভ্য সুখ সুবিধার ক্রীতদাস, তাহাকে আত্মোপলব্ধির সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে আত্মস্থ হইতে হয়, আত্মপরিচয় করিতে হয়। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের সাধনাই তাহার কর্ত্তব্য। 'বিশ্বমানবতা' জাতি-পরিচয়ের রয়চাঁদ-প্রেমচাঁদ ; প্রথম ভাগের ক্লাস নহে। ছেলে ধরিবার আগে শিক্ষাক্ষেত্রেও কেউটে ধরিতে নাই। লেখক জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কল্পনাকে যত অধম ও নির্বুদ্ধি ভাবিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাকে ততটা 'নিরেট' কল্পনা করিবার হেতু নাই। যে ভাবের সমবায়ে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কল্পনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা 'পরের উপরে দ্বেষ' দূর করিবার চেষ্টা অপেক্ষা 'আপনার উপরে প্রেমে'র প্রতিষ্ঠাকে অধিকতর আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহা চক্রবর্ত্তী সমালোচকগণের বিচারে অপরাধ হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনীয়তার হিসাবে তখন অপরিহার্য্য হইয়াছিল, এমন মনে করিলেও নিশ্চয়ই কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না। 'আপনার প্রতি প্রবল অনুরাগে' অজ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতভাবে 'পরের উপরে দ্বেষ আসিয়া না পড়িতে পারে, এমন নয় ; কিন্তু সে শঙ্কায় 'আত্মনি প্রীতিশূন্য প্রিয়কার্য্যসাধনক' বন্ধ হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার কি এখনও সময় হয় নাই ? শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 'জ্ঞানদর্শনে'র সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন —'ইউরোপীয় অধ্যয়ন-পদ্ধতি প্রশস্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশী পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্যাই লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রাচীন দুরূহ গ্রন্থসমূহে কাহারো দন্তস্ফুটই হইবে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন মণিকাঞ্চনযোগ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপেই হউক, যতদিন ইহা ঘটিয়া না উঠিতেছে, ততদিন আমাদের এই স্বীয় পদ্ধতিকে অনুসরণ না করিলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। বর্ত্তমান সংস্কৃতপরীক্ষা আমাদিগকে এই দিকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এখনো কয়েকজন প্রগাঢ় পণ্ডিত দেখা যাইতেছেন, পরে কি দাঁড়াইবে ভাবনার বিষয়।' ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। সার-ডাক্তার সরস্বতীর কল্যাণে উপাধি-পরীক্ষা যে পথের পথিক হইয়াছে, এবং এ দেশের সমাজ পাণ্ডিত্য রক্ষায় যেরূপ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যেই তাহার ফল ফলিতেছে। এখন পদে পদে তীর্থ, কিন্তু রাখালদাসের মত দেবতা ত সে সকল তীর্থে নাই! পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে, কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মার জনতায় দেশ পরিপূর্ণ। যাঁহারা বাঙ্গালার মিথিলার গৌরব রাখিয়াছিলেন, এই সকল তীর্থে তাঁহাদের জ্ঞানের ধারা, পাণ্ডিত্যের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ইহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।—বাঙ্গালার বহু দৈন্য শোচনীয়—কিন্তু এ দৈন্য ? কোন্ ভাষায় ইহার মর্ম্মান্তিকতা প্রকাশ করিব? শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'জাতীয় শিক্ষা'ও চক্রবর্ত্তীর 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধের ছাঁচে ঢালা। ইনি লিখিয়াছেন,—'তখন আমরা চাহিয়াছিলাম জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে।' তাহা সত্য। আমরা তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, এখনও তাহাই চাহি। 'দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত' করিবার পথেই আজকাল বিদেশে শিক্ষা চলিতেছে। স্বাধীন দেশের মানুষ গড়িবার জন্যও যে ভাবের উদ্বোধন আবশ্যক, আমাদের পক্ষে তাহা কি অত্যন্ত আবশ্যক— অপরিহার্য্য নহে ? আমাদের শিক্ষায় 'দেশাত্মবোধ' জাগ্রত করিবার উপায় নাই, চেষ্টা নাই, উপাদান নাই ; তাই আমাদের শিক্ষা গড্ডলিকা-প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে, মানুষ গড়িতে পারিতেছে না, ইহা 'ধ্রুব সত্য' আগে মানুষ গড়, তাহার পর পদার্থতত্ত্ব, সার্ব্বভৌমিক

বিশ্বপ্রেমিকের অভিনয় করিও। শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্রের 'নূতন নক্ষত্র' আমরা সানন্দে পড়িয়াছি। লেখক 'সম্ভবতঃ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর রাত্রে নয় ঘটিকার সময়' এই 'নূতন নক্ষত্র'টি প্রথম দেখিয়াছিলেন। পর দিন তাঁহার সংশয়ভঞ্জন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি পরে যাহা করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে—বিজ্ঞানসম্মত পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হন নাই। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী সাধারণ বাঙ্গালা গল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 'রাঙর প্রেম' নামক গল্পটি লিখিয়াছেন, এবং নূতনের রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক নূতন দৃশ্যে গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, আমাদের প্রায় অজ্ঞাত গ্রাম্য-জীবনের পরিচয় দিয়াছেন ; এবং একটি প্রায়-অজ্ঞের মনের ছবি তুলিয়াছেন। বর্ণনায় স্বাভাবিকতার গৌরব প্রশংসনীয়। ভাষাটা গুরু চণ্ডালী, 'বাস্তব' গল্পের রচনায় পক্ষে যতটুকু আবশ্যক, তাঁহার প্রাদেশিকতা ও যথেচ্ছাচার তদপেক্ষা অনেক অধিক।—লেখক আর্টের হিসাবেও একটা বিষম অপরাধ করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তায় ও নাচুনে ছোকরার চিন্তায় কোনও প্রভেদ রক্ষা করেন নাই। যে পাত্রের মুখে যে কথা শোভা পায় না, যা সম্ভব নহে, তিনি তাহার মুখে সেই কথার আরোপ করিয়াছেন। যথা,—'যত দিন যায় বর্ত্তমানের মোহ একটু একটু করে ছোটে ; যে বড়জল জীবনের পাতাটাকে ঝাপ্‌সা করে রেখেছে, পুরোনো সব কথা তার নীচে থেকে ফুটে বেরোয়।' এ উচ্ছ্বাস সুধীরবাবুর পক্ষে স্বাভাবিক ; তিনি যাহার মুখে দিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার যোগ্য নহে ; তাহার পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে। আবার, "তার স্নেহসোহাগ সে দিন থেকেই দ্বিগুণিত করে সে ঢেলে দিচ্ছিল ; কিন্তু ঐ দুটি কড়া চোখের পাহারায়! তার বুকের কাছে শুতে এর পর আমার কেমন ভয় ভয় লাগ্‌ত, মনে হতো তার চোখদুটি অন্ধকারের ভেতর দিয়েও অনিমেষ হয়ে যেন আমাকে দেখ্‌চে। মাঝে মাঝে মনে হতো তার বুকটিতে করে সেদিনকার ঝড়কে, সেদিনকার নিবিড় কালো অন্ধকারকে সে যেন বয়ে নিয়ে এসেছে ; যত পালাই যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, আমার আকাশ সেদিনকার বর্ষার আকাশের স্মৃতিতে তেমনিতর কালো হয়েই থাক্‌বে।' লেখক ভাবের আতিশয্যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁর নাচুনে ছোক্‌রা এতটা কবিত্ব করিতে পারে না। এই রূপ অস্বাভাবিকতা ও আতিশয্য সাহিত্যে সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই গল্পটি শেষ হইয়াছে। তৃতীয়টি যেন প্রক্ষিপ্ত। উপসংহারে মা-বাপের কাহিনীতে রসের সঙ্গে একটু কষও আছে। সে যাহা হউক, গল্পটি উপভোগ্য বটে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু' যেন কোনও রকমে পিতৃরক্ষার ব্যবস্থা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'চির-ফাঁকা' নাম দিয়া একটি পদ্য লিখিয়াছেন—

'মনটা আমার ফাঁকা হয়ে হাওয়ার মত যাবে উড়ে,
খোলা বুকের দোলা পেয়ে থাক্‌বে বিশ্ব আকাশ জুড়ে।'

'চির-ফাঁকা'য় নিশ্চয়ই হাস্যরস আছে। এটা কি রস? আধ্যাত্মিক হইতে পারে, কিন্তু শেষ চরণটায় প্রারম্ভ? মনটা 'ফাঁকা হয়ে হাওয়ার মত উড়ে' না গেলে নিশ্চয়ই এমন কবিতা লেখা, অন্ততঃ ছাপানো সম্ভব নয়, তাহা বোধ করি বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমাদের

মাসিকগুলি কি ক্রমে ক্রমে ধলদা ও বহরমপুরের স্থান অধিকার করিবে? 'চ' বাক্যরকারীর 'বেলুচিস্থান' সুখপাঠ্য। ইঁহার একাক্ষর বাক্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-রচনা মনে পড়ে— 'জানই আমার সকল কাজ originality!' শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়ের 'বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে চরিত্র-বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবার 'ভারতশাসনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা' সমালোচিত হইয়াছে। পাকা মত। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। এই সমালোচনা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলে, এ সম্বন্ধে লোকমতের গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।

মালবাবুর কোর্টশিপ্।

(নক্‌সা)

১

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যোগিডিহি ষ্টেশনের মালগুদামের সম্মুখে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকের উপর শ্বেতাক্ষরে অঙ্কিত নিম্নলিখিত কথাগুলি সকলের দৃষ্টিগোচর হইত ;—

অটল বিশ্বাস !
মাল্‌বাবু (Goods Clerk)
(শ্রীহরি শরণং ১৯১৬ খ্রীঃ)

বর্ষার দৌরাত্ম্যে অক্ষরগুলির গোটাকতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা উদ্ধার করা সুকঠিন নহে। ইহার ইতিহাস বড় বাবুর নিকট যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গল্প।

২

অটল বিশ্বাস খুব সবলপ্রকৃতি যুবা। দেখিতে সুশ্রী। পূর্ব্বে নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, পরে কর্ম্মের বিপাকে এ দেশে আসিয়াছিল।

মালবাবুদিগের দৈন্যদশা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু অটল বাবুর পিতার জমীদারী ছিল। তৌজি নং— ফরিদপুর জেলা, রাজস্ব বার্ষিক ১০১৮৵০। সুতরাং অটল বাবুর চাক্‌রী কেবল সখের বলিলেও চলে। বাস্তবিকও তাহাই। অটল বাবুর পিতার বিশ্বাস যে, 'দেশ বিদেশ পর্য্যটন এবং চাক্‌রী না করিলে কেহ মানুষ হইতে পারে না। যত দিন চাক্‌রী করিতে শিখে নাই, তত দিন ভারতবর্ষের লোকের মনুষ্যত্ব জন্মে নাই। চাক্‌রী করিয়াই এখন মাথা তুলিতে শিখিয়াছে। বিশেষতঃ, চাক্‌রীর মধ্যে একটু কষ্ট আছে, সেটুকু তিক্তরসযুক্ত হইলেও পিত্তদমন ও বায়ুবর্দ্ধনকারক, অতএব রসায়ন।'

'বড় বড় লোক চাক্‌রী করিয়াই নামজাদা হইয়াছে। সুইডেনের চার্লস্, পোলাণ্ডের কসিয়স্কো, ইংলণ্ডের গ্লাড্‌ষ্টোন, ফরাসী দেশের রিস্‌লিউ ও নেপোলিয়ন, জার্ম্মাণীর বিস্‌মার্ক, আমেরিকার ওয়াশিংটন, ইতালীর গারিবল্ডি,

চীনদেশের লীহুং চাং, কে না চাকরী করিয়াছে? অনেকে চাকরীকে অধীনতা মনে করে, কিন্তু অধীনতা রহিলে 'ডিসিপ্লিন্' শিক্ষা হয় না। অধীনতা হইতেই স্বাধীনতা, যেমন ধান্য ফুটিয়া খই।'

রেলের চাকরী করিবার উদ্দেশ্য যে, 'ফ্রি পাশ' পাইয়া অটল দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবে; এমন কি, 'নিতান্ত ইচ্ছা হইলে একবার মেসোপোটেমিয়াতে যেতে পার', তাহাও পিতৃ-আজ্ঞা ছিল। অটলেরও একবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া 'হিপপটেমস্' দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

অটল বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে 'জয়েন্' করিবামাত্র বড় বাবু (ষ্টেশনমাষ্টার) এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অটল সৌখীন লোক। রাসভাণ্ডার ধুতি, হ্যাট, কোট, নেকটাই, ভাল 'বেডিং,' নেটের মশারি, 'ভিনোলিয়া' সোপ, সাতখানা আর্সি, বারখানা চিরুণী, এক ডজন ঘোষের মাকেসার, কুকার, এবং লক্ষ্ণৌএর ফর্সি ও আলবোলা প্রভৃতি সভ্যজগতের যত আধুনিক হিন্দু ও অহিন্দু সরঞ্জাম, তাহার এক প্রস্থ অটলের সঙ্গে ছিল। 'এ সব আপনাদেরই জন্য' ইহা বলাতে সকলের আহ্লাদ অপার হইয়া পড়িল। সকলে অটলের নিবাসে আসিয়া তামাক ও চা খাইয়া যাইত। অটলের নস্য গ্রহণ করা একটা দৈনিক অভ্যাস ছিল, নচেৎ অটলের মুখের শব্দ নাসিকা দিয়া বাহির হইত না।

অথচ অটলবাবু কর্ম্মে খুব সুদক্ষ। মালগুদামের কোনও খাতা বহিই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকিত না। দিনান্তে সমস্ত 'এন্ট্রি' তুলিয়া ও হিসাব মিলাইয়া সন্ধ্যাকালে অটল বাসায় আসিয়া নবেল লইয়া ইজিচেয়ারে বসিত। অটলের পূর্ব্বে যে সকল মালবাবু চাকরী করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিবাস অটলের পছন্দ না হওয়াতে, সে পানের টাকা দিয়া একটা 'বার্ণিংস্ক টাংলে'র বাংলা ভাড়া করিয়াছিল। অটলের পাছে কষ্ট হয় তাই অটলের পিতা, অটলের 'স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত' মাসে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিতেন। অটল পরিশ্রম করিয়া সব টাকারই জমা খরচ রাখিত। খরচ যতই হউক না কেন, সঠিক জমা খরচ রাখা অটলের অভ্যাস থাকাতে অনেক সময় কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও অটলের শান্তির লেশমাত্র হ্রাস হয় নাই।

অটলের উপর সকলেরই অটল বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তাহার বিশেষ কারণ, অটল চরিত্রবান্। যদিও মোটে পচিশ বৎসর বয়ঃক্রম, অটল বিবাহ

করে নাই। অটলের সে দিকে মনই যায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে 'মন যদি যায়', সেই জন্য অটল ভাল ভাল রঙ্গীন চিঠির কাগজ ও খাম, সুগন্ধিবিশিষ্ট ও পত্রপুষ্পাঙ্কিত করিয়া, একটা 'ক্যাস'-বাক্সের মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

অটলের একটু তবলা বাজাইবার সখ্‌ ছিল। অটলের গলা ছিল (সকলেরই থাকে), কিন্তু গলা কাঁপাইবার শক্তি ছিল না। গলা কাঁপিলে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত। কেবল এই দৌর্ব্বল্যটুকুর জন্য সে গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই। অটলের মাতা বলিতেন, 'বৌ আসিয়া গান করিবে, অটল বাজাইবে।' সেই কথা অটলের মনে লাগিয়াছিল। অটলের ওস্তাদ ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রসন্নবাবুর এক জন শিষ্য। কাওয়ালী, একতালা, মধ্যমান প্রভৃতির সুন্দর 'ঠেকা' ও 'বোল' অটলের জানা ছিল। কোনও গায়কের সন্ধান পাইলে অটল সযত্নে তাহাকে দুই তিন দিন গৃহে রাখিয়া তাহার সেবা করিত, এবং তাহার সঙ্গে 'সঙ্গত' করিয়া কৃতার্থ হইত।

বলা বাহুল্য, অটল সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িল।

বড় বাবুই যত্ন করিয়া অটলের গৃহের সম্মুখে উল্লিখিত 'প্লাকার্ড'খানি টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। 'যোগিডিহি' একটা প্রকাণ্ড কারবারের স্থান। অনেক মাল চালান হয়। কাজেই অনেকে অটল বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিত; ঐ তক্তাখানি দেখিয়া বাসা চিনিয়া লইত।

৩

জুন মাস। এ সময় যোগিডিহি রৌদ্রের তেজে ভয়ানক তপ্ত হইয়া পড়ে; কারণ, এক ক্রোশের মধ্যেই আশে পাশে অনেকগুলি পাহাড়। অটল বসিয়া মালের হিসাব করিতেছিল। পার্শ্বে কুলীদিগের সর্দার রামধন দাঁড়াইয়া অটলকে তালবৃন্ত দিয়া বাতাস করিতেছিল।

এমন সময় ৪০নং ডাউন প্যাসেঞ্জারে এক জন ভদ্রলোক ট্রেন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাণ্ড চশমা চোখে অটলের নামাঙ্কিত তক্তাখানি দেখিতে লাগিলেন। পরিধানে একখানা পাছাপেড়ে শাড়ী, মস্তকে টিকি ও গাত্রে একটা গেঞ্জির উপর 'ওপনব্রেষ্ট' আলপাকার কোট। দক্ষিণ হস্তে কানবিসের একটা ছিদ্রসংযুক্ত পুরাতন ব্যাগ ও বাম হস্তে ছাতা ও লাঠী। পদতলে চটীজুতা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রেলযাত্রীদিগের নির্দ্দিষ্ট শৌচাগারের দুর্গন্ধময় জলে তাহা ভিজিয়া যাওয়াতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। লোকটির চেহারা দেখিয়া খুব বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। বয়স প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। দাড়ি কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। মোটের মাথায় তাঁহার চেহারাখানি আনন্দজনক ও বিশ্বাসবর্দ্ধক।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেই তক্তাখানির দিকে চাহিয়া থাকাতে এক জন কুলী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি মাল্‌বাবুকে খুঁজ্‌ছেন ?'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'বোধ হয়।'

কুলী তাঁহাকে অটল বাবুর আপিসে লইয়া গেল।

অটল তাঁহার পরিধৃত পাছাপেড়ে শাড়ীর দিকে কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে ভদ্রলোক অতিশয় লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'সময়ের গুণে, ভায়া, সবই সময়ের গুণে। যখন ধুতি ছিল, অনবরত ময়লা করেছি, আর ধোপা ব্যাটা সোডা দিয়ে কেচে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে। এখন শেষদশায় অবলম্বন সহধর্ম্মিণীর বস্ত্র। তারই সঞ্চয়শীলতার গুণে এই দুই একখানা পাছাপেড়ে শাড়ী বেরুচ্ছে, নচেৎ পাঁচ টাকা তের আনা জোড়ার কাপড় কি আমরা কিন্‌তে পারি ? জগতে স্ত্রী ছাড়া আর বান্ধব কেহই নাই, কেহই নাই।'

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোক হুক্কা হস্তে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অটল স্বভাবজ সহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া ছল-ছল-নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রীবিয়োগ কত দিন হয়েছে ?'

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমার নাম নকুড় চাটুর্য্যে, আমার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। যত দূর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস, আমরা সমসাময়িক। বোধ হয়, আপনার ভ্রম হয়ে থাকবে। আপনার বিবাহ হয় নাই ?'

অটল। আজ্ঞে না।

নকুড় বাবু। ওঃ, তাই ! বিবাহ হ'লে আপনি কখনও এ কথা বলতে পারতেন না। স্ত্রীবিয়োগ হ'লে কি তার পাছাপেড়ে শাড়ী পরা সম্ভব ? ওটা যে মস্ত স্মরণচিহ্ন ! মনে কর্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 'বাসাংসি জীর্ণানি' মনে আছে ত ?

অটল। মাফ কর্‌বেন, আমি সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

নকুড় বাবু। আহা এমন নিরীহ ছেলে কোথাও দেখিনি।

তোমার নিবাস কোথায় ভায়া ?

অটল। ফরিদপুর। আমরা বিশ্বাসদের বংশ।

নকুড়। তা আমি দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। টুনু বিশ্বাসকে জান ত ?

তাঁর মেসমশায় আমার পিতার যজমান ছিলেন। কালক্রমে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে, কিন্তু সেটা অনিবার্য্য।

অটল। আপনি নস্য লইয়া থাকেন?

নকুড়। নস্য লই না, কিন্তু তামাক খাই। তাতে কি আসে যায়? ভগবান বলেছেন, সকল ধর্ম্মই নানা পথ দিয়ে তাঁরই চরণতলে মিলিত হয়। নাক ও মুখ দুটো পথই এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে। তা বোধ হয় জান?

অটল তৎক্ষণাৎ রামধনকে তামাক আনিতে বলিল। 'আমরা দু'জনেই ব্রাহ্মণ; তবে আপত্তি থাকে, আপনার হুঁকোতেই জল ফিরিয়ে দিতে পারি।'

অটল তৎক্ষণাৎ জল ফিরাইতে বলিল। তাহাতে নকুড় বাবু অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। অটলের কাণে সেটুকু গেল, এবং পায়ে তাল দিয়া দেখিল যে, আগন্তুক খুব লয়দোরস্ত।

তামাক খাওয়া শেষ হইলে অটল জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার খাওয়া হবে কোথায়?'

নকুড় বাবু। এই যোগিডিহির নিকটে এক জন ডাক্তার থাকেন, বোধ হয় তাঁকে জান। শ্রীনিবাস লাহিড়ী?

অটল। নাম শুনেছি। তিনি প্রাক্টিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। বোধ হয়, তাঁরা ব্রাহ্ম।

নকুড়। দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, তবে ধরণ ধারণ সেই রকম বটে। তাঁর মেয়ে সরলা 'মেডিকেল কলেজে' পড়ে। সরলার মাসী চোরবাগানে থাকেন, আমার বাসস্থানও সেইখানে। তিনিই একখানা শাড়ী সরলাকে পাঠিয়েছেন, ডাক্তার বাবুকে চিঠি দিয়েছেন। আমি গালার কারবার করি। এবার কলকেতায় লা'র দর চড়ে গিয়েছে। ইচ্ছা যে, এখান হ'তে কিছু কিনে মির্জাপুরে নিয়ে যাব।

অটল। আমি সুবিধা করে দে'ব। আমার হাতে অনেক কুঠিয়াল মজুত। কিন্তু আপনি দেখ্ছি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ডাক্তারের বাড়ী খাওয়া দাওয়ার সুবিধা হবে কি?

নকুড়। তবে যাই কোথা?

অটল। আমার অতিথি হয়ে থাকুন। আপনি কোনও কষ্ট পাবেন না। ভদ্রলোকের উপকার কর্‌তে পার্‌লে আমি কৃতার্থ হই।

৪

অটল আবার বলিল, 'আপনাকে ধ'রে রাখ্‌বার আর একটা বিশেষ মত্‌লব আছে। আমি তব্‌লা শিখ্‌ছি, একটু হার্ম্মোনিয়ম ও এস্রাজ বাজাতে পারি। আপনি যে গুণ্‌ গুণ্‌ করে গাচ্ছিলেন, সেটা যেন স্বভাবতঃ তালের সঙ্গে মিশেছিল। 'খুব কস্‌রৎ না থাক্‌লে এমন হয় না।'

নকুড় বাবু। সে অনেকদিনকার কথা। কল্‌কেতায় সকলেই একটু না একটু তালের সঙ্গে গায়। আমি মোরাদ আলির নিকট গান শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম, পরে তিনি ম'রে গেলে রম্‌জানের কাছে টপ্পা শিখি। কিন্তু কি জান ভায়া, হরিনামের কাছে কিছুই না, তাই রাম নিধিদের মত নিজেই গান রচনা করে' তাল বসিয়ে নিই। আমি শুনে বড় সুখী হ'লেম। সন্ধ্যা বেলায় দু'জনে বস'ব এখন। সমজদার আছে ত?

অটল। বড় বাবু বেশ বুঝেন। আর মির্জাপুরী দুই এক জন কালোয়াতও মধ্যে মধ্যে আসে। তার মধ্যে এক জন সেতার বাজায় ভাল। সে মস্ত মহাজন।

নকুড় বাবু অতিরিক্ত আনন্দসহকারে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং পাছে অহঙ্কার প্রবল হইয়া পড়ে, তন্নিবারণার্থ 'হরি' ধ্বনি করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জগতের মঙ্গলকামনা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শেষে বলিলেন, 'ভায়া, অনেক কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ হয়। ভগবানের সৃষ্টির মায়া যত বেশী, পালনের বেলা তত নয়, অতএব দিন দিন সংসার করিয়া দশ দিক রক্ষা করতে হয়। পালন করা বড় শক্ত কাজ। আমার মোটে দুটি ছেলে ও একটী মেয়ে, তাদের লালন পালন করতে ও বিবাহের খরচ যোগাড় করতে আমাকে অহরহঃ দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হ'চ্ছে। মনে কর, এই বিশ্ব পালন করতে গিয়ে ভগবানকে কি ভয়ানক ঘুরতে হয়। এত বন বন ক'রে ঘুরেন যে, সেই জন্য তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাইনে। কি লীলাই তাঁর।'

ইহা বলিয়া নকুড় বাবু চক্ষু উল্টাইয়া মুদ্রিত করিলেন। অটল ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিল। ইত্যবসরে বামন নকুড় বাবুর জন্য এক জোড়া উড়িয়ার চটী লইয়া আসিল।

নকুড়। পূর্ব্বজন্মে তপস্যা না করলে তোমার মত মহাজনের ঘরে অতিথি হওয়া ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান করুন, তুমি সুখী হও। আমি প্রাণপণে তার চেষ্টায় থাক্‌ব।

অটল ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পুলকিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং সাদরে তাঁহাকে গৃহে লইয়া অভ্যর্থনা করিল।

নকুড় বাবু একমনে গৃহের চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন; পরে ব্যাগ হইতে একখানা সাদা ধুতি লইয়া পরিধান করিলেন।

জলযোগ শেষ হইলে নকুড় বাবু বলিলেন, 'আমি একবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি; নচেৎ অন্যায় হয়। ঠিক সন্ধ্যার সময় আস্‌ব এখন। তুমি যদি পার, একটা তানপুরোর যোগাড় ক'রে রেখ। লোকজনকে আজ ডেকে কাজ নেই। গলা পরিষ্কার হয়ে গেলে কাল্ তাদের শোনাব।'

অটল। বেশ, তাই হবে।

নকুড় বাবু। আচ্ছা, এখন আসি। তোমার সৌজন্য ও আতিথ্যসৎকার অত বাড়িও না, আমি তাতে লজ্জিত হই। তোমার গৌরব বাড়ে, কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতার উপর হানা পড়ে, আমি গরীব, এ ঋণ পরিশোধ করতে পারব না জান?

অটলের চক্ষুতে জল আসিল। তাহা দেখিয়া নকুড় বাবু প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া অটল এস্রাজে দেশ রাগিণী আলাপ করিতেছিল। অল্প একটু মেঘলা হইয়া বৃষ্টি পড়িয়া গিয়াছে। অন্য দিন অপেক্ষা আজ অনেকটা স্নিগ্ধ ও শীতল। অটল তন্ময় হইয়া বাজাইতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা।

এমন সময় নকুড় বাবু ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন।

অটল চট্ করিয়া এস্রাজটি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, দ্বার খুলিয়া দিল। নকুড় বাবুর সঙ্গে আরও দুইটি লোক ছিল, এক জন বৃদ্ধ ও আর একটী যুবতী অটল অপ্রতিভের ন্যায় তাকাইতে লাগিল।

নকুড় বাবু বলিলেন, 'এঁদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিই। ইনিই ডাক্তা লাহিড়া মহাশয়, এবং ইনি তাঁহার কন্যা সরলা দেবী।

অটল করযোড়ে নমস্কার করিল, তাহাতে ডাক্তার মহাশয় আশীর্ব্বা করিলেন, এবং সরলা দেবীও অটলের মত নমস্কার করিল।

নকুড় বাবু হর্ষচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'বেশ! এঁরা অনেকক্ষণ ধ'রে বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার এস্রাজ শুন্‌ছিলেন।'

অটল লজ্জায় অধীর হইয়া বলিল, 'আপনারা না জানি কতই বিরক্ত হয়েছেন। আমি কেবল শিখ্‌ছি মাত্র।'

ডাক্তার। আমি যদিও রাগ রাগিণী বুঝিনে, কিন্তু সরলা, একটু গান গায়িতে পারে, তার চমৎকার লেগেছিল।

সরলা বলিল, 'খুব মিষ্টি হাত। এমন চমৎকার আলাপ আমি খুব কম শুনেছি।'

সরলার মুখে প্রশংসা শুনিয়া অটলের ভয় হইল। অটল প্রথমে মনে করিল, 'নিশ্চয় আমাকে ঠাট্টা কচ্ছে'ন' কিন্তু সরলার সরল মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা মনে লাগিল না।

অটল। আমার ওস্তাদ গয়ার কানাইলাল চৌঁফ্রির এক জন সাগ্‌রেদ। তিনি ঢাকায় থাকেন। তাঁর বাজনার ঢং বড় চমৎকার।

সরলা বলিল, 'শুন্‌লে দুঃখ হয়।' অটল মনে মনে ভাবিল, 'এর মানে কি? দুঃখ হবে কেন? তবে কি সত্য সত্যই ঠাট্টা?'

৫

অটল বলিল, 'আপনারা একটু বস্‌বেন না?' সরলা পিতাকে বলিল, 'একটু ষ্টেশনের দিকে বেড়িয়ে আসি।' তাহাতে অটল সকলকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেল।

মালগুদামের সম্মুখে অটল বাবুর নামাঙ্কিত তক্তা দেখিয়া সরলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা আপনারই ঠিকানা?' ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'আগে আমি এটা লক্ষ্য করে দেখিনি। এটা একটু নূতন ধরণের।'

অটলের ভীতি ক্রমান্বয়ে প্রবল ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অটল শুষ্কমুখে বলিল, 'বড় বাবুর ইচ্ছাতে এটা হয়েছে। আমি বলেছিলুম যে, এটা কিম্ভূতকিমাকার, তা তিনি শুন্‌লেন না।'

ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। আমার বাড়ীর সম্মুখেও একখানা তক্তা আছে, তবে তাতে 'শ্রীহরি শরণং' টুকু নাই। আমার বোধ হয় এতে আরও সুন্দর হয়েছে।'

নকুড় বাবু। এটা ঐতিহাসিক রকম। এই রকম জিনিস লোপ পায় না। অশোক নিজের প্রস্তরস্তম্ভে ঐ রকম কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। সবই লোপ পায়, কিন্তু হরিনাম লোপ পায় না, আর সেই নামের সঙ্গে যে নাম থাকে, সে নামটিও ইতিহাসে থেকে যায়।

কথা শুনিয়া অটলের নস্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে বেয়াদবী হয়, ইহা মনে করিয়া নস্যের কৌটা বাহির করিয়া আবার পকেটে

রাখিয়া দিল। ডাক্তার বাবু আড়নয়নে তাহা দেখিয়া খুসী হইলেন। নকুড় বাবু বলিলেন, 'বেশ্।'

ইত্যবসরে সরলা মালগুদামের সম্মুখের স্তূপাকার মালের বস্তাগুলি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কি?'

অটল। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে। লা', আলু, লবণ, ডাইল, অনেক রকম মশ্লা, আর ঐ বাক্সগুলোতে ঘি, ও তেলের টিন, কোনটাতে মণিহারী দোকানের জিনিস। দিনান্তে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি 'ওয়াগন্' আসে, তার মধ্যে কয়লাই বেশী। এর সবগুলোর হিসাব আমাকে লিখ্‌তে হয়, দেরী হ'লে 'ডিমরেজে'র হিসাব কর্ত্তে হয়। একটু গোলমাল হবার যো নাই। এ ত কেবল আমদানী। রপ্তানীর সময় আরও হাঙ্গামা। অনেক গরীব লোক আসে, তারা 'ডিমরেজে'র কথা শুন্‌লে কেঁদে ফেলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটু বিশ্রামের সময় থাকে না।

সরলা। শুন্‌লে দুঃখ হয়। আমি খাতা পত্র দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। আমাদের কলেজে যত রোগীর চিকিৎসা হয়, তাদের কথা খাতায় 'নোট্' করা থাকে। অনেকে বাঁচে না, তাদের স্ত্রী পুত্র এসে কাঁদে, আমরা খাতা দেখ্‌লেই সব বুঝ্‌তে পারি। তখন বড় দুঃখ হয়।

অটল ভাবিল, 'এঁর বুক একটা মালগুদামের মত দুঃখে ভরা।'

নকুড় বাবু। দিদিমণি! তার কি সন্দেহ আছে? তোমার দিদিমা (নকুড় বাবুর স্ত্রী) যে খাতাগুলি রাখেন, সেগুলি আমি মধ্যে মধ্যে পড়ি। কত বচ্ছরের খাতা আছে, তার সংখ্যা নাই। কোনটাতেই তারিখ পাওয়া যায় না, অথচ ধোপার কাপড়ের সংখ্যা, বাজারখরচ, ওষুধের দাম, জনার্দ্দন স্যাকরার দেনা, প্রত্যেকের উপর চোখ পড়লেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। গিন্নীর খাতা অনেকটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত। পরিবারের নাড়ী নক্ষত্র, এমন কি, দেশের অবস্থাও তার মধ্যে বুঝা যায়।

সরলা হাসিল। অটল মনে করিল, কি অপূর্ব্ব মিষ্ট হাসি! সরলা দেখিতে যে [illegible] তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য হাসিতে ও কথাতে [illegible] পাইত। সরলার কথা আরও শুনিবার জন্য অটল ব্যগ্র হইয়া পাড়ল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সরলা একেবারে কথা বন্ধ করিয়া বলিল, 'আমরা এখন যাই।'

এমন সময় বড়বাবু (ষ্টেশনমাষ্টার) সেখানে উপস্থিত হইয়া, লাহিড়ী

মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, আমাদের বাড়ী একবার যেতে হবে। আমার মেয়েটার ভয়ানক হাত কেটে গেছে।'

বড় বাবুর সঙ্গে ডাক্তারের অনেক দিনের পরিচয়। সরলাও বড় বাবুকে জানিত। অনেক দিন গাড়ীতে ভিড় হইলে, বড় বাবু তাঁহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। ইহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়া গিয়াছিল। সরলা যদিও বড় বাবুর বাটীতে যায় নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যার অসুখ শুনিয়া তাহার যাইতে ইচ্ছা হইল।

বড় বাবুর কন্যা মনোরমা খুব ছোট নয়। বিবাহযোগ্যা বলিলেও চলে। খুব সুন্দরী, তায় সন্দেহ নাই। প্রবাদ যে, অটল বাবুর সঙ্গে মনোরমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল।

অটল বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল না, তাহাতে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অটল বাবু কোথায় গেলেন?'

নকুড় বাবু বলিলেন, 'অটলের একটু লজ্জা বেশী। ঐ মেয়েটির সঙ্গে অটল বাবুর বিবাহের প্রস্তাব হচ্ছে।'

মনোরমা শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "না!"

তাহাতে সকলে একটু হাসিলেন। সরলা বলিল, 'দিব্বি মেয়েটি, অটল বাবুর সঙ্গে বেশ মানাবে।'

এই প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সরলা মনোরমার অঙ্গুলি পরীক্ষা করিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'বেশী কাটে নাই, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেই চলবে।' সরলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। ক্রমে মনোরমার সঙ্গে সরলার খুব ভাব হইয়া গেল।

মনোরমা। তুমি আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে এস।

সরলা ভাবগতিকে বুঝিতে পারিল যে, মনোরমার মা নাই। বালিকার যত্ন করিবার কেহই ছিল না। ইতস্ততঃ চাহিয়া সরলা বলিল, "আচ্ছা।"

৬

নকুড় বাবু গাহিতেছিলেন; অটল বাজাইতেছিল।

শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া বাহবা দিতে লাগিল। অটল প্রাণপণে এবং অতি সাবধানে বাজাইল। খেয়াল, টপ্পা, কোনটারই 'ঠেকা'য় একবারও হটিল না। নকুড় বাবু বলিলেন, 'সাবাস!'

সকলে চলিয়া গেলে অটল নকুড় বাবুর পদধূলি লইয়া বলিল, 'আপনার কৃপায় বোধ হয় আমার কোন ভুলও হয় নাই।'

নকুড়। মোটেই না। ভায়া, তোমার মত 'তরিবৎ' ছেলে পাওয়া দুষ্কর। একটা কথা বলি, তোমার যেমন দস্তুরমত দোরস্ত হাত, শীঘ্র দারপরিগ্রহ করা উচিত।

অটল লজ্জায় মুখ অবনত করাতে নকুড় বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এতে আর লজ্জা কি, তুমি পুরুষ মানুষ। আমাকে সব মনের কথা খুলে বল। অবশ্য, তুমি এক জন সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাও—তাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, সকলেই চায়, কিন্তু সকলের কপালে জুটে উঠে না। তোমার অদৃষ্ট ভাল, বড় বাবুর মেয়েটি খুব সুন্দরী।'

অটলের সাহস ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে সে বলিল, 'ও ভাল লেখা পড়া জানে না, গান জানে না।'

নকুড় বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিলেন, এবং বলিলেন, 'বেশ! মনে কর, আমাদের সরলা খুব লেখা পড়া জানে, গানের ওস্তাদ। উঁহাকে মনে ধরিবে কি?'

অটল। আমাকে উনি পছন্দ কর্‌বেন্ কেন? ও রকম আশা করা বৃথা।

নকুড়। আশার সঞ্চার হতে কতক্ষণ? একবার পরখ করে নিলেই হয়। কোর্টশিপের কথা শুনেছ ত? আমাদের দেশে এটা ক্রমে বিলক্ষণ প্রচারিত হবে, এবং মানব-চরিত্র তাতে ক্রমে ফুটে উঠবে। প্রেম সম্বন্ধে আমরা এখনও জড় পদার্থের মত। কেবল ঘটকালীর উপর নির্ভর!

অটল। কি ক'রে তা সম্ভব হয়?

নকুড়। আরম্ভ ক'রে দেখ। এ সম্বন্ধে ডাক্তার বাবু তাঁর কন্যাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন তোমার হাতযশ।

অটলের মনে নকুড় বাবুর সুন্দর প্রস্তাবনা গাঁথিয়া গেল। সে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল। উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। আহারান্তে অটল বলিল, 'নকুড়দা, আমি এ বিষয়ে বড় বেয়াকুফ, কি বল্‌তে কি বলে ফেলব, তিনি চ'টে যাবেন।'

নকুড়। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের, এমন কি, ভগবানেরও বেয়াকুফের দিকেই টান বেশী হয়। এ সম্বন্ধে কোনও শিক্ষার দরকার নাই। প্রাণের কথা খুলে বল্‌বে, তাতে যা কপালে থাকে, তাই হবে। এই যে তবলার বোল্ শিখেছিলে, তা কি গোড়াতেই লয়ে বাজাতে পারতে? ক্রমে হাত খুলে যায়।

রাত্রিকালে অটলের নিদ্রা হইল না। ক্রমাগত কোর্টশিপের কথা চিন্তা

করিয়া মাথা গরম হইয়া গেল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া একবার তবলাতে চাঁটী মারিল, একবার এস্রাজ লইয়া দুই একটা 'মিড়' টানিয়া লইল। নকুড় বাবু শয্যায় শয়ান হইয়া নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শেষরাত্রিতে অটল যোড়করে অন্তরীক্ষে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিল, 'হে অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের সহায়! আমার বুদ্ধি নাই, তবে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনি সহায় হউন! আর গতি নাই।'

নিদ্রা হইতে উঠিতে অটলের বেলা আটটা বাজিয়াছিল। সে দিন খুব মনোযোগের সহিত খাতাপত্র লিখিয়া সন্ধ্যাকালে নকুড় বাবুকে বলিল, 'নকুড়দা! আমাকে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে নিয়ে চলুন।'

নকুড় বাবু বলিলেন, 'বেশ।'

ডাক্তার বাবুর বাটী প্রায় এক মাইল দূরে। ডাক্তার বাবু 'ইজিচেয়ারে' বিশ্রাম করিতেছিলেন, এবং সরলা একটা হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে গান গায়িতেছিল।

নকুড় বাবু দূর হইতেই বলিলেন, 'শুনতে পাচ্ছ ত?'

অটল। চমৎকার।

নকুড়। হঠাৎ কোনও জিনিসে মতামত-প্রকাশ ঠিক নয়। সরলার গান গাওয়া খুব অভ্যাস, কিন্তু তাল ঠিক হয় না।

অটলকে দেখিয়া সরলা গান থামাইয়া দিল। নকুড় বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'চলুক, এতে আর লজ্জা কি?' ডাক্তার বাবু উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, 'চলবে বৈ কি। সরলার গানের বাতিক খুব। ওর লজ্জা টজ্জা বড় নাই।'

নকুড় বাবু। তবে অটল ভায়া লয়দার লোক, সরলা এখন তালে গাইতে শিখে নাই, সেই জন্য একটু ইতস্ততঃ হ'তে পারে। কি বল দিদিমণি?

সরলা। আমি এ পর্য্যন্ত তাল কি বুঝতে পারলুম না। যদি কেউ বুঝিয়ে দেয়, তবে—

অটল। তাল অতি সোজা ব্যাপার—এই যেমন কাওয়ালী। 'তাধিন্ ধিন্, তাধিন্ ধিন্, তান ধিন্, তাব এই ফাঁক', ইহা বলিয়া অটল দক্ষিণ করতল বিস্তার করিয়া ফাঁকের ঘর দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, শক্ত তালেরও লয় বেশী কিছু না, যেমন মনে করুন সুরফাক্তা—'ধা দেড়ে নাক দি, দেড়ে নাক গদি দেড়ে নাক।' অভ্যাস, কেবল অভ্যাস। আপনি গাচ্ছিলেন—

'ঐ দেখা যায় আনন্দধাম—'

ওটা তেওরা। তেওরা ধামারের অর্দ্ধেক মাত্রা। ধামারটা একটু কঠিন, কিন্তু তেওরার দুনো কষে ফেল্লেই ল্যাঠা চুকে যায়। ইহা বলিয়া অটল তুড়ি দিয়া তেওরার তাল দেখাইতে লাগিল।

নকুড় বাবু। আচ্ছা, তুমি আবার গান ধর, অটল তুড়ি দিয়া দেখুক।

সরলা। ওটা দুঃখের গান। তালের শব্দ হলে মন কেমন করবে।

নকুড় বাবু। তা করুক্ না। এই যে আমাদের নিমতলা নিয়ে যাবার সময় সকলে তালে তালে পা ফেলে যায়। জীব জন্তু সব তালের ভক্ত, বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষ মরণের সময়ই তালের চর্চ্চা বেশী করেছিল। কোনও নতুন প্রস্তাব হলেই তারা তাল বেঁধে দেখে, যদি তালে না মেলে, তবে টেঁকে না।

সকলের উৎসাহ দেখিয়া সরলা বলিল, 'আচ্ছা, আমি ওঁর সঙ্গে তালে গাইতে চেষ্টা করব।'

৭

সরলার শুশ্রূষায় ও ঔষধে মনোরমার হাত ভাল হইয়া গেল, কিন্তু সেই হাত কাটার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস ছিল, তাহার দাগ মুছিয়া যায় নাই। মনোরমা লুকাইয়া অটলের জানালার পার্শ্বে এস্রাজ শুনিতে গিয়াছিল, তাহাতে অটল বলিয়াছিল, 'মনোরমা, এস।' ইহাতে মনোরমা দৌড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, এবং রেলের লাইনের তার বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। হস্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত বাহির হইলে মনোরমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, 'আর অটল বাবুর বাড়ীর দিকে যাব না।' অটলের ইচ্ছা হইয়াছিল, মনোরমাকে তুলিয়া লইয়া আসে, কিন্তু মনের সাধ মনেতেই ছিল। কারণ, অনেক লোকের সম্মুখে সেটা লজ্জাকর ব্যাপার!

তাই অটল গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় করুণস্বরে আবার এস্রাজ বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় সরলা, ডাক্তার বাবু ও নকুড় বাবু সকলে—সন্ধ্যাকালে—আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই গোপনীয় ঘটনাটুকুর সন্ধান সরলা মনোরমার নিকট বাহির করিয়া লইয়াছিল। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু বুদ্ধিমতী সরলার নিকট তাহা সঙ্গীন। ক্রমে সরলা অর্থহীন ভাঙ্গা কথায় মনোরমাকে অনেক নূতন ও পুরাতন ঘটনা বলিত, এবং তাহার মধ্যে সরলা খরজের তারের মত একটা সুর পাইত। সেটা মধ্যে মধ্যে সম্বাদী সুর দিয়া ধ্বনিত করিয়া সরলা দেখিতে পাইয়াছিল যে, মনোরমা সেই সুর অবলম্বন করিয়া অটলের হৃদয়ের অনেকটা নিকটে গিয়াছে।

তাই সরলা কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না। সে মধ্যে মধ্যে দিনের বেলা মনোরমাকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া গান শিখাইত। ক্রমে উভয়ের গলার সুরের মধ্যে কোনও পার্থক্য কেহ বুঝিতে পারিত না। এমন কি, এক দিন নকুড় বাবু দূর হইতে মনোরমার গান শুনিয়া সরলারই গান মনে করিয়াছিলেন।

এ সংবাদটা অটল বাবুকে কেহ দেয় নাই। দিবাভাগে অটল মালগুদামের হিসাব লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে গিয়া সরলার তাল 'দোরস্ত' করিয়া দিত।

সে দিন কিন্তু অটল একটু সকালে হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটীর দিকে গেল। মনোরমা সরলার হার্ম্মোনিয়ম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছিল। দূর হইতে অটল তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং একটা আম্র বৃক্ষের নীচে বসিয়া নস্য লইতে লাগিল।

সরলা মনোরমাকে গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল। অটল সরলাকে দেখিয়া বলিল, 'আপনার গলা দূর থেকে আজ আমার এত মিষ্টি লেগেছে যে, আমি এখানেই বসে পড়েছি।'

সরলা। আজ থেকে আমি দূরেই থাকব।

অটল। না। আমার ইচ্ছা আপনি খুব নিকটে থাকেন। বোধ হয়, বুঝতে পেরেছিলেন, নয় ত দৌড়ে আসবেন কেন?

অটল মনে করিল, কথাগুলি খুব প্রণয়ব্যঞ্জক হইয়াছে, অতএব অতিশয় লজ্জিত হইল।

সরলা। আপনি পাছে মূর্চ্ছা যান সেই ভয়ে।

এই কথার সঙ্গে এমন একটা ভাব ছিল, যাহাতে অটলের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। কেবল সাহস নয়, অনেকটা আশারও সূত্রপাত বলিয়া বোধ হইল। অটলের মাথার মধ্যে যাহা ঘুরিতেছিল, তাহার গতি অতিশয় ক্ষিপ্র হইয়া পড়িল। অন্য কেহ হইলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত, কিন্তু অটলের মাথা ঘোরার ব্যায়রাম ছিল না; বিশেষতঃ, মালগুদামের খাতা পত্রের কূট হিসাব প্রত্যহ অভ্যস্ত থাকাতে তাহার মস্তিষ্ক সাধারণ প্রণয়ী অপেক্ষা অনেক সবল ছিল।

সুতরাং অটল হঠাৎ বৃক্ষতলে দাঁড়াইল, এবং স্বীয় উত্তরীয় স্কন্ধ হইতে লইয়া মাথায় পঞ্জাবীদিগের ন্যায় একটা পাগড়ী বাঁধিল। কিয়ৎক্ষণ পায়চারী করিয়া

অটল বলিল, 'আজ অনেকগুলো কথা মন থেকে মুখের মধ্যে ছুট্‌ছে, আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত বলি।'

সরলা মনে মনে ভাবিল যে, কথাগুলি নিশ্চয় মনোরমার সম্বন্ধে। তাই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মনের কথা আমাকে বলিবেন, সে ত আমার অনেক স্পর্দ্ধার ও গৌরবের বিষয়।'

অটল। সে সব কথা ভালবাসার কথা, প্রণয়ের কথা। ভালবাসার কথা মুখে বলা বড় শক্ত, তাতে অনেক সময় এত হৃৎকম্প হয়ে পড়ে যে, কথাগুলো লজ্জাকর, এমন কি—

সরলা। যে নিজে প্রণয়িনীকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারে না, সে অন্য কোনও লোক দিয়ে কিংবা চিঠি লিখে চেষ্টা করতে পারে। কেউ কেউ চিঠি লেখার চেয়ে প্রণয়িনীর কোনও সখী কিংবা বন্ধুকে কথাগুলো ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে থাকেন, এমন শুনেছি।

অটল। সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে। প্রথমে আমার জিজ্ঞাস্য যে, বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? আপনি বোধ হয় দুটো একটা কোর্টশিপ্‌ দেখেছেন?

সরলা। ঠিক দেখি নাই, তবে শুনেছি।

অটল। আমি ত নভেলে পড়েছি মাত্র, তবে আমার বোধ হয়, যদি কোনও লোক গান আরম্ভ করে, এবং আর একটা লোক মনে মনে তার তাল খুঁজে বেড়ায়, এবং সেইটে নির্ণয় করবার জন্য ইতস্ততঃ অনেক রকম চেষ্টা করে' দেখে, কোর্টশিপ সম্ভবতঃ অনেকটা সেই রকম।

সরলা। খুব সম্ভব। কিন্তু যেমন একটা লোক হঠাৎ গান আরম্ভ করলে তার তাল ঠিক করা শক্ত, এমন কি, তার মধ্যে তাল আছে কি না, বোঝা যায় না, সেই রকম এটারও মধ্যে। সেই জন্য গায়কেরা বলে, 'আপনি তাল আরম্ভ করুন, আমি ধরে নেব অখন।'

অটল। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন। সেই জন্য আপনার পরামর্শ না নিয়ে আমি মনের কথা বল্‌ব না। আপনি প্রথমতঃ ভেবে দেখুন যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়টুকু বরাবর থাকে না কেন?

৮

সরলা। স্বামী নিজের ধান্দায় থাকে, তারই সঙ্গে প্রণয়টুকুও চলে' যায়। স্ত্রীকে কেবল খেটে মর্‌তে হয়।

অটল। মনে করুন, যদি আমি ধোপার হিসাবপত্র রাখি, বাজার-খরচটুকু বিশেষ রকম সাবধানে চালাই, ছেলেপুলেদের অহরহঃ যত্ন করি, আর স্ত্রীকে তার মনের মত যা খুসী তা করতে দিই, তা হলে প্রণয়টুকু বজায় থাকে কি না?

সরলা। খুব সম্ভব। আর একটা কথা, কিছু লুকিয়ে রাখা ভাল নয়।

অটল। আমি প্রথম প্রথম মালগুদামের টাকা চুরী করতে ছাড়তুম না। কেউ টের পেত না, কিন্তু ভগবানকে ত লুকানো মুস্কিল, তাই ভয়ে ছেড়ে দিইছি।

সরলা। শুনে দুঃখ হয়। আমার এক জন বন্ধু ছিল, সে মড়া কাটতে ভালবাসত। বিয়ে হবার পর সে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে স্বামীর কান্ কাটতে গিয়েছিল, শেষে ভয়ে কলেজ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

অটল। আপনি কি মড়া কাটেন?

সরলা। তা না হলে ডাক্তারী শিখ্ব কি করে? মনে করুন, ভবিষ্যতে এই করে' অন্ন সঞ্চয় করতে হবে। আমার ঘরে একটা মানুষের কঙ্কাল আছে। যখন সে জীয়ন্ত ছিল, স্ত্রীর উপর সন্দেহ করে' একটা লোককে খুন করেছিল, তার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করে। তার মাথাটা দেখ্লে বোধ হয়, যেন সে একটা দিগ্গজ পণ্ডিত, কিন্তু মানুষের কি পরিণাম।

অটল। আমার ও সব গোলমাল কিছু নেই। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী; আমার স্ত্রী যদি উকীল, কিংবা ডাক্তার, কিংবা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্চেয়ারম্যান্ হয়, তবে আমি খুব খুসী হই।

অটল ইহা বলিয়া খুব লজ্জিত হইল। মনে করিল, সরলা এবার তার মনের ভাব অনেকটা বুঝিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সরলার প্রেমের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যত দূর, অটলেরও সেই রকম। সরলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—'স্ত্রী যদি স্বাধীনতা না চায়, তবে জোর করিয়া তাহাকে ঐ সব ব্যবসায়ে নিযুক্ত করবার কোনও দরকার দেখা যায় না। যারা কোনও ব্যবসা অবলম্বন করে, তাদের মধ্যে অনেকে কুমারীই থাকে। বিলাতে এ রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।'

অটল। আপনার বোধ হয় সে রকম বিশেষ কোনও ইচ্ছা নাই।

সরলা। আপনার সে কথা জেনে দরকার কি?

অটল। আমার বিশেষ দরকার আছে। মনে করুন, আপনি যদি

আমার জন্য একটি পাত্রীর চেষ্টা করেন, তবে আপনার জন্য একটা পাত্র চেষ্টা করা সম্বন্ধে আমারও দাবী দাওয়া থাক্‌তে পারে। বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক সময় হয়।

সরলা মুখ নত করিয়া রহিল।

অটল। মনে করুন, আপনি যদি আমার জন্য পাত্রী খুঁজিয়া না পান, আমিও আপনাকে বিরক্ত করিব না।

সরলা। আমার জন্য আপনার পাত্র খুঁজ্‌তে হবে না। আমি চিরকালই 'সার্জ্জারী' কর্‌ব, ওসুধ দেব, চিকিৎসার জন্য ঘুরে বেড়াব।

অটল। যা খুসী করুন না, আপনার স্বামীই আপনার এক জন 'পেশেণ্ট' হ'তে পারে। চিররুগ্ন একটা স্বামী থাক্‌লে তাকে রোজ ওষুধ দিতে পারেন, হাত পা কেটে দিতে পারেন। এমন একটা মস্ত 'একস্‌পেরিমেণ্টে'র ক্ষেত্র আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তার হ'তে গেলে প্রথমে দুটো একটা রোগীকে মারতে হয়, সে ধাক্কাটা স্বামীর উপর দিয়ে চালিয়ে নিলে মহাপুণ্য।

সরলা। আপনি আশ্চর্য্য রকমের লোক।

অটল। আমি এক জন বদ্ধ রোগী। মশার কামড় পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌তে পারি না। খিদে একেবারে হয় না। অনিদ্রা প্রত্যহ। দিন রাত্তির নস্য নেওয়া সত্ত্বেও মাথা ধরা ছাড়ে না। এত রোগ সত্ত্বেও আমি মেসোপোটেমিয়ার রেলওয়ের 'ষ্টোরকিপার্‌' হয়ে যাব ঠিক্‌ করেছি। যদি সেখানে হাত পা কাটা পড়ে, তবে এক জন 'নার্সে'র দরকার। এই সব ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে শেষে দারপরিগ্রহ কর্‌ব মনে করেছি, নচেৎ আর কোনও গতি নাই। আরও ভেবে দেখেছি, আমার এই রোগ উত্তরোত্তর বাড়্‌তে থাক্‌বে, তাতে ডাক্তার ভিন্ন গতি নেই। আমার বাপের মস্ত বিষয় আছে, সেটা বাজে কতকগুলো ডাক্তারের হাতে বিলিয়ে না দিয়ে, একেবারে স্ত্রীর নামে লিখে দেব—মনে করেছি। সেই চিকিৎসাপত্র কর্‌বে। বাঁচি মরি তার হাতে। অন্য ডাক্তারকে ডাকব না, সঙ্কল্প। এর উপরন্তু যদি সে আমাকে ভালবাসে তবে সোনায় সোহাগা।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অটল কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় নস্য লইল, এবং খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইল, এবং তথা হইতে ঘুরিয়া আবার বৃক্ষতলে আসিল, কিন্তু ভয়ে সরলার দিকে তাকাইয়া দেখিল না; কারণ, এবার অটল মনে করিয়াছিল যে, সরলা তাহার মনের কথা ঠিক্‌ বুঝিবে, এবং সরলাও তাহার মনের কথা বলিবে।

৩

কিন্তু সরলা তাহার মনের কথা বলিল না, সে দ্রুতগতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া গেল। অটল তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'সরলা! আমার উপর রাগ করিও না।'

সরলা হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল 'না', কিন্তু চলিয়া গেল। অটল অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি। সেটা যেন মনে থাকে।'

৯

অটল মালগুদামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, নকুড় বাবু তাহার জন্যে বসিয়া আছেন। নকুড় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভায়া! খবর কি?'

অটল। 'খুব সক্‌সেস্‌ফুল্‌'। আমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, ডাক্তার ছাড়া আমি বিবাহ কর্‌ব না। তবে ভালবাসার কথাটা সে চ'লে যাবার সময় চেঁচিয়ে ব'লে দিইছি। ভালবাসার কথা হঠাৎ কোনও স্ত্রীলোককে ব'লে ফেলা আমার মতে ঠিক নয়। সে কেঁদে ফেল্‌তে পারে, কিংবা মূর্চ্ছা যেতে পারে। আমি সে রকম দেখ্‌লে বড় ভয় পাই। যা হয় সে ঘরে গিয়ে কর্‌বে।

নকুড় বাবু ইহাতে খুব প্রীত হইয়া বলিলেন, 'মন্দ হয় নাই, তবে ভালবাসার কথা প্রথম দিন না বল্‌লে ভাল হ'ত। এতে আমার বোধ হচ্ছে, 'কেস্‌'টা খারাপ হয়ে যাবে।'

অটল। তাতে আমার কোনও দোষ থাক্‌বে না। সম্মুখে বলার চেয়ে, ভালবাসার কথা পশ্চাতে প্রকাশ করাত নীতিসঙ্গত। একেবারে উল্লেখ না করা কেনও সময় নষ্ট। আমরা যখন 'ডি. টি. এস্'কে মাল কমতির কৈফিয়ৎ দি, তখন শেষটায় বুঝিয়ে দিই যে, আমরা তাঁর নিতান্ত অনুগত চাকর। প্রথমে সেটা বলি না।

নকুড় বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আচ্ছা, ক্রমে দেখা যাবে। এখন একটু তবলা বাজিয়ে নাও।'

অটল খুব স্ফূর্ত্তির সহিত সঙ্গত করিতে বসিল, এবং তাহার 'কোর্টশিপ'র কথা যতই স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল ততই তবলার নূতন নূতন বোল বাহির হইতে আরম্ভ হইল। নকুড় বাবু অনেকবার হরিনাম-উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'শেষ রক্ষা হ'লে হয়।'

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন পত্রবাহক নকুড় বাবুর নিকট একখানা পত্র লইয়া আসিল। পত্রের মর্ম্ম যে, ডাক্তার বাবু সন্ধ্যাকালে অটল বাবু ও নকুড় বাবুকে চা খাইতে ও জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নকুড় বাবু। ভায়া, তবে বোধ হয় অনেকটা আশা আছে। প্রস্তুত হও।

অটল। আপনি সহায় থাকিলে কোনও ভয় নাই। নকুড় বাবু তাহাতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং বলিলেন, 'ভায়া, আমি তোমাকে বড় ভালবেসেছি। তোমার রীতিনীতি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আমি যদিও নিতান্ত বড়লোক নই, তবু তোমার স্ত্রীকে প্রায় হাজার টাকা গহনা দিয়ে মুখ দেখ্‌ব, সেটা নিশ্চয়।'

অটল আশ্চর্য্য হইয়া মনে করিল, 'নকুড় দাদা খুব চাপা লোক, নিশ্চয় তাঁর অনেক টাকা আছে, নচেৎ কয় দিনের আলাপেই আমার উপর এত অনুগ্রহ!'

অতএব নকুড় বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, 'তবে চলুন, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমাদের প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিতে হবে।'

ডাক্তার বাবুর বাটীতে সকলে একত্রে জলযোগ ও চা' শেষ করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সরলা বলিল, 'অটল বাবু, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব, আসুন।'

অটল কম্পিতহৃদয়ে সরলার অনুসরণ করিল। সরলা অটলকে একটা সুসজ্জিত কামরায় লইয়া গিয়া বলিল, 'এই আমার 'ষ্টাডি-রুম'। আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে বসে ডাক্তারী পুঁথির পাতা উল্টাই, শেষে ঘুমিয়ে পড়ি।'

অটল। ঐ কঙ্কালটা বিষম বিভীষিকা। আমার কখনও এমন ঘরে ঘুমিয়ে পড়্‌তে সাহস হয় না।

সরলা। আপনি সে দিন ডাক্তারীর কথা উত্থাপন করেছিলেন, তাই এ ঘরে আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি জীবনের জন্য ব্যাকুল, আমি মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল। মানুষ কত কষ্ট পেয়ে মরে, তা আমি দিন রাত্ ভাবি। সেই জন্য সকলকে দেখে আমার দুঃখ হয়।

অটল। সেই জন্য আমি ভেবেছিলেম যে, আমার জন্যও দুঃখ হ'তে পারে। সরলা!—

কথা শেষ হইতে না হইতেই সরলা বলিল, 'সেই দুঃখ মেটাবার জন্য আপনাকে নিয়ে এসেছি। মনোরমা আপনাকে ভালবাসে, তা বোধ হয় জানেন?'

অটল। মনোরমা? কি আশ্চর্য্য!

সরলা। অনেক সময় কে কাহাকে ভালবাসে, তা সে বুঝতে পারে না।

আমি অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছি যে, আপনিও মনোরমাকে ভাল-বাসেন।

অটল গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল।

'আপনি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন বোধ হয়।'

সরলা। মোটেই না। আমি সেই জন্য মনোরমাকে গান শিখিয়েছি। আপনি সে দিন যে গান শুনেছিলেন, সে মনোরমার গান। এখন আপনাদের দু'জনের বিবাহ হলে' আমরা খুব সুখী হব।

অটল। কি রকম দাঁড়িয়ে গেল, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সরলা (হাসিয়া) খুব স্বাভাবিক। আপনি আপনার নকুড় দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা দু'জনেই আপনার জন্য দুঃখিত। আপনার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। সেটা আমরা হ'তে দেব না।

ইহা বলিয়া সরলা অটলকে বাহিরে লইয়া আসিল।

১০

অটল নকুড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা! ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।'

নকুড় বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'ভায়া, ব্যাপার খুব সোজা। তুমি প্রথমে যেটা ঠাউরেছিলে, তাই ঠিক। আমার স্ত্রীবিয়োগ অনেক দিন হয়েছে, এখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করব,—ঠিক করেছি।'

অটল। (বিস্মিত হইয়া) তার পর?

নকুড় বাবু। তার পর সরলার সঙ্গেই সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু নিজে বৃদ্ধ বয়সে 'কোর্টশিপ' করাটা নিতান্ত কষ্টকর মনে করে' (বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টাস্থলে) তোমাকে' দিয়ে সেটা করিয়ে নিয়েছি। এতে যে কত দূর উপকৃত হলেম, তা জানানো অসম্ভব।

অটল (অবাক হইয়া) 'এর রহস্য প্রথমে জাহির করা উচিত ছিল।'

নকুড় বাবু। ক্রমে জাহির হয়ে পড়ে। আজ কাল কোনও বিষয়ে নিজে পরিশ্রম ক'রে সফল হওয়া অসম্ভব। জাহানাবাদে এক জন হাকিমের ছেলে-পুলে না হওয়াতে তিনি চাপরাসীকে তারকেশ্বরে ধন্না দিতে পাঠিয়েছিলেন, তাহাতেই দেবতা সন্তুষ্ট। তুমি যে রকম ক'রে বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত জানিয়েছ, সেটা আমার প্রথম হ'তেই মনোগত ভাব, এবং তা সরলা জানতে পেরে আমাকে পছন্দ করেছে। আবার দেখ, তোমার জন্য অনেক চেষ্টা

করে' সরলা মনোরমাকে রাজি করিয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক; কেন না, তুমি ছেলেমানুষ, সংসারধর্ম্মে অনভিজ্ঞ। মনোরমা তোমার পক্ষে মানাবে।

অটল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও শুনি নাই।

নকুড় বাবু। কোর্টশিপ এমনি করেই হয়ে থাকে। এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাবার্ত্তা শুনে নায়িকা আর এক জনকে পছন্দ করে। এ ধরণটা ক্রমে ভারতবর্ষে প্রচার হচ্ছে। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। যখন তক্তায় 'শ্রীহরি শরণং' লিখেছ, তখনই বুঝতে পেরেছিলেম যে তুমি—

অটল। একটা গাধা?

নকুড় বাবু। মোটেই না। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের লোক। তুমি গাধা হ'লে একেবারে চীৎকার ক'রে ভালবাসার কথা আরম্ভ করতে; সেটুকু না করে' বিলক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।

অটল আর কোনও কথা কহিল না।

কথাগুলি বড় বাবুর নিকট যথাসময়ে প্রচারিত হওয়াতে তিনি খুব প্রীত হইয়া নকুড় বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, এবং নকুড় বাবু সরলাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। মালবাবু বড় বাবুর জামাতা হওয়াতে এবং নকুড় বাবুর সহিত সরলা দেবীর শুভ পরিণয় হইয়া যাওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী।

পরলোকগত বেদবিদ্ ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "পুরূরবা ও উর্ব্বশী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "সাহিত্য" পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধগুলি এক্ষণে "বেদ-প্রবেশিকা" নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। এ প্রবন্ধটীও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি ঐ প্রবন্ধে "উর্ব্বশী জাতিতে গান্ধারদেশীয়া গন্ধর্ব্বী বা অপ্সরা ছিলেন", এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১) আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তিনি যে সকল যুক্তি ও কিংবদন্তীর উপর এই মত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

(১) বেদ-প্রবেশিকা—পৃঃ ২৩৫।

পুরূরবা ও উর্ব্বশীর গল্প বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে।

উর্ব্বশী যে অপ্সরা, এবং পুরূরবা যে মনুষ্য, তাহা ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে স্বীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মতে, দেবলোকে উঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। পরে মর্ত্ত্যলোকে বাসকালে তাঁহাদের বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের পর তাঁহাদের একবার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই কোনও ঋষি সূক্ত-রূপে রচনা করিয়াছেন। ইহাই ঋগ্বেদে আছে।

কি জন্য উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ-রচয়িতা (১) ঋগ্বেদীয় সূক্তের অন্তর্গত কোনও কোনও ঋক্ হইতে আভাস গ্রহণ করিয়া, কোনও কোনও শব্দের অর্থ ঘুরাইয়া লইয়া, এবং স্বকপোলকল্পিত গল্প রচনা দ্বারা, ইহার মীমাংসা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, উর্ব্বশী পুরূরবাকে এইরূপ বলিতেছেন :—

অশাসং। ত্বা। বিদুষী। সস্মিন্। অহন্।
ন। মে। আ। অশৃণোঃ। কিং। অভুক্। বদাসি॥ ১০।৯৫।১১

বিদুষী (আমি) তোমায় সকল দিন শিক্ষা দিতাম। আমার (কথা) শুন নাই ; হে সন্ন্যাসী! (এখন) কি বলিতেছ?

এই ঋক্ হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরূরবা উর্ব্বশীর কোনও একটী কথা পালন করেন নাই। ব্রাহ্মণ-রচয়িতা ইহা হইতে আভাস গ্রহণ করিয়া উর্ব্বশী যে পুরূরবাকে কতকগুলি পণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এইটী স্থির করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে তিনটী পণের অবতারণা করা হইয়াছে, (২) তাহাদের প্রথম দুইটী ঋগ্বেদীয় সূক্তের ৪র্থ ও ৫ম ঋক্ একটু ঘুরাইয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

(১) শতপথ ব্রাহ্মণের মূল প্রাপ্ত না হওয়ায় আমরা Julius Eggeling কৃত অনুবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইব।

(২) When she wedded him, she said, 'Thrice a day shalt thou embrace me ; but do not lie with me against my will, and let me not see thee naked, for such is the way to behave to us women.

Translated by Julius Eggeling.—Satapatha Brahmana XI. 5. 1. Sacred Books of the East Series.

কিন্তু পঞ্চম ঋকে উর্ব্বশী বলিতেছেন,—"হে পুরূরবা! আমি যখন তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, হে বীর! তখন তুমিই আমার দেহের রাজা ছিলে।" যদ্যপি উর্ব্বশী পুরূরবাকে নিজ দেহের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রাহ্মণে বর্ণিত প্রথম দুই পণ দ্বারা পুরূরবাকে উর্ব্বশী বন্ধন করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই পণদ্বয় উর্ব্বশী ও পুরূরবার মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করে নাই। অতএব, এই দুই পণ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না।

ব্রাহ্মণ-মতে, উর্ব্বশী পুরূরবাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কখনও তাঁহার উলঙ্গ অবস্থা না দেখেন। এই পণ-ভঙ্গের জন্যই উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করেন। ঋগ্বেদীয় সূক্তে ইহার আভাসমাত্র নাই। এই পণ-ভঙ্গ করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ-রচয়িতাকে একটী নূতন গল্পের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সে গল্প সংক্ষেপে এই, (১) উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বলোক হইতে মর্ত্তালোকে চারি বৎসর বাস করিতেছেন; তাঁহার সন্তান হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে মর্ত্তালোকে দীর্ঘ কাল থাকিতে দেখিয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল। কি উপায়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে, গন্ধর্ব্বগণ তাহার জন্য এক কৌশল স্থির করিল। একটী মেষ ও দুইটী মেষশাবক উর্ব্বশীর খাটের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিল। ইহা উর্ব্বশী জানিতে পারেন নাই।

---

(১) She then dwelt with him a long time and was even with child of him, so long did she dwell with him. Then the Gandharvas said to one another, 'For a long time indeed, has this Urvasi dwelt among men; devise ye some means how she may come back to us.' Now a ewe with two lambs was tied to her couch; the Gandharvas then carried off one of the lambs. 'Alas,' she cried, 'they are taking away my darling, as if I were where there is no hero and no man!' They carried off the second, and she spake in the selfsame manner. 3

He then thought within himself, 'How can that be (a place) without a hero and without a man where I am?' And naked, as he was, he sprang up after them; too long he deemed it that he should put on his garment. Then the Gandharvas produced a flash of lightning and she beheld him naked even as by daylight. Then, indeed, she vanished; 'Here I am back,' he said, and lo! she had vanished. Wailing with sorrow he wandered all over Kurukshetra.

রাত্রে তাহারা আসিয়া যখন মেষশাবকদ্বয়কে একে একে লইয়া যায়, তখন উর্ব্বশীর মনে হইল, কে যেন তাঁহার সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখনই তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার বাছাকে তাহারা চুরী করিয়া লইয়া গেল; এখানে কি কোনও বীর নাই, মানুষ নাই? আমি এমন স্থানে আছি?" পুরূরবা তাহা শুনিয়া শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন! পাছে কাপড় পরিতে দেরী হয়, সেই জন্য উলঙ্গ-অবস্থায় বহির্গত হইলেন। ধূর্ত্ত গন্ধর্ব্বগণ অমনই বিদ্যুৎ প্রকাশ করায় উর্ব্বশী পুরূরবাকে উলঙ্গ দেখিয়া ফেলিলেন। উর্ব্বশী তখনই অন্তর্হিতা হইলেন। পুরূরবা ফিরিয়া আসিয়া আর উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং উর্ব্বশীর অন্বেষণে কুরুক্ষেত্রের সকল স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কেন বিচ্ছেদ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-কার এইরূপে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

তৎপরে, কোথায় পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, ইহাই আর এক প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ-কার ইহার এক মীমাংসা করিয়াছেন। পুরূরবা উর্ব্বশী বিরহে অধীর হইয়া কুরুক্ষেত্রের সকল স্থান অন্বেষণ করেন। পরে অন্যতপ্লক্ষ নামক সরোবর বা হ্রদের নিকট আসিয়া, তাহার তীরে ভ্রমণ করেন। উর্ব্বশী ঐ হ্রদে পক্ষী বা রাজহংসী রূপে বিচরণ করিতেছিলেন। উর্ব্বশী পুরূরবাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইলেন। (১) কিন্তু ঋগ্বেদে ইহা নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে দেখা গেল, মেষশাবকদ্বয় প্রকৃতপক্ষে উর্ব্বশীর দ্বারা সন্তান-রূপে রক্ষিত হয় নাই, এবং তাহাদের জন্য পুরূরবার সহিত তিনি কোনও পণ স্থাপন করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় উর্ব্বশীর মেষশাবক-দ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে গন্ধারী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গন্ধারীগণ অত্যন্ত মেষপ্রিয় ছিল। কিন্তু উর্ব্বশী যদি মেষপ্রিয় না হন, তবে কেমন করিয়া গন্ধারী হইতে

---

(১) Now there is a lotus-lake there called Anyataplaksha; He walked along its banks; and there nymphs were swimming about in the shape of swans. 4

And she (Urvasi) recognised him, said, 'This is the man with whom I have dwelt.' They then said, 'Let us appear to him!'—'So be it!' She replied; and they appeared to him. 5

Satapatha Brahman XI. 5.1.

পারেন? গন্ধর্ব্বগণ যে মেষশাবক রাখিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহারা মেষপ্রিয় ছিল কি না, তাহার কোনও প্রমাণ হয় না। তাহাদের কৌশল এই ছিল যে, মেষশাবকের রব ছোট ছেলের ক্রন্দনের মত বলিয়া উর্ব্বশী নিজ সন্তান চুরী হইতেছে ভাবিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন, এবং রাজাও হঠাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিতে ভুলিয়া যাইবেন। তাহা হইলেই তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ একই দেশের লোক। সেই দেশের নাম হওয়া উচিত গন্ধর্ব্বলোক। এই গন্ধর্ব্ব দেশ কোথায়? গন্ধার শব্দ হইতে কি গন্ধর্ব্ব শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে? বটব্যাল মহাশয় কোনও ব্যাকরণ হইতে এমন কোনও সূত্র উদ্ধার করেন নাই, যাহাতে গন্ধার শব্দ হইতে গন্ধর্ব্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধার রাজার কন্যা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল গান্ধারী। (১) আমাদের মনে হয়, গন্ধার ও গান্ধার শব্দে কোনও প্রভেদ নাই। বৈদিক যুগে যাহাকে গন্ধার বলা হইত, মহাভারতের যুগে তাহাকেই গান্ধার বলা হইয়াছে। ইহাই কি বর্ত্তমান কালের কান্দাহার? (২) যাহাই হউক, গান্ধারীকে কোথাও গন্ধর্ব্বী বা অপ্সরা বলিতে দেখি না। অতএব, গন্ধার বা গান্ধার দেশের লোককে গন্ধর্ব্ব বলা হইত বলিয়া মনে করি না।

আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, হিমালয়ের পরপারে উত্তরকুরু নামক একটী রাজ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। উহাকে দেবক্ষেত্রও বলা হইয়াছে। (৩)

রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তর দিক জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন।

---

(১) ততো গান্ধাররাজস্য প্রেষয়ামাস ভারত। ১১
দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্ম্মচারিণীম্॥ ১২—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১০।

(২) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, বর্ত্তমান পেশাওয়র প্রদেশকে পূর্ব্বকালে গান্ধার দেশ বলিত।
—ঋগ্বেদ, ১২৮ পৃঃ, পাদটীকা।

(৩) সেই জন্য উত্তর দিকে হিমবানের (অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতের) ও পারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ সকল আছে, তাহারই বৈরাজ্য নিমিত্ত (অর্থাৎ তাহাদের রাজাই বৈরাজ্য নামে অভিহিত) যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাট বলে।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৮।৩।১৪

হে ব্রাহ্মণ! আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব। বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন, 'ঐ দেশ দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য উহা জয় করিবার অযোগ্য।'—ঐঃ ব্রাঃ ৩৯।৯।২৩

এই দিগ্বিজয়-বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ জয় করেন, (১) এবং উত্তর হরিবর্ষে উত্তরকুরুদিগের পুরেও আসিয়াছিলেন। ঐ দেশে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। (২)

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হিমালয়-পারে দেবক্ষেত্র বর্ত্তমান। মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্বদিগের দেশ, এবং তাহারও উত্তরে উত্তরকুরু। এই সকল দেশ হরিবর্ষের অন্তর্গত। রামায়ণেও হিমালয়ের পরপারে উত্তর-কুরু দেশ বর্ণিত হইয়াছে। (৩)

এই সকল হইতে আমরা অনুমান করি, হিমালয়ের পর পারে দেবক্ষেত্রে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বাস করিতেন। পুরূরবা এই দেবলোকে জন্মিয়াছিলেন, এবং লালিত পালিত হইয়াছিলেন। দস্যুহত্যার জন্য দেবগণ

(১) তং জিত্বা হাটকং নাম দেশং গুহ্যক রক্ষিতম্। সরো মানস মাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
পাকশাসনিরব্যগ্রঃ সহসৈন্যঃ সমাসদৎ ॥ ৩ গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ ॥ ৫
তাংস্তু সান্ত্বেন নির্জ্জিত্য মানসং সর উত্তমম্। তত্র তিত্তিরিকল্মাষান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্।
ঋষিকুল্যাস্তথা সর্ব্বা দদর্শ কুরুনন্দনঃ ॥ ৪ লেভে স করমত্যন্তং গন্ধর্ব্বনগরাৎ তদা ॥ ৬
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৮ অধ্যায়।

তাহা (অর্থাৎ কিম্পুরুষ দেশ) জয় করিয়া গুহ্যক-রক্ষিত হাটক নামক দেশে সসৈন্যে ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে জয় করিয়া কুরুনন্দন উত্তম মানস সরোবর, তৎপরে ঋষিকুল্যা অর্থাৎ ঋষি নদী সকল দর্শন করিয়াছিলেন। পাণ্ডব প্রভু হাটকদিগের নিকটবর্ত্তী মানস সরোবরে আসিয়া তৎপরে গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ জয় করিয়াছিলেন। তথায় তিত্তির, কল্মাষ, ও মণ্ডূক নামে উত্তম অশ্ব সকল আছে। তিনি সেই গন্ধর্ব্ব নগর হইতে বহু কর লাভ করিলেন।

(২) উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ। পার্থ নেদং ত্বয়া শক্যং পুরং জেতুং কথঞ্চন।
ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দনঃ ॥ ৭ উপাবর্ত্তস্ব কল্যাণ পর্য্যাপ্তমিদমচ্যুত ॥ ৯
তত এনং মহাবীর্য্যাঃ মহাকায়াঃ মহাবলাঃ। ন চাপি কিঞ্চিৎ জেতব্যমর্জ্জুনাত্র প্রদৃশ্যতে।
দ্বারপালাঃ সমাসাদ্য হৃষ্টা বচনমব্রুবন্ ॥ ৮ উত্তরাঃ কুরবো হ্যেতা নাত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥ ১১

সেই পাণ্ডব উত্তর হরিবর্ষে আগমন করিলেন; ইন্দ্রনন্দন সেই দেশ জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর মহাকায়, মহাবল, দ্বারপালগণ এই মহাবীরের নিকট আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাক্য বলিলেন।—হে পার্থ! এই পুর তোমার দ্বারা কখনই বিজিত হইতে পারে না। হে কল্যাণীয় অচ্যুত! ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে; ফিরিয়া যাও। হে অর্জ্জুন! আরও এখানে কিছুই জেতব্য দেখা যায় না; এই উত্তরকুরু; এখানে যুদ্ধ করিতে নাই।

(৩) কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ।

তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন, উর্ব্বশীর মুখ হইতে ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেবলোকেই উর্ব্বশীকে তিনি বিবাহ করেন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উর্ব্বশী ও পুরূরবা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঋগ্বেদে উত্তরকুরু নাম পাই নাই। তখন দেবলোক নামেই সম্ভবতঃ হিমালয়ের পর পার প্রসিদ্ধ ছিল। দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা নাম ঋগ্বেদের কালেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের দেশ যে হিমালয়ের পর পারে ছিল, ইহা তেমন স্পষ্টভাবে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

ঈথার।

১

পদার্থবিদ্যার যে কোনও তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে ঈথার আসিয়া পড়ে। আলোকতত্ত্ব, চুম্বকতত্ত্ব, তড়িততত্ত্ব, তাপতত্ত্ব, যে কোনটা সম্যকরূপে বুঝিতে গেলে ঈথারকে জানা আবশ্যক। ঈথার না বুঝিয়া পদার্থবিদ্যা বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। উপরিউক্ত তত্ত্বের প্রত্যেক তথ্যটি ঈথারের সাহায্যে বেশ বুঝা যায়, ভাবটি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই যে এত আবশ্যক ঈথার, ইহার রূপ ও গুণ জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আজ এই ঈথার সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলিব।

ঈথার একটা মহাসমুদ্র। এই ঈথার-সমুদ্রে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সকলে ডুবিয়া আছে। এত বড় মহান্ মধ্যস্থ (medium) আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যখন জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় পৃথিবী হইতে জগৎ-সবিতার দূরত্ব জানিতে পারি (৯২,০০০,০০০ মাইল), তখন সাধারণতঃ মানুষের মনে হয় যে, এই বিশাল ব্যবধানের মধ্যবর্ত্তী স্থানটা কোনও দ্রব্যে পূর্ণ কি না; এ বিশাল দেশ (space) কি শূন্য পড়িয়া থাকা সম্ভব? প্রকৃতি-চরিত্র-পাঠে মনে হয় যে, এ বিশাল দেশ খালি পড়িয়া থাকিতে পারে না। কোনও না কোনও বস্তুতে পূর্ণ। আবার আর এক দল আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ধরা ও রবির মধ্যবর্ত্তী বিশাল দেশটা শূন্যই পড়িয়া আছে; তাহা না হইলে গ্রহ উপগ্রহগণ ছুটাছুটী করিবে কি করিয়া? এক দেশ দুই বস্তু দ্বারা এক সময়েই অধিকৃত থাকিতে পারে না। যদি এই বিশাল দেশ ঈথার-

রূপ কোনও দ্রব্যে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে, সমস্ত দেশটা (space) পদার্থে ঠাসাঠাসি হইয়া রহিল; কোনও গ্রহের গতি থাকিতে গেলে সমুদয় পদার্থের মধ্যে একটা ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে। কাজেই পদার্থের স্বাধীন গতি (free motion) বলিয়া কোনও তথ্য থাকিতে পারে না। এখন যুক্তি তর্ক দ্বারা এই দুই মতের মীমাংসা করিতে হইবে।

টানা পাখা অনেকের বাড়ীতে আছে; সকলেই দেখিয়াছেন। পাখা টানিতে হইলে পাখার সহিত দড়ি বাঁধিয়া মানুষের হাতে দিতে হয়। পাখা খাটান আছে, টানিবার জন্য মানুষ টুলের উপর বসিয়া আছে। কিন্তু পাখা চলে না। দড়ি চাই; পাখা ও মানুষকে দড়ির সাহায্যে যোগ করিয়া দেওয়া চাই। তবে মানুষের বল দড়ির সাহায্যে পাখাকে দোলাইবে। মানুষের গায় শত হস্তীর বল থাকিলেও দড়ি দ্বারা মানুষ-পাখায় যোগ না থাকিলে পাখাকে তিলার্দ্ধও দোলাইতে পারা যায় না। এটুকু বেশ বুঝা গেল। আচ্ছা, আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। একটি চুম্বকদণ্ড নিকটস্থ লৌহখণ্ডকে টানিতেছে। লৌহখণ্ডটি অগ্রসর হইয়া চুম্বকদণ্ডকে স্পর্শ করিল। এটি একটি সত্য ঘটনা। ঘটনা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে, চুম্বক লৌহকে টানিতেছে, কিন্তু কাহাকে অবলম্বন করিয়া টানিতেছে? দড়ি কোথায়? দড়ির খোঁজ পড়িয়াছে। মানুষ আছে; পাখা আছে; কিন্তু দড়ির অবলম্বন পাইয়া যেমন পাখা চলিয়াছে, তেমনই এখানেও চুম্বক আছে, লৌহ আছে; কিন্তু কাহার অবলম্বন পাইয়া লৌহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে? কিছু একটা অবলম্বন করিয়া শক্তি প্রকাশ পায়। এখানে চুম্বক-শক্তির বিকাশ কাহাকে অবলম্বন করিয়া হইল? চুম্বকের টান কাহাকে অবলম্বন করিয়া লৌহতে পঁহুছাইল? এই অবলম্বন ঈথার; এখানে দড়ি হইতেছে ঈথার, "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার" হওয়া যেমন অসম্ভব, অবলম্বন বিনা কোনও শক্তির স্থানান্তরে বিকাশও তেমনই অসম্ভব। অবলম্বন চাই, পরস্পর যোগ চাই, চুম্বক ও লৌহের ব্যবধান পদার্থে পূর্ণ থাকা চাই, চুম্বক ও লৌহ কোনও পদার্থের যোগে যুক্ত থাকা চাই। তবে চুম্বকের বল সেই ঈথার-রূপ পদার্থ-অবলম্বনে লৌহতে গিয়া পঁহুছিবে। তবে চুম্বকের আকর্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। চুম্বক আছে, লৌহ আছে, আর তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই—শূন্য। অথচ লৌহ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইবে,—ইহা কল্পনা করা বাতুলের কার্য্য। কাজেই আমরা চুম্বক ও লৌহের মধ্যে একটি মধ্যস্থ

(medium) খুঁজি। যে মধ্যস্থ থাকাতে তিনটি পরস্পরে সংযুক্ত। এই মধ্যস্থের নাম ঈথার। এখানে আমি একটী সত্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি; বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সন্ধ্যার পর কোনও এক স্থানে কতকগুলি বালকের আসরে পুতুল-নাচ হইতেছে। সকলেই হাঁ করিয়া দেখিতেছে। কেহ বলিতেছে, হাত উঁচুতে, পুতুল নীচে; কেমন করিয়া হাতের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল নাচিতেছে? কেহ বা আনন্দ করিতেছে। কেহ তাহার সঙ্গীদিগকে কত বিজ্ঞভাবে পুতুল নাচ-কারীদিগের বাহাদুরী বুঝাইয়া দিতেছে। এমন সময়ে একটি বালক বলিল যে, বাহাদুরী কিছুই নয়; কতকগুলি তারের সাহায্যে পুতুল নাচাইতেছে। পুতুল ও হাতের মধ্যে কিছু না থাকিলে কি পুতুল নড়ে? তার রাত্রিতে দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বাজীকরেরা তার ব্যবহার করে। এ ছেলেটি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান নয় কি? আজকালের বৈজ্ঞানিকগণও ঐ ছেলেটার মত একটা মধ্যস্থের (medium) অবতারণা করেন। * শূন্য-বাদ কেহ মানিতে চান না; মধ্যস্থবাদেরই সকলে পৃষ্ঠপোষক।

তাহা হইলে, আমাদের এই জ্ঞান হইল যে, পদার্থ বা পদার্থের পরমাণুগুলি সর্ব্বব্যাপী ঈথার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ঈথার ওতঃপ্রোতভাবে জড় জগৎকে ঘেরিয়া আছে। এই সমগ্র দেশ (space) সম্পূর্ণভাবে ঈথারে পূর্ণ। তাহা হইলে, এই ঈথারের একটি কণা টানিলে পারিপার্শ্বিক কণাগুলিতে টান পড়িবে। সেই কণাটীর আন্দোলনে সেই টান আবার পার্শ্বস্থিত ঈথার-কণায় পঁহুছিবে। এইরূপে এক দেশ হইতে অপর দেশে ঈথার-কণার স্পন্দন গিয়া পঁহুছাইবে।

মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ বোধ হয় এই ঈথারের স্পন্দন-ফল। আলোক ঈথারের তরঙ্গসম্ভূত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। তড়িত এই ঈথারের কোনও বিশিষ্ট-গুণ-প্রসূত। ঈথার সর্ব্বস্থানে সমভাবে বর্ত্তমান। ঈথার কোনও স্থানে পাতলা, কোনও স্থানে ঘন, এরূপ অবস্থায় থাকে না। এক কথায়, ইহার ঘনতা সর্ব্বস্থানে সমান। চাপ দিয়া ঈথারের আয়তন কমাইতে পারা যায় না। পদার্থের ন্যায় ঈথারের অণু পরমাণু নাই। পদার্থের অণুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক আছে; পরমাণুদ্বয়ের মধ্যেও ফাঁক আছে। সুতরাং পদার্থ সর্ব্বব্যাপী নহে। সকল স্থান জুড়িয়া থাকে না। কিন্তু ঈথার সর্ব্বস্থান জুড়িয়া এক অবিভক্ত বস্তুর ন্যায় অবস্থান করে। তাহার অণুও নাই, পরমাণুও নাই, তাহার কণা-

* "বিজ্ঞানে" প্রকাশিত মৎলিখিত "শূন্যবাদ ও মধ্যস্থবাদ" দ্রষ্টব্য।

দ্বয়ের মধ্যে ফাঁকও নাই। ঈথারকে কখনও তরল, কখনও সরিল, আবার কখনও কঠিন বলা হয়। কিন্তু কোনটাই ইহার উপযুক্ত বিশেষণ নহে। ইহা অপরিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ব জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। ইহা স্থিতিস্থাপক, ঘর্ষণশূন্য (frictionless) মধ্যস্থমাত্র। গতি ও শক্তি (energy) বহন করাই ইহার কার্য্য। বারান্তরে ঈথার হইতে কিরূপে আলোকের উৎপত্তি ও গতি সাধিত হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলিব।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

জিজিয়া।

'জিজিয়া' নামক করটী ইতিহাসে মুসলমানগণের চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের উদাহরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'জিজিয়া' এই শব্দটী শ্রবণমাত্র হিন্দুগণ ভীত ও চকিত হইয়া উঠেন! কিন্তু ইহার উৎপত্তির বিবরণ জানা থাকিলে কাহারও কোনও ভয়ের কারণ থাকিত না; কারণ, প্রচলিত ইতিহাসে ইহাকে যে মূর্ত্তিতে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহা ইহার বিকৃত রূপ। প্রচলিত ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মুসলমান-বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ ইতিহাসে ইহার স্বরূপ মিলিবে না; ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে!

'জিজিয়া' কাহাকে বলে, তাহা না জানেন, এমন লোক খুবই অল্প, কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, এরূপ লোকের অভাব নাই। কারণ, ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে—শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত, অধর মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি প্রায় সকল ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-প্রণেতার গ্রন্থসমূহে এ বিষয় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্তই ইউরোপীয় পাণ্ডিতগণের বিদ্বেষভাবাপন্ন মত প্রসূত রচনা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের এই বিদ্বিষ্ট কল্পনার প্রভাবে তদনুকারী এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক মুসলমান সম্রাটগণ, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও 'জিজিয়া' নামক রাজকর—যাহা মুসলমান-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দ:) স্বয়ং অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি পৈশাচিকভাবেই চিত্রিত হইয়াছে! এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায় ও নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পিত হীনতায় ভারতীয় মুসলমানগণ হৃদয়ে কি

অসহ যাতনা অনুভব করিতেছেন। ইহা যে হিন্দু-মুসলমানের একান্ত ঈপ্সিত একতা ও সম্মিলনের ভয়ঙ্কর পরিপন্থী হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাউক, 'জিজিয়া' কি, এবং কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি। 'জিজিয়া' পারস্য ভাষার 'গিজিয়া' শব্দ হইতে উৎপন্ন। যদি প্রশ্ন করা হয়, এ পরিবর্ত্তন কেন হইল? তাহা হইলে বক্তব্য এই, পারসীকদিগের নিকট হইতে 'গিজিয়া' শব্দটী আরবগণ 'জিজিয়া' নামে পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করেন। কারণ, আরবী-ভাষাবিদগণ সকলেই জানেন যে, আরব্য ভাষায় 'গাফ' (গ) অক্ষর নাই। এই জন্যই পারস্য ভাষার গাফ (গ) অক্ষরের পরিবর্ত্তে আরবীতে 'জিম' (জ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, 'হুগলী' শব্দটী আরবীতে লিখিতে হইলে 'হুজলী' লিখিতে হইবে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখন দেখা যাউক, 'জিজিয়া' শব্দের অর্থ কি? 'বোরহানে কাত' নামক পারস্য ভাষার প্রধান অভিধান গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, 'গিজিয়া' শব্দের অর্থ—কর বা খাজানা। পারস্য-কবিকুল-সম্রাট ফেরদৌসী তদীয় বিশ্ববিখ্যাত 'সাহনামা' গ্রন্থে 'গিজিয়া' শব্দটী কর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'জিজিয়া' শব্দটী যে 'গিজিয়া' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা 'মফাতি হুল-উলুম' নামক প্রধান আরবী অভিধানে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন কে সর্ব্বপ্রথম 'গিজিয়া' বা 'জিজিয়া'র প্রবর্ত্তন করেন, দেখা যাউক। ইতিহাস-আলোচনায় জানা যায় যে, সুবিচারক কুল-সূর্য্য পারস্য-সম্রাট নওশেরওয়া এই 'গিজিয়া' নামক কর স্বীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এমাম আবু জাফর তিব্রী তদীয় 'তারিখে কবির তিব্রি' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বলেন,—"উচ্চ বংশীয় আমীর ওম্‌রা, ধর্ম্মগুরু ও সৈনিক পুরুষ ব্যতীত তিনি রাজ্যের অন্যান্য সকল শ্রেণীর বিশ বৎসরের অধিক ও পঞ্চাশ বৎসরের অনধিক বয়সের লোকের প্রতি প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ৪, ৬, ৮, ১২ দেরেম হিসাবে 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন,—"সৈনিক পুরুষগণ দেশের ধন, প্রাণের রক্ষক; তাহারা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে বিপদাপন্ন করিতে এবং স্বয়ং শমন-সাগরে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত নহে, সুতরাং নিরাপদে অবস্থানলিপ্সু লোকজনের পক্ষে সৈনিকগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু কর প্রদান করা একান্তই উচিত।" (১)

(১) তারিখে মুসলমান সভ্যতা—মৌলানা মনিরুজ্জমান এস্‌লামাবাদী প্রণীত।

'ফতুহল বোল্দান' নামক আরবী ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 'জিজিয়া'র বিনিময়ে যে সকল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'জিজিয়া'র বিনিময়ে নিম্নলিখিত দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সন্ধিপত্রের চুম্বক যথা :—

(১) শত্রুর আক্রমণ হইতে জিজিয়া-দাতাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করা হইবে।

(২) তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(৩) 'জিজিয়া' দিবার জন্য তাহাদিগকে তহসিল কাছারীতে উপস্থিত হইতে হইবে না। তহসিল মোহরেরা স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জিজিয়া আদায় করিবে।

(৪) তাহাদের ধন প্রাণ নিরাপদে রাখা হইবে।

(৫) তাহাদের পথিক ও বণিকদলকে দস্যু তস্করের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।

(৬) তাহাদের ভূসম্পত্তি নিরাপদে রাখা হইবে।

(৭) তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করা হইবে।

(৮) পাদ্রী ও ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতদিগকে পদচ্যুত করা হইবে না।

(৯) ক্রশ ও প্রতিমাসমূহের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করা হইবে না।

(১০) তাহাদের নিকট হইতে (মুসলমান প্রজার ন্যায়) 'ওশর' বা ভূমির উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ গ্রহণ করা হইবে না।

(১১) তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা হইবে না।

(১২) তাহাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(১৩) তাহাদের পূর্ব্ব-প্রাপ্ত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে না।

(১৪) যাহারা এখন উপস্থিত নাই, তাহারাও এই সন্ধিপত্রের ফলভোগের অধিকারী হইবে। (১)

যাহাদের নিকট হইতে 'জিজিয়া' আদায় করা হইত, তাহাদের নিকট কত দূর দায়িত্ব স্বীকার করা হইত, এবং তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা সন্ধিপত্রের মধ্য হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

(১) ভারতে মুসলমান সভ্যতা।

ভারতে মুসলমান সম্রাটগণও এই 'জিজিয়া' কর মুসলমান ভিন্ন অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর ধার্য্য করিয়াছিলেন। এরূপ 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপন করা, বিশেষতঃ মুসলমানদিগকে উহার দায়িত্বভার হইতে অব্যাহতি দিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে 'জিজিয়া'র শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা সমীচীন ও ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব।

এস্‌লামের শাসন-নীতি অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান দেশ, সমাজ ও দেশ-বাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য সামরিক কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে বাধ্য। কোনও মুসলমানই এই কঠোর বিধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। এস্‌লাম ধর্ম্ম উদারতন ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী, ইহা তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র 'কোরাণ' সপ্রমাণ করেন। (১) তাই মুসলমান খলিফা ও বাদশাহগণ সামরিক বিধানকে স্বধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের উপর সামরিক আইন বাধ্যতামূলক করিলে, তাহারা এ নিয়মকে অত্যন্ত কঠোর ও অত্যাচারমূলক বলিয়া মনে করিত। এমন কি, হয় ত দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, দেশ উচ্ছিন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে ধর্ম্মের বিধান মনে করিয়া ইহার পালনে সতত বাধ্য ছিল। তাহাদের পক্ষে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, 'জিজিয়া' কোনরূপ বিদ্বেষমূলক কর নহে। যাঁহারা বিদ্বেষ-মূলক কর বলিয়া 'জিজিয়া'র প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা ইহাতে কিঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। 'জিজিয়া' যে কোনরূপ বিদ্বেষ-মূলক কর ছিল না, তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে, মুসলমান ব্যতীত যে সকল অন্যধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'জিজিয়া' দিতে হইত না। যাঁহারা ইহাতেও জিজিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের জন্য

---

(১) কোরাণে আছে,—"লা এক্‌রাহা ফি-দ্দিনে"; অর্থাৎ, 'এস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচারে কোনরূপ বলপ্রয়োগের বিধি নাই।' আর এক স্থানে আছে,—"লাকুম্‌দিনকুম্ ওলইয়াদিন্।" অর্থাৎ, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।' ইহাতে জোরজবরদস্তীর কথা কিছুই নাই। যাঁহারা 'মুসলমানেরা বল-প্রয়োগে ও তরবারী দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ করিবার মুসলমান ধর্ম্মে বিধি আছে' ইত্যাদি ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা 'কোরাণে'র উক্ত বাক্য ও ডাক্তার আর্ণল্ড প্রণীত 'Preaching of Islam' গ্রন্থ পাঠ করিলে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

আরও কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে ; আশা করি, তাঁহারা ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিবেন।

মুসলমান সম্রাটগণের অধীন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগকে 'জিম্মি' বলা হইত। 'জিম্মি' শব্দের অর্থ—'দায়িত্বভার-গৃহীত লোক।' ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার নিকট হইতে 'জিজিয়া' নামক কর গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার 'জেম্মা' অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণ করা হইত বলিয়া তাহারা 'জিম্মি' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। 'জিজিয়া যে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণ করা হইত, তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার খলিফাগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ কথা স্পষ্ট লিখিত ছিল,—'তোমাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ও ধন প্রাণ নিরাপদে রাখিবার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণ করিতেছি।" মুসলমানগণ যে এ সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা সম্যক রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। অগত্যা প্রবন্ধবৃদ্ধির ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

যাহা হউক, এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'জিজিয়া' একটা সামরিক কর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার জন্য মুসলমান সম্রাটগণ কোনও অংশেই দোষী প্রতিপন্ন হইতে পারেন না ; বরং ইহাতে তাঁহাদের শাসন শৃঙ্খলা, ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'জিজিয়া'-লব্ধ অর্থ তাঁহারা সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র-সংগ্রহ, রসদ-সংগ্রহ ও দেশের পথঘাট ও দুর্গাদির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা কি ভাবে 'জিজিয়া' আদায় করিতেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'জিজিয়া'র পরিমাণ কোনও অবস্থাতেই ২০৲ টাকার অধিক ছিল না। লক্ষপতি ও ক্রোরপতি হইলেও ইহার অধিক কাহাকেও দিতে হইত না। সাধারণতঃ বার্ষিক ৬৲ টাকা হিসাবে জিজিয়া গৃহীত হইত। স্ত্রীলোক, অর্দ্ধাঙ্গ অঙ্গহীন, অন্ধ, উন্মাদ, দরিদ্র, অর্থাৎ যাহাদের নিকট ২০০ দেরেমের ন্যূন অর্থ আছে, তাহাদের নিকট হইতে জিজিয়া লওয়া হইত না।

অধুনাতন ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, জলকর, পথকর ইত্যাদি নানা জাতীয় করের সহিত তুলনা করিলে জিজিয়াকে অতি সামান্য কর বলিয়াই বোধ হয়।

সকল মুসলমান সম্রাটই প্রজাবর্গের উপর 'জিজিয়া' নামক 'ট্যাক্স'টী স্থাপন করেন নাই। ভারতে পাঠান-শাসন-কালে হিন্দুগণ সৈনিক বিভাগে বিশেষ-

রূপে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে নাই, এই জন্যই তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপিত হইয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুনের সময়েও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দুগণ দলে দলে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে থাকেন। আকবরের সময়ে পাঠান-বিপ্লবে দেশ পূর্ণ ছিল বলিয়া আকবর পাঠানদের উচ্ছেদসাধনমানসে রাজপুতদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন, এবং তাহাদিগকে সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমে রাজপুতদের অনুগামী হয়। অধিকাংশ হিন্দু সামরিক বিভাগে প্রবেশ করায় সম্রাট আকবর তাঁহাদের উপর সামরিক কর 'জিজিয়া' ধার্য্য করেন নাই। সাহজাহান ও জাহাঙ্গীর আকবরের এই নিয়ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতের অবস্থা অন্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। যে পাঠানদের উচ্ছেদের জন্য সম্রাট আকবর রাজপুতদিগকে অত্যধিক প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহাদিগকে উচ্চপদে, দরবারে ও সামরিক বিভাগে অধিকার প্রদান করেন। সেই রাজপুতগণের ক্ষমতা প্রতিপত্তি পাঠান রাজবংশ অপেক্ষাও বাড়িয়া যায়। তাঁহারা মোগলরাজের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ও তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি, তাঁহারা ক্রমে পিতৃপুরুষদের রাজ্য স্বাধীন করিয়া লইবার কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব মুসলমান রাজত্বের এই আসন্ন বিপদ্দর্শনে রাজপুতদিগের ক্ষমতা দুর্ব্বল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তাঁহাদের সামরিক ক্ষমতার সঙ্কোচবিধানের জন্য তাঁহাদিগকে সামরিক বিভাগ হইতে সরাইয়া 'জিজিয়া'র পুনঃপ্রচলন করিয়া স্বীয় রাজ্যরক্ষার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'জিজিয়া'র পুনঃ-প্রচলনের জন্য ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবকে দোষী করেন। কিন্তু তিনি কি কারণে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার অবসর ঘটিলে, নিশ্চয়ই তাঁহারা এত দূর বিক্ষুব্ধ হইতেন না। আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষাকে দোষাবহ মনে করিলে, এবং রাজদ্রোহিতা ও দেশদ্রোহিতা নিবারণ-চেষ্টাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেব দোষী।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য ও তদনুকারী ঐতিহাসিকগণের কৃপায় 'জিজিয়া' নামক সামরিক করটী যেরূপ ভীতিপ্রদ-রূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সরলচিত্ত পাঠকগণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রবর্গের অন্তরে মুসলমান শাসন-

কালের প্রতি স্বভাবতই ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া থাকে; এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইরূপ অলীক কাহিনীর প্রশ্রয়াধিক্যে হিন্দু ও মুসলমানের চিরবাঞ্ছিত একতা ও সম্প্রীতির পথে প্রবল অন্তরায় পুঞ্জীভূত হইতেছে।

আবুল কালাম মোহাম্মাদ শামসুদ্দীন।

নায়িকার শেষ কথা।

[A Woman's Last Word—by *R. Browning.*]

১

কাজ নাই প্রিয়তম! এ বিবাদে আর,
কাজ নাই যুঝিয়া কাঁদিয়া—
যেমন ছিল গো আগে হোক তা আবার,
এস—রহি শুধু ঘুমাইয়া।

২

পরুষ বচন সম উগ্র আর কিবা?
প্রিয়তম! তোমায় আমায়
কলহে কি র'ব রত, কহ, নিশি দিবা,
শ্যেন যথা তরুর শাখায়!

৩

হের ওই দুই বাজ যেডায় গরবে
আমাদের শুনি রুষ্ট বাণী—
চুপ্ চুপ্—কথা সব এস ঢাকি তবে
গণ্ড পরে রাখি গণ্ডখানি!

কোন সত্য, কহ সখা, মিথ্যা এর চেয়ে
অনুরক্তা নহি তব প্রতি?
সাবধান—যেও না সে তরুমূলে ধেয়ে
রহে যেথা অহি মন্দমতি।

৫

যে দিকে সিন্দুরসম ফল রহে ঝুলে,
লুব্ধ হ'য়ে সে ধারে যা'ব না—
হারাই নন্দন-বন যদি হায় ভুলে,
তুমি সখা শঠের ছলনা!

৬

দেবতা হও গো সখা, ইন্দ্রজাল-করে
মন্ত্রমুগ্ধ করি রাখ মোরে;
মানব হইয়ে সখা, মানব-আদরে
বাঁধ মোরে তব বাহু-ডোরে!

৭

শিখাও আমারে বঁধু! শিখাও গো শুধু
আমার উচিত যাহা হবে,
তোমারি ভাষা সে হবে মোর ভাষা বঁধু,
এ হৃদে তোমারি ভাব র'বে।

৮

মিটাব পিপাসা তব যদি সাধ যায়,
দেহের প্রাণের তৃষা আর;
তনু মন দুই বঁধু! সঁপিনু তোমায়—
তব করে—সর্ব্বস্ব আমার!

সে সাধ মিটিবে সখা কাল নহে আজ,
নহে এ নিশার আজিকার,
ডুবাব মনের খেদ—প্রথম এ কাজ—
চিরতরে—না জাগে আবার।

১০

আজি এ নিশায় বঁধু একটু কাঁদিব,
(অবোধের মত হবে তা সে)
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে ঘুমায়ে পড়িব
ক্রোড়ে তব প্রেমের পরশে।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গায়ক পাখী।

ময়না।

ময়না বলিতে অনেক-জাতীয় পাখীকে বুঝায়। আমরা এ স্থলে যে ময়নার বিবরণ লিখিব, সেগুলিকে 'পাহাড়ে ময়না' বা 'পাহাড়িয়া ময়না' বলে। এই নামেই ইহারা সমধিক পরিচিত।

গারো পাহাড়ের ময়নাই আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিপালিত হয়, এ জন্য ইহাদের বিবরণই আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ময়না কোকিলের মত বড় পাখী। গাঢ় নীলের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ পালকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। ময়নার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের সর্ব্বপ্রধান সহায় তাহার মনোহর কর্ণযুগল। নিকষে কষিত উজ্জ্বল সোনার দুইখানি কোমল পাত যেন তাহার সুন্দর চঞ্চল কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথা নাড়া দিলেই কাণ দুইটী দুলিতে থাকে। এ জন্য ইহাদিগকে সোনাকাণি ময়না কহে। সোনাকাণি ময়নাকে কয়েক দিন দুধ ভাত খাইতে দিলে, ময়নার কাণ দুইটী রূপার মত সাদা হইয়া যায়, ময়না রূপাকাণি হইয়া পড়ে। আবার হলুদ-ঘি মাখা ছাতু বা কুঁচিলা ফল খাইতে দিলেই ময়না পুনরায় সোনাকাণি হয়। সোনাকাণি ময়নাই দেখিতে বেশী সুন্দর। কাণ দুইটী ক্রমে সরু হইয়া মাথার পিছনে গিয়া মিলিত হয়। দুই পার্শ্বের দুইটী রন্ধ্রও দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট লালের আভাযুক্ত হলদে। ভিতরটা লাল। ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা, ধারাল, শক্ত এবং সুন্দর। ঠোঁটের গোড়ায় দুই দিকে দুই নাসারন্ধ্র। পা দুইটী ঈষৎহরিদ্রাভ।

ইহারা কখনও পার্ব্বত্যভূমি ছাড়িয়া নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতে আইসে না। এমন কি, পার্ব্বত্য ভূমির নিকটবর্ত্তী অরণ্যেও ময়না কখনও ভ্রমেও বেড়াইতে আইসে না। ইহারা পর্ব্বতের উচ্চতম বৃক্ষের কোটরে বাসা করিয়া ডিম পাড়ে। মানুষ-ভীতিই ইহাদের এই সতর্কতার প্রধানতম কারণ। কিন্তু সেখানেও মানুষ 'জীবন হাতে লইয়া' ময়নার বাচ্চা সংগ্রহ করিতে যায়। মানুষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ইহারা যতই চেষ্টা করুক, মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। মানুষ বাঁশের অসংখ্য ঝুপড়ি তৈয়ার করিয়া তাহা মনোনীত গাছের উপর স্থাপন করে। বহু ময়না তাহাতে বাসা করে।

বসন্তাগমেই ময়না বাসা ঠিক করে। শীতকালে ইহারা গর্ভধারণ করে; এবং চৈত্র, বৈশাখ মাসে ডিম পাড়ে। এক একটী ময়না দু' চারিটী ডিম পাড়ে। পনর বিশ দিন ধরিয়া অধিকাংশ সময়ই পক্ষিণী ডিমে তা দেয়। পক্ষী তখন তাহার আহার যোগায়। ডিম ফুটিলে উদরসর্ব্বস্ব, একটী মাথা, দুইটী ক্ষুদ্র পা ও ক্ষুদ্র ডানা বিশিষ্ট ছানা বাহির হয়। কিছু দিন পরে ঐ ছানার শরীরে পীতাভ লোমরাজি দেখা দেয়। দুই তিন দিন পরে ঐ লোমরাজির বর্ণ ক্রমে পাংশুটে হয়, এবং ক্রমে কৃষ্ণাভ হইয়া আইসে। আরও দুই সপ্তাহ কাল ইহারা মাতা পিতার প্রদত্ত আহার বাসায় বসিয়া গ্রহণ করে। এই সময়ই ছানা চুরীর প্রশস্ত কাল। ময়না এই সময় হইতে ক্রমে ছানাগুলিকে এ ডাল সে ডাল করিয়া উড়িতে শিখায়। ক্রমে পাখায় বল সঞ্চার করিয়া ইহারা মাতা পিতার সঙ্গে আহার্য্য-সংগ্রহে গিয়া থাকে। পোকা, মাকড়, ফল ইত্যাদি ইহাদের ভক্ষ্য।

ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, ময়নার ছানা পাড়িতে গেলে ইহারা মানুষের ভাষায় কহিত,—"ওই গর্ত্তে সাপ আছে।" সে কথা সত্য না হউক, ময়না যে প্রায় সকল পাখীর স্বর অনুকরণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহ-পালিত ময়নাই তাহার সাক্ষী। আমি দুইটী ময়নার কথা জানি, যাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। একটী ময়না কিশোরগঞ্জের তিন মাইল দূরবর্ত্তী 'চৌদ্দশ' বাজারে এক পশ্চিমে বেহারার প্রতিপালিত ছিল। তাহার কথাবার্ত্তা, গান, শিশ, মানুষের অবাক্ অনুকরণ ছিল। নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কথা কহিত। সে বহু পথিককে নূতন কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিত। তাহা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ব্যতীত বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সে অনেক সময়ে প্রশ্ন করিত, 'আপনি কোথা যাবেন? কি নাম আপনার? বাড়ী কোথায়? তামাক খাবেন? মা ঘরে আছ? একটু আগুন দাও ত।' সে উত্তর দিয়াও মানুষকে খুসী করিত। পাখীটা ছত্রিশ টাকায় বিক্রীত হইয়া গেলে, অপর এক ধনী উহার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। এই পাখীটার কথাবার্ত্তায় প্রায়ই মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এ কুকুর, বিড়াল, অন্যান্য পাখী প্রভৃতির স্বর অনুকরণ করিত। এ রকম 'পণ্ডিত' গোছের পাখী আর দেখি নাই। এক দিন নাকি এই পাখীটার কৃপায় তাহার প্রভু চোরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। পাখী গভীর রাত্রিতে জাগিয়া 'বাবা, চোর, চোর!' বলিয়া চেঁচায়; তাহাতেই গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

হোসেনপুরের নিকট 'পিত্তলগঞ্জে'র বাজারেও এক দোকানীর একটী 'ময়না পাখী'র গল্প শুনিয়াছি। উহারও অনেক অদ্ভুত কথা শুনিয়াছিলাম। পাখীটা দেখি নাই।

এত বেশী পোষ মানিলেও ময়না স্বাধীনতার জন্য লালায়িত। একটীমাত্র ময়নাকে পিঞ্জরের বাহিরে গিয়া পুনরায় স্বেচ্ছায় পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। * ইহারা একবার ছাড়া পাইলে সহজে ধরা দিতে চায় না। তবে, আশৈশব পিঞ্জরাবদ্ধ থাকায় ইহাদের ডানার শক্তি কমিয়া যায়, এবং উড়িবার কায়দা-কানুন অনভ্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং সহজেই ক্লান্ত হইয়া ধরা দেয়। কখনও কখনও পলায়ন করিতে গিয়া অপর পাখী কর্তৃক হত হয়। পরাধীন পাখী ছাড়া পাইলেই অন্য পাখী তাহাকে চিনিতে পারে, এবং ইহাকে বধ করা সুসাধ্য মনে করিয়া আক্রমণ করে।

পাখীমাত্রেরই পুচ্ছের নীচে একটী তৈলাধার আছে। পাখী সময় সময় ঠোঁট দ্বারা ঐ তৈলাধার টিপিয়া প্রয়োজনমত তৈল বাহির করে, এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রসাধনে নিয়োগ করিয়া থাকে। ময়নাকে প্রত্যহ সকাল বেলায় স্নান করাইতে হয়। কখনও কখনও দুই বেলা স্নানও করান উচিত। স্নান বন্ধ করিলে ইহারা অসুস্থ হয়। রুগ্ন ময়নার তৈলাধারটী একটু বড় দেখায়, সেই জন্য পালকেরা উহাকে 'গ্যাজ' মনে করিয়া কাটিয়া দেয়, তাহাতে প্রায় শতকরা নব্বইটী ময়না মারা পড়ে।

বর্ষান্তে ময়না পালক বদলায়। এ সময় মোটা কাপড় দিয়া খাঁচা বেষ্টন করিয়া রাখা উচিত। ঠাণ্ডা বা বেশী গরমে তখন ক্ষতি করে। পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া তখন নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ ময়নাকে মধ্যে মধ্যে মাছ ও মাংস খাইতে দেন।

ময়নার খাঁচায় দুইটী পাত্র দেওয়া হয়। একটীতে ছাতু, অপরটীতে জল। কুঁচিলা ফল ইহাদের প্রিয়। ময়নার আহার্য্য রাখিবার জন্য চীনামাটীর পাত্রই প্রশস্ত। আহার্য্যের গুণের তারতম্যে ময়নার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। এ জন্য সকল প্রতিপালকের ময়না খাঁটী এক বর্ণের দেখা যায় না। একটু একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ময়না পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* এই 'মডারেট' ময়নাটিকে ঐ জাতীয় উদার-সংঘের সভাপতি করিলে হয় না?

আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির কৃষিকার্য্য।

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার আলোচনা লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইব। অন্য প্রসঙ্গবশতঃ একটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

মহাপ্রাজ্ঞ ম্যাক্সমূলর মহোদয় তাঁহার 'Science of Language' নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৯-৪৩ পৃষ্ঠায় এবং 'The Homes of the Aryas' নামক পুস্তকের ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, লাটিন ও গ্রীক ভাষার *ar*, *aro* ও Anglo-Saxon ভাষার *erian* দ্বারা *earing* অর্থাৎ *Ploughing* (কৃষি) বুঝায়। তিনি বলেন,—এই ভাষাগুলির *ar* (অর) ধাতু হইতে বৈদিক 'আর্য্য' ও 'উর্ব্বরা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'উর্ব্বরা' শব্দ 'অরা' ও 'বরা' যোগে গঠিত, তিনি ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ঋগ্বেদের ৮।৪।১৬ ও ৮।২৬।৩ ঋকের 'উর্ব্বরা' শব্দ লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রীক ও লাটিনের 'অর' (ar) ধাতুর অর্থ *to stir* ও *earing* হইলেও, সংস্কৃতে 'অর' ধাতু দ্বারা কিংবা 'অরা' ও 'বরা' যোগে কৃষিকার্য্য বুঝায় না। গ্রীক ও লাটিনের এই 'অর' (ar) ধাতু দ্বারা বৈদিক 'আর্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন নহে। 'অর' ধাতু সংস্কৃতে আছে কি না, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার উত্তর দিবেন।

বৈদিক 'উর্ব্বরা' শব্দের অর্থ,—শস্যদায়িনী ভূমি। এক ভাষার শব্দের সঙ্গে অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্যের তুলনা করিয়া অভিন্নতা সপ্রমাণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক কার্য্য।

একটী কথা বলিয়া রাখি। গ্রীকেরা হিব্রুভাষীদের প্রতিবেশী জাতি। আরবী ও হিব্রুর অনেক শব্দ গ্রীক ও লাটিনের কুক্ষিগত হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বৈদিক 'উর্ব্বরা' শব্দের সঙ্গে হিব্রুর কোনও সদৃশ্য আছে কি না, একটু আলোচনা করিব।

হিব্রু ভাষায় 'অদামা' শব্দের অর্থ ভূমি (Genesis 1—25)। বৈদিক 'অদিতি' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও, ঋগ্বেদের ১।৪৩।২ ঋকে যে 'অদিতি' শব্দ আছে, বেদজ্ঞ বিখ্যাত সায়নাচার্য্য মহোদয় তাহার অর্থ 'ভূমি' করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৫।৪৩।৬, ৭।৩৬।৮, ১০।৯২।৫ ঋকে যে 'অরমতি' শব্দ আছে, সকলে তাহার অর্থ মহী বা ধরিত্রী বলেন। পারসীকদের আবেস্তা গ্রন্থে বৈদিক এই 'অরমতি' Spenta-Aramaiti নামে 'Goddess of earth' রূপে

পরিচিত। হিব্রু ভাষায় 'অর' অর্থে *'to stir up'* (Job 41—10, Deut 32—11) এবং 'অরা' অর্থে ভূমি (Ezra 5—11, Jermia 10—11)। হিব্রুর 'এরেদ' (earth ?) অর্থে ভূমি (Genesis 1—1)। সংস্কৃত ও হিব্রু, উভয় ভাষায় 'বর' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, উত্তম (Song of Solomon 6—9)। হিব্রুতে 'বর' শব্দের আর একটি অর্থ শস্যও বটে।

ঋ ধাতুর অর্থ,—গমন। সকলে বলেন, তাহা হইতে 'আর্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন। 'এবার' নামক ব্যক্তির (Genesis 10—21) বংশধরগণই পরবর্ত্তী কালে 'ইব্রি' নামে পরিচিত। এই 'ইব্রি' শব্দের অর্থ,—Passer-over। যাঁহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'ইব্রি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ইব্রীয় জাতি যেমন পশুপালক, তেমনই কৃষি-জীবী (Genesis 26—12, Deut 19—14, Ruth, 1 Kings 19—19, Proverbs 22—28) ছিলেন। অন্য পক্ষে, প্রাচীন আর্য্যজাতি যেমন কৃষক, তেমনই পশুপালক (১।৯২।৭-৮, ১।২৪।১৫-১৮, ৮।১৯।২, ৮।২৫।৪, ৬।৪৭।২০, ৭।৬২।৫, ৭।৭৭।৪ ঋক) ছিলেন। ঋগ্বেদ-পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্যগণ কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষা পশু-পালনের উপর অধিক নির্ভর করিতেন। প্রাচীন আর্য্য ও ইরাণীগণ যে মরুভূমিবাসী যাযাবরদের ন্যায় বস্ত্রাবাস বা তাঁবুতে বাস করিতেন, তাহা Vendidad 8—9 পদ ও অন্যান্য বহু প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

সংস্কৃতে 'কৃ' হইতে কর, কর্ত্তন, ক্ষোদন, খনন, উৎকীর্ণ নিষ্পন্ন। হিব্রুর 'কর' শব্দ দ্বারা খনন (2 Kings 19—24, Genesis 26—25, Job 24—16) এবং 'কারা' শব্দে দ্বি-ভাগ করা (Genesis 37—29) বুঝায়। ঋগ্বেদের ১।৪।৬ ঋকের 'কৃষ্টয়' ও ৪।৫৭।৪ ঋকের 'কৃষ' শব্দের অর্থ কৃষক ও কর্ষণ। হিব্রুর 'কারাষ' (Deut 22—10, Judges 14—18, 1 Samuel 8—12) ও 'কারিষ' শব্দের (Genesis 45—6, Exodus 34—21) অর্থও কৃষক এবং কৃষি। হিব্রুর 'কারাষ' শব্দে যে প্রকার কৃষক ব্যতীত শ্রমজীবী, শিল্পী বুঝায় (2 Samuel 5—11, 1 Kings 7—14, Isaiah 40—20, Hosea 8—5) সেই প্রকার বৈদিক 'কৃষ্টি' শব্দে (২।২।১০, ৬।৩১।১ ঋক) শ্রমজীবী শিল্পী বুঝায়। ঋগ্বেদে (৮।১৬।৯ ঋক) 'কৃষ্টয়' শব্দ আর্য্যগণের গৌরবাত্মক বিশেষণ। 'কারাষ' শব্দও বাইবেলে (Ezekid 21—31) ইব্রীয়দের দক্ষতা-জ্ঞাপক উপাধি। 'কারাষ' শব্দযোগে আধুনিক জাতা

নামক স্থানের পূর্ব্ব দিকে একটি স্থানের 'কারাষিম' (কৃষকপুরী) নামকরণ হইয়াছিল (1 Chron 4—14)।

ঋগ্বেদে যে 'ধানা' ও 'ধান্য' শব্দ আছে, বিখ্যাত সায়নাচার্য্য মহোদয় সর্ব্বত্রই তাহার অর্থ 'ভৃষ্টযব' করিয়াছেন। কিন্তু ৪।২৪।৭ ঋকের "পচাৎ-পক্তীরুত ভৃজ্জাতি ধানাঃ", ৫।৫৩।১৩ ঋকের "যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহধ্বে অক্ষিতম্", ৩।৩৬।৮ ঋকের "হৃদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ", ৬।২৯।৪ ঋকের "পক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ" এবং ১০।৯৪।১৩ ঋকের "বপন্তো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ" উদ্ধৃত ঋকের ভৃজ্জাতি ধানা, ধান্যবীজ, সোমধানা ইত্যাদির 'ধানা' বা 'ধান্য' শব্দের অর্থ ভাজা যব হইতে পারে না। এই ধানা বা ধান্য শব্দের অর্থ সাধারণ খাদ্যশস্য হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। খাদ্যশস্য (Grain) হিব্রুতে 'দাগান' (Genesis 27—28) এবং সংস্কৃতের ভগিনী পারসীতে 'দানা' নামে পরিচিত। হিব্রুতে শস্যের অপর নাম,—শেবির। কখনও কখনও দ্রাক্ষারস পর্য্যন্ত 'দাগান' পর্য্যায়ভুক্ত। ৩।৩৬।৮ ঋকের 'সোমধানা' শব্দের অর্থ কি হওয়া উচিত, তাহা বিচারসাপেক্ষ।

ঋগ্বেদের ১।১৬১।১৪, ১।১৬৪।১২ ঋকে ষড়ঋতুর প্রসঙ্গ ও ৭।৬৬।১১, ৭।১০৩।৯, ১০।৯০।৬, ১০।১৬১।৪ ঋকে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুর নাম আছে। শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ থাকিলেও, হেমন্ত ঋতু লইয়া ঋতু ছয়টি।

'বর্ষ' শব্দের অর্থ সেচন, বৃষ্টি, বৎসর। বর্ষা অর্থে বৃষ্টি। 'বর্ষ' শব্দের অপর অর্থ বৎসর। মণ্ডুকদের স্তুতি-বাচক ঋগ্বেদের ৭।১০৩।১ ঋকের "সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ" ও ৯ম ঋকের "সংবৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্ম্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্" ইত্যাদি ঋকে যে 'সংবৎসর' শব্দ আছে, দত্ত মহোদয় তাহার অর্থ বৎসর সম্পূর্ণ হওয়া, এবং ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদক গ্রিফিথ মহোদয় ১ম ঋকে "They who lay quiet for *a year*", এবং ৯ম ঋকে "Soon as the Raintime in the *year returneth*" অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে, ঋগ্বেদ-রচনা-কালে প্রাচীন আর্য্যগণ যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশে সংবৎসর-অন্তে প্রাবৃষ আগত অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টিপাত হইতে বর্ষ বা বৎসরের গণনা আরম্ভ হইত। ইহার সমর্থনকল্পে আরও কিছু বলিতে হইবে।

ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র দেখা যায়, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র বা অহিই জল-অবরোধক জীমূত-

বাহন ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়া ‘শরৎ’-(৪।১৯।৮ ঋক)-কালে সিন্ধু অর্থাৎ আকাশের অবরুদ্ধ জলরাশি মুক্ত করিয়া আর্য্যদের উপকার করিতেন। ঋগ্বেদের ১।১৩১।৪, ১।১৭৪।২, ৬।২০।১০ ঋকে ‘শারদীপুর’ শব্দ আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সায়না-চার্য্য মহোদয় নিজ ভাষ্যে তাহার ‘শারদী সংবৎসরসম্বন্ধিনী সংবৎসরপর্য্যন্তং প্রাকারপরিখাদিভির্দৃঢ়ীকৃতা’ এবং সংবৎসরপর্য্যন্তং দৃঢ়ীকৃতঃ’ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদক দত্ত মহোদয় ‘শারদীপুরী’ এবং ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ মহোদয় ‘Autumnal forts’ অনুবাদ করিয়াছেন। এই ‘শারদীপুর’ই জল-অবরোধক ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের বাসস্থান।

ঋগ্বেদের ১।১৭৪।২ ঋকে “দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দ'ৎ। ঋণোরপো অনবদ্যার্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ” এবং ৬।২০।১০ ঋকের “সনেম তেঽবসা নব্য ইন্দ্র প্র পূরবঃ স্তবন্ত এনা যজ্ঞৈঃ। সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম্ম শারদীর্দর্দ্ধন্দাসীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্” ঋক-বাক্যের দ্বারা জানা যায়, ইন্দ্র ‘শারদীপুর’ ভেদ বা জয় করিয়া যজ্ঞবিঘাতক বৃত্র কর্তৃক শারদীপুরে অবরুদ্ধ জলরাশি আর্য্যরাজা পুরুকুৎস এবং প্রজাদের জন্য প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ৪।১৯।৮ ঋকের “পূর্ব্বীরুষসঃ শরদশ্চ গূর্তা বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্” অর্থ—দত্ত মহোদয় ‘ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া তমিস্রা দ্বারা আচ্ছাদিত বহু উষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করিয়াছেন, এবং জল বিমুক্ত করিয়াছেন”, এবং গ্রিফিথ মহোদয় “Through many a morn and many a lovely autumn, having slain Vritra, he set free the rivers” অনুবাদ করিয়াছেন। উদ্ধৃত ঋকের ‘সিন্ধু’ শব্দের অর্থ নদী সঙ্গত নহে। ইহার অর্থ জল বা আকাশ হওয়াই সঙ্গত। বৃত্রের এই শারদীপুর ভেদ বা জয় কিংবা অতিক্রম না হইলে, আকাশ বা নদীর বারিরাশি মুক্ত হইত না। সংবৎসর সম্পূর্ণ (৭।১০৩।১, ৯ ঋক) ও বৃত্রের শারদীপুরী ভেদ বা অতিক্রম (১।১৭৪।২, ৬।২০।১০ ঋক) হইলেই, প্রাচীন আর্য্যনিবাসে আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিক হইতে বৃষ্টিপাত, বর্ষ ও বর্ষা আরম্ভ হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের বর্ষা ঋতুতে ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে বৃষ্টিপাত হইত না।

ভারতবর্ষে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা লইয়া উত্তরায়ণ এবং শরৎ, হেমন্ত, শীত লইয়া দক্ষিণায়ন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।১।৩।৪)। ভারতবর্ষে এই উত্তরায়ণের গ্রীষ্ম ঋতুর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ হইতে বৃষ্টিপাতের আরম্ভ, এবং শরৎ ঋতুতে (ভাদ্র, আশ্বিনে) ক্রমশঃ কম হইয়া কার্ত্তিকের প্রথম ভাগেই শেষ হয়। ঋগ্বেদের ৬।৩২।৫ ঋকের

"স সর্গেন শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্"-এর অর্থ দত্ত মহোদয় "স্বভাবত তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট্ দক্ষিণ হইতে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন", এইরূপ করিয়া টীকায় বলেন,—'ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয়।' ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক Mr. Griffith উক্ত ঋকের 'Indra with rush and might sped by his coursers, hath swiftly won the *waters from southward*' অনুবাদ করিয়াছেন। এ স্থলে 'দক্ষিণতঃ' শব্দের অর্থ জটিল হইলেও, ইহা দ্বারা দক্ষিণায়ন বা দক্ষিণ দিক মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের ২।৫।৬ ঋক এবং ৫।৮৩।১ ঋকের "তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম" দ্বারা জানা যায়, যবের জন্য বৃষ্টিপাতে ভূমি সিক্ত হওয়া আবশ্যক। ঋগ্বেদের ৫।৮৩ সূক্ত, বিশেষতঃ ঐ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখা যায়, ওষধি (যব) বৃষ্টিপাতে অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হয়। ভারতবর্ষে বর্ষাকাল-অন্তে যব-বপন আরব্ধ ও পুনঃ বর্ষা-আগমনের পূর্ব্বেই কর্ত্তন শেষ হয়। দক্ষিণায়নের যব-বপন-সময় কার্ত্তিক হইতে ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে বৃষ্টিপাত হইত, ইহা দ্বারা তাহা আরও সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।১১৭।২১ ঋকের 'যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা', ৮।২২।৬ ঋকের 'দশস্যন্তা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ' দ্বারা জানা যাইতেছে, অশ্বিদ্বয় মনু নামক ব্যক্তি বা প্রথম মনুষ্যকে লাঙ্গল দ্বারা যবের চাষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঋকে 'পূর্ব্য' শব্দ থাকায় গ্রিফিথ মহোদয় তাহার অনুবাদে 'Ploughed first harvest' করিয়াছেন। ইহাতে এই বুঝা যায়, আদিম মনুষ্য বৈদিক ভূমিতে প্রথমেই যবের চাষ শিক্ষা বা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে যবই বৎসরের প্রথম ফসল। যবের চাষের সময়ে বৃষ্টিপাত ও বর্ষা ও বর্ষগণনা আরম্ভ হইত।

এক্ষণে ইব্রীয় জাতি ও দেশের কথা আলোচনা করিব। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি দুই প্রকার প্রথায় বৎসর গণনা করিতেন। প্রাচীনতর প্রথায় আমাদের আশ্বিন হইতে 'তিসরি' নামক প্রথম মাস (1 Kings 8—2) গণনা আরম্ভ হইত। যেমন আমাদের দ্বিতীয় মাসের নাম বৃষ, তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির প্রাচীনতর প্রথার দ্বিতীয় মাসের নাম 'বুল' (1 Kings 6—38)। হিব্রু ভাষায় 'বুল' শব্দের অর্থ বৃষ। মহাপুরুষ মুসার সময়ে যে মাসে ইব্রীয় জাতি মিসর হইতে দাসত্বমুক্ত হয়েন, সেই 'আবিব' মাস হইতে (Exodus 12—2) তৎপর বৎসর গণনা-আরম্ভ পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রাচীন কানান (জুডিয়া) ভূমিতে বৎসরে দুইবার (Joel 2—23, Deut 11—14) বৃষ্টিপাত হয়। প্রথম বৃষ্টিপাত যব-বপনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্বিনের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া হিমের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় (Song of Solomon 2—11)। অন্তিম বৃষ্টি চৈত্রের শেষে আরম্ভ হইয়া অল্পসময়মাত্র স্থায়ী থাকে। সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত আকাশে মেঘ দেখা যায় না। অধিকন্তু সেই সময়ে আকাশে পূর্ব্বীয় শুষ্ক বাতাস (Genesis—41—6, Hosea 13—15) বহিতে থাকে। দক্ষিণায়নের ভাদ্র আশ্বিন (শরৎ ঋতু) অন্তেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রায়ই দক্ষিণ দিক হইতে বৃষ্টি আসিয়া থাকে (Job 37—9, 17 Psalms 78—26, 27 and 126—4)। নোয়ার জল-প্লাবন দক্ষিণায়নের শরৎঋতু-অন্তেই 'বুল' (কার্ত্তিক) মাসে (Genesis 6—11) হইয়াছিল। কানান ভূমিতে যবই বৎসরের প্রথম শস্য (Exodus 9—31, Ruth 2—23)। আশ্বিনের শেষ হইতে যবের বপন ও চৈত্রের শেষ হইতে কর্ত্তন আরম্ভ হয়। যব-বপন বা আশ্বিনের শেষ হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

প্রাচীন মিসরে নদীর জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত (Deut 10—11)। কিন্তু বাইবেলের প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে (কানানে) কৃষিকার্য্য জন্য জলসেচনের আবশ্যক হইত না। বৃষ্টির জলে কৃষিকার্য্যাদি নিষ্পন্ন (Deut 11—11) হইত। বৈদিক ঋষিগণ যেমন কৃষি ও পশ্বাদির জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বৃষ্টিদাতৃরূপে অর্চ্চনা করিতেন, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয় জাতির কোনও কোনও শাখা বৃষ্টিদাতা বিশ্বাসে কোনও দেবতাবিশেষের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেন (Jermia 41—22)।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, 67° North latitude পর্য্যন্ত শীতপ্রধান স্থানেও যব শস্য জন্মিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে যব ভারতে উৎপন্ন হইত না। ইহা আর্য্যদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন কালে লোহিত সাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এসিয়া ভূমিতে Hordeum-distichon জাতীয় যব বিনা চাষে (বন্য-জাত-রূপে) জন্মিত (The Plants of the Bible, 61.)।

ঋগ্বেদে যব ব্যতীত গো-ধূম কি অন্য কোনও প্রকার শস্যের নাম আমার চক্ষে পড়ে নাই। সর্ব্বত্রই কেবলমাত্র যবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনে হয়, ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে যব ব্যতীত অন্য শস্য উৎপন্ন হইত না। ঋগ্বেদ-পাঠে জানা যায়, যব আর্য্য-জনসাধারণের (১০।৪২।১০ ঋক) খাদ্য শস্য ছিল।

যব হইতে প্রস্তুত হব্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইত। তৎকালে যব পশ্বাদিরও যে খাদ্য শস্য ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদের বহু ঋকে ইন্দ্রাদি দেবগণের অশ্বকল্পনা ও যব-শস্য-ভক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারি।

প্রাচীন ইব্রীয় জাতি যে দেশে বাস করিতেন, সেই কানান দেশে গম উৎপন্ন হইলেও, যবের চাষ ও ব্যবহার অধিকতর ছিল। যবই ইব্রীয় জনসাধারণ ও অশ্বাদির প্রিয় খাদ্য (Judges 7—13, 1 Kings 4—28 2 Kings 7—1, 16 Leviticus 27—16) ছিল। বাইবেলের বিখ্যাত রূথের বৃত্তান্ত কৃষি ও শস্যাদির কথায় পরিপূর্ণ। এই রূথের কথার ১।২২ ২।১৭, ২।২৩, ৩।২, ৩।১৫,১৭ ইত্যাদি বহু পদে কেবল যবের নাম উল্লেখ দেখি। একটি মাত্র পদে (২।২৩) গমের উল্লেখ আছে। ভাববাদী ইলিশায় বিশখানা যবের রুটী দ্বারা (2 Kings 4—42) শতাধিক ব্যক্তিকে ও মহাত্মা যিশুখৃষ্ট পাঁচখানা যবের রুটী দ্বারা নিস্তার-পর্ব্বে পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন (John 6—9, 13) করাইয়া অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী ইব্রীয় নারীর প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশে যিহোবার নিকট যাজক কর্ত্তৃক যে ঈর্ষার নৈবেদ্য উৎসর্গ হইত, তাহা কেবল মাত্র যবের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া (Numbers 5—11—31) বিধি। এই প্রকার আর্য্য-নারীর ব্যভিচার-পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তে যে হবি উৎসর্গ করিতে হইত, তাহাও যবময় হওয়া আবশ্যক (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৪।২।২০।২।৪।২।২৩)। উভয় জাতির এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তে নিবেদিত যবের হব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হইত, (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।২ ব্রাহ্মণ; Numbers 5—26)। এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে আর্য্য-নারী (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।২।২০) ও ইব্রীয় নারীকে (Numbers 5—19) তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে একই প্রকার প্রশ্ন করিবার বিধি দেখা যায়। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি 'নিস্তার' নামক (Easter) পর্ব্বে তাড়ীশূন্য যবের পিষ্টক ভোজন করিতেন।

প্রাচীন ইব্রীয় জাতি পরবর্ত্তী প্রথায় গণিত প্রথম মাসে যবের শীষ উদ্গত হয়, এই জন্য সেই মাসের নাম 'আবিব' (যবের শীষ) এবং তৃতীয় মাসের নাম 'সীবান' (কৃষি-উৎসব) রাখিয়াছেন। এ দেশে অগ্রহায়ণ মাসে ধান্যের শীষ উদ্গম হয়, এই জন্য সম্ভবতঃ ঐ অনুকরণে অগ্রহায়ণ মাসের অপর নাম মার্গশীর্ষ। হিব্রুতে শস্যের শীষের নাম 'শীবোলেথ।'

ঋগ্বেদের ৪।৫৭ ও ১০।১০১ সূক্তে যেমন লাঙ্গল, যোয়াল, ফাল ইত্যাদি নানা প্রকার কৃষি-যন্ত্রের নাম আছে তেমনই হিব্রু বাইবেলের বহু পদেও নানা প্রকার কৃষিযন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

কানানভূমি প্রাচীন কালে পশ্চিম এসিয়ার শস্যভাণ্ডার-স্বরূপ (1 Kings 5—11, Acts 12—2) ছিল। বাইবেলের অনেক পদে শস্যের খামার ও শস্য-মর্দ্দন-স্থানের প্রসঙ্গ (Deut 25—4 and 2 Samuel 24—22) আছে।

'বৈদিক 'উদর্ব' (২।১৪।১১ ঋক) হিব্রু ভাষায় 'ইন্দেরিম' (Deut 2—35) ও সংস্কৃতের কুস্থল হিব্রুতে 'কারুত' (Amos 1—3) ও এদেশীয় শস্যের গোলা হিব্রুতে 'গোরেন' (Job 39—12) ও মরাই হিব্রুতে 'মোরগ' (2 Samuel 24—22) ও 'মেগুরা' (Hagg 2—19) নামে পরিচিত।

ইলীশায়ের দ্বাদশ যোড়া বলদ দ্বারা হাল-বহন (1 Kings 19—19) ও শস্যমর্দ্দনসময়ে গরুর মুখে জালতি বাঁধার নিষেধাজ্ঞা (Deut 25—4) ভূমির সীমানা স্থির রাখার (Deut 27—17 and Proverbs 22—28, 23—10) এবং কৃষি-উৎসব-পালনের বাধ্যতা-সূচক আজ্ঞা (Exodus 23—16, 34—22) দ্বারা ইব্রীয় জাতির কৃষি-প্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংস্কৃতের কর্ত্তরী (কাস্তে) সহ হিব্রুর 'কেরমেস', এবং প্রচলিত কুলা সহ হিব্রু ভাষার 'কেবরা'র তুলনা হইতে পারে। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির মধ্যে ভূমিতে সার দিবার প্রথা (Psalms 83—10) ছিল। তাঁহারা অস্থি-সারের বিষয় অবগত (Jermia 8—2) ছিলেন।

প্রাচীন পারসীক জাতি একটি বলদ ও একটি গর্দ্দভ একত্র যুতিয়া চাষ নির্ব্বাহ করিতেন। মহাপুরুষ মুসার সময় হইতে এই প্রকারে চাষ নির্ব্বাহ করা নিষিদ্ধ (Deut 22—10) হয়। ঋগ্বেদের ১।২৩।১৫, ১।১১৭।২১, ৮।২০।১৯ ঋক ও ৪।৫৭ সূক্তে দেখা যায়, প্রাচীন আর্য্যজাতি ইব্রীয়দের ন্যায় (1 Samuel 14—14, Job 1—14) কেবল বলদ দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

ইব্রীয় জাতি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন (Deut 13—9) করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে আবাদ-যোগ্য ক্ষেত্র ছয় বৎসর অন্তর চাষ ক্ষান্ত রাখিয়া বিশ্রাম দিবার বিধি (Exodus 23—10, 11) ছিল।

আর্য্যদের ন্যায় প্রাচীন পারসীক জাতি (Vendidad 19—19) এবং সেমেটীক জাতি (Hibbert Lecture by Prof. Sayce 438) যবের দ্বারা মাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিতেন। ভূম্যোৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ প্রাচীন আর্য্য রাজগণের (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫—২৫) Huan Tsuang by Beal

11—87) এবং পঞ্চমাংশ মিসরীয় ফেরোয়া রাজাদের (Genesis 41—34) ও দশমাংশ ইব্রীয় অধ্যক্ষের (Genesis 14—20, Nahimia 13—12) এবং দশমাংশ ও শস্যবিশেষে চতুর্থাংশ প্রাচীন সিনিয়র ও আক্কাদ (মেসপটেমিয়া) দেশের ভূমির মালিকের প্রাপ্য (The Primer Assyriology 112) ছিল।

ইব্রীয় জাতি ভূমি পরিমাপ-প্রথা অবগত (Psalms 60—6, Amos 7—17) ছিলেন। মিসর হইতে দাসত্বমুক্তির পর মহাপুরুষ মুসা ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে সাত হাত নল ও মানরজ্জু দ্বারা ভূমি জরীপ ও বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন (Psalms 78—55)। প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যেও মান-দণ্ড দ্বারা ক্ষেত্রমাপ-প্রথা (১।১১০।৫, ৫।৮১।৩ ঋক) প্রচলিত ছিল। লেভিটিয়া-বিধানের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মুসার পূর্ব্বে ভূমি বিক্রয় হইলে তাহা চিরকালের জন্য হস্তান্তরিত (Genesis 23/15—16) হইত। কিন্তু তাঁহার সময় হইতে বিক্রেতা সাত বৎসর অন্তর মূল্য প্রত্যর্পণ করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রীত ভূমি ফিরাইয়া লইতে পারিত। অধিকন্তু মূল্য-প্রত্যর্পণে অক্ষম হইলে ৪৯ বৎসর ৬ মাস ৯ দিবস অন্তর অনুষ্ঠিত 'য়োবেল' নামক Jubilee) মহোৎসবে বিক্রীত ভূমি আপনা হইতে মুক্ত হইয়া (Levi 25—23—30) পূর্ব্ব মালিকের স্বত্বাধিকারে আসিত। ভূমিতে কাহারও চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে না। যেহেতু সমস্ত ভূমির মালিক যিহোবা (Levi 25—23)। উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে জার্ম্মাণ ভাষার কল্যাণে যে প্রকার 'ইয়াইয়া' 'আইহান' ইত্যাদি নাম যিহোবা ও যোহন (John) রূপে পরিবর্ত্তিত, তদ্রূপ এই 'য়োবেল' শব্দ—জার্ম্মাণে 'য়োবেল'—ক্রমে ইংরাজিতে জুবিলী (Jubilee) রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

সহযোগী সাহিত্য।

রুষ-বিপ্লব।

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট একটী স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ইউরোপীয় মহাহবের সূচনা। ১৯১৬ সালের মার্চে ইহার প্রথম পর্ব্বের সমাপ্তি—রুষের রাষ্ট্রবিপ্লব। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের আনুষঙ্গিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল, বর্ত্তমানে অতীতের প্রতিহিংসা ও প্রায়শ্চিত্ত, রুষসম্রাটের নিধন। গত ১৬ই জুলাই ১৯১৮, যুগবাহী একতন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরাধিকারী, রুষের নিকোলাস নামশেষ হইয়াছেন। জগতের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও অবিসংবাদিতশক্তি সম্রাট্ বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত, আজ অতীতের গর্ভে বিলীন।

বাইজানটাইন্ সীজার, কনষ্টাণ্টাইন্ মনোমেকাস দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌত্র তৃতীয় Vladimirকে রুষের রাজমুকুট উপহার দেন। রুষের রাজসিংহাসন এককালে কনষ্টান্টি-নোপলের সম্রাটগণের অধিকারে ছিল। ইহা রাজকুমারী Sophia Paleologus কর্তৃক মসকোতে আনীত হয়। রাজকুমারী সোফিয়া তৃতীয় Ivanকে বিবাহ করেন। ইঁহাদেরই অধস্তন পুরুষ এতাবৎকাল এই রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় অষ্টাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই সিংহাসনের উপরে, এই মুকুট মস্তকে মসকোর Cathe-dral of Assumptionএ, নিকোলাস—রাজ্যাভিষেক বা Coronation নহে,—রুষিয়ার পিতৃদেবতা (Little Father) পদে বরিত (Consecration) হন। ইঁহারই পিতার বরণ উৎসবের বর্ণনায় প্রুসীয়ার প্রবীণ সেনানী স্বনামধন্য Motke লিখিয়াছেন—"পৃথিবীর যাবতীয় অধিবাসীর দশমাংশের সর্ব্বময় ভাগ্যবিধাতা, রুষের সম্রাট্ পার্থিব ক্ষমতায় ধরাধামে অদ্বিতীয়। জগতের চতুঃপ্রান্তে বিস্তৃত শাসন, খ্রীষ্টান ও ইহুদী, মুসলমান ও অবিশ্বাসী সকলেরই পালনীয়। ষাট কোটি মানবের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা, ইঁহার আদেশ চীনের প্রাচীর হইতে ভিশ্চুলার তট, পোলের সাগর হইতে আরারাটের শৈলশ্রেণী, সর্ব্বত্র পূজিত ও সম্মানিত। ইঁহার অঙ্গুলিহেলনে অর্দ্ধকোটী সেনা প্রাণদানে অগ্রসর ইত্যাদি" [Moltke's Diary]। ইঁহারই পুত্র, সিংহাসনচ্যুত, কারারুদ্ধ নিকোলাস, গত জুলাইএ, বিচারের প্রহসনে, বিপ্লব-পন্থী বলশেভিকের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্-আভনের কবির অমর উক্তি—

> But yesterday the word of Cæsar might
> Have stood against the world; now lies he there,
> And none so poor to do him reverence.—

অব্যর্থ হইয়াছে। যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধির সম্মানে সমগ্র জগতের শক্তিপুঞ্জ সমবেত হইতেন, তাঁহার নশ্বর দেহের শেষ পরিণাম লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত। এরূপ ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব বোধ হয় বাঞ্ছনীয়, জানিবার চেষ্টাই মূঢ়তা।

গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে দেহবিসর্জ্জন রুষসম্রাটগণের ললাটলিপি; রোগশয্যায় পরলোক যাত্রার দৃষ্টান্ত বিরল; কিন্তু শাসনচ্যুত, শৃঙ্খলিত ও বিচারের নামে প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ অভিনব।

চারি বৎসর পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত কল্পনারও অতীত, আজ তাহা কঠোর বাস্তবে পরিণত। রুষ-সম্রাটের জীবন এখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিভীষিকাময়। নিকোলাসের পিতা আলেক-জান্দারের অনুষ্ঠিত 'দাস-মুক্তি' (Emancipation of Serfs) উপলক্ষে বিলাতের বিখ্যাত Times পত্রের নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

'রুষের সাম্রাজ্য এতই বিস্তৃত ও প্রকাণ্ড যে, সম্রাট স্বয়ং তাহাদের যথার্থ আয়তন অবগত নহেন। কোটি কোটি প্রজা কখনও তাঁহার মুখদর্শনেও সমর্থ হয় না। কিন্তু এক জন নিতান্ত নগণ্য কার্ষাণ ধনীদিগের ভাগ্যও রুষসম্রাটের পক্ষে লোভনীয়।...তাঁহার বংশের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লিখিত; প্রাসাদের মধ্যেই বিষের আশঙ্কা। সভাসদের মধ্যে পরিবারের অন্তরালে Harmodius-এর ছুরিকা লুক্কায়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক বিপ্লববাদী ও ষড়যন্ত্রী। তাঁহারাই পরিচ্ছদে আবৃত, অথচ দুষ্ট কুচক্রী শত্রুর মিত্র ও গ্রাম্য লেখক ও প্রচারক। সমরবিভাগের তড়িতবার্ত্তাবহেরা তাঁহার সংবাদ গোপন ও আদেশ অথবা পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা করে না। অভিজাতকুল প্রাসাদে গুপ্ত মন্ত্রণায় মগ্ন; তাঁহারই চেষ্টায় মুক্ত কৃষক কুটীরে অভিশাপবর্ষণরত। Czarco-selo-র প্রহরীস্বরূপে প্রাসাদ-রক্ষক সেনার নায়কগণ তাঁহার হত্যার জন্য অধীনস্থ সৈন্যগণকে উৎকোচ দানে প্রবৃত্ত। ধর্ম্মবিধানের উপাসনামন্দিরগুলিও বিষ ও বিদ্রোহ মন্ত্রের প্রচারক্ষেত্র। সমগ্র রুষের প্রভু হইলেও, সম্রাট মানবমাত্র; এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের অশান্তি ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা উপেক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। জার স্বয়ং নিরপরাধ; অপরের পাপের ফলভোগী। হতভাগ্য Louis XVI. যেরূপ পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য দায়ী হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় আলেকজান্দারও সেইরূপ পূর্ব্বগামীদিগের পাপ ও প্রমাদের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছেন।'

দ্বিতীয় আলেকজান্দারের পুত্র নিকোলাস পিতৃ-ঋণের অবশিষ্টাংশ পরিশোধ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। মধ্যযুগের শান্তিহীন সাম্রাজ্য ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে; তাহারই প্রথম বাণী বহন করিয়া জার অনন্তের পথে মহাযাত্রী। ঋণ পরিশোধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রতিহিংসার প্রতিভূস্বরূপ জারিভিচ (Czarivitch) শত্রু হস্তে বন্দী। পিতৃলোক হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ হতভাগ্য বালকের উপর সর্ব্বনিয়ন্তার করুণাভিক্ষা করুন। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জলধিগর্ভে মজ্জমান বিদীর্ণ ভেলার ন্যায় জারতনয়ের তরুণ জীবন, নলিনীদলগত বারিবিন্দু অপেক্ষাও অস্থির ও চঞ্চল। *

জার-সাম্রাজ্য চিরতরে লুপ্ত; শতাব্দীর পীড়ন ও কু-শাসনের স্মৃতি পড়িয়া আছে। তাঁহাদের পরিত্যক্ত ক্ষমতালাভের আশায় প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত। রুষের শত্রু, জগতের শত্রু জার্ম্মাণ দ্বারে; আধিব্যাধি ও দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশানে পরিণত। বহির্দ্দেশে নৃশংস, প্রবল বৈরি, ভিতরে দারুণ অশান্তি; কিন্তু চিরপদদলিত রুষপ্রকৃতি অকস্মাৎ শাসন ক্ষমতার নেশায় বিভোর। বাগ্মী-বীর Kerensky অথবা শান্তিকামপ্রয়াসী Alexieff-এর সাধ্য নাই ইহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করেন। ফলে, কুশলী জার্ম্মেনের Kultur মুগ্ধ Lenin ও Trotsky, একচ্ছত্র-

* গত অগষ্টে জারিভিচ নিহত হইয়াছেন।

রুশী বিপ্লব রক্ষা করিবার আশায়, সাম্রাজ্যপন্থী জার্ম্মাণীর সাহায্যভিক্ষু। তাহারই জন্য Brest Litovsk এর বীভৎস সন্ধি এবং জার্ম্মাণীর প্ররোচনায় নবীন প্রজাতন্ত্র রুশিয়া সাধারণতন্ত্র মিত্রপক্ষের সহিত শত্রুতায় অগ্রসর। রুশিয়ার তথাকথিত প্রজাতন্ত্র শাসন হইতে উৎকট অরাজকতার আবির্ভাব হইয়াছে। "A century old misgovernment has been succeeded first by an idealistic, then an idiotic government which fast tends towards becoming no government."

রুষের বিপ্লব পাশ্চাত্য গগনের নিবিড় অন্ধকার, প্রতীচীর নীলাকাশে উড়াইয়া আনিতেছে। মার্ণ ও রাইনের ভৈরব কল্লোল ককেসাসের শান্ত প্রকৃতিতে শঙ্কার আবেগ জাগাইয়া তুলিতেছে। স্বয়ংসিদ্ধ সামরিক দৈবজ্ঞপাল পশ্চিম সীমান্তে এই যুদ্ধের পরিণতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; কিন্তু এই চারি বৎসরে দাম্ভিক মানবের বিচারশক্তির সসীমতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি। মানুষ আমরা, ভবিষ্যদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠামাত্র। প্রাচীর বিক্ষোভ ভারতের সর্ব্ববিধ অনিষ্টের নিদানভূত। সময় থাকিতে যথাসাধ্য ধন ও জন সাহায্যে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা স্বদেশবৎসল ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব (১৯০৩-৭) গবর্ণর Lord Lamington গত এপ্রিলে Pall Mall Gazette এ যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।

'জার্ম্মাণী রুসিয়ায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহার ফলে এসিয়াবাসীর মনে মিত্রশক্তির সামর্থ্যে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। দুঃসংবাদ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এসিয়াবাসীর বিশ্বাস যে, বিপুল রুষবাহিনীর শোচনীয় পতন ও রুষের যুদ্ধ হইতে প্রস্থানের কারণ অদম্য জার্ম্মাণীর দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ। বলা বাহুল্য, এবংবিধ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অতিরঞ্জনদুষ্ট ও ভ্রান্ত। কিন্তু জার্ম্মাণী বহু কাল যাবৎ প্রাচীতে যে জঘন্য চক্রান্ত ও কূট ষড়যন্ত্র চালাইয়া আসিতেছে, তাহাতে এসিয়াটিকগণের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে; সুতরাং তাহারা সহজেই এরূপ মিথ্যায় আস্থা স্থাপন করিবে।

এই চক্রান্ত যে কিরূপ গূঢ়, গভীর ও বদ্ধমূল, ইহা যে কিরূপ ভীষণ আগ্রহের সহিত পরিচালিত, সমগ্র দেশে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত ইহার ফল যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা প্রাচীর ইতিহাসে অনভিজ্ঞ এবং এসিয়াবাসীর মানসিক বৃত্তি, রুচি, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানহীন লোকে সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। ইহার এক প্রধান উদ্দেশ্য, লোকের মনে জার্ম্মাণীর সমরশক্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণার সৃষ্টি, লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যে জগতে জার্ম্মাণী অপরাজেয়, অখণ্ড্যশক্তি; বিশ্বের শক্তি উহার নিকট নতমস্তক। এই শক্তির চতুর্দ্দিকে এমন একটা অসাধারণ, কাব্যময় মহিমার জ্যোতিঃ দীপ্যমান, যাহাতে প্রতীচীর কল্পনা সহজেই মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হয়। তুর্কি ও পার্সিয়া এই মোহে মন্ত্রমুগ্ধ, রুষেও ইহার মোহিনী মায়া প্রস্ফুট। বস্তুতঃ, রুষের অভাবনীয় দুর্ঘটনায় জার্ম্মাণের সামরিক যশঃ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; কারণ, কার্য্যফল দেখিয়া তাহার প্রকৃত হেতু অনুসন্ধান কেহই করিবে না। এসিয়াবাসীগণ আপাততঃ জার্ম্মাণের সামরিক সাফল্যে বিচলিত ও চমৎকৃত হইবে;

তাহারা বিশ্বসংসারের প্রতি সাধারণ্য সংবাদ রাখে, শাসকগণের মহিমা তাহারা জানে না, তাহাদের নিকট শক্তিসামর্থ্য ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য একই নহে, তাহাদের বিশ্বাস যে পক্ষ পশুবলে শক্তিশালী জয়ী, ধর্ম্ম তাহারই দিকে।

ভারতের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, এই উৎকট নিখিল-জার্মানবাদ বা নিখিল-জার্মান-সমন্বয়-প্রয়াসের (Pan-Germanism) গতি রোধ করিতে হইবে। যদি জার্মানগণ পারস্য উপসাগরে আধিপত্যলাভ করিতে পারে, তাহারা বার্লিন হইতে আসিবার পথে বাগদাদে একটী মধ্যবর্ত্তী শিবির স্থাপন কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিবে এবং অনায়াসে সাগর ও আটকে ইংরাজ প্রভুত্বের অনিষ্ট চিন্তা করিবে। ইহাই জার্মান আশার মূলভিত্তি, কৈসরের স্বপ্ন-সাম্রাজ্য গঠনের কুহেলিকা। জার্মানীর এই চেষ্টা শুধু ইংরাজ নহে, এসিয়ার অপর দুইটী ক্ষমতা—চীন ও জাপানের পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর। চীন ও জাপানের সাহায্যে মধ্য ও দূর প্রাচীতে জার্মানীর এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবে।'

বিশাল বারিধির চলোর্ম্মিবিক্ষোভ রোধ হ; ইহার পরবর্ত্তীগণ সাধারণতঃ ভারতের অপরাপর শাসকবর্গ হইতে মনের অবিশালতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়া থাকেন। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' যে জাতির মূলমন্ত্র, তাহারা পশুবলকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, এ চিন্তা এসিয়াবাসীর ইতিহাস ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞানহীন ভারত প্রত্যাগত ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষেই সম্ভব। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারত যখন জ্ঞানগৌরবে অমানিশার অন্ধকারে উল্কার ন্যায় দীপ্যমান, অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির পূর্ব্বপুরুষ তখনও গুহাবাসী, ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, "The East was educated before Germany was peopled by its last barbarians, and in questions of self interest is expert byond any European parallel." (Liverpool Daily Courier). সুতরাং ভারতে জার্মানীর সর্ব্ববিধ কুটিল চক্রান্ত বিফল দেখিয়া ইঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

জার্মান ষড়যন্ত্রের বিশ্লেষণে লর্ড ল্যামিংটন কেবল সমরশক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন, প্রধান অংশটী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। নীটসে ও ট্রাইটস্কে বিশেষ ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে জার্মান কুলটুরের একমাত্র উদ্দেশ্য 'পুরুষোত্তম' বা 'অতি-মানব' (Superman) সৃষ্টি। শারীরিক শক্তি ও মানসিক উন্নতি এইরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টির ভিত্তি; সমরশক্তিতে রাজ্য জয় করিতে হইবে এবং তাহার পর পরাজিত জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কলাবিদ্যায়, এক কথায় তাহাদের চিন্তাপ্রণালীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হরণ করিতে হইবে। শেষোক্ত বিজয়ই আয়াসসাধ্য, মানসিক শক্তিসাপেক্ষ ও গৌরবজনক। এবংবিধ বিজিত জাতির ব্যক্তিগত অস্তিত্বই লোপ পায়। গ্রীক, শক, পহ্লব, হূন, পাঠান ও মোগলের সামরিক বিজয়ের পর, আজিও ভারত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও শিক্ষার মহিমায় অজেয়, পরাধীন হইয়াও চির স্বাধীন। লর্ড ল্যামিংটন অপেক্ষা বিসমার্কের বংশধরগণ ভারতবাসীর প্রকৃতি ও পুরাতত্ত্ব অধিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাই তাহারা ভারতের চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করিতে চায়, সেই জন্যই তাহাদের এসিয়াটিক চক্রান্তের জন্য এরূপ বিস্ময়। কিন্তু এই যুদ্ধ—বোধ হয় ভারতের প্রতি ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ—ভারতের জ্ঞানচক্ষু

উন্মীলিত করিয়াছে, তাহারা ঘনীভূত বিপদরাশির করাল কবল হইতে ফিরিয়াছে, সত্য ও সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত ঘৃণিত মিথ্যার প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছে, জার্ম্মাণীর নীচ ও পাপপঙ্কিল ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রই রহিয়া গিয়াছে।

ল্যান্সিংটন মহাশয়ের অভিপ্রায় এই যে, জাপানের সাহায্যে রুষের সম্মতি বা অসম্মতিক্রমে মধ্য ও দূর প্রাচীর শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। ফরাসী রাজভক্ত-পাদরীপক্ষ-সমরতন্ত্র (Royalist-clerical-militarist) Echo de Paris হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতের Times পত্র পর্য্যন্ত সকলেরই ইচ্ছা যে, জাপানীরা রুষে শান্তি স্থাপন করিবেন। এ বিষয়ে Cambridge Magazineএ প্রকাশিত অধ্যাপক Ninagawa Shinএর মন্তব্য প্রসঙ্গতঃ পাঠ করা উচিত। জাপান উদীয়মান সাম্রাজ্য; ইঁহাদের মৌলিক ও মধুর সভ্যতা সকলেরই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু জাপানের সহিত রুষিয়ার জাতিগত সামঞ্জস্য অতি অল্প। বিপ্লবের দিনে অপরের বাধা দান ও তাহার সাংঘাতিক ফল ফরাসীগণ বিশেষ ভাবে জানেন। তবে জাপান বন্ধুভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর। ইহাতে সুফলের আশা করা যায়।

অনেকের ধারণা, রুষিয়াকে সাহায্য করিলে জার্ম্মাণীর উপকার হইবে। এরূপ ধারণায় যুক্তিতত্ব গুহায় নিহিত। The suggestion that the Bolsheviks, after enduring the severest lesson ever administered to reckless idealists, realizing that Prussian militarism is unteachably brutal, are going to become its tools, agents and accomplices is too ludicrous for argument. দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, যুদ্ধে শ্রান্তি, গুপ্ত সন্ধিপত্র, জাতিগত ও ভূমিগত সমস্যা, আগত ও অনাগত সর্ব্ববিধ বিপত্তয়ে রুষিয়া, কর্ণধারহীন জীর্ণ নৌকার ন্যায় সংশয়াপন্ন। এক বৎসরের ভিতর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে, ইহা নিতান্ত মূঢ়েরও বুঝা উচিত। The Imperialism of the cadets, the weakness of Kerensky, the violence and intolerance of the Bolsheviks are passing phenomena. * এই জন্যই ব্রিটিশ, ফরাসী ও আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের পুরঃপ্রেষ্ঠগণ রুষিয়ার ভবিষ্যতে সন্দেহ হারান নাই, তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর। সর্ব্ব প্রকার দুঃখ ও বিপত্তির অগ্নি-পরীক্ষায় পূত হইয়া রুষের নবীন প্রজাতন্ত্র ইঁহাদেরই আদর্শে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। ডষ্টোভস্কি, টলষ্টয়, টুর্গিনিভের দেশ কখনও দীর্ঘকাল তমসাবৃত থাকিতে পারে না।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

* The "Nation."

"সিদুর মা।"

১

পাঁচ বছরের মেয়ের যতটুকু বুদ্ধি হওয়া সম্ভব, দু একটা বিষয়ে তাহার অর্দ্ধেক বুদ্ধিও সিদুর হয় নাই; অথচ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কখনও কখনও নিজের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এই বয়সেই সে দু'একটা মিথ্যা কথাও বলিতে শিখিয়াছিল।

বাপ যে কেমন, সিদু তাহা জানিত না; তাহার ছিল—মা, আর তাহার কালীমামা। এই মামা তাহাকে খুব ভালবাসিত, এবং তাহার সকল ছোট আবদার সাধ্যমত পূর্ণ করিত বটে, সিদু কিন্তু সব সময় মামাকে কাছে পাইত না। তাহার কারণ এই যে, মামা পাশের গ্রামের কোনও বড় লোকের বাড়ীতে চাকরী করিত। সে খুব বিশ্বাসী ছিল বলিয়া বাবুর সহিত তাহাকেই প্রায় দেশ বিদেশে যাইতে হইত। কাজেই সে প্রত্যহ বাড়ী আসিতে পারিত না; এমন কি কখনও কখনও এক মাসের মধ্যে একদিনও তাহার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইত না।

সিদু যেখানে থাকিত, সে পাড়ায় তাহার সমবয়সী ছেলে মেয়ে বড় একটা ছিল না। দু' এক জন যাহারা ছিল, তাহারা ভদ্রলোক; সুতরাং দাসীর মেয়ের সঙ্গে মিশিত না। তাহাদের একটা পাঁঠা আছে; এই পাঁঠাটাই সিদুর খেলার সাথীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। সিদু তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, কোলে-পিঠে করিত, মুখে মুখ দিয়া চুমো খাইত, পায়ের কাছে শোয়াইয়া তাহার মাথায় হাত চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইত; আরও কত কি করিত। বিকালে ঝড় জল আসিবার উপক্রম হইলে মাকে অনুকরণ করিয়া মস্ত পাকা গিন্নীর মত অবাধ্য ছাগলটাকে কোলে করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে ঘরে আনিত। ঘরে আনিয়া উপদেশ দিত, সে যদি জলে ভিজিয়া অসুখে পড়ে, ঝড়ে যদি ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার গায়েই পড়িয়া যায়, তবে ভোগটা ত তাহারই হইবে—তাহার হইয়া ছাগলের আর কোনও মা মাসী আসিয়া ত ভুগিবে না!

এই সময় তাহার মা যদি আসিয়া পড়িত, তবেই সহসা তাহার উপদেশের স্রোত বন্ধ হইয়া যাইত; গভীর লজ্জায় তাহার কালো মুখখানিও রাঙ্গা হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিত। সুতরাং মা কাছে না আসিয়া দূর হইতে মেয়ের মাতৃত্ব

দেখিত, এবং নিজের সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মৃদু মৃদু হাসিত। আবার কখনও বা স্বামীকে মনে পড়ায়, আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

২

কাল বিকালে মামা আসিয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর দিদির রাঁধা ভাত খাইয়া বাবুর বাড়ী যাইবে। তার পরদিন ভোর ছয়টার ট্রেণে প্রভুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিবে। আবার কবে যে ফিরিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—চাই কি, এক সপ্তাহের ভিতরও ফিরিতে পারে; আবার দুই মাস না হইতে পারে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তাই সে আজ বিকালে দাওয়ায় বসিয়া, ভাগ্নীকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। ভাগ্নী কিন্তু আজ মামার প্রতি তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। সে মামাকে অনেক করিয়া 'রাঙ্গা টুক্‌টুকে' শাড়ী আনিতে বলিয়াছিল, মামা কিন্তু কি একটা 'ভাল নয়' কাপড় আ নিয়া দিয়াছিল। মামা তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিয়াছিল বলিয়াই বোধ করি বলিল, "দেখ দিদি, সিদু কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে।"

সিদু এতক্ষণ আপনার মনেই মন্‌-ভার করিয়াছিল। প্রকাশ্যে ভাল মন্দ কিছুই বলে নাই; ভাবিয়াছিল, বলিবেও না। কিন্তু মামার ঐ কথা শুনিয়া আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি দুই হাতে মামাকে জড়াইয়া ধরিয়া মামার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অভিমানে ঠোঁট দু'টী ফুলাইয়া বলিল, "না, আমি তোমায় ভালবাস্‌তে চাইনে, তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি; তুমি আমায়—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার লজ্জা হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

৩

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সিদু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, মা কাঁদিতেছে। দেখিয়া তাহারও কান্না আসিল, কিন্তু কাঁদিল না; সে যে চালাক মেয়ে, মাকে কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, সে যে তাহা জানে! ধপ্‌ করিয়া মায়ের কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মায়ের চোখের জলে ভেজা গাল দু'টী টিপিয়া ধরিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, "তুই কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন মা? আজ ত আমি পেট ভরে ভাত খেয়েছি, তবে তুই—" মা আর সরলা বুড়ীর সেই উপদেশ স্মরণ রাখিতে পারিল না—তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তোর মামা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে রে—"

"কোথায় পালিয়েছে—না না, কে তোকে ব'লে ?"

হায় ! সে কেমন করিয়া মেয়েকে বুঝাইয়া বলিবে যে, কোনও মানুষ এ কথা বলিয়া যায় নাই, একটা 'পোষ্ট কার্ড' সংবাদ আনিয়াছে যে, তিন দিন হইল, সে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে। মা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আজ তিন দিন হ'ল সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে রে, এখন থেকে আমি তোর খোঁটি, আমার কেমন ক'রে রক্ষে করব মা—"

সিদু ভাবিল, এমন ত আরও কত বার কত জায়গায় গিয়াছে, এবার না হয় 'মরে'ই গিয়াছে, তাহাতে এমন কান্নাই বা কেন! মা যদি বলিত, তাহার মামা কাঁসী গিয়াছে, তাহা হইলে সে বোধ করি মনে করিত, এই ত সে মাসে কাশী গিয়াছিল, এবার না হয় কাঁসী গিয়াছে। এমনই সে চালাক মেয়ে! কাজেই মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"তা গেলেই বা মা, আবার ত আস্‌বে, তার জন্যে আর কান্না কেন ?" "কি মেয়ে মা! কৈ আমি ত কাঁদচি নে।" "সেই ত আর একবার কেঁদেছিলি, আবার ত এসেছিল !"

মেয়ের এই কথায় মায়ের বুক হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সেবার ভাইয়ের ভারি অসুখ শুনিয়া মা ষষ্ঠীতলায় পাঁচ পয়সার মানত করিয়া তবে ভাইকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। কিন্তু এবার ? সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে এবার সে যে আর—"

মেয়ে মায়ের মুখ জোর করিয়া টিপিয়া ধরিয়া বিরক্ত হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"তুই কাঁদিস্ নে, আমারও যে কান্না পাচ্ছে, চুপ কর!" সেই আবার মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আস্‌বে গো আস্‌বে, সে যে সেখানে যাবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলে গেছে, এবার আমার জন্যে কাপড় আন্‌বে, পুতুল আন্‌বে।"

এতক্ষণে বোধ করি গয়লা-গিন্নীর উপদেশ মনে পড়াতেই মা চুপ করিবার চেষ্টা করিল। এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলিল না।

৪

দেখিতে দেখিতে পনর দিন কাটিয়া গেল। মা স্পষ্ট বুঝিল, মেয়ে মনে মনে দিন দিন মামার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; অথচ মুখে কিছু বলে না। সে জানে, আজ কাল মা একটুতেই কাঁদিয়া উঠে। কাজেই আগে ভাত খাইতে বসিয়া সে যেরূপ গোলমাল করিত, ক্রমেই সে সব দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিতে

লাগিল। মাকে শান্তিতে রাখিবার উদ্দেশ্যে মেয়ের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া মায়ের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জলিয়া উঠিত। মাও সাধ্যমত তাহার সম্মুখে মুখে হাসি আনিবারই চেষ্টা করিত। যদি দৈবাৎ অসাবধানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে ধূলা পড়িয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিত।

* * * * *

ভাই বাগ্দীর ঘরের ছেলে ছিল সত্য, এবং সে নিজে লোকের বাড়ীর চাকর ছিল, তাহাও সত্য, কিন্তু তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানটা যেন কিছু বেশী ও অসঙ্গত রকমের ছিল বলিয়া বোধ হয়। সে নিজে বিবাহ করে নাই; দেবতুল্য ভগ্নীপতির কথা স্মরণ করিয়া তাহার মৃত্যুর পর হইতে প্রাণপণে ভগিনীর দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। একবার তাহার কাজ ছিল না, ক্ষুধায় সিদ্ধু কাঁদিতেছিল। কাজেই ভগিনী, নিজে কাহারও বাড়ী দাসীবৃত্তি করিবে কি না, এই কথাটী ভাইকে জিজ্ঞাসা করায়, ভাই জলিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই দিনই চাকুরীর জোগাড় করিয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

এখন সেই ভাই মরিয়াছে বলিয়া সে কোন্ লজ্জায় দাসীবৃত্তি আরম্ভ করে! ভাই বলিত, মেয়ে ছেলের ভিক্ষে মেগে খাওয়াও ভাল, তবু পরের বাড়ীর দাসী হওয়া ভাল নয়। আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল, ভাই মরিয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে, সে একটী একটী করিয়া ঘরে যাহা দু'একখানি পিতল কাঁসা ছিল, সব বেচিয়া মেয়েকে অনশনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু এবার? আর ত বেচিবার মত কিছু নাই। ভাবিল, এই যে একটী টাকা আছে, এতে যে ক'দিন চলে চলুক, তার পর ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। ব্যাস, ধর্ম্ম দেখিবে, সে ভাই ও স্বামীর আদেশপালনে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই; পাড়ার লোক দেখিবে, এক পয়সার সঙ্গতি থাকা পর্য্যন্ত সে ভিক্ষা করিতে বাহির হয় নাই।

৫

প্রায় দিন পনের হইতে গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। দিনে একটা না একটা মরিতেছে। যে যাহার নিজের বিপদ লইয়াই ব্যস্ত। এ সময় সে কাহার বাড়ী ভিক্ষা মাগিতে যাইবে। কাজেই ঘরের ভাঙ্গা তক্তপোষটাও সে দিন আধা দামে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহাতেই এ কয়

দিনও এক রকমে চলিয়া গেল, কিন্তু আবার 'যে নাই, সেই নাই' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ অবস্থায় জমীদারের কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? আর যদিও তিনি তাহা পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান নায়েব মহাশয় ত কখনই সেরূপ পারেন না, আর পারাও উচিত না। কাজেই এক দিন বাদে তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিলেন, মা কালী আসিয়া বলিতেছেন, "ওরে, আমারে ভাল ক'রে পূজো দে, বলিহীন পূজো চল্‌বে না—ক'টা পাঁঠা বলি দিতে হবে।" সুতরাং পর দিন হইতে জমীদার মহাশয়ের আদেশমত পাঁঠার জোগাড় হইতেছে; পূজারও রীতিমত আয়োজন চলিয়াছে।

আজ বিকালে জমীদারের সরকার আসিয়া সিধুর মাকে বলিলেন "শুন্‌চিস্ বাগ্‌দী বৌ, বলি ক'দিন ধ'রে বামুনের ছেলে তোর বাড়ী আনাগোনা ক'চ্চে মায়া ক'রে আর কর্‌বি কি বল—শেষে ত সেই কশাইয়ের হাতেই দিতে হ'বে—আর আমি ত নেহাত অন্যায় চাচ্ছিনে। আর তা ছাড়া তোর পাঁঠার ভাগ্যি ভাল যে, মা স্বয়ং ওর মাংস খাবেন। আর যদি জোর করিস, তা হ'লে জমীদারের বরকন্দাজ এসে জোর ক'রে নিয়ে যাবে, তখন এক টাকা তিন আনা ত দূরের কথা, একটা তামার পয়সাও পাবি নে। দে, আর বাজে গোলমাল বাড়াস নে, আমাদের ঐ একটার জন্যেই আটকাচ্চে, কোথাও পাওয়া যাচ্চে না—তাই না তোর দরজায় আসা—"

বাগ্‌দী-বৌ ভাবিয়া দেখিল, ঠিক কথা, আর মায়া করিয়া করিবে কি, আর তা ছাড়া এটাই বা আর বাকী থাকে কেন। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"আচ্ছা দাদাঠাকুর, কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।" দাদাঠাকুর বলিলেন, "দেখ বাছা, কথার যেন নড়্ চড়্ না হয়—তা হ'লে এখনও বল আমি না হয় অন্য কোথাও দেখি।"

বাগ্‌দী-বৌ বুকে পাষাণ বাঁধিয়া বলিল, "না, তা হবে না।"

দাদাঠাকুর অগ্রসর হইয়া দু' এক পা অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া খাটো-গলায় বলিলেন—"হাঁ, আর এক কথা, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কতোয় বেচ্‌লি, তুই বলিস, 'আমার সখের ছাগল, দাদাঠাকুর অনেক ক'রে বললে, তাই চার টাকায় দিলুম, নৈলে কি ও আমার বেচ্‌বার ছাগল?'—বুঝ্‌লি, কাজ কি লোকের কাছে ছোটো হয়ে'?"

দাদাঠাকুরের কথাটা বুঝিয়াও, সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পর্ণ-কুটীরের দরজা খুলিয়া বাড়ী ঢুকিল।

৬

আজ কাল সিদুর কেন যে পাঁঠার সঙ্গে খেলা করিতে ভাল লাগে না, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। তাহার কেবলই ইচ্ছা করে, ঝোপের ভিতর, পুকুরধারে দুপুর বেলা বোসেদের কলা-বাগানে, এক কথায়, মা যাহাতে দেখিতে না পায়, এমন জায়গায় আপন-মনে বসিয়া আশ মিটাইয়া খুব খানিক কাঁদিয়া লয়। কাহার উপর তাহার যেন ভারি রাগ হয়, কিন্তু তাহা ঠিক মায়ের উপর, কি মামার উপর, কি নিজের উপর, তাহা সে ঠিক করিতে পারে না। একবার ভাবে, তাহার দুষ্ট, মামা কেন আসিতে এত দেরী করিতেছে। এবার আসিলে, সে তাহার সহিত কথা কহিবে না—আদর করিয়া যাহা দিতে আসিবে, তাহা লইবে না—কোলে করিতে আসিলে, কোলে যাইবে না। আবার ভাবে, মা কেন আজ কাল অমন হইয়াছে; কিন্তু কেমন হইয়াছে, তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া মায়ের উপর নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে থাকে। তার পর নিজের উপর রাগ হয়—সে কেন ছাগলের উপর রাগ করিয়াছে, সে তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া আসিতে চাহিলে, সিধু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া তাহার মনে কষ্ট দেয় কেন?

আজ রাত্রে সিদু বলিল—"বেচ্‌লে ও কোথায় যাবে মা?"

মা বলিল, "কালীর কাছে পূজো হ'য়ে ও স্বগ্যে যাবে।"

'পূজো হয়ে' যে 'স্বগ্যে' যায় কেমন করিয়া, সিদু তাহা জানিত না। সে ষষ্ঠী বুড়ীর 'পূজো' দেখিয়াছে, ঘেঁটুর পূজো দেখিয়াছে, এমন কি, সে নিজেও কত 'খেলা-ঘরে'র পূজো করিয়াছে; কিন্তু পূজাতে যে তাহার মত অমন কচি পাঁঠাকেও 'লোকেরা' দুইখানা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারে, ইহা সে জীবনে দেখে নাই। আবার পূজা হইয়া গেলে, কোনও জিনিস পাখীর মত উড়িয়া 'স্বগ্যে' বা আর কোথাও যায় কি না, তাহাও সে জানিত না। কাজেই সে বিহ্বলের মত মার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আর ওকে দেখ্‌তে পাবো না?" মা বলিল—"না।" মেয়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে অমন পূজো হ'য়ে কাজ নেই মা, ওকে স্বগ্যে যেতে হ'বে না। ওকে সেখানে আমার মতন ক'রে খেতে দেবে কে? ও যে আমার জন্যে কাঁদবে তা' হলে।" এই বলিয়া সে দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না মা, তুই ওকে বেচ্‌তে পাবি নে।" মা ঈষৎ হাসিয়া মেয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "ও কাঁদবে, আর তুইও কাঁদবি, না? তুই ওকে খুব ভালবাসিস, না মা?" মেয়ের একটু লজ্জা হইল,

বলিল—"না, আমি কাঁদব না—ও" বলিয়াই মায়ের কোলে মুখ লুকাইল। মেয়ের অব্যক্ত মায়ের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

৭

পর দিন প্রাতঃকালে দাদাঠাকুর এক টাকা তিন আনা হাতে করিয়া বাগ্দী-বৌয়ের কাছে আসিতেই বাগ্দী-বৌ মিনতি করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর, আমাকে মাপ ক'রতে হ'বে, এ কাজ আমি পারবো না।" এই কথার পর প্রথমটা দাদাঠাকুর 'মিষ্টি' কথায় বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এখন' বলছি বাগ্দী-বৌ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ্, এতে আমার মনে কষ্ট হ'বে হোক্, তা'তে আর তোর ভয় কি বল—আজ কাল তোরা ত বামুনকে বড্ডই মানিস !"

তিনি এই পর্য্যন্ত বলিতেই বাগ্দী-বৌ তাঁহার পা দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অমন কথা ব'লো না দাদাঠাকুর, তোমরাই ত কলির দেবতা, ওতে আমার অমঙ্গল হ'বে—"

'দেবতা' কিন্তু তাহার কথায় কাণ দিলেন কি না দিলেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"তা' আমাদের না-ই মানিস, কিন্তু এতে ঠাকুরও তোর ওপর রুষ্ট হ'বেন—তা জানিস্, আর ঠাকুর রাগ করলে, তুই যার জন্মে দিতে চাচ্চিস্‌রে, তার কি হ'বে, তা বুঝতে পারচিস্ কি ?"

এই কথায় বাগ্দী-বৌয়ের মাথা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে সমস্ত অন্ধকার বোধ হইল। সিন্ধু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, 'ষাট্—ষাট্' বলিয়া চুমো খাইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া অবশেষে তাহাকে দাদাঠাকুরের পায়ের কাছে শোয়াইয়া দিল; তার পর নিজেও তাহার পা দু'টী চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার দোষ করিছি ঠাকুর, তার জন্মে আর যা' বলে শাপ দিতে হয় দাও, কিন্তু ও কথা মুখে এন' না—তুমিও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর ত দাদাঠাকুর—"

তাহার শেষ কথা শুনিয়া নিজের ছেলের হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়িতেই দাদাঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অল্প রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"যাক্, আমার কিছু বলার দরকার কি, তুই তা হ'লে সত্য বেচ্‌বি নি ?"

বাগ্দী-বৌ ভয়ে ভয়ে বলিল—"না দাদাঠাকুর, আমাকে রেহাই দাও।"

দাদাঠাকুর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

৮

বলা বাহুল্য যে, বিপদের উপরেই বিপদ আসে। বাগ্দী-বৌয়ের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। আজিকার দিনটা কোনও গতিকে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সিদু পর পর দুইবার বমি করিল। ইহাতে তাহার মায়ের মন অস্থির হইয়া উঠিল।

সিদুর মা মেয়েটীকে কোলে করিয়া আনিয়া তুলসীতলায় শোয়াইয়া দিল। তার পর তাহার গায়ে মাথায় তুলসীতলার মাটী ছোঁয়াইতে লাগিল। এমন সময় গয়লা-গিন্নী বাড়ী ঢুকিল। এতক্ষণ বাগ্দী-বৌয়ের চোখে এক ফোঁটাও জল দেখা যায় নাই, কিন্তু গয়লা-গিন্নীকে আসিতে দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে "মা গো" বলিয়াই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। গয়লা-গিন্নী শশব্যস্তে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া কাঁদিতে বারণ করিলেন। সে তখন শান্ত মেয়েটীর মত তাহাই করিল। এ দিকে মেয়ে আর একবার বমি করিতেই, গয়লা-গিন্নী বলিল—"তুই তা হ'লে মেয়ে নিয়ে বস্, কি ক'র্বি মা। যাই আমি একবার দেখি, যদি তুলসী ডাক্তারের হাতে পায়ে ধ'রে আন্তে পারি।—" বলিয়াই সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিল। ইনি কিছু দিন হইল, কবিরাজি ছাড়িয়া বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

ডাক্তার বালিকার দেহ পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ ভাষায় বলিলেন, "উপস্থিত ঔষধের মূল্য তিন টাকা পড়্বে।" শুনিয়াই বুড়ী তাঁহার পা দু'টী চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল—"কোথায় পাবো বাবা, দেখ্‌লে ত, এক আনা সুদে সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে তোমায় 'বিজিট্' দিলুম, তুমি ত তখন শুন্‌লে না বাবা, নৈলে আমরা গরীব লোক—কবে আর তোমাকে 'বিজিট' দিয়েছি। ঐ টাকাই ওষুদের দাম।"

তিনি বলিলেন—"না :পাঁচুর মা, আমিও গরীব, আমাকে দাম দিয়ে ওষুধ কিন্‌তে হয়।" বুড়ী ভাবিয়া পাইল না, আজ তিনি পাষাণের মত এত কঠিন হইলেন কেন? অগত্যা বলিল—"আচ্ছা বাবা, তবে আবার যাই চল সরকার মশাইয়ের কাছে, কি কর্‌বো, ঠার মেয়েটা মরে যাবে গা—" বলিতে বলিতে বাড়ীর বাহির হইতেছিল, এমন সময় বাগ্দী-বৌ পশ্চাৎ হইতে তাহার আঁচল ধরিয়া বলিল—"না মা, থাক, কাজ নেই—তুমি টাকা ধার কোর্‌ো না।"

বুড়ী বিরক্ত হইয়া 'ছাড় বাবু ছাড়" বলিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বোধ করি বলিল—"এ সময় তোদের টাকা যদি না শোধ করতে পারি, তা হ'লে আমি যে নরকে যাবো, তুই জানিস নে বলে কি তোর সোয়ামীও স্বগ্যে বসে সব দেখ্‌চে না।"

৯

রাত তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। যথাসময়ে মেয়েকে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। এখন মেয়ে মড়ার মত পড়িয়া আছে, আর মা তাহার মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বাড়ীতে, ঘরের বাহিরে দাওয়ায় সেই ছাগল-ছানাটী ভিন্ন আর কেহ নাই। গয়লা-বুড়ী এ বাড়ীতে শুইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ও দিকে তাহার গোয়েরও দুই দিন ধরিয়া বড় জ্বর হইয়াছিল, কাজেই তাহা হইয়া উঠে নাই।

এই সময় যদি কেহ মায়ের মনের কথাটী শুনিতে পাইত, তাহা হইলে সে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইত; 'মা কালী আমি পাঁঠা দেই নি বলিয়া তুমি আমার মেয়েকে মারিবে, বেশ মার।' তবু আমি পাঁঠা দিব না। মেয়ে মরিবে, 'ও'ও ত আমার ছেলে! উহাকে বলি দিয়া মেয়ে লইয়া থাকিব, না হয় মেয়েকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়া পাঁঠা লইয়া থাকিব। তার পর উহাকেও মারিবে? এখন সে তোমায় যা হোক একটু ভয়ও করিতেছে, তখন আর তাহাও করিবে না!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার অল্প তন্দ্রা আসিল। তার পর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন দাদাঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন—"এখনও বলছি বাগ্দী-বৌ, যদি মেয়েকে ফিরে পেতে চাস ত ভালয় ভালয় পাঁঠা ছেড়ে দে—দেখ্‌লি, বামুনের তেজ!" এই কথার উত্তরে সে যেমন দৃঢ়ভাবে বলিল—"না, দোবো না", অমনই ব্রাহ্মণ ভ্রূকুটী করিয়া ডাকিল—"যমদূত, যাও, এই 'পাপিষ্ঠী'র মেয়েকে কাঁটা-বন দিয়ে নিয়ে যাও।" "পাপিষ্ঠী সভয়ে দেখিল, কে এক জন ভূতের মত বামুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়াই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বাগ্দী-বৌ চোখ বুজিল। শুনিল, যমদূত বলিল "এই যাই, কাঁটার ওপর দিয়ে টান্‌তে টানতে নিয়ে যাই।" মা আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুম করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের উপর পড়িয়া তাহার পা দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না ঠাকুর, তুমি ছাগল নিয়ে যাও, মেয়েকে নেব না।" তখন ঠাকুর যেন মনে মনে "পথে এস" বলিয়া ছাগলটীর গলার দড়ী

ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; আর ছাগলছানাটী তাহার দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া "মা মা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। মা আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল, "ও ঠাকুর—তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও, কাজ নেই।" ঠাকুর কিন্তু ছাগল লইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। এই সময় মেয়ে যেন তাহার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সে যেমন মেয়েকে একা ফেলিয়া ঠাকুরের পশ্চাতে ছুটিতে গেল, অমনই দেখিল, সেই যমদূত সজোরে তাহার মেয়ের গলাটা টিপিয়া ধরিল। মেয়ে গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল। মা আর ঠাকুরের পশ্চাতে ছুটিতে পারিল না—"মা গো" বলিয়া সেই খানেই ধুম করিয়া পড়িয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে মেয়ে বলিয়া উঠিল—"মা, জল খাব।" মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইল। তার পর মেয়েকে জল দিয়া ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া দাওয়া হইতে ছাগলটাকে কোলে করিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। "মা, তুই আমায় ফেলে যাবি নে?" মায়ের এই কথার উত্তরে মেয়ে বলিল—"তুই কাঁদিসনে মা, আমার অসুখ ত ভাল হ'য়ে গেছে।"

১০

সত্য সত্যই তাহার পর দিন সকালে মেয়ে যেন সুস্থদেহে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর প্রায় ছয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। গয়লা-বুড়ী না থাকিলে এই ছয় দিনের মধ্যে মেয়ে না খাইতে পাইয়াও মারা পড়িত। কিন্তু এমন করিয়াও আর বেশী দিন চলিল না। আজ বিকালে বাগ্দী-বৌ এমন কিছু শুনিল, এবং বুঝিল, যাহাতে সে একটা সঙ্কল্প মনে মনে দৃঢ় করিয়া ফেলিল। শুনিল, সরকার মশায় নিজের টাকা ও জমাদারের বকেয়া খাজনার টাকা দুই জড়াইয়া মোট ১৮৲টা টাকার জন্য বুড়ীর উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; বুঝিল, সে তাহার সাহায্য করে বলিয়াই বুড়ীর এই দুর্দ্দশা; সঙ্কল্প করিল, আর সে নিজের জন্য "মা"কে অত লাঞ্ছিত হইতে দিবে না।

ইহার পর আরও দিন পাঁচ ছয় কোনও গতিকে কাটিয়া গেলে এক দিন বাগ্দী-বৌ 'মা'কে জানাইল যে, পশু সে গোপনে ৭।।০ গণ্ডা টাকায় নিজের পৈতৃক বাস্তুভিটাটী হীরু মণ্ডলকে বিক্রয় করিয়াছে। বুড়ী শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এখন তবে মেয়ে নিয়ে থাক্‌বি কোথা হতভাগী?" সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি বাগ্দীর মেয়ে বলে কি আর এত বোকা মা,

যে সাড়ে সাত গণ্ডা টাকায় এতখানি জায়গা শুদ্ধ বাড়ী বিক্রী ক'র্‌ব? আমি যে বাড়ী বিক্রী করেছি, তা' কি তোমরা কেউ শুন্‌তে পেয়েছ? কথা হ'য়েচে, এখন পাঁচ বছর আমি মেয়ে নিয়ে যেমন আছি, তেমনই এ বাড়ীতে থাক্‌বো, তার পর যা' হয় হ'বে; হ্যাঁ, আর তা' ছাড়া এই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি টাকাটা জোগাড় কর্‌তে পারি, তা' হ'লে আমার বাড়ী আমারি থাক্‌বে—তার মানে, বাঁধা রেখেছি, সুদটুদ কিছু লাগ্‌বে না ব'লেছে।"

শেষ কথা শুনিয়া বুড়ী কিছু খুসি হইল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে বাগ্দী-বৌ বুড়ীকে আটটী টাকা দিতে গেল। বুড়ী বলিল যে, মেয়ে যে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই তাহার টাকা শোধ হইয়া গেছে। কাজেই বাগ্দী-বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল—"নিলে না, আমার-ই বেঁচে গেল।"

গয়লা-বুড়ীও আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কতকটা যেন আপন মনে বলিল—"বেঁচে যে কার গেল, তা' মাথার ওপর যিনি আছেন, তিনিই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।"

ইহার পর "কেন?"র উত্তরে গয়লা-বুড়ী স্বর পাল্টাইয়া সহস্রবার তাহার মৃত স্বামীর প্রশংসা করিয়া একটী একটী করিয়া জানাইল যে, সেই একবার যখন তাহার ছেলের ভারি ব্যামো হয়, তখন সে যদি না দশটী টাকা ধার দিত, তাহা হইলে সে কি আর সেবার ছেলেকে ফিরিয়া পাইত? তাহার পর কত দিন কাটিয়া গেল, তবু আর সে কোনও মতেই সে টাকা শোধ করিতে পারিল না। ইহাতেও সে একটী দিনের জন্যও বলে নাই যে, 'কি গো, টাকা কটা দেবে?'

• • • •

পর দিন সকালে "মা"য়ের মাথায় অপূর্ব্ব বুদ্ধি যোগাইল। সে ভাবিল, এই টাকাটা সুদে খাটাইলে, বাগ্দী-বৌয়ের কোনও রকমে চলিয়া যাইতে পারে, চাই কি, বাড়ীটীও ছাড়ান যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সে বাগ্দী-বৌয়ের মত জানিবার জন্য বরাবর বাগ্দী-বাড়ী আসিল। কিন্তু বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাগ্দী-বৌ নাই, তাহার মেয়ে নাই, ছাগলছানাটীও নাই—বাড়ী যেন শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বুড়ী মাথায় হাত দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র।—শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর 'নেপথ্যে' নেপথ্যে থাকিলেও কোনও ক্ষতি হইত না। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের 'সুন্দর-মঙ্গলে' প্রথমে 'কুৎসিতে'র ছায়া, তাহার পাশে 'সুন্দরে'র আলো। এই ছায়া ও আলোর সমাবেশে কবি 'সুন্দর-মঙ্গল' ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রাম্যতা—ভাবের গ্রাম্যতা, ভাষার গ্রাম্যতা, কল্পনার গ্রাম্যতা অত্যন্ত অধিক। সুন্দর ও কুৎসিতের দুইটি সুদীর্ঘ, সুবিস্তৃত তালিকাই গীতিকাব্য হইতে পারে না। তবে কুৎসিতে ও সুন্দরে—উভয় ভাগেই উপভোগ্য শ্লোক আছে। কিন্তু

"লজ্জাহীনা, উলঙ্গ হইয়া,
টপ্পা গায় নাচিয়া নাচিয়া"

আঁকিয়া দেখাইবার প্রয়োজন কি? প্রত্যেক কুৎসিতকে নিরাবরণ করিয়া, তাহার বীভৎস কৌৎসিত্য দেখাইয়া সুন্দরের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সৌন্দর্য্যই ম্লান হইয়া পড়ে। সর্ব্বজনপাঠ্য বিশেষতঃ নারীজনপাঠ্য মাসিকপত্রে শালীনতার অভাবও অত্যন্ত শোচনীয়।

'ভিখারীর গালে মারি চড়,
হেসে হেসে দেখিস্ রগড়!'

অত্যন্ত common place, অত্যন্ত মেলো। দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য নহে। 'চড়ে'র সঙ্গে মিলাইবার জন্য 'রগড়'কে টানিয়া আনিয়া রগড়াইতে আরম্ভ করিলে কবিতা নিশ্চয়ই রক্তাক্ত হইয়া পড়ে।

'অদ্ভুত মুখস পরচুলা,
বিশ্ব যাহে বিমূঢ়া, বাতুলা।'

আলোর 'চতুটি সার্থক হইয়াছে বটে। কিন্তু পরচুলার অনুরোধে 'বিশ্ব' স্ত্রীলিঙ্গ হইতে সম্মত হইবে কি?

'নীলাকাশে বিথারিয়া তনু
হাসে সৌন্দর্য্যের রামধনু।
সবুজে সবুজে এ কি ঘটা,
লাল নীল পীতের কি ছটা!'

এইরূপ দুই চারিটী সুন্দর শ্লোক এই সুদীর্ঘ কবিতায় বিরল নয়। 'আজি এ কি আনন্দ উদয়' হইতে 'হে সুন্দর তব মূর্ত্তি রাজে' পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের ছাপ আছে।—কিন্তু মণিহারীর দোকান কবিতা নহে। এই কবিতায় সুদীর্ঘ কুৎসিতের তালিকা ও তদপেক্ষা সুদীর্ঘ সুন্দরের তালিকা আছে বটে, কিন্তু সেই সকলের সমাবেশে ও সমাহারে কবি একটা সমগ্রের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাই কবিতাটি খাপছাড়া ও 'পান্‌সে' হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা বাজারে স্তূপীকৃত পণ্যের মত—কবিতার নিজস্ব নহে। 'ফরাসী হইতে' অনূদিত 'সাহিত্য' উল্লেখ-যোগ্য। কাহার রচনা, তাহ প্রকাশ নাই। ফরাসী লেখকের একটি সিদ্ধান্ত,—'ইংরেজের

অনুকরণে সমস্তই রূপান্তরিত হইয়াছে।' 'সমস্ত'ই অত্যুক্তি। 'যাত্রা ও পৌরাণিক নাটকের পরিবর্ত্তে, সামাজিক নাটক।' এখনও পৌরাণিক নাটকের পার্শ্বে সামাজিক নাটকের অভিনয় হইতেছে। 'কবি লালুলাল 'প্রেমসাগর' নাম দিয়া ভাগবদ্গীতার অনুবাদ করেন।' 'ভাগবদ্‌গীতা' নামক কোনও গ্রন্থ নাই। আমাদের ভগবদ্গীতা আছে, আর ভাগবত আছে। 'প্রেমসাগর' ভগবদ্গীতার অনুবাদ নহে, ভাগবতেরও অনুবাদ নহে। তাহা ভাগবতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত কাব্য হইতে পারে। 'সমস্ত ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে, ভারতবাসীদিগের য়ুরোপকে জানিবার চেষ্টা, য়ুরোপকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়; কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটা 'র‍্যাডিক্যাল' ধরণের ও একটা সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানানুশীলন-ক্ষেত্রে একটা গৌণ স্থান অধিকার করিত; তথাপি, 'নব্য চিন্তা প্রবাহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যিক ইতিহাসে বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়।' বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'গৌণ স্থান অধিকার করিত', এ মতও অভ্রান্ত নহে। ন্যায়শাস্ত্র, তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের জ্ঞান ও ভক্তির ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল; এখনও সে অধিকার বঙ্গদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বঙ্গদেশ পাণিনি পরিহার করিয়া, ভাষার বিধি স্বয়ং রচনা করিয়া লইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর 'প্রাদেশিকতা'র অন্ধ অভিমানের দাবী নহে। ঐতিহাসিক সত্য। কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণও 'অনুবাদ' নহে। ভারতচন্দ্রের একটা অংশ—বিদ্যাসুন্দরের কিয়দংশ 'অশ্লীল', সমগ্র 'অন্নদামঙ্গল' অশ্লীল নহে। তাঁহাকে লঘু-কবি'ও বলা যায় না; অন্ততঃ আমরা তাহা মনে করি না। তবে 'লঘু'র বিপরীত যদি 'গুরুগম্ভীর' হয়, তবে গুরুগম্ভীরের বিপরীত বাঙ্গলা ভারতচন্দ্র লঘু ধরণের কবিতা হইতে পারে। রামপ্রসাদ শুধু 'সরল গ্রাম্য ধরণের কবি' নহেন, তিনি সিদ্ধ সাধক। তাঁহার গান 'নিছক' কবিতা নহে; সাধনালব্ধ অনুভূতি ও ভক্তির উচ্ছ্বাস; সত্যের প্রকাশ। প্রাচীন সাহিত্যের এই আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব, এবং সেই বিশেষত্বের অসাধারণ প্রভাব, সমাজে তাহার অধিকার ও সার্থকতা প্রভৃতি বিদেশী লেখক ধরিতে পারেন নাই। এইরূপ ক্ষুদ্র [illegible] টী এই নিবন্ধে '[illegible]'। ভারতের সাহিত্যের বিচারে লেখক যে বিচক্ষণতার ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন,—'রামমোহন রায়ের পর সমস্ত সাহিত্য নবীভূত হইল। এক দিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৯-৫৮) Aristophanএর মতো রক্ষণশীল ও পরিহাস-রসিক, বিদ্রূপ-কশায় যাহারা য়ুরোপের পক্ষপাতী, উদারমতাবলম্বী বৈপ্লবিকদিগকে চাবকাইতেছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ, একেশ্বরবাদের পক্ষ ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষ সমর্থন ও পোষণ করিতেছিলেন। সকলের অগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১); ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জন মহানুভব ব্যক্তি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ শক্তিশালী লেখক, এবং সর্ব্বোপরি সমাজসংস্কারক:—১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। Seeley প্রণীত Ecce homo গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে দেবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাঁহাকে এক জন ধর্ম্মশীল বীরপুরুষ, শান্তিপ্রিয় ও সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তিনি বলেন,—গোপীগণ ও রাধা—এ সমস্ত কবিকল্পনা।' শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চক্র ও চক্রান্ত' চলনসই গল্প বটে, 'ছোট গল্প' নহে। শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরীর 'স্বপ্নে' নূতন তথ্য প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, বা অভিনব সিদ্ধান্ত নাই। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ছন্দের কুঞ্জে 'কুঁড়ি'কে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুঁড়ি ফুটিল না, কবিও ছাড়িলেন না। কুঁড়ি লজ্জা করে, কিন্তু তিনি 'লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে' বলিতেছেন—'ত্বরা করে লাজ মুকুল ফুটাও আকাশ পানে!' যেন পূজার ছুটীতে কোনও বাস্তবাগীশ কেরাণী ষ্টেশনের প্লাটফরমে তাঁহার জড়ভরত তরুণী গৃহিণীকে দ্রুত চলিবার জন্য ধমক দিতেছেন—'পা চালিয়ে চল—ট্রেণ ছাড়িয়ে যায়!' শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শরৎকুমার' সামাজিক গল্প; এ কালের ছবি; সুখপাঠ্য।

প্রতিভা। ভাদ্র। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের 'ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য' ভাদ্রের 'প্রতিভা'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অধ্যাপক বসাক প্রত্নতত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি মনীষী। সংস্কৃত-ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের শক্তি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে তাঁহার সহায় হইয়াছে। আলোচ্য নিবন্ধে তিনি তাঁহার বক্তব্য গুছাইয়া বলিয়াছেন, এবং ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে 'লেখের মূল্য' যে অত্যন্ত অধিক, তাহা সুপ্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের 'প্রাচীন ভারতের বিবাহবিধান' প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় আছে। শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘাটু গান' আমরা সকল সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিকে পড়িতে বলি। এই প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালার 'ভাটীমুলুকে'র গ্রাম্য কবিদের গানের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আমাদের অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যে—গ্রাম্য সাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবনের এইরূপ বিবিধ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক বিপরিণামের বহু পরিচয় এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমাদের সাহিত্যের প্রথম স্তর, স্বাভাবিক স্তর। এইরূপ অনেক স্তর পরবর্ত্তী স্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। অনেক স্তর কালপ্রবাহে লুপ্ত হইয়াছে। অনেক লুপ্ত স্তরের উপর আবার নূতন স্তরের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল স্তরের স্বরূপ আমরা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি; আমাদের গ্রাম্য-জীবনের অমূল্য স্মৃতিসমূহ কালের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি রক্ষা করিতে না পারিলে আমরা জাতির অতীত ভাবসম্পদে বঞ্চিত হইব; বাঙ্গালার 'গণে'র মানস-বৃত্তির ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিতে পারিব না।—লেখক বলেন,—'বর্ষাকালে ভাটীমুলুকের প্রত্যেকেরই দুয়ারে নৌকার প্রয়োজন। * * * হাটবাজার করিতে বা একটু দূরে যাইতে হইলেই পরের নৌকার সাহায্য লইতে হয়। এমন কি, কোনও কোনও গ্রামের দুই দশখানা নৌকাই সারা পাড়ার মানুষ লইয়া বাজার করিতে যায়। ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া মানুষ তুলিয়া লওয়া হয়। হাটে বাজারে যাইবার পথে সমাজের কথা, পরনিন্দা প্রভৃতির আলোচনা অপেক্ষা ভাটিয়াল রাগিণীতে "বাহাত্তর বছরের পাড়ি—বলা আছে দণ্ড চারি' যে বেশী আরামদায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লালা আনন্দীরাম নির্দ্দিষ্ট গানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ

করিয়া ঘাটু গানের প্রবর্ত্তন করিলেন। ঘাটে ঘাটে গানকারী সংগৃহীত হয় বলিয়া "ঘাটু" গান নামকরণ হইয়াছে। প্রথমে হয় ত ঐ ভাবেই ঘাটুগান গীত হইত। তার পর উহার বিস্তৃতি হইয়াছে। ক্রমে ঘাটুগান আর হাটে বাজারের পথে আবদ্ধ রহিল না। শুধু গানের উদ্দেশ্যেই গায়ক সংগ্রহ করা হইত, এবং নৌকার উপর দস্তুরমত আসর জমান হইতে লাগিল। পাটনীর বড় নৌকা বা দুই নৌকা একত্র বাঁধিয়া তাহাতে চাঁদোয়া খাটাইয়া এবং রেশমের নিশান উড়াইয়া, ঘাটুর আসর তৈয়ারী হইতে লাগিল। ** কিন্তু ইহাতে একটু অসুবিধা হইয়া উঠিল। নৌকায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মানুষ লওয়া হয়, সুতরাং সকলের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এ জন্য একদল সৌখীন গায়ক ঘাটুকে স্থলচর করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। * * * ফলে ঘাটুগান—স্থলঘাটু ও জলঘাটু—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একই গান —একই রীতিনীতি—কেবল স্থানের বিভিন্নতামাত্র।—লেখক ঘাটুগান রক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার এ পরামর্শ নিষ্ফল হইবে না। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'সপ্তর্ষি' ছাপা হইল কেন? বাঙ্গালীর জীবনে অনেক দুঃখ আছে, আর কবিতার দুঃখ সহি কেন? শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 'শ্রীবৃন্দাবনে' 'গোকে'র সঙ্গে 'পুলকে'র মিল করিয়াছেন। 'ধ্যান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আঁখি-জল দিয়ে ভক্তি-নবনীতে' বৃন্দাবন গড়িয়াছেন। ধ্যান ও প্রাণ চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না। আর নব এক বিন্দু নবনী কোথাও পাইলাম না। কিন্তু কুমুদের বৃন্দাবন রচনায় যে অজস্র আঁখি-জল খরচ হইয়াছে, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। লেখক তাহা বলিয়া না দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

প্রবাসী। ভাদ্র। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পল্লীসংস্কারের আদর্শ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসুর 'অভিলাষ' এই যে, 'ক্ষুদ্র হই, ক্ষতি নাই, প্রবালদ্বীপের সম রত্নদ্বীপ করিব গঠন।' এই লেখাটুকু বুঝা যায়। উপরের অংশ পুষ্প আছে, চাতক আছে, কিন্তু কিছু 'বুঝিবার উপায়' নাই। 'সে যদি' ও 'রতি'র অন্বয় কি? এত অল্প চরণের ক্ষুদ্র কবিতায় এত অস্পষ্টতা! উহার প্রবালদ্বীপ কি দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'বৈষ্ণব কবিতা' সুলিখিত। আমাদের অল্প পরিসরে এ প্রবন্ধের রত্নরাজির আলোচনা সম্ভব নহে। অজিতবাবু পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে আলোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। অজিতবাবু এই প্রবন্ধে তাঁহার পূর্ব্বপ্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। আশা করি, যাঁহারা বিশেষবিৎ, তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নব-যৌবন' কথার কচকচি। প্রথমে 'অঙ্গ অঙ্গে উথলে পুলক!'—পুলক খাড়ে নাচিয়াছে, তাহার পর তাহারও পুলকের মত দশ দশা হইয়া গিয়াছে। এবার সে কড়ার ভরা দুধের মত উথলাইয়া উঠিল। সমস্তই দেহের কারবার; কিন্তু উপসংহারে হে সুন্দর!' আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলাইয়া বলা যায়—

'সকলই বিচিত্র কবিতার কাণ্ড,
গোড়া নাই, আগা!'

এখনও মিল 'অত্যন্ত ও দুরন্ত' হয় নাই। 'পুলক' ও 'চোখ', 'মন' ও 'যৌবন', 'গুঞ্জন' ও 'গন্ধ-স্বপন' অধম মিল। 'বা পদ্য, বা মিলে বা, বেবুর পাতায় কয়েতা' ইহার তুলনায় বাপের ঠাকুর!

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর 'জবানবন্দী' চলনসই গল্প। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'যৌবন-বরণ' 'কাব্যি'র অপচার ও প্রহেলিকার সমাহার। কবির কল্পনার দৌড় দেখিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়া মনে পড়ে। 'অনন্তের জীবনের মহাকুম্ভ হতে, ওহে মহীয়ান, আন নাই তুমি তব প্রাণ।' 'অনন্তে'র জীবনটা সান্ত নয়, 'অনন্ত'। তাই কবি কল্পনা করিলেন, তাহার আধার মহাকুম্ভ! ছোট কলসী, ক্ষুদে কুঁজো, ঘটী, ফেরো, বা বদনা নয়, খুব বড় একটা মহাকুম্ভ! কবির 'মহীয়ান' তাহা হইতে এক ঘটী প্রাণ ঢালিয়া আনেন নাই। বোধ হয়, জালা হইতে, অথবা ইঁদারা হইতে প্রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাণের সেই আস্তানার নামই বোধ হয়—'আমারি সর্ব্বস্ব।' বিশারদ বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলেন,—'তাও ছাপালি পদ্য হ'ল, নগদ মূল্য এক টাকা!' যৌবন-বরণের মূল্য কত? শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'মানুষ হওয়া' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—'আত্মা আমার চিরস্বাধীন ভয় করে না কারে।' তাহা সত্য; প্রমাণ, এই কবিতা ছাপা। 'আপনি পুড়ি, পরকে পোড়াই, রাখতে নারি চেপে',—কবির এই উক্তিটি আমরা সজলনয়নে পাঠ করিয়াছি। উপায় কি? শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরীর 'আবু পর্ব্বত' সুখপাঠ্য। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'পদ্মার মায়া' নামক কবিতাটি বোঝা যায়। প্রথম তিনটি শ্লোক ব্যর্থ। শেষ দু'টি শ্লোকেই কবির বক্তব্যের আরম্ভ ও শেষ। 'আমাদের জাতীয় নেতা' নামক ছবিখানির যে ব্যাখ্যা 'চিত্র পরিচয়ে' ছাপা হইয়াছে, ছবি হইতে তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। গল্প আছে,—এক জন লেখককে এমন চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল যে, চিঠি পড়াইবার জন্য তাহাকে দেশান্তর হইতে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল। ছবির সম্বন্ধেও কি বাঙ্গালা দেশে সেই সনাতন ব্যবস্থা চলিবে? চিত্রকর ছবির সঙ্গে সঙ্গে 'বিষয়' বুঝাইয়া দিবার জন্য ধাবিত হইবেন?—ছবিখানি সুচিত্রিত, কিন্তু অত্যন্ত কৃত্রিম. অধ্যাপক শ্রীশান্তা দেবীর 'শিক্ষার পরীক্ষা' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য।

ভাণ্ডার। শ্রাবণ। কলিকাতার 'Bengal Co operative Organization Society' অর্থাৎ 'বঙ্গীয় সমবায়মণ্ডলী-গঠন-সমিতি' 'যেমন নূতন নূতন জায়গায় সমিতি গড়বার চেষ্টা করবেন, তেমনি নূতন নূতন রকমের সমিতিও তাঁরা গড়ে তুলবেন বলে আশা করেন। বাঙ্গালা দেশের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁরা সমবায়ের প্রচার করবেন। যে সমস্ত সমিতি কাজ করছে, তাঁরা তাদের ভুল-চুক দেখিয়ে দিয়ে ভাল কোরে কাজ কোর্তে শেখাবেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের সুবিধা হ'বে বলে "ভাণ্ডার" পত্রিকাখানির প্রকাশের ভার এই "বঙ্গীয় সমবায়-মণ্ডলী গঠন সমিতি" গ্রহণ করেছেন।' শ্রীতারকচন্দ্র রায় 'ভাণ্ডারে'র সম্পাদক হইয়াছেন। আমরা সাদরে এই নূতন পত্রের সংবর্দ্ধনা করিতেছি। প্রথম-[শ্রাবণ]-সংখ্যার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'সমবায়' নামক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সমবায়ের আবশ্যকতা, উপযোগিতা ও বর্ত্তমান কালের জীবনযুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে তাহার অপরিহার্য্যতার কথা বাঙ্গালীকে সহজ সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড় হইয়া উঠিবে। ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়, ইহাতে

করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক এক জায়গাতেই বড় হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড় টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে, চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে, পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড় হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড় হইবে।' রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিয়াছেন,—'আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং এক-ঘরে হইয়া আছে, * * ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়-মানুষ করিতে হইবে। আর এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া।' অর্থাৎ, দেশের কাজ করিবার সর্ব্বপ্রধান সাধন—'সমবায়'। সেই সমবায়ের প্রচারে 'ভাণ্ডারে'র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সাহায্য পাইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। 'গরীবের বাঁধা' গ্রামবাসীর কানে উঠিলে মনে লাগিতে পারে। 'নানা কথা'য় দেখিতেছি,—বাঙ্গালার পল্লীতে সমবায়ের সূচনা হইয়াছে। বারাসত মহকুমার কয়েকটি গ্রামে দুগ্ধব্যবসায়ীদের সমবায়-'সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে। খুব ভোরে এক জন লোক বাড়ী বাড়ী গিয়া গাই দোয়াইয়া দুধ সংগ্রহ করিয়া আনে। এক জন লোক সেই দুধ কলিকাতায় আনিয়া এক সঙ্গে বাজারে বিক্রয় করে। সকলকে আসিতে হয় না, গাড়ী ভাড়া বাঁচিয়া যায়; অথচ সমবায়ের ফল সকলেই ভোগ করে। খরচ অল্প, সুবিধা অনেক। 'ভাণ্ডারে' লিখিতেছি, 'ছয় মাস তারা কাজ করবার পরে হিসাব নিকাশ ক'রে দেখা গেছে সকল সমিতিই বেশ লাভ করেছে। এখন আরও লাভ হ'তে পারে, যদি এই সমিতিগুলি সকলে মিলিত হ'য়ে এক সঙ্গে কলিকাতায় দুধ পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে কলিকাতার বাজারে দুধ নিয়ে যাবার খরচ আরও কমিয়ে নিতে পারে। সেই চেষ্টা এখন করা যাচ্ছে।' আশা করি, এ চেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে। সমিতির আর একটা দৃষ্টান্ত,—'উলুবেড়িয়া মহকুমার ধীবরদিগের মধ্যে কতকগুলি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই ধীবরেরা নৌকা ও জালের জন্য মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। মহাজনেরা টাকার সুদ নেয় না, কিন্তু ধীবরদিগের মাছ খুব কম দামে কিনে নেয়। যে তপসে মাছ কলিকাতায় বারো আনায় একশো বিক্রয় হয়, তা মহাজনেরা চারি আনায় কিনে নেয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে—চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এই তিন মাসে এই ভাবে প্রত্যেক ধীবরের যে টাকা লোকসান হয়, মহাজনের টাকার রীতিমত সুদ তার চাইতে অন্ততঃ তিন শত টাকা কম। তিন মাসে প্রত্যেকের তিন শত টাকা লোকসান। এই ধীবরদিগের মধ্যে সমিতি হ'য়েছে। তারা এখন আর মহাজনের কাছে যাবে না। এখন তারা যাতে কলিকাতার বাজারে মাছ এনে বেচতে পারে, তার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে।' 'নানা কথা'য় এইরূপ বিবিধ তথ্যের সংগ্রহ আছে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কো-অপারেটিভ ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা' আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। 'যাহা এক জন দুই জনের অসাধ্য, তাহা গ্রামবাসীরা সকলে জড় হইয়া করিলে, সাধ্য হইয়া উঠিবে। এইরূপ দুইটি সভা

২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটি ও সুখচর গ্রামে সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। * * * কার্য্যের ভার ভাগ করিয়া, যাহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাদের স্কন্ধে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাতে তাহারা সম্মত হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভার সরকারী ড্রেণ ও সরকারী রাস্তার ধারে নালা ঠিক রাখা—তাহা তাঁহারা করিতেছেন। সোসাইটীর কাজ—মেম্বরদের আঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর ডোবা ইত্যাদি বোজান, জঙ্গল কাটা, যাহাতে রৌদ্র আসিতে পারে। সকল মেম্বরদের নিকট হইতে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা লওয়া হইতেছে। ১০০ শত জন মেম্বর হইলে, ১০০৲ শত টাকা মাসে সোসাইটীর তহবিলে জমিবে। তাহার ৭০৲ টাকা স্থানীয় মেডিকেল কলেজের পাশকরা এক জন ডাক্তারকে দেওয়া হইবে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেম্বরগণকে বিনা ভিজিটে দেখিতে স্বীকার পাইয়াছেন, এবং ঔষধ বিনা দামে দিবেন। বাকী ৩০৲ টাকা হইতে মেম্বরদের বাসার আঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর বনজঙ্গল দূর করা ও ডোবা বোজান হয়। সকলে এক হইয়া মাসে মাসে সভা করিয়া উপায় ঠিক করিতেছেন। কাৰ্য্য অতি সুশৃঙ্খলে চলিতেছে।'—বাঙ্গালী যদি বাঁচিতে চান, তাহা হইলে এই পথের অনুসরণ ভিন্ন উপায় নাই। ইহাই বাঁচিবার পথ। যাঁহারা গ্রামে এইরূপ সমিতির সৃষ্টি করিতে চান, তাঁহারা ৬ নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বঙ্গীয় সমবায়-মণ্ডলী গঠন-সমিতি'কে লিখিলে সমস্ত বিবরণ অবগত হইবেন, এবং 'সভা-স্থাপনে সহায়তা' পাইবেন। 'ভাণ্ডারে'ও কবিতা! কথায় বলে,—'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!' শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বোধ হয়, ফরমাসমত 'কৃষক' নামক কবিতাটির রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ভাল কথা আছে। কিন্তু সমবায়-সমিতির চেষ্টায় বা ফরমাসে কবিতা হয় না, হইবার আশা নাই, কবিতাটি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। 'ভাণ্ডার' বোধ হয় 'নীতি-শ্লোক' করিয়া বুঝাইতেছেন—কবিতায় সমবায়'ও ব্যর্থ—আমরা শ্রাবণের পর আর 'ভাণ্ডার' পাই নাই। বিনিময়ে যে 'সাহিত্য' পাঠাইয়াছিলাম, তাহাও অসংখ্য ডাক-মোহরের ছাপ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সম্পাদককে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি নিরুত্তর। কারণ কি? 'ভাণ্ডার' দেখা দিয়া লুকাইল কেন?

নারায়ণ। ভাদ্র। প্রথমেই শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'ব্রাহ্মসমাজের কথা' কুড়ি পৃষ্ঠা—তাহাও ক্রমশঃ। 'নারায়ণে' ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গ কিছু আতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে।—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আলোচনাও নিষ্ফল নয়, এবং সাহিত্যের দিক হইতেও তাহার অনুশীলন আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সে আলোচনা তত্ত্ববোধিনী, তত্ত্বকৌমুদী ও ধর্ম্মতত্ত্বে আবদ্ধ থাকিলে আমাদের মত বোকা পাঠকেরা নিষ্কৃতি পাইতে পারে। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'রঘুতে নারায়ণ' ভাদ্রের নারায়ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন,—'লক্ষ্মী-নারায়ণ'কে রঘুবংশের 'নায়ক-নায়িকা বলিয়া ধরিতে পারিলে সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়, কাব্যের আখ্যান চমৎকার হয়, উহা এক অপূর্ব্ব রসভাবের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যেন, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সব এক সূতায় গাঁথা, এক ভাবে ভোর, এক রসে পুষ্ট, এক উদ্দেশ্যে আবদ্ধ।' মতটি সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তি' প্রবন্ধে শ্রীমান ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'The Foundation of Indian Economics' নামক গ্রন্থের পরিচয় দেবার সকল

করিয়াছেন। স্বচনায় বিদেশী ও স্বদেশী সমালোচকগণের সমালোচনার সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—এই সবে আরম্ভ। 'এ কি স্বপ্ন?' বেঁাপাসা অবলম্বনে সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে আখ্যান-বস্তুর বৈচিত্র্য ও পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 'প্রাচীন পুথির বানান' প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী ও ভক্তগণ তাহার মীমাংসা না করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিবে।—'কমলের দুঃখ' এই সংখ্যায় শেষ হইল।—যাহা অ-শেষ, অনন্ত ও অনপনেয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, খোদ 'নারায়ণ'কেও তাহা শেষ করিতে হইল। 'বিসর্জ্জন আসিয়া' কুৎসিতের 'প্রতিষ্ঠা'কে লইয়া গেল; বালুময়ী বেলার উপর লালসার পদচিহ্নও থাকিবে না; কামনা কর্দ্দমের সরোবরে জলের উপর যে আলিপনা দিয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই শিবের তপোময়ী তনুতে মিশিতে পারিবে। কিন্তু 'কমলের দুঃখ' কালের এক অংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক খণ্ডে যে গরলের ধারা ঢালিয়া দিল, কোন্ মহাদেব তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবেন?—'দাও করতালি, জয়-জয় বলি'—চিত্তরঞ্জনের পরম-প্রিয় 'কমলের দুঃখ' শেষ হইল। বাঙ্গালা দেশে ভাদ্র মাসে ইহার শেষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেনের 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' এই সংখ্যায় শেষ হইল।—চট্টগ্রামের কবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে চারিটী 'প্রাচীন পদাবলী'র উদ্ধার করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'বঙ্কিম-স্মৃতি'র বিজ্ঞাপন আমরাও ছাপিয়া দিলাম। আশা করি, পরিষদের এই সাধু চেষ্টা অচিরে সাফল্য লাভ করিবে।

বঙ্কিম স্মৃতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য, ২৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

তন্ত্রের ইতিহাস।

গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

[পূর্ণানন্দ গিরি।]

তন্ত্রের ইতিহাসে 'গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে'র বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। নিবন্ধ-রচনায় ও টীকা-প্রণয়নে গৌড়ীয়দিগের সূক্ষ্ম মনীষার পরিচয় সভ্যসমাজে নূতন নহে। যে নব্য-ন্যায়-দর্শন জগতে অতুলনীয় শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, গৌড় দেশই তাহার জন্মভূমি। এমন কি, দেশান্তরে উহা 'গৌড়ীয় ন্যায়' নামেই পরিচিত হইয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে—বাঙ্গালী জাতির অধিষ্ঠান বর্ত্তমান বাঙ্গালা নামে প্রসিদ্ধ সমস্ত ভূভাগই 'গৌড়' শব্দের প্রতিপাদ্য, এই মতের অনুসরণ করিয়াই আমরা গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করিব। গৌড়ের সীমানির্দ্ধারণ এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিচার বিতর্ক উপেক্ষিত হইল।

ভট্ট দিবাকর, মুরারি মিশ্র প্রভৃতি মীমাংসকগণ গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ আপনাকে 'গৌড়ীয়' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। ভবদেব, হলায়ুধ, শূলপাণি, মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ-কারদিগের ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় গৌড়ীয় পণ্ডিতের অনন্যসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিতেছে। অপর দিকে, মহারাজ বল্লাল সেনের দানসাগর প্রভৃতি নিবন্ধ স্বাধীন নরপতির নিরতিশয় শাস্ত্রব্যসনিতা জ্ঞাপন করিতেছে।

বিচারবহুল দর্শন শাস্ত্রে ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মজ্ঞাপক স্মৃতিশাস্ত্রে গৌড়ীয়দিগের যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, উপাসনা-প্রতিপাদক তান্ত্রিক নিবন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তদপেক্ষা অধিকতর কৌশল প্রতিভাত হয়। গৌড়ে কতগুলি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান সময়ে কতগুলির অস্তিত্ব আছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এবং যাহা আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহারই বিষয় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

পরের কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ নিজের ঘরের কথা বলাই সহজ এবং

সঙ্গত। অতএব গৌড়ীয় তান্ত্রিক নিবন্ধের আলোচনার উপক্রমেই আমরা শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরির গ্রন্থাবলীর বিষয় বিবৃত করিব।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

১। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, ২। তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, ৩। শাক্তক্রম, ৪। শ্যামারহস্য, ৫। ষট্‌চক্রনিরূপণ, * ৬। যোগসার, ৭। কালীককারকূটসহস্রনাম টীকা, ৮। ষট্‌চক্রনিরূপণ টীকা।†

শাক্তক্রম, শ্যামারহস্য ও ষট্‌চক্রনিরূপণ মুদ্রিত হইয়াছে,‡ অন্যগুলি এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে উক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

১। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'ই অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। এই পুস্তকে শ্রীবিদ্যার অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা-প্রণালী অতি বিস্তৃতভাবে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইহার পরিচ্ছেদগুলি 'প্রকাশ' নামে অভিহিত, যেমন 'প্রথম প্রকাশ' ইত্যাদি।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ ছয়টি শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্লোকগুলিতে কবিত্বের কিরূপ বিকাশ হইয়াছে, এবং পঞ্চতত্ত্বপ্রধান শাক্তের নিকট ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহা পাঠকের গোচর করিবার জন্য শ্লোকগুলি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

দলদতরল-পদ্ম-প্রোল্লসৎ পূর্ণেন্দু
হিমরুচি-রুচিরাস্যো তৎসমীপ-স্বরূপঃ।
অভয় বরকরাঢ্যো যোগমুদ্রা-স্তনেরঃ
কুল-কমলবিলাসী পাতু মাং দেবদেবঃ ॥ ১
অজ্ঞানাং জ্ঞানদেবঃ নিবিড়ঘনঘনাবাঞ্ছনম্বালহাসি
জ্যোৎস্নাজালৈর্ষৈশ্যোঃ কুলকমলবনীকান্তিকান্তিপ্রকাশম্।

---

* ষট্‌চক্রনিরূপণ পৃথক্ গ্রন্থ নহে; শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির ষষ্ঠ পটলের নামই ষট্‌চক্রনিরূপণ, ইহারই অপর নাম যোগচিন্তামণি। ইহা পৃথক্ গ্রন্থ না হইলেও বর্তমান সময় পৃথক্ গ্রন্থরূপেই পরিচিত হইয়াছে, তাই পৃথক্ ভাবেই ইহার নামোল্লেখ করিলাম।

† পূর্ণানন্দ স্বকৃত ষট্‌চক্রনিরূপণের একখানি টীকাও লিখিয়া গিয়াছেন। এই টীকার নামও যোগচিন্তামণি।

‡ মুদ্রিত পুস্তকগুলিও নিতান্ত অশুদ্ধ ও বিকৃতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

গঙ্গাদ্যশেষতীর্থৈর্ঘনঘনলহরীপুণ্যপুঞ্জপ্রবাহৈঃ
বন্দে শ্রীমদ্গুরূণাং চরণসরসিজদ্বন্দ্বমানন্দকন্দম্ ॥ ২

অজ্ঞানৌঘমহান্ধকারপটলধ্বংসপ্রচণ্ডদ্যুতি-
ব্রহ্মানন্দপরম্পরৈকনিলয়ঃ পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভঃ।
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ দধতামুচ্চৈর্দধানোঽনিশম
মূর্দ্ধ্নি শ্বেতসরোরুহাসনসমাসীনঃ শিবঃ পাতু নঃ ॥ ৩

যস্যাঃ শ্রীধরকান্তিকুন্দসদৃশে বক্ষঃস্থলে নির্ম্মলে
ভান্তি স্বচ্ছমনোহরেব বিমলা সংলগ্নমুক্তাবলী
কালিন্দীসলিলোৎকপঙ্কজদলশ্যামাম্বুধারোপমাং
শোভামাতনুতে নমামি শিরসা তাং পাদযোর্দ্বন্দ্বকম্ ॥ ৪

ভক্ত্যা নম্র নিলিম্পমৌলি বিলসন্মন্দারমালাবলী-
নির্যাতস্মরকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ স্নাতাঙ্ঘ্রিপীঠাম্বিকা।
ধ্যানৈর্যের নিষেবিতা শুকমুখৈর্ব্রহ্মাদিবৃন্দারকৈঃ
শশ্বোদ্বন্দ্বললোচনা ভগবতী দেবী শিবা পাতু নঃ ॥ ৫

ন পীনং নাপীনং নহি পরিমিতং নাপরিমিতং
ন রক্তং নারক্তং ন হি ধবলিতং নাধবলিতম্।
নিরাকারং নিত্যং ত্রিগুণরহিতং দেবমজরং
তমাত্মানং বন্দে পরমসুখসন্তাননিলয়ম্ ॥ ৬

মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, সংসার-সাগর-মগ্ন জীবসমূহের উদ্ধার-বাসনায় পরমকারুণিক ভগবান্ পরম শিব পরম দেবতার রহস্যপূর্ণ আরাধনা-প্রতিপাদক অনেক-কোটী-সংখ্যক সারভূত তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল তন্ত্রের দুর্জ্ঞেয় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া অলস মানবদিগের পক্ষে উপাসনা অসম্ভব; তাহাদের উদ্ধারের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীপূর্ণানন্দ পরমহংস তাঁহার গুরু শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দের নিকট সমস্ত রহস্য অবগত হইয়া চতুর্দ্দশশতাধিক নবনবতি শকাব্দে [১৪৯৯ শকাব্দ, ১৫৭৭ খৃঃ অঃ] শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি রচনা করিয়াছেন।

সূচনার দার্শনিক প্রণালীতে প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরের দ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অত্রত্য আত্মতত্ত্বনিরূপণে শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত মায়াবাদের প্রতি-ধ্বনি লক্ষিত হয়। অধ্যাসভাষ্য-বর্ণিত অবিদ্যার বিবরণ ইহাতেও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময়ে গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনে বিশেষরূপে ব্যাপৃত ছিলেন।

গ্রন্থকার নিজেও বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুদিগের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য অনাদি অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে তিনি 'সাধনা'র অর্থাৎ আরাধনার প্রকার বলিয়াছেন। স্মৃতি-আগম-পুরাণবিদ্দিগের সৎসম্প্রদায়ানুমোদিত সিদ্ধান্তানুসারে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তিনি শ্লোকের দ্বারা বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রথম 'প্রকাশে'র পূর্ব্বাংশে আত্মনিরূপণ প্রকরণে একটু গদ্য আছে, তদ্ব্যতীত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পদ্যাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে মূলতন্ত্রের বচন অবিকলরূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে; কোথাও বা কিঞ্চিৎ অন্যথা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মূলতন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষায় পদ্য রচিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ তন্ত্র হইতে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র তাহার উল্লেখ করেন নাই। কোনও কোনও স্থানে তন্ত্রের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম 'প্রকাশে' সংসারের অনিত্যতা, দুঃখবাহুল্য প্রভৃতি দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধকের বৈরাগ্যোৎপাদনের অভিপ্রায়ে যে সকল শ্লোক উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কুলার্ণব তন্ত্র হইতে সংগৃহীত।

জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না. কাহারও মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, তাঁহাদিগের মতে তৃষ্ণার নাশ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই মুক্তি। গ্রন্থকারের নিজের মতে, আনন্দময় পরমাত্মাতে জীবাত্মার বিলয়াবস্থাই মুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র মুক্তির কারণ নহে, দর্শনাদি শাস্ত্রও মুক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। সেই জ্ঞান দুই প্রকার,—এক শব্দব্রহ্মের অবগতিজন্য, অর্থাৎ বেদান্তাদি-বাক্যার্থজ্ঞানজন্য; অপর পরব্রহ্মের বিবেকজন্য। ৬১ হইতে ৬৫ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রদর্শিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ৬৬ হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত শব্দব্রহ্মের স্বরূপ এবং বর্ণাকারে তাহার অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি শ্লোক শারদাতিলক হইতে সংগৃহীত।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে. যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়. সেই পর্য্যন্তই জপ, হোম. পূজা, তীর্থস্নান প্রভৃতি আবশ্যক। অতএব মোক্ষকামী মানব সকল অবস্থাতেই তত্ত্বনিষ্ঠ হইবেন। নিগমাগমসম্মত-তত্ত্বনিষ্ঠ হইবার উপায় কথিত হইতেছে,—এক সনাতন পরব্রহ্মই রসরূপী, তিনি প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন, এবং তদ্দ্বারাই আবার অব্যক্তও হন। অতএব, প্রকৃতির সংযোগই শীঘ্র

ব্রহ্মপ্রত্যক্ষের উপায়। প্রকৃতি-পুরুষের সমরস জ্ঞান, অর্থাৎ ষট্‌চক্রবর্ণিত সহস্রারের ব্যাপার পরমপদস্বরূপ। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানের বহু উপায় বিদ্যমান, তথাপি প্রকৃতিযোগে যত সত্বর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তত সত্বর অন্য কোনও উপায়েই হয় না। প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিবার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় প্রকাশে দীক্ষাপ্রণালী বলা হইবে, এই সূচনার পর প্রথম প্রকাশ উপসংহৃত হইয়াছে।

এই স্থলে বর্ণিত 'তত্ত্বনিষ্ঠ' ও 'প্রকৃতিযোগ', এই দুইটি কথার ভিতর শাক্ত-দর্শনের গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। যথাশ্রুত অর্থ—প্রকৃতির ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যাহা কিছু অবগতির উপায়, তাহা সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। পক্ষান্তরে, গূঢ় অর্থ—ব্রহ্ম আনন্দময়, প্রকৃতির কমনীয়-মূর্ত্তি-যোষিৎ সমাগমে ঝটিতি দেহস্থ আনন্দের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বপদে পঞ্চতত্ত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে; কারণ, প্রধান-গুণভাবে পাঁচটি পদার্থই আনন্দের অভিব্যঞ্জক।* প্রথম প্রকাশের শ্লোকসংখ্যা ৮৫। এই প্রকাশের নাম তত্ত্ববিবেচন।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রকাশে দীক্ষার যাবতীয় বিষয় কথিত হইয়াছে। দীক্ষা-প্রসঙ্গে গুরুশিষ্যের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ইহার মতে, যিনি শিষ্যের উদ্ধার এবং অনিষ্টকারীর সংহার করিতে সমর্থ, যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, যিনি মন্ত্র-যন্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, এবং রহস্য বিষয় অবগত, যিনি দানশীল দান্ত শান্তহৃদয় সৌম্যমূর্ত্তি অধ্যাত্মবিৎ ব্রহ্মচারী ও কুলীন [মহাকুলসম্ভূত অথবা কুলক্রিয়ারত], তাদৃশ ব্রাহ্মণই গুরু। এই প্রকাশে মন্ত্রমুক্তাবলী ও কাদিমত এই দুইখানি তন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৭৪।

তৃতীয় প্রকাশে দীক্ষার স্থান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৯১।

চতুর্থ প্রকাশে মণ্ডপাদিরচনা ও অঙ্কুরার্পণপদ্ধতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার শ্লোকসংখ্যা ৬৬।

---

* আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং দেহে তচ্চ ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ-মকারা বৈরবার্চ্চনম্।
[সৌভাগ্যভাস্করধৃত পরশুরামকৃত কল্পসূত্র।]
আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং দেহে তচ্চ ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভি স্তেন পীয়তে। [উড্ডীশোত্তর খণ্ড

পঞ্চম প্রকাশে দীক্ষাবিধি উক্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ১৭৮।

অতঃপর ষষ্ঠ প্রকাশে ষট্‌চক্র বর্ণিত হইয়াছে। যে গ্রন্থ সাধারণের নিকট 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' বা 'যোগচিন্তামণি' নামে পরিচিত, তাহা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেরই ষষ্ঠ প্রকাশ। আমরা পরে পৃথক্ ভাবে এই গ্রন্থের আলোচনা করিব। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৬।

সপ্তম প্রকাশে হোমের উপযোগী কুণ্ড প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে উত্তর তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬৫।

অষ্টম প্রকাশে শক্তিতন্ত্রানুসারে হোমের বিধান কথিত হইয়াছে। ইহাতে হোমের পরিপাটী অতি বিশদভাবে ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হোম সম্বন্ধে এমন কথাও বলা হইয়াছে, যাহা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—শূদ্র যদি স্বয়ং তান্ত্রিক হোম করিবার ইচ্ছা করে, তবে স্বাহা শব্দের পরিবর্ত্তে 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে, 'বারাহীতন্ত্ররাজে'র এই মত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১২৬।

নবম প্রকাশে অনেক প্রকার হোমদ্রব্যের নাম প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে অরিমন্ত্র-পরিত্যাগের 'মালিনীবিজয়তন্ত্র'সম্মত বিধান কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৭৮।

দশম প্রকাশে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রমাহাত্ম্য, বিদ্যামাহাত্ম্য ও পরমেশ্বর হইতে দেবীর অভিন্নতা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রনির্ণয়তন্ত্র, কুলোড্ডীশতন্ত্র ও বৃহৎ শ্রীক্রমতন্ত্র, এই তিনখানি তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ২২৭।

একাদশ প্রকাশে কতিপয় মন্ত্রোদ্ধার, শাক্তী ও শাম্ভবী, এই দুই প্রকার বিদ্যাভেদ, পূর্ব্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায়, ঊর্দ্ধাম্নায় ও অধ-আম্নায়, এই ষড়াম্নায় ভেদে শক্তির ও শাম্ভবীর পার্থক্য কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৬৫।

দ্বাদশ প্রকাশে শুদ্ধাশুদ্ধ মন্ত্রভেদে মহাত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্রের মেরুমন্ত্রকথন, মেরু হইতে মন্ত্রের উৎপত্তিকথন, মনু, চন্দ্র, কুবের, কাম, লোপামুদ্রা, অগস্ত্য, নন্দি, সূর্য্য, বিষ্ণু, স্কন্দ ও দুর্ব্বাসাঃ, ইঁহাদের আরাধিত দ্বাদশপ্রকার বিদ্যা শুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অগস্ত্যারাধিত বিদ্যা দুই প্রকার। এই সকল বিদ্যার প্রভেদ ও শিবপূজিত বিদ্যা কথিত হইয়াছে। অতঃপর সবল-[শবল]-সংজ্ঞক মন্ত্রকথনের প্রসঙ্গে বরুণপূজিত, যমপূজিত, বহ্নিপূজিত, পন্নগরাজপূজিত,

সোমপূজিত, ঈশানপূজিত, রতিপূজিত, ব্রহ্মপূজিত, বৃহস্পতিপূজিত বিদ্যা কথিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি কি জন্য শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই স্থলে কথিত হয় নাই। পুরাণ শাস্ত্রে এই বিষয়ের বিবরণ নিহিত আছে। অতঃপর ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রের দীপনী প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্র, শ্রীক্রম, মন্ত্রনির্ণয়তন্ত্র ও ভৈরবী তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১২৫।

ত্রয়োদশ প্রকাশে ষোড়শীবিদ্যা-বিবরণ কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৬৪।

চতুর্দ্দশ প্রকাশে উপাসনার প্রাতঃকৃত্য কথিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১০৬।

পঞ্চদশ প্রকাশ অতিবিস্তৃত। ইহাতে প্রথমতঃ আভ্যন্তর স্নানপ্রণালী, অনন্তর গৃহ্যোক্ত বাহ্যস্নানপরিপাটী কথিত হইয়াছে। স্নানের কতিপয় পরিপাটী বলিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অন্যান্য বিষয় সংকৃত স্নানবহস্তে দ্রষ্টব্য। স্নানের অনন্তর বৈদিক সন্ধ্যা প্রভৃতি ক্রিয়ার পর অতিবিস্তৃত তর্পণানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ প্রভৃতি দেবতার তর্পণও বিহিত হইয়াছে। অনন্তর অতিবিস্তৃত পূজানুষ্ঠানপরিপাটী এবং তৎপ্রসঙ্গে বিস্তৃত ও বিশদ ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি ও পরে প্রপঞ্চসারের ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। অনন্তর ন্যাসশব্দের নিরুক্তি ও ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্যার্থ কথিত হইয়াছে। তাহার পর অনেক প্রকার ন্যাস, তৎপ্রসঙ্গে ষট্‌চক্রস্থিত ডাকিনী প্রভৃতি দেবতার ধ্যান, চক্রন্যাস প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শন, ব্রহ্মদর্শন, শৈবদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, জৈনদর্শন ও শক্তিদর্শন, এইগুলি স্থানবিশেষে ন্যস্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনন্তর অতিবিস্তৃত ও বিশদ অন্তর্যাগপদ্ধতি কথিত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত, এই দুই প্রকার সমাধি উক্ত হইয়াছে। অনন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানহোম কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটি বড়ই উপাদেয়। ইহাতে তান্ত্রিকোপাসনার অঙ্গভূত আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা, এতচ্চতুষ্টয়ের লক্ষণ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কল্পনাময় আত্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানও স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। ইহাতে কুলোড্ডীশ, তত্ত্ববিমর্ষিণী ও জ্ঞানার্ণব, এই তিনখানি গ্রন্থের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৯০।

ষোড়শ প্রকাশে যন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাতে সম্মোহন তন্ত্র, ভাবচূড়ামণি তন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র, শ্রীক্রম তন্ত্র, বৃহৎ শ্রীক্রম তন্ত্র ও গুপ্তার্ণব তন্ত্র, এই কয়খানি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ১১০।

সপ্তদশ প্রকাশে দেবীর অতিবিস্তৃত পূজাপরিপাটী কথিত হইয়াছে। ইহাতে আবাহন প্রভৃতির উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর ধ্যেয় রূপে নাসাগ্রে গজমুক্তালঙ্কারের সন্নিবেশ বর্ণিত হইয়াছে; * সুতরাং নোলোকের ব্যবহার পূর্ব্বকালেও ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়: হস্তে নাগেন্দ্রদন্তনির্ম্মিত শঙ্খ-ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়; † অতএব গজদন্তের বিবিধ অলঙ্কার প্রাচীন যুগেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাতে অঙ্গদেবতার পূজাপ্রসঙ্গে ত্রৈলোক্য-মোহন নামক চক্রের পূজায় বুদ্ধের পূজা ও বুদ্ধমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ‡ ইহাতে বৌদ্ধদর্শনেরও উল্লেখ আছে। সূর্য্যের পূজা-প্রসঙ্গে সৌরদর্শনের পূজা এবং সর্ব্বরক্ষাকরচক্রে জিনেশ বিষ্ণুর পূজা বিহিত হইয়াছে। দেবীপ্রিয় অনেক প্রকার ধূপ কথিত হইয়াছে। তর্পণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করিবে, কখনও মদ্য ব্যবহার করিবে না। বামমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণও মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না। যে স্থলে মদ্যের বিধান আছে, সে স্থলে তাম্রপাত্রে মধু অথবা কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক দান করিবে; বৃহৎ শ্রীক্রম তন্ত্রের এই মত। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে এই নিয়মই কথিত হইয়াছে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের মতেও বর্ণভেদে [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে] সবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানী সাধকের পক্ষে যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মদ্য বিহিত হইয়াছে। ৫১৫ শ্লোকে দেবী অবধূতেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রকরণে মহারাজতন্ত্র, কুলার্ণব, সময়াচারতন্ত্র, শক্তিযামল, যামল, বৃহৎ শ্রীক্রম, দক্ষিণা-মূর্ত্তিতন্ত্র, তত্ত্ববিমর্ষিণী, জ্ঞানার্ণব ও মন্ত্রনির্ণয়, এই কয়খানি তন্ত্রের নাম আছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ৬২৩।

অষ্টাদশ প্রকাশে প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'ক্রমস্তব' নামক ৫৬ শ্লোকাত্মক একটি স্তব কথিত হইয়াছে। এই স্তোত্রে আনন্দলহরীর ন্যায় নিরতিশয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্তর ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রোক্ত কবচ, তৎপরে কুলার্ণবতন্ত্রোক্ত কবচ, অনন্তর রুদ্রযামলতন্ত্রোক্ত শতনাম কথিত হইয়াছে।

---

* নাসাগ্র-গজরাজোত্থ-মহামুক্তাবিরাজিতাম্। ১১৫

† নাগেন্দ্রদন্তশঙ্খেন মণিকান্তবিরাজিতাম্। ১৭০

‡ প্রণবঞ্চ ততস্তারে তুত্তারে চ ততস্ততম্। বহ্নিজায়া শিরঃশিতো বৌদ্ধমন্ত্রো মনীষিভিঃ। ৩০৩ ইহাতে 'ওঁ তারে তুত্তারে তত তত স্বাহা' এই মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়াডেল কৃত 'তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম' নামক পুস্তকে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধারণ মন্ত্র 'ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা' এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় মন্ত্রের সাদৃশ্য প্রণিধানযোগ্য।

ইহাতে ত্রিপুরার্ণব, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৩৯।

ঊনবিংশতিতম প্রকাশে পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে। যথোক্ত পুরশ্চরণানুষ্ঠানেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে দ্রাবণ প্রভৃতি সাত প্রকার অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে।

'এবমনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়া স্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ।
দ্রাবণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষ-পোষণে।
দহনান্তং পুনঃ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্।' ৯৫, ৯৬

অতঃপর মন্ত্রজপের অঙ্গরূপ কতিপয় যোগানুষ্ঠান ও মালাশোধনাদির বিস্তৃত অনুষ্ঠান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বামকেশ্বর তন্ত্র ও মুণ্ডমালা তন্ত্রের নাম আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫১।

বিংশতিতম প্রকাশে প্রথমতঃ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পূজানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান কুলাচারানুসারে কর্ত্তব্য, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে মণিমুক্তা-নির্ম্মিত বিবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজার বিধান বলা হইয়াছে। ইহাতে শিল্পের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—স্বর্ণের দ্বারা পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া মুক্তারত্নের দ্বারা তাহা অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে, * ইত্যাদি।

পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণিনির্ম্মিত স্বর্ণযুক্ত পুষ্পেরও উল্লেখ আছে। কোন্ কোন্ পুষ্প দেবীপূজায় দেয়, ইত্যাদি অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবী-সাধকের পক্ষে মদনপূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত ও মদনপূজার অনুষ্ঠানে দ্বাদশ মাসে দেবীর বিশেষ পূজা বিহিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫৬।

একবিংশতিতম প্রকাশে জ্ঞানদূতীকূটত্রয়-সাধন নামক রহস্যপূর্ণ অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ৯৪।

দ্বাবিংশতিতম প্রকাশে উচ্চাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণের নাম শ্রীবিদ্যাজীবনযন্ত্রাদি-বিবরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫২।

ত্রয়োবিংশতিতম প্রকাশে স্তবপাঠের নিয়ম, ছাগাদি-বলির লক্ষণ ও বলিদানের নিয়ম কথিত হইয়াছে। এই নিয়ম বারাহীসংহিতোক্ত। তান্ত্রিক

* মুক্তারত্নৈ রঙ্কিতানি স্বর্ণপুষ্পাণি যানি চ। ২২

বলিদানের যে পদ্ধতি আছে, উহা সেরূপ নহে। ইহাতে পৌরাণিক রীতিই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৮৭।

চতুর্বিংশতিতম প্রকাশে রুদ্রযামলোক্ত সংক্রমায় কথিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৯৩।

পঞ্চবিংশতিতম প্রকাশে প্রথমতঃ মন্ত্রসংস্কার, তৎপ্রসঙ্গে ষোড়শোপচারদানের মুদ্রা, অনন্তর দেবতা-প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি, অনন্তর শরৎকালে দুর্গাদেবীর গৃহপ্রতিষ্ঠা, তৎপ্রসঙ্গে দুর্গাদেবীর পূজা, হোম, সন্ধিপূজা, বলিদান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অতঃপর মিলিত সাধকগণ কর্তৃক চক্রানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। এই চক্রানুষ্ঠান 'সময়' নামে অভিহিত হইয়াছে। সময় শব্দের অনেক অর্থ অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে সিদ্ধান্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অথবা, আচার অর্থও হইতে পারে; কৌলিকদিগের এই আচার, বা সিদ্ধান্ত। এই প্রকাশের শ্লোকসংখ্যা ১২৪।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির মোট শ্লোকসংখ্যা ২৬৬৮। এই পুস্তকে প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানই কুলাচারানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় উক্ত হয় নাই, তাহা শ্যামারহস্য, শাক্তক্রম ও তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

২। তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী।

এই গ্রন্থ একাদশ উল্লাসে সমাপ্ত। ইহাতে কৌলিকদিগের গূঢ় উপাসনা-প্রণালী কথিত হইয়াছে। ইহার প্রথমোল্লাসে প্রথম শ্লোকে গ্রন্থকার গুণাতীত আত্মাকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবতা-নমস্কারের পর দ্রব্যসংস্কার কথিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শিবসিদ্ধান্ত ও গুরুমত অবগত হইয়া পূর্ণানন্দগিরি দ্রব্যসংস্কার বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় উল্লাসে মৎস্য প্রভৃতি তত্ত্বের শোধন কথিত হইয়াছে। তত্ত্বপদার্থের শোধনে বৈদিক মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—ব্রহ্মানন্দগিরি হইতে অবগত হইয়া পূর্ণানন্দ এই প্রক্রিয়া বলিয়াছেন।

'ব্রহ্মানন্দগিরেঃ শ্রুত্বা পূর্ণানন্দোঽব্রবীদিদম্।'

তৃতীয়োল্লাসে অর্ঘ্যপাত্রাদিস্থাপন কথিত হইয়াছে। ইহাতেও বৈদিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। চতুর্থোল্লাসে তত্ত্বশুদ্ধি ও পঞ্চমোল্লাসে বলিদান-প্রকার কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম উল্লাসে পানানুষ্ঠান, দ্রব্যের গুণাগুণ ও অশক্তের পক্ষে প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। অষ্টম হইতে একাদশ উল্লাস পর্য্যন্ত পদ্ধতি কথিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম হইতে সপ্তম পটল পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত; অবশিষ্ট গদ্যময়।

৩। শাক্তক্রম।

শ্রীমৎপূর্ণানন্দগিরি-কৃত শাক্তক্রমনিবন্ধও তান্ত্রিকসমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থ সপ্ত পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। এক একটি পরিচ্ছেদ এক এক 'অংশ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রথম অংশে গ্রন্থকার দেবতা-নমস্কারপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া দীক্ষিত শাক্তদিগের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাতঃকৃত্য প্রসঙ্গে ধ্যেয়-গুরু-রূপ-বর্ণনার পর মানসপূজানন্তর পাঠ্য একটি উৎকৃষ্ট গুরুস্তব কথিত হইয়াছে। এই স্তবটি গ্রন্থকারের নিজগুরু শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দকৃত 'শক্তি-তন্ত্রসার্ব্বমন্ত্রিকাগমে'র অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপরে কুলবৃক্ষ-প্রণাম-প্রসঙ্গে দ্বাদশ প্রকার কুলবৃক্ষের নাম কথিত হইয়াছে। অনন্তর স্নানাদি নিত্য-কর্ম্ম, পূজার স্থান, দীপস্থান, পারিভাষিক স্থান ও আসন কথিত হইয়াছে। অনন্তর অতিবিস্তৃত অন্তর্যাগানুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অত্রত্য অন্তর্যজন শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণিতেও বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্যাগের পর ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য মহাবজ্র কথিত হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত শরীরকে মহাশূন্যে নিযুক্ত করিতে হয়।

দ্বিতীয় অংশে দিব্য, বীর ও পশু, এই ভাবত্রয় কথিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, দিব্যভাব অতি শ্রেয়স্কর, বীরভাব মধ্যম, এবং পশুভাবে বহু-জপানুষ্ঠানে কায়ক্লেশে সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের মতে, কলিতেও ত্রিবিধ ভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়দিগকে এই বিষয়টি বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। ভাব-প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এতৎ-ত্রিতয়ের অন্যতম ভাব ব্যতীত পূজাদি ক্রিয়ার ফল হয় না।

'কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা কেন বা ন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ দেবেশ ভাবাভাবাৎ প্রজায়তে।'

অনন্তর দিব্যভাবের ও বীরভাবের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র-মতে দিব্যভাবে ও বীরভাবে বিশেষ প্রভেদ নাই। এইমাত্র ভেদ যে,—

"শান্তো বিনীতো মধুরো কলা-লাবণ্যসংযুতঃ।
দিব্যস্তু দেববৎপ্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।"

কুল [অর্থাৎ শক্তি] ব্যতীত দিব্য ও বীরের কার্য্যে অধিকার নাই।

অনন্তর পশুভাবের কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুভাবের সাধক পশ্বাচার-পরায়ণ গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পশুভাবপরায়ণ হইবেন।

পশুভাব-সাধক মৎস্য ভক্ষণ করিবেন না, কোনও স্ত্রীকে মনেও স্মরণ করিবেন না, পরদ্রব্যে লোভ ও ভোগে মনোনিবেশ করিবেন না, নদীতীরে পর্ব্বতে বনে দেবালয়ে বিল্ববৃক্ষমূলে নির্জ্জন স্থানে মনোহর পুণ্যক্ষেত্রে জপাদি করিবেন। শূদ্র দর্শন করিবেন না, সর্ব্বতোভাবে কুটিলতা পরিত্যাগ করিবেন। উপাস্য দেবতাকে শুভ্রবর্ণ-রূপে ধ্যান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে,মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে দেবতার পূজা ও মন্ত্রজপ করিবেন। জপমালা ও যন্ত্র, এতদুভয়কে রাত্রিতে স্পর্শ করিবেন না। ভোজনের পর জপ কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত বৈধ কার্য্যেই মৌনাবলম্বন কর্ত্তব্য। পর্ব্বকালে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাজ্য। মৈথুন, তৎ-কথা ও যে সভায় ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ঋতুকাল ব্যতীত নিজস্ত্রীতেও উপগত হইবেন না। পুরাণ-শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ এবং বেদপাঠে ও বেদার্থজ্ঞানে তৎপর হইবেন। রাত্রিতে ভোজন ও তাম্বূলভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন। গুরু যাহা যাহা আদেশ করেন, যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিবেন। কৌলিকদিগের পরম পবিত্র স্বয়ম্ভূকুসুম ও মদ্য প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন না; এই সকল দ্রব্য স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য-পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। দেবীভক্তিপরায়ণ পশুভাব-সাধক রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবেন না। বিষ্ণুতন্ত্রানুসারে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। বীরাচার-সাধকের সহিত আলাপ করিবেন না, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিবেন না।

পশু দুই প্রকার;—পূর্ণ ও সাধারণ। পশুর পূজায় অধিকার আছে, অর্থাৎ বীরের পূজাও পশু করিতে পারেন, কিন্তু গুরু হইতে পারেন না। পূর্ণসংজ্ঞক পশুর পক্ষে বীরের পূজাপ্রদেশে গমন করিবারও অধিকার নাই। কৌলিকগণ নিজের পূজা-স্থান হইতে পূর্ণসংজ্ঞক মহাপশুকে বাহির করিয়া দিবেন; দৈবাৎ পূর্ণকে দর্শন করিলে কুলদর্শন করিবেন। কৌলিকদিগের আরও অনেক নিয়ম কথিত হইয়াছে।

অতঃপর শাক্তদর্শনের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এই মতে, ঘন-আনন্দময় এক আত্মাই প্রকৃতিরূপধারী, তিনিই রসরূপী, তিনিই পরমাত্মা বলিয়া অভিমত হইয়াছেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎই বীর সাধক-গণের করণীয়; অর্থাৎ, আত্মার সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। এই স্থলে শ্রবণ-মননাদির স্বরূপ গদ্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর, এক আত্মারই প্রকৃতিসম্বন্ধনিবন্ধন দ্বৈতভাব-সম্পাদনের তাৎপর্য্য

বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে ভগবৎপাদ-শঙ্করাভিমত অদ্বৈতবাদের সহিত তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের পার্থক্য নাই। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতির দ্বারাই ভেদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং প্রকৃতির যোগ ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীভাব প্রকৃতি ও পুংভাব পুরুষ-রূপে জ্ঞাতব্য ; উত্তম সাধকগণ জ্ঞপ্তি-জ্ঞেয় বিভাগানুসারে ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া লউন। যাঁহার চিত্তে দিব্যভাব ও বীরভাব অবস্থিত হয়, তাঁহার এক জন্মেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় ধরণীমণ্ডলে ভোগার্থ পরিভ্রমণ করেন। তিনি দেবীপুত্র নামে ও ভৈরব নামে কথিত হন।

অনন্তর কৌলিকদিগের কর্ত্তব্য অভিহিত হইয়াছে। কৌলিক সাধক সমস্ত জগৎকে শক্তিময় চিন্তা করিবেন, এবং নিজেও শক্তিময় হইবেন। সংযতচিত্ত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সুখকর যাবতীয় বস্তুকে যুবতীরূপে চিন্তা করিবেন। কুলজা যুবতীকে দর্শন করিলেই প্রণাম করিবেন। কুলজা দর্শন-মাত্রই মনে মনে তাঁহাদের পূজা করিবেন। স্ত্রী জাতির প্রহার নিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীজাতিই দেবতা, স্ত্রীজাতিই প্রাণ, এবং স্ত্রীজাতিই অলঙ্কার। সর্ব্বদা স্ত্রীযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। অন্য স্ত্রী না পাইলে নিজ স্ত্রীকেই সঙ্গে রাখিবে। স্ত্রীলোকের হস্তের দ্বারা অবচিত পুষ্প, জল ও ভোজ্য দেবতাকে নিবেদন করিবেন। স্বয়ং তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবেন না। সাধকের ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে দেবীরও ক্ষোভ হয় ; অতএব সুবুদ্ধি বীরসাধক ভোগযুক্ত হইবেন। সাধক ভোগের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন, ভোগের দ্বারাই কুলসাধন হইয়া থাকে। হেতুদ্রব্য [সুরা] আস্বাদন ব্যতীত মানুষ ক্ষোভযুক্ত হয় ; অতএব, কারণ দ্রব্য পান ও মাংসাদি ভোজন করিয়া পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ইহার পর আরও অনেকগুলি প্রতিপাল্য নিয়ম কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের শেষ ভাগে দেব-গন্ধর্ব্ব-মানব-জাতীয় অনেকগুলি নরনারীর নাম শক্তির উপাসক-সম্প্রদায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুষ্পদন্ত ও মহাবুদ্ধ, এতদুভয়ের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ তন্ত্র হইতে এই অংশের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে প্রকট বীর-সাধনার উপযোগী প্রমাণগুলি স্বতন্ত্রতন্ত্র, কালীতন্ত্র, মুণ্ডমালাতন্ত্র, কুমারীতন্ত্র, মহাচীনাচারক্রম, কুলার্ণব, রুদ্রযামল, উড্ডীশোত্তরখণ্ড, সময়াচারতন্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অংশের প্রথমে কুমারীপূজা কথিত হইয়াছে। ইহাতে এক বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষবয়স্কা পর্য্যন্ত অনাগতার্ত্তবা কন্যা কুমারী-রূপে পূজনীয়া বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মতান্তরে, দুই বৎসর হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কুমারী। ইহাদের একাব্দ হইতে ষোড়শাব্দ পর্য্যন্ত বয়সানুসারে নামবিশেষ কথিত হইয়াছে। কুমারী-পূজার ফলকথন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কুমারী-পূজায় জাতিবিচার করিবে না; অর্থাৎ, সর্ব্বজাতীয়া কুমারীকেই পূজা করিবে।

অতঃপর শক্তিপূজার আবশ্যকতা ও তৎপ্রসঙ্গে কুলতিথি, কুলনক্ষত্র ও কুলাচার কথিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিথিবিহিত তান্ত্রিক কার্য্যে পৌর্ণমাস্যন্ত মাস বুঝিতে হইবে। তৎপর শিবাবলির মন্ত্র প্রভৃতি এবং কৌলিক-দিগের শিবাবলির নিত্যতা কথিত হইয়াছে। পশুশক্তি, নরশক্তি ও পক্ষিশক্তি, এতৎত্রিতয়ের পূজ্যতা বিবেচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, বেশ্যা, নাপিতকন্যা, রজকী ও যোগিনী, এই অষ্ট প্রকার কুলাঙ্গনা যথাক্রমে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী এই অষ্ট শক্তি-রূপে পূজনীয়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উক্ত কন্যা না পাইলে, নিজের কন্যা, কনিষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা, অথবা সপত্নী মাতা, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে। বয়সে অথবা জাতিতে হীন স্ত্রীলোককেও পূজা করিবে। সধবাই হউক, অথবা বিধবাই হউক, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকের অভাবে পরোক্ত স্ত্রীলোককে পূজা করিবে; যেহেতু স্ত্রীলোকগণ দেবীর অংশ। এই অনুষ্ঠান পুরশ্চরণের আদিতে, অন্তে, এবং মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য। অনন্তর পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে জপের নিয়ম এবং মালা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অনন্তর পঞ্চতত্ত্ব-ঘটিত কুলপূজা কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
অতএব মহাপ্রাজ্ঞঃ পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ॥'

এই মহাপ্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ আপাততঃ নিতান্ত গূঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, পরবর্ত্তী গ্রন্থের দ্বারা উহার প্রকৃত অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। পঞ্চমকারের প্রশংসার পরই বলা হইয়াছে যে, এই পূজায় মদিরাদান অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি মদ্যের পরিবর্ত্তে তাম্রপাত্রে মধুরূপ মদ্য অথবা তাম্রপাত্রে ঘৃত ব্যতীত গব্যরূপ মদ্য, অথবা কাংস্যপাত্রে নারিকেলো-দক, কিংবা গুড়সংযুক্ত আর্দ্রক-রূপ মদ্য কল্পনা করিবেন। এই অনুকল্প সবিকল্প

সাধকের পক্ষে, অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ, মদ্য পান করিলে আমার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইতে পারে', এই সংশয় যাহার চিত্তে আছে, তাহার পক্ষে। পক্ষান্তরে, নির্ব্বিকল্প সাধকের পক্ষে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাধিকারের অতীত অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন অবধূতের পক্ষে মহামন্ত্র-সাধনে শ্রুতি-স্মৃতি-নিষিদ্ধ আচরণে কোনও অধর্ম্ম হয় না, প্রত্যুত অভিপ্রেত-সিদ্ধিই হইয়া থাকে। অতঃপর মন্ত্রের প্রকারভেদ ও কাম্যফলবিশেষ বলা হইয়াছে।

মাংস সাধারণতঃ জলচর, ভূচর ও খেচর, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অষ্টপ্রকার মাংস মহামাংস নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—গো, নর, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, ছাগ ও মৃগ; এই সকল জন্তুর মহামাংস দেবতার প্রীতিবর্দ্ধক।

শক্তিপূজনতৎপর সাধক দক্ষিণাচার, বামাচার, বেদবাক্য ও শক্তিসিদ্ধান্ত, এই গুলির নিন্দা করিবে না। শক্তি হইতেই সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতেই পুনঃ পুনঃ লীন হয়; অতএব শক্তিই প্রধান, এবং বস্তুতঃ পূজনীয়া। বীরের পক্ষেও কয়টি কার্য্য বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

'অসংস্কৃতং পিবেন্মদ্যং বলাৎকারেণ মৈথুনম্।
স্বহস্তেন পশুং হত্বাদ্ বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ॥'

অনন্তর শক্তিপূজার অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান অতি রহস্যপূর্ণ, ইহার বিশ্লেষণ সাধারণের নিকট নিষিদ্ধ, এবং সমাজের অনিষ্টকর। তবে ইহাতে যেরূপ সংযম ও সাবধানতা আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। এই প্রকরণে পঞ্চতত্ত্বের নানাপ্রকার শুদ্ধি কথিত হইয়াছে। শাক্ত দর্শনের তাৎপর্য্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নির্ম্মৎসরভাবে স্থিরচিত্তে এই ক্রিয়ার বিষয়গুলি চিন্তা করিলে, অদ্বৈতবাদের সহিত শাক্তদিগের যে কিরূপ সামঞ্জস্য, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মদ্যপানের মাত্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত দৃষ্টির চাঞ্চল্য ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহার অতিরিক্ত পান 'পশুপান' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকারিবিশেষের পক্ষে অর্থাৎ অবধূতের পক্ষে বিশেষ পান বলা হইয়াছে।

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পীত্বা পতিত ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

এই প্রকরণে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান এবং সুরার উৎপত্তি-বৃত্তান্ত ও ধ্যান কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ অংশে প্রথমতঃ বিজয়াকল্প, অনন্তর অবধূতাশ্রমের কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে। পঞ্চম অংশে প্রথমতঃ কামকলার বিবরণ কথিত হইয়াছে। অনন্তর বীরদিগের অনুষ্ঠেয় মন্ত্রসিদ্ধির নানা প্রকার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। শবসাধন প্রভৃতি প্রক্রিয়া-কথনের পর পঞ্চম অংশের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, শাক্ত সাধক যে ভাবে অর্থাৎ পশ্বাদি ভাবত্রয়ের মধ্যে যাহাতে অবস্থিত, তিনি যদি তদ্‌ভাবোক্ত বিধানানুসারে অর্চনা না করেন, তবে দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন, এবং ভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু এই আদেশানুযায়ী কাজ বর্ত্তমান সময়ে কতটুকু হইয়া থাকে, তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রতিপন্ন করিব।

ষষ্ঠ অংশেও নানা প্রকার সাধনা কথিত হইয়াছে। ইহাতে শবসাধন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহাতে শাক্তাচারের তাৎপর্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অংশে ষট্‌কর্ম্ম অর্থাৎ মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উপসংহারে রচিত পুস্তকের মূলীভূত গ্রন্থের নামনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—ভাবচূড়ামণি, বীরচূড়ামণি, কুলচূড়ামণি, বীরতন্ত্র, যামল, জ্ঞানার্ণব, শ্রীক্রম, বামকেশ্বরসংহিতা, সময়তন্ত্র, অন্নদাকল্প, মাতৃকাতন্ত্র, উত্তরাতন্ত্র, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব ও গুরুর মত।

গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ১৪৬৬ শকে [১৫৪৪ খৃঃ অঃ] আশ্বিন মাসে মঙ্গলবারে 'নিত্যমুক্তস্বভাব' সাধকের জন্য তিনি এই উৎকৃষ্ট শাক্তক্রম গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন। *

৪। শ্যামারহস্য।

শ্যামারহস্যে কালীর উপাসনা-পদ্ধতি অতি বিশদভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক কৌলিকদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ-রূপে পরিচিত। উহা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই কর্ত্তব্য বিষয়গুলি বিশদ গদ্যাকারে লিখিয়া তাহাদের সমর্থনের জন্য বিভিন্ন তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যাস পর্য্যন্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তর্যাগ প্রভৃতি কৃত্য কথিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ অতিবিস্তৃত। ইহাতে পূজাপদ্ধতি ও তদঙ্গ মদ্যপান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে স্ত্রীবেশধারী

* ইষে বাণাগ্নিবেদেন্দুশাকে মঙ্গলবাসরে।
নিত্যমুক্তস্বভাবার্থং শাক্তক্রমঃ সমুদ্ধৃতঃ।

হইয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্তব কবচ, পঞ্চমে মন্ত্রসিদ্ধার্থ পুরশ্চরণ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কালীর নানা প্রকার মন্ত্র ও ধ্যান কথিত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে নিত্যামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে কৌলিকদিগের আচার উক্ত হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে কৌলিকদিগের দ্রব্যশুদ্ধি ও দশমে সামান্য সাধন অভিহিত হইয়াছে। একাদশে মন্ত্রসিদ্ধির উপায়, দ্বাদশে কাম্যকার্য্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ত্রয়োদশে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার সাধনপ্রণালী ও পঞ্চদশে হোমাঙ্গ কুণ্ড প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অধিকাংশ বিষয় শাক্তক্রমে ও তন্ত্রানন্দতরঙ্গিণীতে দেখা যায়। ইহাতে অনেকগুলি ধ্যান আছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে ধ্যানানুসারে পূজা হইয়া থাকে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ভূতশুদ্ধি অতি বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ-কৃত তন্ত্রসারে ভূতশুদ্ধি অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই গ্রন্থে কোনরূপ ত্রুটী নাই।

এই গ্রন্থের উপক্রমে গ্রন্থকার যে সমস্ত উপজীব্য তন্ত্রের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও অনেকগুলি তন্ত্রের নাম ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। উত্তরতন্ত্র, ২। উদরকরপদ্ধতি, ৩। কালিকাস্মৃতি, ৪। কালিকাশ্রুতি, ৫। কালিকোপনিষৎ, ৬। কালিকা পুরাণ, ৭। কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ৮। কালীতন্ত্র, ৯। কালীক্রম; ১০। কুমারীতন্ত্র, ১১। কুমারীকল্প, ১২। কুলচূড়ামণি, ১৩। কুলার্ণব, ১৪। কুলসদ্ভব, ১৫। কুলসার, ১৬। কুলপ্রকাশ, ১৭। কুলসর্ব্বস্ব, ১৮। কুলসদ্ভব, ১৯। কুলসারসংগ্রহ, ২০। কুলোড্ডীশ, ২১। কৌলতন্ত্র,। ২২। গুপ্তার্ণব, ২৩। গৌতমীয়, ২৪। ছিন্নমস্তাতন্ত্র, ২৫। জ্ঞানার্ণব, ২৬। ডামর, ২৭। তন্ত্রান্তর, ২৮। তন্ত্রার্ণব, ২৯। তন্ত্রচূড়ামণি, ৩০। তারাতন্ত্র, ৩১। তারাপ্রকরণ, ৩২। তারাপ্রদীপ, ৩৩। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা, ৩৪। নিগম, ৩৫। নীলতন্ত্র, ৩৬। পঞ্চমীযামল, ৩৭। পাশবকল্প, ৩৮। ফেৎকারিণী, ৩৯। বারাহীতন্ত্র, ৪০। বিজয়াকল্প, ৪১। বীরতন্ত্র, ৪২। বৃহৎশ্রীক্রম, ৪৩। বৃহৎশ্রীক্রমসংহিতা, ৪৪। ভাবচূড়ামণি, ৪৫। ভৈরবতন্ত্র, ৪৬। মৎস্যসূক্ত, ৪৭। মন্ত্ররত্নাবলী, ৪৮। মহাকালকৃত স্তব, ৪৯। মুণ্ডমালা, ৫০। মূলবিদ্যাখতন্ত্র,। ৫১। যামল, ৫২। যোগিনীহৃদয়, ৫৩। রাঘবভট্ট, ৫৪। রুদ্রযামল, ৫৫। ললিতাবাক্যদীপিকা, ৫৬। শারদাটীকা, ৫৭। শিবাগম, ৫৮। শ্রীক্রম, ৫৯। শ্রুতি, ৬০। সময়াচার, ৬১। সময়ার্ণব, ৬২। সম্প্রদায়মত, ৬৩। সারসর্ব্বস্ব, ৬৪। সিদ্ধসারস্বততন্ত্র, ৬৫। সিদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ৬৬। স্বতন্ত্র; ৬৭। হংসপারমেশ্বর।

ঙ

৫। ষট্‌চক্রনিরূপণ।

গ্রন্থকার উহার প্রথমেই বলিয়াছেন—

'অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দনির্ব্বাহপ্রথমাঙ্কুরঃ॥'

তন্ত্রের মতানুসারে ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্গত পরমানন্দনির্ব্বাহের প্রথম অঙ্কুর কথিত হইতেছে। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার অনেকগুলি তন্ত্র হইতে ষট্‌চক্রনিরূপণের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কোনও একখানি নির্দ্দিষ্ট তন্ত্র হইতে উহা অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু বৈদিকান্বয়সম্ভূত বিশ্বনাথ ষট্‌চক্রের যে সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ণানন্দগিরির নামেরও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে, উহা কৈবল্যকালিকা তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল। ষট্‌চক্রের বিস্তৃত টীকার প্রণেতা কালীচরণের মতে, উহা শ্রীমৎপূর্ণানন্দের নিজস্ব। টীকাকার শঙ্কর, রামভদ্র, রামানন্দ যতি প্রভৃতির মতও কালীচরণের মতেরই অনুরূপ। ইহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, বিশ্বনাথ বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াই শ্রীমৎপূর্ণানন্দের যশঃসঙ্কোচের অভিপ্রায়ে এই অভিনব মতের প্রচার করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানের ষট্‌চক্রের পুথির শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, 'ইতি কৈবল্যকালিকাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ'। ইহা যে বিশ্বনাথের দলেরই অদ্ভুত আবিষ্কার, এ কথাও সাহস করিয়া বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে, সেইগুলির মূল কোন্ তন্ত্রে নিহিত আছে, গ্রন্থকার স্পষ্ট-ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' যদি কৈবল্য-কালিকাতন্ত্রেরই নিজস্ব হইত, তবে তিনি সে কথার উল্লেখ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, ষট্‌চক্র-বর্ণনের পদ্যগুলিতে অনেক পদবিন্যাস কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধেই হইয়াছে; মূলতন্ত্রে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূতশুদ্ধি-তন্ত্রে ষট্‌চক্রের অনেক উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রেও ষট্‌চক্রসংক্রান্ত অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল মূলতন্ত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে বিচরণোপন্যাস লক্ষিত হয় না। শ্রীমৎপূর্ণানন্দই তাহা একত্র সুচারুরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি কৈবল্যকালিকাতন্ত্রে ষট্‌চক্র-নিরূপণের শ্লোকগুলি থাকিত, তবে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের গ্রন্থে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিভিন্ন দেশের নিবন্ধে ষট্‌চক্রের যে সমস্ত বিবরণ দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাতে পূর্ণানন্দীয় শ্লোকের অনুরূপ পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়

না। গ্রন্থকার শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উপক্রমে ছয়টি শ্লোকের রচনায় যে রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, ষট্‌চক্রবর্ণনেও সেই রীতি দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষে নানা স্থানে নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; হরিদ্বার হইতে হিন্দী টীকা সহ একখানি ষট্‌চক্রনিরূপণ মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতেও পূর্ণানন্দেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় সাধকগণও ইহাকে পূর্ণানন্দ-রচিত বলিয়াই স্বীকার করেন। এই সকল কারণে ষট্‌চক্রনিরূপণের পদ্যাবলী যে শ্রীমৎপূর্ণানন্দের নিজস্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। *

৬। যোগসার।

যোগসার গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমাদের জ্ঞাতি, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বারড়ী গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতি-ভূষণের বাড়ীতে একখানি "যোগসার" দেখিয়াছি। এই পুথি অত্যন্ত জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ, তাহার অনেক স্থান পাঠ করা যায় না। যতটুকু পাঠ করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, তান্ত্রিক সাধকের যোগানুষ্ঠানই ইহার প্রতিপাদ্য।

৭। কালীককারকূটসহস্রনাম-টীকা।

এই গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি আমরা দেখিয়াছি, ইহা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই পুথিও অতিশয় জীর্ণ, এবং ছিন্ন। কালীর ককারকূট সহস্রনামের অধিকাংশ নামই দুরূহার্থ-প্রকাশক। পূর্ণানন্দ এই গ্রন্থে এই সকল নামের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৮। ষট্‌চক্রনিরূপণ-টীকা।

এই গ্রন্থের নামও যোগচিন্তামণি। শ্রীমৎপূর্ণানন্দ এই গ্রন্থে স্বকৃত ষট্‌চক্রনিরূপণ-পদ্যাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

* ষট্‌চক্রবিবরণের প্রতিপাদ্য বিষয় অল্প কথায় বুঝান অসম্ভব, এই জন্য এখানে তাহার প্রসঙ্গ করিলাম না। আমরা অনেকগুলি টীকার সাহায্যে ষট্‌চক্রনিরূপণের বিশদ বঙ্গানুবাদ করিয়াছি। তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

সমুদ্রতীরে।

ন্যু ক্রোয়াজিক হইতে বাজ সহর পর্য্যন্ত কোনও বাঁধা রাস্তা নাই। গাড়ীর যাতায়াতে যে চাকার দাগগুলি পড়ে, তাহা একদিন বাতাস একটু জোরে বহিতে থাকিলেই বালিতে ঢাকিয়া যায়। কোথাও মাঠের ভিতর দিয়া, কোথাও বা সমুদ্রের ধার বাহিয়া, কোথাও বা সমুদ্রতীরস্থ পাহাড় ঘুরিয়া, রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। বিদেশী লোকের পক্ষে এ পথ চিনিয়া চলা বড় সহজ নহে; তবে স্থানীয় পথপ্রদর্শকেরা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গোময় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া কোনও প্রকারে পথভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। আমরা অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। সম্মুখের সাগরতীরে একটা নাতিক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া মনে হইল সেখানে হয় ত একটু ছায়াময় বিশ্রামের স্থান পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গী জেলিয়াটিকে তাই বলিলাম, 'বাপু, বড়ই হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, ওখানে একটু বসিয়া গেলে হয় না?' পথপ্রদর্শক আমার কথায় পাহাড়ের দিকে চাহিয়াই যেন হঠাৎ দমিয়া গেল, বলিল, 'মাপ করিবেন, ওখান দিয়া যাওয়া হইবে না। বাজ হইতে ক্রোয়াজিক পর্য্যন্ত যাহাদিগকে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাহারাও ও স্থানটি দূরেই রাখিয়া চলে। ঐ পাহাড়ের ধারে একটা লোক বসিয়া থাকে, তাহার কাছে কেহই ঘেঁষিতে চায় না।'

কথা কয়টি যেরূপ ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় উচ্চারিত হইল, তাহাতে আমার কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য একটু আগ্রহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত ভয় কিসের হে? ডাকাত, না খুনে?' লোকটা কি বলিল, শুনা গেল না; তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, সেখান দিয়া গেলে সে আমাদের সঙ্গে যাইবে না। আমাদেরও কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল। বলিলাম, 'যদি প্রাণের ভয় না থাকে ত বাপু! জায়গাটা একবার দেখিয়া যাইব। যদি বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকে ত এই বেলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল।' জেলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'জীবনের ভয় থাকিলে কি আমি আপনাদের ছাড়িয়া দিই? যাকে ওখানে দেখিবেন, সে মোটেই কথাবার্ত্তা কয় না, ঠায় এক জায়গায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে।'

'কে সে? এ দেশেরই—'

'কে আবার? মানুষ—আমাদেরই স্বজাত।'

লোকটার কথা শুনিয়া বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আমাদের সম্মুখে প্রায় বিশ হাত দূরেই একটা সমুদ্রের খাড়ি। তখন জোয়ার। ফেনিল তরঙ্গ সমুদ্রবেলায় আছাড়িয়া পড়িতেছে। আমি ও আমার স্ত্রী হাত-ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথপ্রদর্শক সেখান হইতেই বাঁকা পথ ধরিল। তাহার সঙ্গে কথা রহিল, সেই 'তেমাথা'য় সে আমাদের সঙ্গ ধরিবে। দেখিলাম, তখনই বেশ পা চালাইয়া চলিয়াছে। পথপ্রদর্শকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহার দৃঢ় ধারণা, লোকটিকে একবার চাক্ষুষ করিলে, আমাদিগের আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইবে না। আমাদের মনে কোনও ভয় ছিল না বটে, কিন্তু কৌতূহলের আবেগে বুকটা কেমন ধড়ফড় করিতেছিল। এই যে দুপুর রৌদ্রে বালির উপর দিয়া এতখানি আসিলাম, একবার স্ত্রীপুরুষে হাত-ধরাধরি করিয়া হাঁটিতেই পুলকস্পর্শে শ্রান্তি ক্লান্তি যেন কোথায় উড়িয়া গেল। তখন যেন আমাদের একই প্রাণে একই স্পন্দন। সুকণ্ঠ গায়কযুগলের সম্মিলিত স্বরলহরীর ন্যায় একই চিন্তা বা অনুভূতির পবিত্র বন্ধনে আমাদের দুইটি হৃদয় যেন একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দের এ অপূর্ব্ব বিকাশ আর কখনও অনুভব করি নাই! পথশ্রান্তি দূরীভূত হইয়া কি আনন্দে যে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে! এ অনুভূতি কেবল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত-শ্রবণেই সম্ভবে। সেদিনকার অপূর্ব্ব ভ্রমণসুখে কতখানি ভোগাসক্তি মিশ্রিত ছিল, জানি না। কুক্ষণে আকস্মিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া সে আনন্দের মধুর স্মৃতি হেলায় হারাইয়া ফেলিলাম। মনে হইতে লাগিল, যেন নদীতীরে বৃক্ষশাখায় চিত্র বিচিত্র হরিতাল কপোত মধুর স্বরে কূজন করিতেছিল; কোথা হইতে দুরন্ত শ্যেন আসিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল!

খানিক দূর সোজা পথে চলিয়া আমরা একটী গুহার পার্শ্বে উপনীত হইলাম। গুহাসন্নিধানে বারান্দার মত পাহাড়ের স্তর; আর তাহার সম্মুখেই প্রাচীরের ন্যায় খাড়া পাহাড়। বারান্দাটি সমুদ্রতীর হইতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সম্মুখে এই স্বাভাবিক শৈল-প্রাচীরের ব্যবধান থাকায় জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

কাছে যাইতেই দেখিলাম, গুহার নিকটে পাথরের উপর এক জন লোক বসিয়া আছে। এ কি! তাহার রক্ত চক্ষুর্দ্বয়ের ভয়াবহ দৃষ্টি যে আমাদেরই

উপর সংস্থত! কি স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি! যেন আগা গোড়া পাথর কুঁদিয়া বাহির করা। যেন কোনও সমাধিমগ্ন যোগী হঠাৎ পাষাণ হইয়া গিয়াছে। কেবল অক্ষিপক্ষ্মের ধীর সঞ্চালন তাহার প্রাণের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছিল। ক্রমে তাহার বিকট দৃষ্টি আমাদের মুখ হইতে অপসৃত হইয়া উন্মুক্ত-বারিধি-বক্ষে সম্বদ্ধ হইল। মানুষের চক্ষে এমন জ্বালাময়ী দীপ্তি আর কখনও' দেখি নাই। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্দীপ্ত সমুদ্রের জলরাশি, সৌরকরদীপ্ত দর্পণের ন্যায় আমাদের চক্ষু পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু সে ব্যক্তির যেন তাহাতে আদৌ ভ্রূক্ষেপই নাই! বাল্যকালে শুনিতাম, ঈগলপক্ষী নাকি এইরূপ অকম্পিত-দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে। আর সে চোখ তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিল না।

গ্রীক বীর হার্কিউলিসের অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া থাকিবে—এ যেন তাহারই সজীব ভগ্নাবশেষ। যেন দেবরাজ জুপিটার শোকে, খাদ্যাভাবে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে, বার্দ্ধক্যে এইরূপ জরাগ্রস্ত স্থবিরের আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

পথিপার্শ্বস্থ বিশাল ছায়াতরুর শাখাপ্রশাখাগুলি কালবশে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, অশনিপাতে শুষ্ক কঠিন কাণ্ডদেশটির যেমন দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, এ লোকটির আকৃতি দেখিয়া আমার কেবল সেই কথাই বার বার মনে পড়িতেছিল। আমি তাহার রোমাবৃত, পেশীবহুল বাহু দুইটি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শিরাগুলি স্থানে স্থানে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিরাও নয়; যেন স্থূল ইস্পাতের তার! এ ব্যক্তি এক কালে কত শক্তিই না ধারণ করিত! এখনও এ ভগ্ন দেহে স্বাভাবিক শক্তিমত্তার কত চিহ্নই না বিদ্যমান! কোনও প্রাকৃতিক উৎপাতে এক খণ্ড পাষাণ পাহাড়ের গাত্র হইতে সরিয়া আসিয়া গুহার ভিতর একটী 'তাকে'র সৃষ্টি করিয়াছিল। দেখিলাম, সেই উদ্গত প্রস্তরখণ্ডের উপর মৃন্ময় কলসীতে এক কলসী পানীয় জল রহিয়াছে। কলসীর মুখ এক খণ্ড রুটীর টুকরা দিয়া ঢাকা। গুহার কোণে এক রাশি শুষ্ক শৈবাল। বুঝিলাম, উহাই গুহাবাসীর শয্যার একমাত্র উপকরণ। শুনিতাম, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে মরুপ্রান্তরবাসী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিগণ নানারূপ কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত হইতেন। ধর্ম্মারাধনা ও আত্ম-গ্লানির এমন জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কত স্থানে কত লোক দেখিলাম, কিন্তু এই সমুদ্রচারী ধীবরের ন্যায় এরূপ মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি ত আর কাহারও দেখি নাই। ইহার বৈরাগ্যের প্রকৃত

কারণ তখন অবগত না থাকিলেও, মনে মনে অনেক কথা যেন বুঝিতে পারিলাম।

এ কঠোরব্রতধারী কে? কাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে চোখ রাঙ্গা করিয়াছে? ঐ পাথরে গড়া হাতের আঘাতে কাহার বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণ হইয়াছিল? এ কুঞ্চিত ভ্রূযুগে ত কুটিলতার চিহ্নমাত্র নাই। যে সারল্য শারীরিক বলের স্বাভাবিক সহচর, এ রেখা-চিহ্নিত ললাটে ত বরং তাহারই নিদর্শন দেখিতেছি। তবে কি এ ক্ষেত্রে কর্কশ আকৃতির সহিত উদার হৃদয়ের সামঞ্জস্য ঘটে নাই? এ গৃহত্যাগী সব ছাড়িয়া পাথরের উপর বসিয়া কেন? ক্রমে কি ইহার মনুষ্যত্ব-টুকুও প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে? উহার মধ্যে কতটুকু মানুষ, আর কতটুকু পাথর, তাহাই বা কে বলিবে?

এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নে আমাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল, কিন্তু কে ইহার সদুত্তর দিবে? পথপ্রদর্শকের অনুমানই ঠিক হইল। আমরা আর সেখানে অযথা বিলম্ব না করিয়া বিনা বাক্যে ত্বরিতপদে গন্তব্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তেমাথায় আসিয়া দেখিলাম, 'গাইড' আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা আমাদের মুখে ভীতি ও বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া সে নিজের অভিজ্ঞতার বাহাদুরী করিয়া বলিবে, 'কি ম'শায়, কাঙ্গালের কথা বাসী হইলে মিষ্ট লাগে কি না?' কিন্তু বেচারী ভালমানুষ, কোনও বাজে কথা না তুলিয়া বলিল, 'তাকে দেখ্‌তে পেয়েছেন ত?' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওখানে বসিয়া ও করে কি?' জেলে বলিল, গুহাবাসী নাকি প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। শুনিলাম, এই জন্য লোকে তাহাকে 'ব্রতধারী' বলিয়া ডাকে। আমাদিগের চোখের চাহনিতে মৌন কুতূহল যেন আবেগভরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। পথপ্রদর্শক আমাদের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কাহিনী শুনাইয়া দিল। তাহার গ্রাম্য ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখিয়া গল্পটি পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিব।—

'মা ঠাকরুণ! লোকে বলে, ও মহাপাপী। নাকি সহরের ওধারে কোনও গুরুঠাকুরের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে' ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে। তিনি যে রকম প্রাচিত্তির কর্‌তে বলে দিয়েছেন, তাই ঠিকমত কর্‌বার জন্য ও ঐ পাহাড়ের ধারে পড়ে থাকে। নাম ওর কাস্ত্রেমার। আবার কেউ

কেউ বলে, ওকে নাকি কে ওষুদ করেছে। ওর গায়ের হাওয়া গায়ে লাগ্‌লেই ছোঁয়াচ ধরে। সেই জন্য ও ধার থেকে যখন হাওয়া বয়, তখন কেউ পাহাড়ের কাছ দিয়ে হাঁটে না। পশ্চিম থেকে ঝড়ো হাওয়া যখন জোরে বইতে থাকে, তখন এ রাস্তা দিয়ে প্রাণ থাক্‌তে কেউ চল্‌তে চায় না; তা বল্‌তে কি, তখন ঠাকুর দেবতার নাম করেও কেউ বড় এ দিকে এগুতে সাহস করে না। ল্য ক্রোয়াজিকের বড়লোকেরা বলে, ও নাকি কি একটা কঠিন 'বর্ত্ত' নিয়েছে। দিন নাই, রাত নাই, কোথাও যাওয়া নাই, একই জায়গায় বসে' আছে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর ত বলি, 'বর্ত্ত' নেওয়ার কথাটাই খাঁটী বলে মনে হয়। ঐ যে দেখ্‌ছ, ওখানে একটা ক্রুশ পোঁতা রয়েছে, ওটা ওরই কীর্ত্তি। ওটার মানে কি জান? ও জানাতে চায়, আর কেউ দেখুক না দেখুক, দেবতারা সবাই ওকে দেখ্‌ছেন। লোকে ওর চেহারা দেখে যদি এত ভয় না পেত, তা হলে এতদিন ওকে দেশছাড়া করে ছাড়্‌ত। কিন্তু এখন ওর নামের এমনি ভয় যে, তারা এক দল লড়ায়ে সেপায়ের মোহাড়ায় দাঁড়াবে, তবু ওর কাছে যেতে চাইবে না। ওখানে এসে অবধি ও কারুর সঙ্গে একটীও কথা কয় নি। ওর ভাইয়ের একটী মেয়ে আছে; তার বছর বার বয়েস হবে। সেই ওকে রোজ সকালে খাবার এনে দেয়। খাওয়াও ত ভারী, শুধু একটু রুটী, আর এক ঢোক জল। শুনেছি নাকি ওর যা কিছু ছিল, তা ওর ঐ ভাইঝিকেই লিখে' পড়ে' দিয়েছে। খাসা দেখ্‌তে মেয়েটা, যেমন নরম-সরম, তেমনি মিষ্টি কথাবার্ত্তা—কি ডাগর ডাগর নীল চোখ, কি সোনার বরণ চুলের ঝাড়! ঠিক যেন পটে আঁকা পরী।

'তাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ্যরে পেরো! তোর জেঠা তোকে কি বলে?" সে বলে, "কৈ, আমাকে কিছু বলে না ত। সে যে আদপে কথাই কয় না। কেবল রবিবারে এক একবার আমার কপাল ছুঁইয়ে চুমো খায়।"

"তোর ভয় করে না?"

"ভয় করবে কেন? জেঠা বাবাকে কি কেউ ভয় করে? আর কারও হাতে খাবার পাঠালে সে ছোঁয় না। আমি নিয়ে যাব, তবে খাবে। ছুঁড়ীটা বলে, তাকে আস্‌তে দেখ্‌লে তার জ্যাঠা নাকি হাসি-হাসি মুখ করে' তার দিকে তাকিয়ে থাকে। যে তার চাহনী, দেখেছেন তো, ঘোর কোয়াসার ভিতর দিয়ে বরং আলো দেখা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তার ও মুখে হাসি ফুটে উঠে, তা সহজে বিশ্বাস হয় না।"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, 'বাপু! গৌরচন্দ্রিকাটি ত জুড়েছ মন্দ নয়, আগ্রহ ত ক্রমেই বাড়িয়ে তুল্‌ছো, কিন্তু এখনও আসল কথায় যে কিছুই ভাঙ্গলে না। লোকটা যে একবারে বিবাগী হয়ে গেল, তার কারণটা জান কি? দুঃখে, মনের কষ্টে ত অনেকে এমনতর হয়—শুন্‌তে পাই; তা ওর এ সব পাগ্‌লামী ফৌজদারী হাঙ্গামার জের টের নয় ত?' জেলে আমার জেরায় পশ্চাৎপদ না হইয়া উৎসুকভাবে বলিতে লাগিল, 'তা যদি বল্লেন মশায়! ত বলি—এ তল্লাটে আমি আর আমার বাপ ছাড়া এর আসল খবর কেউ জানে না। আমার মা চাকরী করত এ এলাকার জজ সাহেবের কুঠীতে। তিনি বেঁচে থাক্‌তে কামব্রেমারকে জজের কাছে গিয়ে, এ সকল কথা প্রকাশ করে' বল্‌তে শুনেছিলেন। মা তখন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। যে ঘরে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল, সেটা ঠিক তারই লাগোয়া। তাই শোনবার মতলব না থাকলেও কোনও কথাই তাঁর কান এড়িয়ে যায় নি। মা আমাদের বাপ বেটাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল যে, এ অঞ্চলের কা'কেও আমরা সে সব কথা বল্‌বো না। তা তোমরা বিদেশী লোক, তোমাদের বল্‌তে কোনও বাধা নাই। যে ভয়ানক ব্যাপার! শুনলে গা শিউরে উঠ্‌বে। যে দিন সন্ধ্যাকালে প্রথম শুনি, ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।'

আমি বলিলাম, 'এতই যখন বল্‌ছ, তখন গল্পটাই আমাদের একবার শুনিয়ে দাও না। আমরা কারও কাছে প্রকাশ করব না।'

জালিকপ্রবর আমাদিগের দিকে চাহিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গল্প আরম্ভ করিল, 'ও হচ্ছে বুড়ো কাম্‌ব্রেমারের বড় ছেলে। ওর নাম পিয়ের কাম্‌ব্রেমার। নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যেতে ওদের কিছুমাত্র ভয় নাই—ও-ই হ'ল ওদের চিরকেলে ব্যবসা। ক' পুরুষ ধরে' যে ওরা ও কাজ করে আস্‌ছে, তা কে বল্‌বে? সমুদ্র ওদের কাছে হার মেনেছে। কাম্‌ব্রেমার নামের মানেই হচ্ছে তাই।

'তুমি যাকে বিরাগী বল্‌ছিলে, ওর নিজের নৌকা—জাল সব ছিল। আক্‌সার সার্ডিন মাছই ধরতো বটে, তবে মহাজনদের দরকার মত, মাঝে মাঝে বেশী দূরে গিয়ে, বড় মাছ-টাছও ধরে আন্‌তো। পরিবারের ওপর অতটা টান না থাক্‌লে ও কোন্ দিন কড মাছ ধরা ব্যবসা সুরু করে' দিত। পিয়ের কাম্‌ব্রেমারের বিয়ে হয়েছিল গে রাঁদ অঞ্চলে। ওর স্ত্রী ক্রুঁই ঘরের মেয়ে। ডাকসাইটে সুন্দরী, আর অমন সতীলক্ষ্মী আজকালকার দিনে দেখা যায় না।

সোয়ামীকে না দেখে সে একদণ্ড থাকতে পারত না; তাই পিয়ের কামব্রেমারের যোগে-যাগে সার্ডিন মাছটাই ধরা চল্‌তো।'

আমরা গল্প শুনিতে শুনিতে বালিয়াড়ার ধার দিয়া চলিতেছিলাম। দূরে দিক্‌চক্রবালের সীমান্তদেশে পাঁবাদের লবণাক্ত জলাভূমি দেখা যাইতেছিল। মধ্যে ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র সংস্করণের ন্যায়, একটা হ্রদ বা বিল; আর তাহারই ভিতর এক অনতিক্ষুদ্র দ্বীপ। পথপ্রদর্শক অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ যে দ্বীপের উপর বাড়ী দেখ্‌ছেন, ঐ কামব্রেমারদের বসতবাড়ী। ঐখানেই ওরা থাক্‌তো। পিয়েরের একটী বই ছেলে ছিল না: একমাত্র সন্তানকে বাপ মা যে কত ভালবাসে, তা' বোধ হয় আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি তাদের আঁধার ঘরের প্রদীপ, এই সবে-ধন-নীলমণিটিকে নিয়েই তারা দিন রাত ব্যস্ত থাক্‌তো—লোকে বলতো, ছেলে-ছেলে করে' ওরা স্ত্রীপুরুষে পাগল হয়ে যাবে। কোলে করে' নিয়ে খাবার সময় খোকা খাবার নষ্ট করে' দিলেও বাপ মার তা অমৃত বলে বোধ হ'ত। মেলা টেলা বস্‌লে দেখ্‌তাম পিয়ের আর তার পরিবার, যা কিছু ভাল খেলনা, সব ছেলের জন্যে কিনে আন্‌ছে। বাপ-মার এই গতিক দেখে ছেলেও ক্রমে ধিঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। বুঝলে, তার যা খুসী, সে তাই করতে পারে; একটু বায়না ধর্‌লেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। লোকে পই-পই করে' বলত, ছেলে-পিলেকে অত 'নাই' দিতে নাই। তা সে কথা শোনে কে?

'যদি কেউ এসে বল্‌তো, "শুনেছ, কামব্রেমারের পো! আজ তোমার বেটা অমুক ছোঁড়াটাকে প্রায় আধমারা করেছে।" ছেলেকে শাসন করা দূরে থাক, বাপ্ মিন্‌সে হেঁসে বল্‌তো, "বেটা এর মধ্যেই লড়ায়ে এত বাহাদুর, বড় হ'লে দেখ্‌ছি সরকারী লড়ায়ের আমীর হয়ে বস্‌বে।" আবার হয় ত কেউ এসে জানালে, "শুনেছ পিয়ের! তোমার ছেলের কাণ্ডখানা? পুগোর ছোট মেয়েটার একবারে চোখের চিপ্‌লে বার করে' দিয়েছে।" শুনে কামব্রেমার হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্‌ত,—"বেটা এই বয়সেই ছুঁড়ীগুলোর পেছনে লেগেছে—বড় হ'লে না জানি কত কীর্ত্তিই কর্‌বে।" ছেলের কোনও দোষটাই তার নজরে পড়্‌ত না; তার অপরাধ যেন অপরাধই নয়। বাপ মার আদর পেয়ে পেয়ে ছোঁড়া এমনি দুষ্ট্‌ হয়ে উঠ্‌ল যে, তা বল্‌বার নয়। একবারে আস্ত বিচ্ছু। যখন সবে দশ বছরের, তখন থেকেই মারামারি হাঙ্গামা নিয়েই থাক্‌ত। হাঁস মুরগীর ঘাড় মটকানো, পোষা শুয়োরগুলোর

পেট চিরে দেওয়া, এই সব ছিল তার নিত্যিকার ছেলেখেলা। তাদের মত মেরে ফেলা, রক্তারক্তি করাটাই যেন তার খুব ভাল লাগ্‌ত। বাপ দেখে বল্‌ত, "বেটা রক্ত দেখে ডরায় না; বয়েস হ'লে, লড়াইয়ে গিয়ে ভারি নাম কিন্‌বে" তার ছেলেবেলার এ সব কীর্ত্তি আমরা ত ভুলিইনি, পরে তার বাপকেও এ সব কথা বিশেষ করে' মনে কর্‌তে হ'য়েছিল। যখন বছর পনর ষোল বয়েস, তখন পিয়েরের পো জ্যাক্ কামব্রেমার পেকে ঝাঁটী হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই সে গাঁয়াদ কি সেভদের গিয়ে মজা ওড়াতে আরম্ভ কর্‌লে। এ সব আমোদ 'রেস্ত' ভিন্ন হয় না; কাজে কাজেই চুপি-চুপি তার মার টাকায় হাত পড়্‌তে লাগ্‌লো। ভালমানুষের মেয়ে সে, ছেলের এ সব চুরী চামারীর কথা মুখ ফুটে' সোয়ামীকে বল্‌তে পার্‌তো না। আর টাকা কড়ির ব্যাপারে পিয়ের কামব্রেমার ছিল খুব খাঁটী লোক। কেউ যদি কখনো ভুলে' দুটো পয়সা বেশী দিয়ে যেত, সে দশ ক্রোশ হেঁটে গিয়ে তা ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌ত।

'জাক্ কামব্রেমারের ক্রমেই সাহস বেড়ে উঠ্‌ল। একবার তার বাপ দিন কতকের জন্যে মাছ ধর্‌তে বেরিয়েছে, তারই মধ্যে এক দিন সময় বুঝে, ছোঁড়া যা কিছু গেরস্থালীর জিনিসপত্র ছিল, সব বেচে' নান্তে সহরে আমোদ করতে চলে গেল। কাপড় চোপড়, বাসন-কোষন, বাক্স পেট্‌রা, এমন কি, বিছানার চাদরখানা পর্য্যন্ত রইল না; থাক্‌ল কেবল ঘরের দেয়াল চারখানা। মাগী আর কি কর্‌বে? দিনরাত্রি কেঁদে বুক ভাসাতে লাগ্‌ল।—ছোঁড়ার বাপ ফিরে এলে তাকে কোন্ মুখে ছেলের কীর্ত্তির কথা বলবে, এই ভয়েই অস্থির। তার নিজের আর অপরাধ কি? যা কিছু ভয় ভাবনা, তা ঐ হতভাগা ছেলেটার জন্যে। পিয়ের কামব্রেমার এসে দেখ্‌লে, —এর ওর কাছ থেকে জিনিস পত্তর ধার করে' নিয়ে তাদের সংসার চল্‌ছে। পরিবারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হাঁগা, এ সব এনেছ কাদের কাছ থেকে? আমাদের ঘরের বাক্স সিন্দুক আসবাবপত্র সব গেল কোথা?"

'জাকের মা এই ক'দিনেই আধমরা গোছ হয়ে উঠেছিল। কি আর জবাব দেবে? বল্‌লে, "সব চুরী হয়ে গিয়েছে।"

"জাক কোথায়?"

"সে আমোদ করতে চলে গিয়েছে।"

পিয়ের বল্লে, "তার আহ্লাদ যে বড় বেড়ে উঠেছে দেখ্‌ছি।"

'লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা যে কোথায় গিয়েছিল, সে খবর কেউই জান্‌ত না।

'মাস ছয় পরে জাকের বাপ খবর পেলে যে, তার ছেলেকে পুলিসে গ্রেফ্‌তার করেছে। নাস্তের ফৌজদারী আদালতে বিচার হবে। বেচারা আর কি করে? সমুদ্রের পথে যেতে গেলে দেরী হয় বলে' হেঁটেই নাস্তের চলে গেল। গিয়ে কোনও রকমে ছোঁড়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

'ছেলেকে—সে কি করেছিল না করেছিল, তা আর জিজ্ঞাসা না করে' শুধু বল্‌লে, "দেখ বাপু! দুটি বছর বাড়ীতে তোমার মার কাছে ঠাণ্ডা হয়ে থাক। ভালমানুষের মত সোজা পথে চল্‌বে; আর মাছ ধর্‌তে যাবার সময় মাছ ধর্‌তে যাবে। এ যদি না কর, তা হ'লে এবার আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া।" লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া বাপের কথায় কান না দিয়ে মুখের কাছে গিয়ে মুখভঙ্গী করলে! ভেবেছিল, অন্য বাবের মত বাপ এবারও তা আদর করে' উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বাছাধন—এবার তার বাপ এমন চড় মারলে যে, ছেলেকে বিছানা ছেড়ে ছ' মাস আর উঠতে হলো না। ছেলের যা শাস্তি হবার ত হ'ল—পোড়ানী যত মায়ের। পিয়েরের পরিবা[illegible] মনের কষ্টে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

'একদিন তারা স্ত্রীপুরুষে শুয়ে রয়েছে, এমন সময়ে জাকের মা কি যেন একটা শব্দ শুন্‌তে পেলে। বিছানা থেকে উঠ্‌তেই কে যেন তার হাতে ছুরী মার্‌লে। মাগীর চেঁচানী শুনে' পাড়ার পাঁচ জনে ছুটে এল। পিয়ের আলো নিয়ে এসে দেখ্‌লে, তার স্ত্রীর হাত দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়্‌ছে। তারা মনকে বুঝালে, চোর ডাকাতে মেরেছে। কিন্তু চোর কোত্থেকে আস্‌বে ম'শায়? এ দেশে কি চোর ডাকাত আছে? হাজার মোহরের তোড়া নিয়ে ল্য ক্রোয়াজিক থেকে সাঁ নাজেয়ার পর্য্যন্ত সোনা উছ্‌লে চলে যাও, কি আছে কি না আছে, কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস কর্‌বে না। পিয়ের সেই রাত্তিরেই জাকের খোঁজে চলে গেল; কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালে পাষণ্ডটা দিব্যি নিশ্চিন্ত ভাবে এসে বল্‌লে, "কাল একটু বাজ্‌ সহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।" একটা কথা বল্‌তে ভুলেছি, জাকের মা টাকা কড়ি লুকিয়ে রাখ্‌তে জান্‌তো না। পিয়েরের হাতে কিছু হ'লে ল্য ক্রোয়াজিকের দ্য পোন্‌ ম'শায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে আস্‌তো; কিন্তু তার পরিবারের তত হুঁস-পর্ব্ব ছিল না।

'ছোঁড়ার বদখেয়ালিতে তাদের যে কত খরচ হয়ে যাচ্ছিল, তা আর বল্‌বার

নয়। তাদের হাজার কয়েকের সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেক শুধু এই জন্তেই নষ্ট হ'য়ে গেল। অবস্থা ত নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাস্তুভিটার খাজনা টাজনা কিছুই তাদের দিতে হতো না। সে দ্বীপটার তারাই মালিক ছিল। ছেলের বদ্‌খেয়ালী ত ছিলই। তার উপর পুলিসের খপ্পর থেকে তাকে ছাড়িয়ে আন্‌তে কত যে খরচ হয়েছিল, তার আর লেখা-জোঁখা ছিল না। তাদের যেন কেমন একটা দুঃসময় পড়ে গেল। সময় বুঝে' পিয়েরের ভাই ব্যবসায় লোকসান দিয়ে একবারে ফতুর হ'য়ে বস্‌লো। এমন অবস্থা যে, মজুরী না ক'ল্লে চলে না। তারা অনেক দিন থেকেই আলাদা। তা হ'লে কি হয়? রক্তের টান যাবে কোথায়? জাকের বাপ আপন ভাইকে কাছে এনে মাছ টাছ ধরার ব্যবস্থা করে দিলে। জাকের কাকীমা আবার কোলের একটী কচি মেয়ে রেখে আঁতুড় থেকে বেরুতে না বেরুতেই মারা গেল। সেই মেয়েই এই পেরৎ। এর জন্যেও জাকের বাপকে যথেষ্ট খরচ করতে হলো। নিতান্ত ছোট মেয়ে, মায়ের দুধ ছাড়া খেত না। ভাগ্যে সেই সময়ে গাঁয়ের একটা মাগীর ছেলে হয়েছিল। তারই দুধ খেয়ে পেরৎ কোনও মতে বেঁচে গেল। সে মাগী ত আর মেয়েটাকে অমনই দুধ খাওয়াত না। তার জন্তে পিয়ের কামব্রেমারকেই ক' মাস ধরে' টাকা গুণ্‌তে হলো। পিয়ের ভাইকে বোঝাবার জন্তে বল্‌তো, "তুই ভাবিস্‌নে; মেয়ে বেঁচে থাক, ওর সঙ্গেই আমার জাকের বিয়ে দেব। আপনা-আপনির মধ্যে এ রকম বিয়ে এ দেশে আক্‌ছার হয়ে থাকে। ছেলে মানুষ করা কি সাধারণ কথা? দুধের দাম ত আছেই। তা ছাড়া জামা কাপড় বালিস বিছানা—সবই যোগাতে হয়। এই সব খরচ খরচায় আর পেরতের সেই দুধ্‌মা লম্বা ফ্রেলুর মাস দু'য়ের বাকী মাইনে চুকিয়ে দিতে পিয়েরের স্ত্রীর প্রায় শ' খানেক টাকা ধার হয়ে পড়্‌লো। জাকের মা বেশ লেখাপড়া জান্‌ত; হাতের লেখা ছিল পাকা মুহুরীর মতন। সোয়ামীর কাছে একদিন একখান হিস্পেনী মোহর পেয়ে, সে কাগজ মুড়ে' "পেরতের যৌতুক" বলে' এক ছত্তর লিখে' গদীর ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। জাক্‌ হতচ্ছাড়া তাই না টের পেয়ে, আস্তে আস্তে কখন বার করে নিয়ে, ল্যা ক্রোয়াজিকে স্ফূর্ত্তি করতে পালিয়ে গেল! বিধির লিখন খণ্ডাবে কে? যা ঘটবার, তা কি আর আটকে থাকে! পিয়ের কাম্‌ব্রেমার মাছ ধরতে গিয়েছিল। সে দিন নৌকা থেকে নেমেই দেখ্‌লে, ঘাটের ধারে জলে কি একখানা কাগজ ভাস্‌ছে। কুড়িয়ে নিয়ে তার স্ত্রীর হাতে দিতেই, জাকের মা চিন্‌তে পেরে

অজ্ঞান হয়ে' মাটীতে পড়ে গেল। কামব্রেমার আর কিছু না বলে' সা জোয়াকিনের রওনা হ'ল ;—গিয়ে শুনলে, ছেলে চন্দর হোটেলে বিলিয়ার্ড খেলছে। হোটেলওয়ালী মেয়কে ডেকে বললে, "দেখ, আজ তোমাকে আমার ছেলে একটা হিস্পানী মোহর দেবে। আমি তাকে সেটা খরচ করতে মানা করে' দিয়েছিলাম। যদি দেয় ত সেটা আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি বাইরে দুয়ারের কাছে বসে রইলাম। মোহরটা পেলেই তার যা নায্য দাম হয়, নগদ টাকা দিয়ে তখনই মিটিয়ে দেব।" হোটেলওয়ালী ভালমানুষ, কথামত মোহরটা এনে দিলে। কামব্রেমার দাম চুকিয়ে দিয়ে সেটা নিয়ে বাড়ী চলে এল। বললে, ভাল, একবার ওর দৌড়টাই দেখা যাক। সহরের লোক শুধু এইটুকুই টের পেলে। কামব্রেমার বাড়ী এসে স্ত্রীকে বললে,—"দেখ, নীচের ঘরটা বেশ সাফ করে ফেল ত।" ঘর দুয়োর সব পরিষ্কার হ'ল। শীতকাল, আগুনের কুণ্ডে আগুন জেলে' ঘরটা গরম করা হ'ল। টেবিল সাজান হ'ল। তার উপর যোড়া বাতি জলতে লাগলো। টেবিলের এক দিকে দু'খানা চেয়ার, সামনে একখানা টুল। পিয়ের জাকের মাকে বললে, "দেখ, আমাদের সেই বিয়ের সময়কার কাপড় চোপড়গুলো বার করত। তোমার গুলো তুমি পর; আমার গুলো আমাকে দাও, পরে আসি।" যা বলা, তাই করা। বিয়ের পোষাক পরা হ'লে কামব্রেমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাইকে ডেকে বললে, "দেখ, তুই বাইরে বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে পাহারা দে। যদি জলার ও পারে কি গাঁয়াদের ধার থেকে কোনও শব্দ শুনতে পাস, ত আমাকে তখনই খবর দিবি।"

'একটুখানি পরে, তার পরিবারের কাপড় ছাড়া সারা হয়েছে বুঝে, পিয়ের বসবার ঘরে ফিরে এল। তার পর নিজের বন্দুকটা বার করে' বারুদ টাকদ পেরে আগুনের কুণ্ডের কাছে ঘরের কোণে লুকিয়ে রেখে দিলে।

'খানিক পরেই জাক বাড়ী ফিরে এল। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে হোটেলে বসে' বসে' শুধু মদ খেয়েছে, আর জুয়ো খেলেছে। শেষে এমন অবস্থা যে, ধরাধরি করে' ও পারে কার্ণুক পয়েন্টের কাছে রেখে যেতে হয়েছে। সেখান থেকে তার চীৎকার শুনে তার কাকা নৌকা নিয়ে গিয়ে তাকে জলা পার করে নিয়ে এল। পার হবার সময় কিন্তু ভাল মন্দ কোনও কথাই তার কাছে ভাঙ্গলে না। জাক ঘরে ঢুকতেই তার বাপ বললে, "এই—এ দিকে এসে বসতো ওই টুলখানার ওপর। তোর বাপ

যার কাছে তুই আর গুরুতর অপরাধ করেছিস্—আর আমরা দুজনেই তোর বিচার কর্‌বো।” কামব্রেমারের চোখের ভাব দেখে জাকের ভয় হ’ল, সে নেশার ঝোঁকে হাউ-হাউ করে’ কান্না জুড়ে’ দিলে। তার বাপ ধমক্ দিয়ে বল্‌লে,—“দেখ্, ফের যদি চেঁচাবি, তা হ’লে’ এখনই তোকে কুকুরের মত গুলি করে’ মার্‌বো।” ধমক খেয়ে বাছাধন একদম্ চুপ। পিয়ের বল্লে, “দেখ্, এই কাগজখানায় একখান হিস্পানী মোহর জড়িয়ে তোর মা বিছানার ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। সে খবর সে ছাড়া আর কেউ জান্‌তো না। কাল দেখ্‌লাম, কাগজখানা জলে ভাস্‌ছে, আর তোর মাও মোহরটা খুঁজে পাচ্ছে না। তুই কাল্‌কে হোটেলওয়ালী ফ্রেরঁাকে এই মোহরটা দিয়ে এসেছিলি। এটাও হিস্পানী আস্‌রফী। এখন তোর কি বল্‌বার আছে, বল্।”

‘জাক্ কি তেম্‌নি ছেলে যে, স্বীকার কর্‌বে? সে বল্‌লে, তার মার মোহর, সে চোখেও দেখেনি। এটা হচ্ছে তার নাস্তের দরুণ মোহর। খরচ-খরচা করে’ এইটেই বেঁচে গিয়েছিল।

‘পিয়ের বল্লে, “বেশ। তোরই যদি হয়, তার কোনও প্রমাণ আছে?”

‘জাক বল্লে, “প্রমাণ আবার কি থাক্‌বে?”

‘আমি বল্‌ছি—“আমার মোহর।”

“তোর মার মোহর নিস্‌নি?”

“না।”

“একবার পরকালের কথা ভেবে’ হলফ্ নিয়ে এ কথা বল্‌তে পারিস্?”

‘জাক্ হলফ নিতে যাচ্ছে দেখে’ তার মা তার মুখের দিকে চেয়ে’ বল্‌লে—“দেখ্ বাবা, মিছে কথা হলফ্ করে’ বলে’ চিরজন্মের মত ইহকাল পরকাল খোয়াস্‌নি; এখনও ভাল হ’তে পার্‌বি; এখনও শোধরাবার উপায় আছে।” বলে’ জাকের মা হাপুসনয়নে কাঁদিতে আরম্ভ কর্‌লে। জাক বাপের তেমনি সুপুত্ত্র! সে মার কান্না দেখে নরম হবে! মাকে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, “বাধিয়ে দিয়ে এখন এয়েছেন ভালমানুষী করতে। তুমি যে কি চিজ, তা জানা আছে। কিসে আমি হাঙ্গামে পড়ি, তোমার কেবল সেই চেষ্টা।”

‘রাগে কামব্রেমারের মুখ ফেকাসে হ’য়ে গেল;—ছেলেকে বল্‌লে, “তোর মার যে এই অপমান কর্‌লি, এর জন্যে তোর শাস্তি বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। বাজে কথা রেখে দে; বল্, হলফ্ নিয়ে বল্‌বি ত?”

‘জাক বল্লে, “হাঁ।”

'পিয়ের বল্লে, "দেখ্. সার্ডিন মাছের দাম মেটাবার সময় মহাজন নিজে হাতে এমনই করে' মোহরটায় চেরা কেটে দিয়েছিল, বল্—তা হ'লে তোর-টাতেও এম্‌নি দাগ্ দেওয়া ছিল?"

'জাকের তখন নেশা ছুটে আস্‌ছিল। সে আর জবাব না দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লে। পিয়ের বল্লে, "যা হবার, তা হয়েছে; এখন কথা কয়ে আর মিছে সময় নষ্ট করার দরকার নাই।' কাম্‌ব্রেমার বংশের কেউ যে ফাঁসিতলায় জল্লাদের হাতে মর্‌বে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না। ভগবানের নাম কর্, অন্তিমকালে যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, সেরে নে। পাদরীকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি; দোষ ঘাট যা থাকে, তিনি এলে পরে তাঁর কাছে স্বীকার করিস্।" জাকের মা একটু আগেই উঠে গিয়েছিল—মার প্রাণ ত বটে, বসে' থেকে পেটের ছেলের প্রাণদণ্ডের কথা শুন্‌বে কি করে'? একটু পরেই জাকের কাকা পিরিয়াকের পাদরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। জাক্ তাঁর কাছে মোটেই মুখ খুল্‌লে না, যা কর্‌লে অপরাধ স্বীকার; না কর্‌লে 'প্রাচিত্তির'। বেশী চালাক কি না, ভেবেছিল, তার বাপ পরকাল নষ্ট হবার ভয়ে পাদরীর কাছে অপরাধ স্বীকার না করিয়ে প্রাণে মার্‌বে না।

'কাম্‌ব্রেমার ছেলের একগুঁয়েমী দেখে পাদরীকে বল্‌লে, "বাবা! মিছে-মিছি আপনাকে কষ্ট দিলাম, কোনও অপরাধ নেবেন না। ছোঁড়াটা যে বজ্জাত, ওকে একবার ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়েছিল। ঘরের কলঙ্ক—দয়া করে' কারুর কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর্‌বেন না।" তার পর ছেলেকে খুব ধমকে বল্লে, "দেখ্ ফের যদি এমন হয়, তা হ'লে তোকে সেই দিনই সাবাড় কর্‌বো, প্রাচিত্তির ফ্রাচিত্তির কিছুই মান্‌বো না।" ছোঁড়া মনে করলে, আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত—রাগ পড়ে গেলে যে-কে-সেই হয়ে যাবে। এই ভেবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। তার বাপ কিন্তু চারিদিকে চোখ রেখে জেগেই বসেছিল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়্‌তেই তার মুখের ভিতর খানিকটা সনের ফেঁসো পুরে দিয়ে, ছেঁড়া পাইলের একটা টুকরা কেটে বেশ করে মুখটা বেঁধে ফেল্‌লে, তার পর তার হাত পা বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলে। ছোঁড়ার আর নড়্‌বার চড়্‌বার যো রইল না। ছোঁড়ার যে কান্না, কামব্রেমার জজকে বলেছিল, তার চোখ ফেটে নাকি রক্ত বেরিয়েছিল। জাকের মা এসে সোয়ামীর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লো। পিয়ের কিন্তু কোনও কথাই শুন্‌লে না। স্ত্রীকে বল্‌লে, "ওর বিচার হ'য়ে গিয়েছে; ধর একটা

দিক। ওকে নৌকার উপর তুলে দিই গে।" জাকের মা রাজী হ'ল না। তখন পিয়ের হাত-পা-বাঁধা জোয়ান ছেলেটাকে একাই পাতলি-কোলা করে নিয়ে' নৌকার পাটাতনের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার গলায় মস্ত একখানা পাথর বেঁধে দিলে। তার পর, পিয়ের যেখানে পাহাড়ের কাছে বসে আছে—দেখেছ, এখান থেকে প্রায় ততটা দূরে সমুদ্দুরের ভিতর একাই নৌকাখানা বেয়ে নিয়ে চল্‌লো। জাকের মা এর মধ্যে পিয়েরের নৌকাখানা ধরবার জন্যে তার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এল। তাই কি আর পাবে? মাগী দূর থেকেই 'এবারটা মাপ কর!' 'এবারটা দয়া কর!' বলে' ছেলেটার জন্যে কত যে মিনতি করতে লাগ্‌ল, তা আর বল্‌বার নয়। চেঁচিয়ে তার গলা ভেঙ্গে গেল। পিয়ের কিন্তু সে সব গ্রাহ্যই করলে না। পর ত নয়—আপনার ছেলে, মাগীর বত্রিশ নাড়ী তখন যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছিল। চাঁদনী রাত; ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না; হাওয়া একদম্ নাই, পিয়েরের স্ত্রী দেখ্‌তে পেলে—বাপ অত আদরের ছেলেকে নিজে তুলে ধরে' সমুদ্দুরের মধ্যে ফেলে দিলে! ঝপ্ করে একটা শব্দ, বাস্—একটা বুদ্‌বুদ যে ওঠা, তাও উঠ্‌লো না। এত বড় যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল, তার কোনও চিহ্নও রইলো না। সমুদ্দুর ত আর নদী পুকুর নয়, তার কাছ থেকে কোনও কথাই ফাঁস হয় না। কাজ শেষ হ'তেই কামব্রেমার তার স্ত্রীর গোঙ্গানি শুনে' তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে কিনারায় ফিরে এল। এসে দেখ্‌লে, তার আর হুঁস্ নাই; মড়ার মত পড়ে আছে। দুই ভাইয়ে ধ'রে তুলে' তাকে আর ডাঙ্গা পথ দিয়ে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না—কোনও রকমে তার ছেলের দরুণ নৌকাখানায় উঠিয়ে লা ক্রোয়াজিকের খাঁড়ী দিয়ে অনেক ঘুরে শেষে বাড়ীর দুয়োরে এসে পৌঁছল। ক্রুঁই-বউ পাড়ার সুন্দরী বউ। বাড়ী এসে' হদ্দ দিন পাঁচ ছয় বেঁচেছিল। মরবার সময় সোয়ামীর হাতে ধরে' বলে' গেল, সে যেন সে নৌকাখানা আর না রাখে;—যেন সেটা সঙ্গে সঙ্গেই পুড়িয়ে ফেলে। মিন্‌সে এ কথাটা আর অগ্রাহ্য কর্‌লে না। বৌটা মরে যেতেই সেও যেন কেমনতর হ'য়ে গেল। কি যে নাই, কি যে চাই, সবই যেন ভুলে গিয়েছে। চল্‌তো যেন মাতালের মত, যেন কোনও কিছুরই হুঁস্ নাই।

'তার পর—দিন দশেক ধরে' কোথায় কোথায় ঘুরে' ফিরে পিয়ের সেই যে এসে পাহাড়ের ধারে ব'সেছে, কারুর সঙ্গে আর একটী কথাও কয় নি।'

জেলে তাহার গল্প দুই মিনিটে শেষ করিয়া ফেলিল। লিখিতে যে সময়

লাগিয়াছে, বলিতে তত লাগে নাই। তীক্ষ্ণধার কুড়ুলের আঘাতের ন্যায় সেই অনাড়ম্বর 'চাঁচা-ছোলা' বর্ণনায় গল্পটি যেন এক কোপেই সাবাড় হইয়া গেল। লিখিত আখ্যায়িকার তুলনায় সে ভঙ্গী আরও প্রাণস্পর্শিনী, আরও সরল। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা গল্প বলিতে বসিয়া, মনস্তত্ত্ব বা দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণা করে না; ঘটনার যেটুকু তাহাদের চিত্রপটে মুদ্রিত হয়, সেইটুকুবই 'সোজা-সুজি' বর্ণনা করিয়া যায়। আখ্যানাংশ যেমন মনে পড়িতে থাকে, তেমনই কথায় প্রকাশ করিয়া বলিয়া যায়।

আমরা হ্রদের উচ্চপ্রান্তে উপস্থিত হইতেই পলিন বলিল, সে আর 'বাজ' সহরে যাইবে না। অগত্যা লবণময় জলাভূমি অতিক্রম করিয়া লা কোয়াজিকেই ফিরিয়া আসিতে হইল। আমাদের আর কথা কহিবার প্রবৃত্তি ছিল না, গাইডটিও নির্ব্বাক্। গোলক-ধাঁধার ন্যায় 'পাওঠ' পথ ধরিয়া সে আমাদিগকে সন্তর্পণে লইয়া যাইতেছিল।

'এই জীবন-নাট্যের শোকাবহ বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি হৃদয় কেমন যেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই যে লোকটিকে দেখিয়া তখন হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, অশুভ ঘটনার পরিচায়ক মনে করিয়া আমরা উভয়েই বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম এখন তাহার সকল রহস্য অবগত হইতেই মন যেন নানা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

তরুণ তরুণী বলিয়াই আমরা একবারে সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলাম না; তাই এ তিন জনের লোমহর্ষণ কাহিনীর যেটুকু গাইড প্রকাশ করিয়া বলে নাই, তাহাও বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইল না। মনে হইতে লাগিল, পুত্রহন্তা পিতার এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে যে নাট্যের পরিসমাপ্তি, তাহার বিভিন্ন অঙ্কগুলি যেন আমাদিগের সম্মুখেই অভিনীত হইতেছে! বুঝিলাম, কি কঠিন কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া পিয়ের কাম্‌ব্রেমার একমাত্র আত্মজকে বলি দিয়াছিল। নিজের সুখশান্তি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া সারা দেশের ভয় ভীতির উদ্রেক করিয়া সে যে পাহাড়টির পাদদেশে বসিয়া আছে, দূর হইতে সে দিকে চোখ ফিরাইতেও আমাদের আর সাহসে কুলাইল না।

ক্রমে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কোথা হইতে কুয়াসা আসিয়া দিক্‌বলয় পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। এরূপ তিমিরমলিন নৈরাশ্যপূর্ণ দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। লবণসমাচ্ছন্ন পঙ্কিল জলাভূমির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল, এখানকার ধূসর মৃত্তিকাও যেন রোগগ্রস্ত; যেন

ধরিত্রীর অঙ্গে গণ্ডমালার ন্যায় কদর্য্য রোগচিহ্নবহুল করিয়া রহিয়াছে। এখানকার এ নিমক্‌-মহলের আর কি বর্ণনা করিব? চারিদিকে অসম চতুষ্কোণ 'খাত' ভিতর হইতে মাটী তুলিয়া বেশ গভীর করিয়া কাটা। ঢালু পাহাড়। ভিতরে ভিতরে বাঁধ—সমস্তই মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত। খাতমধ্যস্থ লোণা জলের উপরিভাগে লবণ জমিয়া থাকে।—লবণ-আবাদের মজুরেরা বাঁধের উপর দিয়া বিভিন্ন খাতে যাতায়াত করিয়া 'কাঁচা' লবণ সংগ্রহ করিয়া আনে। 'বিদা'র ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ভাসমান লবণ ছাঁকিয়া তোলা হইলে, উহা কতকগুলি বৃত্তাকার পাটাতনের উপর সঞ্চিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ লবণস্তূপ গঠিত হইয়া থাকে। সতরঞ্চ খেলার ছকের ন্যায় পরস্পর-সন্নিবিষ্ট এই সকল চৌকা কাটা গর্ত্তের ধার দিয়া আমাদিগের প্রায় ঘণ্টা দুই ধরিয়া যাইতে হইল। এ লোণার দেশে গাছ পালা কিছুই জন্মে না—ঘাস পাতা সমস্তই লবণে 'জরিয়া' যায়। মাঝে মাঝে দুই এক জন লবণ-সংগ্রাহক ছাড়া এ পথে লোকজনের সহিত বড় দেখাশুনাও হয় না। লবণ-আবাদে নিযুক্ত লোকদিগকে এ অঞ্চলে 'পালুদিয়ে' বলিয়া থাকে। চোলাই-কারখানায় মদ্য-ব্যবসায়ীদিগের হাত-কাটা মেরজাইয়ের ন্যায় ইহারাও এক প্রকার বিশিষ্ট পোষাক পরিধান করে। স্ব-শ্রেণীর বাহিরে ইহারা কদাচ বিবাহ করে না। এ যাবৎ কোনও 'পালুদিয়ে'-কন্যার অপর-জাতীয় পুরুষের সহিত পরিণয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এই সকল ভীষণদর্শন জলা, কদর্য্য কর্দ্দম-স্তূপ ও পুষ্পবর্জ্জিত ধূসর মৃত্তিকার সহিত আমাদিগের তখনকার মানসিক অবস্থার বেশ সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। কতক দূর আসিয়া সমুদ্রসংলগ্ন একটী খাল পার হইতে হইল। দেখিলাম, এই খাল-পথেই সাগরের জলরাশি 'বিলে' প্রবেশ করিয়া এই সকল জলাভূমি লবণাম্বু-পূর্ণ করিয়া রাখে। ক্রমাগত এই সকল নিরানন্দ দৃশ্যের পর খালধারের সেই সামান্য তৃণগুল্মের হরিত শোভা দেখিয়াই আমাদের কি আনন্দ! পার হইবার সময় কামব্রেমারদিগের আবাসস্থান—সেই বিল-মধ্যস্থ দ্বীপটি নজরে পড়িয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। হোটেলে আসিয়া দেখিলাম, নীচের তলায় হল্‌-ঘরটিতে একটী বিলিয়ার্ড টেবল্‌ রহিয়াছে। শুনিলাম, ল্য ক্রোয়াজিকে ইহাই সর্ব্ব-সাধারণের বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান। আমাদের আর সেখানে রাত্রিবাস করা হইল না। সেই রাত্রেই যাত্রার ব্যবস্থা করিলাম। পর দিন সকালে গাঁরাদে পঁহুছিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। *

শ্রীগুরুদাস সরকার।

---

* ব্যাল্‌জাকের Un drame de lord de la mer নামক গল্পের মূল ফরাসী হইতে অনুদিত।

উরুক্ষিতি ও পাঞ্চজন।

ঋগ্বেদ আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা যে আর্য্যদিগের প্রথম রচনা নহে, তাহাও ঋগ্বেদপাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাক্‌বৈদিক যুগের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। সেই প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যে দেশে বাস করিতেন, এবং যে নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাহার সন্ধানই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ যখন যজ্ঞার্থ ঋক্ রচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাট প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের বিজয়-কাহিনী ঋষিগণ ঋকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঐতিহাসিক বিষয়েরও আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব না।

ঋষিগণ আপন আপন কালের কথা বলিতে গিয়া প্রাক্‌বৈদিক যুগের অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা বৈদিক যুগে কিংবদন্তীরূপে বা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের রচনা হইতে তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। ঋষিদিগের রচিত এই জাতীয় ঋক্ হইতে আমরা আর্য্যদিগের বাসস্থানের নাম ও আর্য্যগণ যে সকল নামে আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে আর্য্যগণ দাস, দস্যু, বৃত্র, শম্বর, পণি, মৃধ, যাতুধান, রাক্ষস, কিমীদিন্ প্রভৃতি জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শত্রু-জাতীয়দিগকে আমরা অনার্য্য বলিতে পারি। আর্য্য শব্দের অর্থ কি? আর্য্য শব্দ 'ঋ' ধাতু হইতে আসিয়াছে। উহার অর্থ—'গমন'। অতএব আর্য্য শব্দের অর্থ 'যিনি দেবতার নিকট গমন করেন'। যাহারা অনার্য্য জাতি, তাহাদিগকে 'অব্রত' বলা হইত। (১) ইহা দ্বারা বেশ বুঝাইতেছে যে, আর্য্যগণ যজ্ঞরূপ ব্রত করেন, এবং অগ্নি, ইন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ আপনাদিগকে 'আর্য্যবর্ণ' বলিতেন। (২). বেদে আর এক বর্ণের উল্লেখ আছে, তাহা 'দাস বর্ণ'। (৩) জাতিদিগের

---

(১) সহবান্। দস্যুং। অব্রতং। ওষঃ। পাত্রং। ন। শোচিষা।—১।১৭৫।৩

অগ্নি যেমন তাপ দ্বারা পাত্রকে, (তুমি) সেইরূপ অব্রত দস্যুদিগকে তপ্ত কর।

(২) হত্বী। দস্যূন্। প্র। আর্য্যং। বর্ণং। আবৎ।—৩।৩৪।৯

দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

(৩) যঃ। দাসং। বর্ণং। অধরং। গুহা। অকঃ।—২।১২।৪

যিনি দাসবর্ণকে দক্ষিণ দিকে গুহায় (রুদ্ধ) করিয়াছেন।

মধ্যে বিভেদ বর্ণ দ্বারা সহজে করা যায় বলিয়া বোধ হয়, 'বর্ণ' শব্দ জাতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অপর যে সকল অনার্য্য বা অব্রত জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা দাস জাতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া অনুমান করি। কারণ, পণি নামক এক জাতির 'সম' আখ্যা দেখিতে পাই। (১) অনুমান করি, পণিগণ সমান-বর্ণ হইয়াও অব্রত ছিল।

দাস, দস্যুগণের অনেকে সাঁওতাল-জাতীয় ছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ, দাসগণের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল। (২) এক স্থলে ইন্দ্র 'উরণ' নামক দস্যু সংহার করিয়াছেন, বর্ণিত হইয়াছে। (৩) সাঁওতালদিগের মধ্যে 'উঁরাও' জাতি এখনও বর্ত্তমান। দাসগণ দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতগুহায় বিতাড়িত হইয়াছিল, ইহাও জানিতেছি। এই সকল একত্র গ্রহণ করিলে, দাস ও দস্যুগণ সাঁওতাল-জাতীয়, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। দাস জাতি কৃষ্ণবর্ণ ছিল ; আর্য্যগণ কিন্তু শ্বেত ও সুবর্ণ-বর্ণ ছিলেন, দেখিতে পাই। (৪) ঋগ্বেদের যুগে, আর্য্য ও দাস, উভয় বর্ণই, একই ঋষির অধীনে বাস করিত, এবং তিনি উভয় বর্ণকেই পালন করিতেন, এরূপ বর্ণনাও বেদে দেখা যায়। (৫) ইহা হইতে মনে হয়, বৈদিক যুগের সর্ব্বপ্রাচীন ঋগ্বেদের কালেই দাসগণ আর্য্য সমাজের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। শূদ্র শব্দ ঋগ্বেদের মধ্যে কেবল এক স্থলে

---

(১) তয়া। সমস্ত। হৃদয়ং। আরিথ।

কিকিরা কৃণু —৬।৫৩।৮

তাহার দ্বারা 'সমে'র হৃদয় কাটিয়া কিকিরা কর।

(২) সঃ। বৃত্রহা। ইন্দ্রঃ। কৃষ্ণযোনিঃ।

পুরন্দরঃ। দাসীঃ। ঐরয়ৎ। বি॥—২।২০।৭

সেই বৃত্রহননকারী, পুরবিদারণকারী ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাসী (বিশকে) সংহার করিয়াছেন।

(৩) অধ্বর্যবঃ। যঃ। উরণং। জঘান।—২।১৪।৪

হে অধ্বর্য্যুগণ। যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) উরণকে সংহার করিয়াছেন।

(৪) শ্বিত্যঞ্চঃ। যত্র। নমসা। কপর্দিনঃ।—৭।৮৩।৮

যথায় শ্বেতবর্ণ কপর্দ্দিগণ নমস্কার দ্বারা...।

পিশঙ্গ-রূপঃ। সুভরঃ। বয়োধাঃ।

শ্রুষ্টী। বীরঃ। জায়তে। দেবকামঃ।—২।৩।৯

সুবর্ণবর্ণ, শোভনযজ্ঞ, অন্নধারক, ক্ষিপ্রগুণযুক্ত, বীর, দেবভক্ত জন্মগ্রহণ করেন।

(৫) উভৌ। বর্ণৌ। ঋষিঃ। উগ্রঃ। পুপোষ।—১।১৭৯।৬

তেজস্বী ঋষি (অগস্ত্য) দুই বর্ণকে পালন করিয়াছিলেন।

দেখা যায়। কিন্তু তৎকালে দাস শব্দই শূদ্রার্থে ব্যবহৃত হইত; পরে শূদ্র শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, অগ্নি দেবই প্রথম আয়ু এবং আয়ু-নহুষের বিশ্পতি হইয়াছিলেন। (১) বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি প্রাচীনতম ঋষিগণ অগ্নিবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। (২) সেই জন্য আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন নাম 'আয়ু'। (৩) সকল আর্য্যই আপনাদিগকে 'আয়ু' বলিতেন। ঋগ্বেদে আয়ুকে কোথাও পুরূরবা ও উর্ব্বশীর সন্তান বলা হয় নাই। তবে আয়ু ও মনুর জন্য জ্যোতিঃ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা একটী ঋকে দেখিতে পাই। (৪) আমরা বৈদিক আয়ু শব্দ ও গ্রীক আয়ন্ শব্দ একই মনে করি। নহুষ ও যযাতি নাম ঋগ্বেদে আছে। ইহারা অতি প্রাচীন রাজা ছিলেন। নহুষকেও আয়ু বলা হইয়াছে। তাহা হইলে নহুষ আয়ুবংশীয় ছিলেন।

---

(১) ত্বাং। অগ্নে। প্রথমং। আয়ুং। আয়বে

দেবাঃ। অকৃণ্বন্। নহুষস্য। বিশ্পতিম্ —১।৩১।১১

হে অগ্নে! দেবগণ প্রথম আয়ু তোমাকে আয়ু-নহুষের বিশ্পতি করিয়াছিলেন।

(২) ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ।—১।৩১।১

হে অগ্নে! তুমি প্রথম অঙ্গিরা ঋষি।

যে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে। বিরূপাসঃ। দিবঃ। পরি।

নবগ্বঃ। নু। দশগ্বঃ। অঙ্গিরস্তমঃ। সচা। দেবেষু। মংহতে।—১০।৬২।৬

যাঁহারা অগ্নি হইতে জন্মিয়াছেন, (তাঁহারা) দেবলোকে বিবিধ-রূপযুক্ত; নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবতাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দান করেন।

যঃ। অদ্রিভিৎ। প্রথমজাঃ। ঋতাবা।

বৃহস্পতিঃ। আঙ্গিরসঃ। হবিষ্মান্।—৬।৭৩।১

অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন বৃহস্পতি প্রথমজাত, যিনি অদ্রিভেদকারী, ঋতাবা ও হবিষ্মান্।

(৩) আয়বঃ। প্রিয়মেধাসঃ। অস্বরন্।—৮।৩।১৬

প্রিয়মেধ আয়ুগণ (স্তোত্র) উচ্চারণ করিয়াছেন।

অতক্ষন্। আয়বঃ। নব্যসে। সম্।—২।৩১।৭

আয়ুগণ স্তুতি রচনা করিয়াছেন।

আ। শুক্রং। কেতুং। আয়বঃ।

ভৃগবাণঃ। বিশে। বিশে।—৪।৭।৪

আয়ুগণ ভৃগুবংশীয় কেতুকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) সকল বিশের (অর্থাৎ প্রজার) জন্য আহরণ করিয়াছেন।

(৪) যেন। জ্যোতীংষি। আয়বে। মনবে। চ। বিবেদিথ।—৮।১৫।৫

আর্য্যদিগের আর একটী সাধারণ নাম—মানুষ। কারণ, তাঁহারা মনু হইতে উৎপন্ন। এই মনু বিবস্বানের পুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৈবস্বত মনু বলা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে বিবস্বান্ শব্দ সূর্য্যকে বুঝায়; এবং যিনি ব্রতপরায়ণ, তাঁহাকেও বুঝায়। আমরা মনে করি, ঋগ্বেদের যুগে মনুর পিতা বিবস্বান সূর্য্যপূজক ব্রতপরায়ণ ঋষি রূপেই গৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বিবস্বান শব্দের অপর অর্থ গৃহীত হইয়া মনুকে সূর্য্য-পুত্র-রূপে প্রচার করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে মনুর বিষয় আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে তাঁহাকে এক জন ধর্ম্মসংস্কারক-রূপে দেখিতে পাই। ১ম, তিনি ৩৩টী দেবপূজার প্রবর্ত্তক। ২য়, তিনি ইড়া নামক এক নূতন যজ্ঞবেদি রচনা করিয়াছিলেন। (১) ইহা হইতে অনুমান করি, আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখায় মনুর সময় বিভিন্ন দেব-পূজার সৃষ্টি ও প্রচার হইয়াছিল। ইহার ফলে ক্রমশঃ উঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহিত ত্বষ্টার মধ্যে এইরূপ বিরোধের আভাস দেখা যায়। ঋভুদিগের বর্ণনাতেও অগ্নিবংশীয়দিগের সহিত ঋভুদিগের মনোমালিন্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনু ৩৩টী দেব গ্রহণ করায় দেখা যাইতেছে যে, তিনি নিতান্ত গোড়ার দিকের লোক নহেন। যাঁহারা তাঁহার দ্বারা প্রচারিত এই ৩৩টী দেবপূজা ও ইড়া নাম্নী অগ্নিবেদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মানব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মনুবংশীয়গণ ইড়াকে ধেনু, পুত্র দোহন করিয়া দিবার প্রার্থনা করিতেন, (২) এবং ইহাকে পৃথিবীর

(১) ইতি। স্তুতাসঃ। অসথ। রিশাদসঃ যে। স্থ। ত্রয়ঃ। চ। ত্রিংশৎ। চ। মনোঃ। দেবাঃ। যজ্ঞিয়াসঃ ॥—৮।৩০।২

হে মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ। যাঁহারা (সংখ্যায়) ৩৩টী; (তাঁহারা) হিংসকদিগের হইতে উদ্ধারকর্ত্তা হন। এইরূপে (আমার দ্বারা) স্তুত হইয়াছেন।

জোহূত্রঃ। অগ্নিঃ। প্রথম। পিতেব।

ইড়ঃ। পদে। মনুষা। যৎ। সমিদ্ধঃ ॥—২।১০।১

পিতার ন্যায় জোহূত্র অগ্নি ইড়ার পদে মনু দ্বারা প্রথম প্রজ্বলিত হন।

ইড়াং। অকৃণ্বন্। মনুষস্য। শাসনীম্

পিতুঃ। যৎ। পুত্রঃ। মমকস্য। জায়তে।—১।৩১।১১

(দেবগণ) ইড়াকে মনুষ্যের পিতার শাসনী করিয়াছিলেন—যে (বংশে) আমাদের পুত্র জন্মে।

(২) অস্য। প্রজাবতী। গৃহে। অসশ্চন্তী। দিবে। দিবে

ইড়া। ধেনুমতী। দুহে ॥—৮।৩১।৪

ইহার (অর্থাৎ যজমানের) গৃহে প্রজাবতী, ধেনুমতী, আগমনশীলা ইড়া (পুত্র, ধেনু) দোহন করিয়া দিন।

নাভিরূপে কল্পনা করিতেন। (১) তাঁহারা আরও মনে করিতেন, বিষ্ণুদেব মনুর ক্ষেত্র করিবার জন্য উরুক্ষিতি প্রদান করিয়াছেন। (২) এই সঙ্গে তাঁহারা দূর হইতে আগত একটী পথেরও উল্লেখ করিতেন। (৩) এই সকলের একত্র বিচার করিলে মনে হয়, মনু দূরদেশ হইতে উরুক্ষিতিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে দেশে ইড়া বেদি প্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাকে ইড় দেশ বলা হইত, অনুমান করি। তাঁহার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মানব সম্প্রদায় উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ ইড় দেশ হইতে উরুক্ষিতিতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন উরুক্ষিতিতে মানবগণ যজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ সেই দূরবর্ত্তী দেশ হইতেও আসিতেন, এরূপ বর্ণনাও দেখা যায়। (৪) তাঁহারা দেব-নামের অধিকারী এবং মানবদিগের যজ্ঞে আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণও করিতেন। ইড়া যে দেশ বা পৃথিবীর একটী নাম, তাহা কোনও কোনও আর্য্যভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) পারস্যের নাম

---

(১) ইড়ায়াঃ। ত্বা। পদে। বয়ম্

নাভা। পৃথিব্যাঃ। অধি —৩।২৯।৪

পৃথিবীর নাভির উপর ইড়ার পদে তোমাকে আমরা (প্রজ্বলিত করিয়াছি)।

(২) বি। চক্রমে। পৃথিবীম্। এষঃ। এতাম্। ক্ষেত্রায়। বিষ্ণুঃ। মনুষে। দশস্যন্।

ধ্রুবাসঃ। অস্য। কীরয়ঃ। জনাসঃ

উরুক্ষিতিং। সুজনিমা। চকার॥—৭।১০০।৪

এই বিষ্ণু মনুকে (কৃষির জন্য) এই পৃথিবীকে ক্ষেত্রার্থ প্রদান করিতে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। হে জনগণ! ইঁহার স্তবকারিগণ অটল (বা ধ্রুবলোকবাসী)। শোভনজন্মা উরুক্ষিতিকে করিয়াছেন।

(৩) মা। নঃ। পথঃ। পিত্র্যাৎ। মানবাৎ

অধি। দূরং। নৈষ্ট। পরাবতঃ।—৮।৩০।৩

পিতা মানব হইতে প্রাপ্ত, দূরগামী পথ হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যাইও না।

(৪) পরাবতঃ। যে। দিধিষন্তে। আপ্যং

মনুপ্রীতাসঃ। জনিম। বিবস্বতঃ।

যযাতেঃ। যে। নহুষ্যস্য। বর্হিষি দেবাঃ। আসতে। তে। অধি। ব্রুবন্তু নঃ॥—১০।৬৩।১

দূর হইতে আগত, যাঁহারা মনুর প্রতি প্রীত, বিবস্বান্ হইতে (আমরা) জন্মিয়াছি (এরূপ আমাদের) আত্মত্ব ধারণ করেন, (এবং) নহুষ-পুত্র যযাতির যজ্ঞে যে দেবগণ আসীন আছেন, সেই সকল (দেব) আমাদিগকে অধিক বলুন।

(৫) পারস্যদেশের নাম ইরাণ। এংগ্লো-স্যাক্সন ভাষায় পৃথিবীর নাম—Eorthe; ডচ ভাষায়—Aarde; জার্ম্মান ভাষায়—Erde

ইরাণ। ইড়া শব্দ হইতেই এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, মনে করি ; এবং পারস্যের নিকট কোনও স্থান হইতে মনু সম্প্রদায় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান পঞ্জাব দেশে আসিয়া আর্য্যবংশীয় মানবগণ উপনিবেশস্থাপন করেন। এই দেশ প্রাচীন কালে উরুক্ষিতি, উরুলোক (১), উরু ও ক্ষিতি, এই সকল নামে অভিহিত হইত। উরু অর্থে বহু, প্রচুর, বিস্তীর্ণ ; তাহা হইলে উরুক্ষিতি বা উরুলোক অর্থে বিস্তীর্ণ ক্ষিতি বা লোক বুঝায়। অনেক স্থলে উরু শব্দ এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেখানে উহার অর্থ উরুদেশ বুঝায়। (২) বিষ্ণুকে উরুগায় বলা হইত। বিষ্ণুই মনুকে 'উরুক্ষিতি' প্রদান করেন। তাঁহার 'উরুগায়' নামের অর্থ, উরুদেশীয় লোকের দ্বারা গীত, করিলে সার্থক হয়। যাহা হউক, সাধারণে এই দেশকে ক্ষিতি বলিত, এবং দেশবাসিগণও ক্ষিতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্জাবে শুতুদ্রী (বা সট্‌লেজ), বিপাশ্ (বা বিয়া), পরুষ্ণী (বা রাভী), অসিক্নী (বা চেনাব), বিতস্তা (বা ঝিলম্) এবং সিন্ধু, এই ছয়টী প্রধান নদীর অন্তর্গত যে সকল ভূখণ্ড আছে, তাহারা পঞ্চক্ষিতি নামে প্রাক্‌বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। (৩) এই জন্যই বেদে পাঞ্চজন্য বিশ নাম নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) আর্য্যদিগের একটী

(১) বসিষ্ঠস্য। স্তুবতঃ। ইন্দ্রঃ। অশ্রোৎ।

উরুং। তৃৎসুভ্যঃ। অকৃণোৎ। উ। লোকম্।—৭।৩৩।৫

স্তবকারী বসিষ্ঠের (স্তব) ইন্দ্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণকে 'উরুলোক' প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) উরৌ। ন। মায়ুং। চিতয়ন্ত। ধুনয়ঃ।—১০।৯৫।৩

উরু (দেশে) ধুনিগণ শত্রুকে চেতনা দেয় না।

তং। ত্বা। গীঃভিঃ। উরুক্ষয়াঃ

হব্যবাহম্। সম্। ঈধিরে।—১০।১১৮।৯

হব্যবহনকারী, গীতি দ্বারা সেবিত সেই তোমাকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) উরুদেশীয় গৃহ সকল প্রদীপ্ত করিয়াছে।

কবী। নঃ। মিত্রাবরুণা। তুবিজাতৌ। উরুক্ষয়া।—১।২।৯

হে তুবিজাত কবি মিত্রবরুণ ! আমাদের উরুদেশবাসিদ্বয়।

(৩) পঞ্চ। ক্ষিতীঃ। মানুষীঃ। বোধয়ন্তি।—৭।৭৯।১

মানুষবংশীয় পঞ্চক্ষিতিদিগকে চেতনা-প্রদানকারিণী।

(৪) যৎ। পাঞ্চজন্যয়া। বিশা।—৮।৫২।৭

পঞ্চজনসম্বন্ধীয় বিশ্ (অর্থাৎ প্রজা) দ্বারা।

নাম যেমন ক্ষিতি ছিল, সেইরূপ তাঁহাদের আর এক নাম ছিল,—জন। কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ কৃষক ছিলেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃষ্টি বা চর্ষণী বলিতেন। (১)

অতএব আমরা দেখিতেছি, পঞ্জাবে যে পাঁচটী 'দোয়াব' বা দ্বীপ আছে, (২) সেই পঞ্চ প্রদেশে আর্য্যগণ প্রথম আগমন করিয়া বাস করেন। তথায় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা 'আয়ু' ও 'মানুষ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা দেশের নাম 'ক্ষিতি' বা 'উরুক্ষিতি' রাখিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগকে 'পঞ্চ-মানুষ', 'পঞ্চ-ক্ষিতি', 'পঞ্চ-জন' ও 'পঞ্চ-কৃষ্টি' বলিতেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

পরীর শ্রম।

'পূজার মৌসিমে' সকলেই একটু 'চাঙ্গা' হইবার চেষ্টা করে,' ইহা আমাদের জমিরুদ্দীন চাচার উক্তি। জমিরুদ্দীন চাচার জুতার দোকান; আমাদের হরিদাস খুড়ার কাপড়ের দোকান। দুই জনেই মধ্যে মধ্যে রেলে আরোহণ করিয়া 'খদ্দের' জুটাইয়া আনেন। চাচার ও খুড়ার মধ্যে বড় ভাব, বিশেষতঃ পূজার মৌসিমে। এ বৎসর জুতার দর অপেক্ষা বস্ত্রের দর বেশী। চাচা কিছু ম্রিয়মাণ। হরিদাস খুড়া বলিলেন, 'ভয় নাই দাদা, জুতা না খেলে কাপড়ের দাম জুটবে কোথা হতে? তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাক। নিতান্ত দরকার হয় ত পরে "ত' গুলো কেটে চটী করা যাবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান খুব সম্ভব। আমি হরিদাস চাটুর্য্যে তোমাকে এ কথা বলছি।'

এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে হরিদাস খুড়া ঠিক পিপীলিকা কিংবা চক্রবাকের মত

---

(১) অধি। শ্রবঃ। পাঞ্চজন্যাসু। কৃষ্টিষু।—৯।৬৫।২৩

পঞ্চজন-সম্বন্ধীয় কৃষকদিগের মধ্যে অধিক অন্ন।

চর্ষণয়ঃ। ইন্দ্রং। বর্ধয়ন্তি। ক্ষিতয়ঃ।—৮।১৩।১৯

কৃষক ক্ষিতিগণ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন।

ইন্দ্রো রাজা জগতঃ চর্ষণীনাম্।—৭।২৭।৩

ইন্দ্র চর্ষণীদিগের জগতের রাজা।

(২) নি। দ্বীপানি। পাপতং। তিষ্ঠং।—৮।২০।৪

দ্বীপানি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ আপো যেষু তানি উদমধ্যে স্থলানি।—ইতি সায়ন।

পাকা। কখন কি হবে, তা খুড়ার মনের মধ্যে বিনা চেষ্টায় উদয় হইয়া পড়িত। সেই জন্য চাদনীচ'কে খুড়ার বড় খাতির। হরিদাস খুড়ার বাটী কোন্নগরে। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা কাশীবাসী। সেখানে আমাদের খুড়ীমাও থাকেন। খুড়া মহাশয়ের পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তান, কিছুই হয় নাই। জমিরুদ্দীন চাচারও তথৈব চ। উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্যের তাহাই অন্যতম কারণ। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা যে, দশ হাজার টাকা না জমিলে সন্তানের আবির্ভাব মহা পাপ। অন্ততঃ দোকানদার ও পেশাদার লোকের পক্ষে এই বিধান হওয়া উচিত। যাহারা চাষী, জমী চাষ করিবার লোক নাই, তাহাদিগের জন্যই 'পুন্নাম নরক' নির্দ্দিষ্ট ছিল। যখন মনু সে বিধান করিয়াছিলেন, তখন চাঁদনী-চক, ইনকমট্যাক্স, স্বায়ত্তশাসন, এ সব গোলমাল ছিল না।

চাচা এবং খুড়া উভয়েই স্থির করিলেন যে, একবার বারাণসী ঘুরিয়া কিছু জড়াওয়ের সুতা ও কাশী-সিল্ক সস্তা দরে আনিতে পারিলে ও সেই সঙ্গে কলিকাতায় জনকতক খরিদ্দার জুটাইতে যাইলে মন্দ হয় না। খুড়ার অবশ্য খুড়ীমাকে দেখিবার অনেকটা ইচ্ছা ছিল। জমিরুদ্দীন চাচা খুড়ার বাটীতে অতিথি হইতেন, এবং তাহাতে কর্ত্তা মহাশয় (খুড়ার পিতৃদেব) খুব আনন্দিত হইতেন। কর্ত্তা মহাশয়ের মনের ভাব সম্পূর্ণ বৈদিক আমলের; এমন কি, তাঁহার জমিরুদ্দীন চাচার সহিত পুরোডাশ ভক্ষ করিয়া খাইবার কোনও আপত্তি ছিল না।

এই সনাতন বদান্যতার গুণে পূর্ব্বে হিন্দু খুড়া ও মুসলমান চাচাদিগের মধ্যে কোনও হাঙ্গামাই হইত না।

দুই বন্ধু টিকিট ক্রয় করিয়া হাবড়া ষ্টেশনে প্লাটফর্মে পাইচারী করিতেছিলেন। এক জন যুবক হ্যাটকোট পরিধান পূর্ব্বক সকলকে আপ্যায়িত করিতেছিল। হরিদাস খুড়া বাজে লোক চিনিতে অদ্বিতীয়। তিনি চাচার কাণে কাণে বলিলেন, 'ঐ যে লোকটা দেখ্‌ছ, ও এবার বি. এ. পাশ ক'রেছে, প্রায়ই ষ্টেশনে আসে, এক জন গাঁটকাটা।' চাচা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোবা, তোবা, হরিদাদা, এমন খয়সান্ কথা আর শুনিও না। আমি লেখাপড়ার অত্যন্ত সম্মান করি। হায় আল্লা! হিঁদু লোকের এ কি হৈল? শিক্ষা এমনই উঁচাদরের জিনিস যে, শিক্ষিত ব্যক্তি যদি চুরী করে, তবে চুরীরও সম্মান বাড়ে, কিন্তু চুরী ও মিথ্যা কথার সঙ্গে যদি 'বি-এ', 'এম-এ', থাকে, তবে 'লাহল বিলাকুল্'! এ রকম শিক্ষা না হওয়াই ভাল। এ সব সময়ের

গুণ। তাই, আমরা কোরাণ আগে পড়ি, তার পর অন্য সাহিত্য। আমাদের স্ত্রীলোকও কোরাণ পড়ে। ধর্ম্মই আসল, হরিদাদা, ধর্ম্মই আসল।'

এই সকল কষ্ট-কথা মনে হওয়াতে ধর্ম্মপরায়ণ জমিরুদ্দীন্ মুনশী মুখ হইতে লালা নিঃসৃত করিয়া প্লাটফর্মের এক পার্শ্বে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। হরিদাস খুড়া আরোহীদিগের প্রতি একে একে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্রমেই অশান্তি লাভ করিতেছিলেন।

গাড়ীতে বড় ভিড়। সেকণ্ড ক্লাসে 'বার্থ' সবগুলিই 'রিজার্ভ' হইয়া গিয়াছে। মাড়ওয়ারীগণ দলে দলে বস্তা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বিকানীরের ও জয়পুরের ও যোধপুরের টিকিট হস্তে শশব্যস্তে নিজের 'বার্থ' দেখিয়া লইতেছে। কাহারও হস্তে নিমকী ও মোহনভোগ, কাহারও পরিধানে আদ্দির 'সার্ট' ও সোনার বোতাম। মাথায় পাগড়ী। কাহারও সঙ্গে ত্রিশ বত্রিশটা বড় বড় মোট। এই গোলমালের মধ্যে একটী যুবক সেকণ্ড ক্লাসে স্থান না পাইয়া 'মেচো মাণ্ডলের' গাড়ীতে প্রবেশের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল। যুবক দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, অঙ্গে পাঞ্জাবী পিরিহাণ হস্তে 'রিষ্টওয়াচ' ও সুবর্ণ-অঙ্গুরীয়। নিরুপায় হইয়া একটা কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়াতে হরিদাস খুড়া জমিরুদ্দীন চাচার কানে কানে বলিলেন, 'লোকটা খুব ধনী ব'লে বোধ হচ্চে', একে ডেকে নিন্।' মুনশীজী যুবককে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনি এই কামরায় আসুন। যথেষ্ট জায়গা আছে।' যুবক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল, এবং তাহার অব্যবহিত পরে আর এক জন ভদ্রলোকও সেই কামরায় প্রবেশ করিলে ট্রেণ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল।

২

শেষোক্ত ভদ্রলোকটি অতিশয় শীর্ণকায়। কেশ রুক্ষ, ও হাতে একটা ক্যানবিশের ব্যাগ, এবং বহু পুরাতন একটি ইনামেলের গ্লাস। ভদ্রলোকটি গাড়ীতে উঠিয়াই যুবককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মশাই, আপনার পকেট্ হ'তে মনিব্যাগটা প্লাটফর্মে পড়ে' গিয়েছিল, আমি দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।' যুবক স্বীয় পকেটে হাত দিয়া কহিল, 'তাই ত! আমি কি অসাবধান! আপনি আমার বড় উপকার ক'রলেন।' আগন্তুক কোনও উত্তর না দিয়া ব্যাগটি যুবকের হস্তে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কামরার এক কোণে সরিয়া পড়িলেন। হরিনাথ খুড়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে, শ্রীশচন্দ্র, এস—এস। পূজোর সময় কাশী যাচ্ছ বুঝি?' শ্রীশচন্দ্র নম্রভাবে বলিল, 'হাঁ।'

ইত্যবসরে জমিরুদ্দীন চাচা যুবককে বলিলেন, 'আপনি মনি ব্যাগের মধ্যের টাকা কড়িটা দেখে নিয়ে সাবধানে রেখে দিন, আজ কাল চোরের উপদ্রব খুব !' যুবক ব্যাগের মধ্যে নোটগুলি বাহির করিয়া গণিয়া বলিলেন, 'ঠিক আছে, এতে বেশী ছিল না, কেবল আট্ হাজার টাকা মাত্র, আর একটা ফটো। এই ফটোখানিই মহামূল্য। এটা সেই বায়স্কোপের পরীর ফটো।' ইহা বলিয়া যুবক সেই ফটোর দিকে একবার তাকাইয়া মনিব্যাগ পকেটে রাখিয়া দিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কি করা যায়—বলুন ত ?' জমিরুদ্দীন চাচা বলিলেন, 'কোনও ভয় নাই, আমার কাছে 'সোলেমানী নেমক' আছে, ইহার জিহ্বায় ঠুসিয়া দেও।' হরি খুড়া চাচাপ্রদত্ত খানিকটা 'সোলেমানী নেমক' যুবকের জিহ্বায় প্রয়োগ করাতে জিহ্বা অবলীলাক্রমে জলাকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে যুবকেরও জ্ঞানসঞ্চার হইল। কিন্তু যুবকের তখনও কিঞ্চিৎ নেশার মত ছিল। সে বলিয়া উঠিল, 'প্রমীলা, বিমলা, অমলা, শুশী, মালতী, কুন্দ, তোমরা এর মত কেউ নও, এর তুলনা নাই ! তুলনা নাই !'

সকলেই অবাক। জমিরুদ্দীন চাচা বলিলেন, 'এ ছোকরা কোনও নায়িকার প্রতি 'আসেক্' হয়েছেন, এবং তার সঙ্গে পূর্ব্বে যাঁদের উপর 'আসেক' হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অধুনাতন নায়িকার তুলনায় সমালোচনা ক'চ্ছেন।'

যুবক তাহা শুনিয়া বলিল, 'না, না ! যদিও আমি আপাতঃ আসেক্ হয়েছি বটে, কিন্তু সেটা একটী পরীর প্রতি। আর যাদের নাম কচ্ছিলুম, সে সব ছোট বড় উপন্যাসের নায়িকা। আমি যাকে দেখে পাগল, সে "মর্‌মেড্।" সমুদ্রের অঙ্গনা, জলমগ্না, অপ্সরা জাতির কেউ। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই সে আছে। তার প্রমাণ যে, আমি তাকে পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখেছিলুম, এবং তার কিছু দিন পরে রূপসিংহের দোকানে তার ফটোগ্রাফ দেখ্‌তে পেলুম। তারা, কার ফটো, তা বল্লে' না। যা হোক, সেখানা কিনে নিইছি। কাল্ রাত্রিকালে আমি যখন বায়স্কোপ দেখি, তখন যে 'মর্‌মেড' সমুদ্রে স্নান কচ্ছিল, ডুবছিল, উঠছিল, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছিল, মাঝে মাঝে কাঁদছিল, এবং করুণ ভাবে জগতের দিকে তাকাচ্ছিল, তাহার চেহারা, আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট চেহারা, ও ফটোর চেহারা, ঠিক একই রকম ! এটা আশ্চর্য্য নয় কি ?'

হরি খুড়া। আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে !

জমিরুদ্দীন চাচা। আমার বোধ হয়, উপন্যাস পড়ে' ও বায়স্কোপ দেখে আপনার মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

যুবক। কাশীধামে।

হরি খুড়া। কাশীতে হারানো জিনিস্ পাওয়া যায়। আপনার সঙ্গে কিছু কাপড় চোপড় দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনার সেখানে কেউ আছে?

যুবক। কেউ নাই। কোনও পাণ্ডার বাসায় গিয়ে থাক্‌ব। এক জোড়া চটী পায় দিয়ে এসেছি। আমার ঠিক বিশ্বাস যে, কাশীতেই সেই পরীটি আছে; কেন না, স্বপ্নে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়োর উপর তাকে উড়তে দেখেছি।

জমিরুদ্দীন। আপনি এক জোড়া জড়াওয়ের জুতা ও একটা কাশী সিল্কের 'লেবাস্' প্রথমতঃ সংগ্রহ করুন। আমাদের হরিদাদার দোকান খুব ভাল, ওঁদের ও আমাদের কারবার একত্র। মনে রাখ্‌বেন। এই কার্ডখানা রেখে দিন।

ইহা বলিয়া মুনশীজী 'জমিরুদ্দীন খাঁ এণ্ড হরিচাটুর্য্যে এণ্ড কোং' মুদ্রিত একখানি কার্ড লইয়া যুবকের হস্তে দিলেন। যুবক বলিল, 'আমার ঠিক এই-গুলোর দরকার। আপনাদের ঠিকানা?'

হরি খুড়া। দশাশ্বমেধ ঘাট। বেনারস সিটী।

যুবকের মাথায় বোধ হয় মধ্যে মধ্যে কোনও কষ্ট হইতেছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাহার কুঞ্চিত কোমল কেশ অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া অনেকক্ষণ পরে শ্রীশবাবু বলিলেন, 'আপনি শুইয়া পড়ুন, আমি একটু বাতাস করি।'

যুবক কৃতজ্ঞভাবে শ্রীশবাবুর ক্যানবিসের ব্যাগের উপর মাথা দিয়া শয়ন করিল, এবং জমিরুদ্দীন মুনশীর 'সোলেমানী লবণ' পুনর্ব্বার আস্বাদনপূর্ব্বক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

৩

চন্দ্রালোকে রাত্রির শোভা-বৃদ্ধি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ পার হইয়া, ক্রমে গিরিশ্রেণীর শোভা নয়নপথে উদিত হওয়াতে হরি খুড়ার আনন্দ উছলিয়া পড়িল। মুনশীজী অহিফেনের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেছিলেন। ক্রমে অত্যন্ত ধর্ম্মভাবে অধীর হইয়া বলিলেন, 'ভায়া, এক সময় হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের কেমন সদ্ভাব ছিল, তাহা অভিধান হইতে প্রকাশ। আমরা বাল্যকালে যে অভিধান মুখস্থ করেছি, সেটার নাম "পদ্মনামা"। সেই পদ্মনামা সমগ্র কাব্য লেখা।'

হরি খুড়া। কি আশ্চর্য্য! অভিধান কাব্যে লেখা!

জমিরুদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ! ছন্দ না রক্ষা করলে স্মৃতিশক্তি কাবু হয়ে পড়ে, যেমন স্ত্রী-বিহনে পুরুষ, কিংবা তাল বিহনে সঙ্গীত। প্রথম গোটা কতক লাইন তোমাকে শুনাই, –

রহমান রাম, আল্লা কর্ত্তার,
পরওর দিগার হয় পালন হার।
নবী, রসুল, পয়গম্বর জান্
চার ইয়ারকো পহিলা মান্।
ওয়াহিদ এক, শানি দুজা
বুতখানা মণ্ডপ, পরস্ত পূজা।

এই দেখ, এক একটা কথার অর্থ তাহারই পরে কি সুন্দরভাবে বসান' হয়েছে। যেমন আমাদের রহমান্ = তোমাদের রামচন্দ্র—আমাদের বুতখানার অর্থ তোমাদের মণ্ডপ, আমাদের পরস্ত শব্দের অর্থ তোমাদের পূজা। এই রকম হিন্দুদের কথা আমাদের অভিধানে কাব্যসংযোগে সন্নিবেশিত হওয়াতে ঠিক যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মত ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তোমরা যদি পেঁয়াজটা বরাবর খেতে, তবে আমরা এত দিনে 'বৈষ্ণব হয়ে পড়তুম, তার কোনও সন্দেহ নাই।'

'ভাষা সম্বন্ধে আমারও তাই মত' ইহা বলিয়া হরি খুড়া বলিলেন, 'তোমাদের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিশে আজকালকার পোষাকের মত একটা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ক্রমে ইংরাজী ভাষার ভাবগুলো এসে 'ওড়না' জিনিসটা লোপ পেয়ে গিয়েছে। স্ত্রীলোকদের 'হ্যাটে'র চেয়ে, এবং পুরুষের 'নেকটাই'এর চেয়ে, আমার বোধ হয় ওড়না ও গলার রুমাল ভাল।'

ক্রমে উভয় বন্ধুর মধ্যে বাজারের দর সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইবে মুন্সীজী বলিলেন, 'ঝাঁটা, কলসী ও মাটীর বাসনের দর পর্য্যন্ত এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা মুস্কিল হবে। জুতোর দর বাড়লে অনেকে জুতো ছেড়ে দেবে, কিন্তু ঝাঁটা ছাড়া মুস্কিল।'

হরি খুড়া। এ সব বড় শক্ত কথা। মাটীর কমতি নাই, অথচ কলসীর দর বাড়ে কেন? তা বুঝলে না? যারা পরিশ্রম করে, তারা পরিশ্রমের দর বাড়িয়ে দিয়েছে। এক দল যদি পরিশ্রমের দর বাড়ায়, তবে আর এক দল বাড়াবে

নিশ্চয়, ক্রমে এক রকম পরিশ্রমের সঙ্গে আর এক রকম পরিশ্রমের টক্কর বেধে যাবে। যারা আগে ব্যাপার খাটিয়ে মূলধন সঞ্চয় ক'রে ব'সে আছে, তারা মুস্কিলে পড়বে। হয় তাদের নিজের গতর খাটাতে হবে, কিংবা এক টাকায় একটা ঝাঁটা কিনবে। কাজেই তাদের টাকার দর কমে গেল। এখন জোর ক'রে মজুরী কমিয়ে দেবার সময় আর নেই। এক কথায় বিপ্লব। ভদ্রলোকের পরিশ্রমের চেয়ে ছোট লোকের পরিশ্রম হবে মূল্যবান্, সুতরাং মাল মশলা সংগ্রহ ক'রে নিজে না খাটলে দিন চলা দুষ্কর।

জমিরুদ্দীন। তোমাদের ধর্ম্মে কি বলে?

হরি খুড়া। এই রকম অবস্থা হ'লে 'চান্দ্রায়ণ' নামক একটা ব্রত কর্ত্তে হয়। সেটার মধ্যে ভয়ানক আধ্যাত্মিক মানে আছে। চাঁদ যত বাড়ে, আহারের গ্রাস তত কমান' উচিত; এমন কি, পূর্ণিমার দিন মোটে এক গ্রাস, কিংবা উপবাস। সেই রকম অমাবস্যার দিকে। এই ত গেল আহার। নিদ্রার বেলাও তাই। যতক্ষণ অন্ধকার, ততক্ষণ জেগে থাকবে। পূর্ণিমার রাত্রিতে একেবারে ঘোর নিদ্রা। আর অমাবস্যার রাত্রিতে সম্পূর্ণ জাগরণ। 'জাগ সবে ভারতসন্তান' গান জান ত? এর একটা মহা সুবিধা। অন্ধকার রাত্রিতে চোর ঘরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক তারি উল্টো। অর্থাৎ, পূর্ণিমার রাত্তিরে জাগ্‌বে, এবং অমাবস্যায় ঘুমুবে। এই ছিল আমাদের শাস্ত্র। ক্রমে লোপ পেয়ে আমরা অকালকুষ্মাণ্ড হয়ে পড়েছি।

মুনশীজী বলিলেন, 'হায়! হায়! ঠিক কথা। আফিং চড়িয়ে রাত্রিকালে খোলা মনে সেতার বাজাব, সে দিন আর হবে না। সকলেই পরিশ্রমের দর চড়িয়ে দিয়েছে। এই যে দেখ্‌ছ ছোকরাটি, কেমন খোসবুদ্ধ চেহারা, মেজাজও তেম্‌নই, কিন্তু পরিশ্রম না করে' বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। কোনও কাজ কর্ম্ম না থাকলে মাথা বিগ্‌ড়ে যায়, এ রকম অনেক জায়গায় দেখেছি। খোদাতালার সৃষ্টির মর্ম্মই এই। মাহমুদ নামে এক জন বাদশাহ গজনীতে ছিলেন, তাঁহার চক্ষু কোটরে ঘুরিত; ইহাতে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "এর কারণ কি মহারাজ?" মাহমুদ শাহ চক্ষু আরও ঘুরাইয়া বলিলেন, "দেখ মন্ত্রী, সৌন্দর্য্য দেখে দেখে একেবারে অন্ধ হ'বার উপক্রম হচ্ছিল, তাই চক্ষুটাকে পরিশ্রমে নিযুক্ত করেছি।"

উভয় বন্ধু যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহারই মধ্যে রেল জোড়াসা

ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল। যুবক নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্মিতমুখে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'আপনি আমার জন্য বড় কষ্ট করেছেন। এ কথা আমি জন্মে ভুলব না। আপনার কি করা হয়?'

শ্রীশ। আমি কেরাণীগিরি করি। কাশীতে আমার শ্বশুরবাড়ী, তাই যাচ্ছি।

যুবক। কৈ, আপনি কাপড় চোপড় ত কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন না?

হরি খুড়া যুবককে বুঝাইয়া বলিলেন, 'শ্রীশের মাইনে কম, এমন কি, তার স্ত্রীকে কলকেতায় নিয়ে যেতে পারে না। শ্বশুরের যজমানী আছে, আর একটু জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, তাইতে দিন চ'লে যায়, কিন্তু তাঁরও আবার কন্যাদায় হয়ে পড়েছে। এ বৎসর কি কাপড় চোপড় কেনা কারও সাধ্য? পুরানো কাপড় শেলাই ক'রে সকলে দিন চালাচ্ছে।'

যুবক সহসা বলিয়া উঠিল, 'আপনি কিছু ভাববেন্ না, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, যত টাকা লাগে, আমি দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করিয়ে দেব।'

ইহাতে শ্রীশচন্দ্রের মুখ আরও শীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহা বোধ হয়, যুবক বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। 'আমার বলবার অর্থ যে, আমিও ব্রাহ্মণ। আপনিও ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে দান প্রতিদানে বাধা নেই। আপনার শ্বশুর মহাশয় যদি জ্যোতিষী হন, তবে নিশ্চয় (পকেটের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) এর একটা সন্ধান করে দিতে পারবেন বোধ হয়। তার মূল্য আমার খুব বেশী। আমি অকুণ্ঠিতভাবে যত টাকা লাগে খরচ ক'রব।'

হরি খুড়া। ফটোখানা দেখ্‌তে পারি কি?

যুবক শিহরিয়া বলিল, 'না, ঐটি আমার ধ্যানের জিনিস। যখন তাকে পাব, তখন নিশ্চয় দেখাব। ততক্ষণ কখনও না—না—'

যুবককে উৎসাহিত দেখিয়া জমিরুদ্দীন খাঁ বলিলেন, 'আপনি অত উতলা হবেন না। আমাদের 'হাতেমতাই' নামক 'কেচ্ছা'তে পড়েছি, যে অধ্যবসায় থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, পরী কোন্ ছার?'

যুবক। আমার বোধ হয় এই পরীই আমাকে ঈশ্বরের খবর বল্‌বে, নয় ত আমি এত পাগল হয়েছি কেন?

যুবকের অবস্থা পুনরায় অস্থির দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, 'আপনি একটু বরফ ও লেমোনেড্ খান।' যুবক স্বীকৃত হইলে শ্রীশ বাবু তাহা পান করাইয়া দিলেন। যুবক আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

জমিরুদ্দীন মুনশী হরি খুড়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া! ঘরে চুপ ক'রে বসে' থাকলে মানুষ কি রকম অপদার্থ হয়ে যায়, এটা তার প্রমাণ। মানুষ সংসারে যদি ঠিক খাড়া হ'তে চায়, তবে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম হুবহু করতে হবে। আমার বিবি দিনের বেলায় কেবল চরকা কাটে, জুতার ফিতা শেলাই করে, আমার দোকানের হিসাব রাখে, আর একটু অবসর পেলেই ফার্সি বয়েৎ আওড়ায়। রাত্রিকালে এত ঘুমায় যে, একদিন হাকিম ডাকতে হয়েছিল। এই জন্ত তার উপর আমি বড় খুসী, নচেৎ এত দিনে আমাদের দু'জনের মাথা খারাপ হয়ে যেত।' শ্রীশ বাবু! 'আপনার সন্তান হয়েছে?'

শ্রীশ। সম্ভাবনা হয়েছে।

জমিরুদ্দীন। এই বেলা থেকে সাবধান হবেন। লড়াইয়ের পর যারা জন্মাবে, তারা বীর পুরুষ হবে নিশ্চয়, তাদের খোরাক বাড়বে, দুমদাম্ ক'রে জিনিসপত্র ভাঙ্গবে।

শ্রীশ। আপনি পুনর্জ্জন্ম মানেন?

জমিরুদ্দীন। হিঁদুদের সঙ্গে থেকে থেকে ক্রমে মানতে হয়েছে। তবে ঠিক সেই সৈন্যগুলোই যে এসে জন্মাবে, তার কোনও প্রমাণ নেই; তবে তাদের মত লোক আসার কোনও আশ্চর্য্য নাই। এই দেখুন, আমাদের আরব দেশে হুছন হুসেনের যে যুদ্ধ বেধেছিল, তার পরে আমাদের দেশে ধর্ম্মবীর সব জন্মাতে লাগল। হূনদের যুদ্ধের পর রাজস্থানে কোন্ অগ্নিযজ্ঞে অগ্নিকুল রাজপুত অবতীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ সব 'তোয়ারিখে'র (ইতিহাসের) কথা, চালাকী নয়।

ইহা বলিয়া মুনশীজী স্বয়ং তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া স্বীয় উক্তির অর্থ নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিখুড়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা দেবীকে আহ্বান করিতেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সযত্নে যুবকের মাথায় বাতাস করিতেছিল। শেষ রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একবার সেই যুবক হঠাৎ উঠিয়া শ্রীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বায়স্কোপ দেখছ ত?' শ্রীশবাবু ঘুমন্ত অবস্থাতেই বলিয়াছিলেন, 'হঁ'।

৫

শ্রীশচন্দ্র পিতৃহীন। কলিকাতায় মেসে থাকিয়া একটা 'মার্চেন্ট'-আপিসে কেরাণীগিরি করে। বেতন ত্রিশ টাকা। মাতা অতি বৃদ্ধা। তিনি অন্য কতকগুলি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করেন। তাঁহার জন্য শ্রীশকে মাসে দশ

টাকা ধরিয়া দিতে হয়। বাকী টাকার মধ্যে শ্রীশের নিজের ভরণপোষণেই পনের টাকা ব্যয় হইত। কখনও কখনও হস্তে কপর্দ্দকও থাকিত না। সুতরাং পরমুদ্রা হিসাব করিতে গেলে শ্রীশচন্দ্রের সংসারে আর কাহাকেও 'আমার' বলিয়া পালন করিবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু 'আমার' বলিবার এক জন ছিল। সে শ্রীশের স্ত্রী। সেই চিরন্তন বিশ্ব-সম্বন্ধ প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিত। হাতে পয়সা না থাকিলেও শ্রীশচন্দ্র মাতাকে একবার প্রণাম করিয়া ও স্ত্রীকে একবার কোলে লইয়া দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সার্থকতা অনুভব করিত।

আজ শ্রীশের স্ত্রী বিনোদিনী স্বামীর শীর্ণ চেহারা ও জীর্ণ বাস দেখিয়া কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। এতদিন এক রকম চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'ছেলে হইলে কি দশা হইবে?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যাহা উপার্জ্জন, তাহাতে কাহাকেও এতদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনী বিবাহযোগ্যা। এমন কি, বিবাহ না দিলে আর চলে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদারচরিত লোক।

তিনি সরোজিনীকে অঙ্কে লইয়া উপবিষ্ট। সরোজিনীর বয়স বাড়িয়াও 'ছেলেমানুষী' যায় নাই। সে অতিশয় তন্বঙ্গী। কিন্তু কৃশা হইয়াও শীর্ণা নহে। একখানি ছবি। গৃহকর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই জানে, কিন্তু চিন্তা জানে না। দিদি যখন সরোজিনীকে আহার করিতে ডাকে, তখন সরোজিনী বলে, 'আমি খেয়েছি'। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঠিক কথা নয়। অনেক সময় খাদ্যের অকুলান হইলে সরোজিনী অর্দ্ধ-উপবাসিনী থাকে। কিন্তু সে এত হাস্যময়ী ও আনন্দময়ী যে, সে কথা কেহ বুঝিতে পারে না।

সরোজিনী সেটুকু দিদির নিকট শিখিয়াছিল। শ্রীশকে যাহা কিছু থালে সাজাইয়া দিয়া বিনোদিনী অনেক সময় উপবাসে থাকিত। সরোজিনীর সেটুকু মনে লাগিয়াছিল। প্রেমের রাজ্যে আত্মা কেন উপবাসী হয়, তাহার দর্শনশাস্ত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিতেন; কিন্তু সরোজিনী না বুঝিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সেটুকু তাহার চৈতন্যের একটা অংশ। তাহার জীবনের গতিও সেই দিকে। ধর্ম্মপরায়ণ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যের কন্যা বলিয়াই হউক, কিংবা চরিত্রবলেই হউক, সরোজিনী স্বভাবতঃ আত্মসংযত। দিদির চরিত্র ও তাহার চরিত্র একই বৃন্তে দুইটী পুষ্প। কিন্তু বিনোদিনী গম্ভীরা; সরোজিনী চঞ্চলা।

বিনোদিনী সংসারের দুঃখ অনুভব করিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় দুঃখের আভাস অন্তরে পাইয়াছিল। তাহার জীবনও দুঃখের দিকে গিয়াছিল। সরোজিনী দুঃখের কল্পনা করিতেই পারে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জামাতাকে সংসারের দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীশ বসিয়া শুনিতেছিল। বিনোদিনী অন্তরালে দাঁড়াইয়া। সরোজিনী তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'দেখ বাবা, তুমি ঘরে আসিয়াছ আজ কত আনন্দের দিন, কিন্তু তোমার যত্ন আদর করিবার উপায় আমার নাই। এমন দুর্বৎসর পড়িয়া গিয়াছে যে এক যোড়া নূতন কাপড় কিনিবার শক্তি আমার নাই। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত। অধর্ম্মের পথে লোকে অর্থ ব্যয় করিতেছে। পূর্ব্বে আমার দৈনিক চারি আনায় আহার চলিয়া যাইত, এখন তাহার চতুর্গুণ লাগে। তোমার শাশুড়ী যখন বাঁচিয়াছিলেন, তিনি কন্যা দুটীকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়ে বলিয়াছিলেন, 'এদের যেন কষ্ট না হয়'। কিন্তু তাহার শেষ ইচ্ছা আমি রাখিতে পারিলাম না।

পিতার সকরুণ কথা শুনিয়া সরোজিনীর মনে কি জাগিয়া উঠিল। সরোজিনী বলিল, 'বাবা, গৌরী যখন শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন, তখন কি খেতেন?'

পিতা হাসিয়া বলিলেন, 'মা, তাঁহারা দেবতা। দেবাদিদেব শিব মহাযোগী। তিনি অনাহারী সন্ন্যাসী। গৌরীও সেই পথের পথিক। আমরা সংসারী। অন্ন-বস্ত্রের ভিখারী।'

সরোজিনীর মনে লাগিল না। মধ্যে মধ্যে কুমারসম্ভবের টীকা পড়িয়া তাহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব! তপস্যাই মানব জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথ। তপস্যার বলে ক্ষুধা, নিদ্রা ও অভাবের জ্বালা অতিক্রম করিয়া আমরা আনন্দে ও সহজে জীবনের গন্তব্য পথে যাইতে পারি। তাই সরোজিনী বলিল, 'ভাল খেতে পারলে, ভাল কাপড় পরলেই কি মানুষ বড় হয়?'

ভট্টাচার্য্য। ঠিক তা নয়, কিন্তু সকলে ত তোর মত পাগলী নয়। অসুখ বিসুখ হ'লে ঔষধ চাই, ছেলে পুলে হ'লে তার লেখাপড়া চাই, দাস দাসী না হ'লে সেবা শুশ্রূষা করবে কে?

সরোজিনী। কেন? নিজে দাস দাসী হব, নিজে সেবা শুশ্রূষা করব, নিজে লেখা-পড়া শেখাব।

ভট্টাচার্য্য। তাতে মান থাকে না।

সরোজিনী। আমাদের অপমান করে, কাহার সাধ্য? আমরা সকলে মিলে কেউ তার সেবা করব না। কাজেই সে লজ্জা পেয়ে মরে যাবে, নয় ত নিজেই আমাদের মত পরিশ্রম করে' একলা একলা বসে কাঁদবে, আর চোখের জলে ভাত গিলবে।

৬

সরোজিনীর আদর্শে আঘাত লাগিয়াছিল। পিতার গৃহকর্ম্ম সবই সরোজিনী করে। সকালে উঠিয়া সে বাসন মাজে, উনুন জ্বালে, পিতার পূজার উপকরণ-সামগ্রী একত্র করিয়া দেয়, স্নান করিয়া চন্দন তুলসী লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখে, তৎপরে রন্ধনশালায় যায়, পিতার ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর আহার হইলে সে চারিটী যাহা কিছু পায়, মুখে দিয়া পুঁথি পড়িতে বসে। বিকালে সে দিদির চুল বাঁধিয়া দেয়, এবং কত রকম গল্প করে; তাহা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হয়। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া সরোজিনীর আবার সেই গৃহকর্ম্ম। সে নিদ্রার জন্য ব্যস্ত নহে, কিন্তু নিদ্রা তাহার জন্য ব্যস্ত। সে বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত নহে, কিন্তু বিশ্রাম তাহার পদতলে থাকিয়া গৌরবান্বিত। সে আহারের জন্য কখনও ভাবে না, কিন্তু যে সর্ব্বনিয়ন্তা জগতের আহার যোগাইয়া দেন, তিনি বোধ হয় অন্ততঃ একমুষ্টি আহার লইয়া সরোজিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং কোনও সময়, সময় পাইলে তাহা সরোজিনীর মুখে গুঁজিয়া দেন।

কেন? যে অন্তরে তপস্যারত, তাহার জন্য অন্তরের দেবতাও ব্যস্ত।

কিন্তু সে তথ্য সরোজিনী নিজেই জানিত না, তাহাই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মনোজগতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীশচন্দ্র তাহা খানিকটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'মা, তুমি আমার লক্ষ্মী; আমার ভয় হয়, তুমি এক দিন আমাকে ছাড়িয়া না যাও।'

সরোজিনী। কখনও না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্রীশচন্দ্র সাদরে সরোজিনীর হাত ধরিয়া বলিল, 'সরো, আমি আশীর্ব্বাদ করছি যে, তুমি মহাদেবের মত স্বামী পাও। তোমার অনেক কথায় আমার মোহ দূর হয়ে যায়। আমরা অনেক শুনেছি ও শিখেছি, কিন্তু আমাদের জীবন তোমার মত গঠিত হয় নাই।' ইহা বলিয়া শ্রীশ উঠিল।

সরোজিনী। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শ্রীশ। আমাদের অতিথিকে দেখতে।

সরোজিনী। উনি কি সত্যই পাগল?

শ্রীশ। বোধ হয়। তুমি ওঁর সমুখে বেরিও না।

সরোজিনী। না, কিন্তু আমার ভয় হয়, কোন সময় আমাকে দেখ্‌তে পান।

ভয়ের কারণ ছিল। আমাদের সেই মাথা-পাগলা যুবকটি এখন শ্রীশদের বাটীতে অতিথি। তিনি প্রায়ই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে তাঁহার 'পরী'র অনুসন্ধানে যাইতেন। সেই অবসরে সরোজিনী তাঁহার সমস্ত কাজ করিয়া দিত। গৃহমার্জ্জন, শয্যা পাতিয়া দেওয়া, আলোটুকু জ্বালিয়া দেওয়া, বইগুলি সাজান', কাপড় কোঁচান', জল খাবার ঠিক যায়গায় রাখিয়া পলায়ন, ইত্যাদি।

৭

আমাদের সেই মাথাপাগ্‌লা যুবকের নাম গৌরচন্দ্র। সে শ্রীশের সখ্যে বদ্ধ হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীশ তাহাকে ডাকে নাই। সে আপনিই ষ্টেশন হইতে শ্রীশের বাটীতে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার সেখানে আসিবার আর একটি কারণ যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্যোতির্ব্বেত্তা, এবং তিনি একটু চেষ্টা করিলে সেই বায়স্কোপের পরীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া গৌর পরম প্রীত হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকট পাতঞ্জল দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি বহি সংগ্রহ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া পাঠ করিত।

আজ পার্শ্বের ঘরে বসিয়া সরোজিনী ও তাহার পিতার কথোপকথন গৌরচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে পাগল গৌর একটু হাসিল। সরোজিনীকে দেখিবার জন্য তাহার দুর্দ্দমা অভিলাষ জন্মিল। কথাটা এই,—'এখানেও এক জন আমার মত কোনও একটা তপস্যা করিতেছে। সেও একটা কি চাহে। অতএব, সে আমারই পথের পথিক।'

হাসিটুকু মুখেই লাগিয়াছিল, তখন শ্রীশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীশ। তাই ত, আজ খুব সকালে সকালে এসেছেন।

গৌর। আজ আমি একটা নূতন ফন্দী এঁটেছি। আপনাদের চাকর কেউ নাই?

শ্রীশ ব্যথিতমুখে বলিল, 'না। আপনার কোনও দরকার আছে?'

গৌর। না। চুপ করে বসে' থেকে থেকে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। তাই স্থির করেছি যে, আপনাদের বাড়ীর চাকরের মত কর্ম্ম আমি ক'র্‌ব।

ইহা কল্পনা নহে, প্রতিজ্ঞা! অন্য কেহ হইলে শ্রীশ হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু গৌর এক জন অর্দ্ধ-উন্মাদ যুবক। হরি খুড়া ও জমিরুদ্দীন পরামর্শ দিলেন, 'উহাতে বাধা দিলে লোকটা খেপিয়া উঠিবে, অবশেষে পুলিস না ডাকিতে হয়।'

কাজেই ফাঁপরে পড়িয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীশ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

কি সুন্দর পরিচর্য্যা! লক্ষপতি হরিহর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরচন্দ্র কোথা হইতে শিখিল এ সব? কোথা হইতে তাহার কোমল দেহে বল আসিল, কে জানে? পাগল মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিল। সরোজিনী পিতার নিকট গিয়া বলিল, 'বাবা, এ পাগল খেটে খেটে মারা যাবে।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মস্তক কণ্ডূয়নপূর্ব্বক হাসিয়া বলিলেন, 'মহা বিপদে পড়েছি বটে। তবে তুমি একটু বিশ্রাম কর। তোমার বার আনা কর্ম্ম উনিই করছেন। এর একটা উপায় করতে হবে।'

সরোজিনী। কি?

ভট্টাচার্য্য। ওঁর বাড়ীতে চিঠি লিখে খবর নিতে হবে। কি জানি, ভাল মন্দ কিছু হয়ে পড়ে।

শ্রীশের স্ত্রী বিনোদিনী গৌরচন্দ্রের মতি গতি দেখিয়া হাসিয়া খুন! সে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া গৌরের সম্মুখে উপস্থিত। 'আজ থেকে তুমি আমার ভাই।'

গৌরের ইচ্ছা ছিল, আরও এক জন তাহার সম্মুখে আসে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সে বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল।

গৌর। আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি চমৎকার খিচুড়ী রাঁধ্‌তে পারি। এ কথা বোধ হয় আপনারা জানেন না।

বিনোদিনী। জানাই সম্ভব। যখন সব কাজই জান, তখন ওটা বাকী থাকিবে কেন?

বিনোদিনী। তবে যোগাড় করে' ফেলুন।

ইহা বলিয়া গৌর স্নান করিয়া আসিল, এবং একেবারে রন্ধনশালায় গিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীশচন্দ্র গৌরের পাগলামীর সঙ্গে যোগ দিয়া সরঞ্জামগুলি সম্মুখে রাখিল। কিন্তু সরোজিনী কৈ? সে পূর্ব্বের ন্যায় অদৃশ্য। সে কোনও প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে গৌরচন্দ্রের রন্ধনপটুতা পরীক্ষা করিতেছিল।

জমিরুদ্দী মুনশী বলিলেন, 'দেখ হরি ভায়া, তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, পরিশ্রমের মূল্য না বুঝ্‌লে মনুষ্যত্ব হয় না। পরিশ্রমের অর্থই পরীর জন্ম শ্রম। এই যে মায়া-ভরা সংসার, তাই দেখে শেখ্‌ সাদি বলেছেন—

করিম! ববক্‌সায় বর হাল মা,
কে হস্তম অসিরি কমন্দে হাওয়া।

অর্থাৎ, হে ভগবান, আমার হাল ত বড় খারাপ, কেন না, আমরা সংসার কারাগারে বন্দী।

হরি খুড়া। (নস্য লইয়া) ভগবান্‌ তাতে কি বল্লেন?

জমিরুদ্দীন। জেলের কয়েদী কেবল পরিশ্রম করিবে। পরিশ্রমে কারাগারের কষ্ট ভুলিয়া যায়, এবং বুদ্ধি থাকিলে শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়, যেমন আমার খোদাবক্স চাচার হইয়াছিল।

হরি খুড়া তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। গৌরচন্দ্রের বিবাহের লম্বা ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল, গরীবদের জন্য বহুসংখ্যক বস্ত্র ও আত্মীয়গণের জন্য কাশী সিল্‌ক্‌ ও অনেক পরিমাণের জুতার বরাদ্দ হইয়া গেলে, উভয় বন্ধু সানন্দে তাহাদের লাভ নির্ণয় করিতে বসিয়া গেলেন। এই মহৎ কর্ম্মে বিভাবরী পোহাইয়া গেল।

গৌরচন্দ্র অতি প্রত্যূষে আকাশের শুক্রতারা দেখিতেছিল। বাতায়ন-পার্শ্বে একটী লজ্জাবনতবদনা বালিকা আসিয়া কম্পিতস্বরে বলিল, 'আমার একটা মিনতি আছে।'

গৌর। কি সরোজিনী?

সরোজিনী। আমি বাবাকে ছেড়ে যেতে পারব না।

গৌর। প্রত্যেক পূজায় সময় বাবাকে দেখতে এস।

সরোজিনী। না। বরাবর এখানেই থাকব। এই বলিয়া সে কাঁদিতে বসিয়া গেল।

গৌর অবাক হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমর্পণ।

১

তিন বছরের ছেলে ধনাকে রাখিয়া স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন গগনের বয়স বেশী নয়; সুতরাং অনেকেই গগনকে পুনরায় বিবাহ করিতে, অন্ততঃ একটা সাঙ্গা করিতেও পরামর্শ দিল। গগনের কিন্তু ধারণা ছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেই ছেলে পর হইয়া যায়; তাহার উপর আর তেমন মমতা থাকে না। এই ধারণার বশে গগন কাহারও কথায় কান দিল না। বিবাহের কথা মনে হইলেই সে মাতৃহীন অসহায় শিশুটীর মুখের দিকে চাহিত; চাহিতে চাহিতে স্নেহ ও করুণায় তাহার প্রাণটা এমনই গলিয়া যাইত যে, বিবাহের কথাটাকে সে মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া দিত, এবং এই ক্ষুদ্র শিশুটীকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকেই একমাত্র সুখের কেন্দ্র করিয়া লইত। সে ধনাকে খাওয়াইয়া, আদর করিয়া, ঘুম পাড়াইয়া এমন একটা পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিত যে, হৃদয়ের কোনখানেই অতৃপ্তির একটুও ছায়া দেখিতে পাইত না।

কিন্তু একটা বড় গোল বাধিত মজুরী খাটিতে যাইবার সময়। ডোমের ছেলে, দিন-মজুরীই তাহার জীবিকা। সুতরাং মজুরী খাটিতে যাইবার সময় ছেলেটীকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না; যাহার তাহার কাছে রাখিয়া যাইতেও বিশ্বাস হইত না, ছেলেও থাকিত না। অগত্যা গগনকে ছেলে কোলে করিয়াই খাটিতে যাইতে হইত। সেখানে কাছে বসাইয়া রাখিয়া কাজ করিত। কিন্তু সব দিন গ্রামেই যে মজুরী জুটিত, তাহা নহে। ভিন্ন গ্রামে দুই এক মাইল দূরেও খাটিতে যাইতে হইত। সে দিন গগন ছেলে লইয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িত। মজুরী ছাড়িলে দিন চলে না, অথচ ছেলেকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াও যাইতে পারে না। সুতরাং এই মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গগন যখন কোনও দিকেই কূল কিনারা দেখিতে পাইল না, তখন কিনু সর্দারের মেয়ে সারী এই সমস্যা-সাগরের মধ্যে তাহাকে কূল দেখাইয়া দিল। সে গগনের কোল হইতে ছেলে লইয়া বলিল, 'ছেলের তরে তোর ভাবনা নাই খোড়ুই, তুই যা।'

যে ছেলেকে কাহারও কাছে রাখিয়া গগনের মনঃস্থির হইত না, সেই ছেলেকে সারীর কোলে দিয়া গগন নিশ্চিন্তমনে কাজে গেল।

সারী ওরফে সারদা বিধবা হইয়া অবধি বাপের বাড়ীতে ছিল। বাপ ছিল না; মা ছিল। মা ও মেয়ে ধুচুনী চুপড়ী বুনিয়া দিন নির্ব্বাহ করিত। ডোমের মেয়ে হইলেও সারী দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাহার উপর বয়স তখনও কুড়ি পার হয় নাই, সুতরাং ভরা যৌবনে তাহাকে একটু রূপসীই দেখাইত। আর এই রূপের জন্য সারীরও মনের ভিতর যে একটু গর্ব্ব ছিল না, তাহা নহে। তাহার চাল চলনে, কথায় বার্ত্তায় অন্তরের প্রচ্ছন্ন গর্ব্বটুকু বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিত। সে যখন ধুচুনী চুপড়ী লইয়া পাড়ায় বেচিতে যাইত, তখন পাড়ার ছোঁড়ারা কুটিল কটাক্ষ করিত। সারী কিন্তু তাহাদের সে কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এমনই গম্ভীরভাবে সদর্প পদক্ষেপে তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত। তাহারা কিন্তু জানিত না, সারীর এই সদম্ভ বিজয়-গৌরবেরও একটা পরাজয়-স্থান ছিল। সে পরাজয় হইত গগনের কাছে। গগনের গভীর উদাস দৃষ্টির সম্মুখে সারীর এই দম্ভ যেন সম্পূর্ণ ব্যাহত হইয়া লজ্জায় অপমানে মুসড়িয়া পড়িত। সারী আপনার রূপ যৌবন গর্ব্ব সকল দিয়া গগনের এই উদাস ভাবটাকে পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা প্রত্যাখ্যানের একটা গভীর বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অনেকেই ভাবিয়াছিল, সারীর মাও ঠিক করিয়াছিল, গগন সারীকে সাঙ্গা করিবে। কিন্তু গগন কোনও কথাই তুলিল না। অগত্যা সারীর মা নিজেই প্রকারান্তরে গগনের কাছে কথাটা পাড়িল; গগন কিন্তু তাহাতে এমন একটুও আগ্রহ দেখাইল না, যাহাতে সারীর মা তাহার উপর একটুও নির্ভর করিতে পারে। এ দিকে সারীর পাণিপ্রার্থীরও অভাব ছিল না; সারীর মা তাহাদের সহিত কাণাঘুষা করিতে লাগিল। সারী কিন্তু সে কাণাঘুষায় আদৌ যোগ দিল না; সে ধনার ভার লইয়া গগনকে একটা মস্ত অসুবিধার দায় হইতে মুক্তি দিল।

ইহাতে একটা গোল বাধিল। ধনাকে লইয়া সারী এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, সারা দিনে একটা চুপড়ী বুনিবার অবসরও তাহার রহিল না। সারীর মা ইহাতে খুব রাগ করিত, এবং রাগিয়া মেয়েকে এমন সব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিত, যাহা সারীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। অসহ্য হইলেও সারী তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যাইত।

ক্রমে এমন হইল যে, শুধু ভিন্ন গ্রামে নয়, গ্রামে কাজ করিতে যাইবার

সময়ও গগন ধনাকে সারীর কাছে রাখিয়া যাইত। ধনাও সারীকে ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিত না। সন্ধ্যার সময় গগন তাহাকে লইতে আসিলে, ধনা বাপের কাছে যাইতে অনেক আপত্তি প্রকাশ করিত; গগন অনেক রকমে ভুলাইয়া ছেলেকে ঘরে আনিত। যে দিন ভুলিত না, সে দিন ধনা সারীর কাছেই থাকিয়া যাইত।

৬

'ঘোড়ুই!'

'কেন সারী!'

'আমি কি তোর ছেলেকে বইবার কেনা বাঁদী?'

'না।'

'তবে যে তুই নিত্যি আমার কাছে ছেলে গছিয়ে দিয়ে যাস্?'

গগন কোনও উত্তর দিল না। সারী বলিল, 'আমি তোর ছেলে রাখতে পারব না।'

গগন উত্তর দিল, 'আচ্ছা।'

সারী একটু রাগিয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, 'তোর ছেলে দেখলে তো আমার দিন চলবে না। আমাকে পেটের ভাবনা ভাবতে হয়।'

গগন বলিল, 'তা হয়।'

ভ্রূকুটী করিয়া সারী বলিল, 'হয় ত কোন্ লজ্জায় ছেলে গছিয়ে দিয়ে যাস্?'

গগন খুব সহজ শান্তস্বরে উত্তর দিল, 'আর দেব না।'

সারী কিন্তু এমন উত্তর শুনিবার আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। সে ধনাকে খুব ভালবাসে, তাহার কাছে না রাখিলে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে, আর কে ধনাকে তাহার মত যত্ন করিবে, এইরূপ মোলায়েম উত্তর শুনিবার জন্যই সে আশা করিয়াছিল। কিন্তু গগন যখন সেরূপ উত্তরের কাছ দিয়াও গেল না, এবং ধনার পক্ষে সে যে এতটুকু প্রয়োজনীয়, এমন কোনও একটা কথাই বলিল না; এবং তাহার পরিবর্ত্তে গগন যেরূপ উত্তর দিল, তাহা সারীর পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। সুতরাং সে খুবই রাগিয়া উঠিল, এবং খুব চড়া গলায় বলিল, 'না দিয়ে গেলি আমার কি? তোর ছেলের পিছনে ছুটোছুটী করলে আমার চারটে হাত বেরুতো, না? লাভের মধ্যে সারা দিনে দু'টো পয়সার কাজ করবারও সময় পাই নে। খবরদার, কাল

সকালে যদি ছেলে দিতে যাবি, তবে তোরি এক দিন কি আমারি এক দিন।'

সারী রাগিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। গগন ধনাকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সকালে সারী দেখিল, ধনাকে কোলে লইয়া গগন কাজে যাইতেছে। ধনা যাইতে আপত্তি প্রকাশ করিতেছে, এবং কোল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অদূরবর্ত্তিনী সারীর দিকে কচি হাতখানি বার বার প্রসারিত করিয়া দিতেছে। গগন তাহাকে দুই হাতে শক্ত করিয়া জড়াইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। সারী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

সে দিন সারী খুব মনোযোগের সহিত কাজ করিলেও সমস্ত দিনে যখন একটা ধুচুনীও গড়িয়া শেষ করিতে পারিল না, তখন মা বলিল, 'হাঁলা, আজ তোর হ'য়েছে কি? একটা ধুচুনী নিয়েই যে বুড়ো হ'লি?'

সারী মায়ের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, এবং অসম্পূর্ণ ধুচুনীটা মায়ের কোলের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে উঠিয়া গেল। মা তখন আপন মনে কন্যা যে কিরূপে অন্নসংস্থান করিবে, প্রকাশ্যভাবে তাহারই চিন্তায় ব্যাপৃত হইল।

পর দিন সন্ধ্যার সময় গগন গিয়া ডাকিল, 'সারী!'

সারী কেরোসিনের ডিবায় নূতন পলিতা পরাইতেছিল। সে খুব গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিল, 'কি?'

গগন বলিল, 'ধনার বড্ড জ্বর হ'য়েছে।'

চমকিতভাবে মাথা তুলিয়া সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কখন্ জ্বর হ'লো?'

গগন বলিল, 'কাল রাত্তিরে একটু জ্বর হ'য়েছিল। আজ রায়েদের ঘর বাঁধতে গিয়েছিলাম, সারাদিন ভিজে মেঝেটার উপর প'ড়েছিল।'

সারী তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, 'রোগা ছেলে, সারাদিন ভিজে মেঝের ফেলে রেখেছিলি?'

ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গগন উত্তর করিল, 'কাজেই। কিন্তু আজ বিকেল থেকে জ্বরটা বড্ড তোড়ে এসেছে, যেন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে।'

সারী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় জ্বলন্ত চোখ দুইটা গগনের মুখের উপর স্থাপন করিল। গগন বলিল, 'একবার যাবি সারী?'

দৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইয়া সারী উত্তর করিল, 'না।'

একটু আমতা আমতা করিয়া গগন বলিল, 'একবার গেলে ভাল হ'তো।'

ভারী গলায় সারী বলিল, 'আমার সময় নাই।'

গগন মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছেলেটা জ্বরের ধমকে থেকে থেকে চমকে উঠ্‌ছে, আর তোকে ডাকছে।'

সারী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'তোর ছেলে আমাকে কেন ডাকে বল্‌ তো? আমি কি তোদের বাঁদী চাকরাণী?'

মৃদুস্বরে গগন বলিল, 'তুই তাকে খুব ভালবাসিস্—'

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া সারী বলিল, 'আমি একটুও ভালবাসি না। পরের ছেলেকে ভালবাসতে যাব কেন? আমি যদি ভালবাসতাম, তা হ'লে তুই—'

সারী আর বলিতে পারিল না, ক্রোধ ও অভিমানের উচ্ছ্বাসে গলাটা যেন চাপিয়া ধরিল। গগন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তাহার মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'রোগা ছেলেটাকে একা ফেলে দাঁড়িয়ে রইলি যে? আমি যেতে পারবো না, যাবো না।'

গগন মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। সারী ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া ডিবায় পলিতা পরাইতে লাগিল।

৩

ছিটে বেড়ার ছোট ঘর; কতক খড়ে, কতক তালপাতায় ছাওয়া। বর্ষার জলে তালপাতা পচিয়া গিয়াছিল, দরজার ছেঁচা বাঁশের আগড়টা ঘুণে ঝাঝরা করিয়া ফেলিয়াছিল। ঘরের ভিতর কেরোসিনের একটা ছোট ডিবে মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই পাশে একখানা ছেঁড়া ময়লা কাঁথায় জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হইয়া ধনা পড়িয়াছিল। মাথার কাছে গগন ছেলের মুখের উপর শঙ্কাকম্পিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া ছিল।

ধনা একবার চমকিয়া উঠিল। গগন ডাকিল, 'ধনা, ধনা!'

ধনা আরক্তদৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'সারী, সারী!'

ডাকিয়াই সে চক্ষু নিমীলিত করিয়া পুনর্ব্বার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। গগন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিল। স্তব্ধ ঘর দুইটিতে শুধু কেরোসিনের ডিবেটা ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

'ঘোড়ুই !'

উচ্চ আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের আগড়টা জোরে ঠেলিয়া সারী ঘরে ঢুকিল, এবং কোনও দিকে না চাহিয়াই একেবারে ধনার বিছানায় গিয়া বসিল। তার পর উপুড় হইয়া পড়িয়া, ধনার মুখের উপর মুখ রাখিয়া, উচ্চ করুণকণ্ঠে ডাকিল, 'ধনা, ধনু !'

ধনা চমকিয়া উঠিল, চোখ মেলিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, 'সারী !'

'এই যে আমি ধনু !'

সারী তাহাকে তুলিয়া কোলে শোয়াইল। তার পর গগনের দিকে ফিরিয়া তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিল, 'ডাক্তার এসেছিল ?'

গগন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল, 'না।'

সারী তীব্রদৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, 'শীগ্‌গীর ঠাকুর মশায়কে ডেকে আন্।'

ঠাকুর মশায় বা গোপাল ঠাকুর হাতুড়ে ডাক্তার হইলেও, গ্রামের মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্ন দরিদ্র শ্রেণীর ভিতর তাঁহার খুব পসার প্রতিপত্তি ছিল। ভিজিটের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না; আট আনা, এক টাকা, যে যাহা দিতে পারিত, তাহাই লইয়া চিকিৎসা করিতেন। ঔষধের মূল্যও তেমন বেশী ছিল না; আট আনা দামের মিকশ্চারের শিশিতে তিনি চার আনা লইতেন। তাই বলিয়া তাঁহার ঔষধ যে মন্দ ছিল, তাহা নহে; লোকে বলিত, ঠাকুর মশায়ের ওষুধ ডাকলে ডাক শোনে।

গগন ব্যস্তভাবে উঠিয়া লাঠী গাছটা লইয়া ঠাকুর মশায়কে ডাকিতে ছুটিল। সারী ধনাকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এবং গগনের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বার বার দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।

খানিক পরে গগনের পায়ের শব্দ পাইয়া সারীর মুখখানা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু গগন দ্বারে দাঁড়াইয়া যখন ম্লান মুখে জানাইল যে, সে ঠাকুর মশায়ের দেখা পায় নাই, তিনি সন্ধ্যার আগে মেয়ের বাড়ী গিয়াছেন, তখন সারীর মুখখানায় কে যেন কালী মাড়িয়া দিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই মেয়েমানুষেরও অধম। ঠাকুর মশাই ঘরে নাই বলিয়া ছেলেটার চিকিচ্ছে হবে না ? গণেশ বাবুকে কেন্ ডেকে আনলি ?'

কথাটা যে গগনের মনেও উঠে নাই, এমন নয়; কিন্তু গণেশ বাবুকে ডাকা

যে কতটা দুঃসাধ্য, তাহা সে জানিত। গণেশ বাবু পাশ করা ডাক্তার, গ্রামে এক টাকা ভিজিট হইলেও রাত্রিতে তিনি দুই টাকার ভিজিটের কম কিছুতেই আসিবেন না। দরিদ্রের কাতর ক্রন্দনেও তাঁহার নিয়মের অন্যথা হইবে না। জানিত বলিয়াই সে তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করে নাই, এবং সারীর তিরস্কার শুনিয়াও সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তখন খুব রাগ করিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, ছুটে যা।'

গগন ধীরে ধীরে কুলুঙ্গীর কাছে গিয়া একটী ছোট মাটীর ভাঁড় পাড়িল, এবং তাহার ভিতরকার পয়সাগুলি মাটীতে ঢালিয়া গণিতে বসিল। একবার, দুইবার, তিনবার গণিয়া পয়সাগুলি আবার ভাঁড়ে তুলিল, এবং পয়সা সমেত ভাঁড়টী কুলুঙ্গীতে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী জিজ্ঞাসা করিল 'দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

গগন বলিল, 'মোটে সাত আনা আছে।'

সারী বলিল, 'দুটো একটা টাকা নিয়েও ঘর করিস্ নে?'

সারীর দুই হাতে চার গাছা করিয়া আট গাছা রূপার চুড়ী ছিল। সে এক গাছা করিয়া রাখিয়া বাকী ছয় গাছা চুড়ী তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিল, এবং সেগুলা গগনের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'যা।'

গগন কিন্তু গেল না। সে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চুড়ীগুলার দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সারী তাহার ভাব দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, 'তোর পায়ে পড়ি যোড়হাত, ছুটে যা। ছেলেটা যে যায়।'

গগন চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার সারীর মুখের দিকে, আর বার রুগ্ন পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া, চুড়ীগুলা লইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইল।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ধনার মাথার শিয়রে বসিয়া থাকিয়া সারী যখন ধনাকে হাসিয়া কথা কহিতে এবং উঠিয়া বসিতে দেখিল, তখন সে তাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গগনকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, 'পারিস্ তো কালই ছেলেটাকে কারো ভিজে মাটীতে শুইয়ে রাখিস্।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সারী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গোপাল মাঝি আসিয়া বলিল, 'সারীর মা, যদি দশ কুটুমের খবর রাখতে হয়, তা হ'লে মেয়েটাকে একটু নজরে রাখ।'

সারীর মা আক্ষেপ করিয়া বলিল, 'মেয়েটাকে নিয়ে আমি যে কি

করি, তা তো ভেবে পাই না। বল্লেও কথা শোনে না। এই দেখ না, এক জায়গায় পাঁচ রাত্তির কাটিয়ে এল।'

গোপাল বলিল, 'সেই জন্যেই তো বলচি, শেষে দশ জনে দশ কথা বল্‌লে সেটা আমাদেরই গায়ে লাগবে। তুমি তো পর নও, আপন মামাতো ভেয়ের জেঠতুতো শালী।'

সারীর মা উত্তর করিল, 'তাতো বটেই ভাই, আপনার লোক হলেই বলতে হয়। আর অপরকেই বা বলতে হবে কেন, নিজের কথা নিজেই বল্‌ছি, সোমত্ত বয়সে এগুলো কি ভাল? দেখ না, গগনার ছেলেটাকে নিয়ে সারা দিনটা কাটাবে। কাজ কর্‌লে চার গণ্ডা পয়সার কাজ তো হয়; পেট তো চলে।'

বিজ্ঞের মত মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে গোপাল বলিল 'ঠিক কথাই তো। এমন করলে লোকেই বা বলবে কি? তুমি এক কাজ্ কর, সারার মা, মেয়েটার সাঙ্গা দিয়ে দাও।'

সারীর মা বলিল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছে। মনে ক'রেছিলুম, গগনার সঙ্গে সাঙ্গা দেব। কিন্তু ও তো তাতে রাজি নয়। ওর রাজি হ'বারই বা দরকার কি। পরকে দিয়ে ছেলে মানুষ ক'রে নিচ্চে, কিছুই তো আটকাচ্চে না, কেন সাঙ্গা করবে?'

গোপাল বলিল, 'সাঙ্গাই যদি দাও, ছেলের অভাব কি? চক্করপুরে আমার শালার ছেলে বারু. ছেলে তো নয়, যেন একটা অসুর, বেতের কাজে রোজ দশ গণ্ডা পয়সা ঘরে আনে। বল তো আমি কথা কই।'

সারীর মা ইহাতে সম্মতি দিল। কিন্তু বয়ঃস্থা মেয়ের সাঙ্গায় শুধু তাহার মতই যথেষ্ট নয়, মেয়েরও সম্মতির দরকার। সুতরাং সে সারাকে ডাকিয়া গোপালের সম্মুখেই তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল। সারা কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিল না। গোপাল তাহাকে সাঙ্গার প্রয়োজনীয়তা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। সারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিল। কথা শেষ হইলে নিরুত্তরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সারার মা তখন গোপালকে অনুরোধ করিল, 'ওর মত আছে। তুমি চেষ্টা দেখ ভাই মামা, যাতে এইটী হয়, তা তোমাকেই কত্তে হবে।'

গোপাল তাহাকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন সকালে গগন ধনাকে দিতে আসিলে সারা ছেলে তো লইলই না,

অধিকন্তু রাগিয়া গগনকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেন বল দেখি ছেলে দিতে আসিস্? আমি কি তোর ছেলে দেখবার বাঁদী? নিজে মানুষ কত্তে না পারিস্, সাঙ্গা কর, সে ক্ষমতা না থাকে, ছেলে বিলিয়ে দে।'

গগন অবনতমুখে ছেলে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। মেয়ের কথা শুনিয়া মা সহর্ষে বলিল, 'এই দেখ্ দেখি, এদ্দিনে তোর বুদ্ধি হয়েছে। পরের ছেলে নিয়ে কেন এত? এখন চুড়ীগুলো আদায়ের চেষ্টা দেখ্।'

পর দিন গগন ছেলে কোলে লইয়া যখন কাজে যাইতেছিল, তখন ক্ষুধার্ত্ত বাজ যেমন মাতার পক্ষাবরণ হইতে পক্ষিশাবককে ছোঁ মারিয়া লয়, তেমনই ভাবে হঠাৎ কোথা হইতে সারী আসিয়া গগনের কোল হইতে ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইল। গগন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারী তাহার মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, 'মরতে হয় নিজে মরবি, ছেলেটাকে কেন মারিস্ বল তো? ওর মা নাই ব'লে কি ওকে খুন করবি?'

ধনাকে লইয়া সারী চলিয়া গেল। গগন কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

৫

ধনার অসুখের পর হইতেই গগন বুঝিতে পারিয়াছিল, যে ছেলের উপর মমতাপ্রযুক্ত সে পুনরায় বিবাহে অনিচ্ছুক, সেই ছেলেকে মানুষ করিবার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে গগন এটাও ভাবিয়াছিল যে, ইহা করিতে হইলে সারীকেই সাঙ্গা করা উচিত। সে কয় দিন হইতেই কথাটা নিজের মনেই তোলাপাড়া করিতেছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় গগন ধনাকে আনিতে গেলে সারী খুব তিরস্কার করিয়া বলিল, 'ছেলেটার কি দশা ক'রেছিস? এই সেদিন মরা বাঁচল না? এখন ওকে কত সাবধান সতর্কে রাখতে হবে।'

গগন বলিল, 'দেখছি সারী, একটা মেয়েমানুষ না হ'লে আর ঘর চলে না।'

'অচলটাই বা হ'লো কিসে?'

'আমার অচল না হ'লেও ছেলেটার চলে না।'

সারী বলিল, 'ওঃ, ছেলে মানুষ করবার ত'রেই বুঝি সাঙ্গা কত্তে চাস্?'

গগন উত্তর দিল, 'কাজেই।'

সারী মুখখানা ভার করিয়া বলিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর, ছেলেটাকে বিলিয়ে দে।'

'কে নেবে ?'

'আমি নেব, দিবি ?'

মৃদু হাসিয়া গগন বলিল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছে, তোকেই ওর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।'

বলিয়াই গগন সারীর মুখের উপর সহাস্য মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সারীর মুখে একটা অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সারী নিঃশব্দে ধনাকে তাহার কোলে দিয়া চলিয়া গেল। গগন ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল।

মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁলা, গগন কি বলছিল ? ও সাঙ্গা করবে ?'

গম্ভীরভাবে সারী উত্তর দিল, 'হুঁ।'

মা ঈষৎ উৎফুল্লভাবে বলিল 'বেশ তো, ত যদি করে—'

বাধা দিয়া সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'তা হ'লে কি হবে ?'

'তা হ'লে আমার আর চকরপুরে যাবার দরকার কি ?'

'কেন বল দেখি ?'

'কেন আবার কি লো ? পাড়ায় ঘরে চোখের সামনে থাকবি। আমারি আর কটা বেটা পুত্তুর আছে ? এই তো বয়েস, মুখে জল দেবার কেউ নাই।'

সারী বলিল, 'তোমার মুখে জল দেবার তরে এক জনের ছেলে মানুষ করবার বাঁদী হ'তে বল নাকি ?'

বিস্ময়ের সহিত মা বলিল, 'ওমা, তা তুই কোন্ পরের ছেলে মানুষ কচ্ছস না ?'

গম্ভীরভাবে সারী উত্তর দিল, 'সে কথা আলাদা।'

বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিল 'তা হ'লে গগনকে তোর পছন্দ নয় ?'

স্বরে জোর দিয়া সারী বলিল, 'না।'

মেয়ের কথা শুনিয়া মায়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কেন না, সে জানিত, গগনকে সারী ভালবাসে। যে দিন হইতে গগনের বৌ মারা গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সারী যেন গগনের উপর ভালবাসার একটা প্রবল আগ্রহ লইয়া খুব আকুলভাবেই দিন কাটাইতেছে। তাহার ছেলেটাকে লইয়া মানুষ করিতেছে, তাহার একটু অসুবিধা দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া সে অসুবিধাটুকু দূর করিয়া দিতেছে। আজ সারী সেই গগনকে সাঙ্গা করিতে অসম্মত শুনিয়া বুড়ী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল।

আসল কথা, গগনকে সাঙ্গা করিবার ইচ্ছা যে সারীর ছিল না, তাহা নহে; বরং সে জন্ম তাহার প্রাণের ভিতর বেশ একটু আগ্রহই ছিল। আর সেই আগ্রহটুকুই যে তাহাকে প্রথমে ধনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল, ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। এই ছেলেটাই গগনের সর্ব্বস্ব; সুতরাং এই সর্ব্বস্ব-টুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই সে এতটা আকুলতা প্রকাশ করিত। কিন্তু এক দিন গগনের একটা কথা তাহার প্রাণে এমন খোঁচার মত বিঁধিল যে, তাহার চিত্তটা গগনের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। গগন যে দিন স্পষ্টভাবে তাহার নিকট প্রকাশ করিল যে, শুধু ছেলেটাকে মানুষ করিবার জন্যই সে সারীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, সে দিন ভালবাসার অপমান তীব্র অভিমানের আকারে তাহার সমগ্র হৃদয়টাকে অধিকার করিয়া বসিল। ছি ছি, এই কি তাহার ভালবাসার প্রতিদান! তাহার জন্ম গগন তাহাকে চাহে না, শুধু ছেলেটার খাতিরে চায়! সারী এতটা অপমান মাথা পাতিয়া লইবে? ধিক তাহাকে!

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সারী স্থির করিল, প্রাণ থাকিতে গগনের ঘরে যাইবে না।

মা মেয়েকে আরও দুই চারিবার বুঝাইল, কিন্তু মেয়ে যখন কিছুতেই বুঝিল না, অধিকন্তু গগনের কথা তুলিলেই সে রাগিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে অগত্যা চকরপুরেই সাঙ্গার কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলিল।

গগনের কানেও কথাটা গেল। শুনিয়া সে যেন বজ্রাহত হইয়া পড়িল। সে এক দিন সারীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর সাঙ্গা হবে সারী?'

কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও গগনের গলা যেন বাধিয়া যাইতে লাগিল। সারীও যে তাহার এ ভাবটুকু লক্ষ্য করিতে পারিল না, এমন নয়; কিন্তু ইহাতে সে যেন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় আনন্দ অনুভব করিল, মুখে জোর করিয়া হাসি আনিয়া উত্তর দিল, 'হাঁ, হবে।'

গগন আর কিছু বলিল না; শুধু সারীর মুখের উপর বিষাদ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সারী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

'তোর জর হ'য়েচে ষোড়ই?'

'হাঁ।'

'ক'দিন?'

'আজ পাঁচ দিন।'

'আমাকে তো কৈ একদিনও বলিস্ নি?'

'ব'লে কি হবে?'

সারী অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, 'কি হবে? আমি কি তোর এতই পর?'

গগন কোনও উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল। সারী জিজ্ঞাসা করিল, 'ওষুধ খাচ্ছিস্?'

গগন বলিল, 'না।'

সারী স্তব্ধদৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে গগন জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে—কবে তোর—'

গগন কথাটা যেন শেষ করিতে পারিল না। সারী রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমার—কি? সাঙ্গা? পরশু।'

গগন পাশ ফিরিয়া শুইল। ধীরে ধীরে বলিল, 'একটা কথা তোর মনে আছে?'

'কি কথা?'

'ধনাকে তুই নিবি ব'লেছিলি।'

'ব'লেছিলাম।'

'কথাটা রাখিস্ ওকে তোর হাতেই বিলিয়ে দিয়ে গেলাম।'

'তুই কোথায় যাবি?'

ম্লান হাসি হাসিয়া গগন বলিল, 'তা জানি না। এক ঘড়া জল তুলে দিয়ে যা।'

'আমার বোয়ে গেছে' বলিয়া সারী এক প্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিকালে সারী আসিয়া দেখিল, গগনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিয়াছে. গলার ভিতর একটা ঘড়-ঘড় শব্দ হইতেছে, কথাগুলা যেন জড়াইয়া আসিয়াছে। সারী ছুটিয়া গিয়া ঠাকুর মশায়কে ডাকিয়া আনিল। ঠাকুর মশায় আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, বুকে চোঙ্গ বসাইয়া রোগ পরীক্ষা করিলেন। তার পর মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, 'ডবল নিমুনিয়া, সন্নিপাতে ঘিরে ধরেছে।'

ঠাকুর মশায় ঔষধ দিয়া গেলেন। সারী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গগনকে ঔষধ খাওয়াইল। শেষরাত্রিতে ঔষধ চোয়াল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সকালে দুই এক জন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিল। ঠাকুর মশায় হাত দেখিয়া বলিলেন, 'আড়াই প্রহর।'

ধনাকে কোলে লইয়া সারী শুষ্কদৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গগনের অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। সারীর মা আসিয়া মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'আচ্ছা সারী, কাল তোর যেমন হোক একটা শুভকাজ, আর আজ তুই মড়া কোলে ক'রে ব'সে আছিস্?'

কথাটা বুঝি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান গগনের কানে গেল। কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা তুলিয়া সে সারীর মুখের দিকে চাহিল সারী দাঁতে দাঁত চাপিয়া আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, এবং গগনের অবসন্ন হাতখানা আপনার হাতের উপর লইয়া স্থির উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, 'ধর্ম্ম সাক্ষী ঘোড়ুই, তোর সঙ্গে আজ আমার সাঙ্গা হ'য়ে গেল। আজ থেকে ধনা আমার সতীনপো।'

গগনের পাণ্ডুর অধরপ্রান্ত মৃদু হাস্য রেখায় রঞ্জিত হইল। সমাগত প্রতিবেশীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের সেই স্তব্ধতার মধ্যে গগন অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করিল।

হাতের চুড়ী দুই গাছা খুলিয়া ফেলিয়া সারী আর্ত্তনাদ করিয়া গগনের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন।—প্রথমেই 'শরৎ-শ্রী' নামক ছবি;—শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত। যে ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্রকর 'শরৎ-শ্রী'র কল্পনা করিয়াছেন, তাহার আকৃতি দেখিয়া মিশরের মসীর আধার মনে পড়ে। শরতে চরাচর জাগে, আকাশে বিশ্বে নব-জীবন-রাগের ঢেউ খেলিয়া যায়। এ 'শরৎ শ্রী'তে সে নবজীবনের দ্যোতনা নাই।—কল্পনায় অজন্তার ছায়া আছে। মেঘগুলির কল্পনাও অলৌকিক। অলৌকিক চিত্রে অবশ্য সে স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এখনকার চিত্রকর প্রাচীন যুগের স্বপ্ন দেখিতে পারেন, এবং সে স্বপ্ন সেকালের রীতিতে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, নন্দবাবু চিত্রে তাহার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার তুলিকায় সজীব সৃষ্টির আশা করি।—নন্দবাবু বহুকাল পরে গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন;—অবনীন্দ্র বাবুর 'প্যাটেণ্ট' লতানে আঙ্গুল আঁকিয়াছেন। পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উহা কাহারও দন্তস্ফুট করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা; বাঙ্গালা হরফে লেখা; অভিধানে শব্দগুলির অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সমবায়ে যে বাক্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বাক্য সমূহের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব বা লেখকের বক্তব্য—যদি কিছু থাকে—প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার নাগাল পাইলাম না। এগুলি লিখিয়া লাভ কি, ছাপিয়া ফল কি? আমরা

বোকা ও মূর্খ হইতে পারি, কিন্তু 'প্রবাসী'র বা সাধারণ মাসিকের অন্ততঃ পৌনে পনর আনা পাঠক যে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র শীল বা রামানন্দ নন, তাহা ত নিশ্চিত! জানাইবার—বুঝাইবার—পড়াইয়া শিখাইবার ও লিখিয়া নিজের মনের ভাব পাঠককে দিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই ত লেখা ও ছাপা? সুরেশ-কূটের রচনা করিয়া পাঠক সম্প্রদায়কে ভাবাইয়া, ঘামাইয়া, কাঁদাইয়া, 'নাজেহাল' ও নিরাশ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি সাফল্য ও কি আনন্দ লাভ করিলেন? পাঠককে 'ঠকাইয়া' যে সুখ, তাহা ত 'বরযাত্র ঠকানে' প্রথেই আবদ্ধ ছিল। তাহাই কি আমাদের সাহিত্যের আসরেও জাঁকাইয়া বসিবে? শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' 'ইরাগা সাধনে'র মত তত সাংঘাতিক নয়। ইহা কিছু কিছু বুঝা যায়। মনে হয়, 'ধর্ম্ম' ও 'সাহিত্যে'র ক্ষেত্র জরীপ করিয়া এত অল্প পরিসরে তাহার চৌহদ্দী নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। —আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় এক শ্রেণীর প্রবন্ধ গজাইতেছে। তাহাতে দর্শন থাকে, কাব্য থাকে; সত্যনির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাও থাকে। কিন্তু তত্ত্ব-নির্ণয় ও তাহার নির্দ্দেশ করিবার জন্য যেরূপ ধরা-বাঁধা নিয়মের ভিতর থাকিতে হয়, যেরূপ চাঁছা-ছোলা, নিরলঙ্কার, প্রকৃত-বস্তু-নির্দ্দেশক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, এ শ্রেণীর রচনায় সে সকল বন্ধনের কোনও আপদ-বালাই নাই। 'লাগে তুক্, না লাগে তাক্!' হয় সত্য, নয় কাব্য! হয় তত্ত্ব, নয় কথার খেয়াল! ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই। তিন পৃষ্ঠায়, সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিমধুর উক্তি শুনিয়া যাও। 'সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনের অতীত যে আনন্দ সেটা যেমন জগৎস্রষ্টার শিল্পচাতুরীর মধ্যে তাঁর বিশ্ববীণার ঝঙ্কারে তাঁর লুকোচুরি খেলার মধ্যে ভক্ত দেখতে পান'—ইহা নিশ্চয়ই দর্শনের রীতি ও ভাষা নয়, দার্শনিক সত্যও নয়; কাব্যও নয়, কবিত্বও নয়। ইহাতে অনেকগুলি অব্যক্ত তত্ত্ব আছে। সেগুলি কেবল বাক্য, প্রতিপন্ন নয়। সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ আছে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। প্রয়োজনের অতীত আনন্দ সৃষ্টিতে আছে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। থাকিতে পারে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। তুমি যাহাকে প্রয়োজনের অতীত মনে কর, তাহা 'প্রয়োজনের অতীত' নয়; কারণ, জগতে যাহা আছে, তাহা 'প্রয়োজনের অতীত' নয়, ইহাও একটা তর্ক। বিশ্বে '[illegible]' বলিয়া কিছু আছে কি না, ইহাও একটা তর্ক। এই শ্রেণীর তথাকথিত 'মিষ্টিক্' রচনায় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না, এ সকল তর্কের মীমাংসা করিতে হয় না। যদি যুক্তির আলোকে স্বরূপ দেখিতে যাও, কুহেলিকার মত আকাশে মিলাইয়া যায়। যদি কাব্যের মত ভোগ করিতে চাও, অপঘাতে মৃত দর্শনের ভূত আসিয়া ভয় দেখায়! ইহা মৎস্য-নারীর মত অর্দ্ধেক মানুষ—অর্দ্ধেক মাছ। এ হিসাবে এই শ্রেণীর রচনায় 'তত্ত্বে'র অস্তিত্ব আছে; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বিচারে বাস্তব-জগতে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই।—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনুভবগুলি সাহিত্যে যে স্থান পায়, তাহার কারণ তাহাদের জনকের গৌরব। প্রকৃতপক্ষে সে পথে দার্শনিক সত্য বা কোনও তত্ত্ব বিবৃত হইতে পারে না; চেষ্টা করিলেও তাহা সত্য-বাচনের স্থান অধিকার করিতে পারে না। 'জগৎ-স্রষ্টার শিল্পচাতুরী' ও তাঁর 'বিশ্ববীণার ঝঙ্কা'র অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে। উহার চর্ব্বিত-চর্ব্বণে নিবন্ধকারেরা কি সুখ পান, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখিয়া আমাদের 'দা দিন্-

দিন্‌' করে। 'বিশ্বদেবতার বিরহ ভুবনে ভুবনে অহরহ যে ক্রন্দন তোলে', তাহা পড়িতে মন্দ নয়; কিন্তু ইহার কোনও 'মানে' আছে কি?—আমরা এই রচনাটিকে উপলক্ষ করিয়া এই শ্রেণীর কুয়াসার চাদায় ও অন্ধকারের পোড়েনে বোনা রচনার প্রকৃতি-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিলাম। শ্রীমতী সীতা দেবীর 'অচিন্ পাখী' চলনসই গল্প। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মরাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ' সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীশান্তা দেবীর 'আঁধারের যাত্রী' নামক গল্পটি বেশ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'ম্যালেরিয়ার বাহন-ধ্বংসের উপায়ে' যে উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সেই ছারপোকার মহৌষধের মত।—এক জন বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, 'এক টাকা পাঠাও, ছারপোকার অব্যর্থ মহৌষধ পাইবে।' এক ভদ্রলোক আনাইয়া দেখিলেন,—দুই টুকরা কাঠ ও এক প্রস্থ উপদেশ—'ছারপোকাটি ধর, একখানি কাঠে রাখ, আর একখানি কাঠ দিয়া চাপিয়া মার!' 'চ'—স্বাক্ষরকারীর 'গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরম্‌' সুখপাঠ্য। শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনের 'রায় বাহাদুর' নামক ছবিখানি চমৎকার! এই শ্রেণীর 'রায় বাহাদুর'-জাতীয়েরা দেশের 'নেতা' হইবার চেষ্টা করিতেছে। চিত্রকর তাহা-দিগকে চিনাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর উপকার করিয়াছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গিরিরাণী' কবিতায় মৌলিকতা আছে। ভাষার ও ভঙ্গীর মুদ্রাদোষের আতিশয্য অতিক্রম করিয়া গিরিরাণীর ভাব পাঠকের মন স্পর্শ করে। লেখক 'মাতলি'র সঙ্গে 'মাতুলই'র মিল করিয়াছেন। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ'—তাই 'উৎসুক' সত্যেন্দ্রনাথের মন উঠে নাই, তাহাকে 'উৎসুকী' করিয়া ছাড়িয়াছেন। 'উৎসুকী' চলিত বাঙ্গালাও নয়, সংস্কৃতও নয়, মিলের জন্য অপরিহার্য্যও নয়। তথাপি? 'একটা নূতন কিছু করো না, 'জানই আমার সকল কাজেই Originality'! 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র 'জাতির উত্থানে প্রধান কাজ' ও 'পরাজিত হওয়া কি ভারতের বিশেষত্ব' আমরা সকল বাঙ্গালীকে—বিশেষতঃ সুরেন্দ্রবাবুকে পড়িতে বলি। শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে আর্য্য-উপনিবেশ-স্থাপন' প্রবন্ধে সংক্ষেপে 'কারমাইকেল-অধ্যাপকের বক্তৃতার সারাংশ' বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছেন। Lecture কি 'বক্তৃতা'? 'উপদেশ' নয়? অন্ততঃ—'বিবৃতি' হইতে পারে না?

ভারতী। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক 'অঙ্কিত' 'ঘরের বাহিরে' নামক 'ছবি'-খানি দেখিয়া আমরা সত্যই এই চলিত শব্দের যুগেও 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা কি ছবি? রঙ্গ যেমনই হউক, রঙ্গ বটে। সেই রঙ্গের লেপও এমন লোম-হর্ষণ হয়? রঙ্গকেও এমন বীভৎস-ভাবে 'ধ্যাবড়ানো' যায়? তাহাও 'ছবি' হয়, এবং ছাপাইয়া দেখানো চলে? শ্রী-হীন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘেন্না'র স্বাভাবিকতার শ্রী দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'দ্যৌ মে পিতা মাতা পৃথিবী'র শিরোনাম লেখকের ভাষায় 'হইতেছে যাহা বেশী জানা, বেশী স্পষ্ট, আর ভিতরটা [অর্থাৎ প্রবন্ধটা] সন্দেহের জায়গা, সেখানকার সবই আবছায়া।' ইহা বলিলেই সকল বলা হইল। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবীর 'অনাদি মন্ত্রে' কবিত্ব নাই। মন্ত্রে সত্যই থাকে; কবিত্ব যদি থাকে, তাহা ফাউ। কিন্তু 'খণ্ডিবারে' মন্ত্রও বহন করিতে পারিতেছে না, একটু 'কাবু' হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ভাসের 'পঞ্চরাত্রে'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'কান্দী

ফুলের প্রথম শ্লোকটি সুন্দর। অবশিষ্ট টানিয়া বোনা কষ্টকল্পনা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শরতের গান' কল্পনায় সমৃদ্ধ—উপভোগ্য। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'বাসকাবাদি'তে 'আর্টের অভিব্যক্তি ও আধুনিক আর্টের রূপ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সন্দেশ। আশ্বিন।—রঙীন ছবিখানি সুন্দর। সন্দেশের পাঠকগণের অভিভাবকেরাও দেখিয়া প্রফুল্ল হইবেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কাঠপুতুলের বিয়ে' সুলিখিত। চীন দেশের গল্প—'ওয়াং' মন্দ নয়, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাটাও চীনে হইয়া গিয়াছে। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় শিশুদের উপযোগী করিয়া 'চন্দ্রবংশের উপাখ্যান' লিখিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি শিশু-সাহিত্যে দান করিয়া কুলদাবাবু দেশের উপকার করিতেছেন। 'মেঘ-বৃষ্টি' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প 'সোমিলক' উল্লেখযোগ্য। 'জানোয়ারের ঘুম' আশ্বিনের 'সন্দেশে'র সেরা প্রবন্ধ। প্রাণিজগতের তথ্যগুলি লেখক গল্পের মত জমাইয়া বলিয়াছেন। 'কিম্ভূত' শিশু পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবে।

উদ্বোধন। আশ্বিন।—শ্রীস্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', শ্রীস্বামী বাসুদেবানন্দের 'ভারতীয় শিল্প', শ্রীবিহারীলাল সরকারের 'শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব' ও শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্রের 'শিবস্তব'—চারিটি সন্দর্ভই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। একটি নূতন প্রবন্ধ আছে—স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের 'What is Religion' নামক উপদেশ সন্দর্ভের অনুবাদ—'ধর্ম্ম জিনিসটা কি?' তাহাও অসমাপ্ত—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সৌরভ। আশ্বিন।—এই সংখ্যায় 'সৌরভে'র ষষ্ঠ বর্ষ সমাপ্ত হইল। চাণক্য বলেন,—'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।' আশ্বিনের 'সৌরভে'র ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা ও অসারতা দেখিয়া মনে হইতেছে, ময়মনসিংহে চাণক্য-নীতি চলিত নাই। তাহা হইলে সম্পাদক নিশ্চয়ই সাবধান হইতেন। মোট চল্লিশ পৃষ্ঠা কাগজে পাঁচটি গল্প। একটি ফুলে কবিতা ধরিলে গল্পের সংখ্যা ছয় গণ্ডায় উঠিতে পারে।—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছয় জন লেখক ও এক জন সম্পাদক এই ভেদ-ভিন্ন দেশে এমন এক-মত হইয়াছেন! গল্পগুলি এক ছাঁচে ঢালা। এমন অদ্ভুত সাম্য এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে প্রায় দেখা যায় না! সকলে যেন পরামর্শ করিয়া সাহিত্য-শ্রীর ও মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার অপমান করিয়াছেন। 'শেষ অঞ্জলি' গল্পে লেখক কল্পনার 'অন্তর্জ্জলি' করিয়াছেন। নায়কের 'নিরুপম' নামটা সার্থক হইয়াছে, কারণ সত্যই তাহার উপমা নাই—এই নূতন বঙ্কিমের 'নিরুপম' ঠিক 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপের মত। তাহারও বেলা নাম্নী এক শৈবলিনী ছিল। ময়মনসিংহের প্রতাপও শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্য ইন্দুর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। অতএব, ইন্দুই এই অদ্ভুত চন্দ্রশেখরের সুন্দরী। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়-সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে কত আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ময়মনসিংহের প্রতাপ অত্যন্ত সুবোধ ও সুশীল—সে বন্ধুগৃহে, বন্ধুর মাতার আতিথ্যের ছায়ায়, বন্ধুর ভগিনীর মুখে মোট একটিবার 'সুন্দর অভিমান' গান শুনিয়া তাহাকে 'মনপ্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে' ফেলিয়াছিল! অনেক অস্বাভাবিক ও আকস্মিক প্রেমের কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু এমন 'তড়িঘড়ি' প্রেমে-পড়ার কাহিনী কখনও শুনি নাই! এই 'ক্ষণ'-জন্মা প্রেম 'নিরুপম' নায়কের মনে ফল্গুর মত বাড়িতে লাগিল—ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা, কিন্তু মেঘনার মত ভয়ঙ্কর, পদ্মার মত কর্ম্মনাশা। এ দিকে,

'বিয়ে করেই পুত্র-কন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা!'

সুতরাং 'পাঁচটা বছরে'র মধ্যে নায়কের 'ঘর শিশুর কলকণ্ঠে মুখরিত' হইয়া উঠিল। খোকার বাপ বলিতেছেন—'মা হাসতেন, ইন্দু হাসত।' আমরাও কেন না হাসিতেছি?—সে কথা যাক, এখন গল্প শুনুন। মা বলিলেন, 'কোথা হতে একটু ঘুরে আয় না।' সুতরাং প্রতাপ পুরীধামে রওনা হইলেন। একদিন পুরীর সমুদ্রতীরে অকস্মাৎ এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের বাড়ী খুঁজিতেছিল। প্রতাপ হোমিওপ্যাথী জানিত। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিল। প্রতাপের মুখেই শেষটা শুনুন—'নিকটে একখানা ছোট সুন্দর বাসায় আমরা ঢুকে পড়লুম। দেখি, একটী যুবতী শয্যায় পড়ে আছে। দেহ অত্যন্ত জীর্ণ, হাত ধরে বুঝলুম—শরীর অসাড় হয়ে আসছে। * * হঠাৎ 'উঃ' করে পাশ ফিরতেই মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আমার কাপড় রাঙ্গা করে দিল। তাড়াতাড়ি হাত ধরে বুঝলুম—সব শেষ। বৃদ্ধের নিকট যুবতীর পরিচয় পাইয়া জানিলাম—বিপদের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী একটী বৃদ্ধা ঝি ও এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর হাতে তাঁহাদের এই যুবতী বধূকে রাখিয়া আজ ভুবনেশ্বরে চলিয়া গিয়াছে। বুঝলেম, এ কে? এ যে আমারই কৃত অত্যাচারের শেষফল; সে তার বুকের রক্ত দিয়ে আমায় শেষ অঞ্জলি দিয়ে গেল ফণী।' * * * 'এইখানে নিরুপম নীরব হইল। দেখিলাম তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ। তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ঘোর অন্ধকার।' প্রতাপ ত 'বুঝলেন'; পাঠক! তুমিও নিশ্চয় বুঝিলে, এ যুবতী শৈবলিনী না হইয়া যায় না। 'ফণী' কে, জান? সাপ নয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খানিকটা গুনিয়াই গল্পটির শিরে দংশন করিত। এ ফণী আমাদের প্রেমিক প্রতাপের বন্ধু। সেই ফণী উপসংহারে সাক্ষ্য দিতেছে।—তখন না হয় 'সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল।' তখন না হয় 'বাহিরে ঘোর অন্ধকার' ছিল। কিন্তু গ্রামে কি বৈদ্য ছিল না? পর দিন কি প্রভাত হয় নাই? প্রতাপকে ময়মনসিংহে সৌরভ-সম্পাদকের বাসায় না পাঠাইয়া ফণী তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইল না কেন? অথবা 'সমঃ সমং সময়তি' ভাবিয়াই ফণী তাঁহাকে 'সৌরভে'র গারদেই পাঠাইয়াছিল? দ্বিতীয় গল্পটির নাম—'লাঞ্ছিতার সম্মান!' ইহার প্রথম প্যারাতেই মাতাল লম্পট বিমলকুমার মনোরমাকে 'পুকুরের ঘাটে' আক্রমণ করিয়াছে। মনোরমাকে রাজশাহী সহরে তাহাদের 'বাসার পশ্চাৎভাগস্থ পুকুরের ঘাট হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া' পাষণ্ডেরা হরিয়া লইয়া যায়। তিন দিন পরে পুলিস তাহাকে উদ্ধার করে। বিচারে পাষণ্ডদের 'ছয় বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়।' এখন বিমলকুমার মনোরমাকে বলিল, হয় আমাকে ভজ, নয় ত গুপ্তকাহিনী প্রকাশিয়া তোমার বিয়ে বন্ধ করিয়া দিব। মনোরমা একবার ভাবিল, তাহার 'সর্ব্বনাশ যা হওয়ার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, এই পাষণ্ডের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে যদি সকল কথা গোপন থাকে, পিতা মাতাকে সমাজে অপদস্থ হইতে না হয়, তাহা হইলে সম্মত হওয়ায় ক্ষতি কি?' ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে বেত্রাঘাতের সুযোগ পাইয়া আসিয়াছিলাম। ও অঞ্চলে কি বেতের অন্য কোনও ব্যবহার নাই? তার পর মনোরমা সুস্বভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঁটাইয়া দিল সেই পাষণ্ড বিমলে! বিমল হতভম্ব! ইত্যবসরে মনোরমার পলায়ন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে গ্রামের জমীদার-পুত্র বিনোদ কর্ত্তৃক বিমলের গ্রীবা-ধারণ। বিমলের বিনোদ-সমীপে মনোরমা-ধর্ষণের রহস্যকথন। বিনোদের শাসন,—এ কথা প্রকাশ করিলে 'তোকে আমি খুন করে ফেলব।' বিমলের প্রস্থান। যথাসময়ে মনোরমার বিবাহের আয়োজন। বিবাহের রাত্রে বিমলের বর-কর্ত্তার নিকট রহস্য-ভঙ্গ। বিবাহ বন্ধ। বর লইয়া বরযাত্রীদের প্রস্থান। সেই রাত্রেই জমীদার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিনোদের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ! এই ত গল্প! ইহাকে যত দূর অসম্ভব, অস্বাভাবিক ও বিরক্তি-জনক ও ন্যাকামী দ্বারা খচিত করা যায়, লেখক তাহার ত্রুটী করেন নাই। মনোরমা 'ক্রোঞ্চা সিংহিনীর মত গ্রীবা বক্র করে।' একে 'ক্রোঞ্চা', তাহার উপর 'সিংহিনী'। সোনায় সোহাগা! চূড়ার উপর ময়ূর পাখা! আমরা জানিতাম, 'সিংহিনী' রায় সাহেব তারাপচন্দ্রের একচেটে। কিন্তু মজিলপুরের সে গৌরব ময়মনসিংহ হরণ করিল! তারাপচন্দ্রী ও দীনেশী সম্প্রদায়ের পাণ্ডা, ধাতা ও ত্রাতা সার আশুতোষ কি আবার ধর্ম্মাধিকরণে পাড় বিবাক হইয়া বসিয়া এই মলিমুচকে শাস্তি দিবেন না? এই লেখক ব্যাকরণের মত ভূগোল-বিবরণও বদলাইয়া দিতেছেন—রাওলপিণ্ডী সহরে বাসার পশ্চাতে খিড়কীর পুকুর! অকটারলোনী মনুমেন্টের পার্শ্বে ফুজিয়ামা! পৃথিবীর ছাদের উপর লাসা নগরে দালাই লামার ধানের গোলায় 'পদতল প্রক্ষালিত করিয়া' আটলাণ্টিক বহমান! ইনি বোধ হয় নৈয়ায়িক। কারণ, 'অপদস্থ'র 'স্থ'টি কাড়িয়া লইয়া বিনিময়ে তাহাকে একটা 'ত' দান করিয়াছেন। কারণ, এ ক্ষেত্রে 'প্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ' প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ত-বর্গের প্রথমেই 'ত'; অতএব, তাহাই প্রথমোপস্থিত'; তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবার কারণ কি? 'থ' দ্বিতীয় বর্ণ, সুতরাং সে কখনও 'পদ-স্থ' হইতে পারে না। তাহার পর, 'উৎকণ্ঠা', 'নিষ্ঠাবান', 'ঘাড়ে'। 'কাকাবাবু' নামক আর একটী কাহিনী দেখা যাইতেছে, 'সৌরভে'র লেখকগণ 'দ-ড়য়োরৈক্যং' মন্ত্র দগ্ধ করিয়াছেন। উভয়তেই 'ঘাড়ে' ও 'বেড়িয়ে' আছে। উপসংহারে climax—'সহস্র বিচ্ছিকের দংশনযাতনা।' বৃশ্চিকের দংশন যাতনা ইহার তুলনায় পিঁপড়ের কামড়! 'অকর্ম্মা'র কবি 'কথা'র সঙ্গে 'বাথা'কে মিলাইয়া দিয়াছেন। 'বিদ্যুতের শেষ' উদ্ভট 'আষাঢ়ে'র পচা-ধসা অকালকুষ্মাণ্ড। ইহার লেখক শ্রীরাজেন্দ্রকুমার 'শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ'। নমুনা—'পরাস্থ'। 'অপদস্থ' 'থ' হারাইয়াছিল, 'পরাস্থ' তাহা লাভ করিল! আবার নমুনা, 'শিকারের অভাব নাই। পাখীর মধ্যেও অভাব নাই।' তার পর, 'প্রাচ্য-যোগ্য'। শুধু 'প্রাচ্যে' মন উঠিল না। 'সহণযোগ্য'ও হাটে বাজারে পাওয়া যায়। 'তবু ভরিল না চিত্ত!' একবারে ডবল-পাঁচার মত 'প্রাচ্য-যোগ্য' কলাইয়া দিলেন! কারণ, 'অধিকন্তু ন দোষায়।' ইনি 'খড় কুটা লাগাইয়া আগুন জ্বালেন! সকলে 'আলো জ্বালে, আর আগুন ধরায়; ইনি 'আগুনে আলো ধরান'। চারুপন্থীরা লঘু 'কি' কে 'কী' করিয়া তাহাতে গুরুত্বের আরোপ করেন। 'ক্রমে দুলে মধু আসে।' ইনি বিকটকে 'প্রোমোশন' দিয়া 'বীকট' করিয়াছেন। 'প্রান্তি' নামক কবিতায় প্রগল্ভতার আছে—'সিকন'! 'বাবাজীর ঝুলী'তে আছে—'শ্রীশ্রীমদ্ভাগ-বতগীতা'! মনে করিবেন না, আমরা বসিয়া বসিয়া হারপোকা বাছিয়াছি। যে পাতায় খুঁজিবেন, সেই পাতায় এইরূপ নিদর্শন পাইবেন।

সাহিত্য, ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

মানব-মঙ্গল।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ কয়েকটি 'মঙ্গল'-গীতি রচনা করিয়াছেন—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। ঐ সকল কাব্যে কবিগণ কোনও না কোনও দেবতার মহিমা গান করিয়াছেন—ঘনরাম ধর্ম্মঠাকুরের, মাধবাচার্য্য কৃষ্ণঠাকুরের, লোচন দাস শ্রীচৈতন্যের, ভারতচন্দ্র 'অনাস্থা' অন্নদার। আমি আজ মানবের মহিমা গান করিতে চাই—সাধারণ মানুষ; কবি নয়, দার্শনিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, সাহিত্যিক নয়, যোদ্ধা নয়, রাজা নয়, মন্ত্রী নয়, জননায়ক নয়,—নিরুপাধি নিরঞ্জন সাধারণ মানুষ—তাহার মহিমা গান করিতে চাই;—সে যে হেয় নয়, ঘৃণ্য নয়, পতিত নয়, হীন নয়—সে যে কত বড় গরীয়ান্, মহীয়ান্, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাই। বীণাপাণি আমার সহায় হউন!

আমার স্মরণ আছে, একবার আমি এক পাদরী বন্ধুকে শোকপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। পাদরী সাহেবকে কে এক জন ইংরাজি-ওয়ালা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে, বিশেষতঃ বেদে, মানুষের মধ্যে পাপশোচনার (খৃষ্টানেরা যাহাকে sense of sin বলেন) উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এ সংবাদে পাদরী সাহেব শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, একে ত বাইবেলের গোড়াতেই আদম কৃত original sin (আদিম পাপ), যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকল আদমীই পাপী, ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস যদি কোনও জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে না থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেকজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গমও হয় নাই। ইহা ভাবিয়া বন্ধুবর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'পাপের শোচনা ধর্ম্মজীবনের ক খ। বেদের ঋষিরা পর্য্যন্ত যখন এ পাঠ পড়েন নাই, তখন তোমাদের ত গতি মুক্তি দেখি না।' আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—'ধৈর্য্যং কুরু। আপনি যাহাকে পাপের শোচনা বলিলেন, আমাদের শাস্ত্রে তাহা যথেষ্ট আছে। অধিকন্তু যাহা আপনি হয় ত কখনও শুনেন নাই, এমন কথা, অর্থাৎ আত্মা যে পাপী তাপী নহে, শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এ কথাও আছে।' তিনি বলিলেন, 'ইহা blasphemy—শুনিতে নাই—পাপের শোচনা

কি আছে, তাই বল।' আমি তখন তাঁহাকে কয়েকটা শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্ম্মানুবাদ শুনাইলাম। মিশনরী-প্রবর কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। ইচ্ছা করিলে আরও শুনাইতে পারিতাম। ধরুন, খুব প্রচলিত 'অপরাধভঞ্জন' স্তোত্র—

করচরণকৃতং বাক্‌কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো!

'হে করুণাসাগর মহাদেব শম্ভু! আমি করের দ্বারা, চরণের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, কায়ের দ্বারা, শ্রবণ নয়ন মনের দ্বারা যে যে অপরাধ করিয়াছি, বা করিতে গিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা করুন। আপনার জয় হউক।'

স্তোত্র সকলে নিত্য পাঠ করে না। কিন্তু 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' —যে সন্ধ্যা নিত্য করণীয়, সেই সন্ধ্যার মন্ত্র ধরুন।

'তদহ্না পাপমকার্ষম্' ইত্যাদিতে যদি কাহারও আপত্তি হয় যে, সন্ধ্যার মন্ত্রের ভাষা খুব প্রাচীন নহে, উহা হয় ত বৈদিক মন্ত্র নহে, বেদ হইতে পাপশোচনার প্রমাণ দাও, তবে সে আপত্তির খণ্ডন অতি সহজ। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমান 'ইড়া' ভক্ষণসময়ে দেবকৃত, মনুষ্যকৃত, পিতৃকৃত সমস্ত পাপের (বৈদিক শব্দ এনস্) এই মন্ত্রে মার্জ্জন চাহিতেন :—

দেবকৃতস্য এনসোঽব যজনমসি,
মনুষ্যকৃতস্য এনসোঽব যজনমসি
পিতৃকৃতস্য এনসোঽব যজনমসি।

শুধু তাই নহে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শেষ অধ্যায়, যাহাকে 'ঈশ' উপনিষদ্ বলে—সেখানে ঋষি অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে বলিতেছেন,—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে—

'হে অগ্নি! আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগের জন্য সুপথে লইয়া যাও'; আর—

যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।

'তোমাকে বার বার নমস্কার করি, আমাদের চিত্ত-লিপ্ত সমস্ত পাপ অপমার্জ্জন কর।'

যাঁহারা খাঁটী ঋগ্‌বেদসংহিতা ভিন্ন কোনও বৈদিক সাহিত্যকেই বেদ বলিয়া মানেন না, তাঁহাদেরও নিরাশা হইবার কারণ নাই; যে হেতু ঋগ্‌বেদসংহিতায়

প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে দেখিতে পাই যে, শুনঃশেফ পাপশোচনা করিয়া বরুণকে আহ্বান করিতেছেন :—

বাধস্ব দূরে নিঋ´তিং পরাচৈঃ
কৃতং চিদ্ এনঃ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ।
[পরাচৈঃ—পরাঙ্‌মুখাং কৃত্বা। প্রমুমুগ্ধি—মুক্তং কুরু।]

'নিঋ´তিকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে অবস্থিত করাও, আমার কৃত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর।' আবার—

ক্ষয়ন্ অস্মভ্যম্ অসুর প্রচেতা
রাজন্ এনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি।
[ক্ষয়ন্—নিরসন্; শিশ্রথঃ—শিথিলানি কুরু।]

'হে অসুর রাজা বরুণ! আমার কৃত সমস্ত পাপ শিথিল কর।' ইহার পর বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, আমার মিশনরী-বন্ধু হিন্দু শাস্ত্রে পাপের শোচনার সাক্ষাৎ না পাইয়া যে মুহ্যমান হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট হেতু ছিল না।

অপরে হয় ত উল্টা দিক্ হইতে বলিবেন যে, বৈদিক যুগে পাপের শোচনা থাকিলেও অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—অতএব, মিশনরীর আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, এখনও হিন্দুর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে দেখিতে পাই যে, অনেকে প্রতিদিন শ্রীহরির নিকট নিবেদন করেন—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপনিশ্চয়ঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥

'আমি পাপী, পাপকর্ম্মী, পাপাত্মা, পাপাশয়; হে পুণ্ডরীকাক্ষ হরি! আমাকে পরিত্রাণ কর, আমার সকল পাপ হরণ কর।' খৃষ্টানেরা ত এই কথাই বলেন, তবে খৃষ্ট-পন্থী ও হিন্দু-পন্থাদের মধ্যে প্রভেদ কি? বিশেষ প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ এই যে, খৃষ্ট-পন্থী মানুষকে আদিতে মধ্যে অন্তে পাপী পাপাশয় মনে করেন—he is born in sin and nurtured in sin. পাপে তাহার জন্ম, পাপে তাহার বৃদ্ধি, স্থিতি। আর হিন্দু-পন্থী বলেন যে, পাপ মানুষের একটা আগন্তুক জিনিস, বাহিরের ব্যাপার—মানুষ স্বতঃ স্বভাবতঃ শুদ্ধ নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ; পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হইতে পারে না, মানুষের আত্মাতে, যাহা প্রকৃত মানুষ, তাহাতে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্য ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষ—পাপী তাপী, হীন মলিন, দীন দুঃখী, সমস্ত মানুষই মহীয়ান্ ও গরীয়ান্। কেহ হেয় নয়, কেহ ঘৃণ্য নয়—সকলেই সেই সচ্চিদানন্দের

নিকেতন, ব্রহ্মের বিভূতি। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন্—

'সমস্ত জীবকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে'। কেন? ইহার উত্তর পরের চরণে রহিয়াছে—

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি।

কারণ, 'ভগবান ঈশ্বরই অংশ দ্বারা জীবরূপী হইয়া আছেন।' বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আরও স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ

'কিরাতজাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোক—এমন কি, যে পাপী প্রবঞ্চক, সেও ব্রহ্ম।' শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—'প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্ম।' অর্থাৎ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম জীবরূপে অবস্থিত।

মানব-মঙ্গলের ইহাই মূল কথা—মানুষ যে সে নয়, মানুষ সেই অপাপবিদ্ধ ভগবান্—এ মানুষ ও মানুষ নয়, সমস্ত মানবই ব্রহ্ম। বেদে যাহাকে মহাবাক্য বলে, অর্থাৎ চরম উপদেশ, চারি বেদের সেই চারি মহাবাক্য এক স্বরে জীবের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিতেছেন—'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'; 'তুমি হও তিনি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম', 'আমিই তিনি', 'আমি হই ব্রহ্ম'। জীব যদি ব্রহ্ম, জীব যদি সচ্চিদানন্দ, জীব যদি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, তবে তাহার শোক মোহ কেন? তবে তাহার সংসার-গতি কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীব আত্ম-বিস্মৃত। শ্রীরামচন্দ্র যেমন বিষ্ণুর অবতার হইয়াও আত্মবিস্মৃতির ফলে সাধারণ মানবের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, জীবেরও সেই দশা। যোগ-বাশিষ্ঠে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

হেতুর্বিহরণে তেষাম্ আত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধোঃ জন্মান্তরফলপ্রদঃ॥

'জীবগণ যে জন্ম জন্ম দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ, তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।' জীব অনাদিকাল হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যে দিন সে প্রবুদ্ধ হইবে, সেই দিন বুঝিতে পারিবে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু।

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥—মাণ্ডুক্যকারিকা। ১।১৬

প্রাচীনেরা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তত্ত্ব বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এক সিংহশাবক জন্মমাত্রে জননীকে হারাইয়া এক মেষপালকের অধীন হয়, এবং মেষের দলে প্রবিষ্ট হইয়া মেষের সহিত প্রতিপালিত হয়। সে সুতরাং নিজেকে মেষ বলিয়াই জানিত, এবং মেষসাহচর্য্যে ভ্রান্তিবশে মেষধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে হিংস্র জন্তু দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিত—সিংহ ব্যাঘ্রের কথনও সম্মুখীন হইতে পারিত না। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে নদীর ধারে লইয়া গিয়া জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইল, এবং বুঝাইয়া দিল যে, সে মেষ নহে, সিংহ। তখন সেই আত্মবিস্মৃত সিংহ-শিশু নিজের স্বরূপ বুঝিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইল।

সাধারণতঃ জীবের দশাও ঠিক এইরূপ। জীব দেহযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে।

মোহাদ্ অনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।—পঞ্চদশী।

'দেহবদ্ধ জীব মোহের বশে ঈশ্বর ভাব হারাইয়া শোকের অধীন হয়।'

দেহযোগাৎ সোপি।—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৬

'দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বদ্ধ ভাব।' অর্থাৎ, জীব উপাধি-সংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—ঈশ্বর ভাব হারাইয়া, শোক-মোহের অধীন হয়। যদি কখনও সদ্‌গুরু তাহাকে বলিয়া দেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', যদি কখনও সে বুঝিতে পারে, 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', তবেই তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মর্ম্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে * *
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।

[হংসঃ—জীবঃ। আত্মানং জীবং। প্রেরিতারম্—ঈশ্বরম্—শঙ্কর।]

'আত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ মনে করিয়া জীব এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে পরমেশ্বরের বর লাভ করে, তখন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার অমৃতত্ব লাভ হয়।'

এই সকল কথার সম্প্রসারণ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জীবের সংসার-যোগ এই ভাবে বুঝাইয়াছেন :—

এবং পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্‌ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্।—৩।২।২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

'সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, রোগ, শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম ; জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে।'

তথাপি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, আত্মাকে সেইরূপ পাপ স্পর্শ করিতে পারে না—কারণ, অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ। গৌড়পাদ বলিয়াছেন :—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানাং আত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ।

'যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানান্ধেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে।'

গীতারও উপদেশ ঐরূপ—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।—গীতা ১৩।৩২-৩৩।

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ; সেই জন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ। যেমন সর্ব্বগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হয় না।'

এই উপলেপই মানব-মঙ্গলের মূল সূত্র—অতএব কথাটার একটু বিস্তার করিলে মন্দ হয় না। এই যে জীব—যাহাকে আমরা পাপী তাপী শোকী দুঃখী দীন হীন মলিন ভাবি, কিন্তু যাহাকে শাস্ত্র ব্রহ্মের পদবীতে স্থাপনা করিলেন, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জীব ব্রহ্ম-বিন্দু—ব্রহ্ম সিন্ধু, জীব সেই সিন্ধুর বিন্দু—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব তাহার বিস্ফুলিঙ্গ। অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম-কণা।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।—মুণ্ডক, ২।১।১

[ভাবাঃ—জীবাঃ] যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।'

জীব যে ব্রহ্মাংশ, এ কথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।—গীতা, ১৫।৭

'আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীব-রূপে অবস্থিত।'

ব্রহ্মসূত্রেরও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—২।৩।৪৩ সূত্র।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

'জীব নিত্য-মুক্ত-স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ'। অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ, প্রকৃতিগত কোনও ভেদ হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের এইমাত্র প্রভেদ যে, ব্রহ্মে সচ্চিদানন্দ ভাব সুব্যক্ত, জীবে তাহা অব্যক্ত। জীব সাধনার দ্বারা ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাবকে সুব্যক্ত করিতে পারে—স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে পরিণত হইতে পারে, বিন্দু সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতে পারে ; এক কথায় জীব ব্রহ্ম হইতে পারে। * তখন সে বলিতে পারে—যোসাবসৌ সাহমস্মি—খৃষ্টের ভাষায় I and My Father are one.

এই তত্ত্ব ঋষিরা অন্য ভাবেও বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব ; ব্রহ্ম আতপ, জীব ছায়া।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।

'জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেন ছায়া ও আতপের সম্বন্ধ।' অন্যত্র উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু ; ১১।১২।

'যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।'

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহু-রূপে দৃষ্ট হইতেছেন।' এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ—২।৩।৫০ সূত্র।

---

* এই কথা ইংরাজিতে এক জন মনীষী লেখক এই ভাবে বলিয়াছেন—Every soul is the logus in gestation, a God in the making.

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ সূত্র।

এই প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত মিলিত হইতে পারে, এই চিদাভাস চিদাকাশে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

—বৃহদারণ্যক।

এই জীব শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হয়। পতঞ্জলি এই অবস্থাকে যোগের অবস্থা বলিয়াছেন,—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।—যোগসূত্র।

'ঐ অবস্থায় দ্রষ্টা জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।' আর অন্য অবস্থায়?

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।

অন্য অবস্থায় জীবের শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব শোক দুঃখ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা উপরক্ত হয়। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের সন্নিধানে রক্তজবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়, নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ দেখায়, সাদা চামেলী আনিলে শুভ্রবর্ণ দেখায়, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। স্বচ্ছ স্ফটিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপরাগ হয় মাত্র, স্ফটিক বস্তুতঃ বর্ণান্তরিত হয় না। সেইরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ জীব বৃত্তির প্রতিবিম্বে উপরক্ত হয় মাত্র—তাহার 'কেবল', চিন্মাত্র স্বরূপের কোনও-রূপ ব্যত্যয় হয় না। যখনই জীব বৃত্তির উপরাগ মুছিয়া ফেলিয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলন লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার পাপ তাপ, রোগ শোক, দীনতা হীনতা, সমস্ত এক কালে তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাই মানবের আশার সাফল্য ও সম্বল।

শুধু তাহাই নহে; যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা ঋষি, সত্যের যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছে, তাঁহাদের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, ঈশ্বর মানুষের মলিন দেহে বসতি করেন। সেই জন্য দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। দেহ-রূপ পুরে তিনি পুরস্বামী।

'অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম।'

'এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে এক ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ গৃহ আছে; ইহাকে চলিত কথায় হৃৎপদ্ম বলে। এই হৃৎপদ্মে এই জ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতা অধিষ্ঠিত আছেন।'

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।

তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥

অর্থাৎ, 'দেহ-রূপ পুরের মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে।

সেই পুণ্ডরীকে যে পরম দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে।' এই জন্য হৃদয়কে 'হৃদয়' বলে।

স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়ম্ ইতি। তস্মাৎ হৃদয়ম্।

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

'সেই পরমাত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত (etymology) এইরূপ। হৃদয়ে তিনি, সেই জন্য হৃদয়কে হৃদয় বলে।'

ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।'

অতএব, জীবের কত দূর সৌভাগ্য, ভাবিয়া দেখ। সে দেহের মধ্যে পরম দেবতাকে বসতি করাইয়াছে। সেই জন্য তাহার দেহকে ঋষিরা দেবালয় বলিয়াছেন।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। —মৈত্রেয়ী ; ২।১

'দেহকে দেবালয় বলে ; কারণ, এখানে সদাশিব প্রতিষ্ঠিত আছেন।' *

ভগবান্ যদি জীবের এত নিকট প্রতিবেশী হন যে, তাহার সহিত এক চালায় বাস করেন, তবে তাহার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? তিনি শুধু আমাদের প্রতিবেশী নন, তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ সখা, অন্তরতম সুহৃদ্। উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ।

'দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে এক জন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে এক জন নিমগ্ন হইয়া স্বাধীন ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু যখন সে অন্যকে দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।' বলিতে হইবে কি যে, এই বৃক্ষ আমাদের দেহ ; আর বিহঙ্গমদ্বয় আমাদের আলোচ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা?

---

* খ্রীষ্টানদিগের প্রধান আচার্য্য সেন্ট পল এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—"Know ye not that ye are the temple of God, and that the spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy ; for the temple of God is holy which temple ye are," *I Corinthian, III. 16. 17.*

অতএব, জীবের দৈন্যের কোনই কারণ নাই। তাহার অতি নিকটে সখা-রূপে ভগবান্ অপেক্ষা করিতেছেন—সে তাঁহার সহিত মিলিত হউক। সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে, সকল পাপতাপ দূরে যাইবে, সকল দীনতা সকল হীনতা তিরোহিত হইবে। সে অমৃতের পুত্র, অমৃতত্ব তাহার অধিগত হইবে, এবং সর্ব্বমঙ্গলের সংস্পর্শে তাহার পূর্ণ মঙ্গল ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

১

বেগুনবাড়ীর বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা প্যালারাম মাঝি, জাতিতে সাঁওতাল, গ্রামের ষোল আনা লোককে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ হে, এ বৎসর আমি দুর্গাদেবতার পূজো করব, তোমরা কেউ বাধা দিও না।'

প্যালারাম মাঝিকে বাধা দেয়, কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে কখনও বেগুনবাড়ীর পাহাড়িয়া দেশে, শালবনের মধ্যে, দুর্গোৎসব হয় নাই। দলে দলে সাঁওতালগণ নিকটস্থ গ্রাম কালদহে গিয়া বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব দেখিয়া আসিত বটে, কিন্তু পূজার সঙ্কল্প এ পর্য্যন্ত অন্য কাহারও মনে উদিত হয় নাই। গত তিন বৎসর ধরিয়া কেবল প্যালারামের মনে জাগিত, 'এই যে বাঙ্গালী জাত, এরা দুর্গাপূজা করে বলিয়াই এত চালাক। দুর্গাপূজা না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একবার লাগিয়া দেখা যাক্।'

প্যালারামের আর একটা কথা ছিল। সে কালক্রমে বাঙ্গালা ভাষা মোটা-মুটি শিক্ষা করিয়া, এবং বাঙ্গালী ঠিকাদার ও কারবারী লোকের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিশিয়া উচ্চদরের পূজার একটা মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা এই যে, পূজা না করিলে মনে বল হয় না। 'এই যে জঙ্গলের বাঘ ও হাতী, তাহারা যদি পূজা করিত, না জানি কি রকমই হইত! ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মই বল।'

যেমন কথা, অমনই কাজ আরম্ভ! প্যালারামের উদ্যম তল্লাটে বিখ্যাত। প্রকাণ্ড শরীর! তাহা অপেক্ষাও দীর্ঘ লাঠী হস্তে সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ, আমরা অনেক পাপ করেছি। শরীরের শক্তিতে পাপের প্রশ্রয়, মনের বলে পুণ্য। সেই মনের বল যদি শরীরে আসে, তবেই মাহাত্ম্য। মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হ'লে এ কাজটা শীঘ্রই সম্পন্ন করতে হবে।'

অনেকে বলিয়াছিল, 'দুর্গাপূজাতে খরচ বেশী প্রতিমা গড়াইবার লোক নাই, পূজার মন্ত্র জানা নাই, হঠাৎ এমন একটা সঙ্গীন কাজে হাত দিতে হইলে তাহার যোগাড় এই সময় হইতেই করা উচিত।'

কেহ কেহ বলিল, 'পূজা করিতে হইলে ভক্তি চাই। কেবল নাচ গান তামাসা লইয়া পূজা হয় না।'

প্যালারাম ঘোর গর্জ্জনপূর্ব্বক কহিল 'ও সব বাজে কথা। আমি বরাবর কুণ্ড মশাইয়ের বাড়ীতে দুর্গাপূজা দেখেছি। রামবন্ধ ভটাচার্য্য দু'টাকা রোজ দিলেই মন্ত্র পড়্‌বেন। তিনি বল্লেন যে, শক্তিপূজার অধিকার সব জাতিরই আছে। আর ভক্তির কথা বলছ তোমরা! সেটা ঠাকুরানীর চোটে হবে। কোনও ব্যাটারই ভক্তি থাকে না, পূজার তিন দিন বসে' নেশা খায় ও বেয়াদবী করে। আমার বোধ হয়, আমাদের যে ভক্তি আছে, তা বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক লোকের নাই। সেই জন্য 'মা' আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন।'

শেষ কথাতে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। 'মা যদি স্বপ্ন দিয়ে থাকেন, তবে ত কোনও কথাই নাই।' অনেকের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা প্যালারামের 'মা' শব্দ শুনিয়া মিটিয়া গেল।

সাঁওতালদিগের মূলধন না থাকিলেও, তাহারা পরিশ্রমে কাজ সারিয়া লয়। সুতরাং উপায়ের অভাব ছিল না।

তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটকের তহশীলদার বভ্রুবাহন সিং এক দিন পরিভ্রমণে আসিয়া দেখিতে পাইল যে যত সাঁওতাল্‌নী রাত্রি জাগিয়া কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যান্য বৎসর কাপাসের তূলা তাহারা মহাজনকে বেচিয়া ফেলে, এবার বেচে নাই। পুরাতন চর্খাগুলি তৈলাক্ত হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। শালবৃক্ষের বনে পর্ণকুটীরের মধ্যে বায়ুস্বননের সহিত চর্খার সুর গম্ভীরভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

বভ্রুবাহন জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাপা! ব্যাপারখানা কি?'

সাঁওতাল জাতির গুণ এই যে, তাহারা ঘরের কথা কাহাকেও বলে না। সে বলিল, 'এবার কাপড়ের দর চ'ড়ে যাওয়াতে আমরা নিজেই সূতা কেটে কাপড় বুন্‌ছি।'

বভ্রুবাহন। অনেক যায়গায় লুটপাট হয়ে গেছে।

হ্যাপা। সেটা ধর্ম্মের কথা নয়। ধর্ম্ম দেখ্‌তে হবে। ধর্ম্ম দেখ্‌তে হ'লে এমন কর্ম্ম করতে হবে, যাতে কেউ দোষ না ধরতে পারে।

বক্রুবাহন সিং অনেক দিনের তহশীলদার। সে মনে মনে বুঝিল, এদের একটা মতলব আছে নিশ্চয়! সাঁওতালদিগের মুখে ধর্ম্মকথা বড় সোজা কথা নয়। সে বলিল, 'যা করিস্ বাপু! কর্, কিন্তু মনে থাকে যেন যে, খাজনা দেবার সময় খুব নিকটে।'

স্তাপা সাঁওতাল কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিল, 'তোমার মালিক্ খাজনা নিয়ে যা করেন, তা জানা আছে। আমরা কি করব, পরে জান্‌তে পারবে।'

বক্রুবাহন গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল।

২

জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটক তুলিনের নিজ বাটীতে একখানি পুরাতন চেয়ারে বসিয়া বিষ্ণুপুরের আট আনা সেরের তামাক বাঁধা-হুঁকা-সংযোগে টানিতেছিলেন। সম্মুখে সুবর্ণরেখা নদী বহিয়া যাইতেছিল।

ঘটক মহাশয় পূর্ব্বে 'লা'র কারবার করিতে ছোটনাগপুরে আসেন। ক্রমে পয়সা জমিয়া যাওয়াতে, এবং দেহের কাঠাম স্থূল ও সুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি তুলিন স্থানটি পছন্দ করিয়া একটা বাটী নিম্মাণ করিয়াছিলেন।

ঘটক মহাশয়ের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা দেখিয়া সাঁওতালগণ ঘটক মহাশয়কে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশধরের মধ্যে কেহ, এই প্রকার বিবেচনা করিত। তাহাতে ঘটক মহাশয়ের কারবারের সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে অস্থাবর হইতে স্থাবর সম্পত্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক ঘটক মহাশয় তুলিনে গাড়িয়া বসিলেন; এমন কি, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দার-পরিগ্রহের ইচ্ছা হয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে তিনি টাকা কড়ি ভূগর্ভের কোনও অজ্ঞাত স্থানে গাড়িয়া ইদানীং ঘন ঘন সংবাদপত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ঘটক মহাশয়ের সম্পত্তি দশখানি গ্রাম জুড়িয়া। তাহার মধ্যে সমৃদ্ধিশালী পাঁচখানি গ্রামে প্যালারাম মাঝি ও তাহার আত্মীয়বর্গের চাষ ও বাস।'

'গ্রাম' বলিলে আমরা যেমন বাঙ্গালা দেশের গ্রাম বুঝি, সাঁওতালদিগের আবাসভূমিতে তাহা নয়। গ্রামের মাটী কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব নহে। পাঁচটা গ্রামের সাঁওতাল মিলিয়া যেন একটা পরিবার। সকলে একত্র মিলিয়া চাষ করে। যদিও পরস্পরে ক্ষেত বাঁটিয়া লয়, কিন্তু যাহার যত পরিশ্রম সাধ্য, সেই অনুসারে বণ্টন। কেহ মরিয়া গেলে তাহার ক্ষেত সকলেরই প্রাপ্য। যাহার অনেক পরিবার, অথচ ক্ষেতের অভাব, পতিত ক্ষেত্র তাহারই ভাগে

গিয়া পড়ে। ক্ষেত বিক্রয় করিবার প্রথা নাই। খাজনার ভার সর্দ্দারের উপর। সকলের পরিশ্রমের এক অংশ সে সংগ্রহ করিয়া জমীদারকে দেয়। বাকী খাজনায় নিলাম হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বৎসরে অনেক সময় ঘটক মহাশয়কে খাজনা ছাড়িয়া দিতে হইত, কিন্তু সুবৎসরে তাহা আদায় হইয়া যাইত। কিন্তু যদি না হয়, সেই ভয়ে অনেকবার তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে হইয়াছিল। কোনও কোনও স্থলে সর্দ্দারের জমী কাড়িয়া লইয়া ঘটক মহাশয় নিজেই চাষ করিয়া বাকী খাজনা আদায় করিতেন। তাহাতে প্রজাগণ আপত্তি করিত না। পরিশ্রমই তাহাদিগের মতে সম্পত্তি। পরিশ্রম নহিলে জমীর মূল্য নাই।

জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটকের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে মহাজন বনমালী কুণ্ড মহাশয়ের বাস। কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্বে দুর্গোৎসব হইত, এ বৎসর দেশে আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ হওয়াতে তিনি কিছু দিনের মত জন্মভূমিতে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া গুড়ের জালা গণিতেছিলেন। এমন সময় দল-বল লইয়া প্যালারাম সর্দ্দার উপস্থিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর সম্মুখে বসিয়া হুঁকায় জল ফিরাইতেছিলেন। প্যালারাম সর্দ্দার প্রণত হইয়া বলিল, 'এবার আমরা দুর্গাপূজা করিব নিশ্চয়, এই বেলা হ'তে যোগাড় করুন।'

কুণ্ড মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, 'টাকা পাবি কোথায়?'

প্যালারাম। কত টাকা লাগ্‌বে?

কুণ্ড মহাশয়। অন্ততঃ পাঁচ শ' টাকা না হ'লে কি দুর্গোৎসব হয়? কারিগর এনে প্রতিমা গড়াতে হ'বে। নৈবেদ্যের সরঞ্জাম চাই, সাজসজ্জা চাই, ভাল ঢাকী ও ঢুলীর বন্দোবস্ত চাই, বলিদানের পাঁঠা চাই। তোদের দেশে পূজোর কোনও উপকরণই ত পাওয়া যায় না। আমি বৎসর বৎসর পূজো করবার সময় আমাকে বাঙ্গালা দেশ হ'তে অনেক খরচপত্র ক'রে মালমশলা সংগ্রহ করতে হ'ত। হাজার টাকার উপর পড়ে যে'ত। তোদের তত দূর শক্তি না থাকলেও অন্ততঃ অর্দ্ধেক খরচ হবে ত?

প্যালারামের দলবলের বুক দমিয়া গেল, কিন্তু প্যালারাম বলিল, 'কুণ্ড মশাই, আমাদের পাঁচ শ টাকা আপনিই ধার দিন, সেই টাকা দিয়ে বাঙ্গালা দেশ হ'তে মালমশলা আনিয়ে দিন। আমরা পরিশ্রম ক'রে টাকা শোধ দিতে পারি, কিন্তু মালমশলার তত্ত্ব জানিনে। যদি একবার কেউ এসে শিখিয়ে দেয়,

তবে আমরা নিজেই ও সব তৈরী ক'রে নিতে পারি। ঢাক ঢোল আছে, তবে সে রকম বাজন্দার নেই। ডাকের গহনা কিন্‌তে হবে' বাঙ্গালা হ'তে কারিগর আর রং আন্‌তে হবে। আপনি কিছু ভাল খাবার বর্দ্ধমান থেকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মেয়ে সন্দেশ তৈরী করতে শিখেছে, কিন্তু কল্‌কেতার মত হয় না। সেই গরুর দুধের ছানা, সেই চিনি, অথচ হয় না, এটা কি সামান্য দুঃখের কথা! এই দুঃখেই দুর্গাপূজো কর্‌ছি। আর একটা বিশেষ কথা, সস্তা দরে একটা যাত্রার দল আন্‌বেন, তার খরচ আমি নিজে দেব। আমরাও একটা যাত্রার দল ফেঁদেছি, কিন্তু আপনাদের মত হয় না। এই সব দুঃখেই দুর্গাপূজো কর্‌ছি।

৩

কুণ্ড মহাশয় ভক্ত লোক। প্যালারাম সর্দ্দারের মহাজন। মক্কেলের উৎসাহে বাধা দেওয়া তিনি ন্যায্য বিবেচনা করিলেন না। বাঙ্গালা দেশে দুর্গোৎসব প্রজাদের মধ্যে দারিদ্র্যবশতঃ এক রকম উঠিয়া যাইতেছে, যদি সাঁওতালরাই আরম্ভ করে, তবে মন্দ কি? এক জাতির পতন হইলে অন্য জাতি উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ যত টাকা লাগে, তাহা ধার দিয়া দেশ হইতে সরঞ্জাম পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রামযত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও আশা প্রদীপ্ত হইয়া পড়িল। রিক্তহস্তে কুণ্ড মহাশয়ের বাটী রক্ষণ করিয়া এ বৎসরটা কাটাইতে হইবে, ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সম্প্রতি অনিদ্রা বাড়িয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্দ্দারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'সর্দ্দার, তুমি বেঁচে থাক।' বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। বাঙ্গালা দেশ হইতে লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছেন। এখন এই দেশে অবতীর্ণা নিশ্চয়।'

সর্দ্দার বড় খুসী হইয়া গেল। 'আচ্ছা ভটচায্ মহাশয়! আমাদের মত ছোট জাত্ দুর্গাপূজো ক'লে কোনও পাপ হবে না ত?'

ভট্টাচার্য্য নস্যগ্রহণান্তর কহিলেন, 'আমি অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছি যে, দৈত্যদানবেরাও এক কালে দুর্গোৎসব কর্‌ত। কেবল মধ্যে তাদের ভক্তি লোপ পাওয়াতে তারা রামচন্দ্রের হাতে মারা গিয়েছিল। শক্তিপূজা হ'তে আর বড় পূজা নাই।'

প্যালারাম বিদায় লইয়া দলবল সমেত জমীদার কৃষ্ণলাল ঘটকের বাটীতে উপস্থিত হইল। ঘটক মহাশয় হঠাৎ দুরন্ত প্রজা প্যালারাম সর্দ্দারকে দেখিয়া

মনে প্রমাদ গণিবেন, এই রকম চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তহশীলদার বভ্রুবাহন সিং বলিল, 'আমি বল্‌তে ভুলে গেছিলেম যে, এবার সাঁওতালরা দুর্গোৎসব কর্‌বে, বোধ হয় আপনার অনুমতি নিতে আস্‌ছে।'

ঘটক মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'তাও কি কখনও হয়? তোমাদের জাতির মধ্যে কখনও এ ব্যাপার হয়েছে?'

বভ্রুবাহন তহশীলদার তাহার সম্মুখের বৃহৎ দন্তযুগল বিকাশপূর্ব্বক বলিল, 'আমাদের ভুঁইয়া জাতির মধ্যে কখনও দুর্গোৎসব হয়েছে কি না—মনে পড়ে না, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ কেহ কালীপূজা ক'রত। সে রকম পূজা এখনও খেড়ে ও মাহতোরা মধ্যে মধ্যে করে। ডাকাতি করবার মতলব থাক্‌লেও মানস ক'রে পূজা করে।'

সম্প্রতি চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রবল হওয়াতে ঘটক মহাশয়ের মনে বিলক্ষণ আতঙ্ক জাগ্রত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, যেন সাঁওতালদেরও মতলবটা বড় ভাল নয়। প্যালারাম সর্দ্দার দলবল সমেত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ঘটক মহাশয় বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখ প্যালারাম! পূজার অধিকারী সকলে হ'তে পারে না। একে তোমরা ছোট জাত, তাতে এটা দুর্বৎসর। খাজনা দিতেই তোমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বরং এখানে একটা মিউনিসিপালিটীর সূত্রপাত হচ্ছে, সেইটে যদি কোনও রকমে খাড়া করতে পার, তবে তোমাদেরও উন্নতির পথ হবে, আর আমিও তোমাদের চেয়ারম্যান্ হয়ে একটা অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাব, এমন আশা করি।'

প্যালারাম। তার মানে কি?

ঘটক। তোমরা যে ক'খান গ্রামের পত্তন করেছ, সেগুলি আমাদের এই প্রধান গ্রামের নিকট। সব গ্রামগুলিই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হ'চ্ছে। ব্যারাম বেড়েছে। রাস্তাগুলো ভেঙ্গে গেছে। গাড়ী চলে না। তোমাদের শস্য চালান হয় না। তোমরা খেয়ে খেয়ে মোটা হ'চ্ছ, কিন্তু তাতে কি লক্ষ্মীশ্রী হয়?

প্যালারাম। তবে কিসে হয়?

ঘটক। সভ্যতায় হয়। জিনিসগুলো চালান দিলে দাম হয়। টাকা আসে। সেই টাকাতে রাস্তা ঘাট আরও প্রশস্ত করা যায়। দশ জন ভদ্রলোক দেশে আসে। ময়লা বের হ'বার ড্রেণ হয়। মশা কম হয়। দুর্গন্ধ থাকে না। জ্বর জ্বালা হয় না। ক্রমে তোমরা আপসের মধ্যে টেক্স বসিয়ে গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করবে, ল্যাম্প-পোষ্ট দাঁড় করাবে, ময়লা-ফেলার গাড়ী ও

বলদ জোটাবে। ক্রমে তোমাদের চেহারা ফিরে যাবে, স্কুল খুলে লেখা পড়া শিখ্‌বে, দেশের শাসন নিজেই করবে, মানুষ বেছে নিয়ে তাকে ভোট্‌ দেবে, সে গিয়ে কৌন্সিলে বসে' বক্তৃতা করবে। তোমাদের নাম কাগজে বেরুবে, সেই কাগজ রেলগাড়ী ক'রে এদেশে এসে এক পয়সায় বিক্রয় হবে। দুর্গোৎসব ক'রে লাভটা কি? কেবল লোক জড়' করে' হেঁড়ে খাবে বই ত নয়? কেবল ময়লার বৃদ্ধি হবে, শেষটা তোমাদের মৃত্যুসংখ্যা বাড়্‌লে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, আর রিপোর্ট না হ'লে চৌকিদারগুলোর প্রাণ যাবে। এই দেখ, পঞ্চায়েতের সর্দার হয়ে আমাকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। তুমি প্রজাদের সর্দার, একটু বিবেচনা ক'রে দেখ, আমি অধিক আর কি বল্‌ব? আর এ কথাও বলে দিচ্ছি। অন্যান্য বার আমি তোমাদের মাল ক্রোক করি না, এবার তাও করব। অনেক খাজনা বাকী পড়েছে। অনেক।

৪

ইহা বলিয়া ঘটক মহাশয় উঠিয়া গেলেন। প্যালারাম উত্তর না দিয়া সদলে গ্রামে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া ন্যাপাকে ডাকিয়া বলিল, 'ন্যাপা, ব্যাপার-খানা কি বল ত?'

ন্যাপা। এ সব বজ্রবাহন সিংএর বজ্জাতি।

প্যালারাম। তা ত বুঝি। কিন্তু তোমাদের মতে দুর্গাপূজোটা এ বৎসর করে' ফেলা ভাল নয় কি?

ন্যাপা। যখন আপনি স্বপ্ন পেয়েছেন, তখন এর একটা মানে আছে। তবে কি জানেন, যদি সত্যি সত্যিই গ্রামে ময়লার গাড়ী আসে, টিনের পাইখানা বসে, তবে পূজোর পরে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিশু মোক্তারের পরামর্শটা নিলে হয়।

প্যালারাম গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'রেখে দে তোর বিশু মোক্তার। আমরা পাগাড়ে' জাত্‌। হাজার বৎসর ধ'রে নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করেছি, কোনও আপদ বালাই হয় নাই। এর একটা উপায় আমরাই ক'রব। আমি নিমেষের মধ্যে এ সব কথার আদি অন্ত ভেবে নিয়েছি। দেখ, আমি স্বীকার করি যে, গ্রাম পত্তন ক'রে আমরা যে ময়লা জড়' করেছি, সেটা আমাদেরই বোকামী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগুলো দূরে দূরে থাকত, আর মাঠে মাঠে কাজ শেষ কর'ত। আমরা এক পা হেঁটে যেতে কাতর হই ব'লে এই বিপদ ঘটেছে। এখন আমার প্রথম হুকুম যে, সাত দিনের মধ্যে এই গ্রামগুলো ভেঙে

সাফ্ করে ফেল, আর আমাদের বাস আগে যেখানে ছিল সেইখানে খড় ও বাঁশগুলো নিয়ে ঘর বেঁধে ফেল। দেখি, কোন্ বেটা ময়লার সন্ধান পায়।'

সকলে প্যালারামের বুদ্ধির বাহাদুরী দিয়া বলিল, 'ঠিক কথা। ময়লার সন্ধান না পেলে টেক্স বসাবে কি ক'রে?'

প্যালারাম। বেশ! আমার দ্বিতীয় হুকুম যে, দুর্গাপূজোর জন্য পাহাড়ের উপর একটা যায়গা ঠিক কর। পূজো অর্চ্চা লুকিয়ে করাই ভাল, নয় ত বাহিরের লোকের হিংসা হয়। বড় বড় গাছ কেটে ফেল। আইনে ঠিক হয়ে গেছে যে, দরকার হ'লে আমরা জঙ্গলের বড় গাছ কাটতে পারি। তার জন্য গোলমাল হয়, তবে আমি দায়ী। গাছ কেটে বড় দুটো মণ্ডপ তৈরী কর। যদি কারিগর আস্‌তে দেরী হয়, তবে একটা মণ্ডপে আমরা আপাততঃ মহিষাসুর, কার্ত্তিক, গণেশ, এগুলোকে গ'ড়ে ফেলি। দুর্গার প্রতিমা পরে বস্‌বে। কাজ এগিয়ে থাকলে চমৎকার হবে।

সর্দ্দারের হুকুম অলঙ্ঘনীয়। অনুজ্ঞা প্রচার হওয়ায়, দলে দলে সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল। প্যালারাম উৎসাহ দিয়া বলিল, 'ভাঙ্, সকলে ভাঙ্! ইতিহাস ব'লে একটা বহি আছে, সেটাতে ম্যাষ্টর এ সব কথা লিখ্‌বে, আর ছেমেড়া পড়্‌বে। ভাঙ্!'

দুই দিবসের মধ্যে গ্রামগুলির কোনও চিহ্ন রহিল না। ধন ধান্য, তরি-তরকারি, ঘটী বাটী, লাঠী ও টাঙ্গী লইয়া, এবং মস্তকে বাঁশ ও খড় বহন করিয়া, সাঁওতালগণ তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটাস্থান অনায়াসে আবিষ্কারপূর্ব্বক পুরাতন বাঁশ খড়ে নূতন ঘর বাঁধিয়া ফেলিল। প্যালারাম খুসী হইয়া বলিল, 'সাবাস্! তোরা এখানে আর কোনও ময়লার চিহ্ন পাচ্ছিস্?'

ন্যাপা। মোটেই না। কেবল একটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

প্যালারাম। সেটা বেশী দিন থাক্‌বে না। এখন আমরা দূরে দূরে থাক্‌ব। ক্ষেতগুলো এখন বরং কাছে হবে। এতে আমাদের শরীরের বল বাড়্‌বে। এতে আমাদের ভালবাসা আরও বেড়ে যাবে বই কম্‌বে না। যখন আমরা ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকতেম, তখন রোষারুষি ক্রমে বাড়ছিল, চুরী চামারী হচ্ছিল, পুলিসগুলো এসে দৌরাত্ম্য কচ্ছিল, তহশীলদার এক যায়গায় বসে সকলকে ডেকে 'শালা' বলে' গালাগালি দিচ্ছিল। একটা ছেলে মরে গেলে চৌকিদার বই নিয়ে এসে তম্বি হম্বি কর্‌ত। এখন দেখি, মর্‌লে বাঁচলে কোন্ ব্যাটা খবর রাখে!

প্যালারামের অসাধারণ কূটবুদ্ধির প্রতিভা পূর্ব্বে অনেকবার প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং কেহই বিশেষরূপ আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া কেবল সাধুবাদ দিতে লাগিল।

সকলে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলে, প্যালারাম তাহার প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া পড়িল। বকুল বৃক্ষ প্রায় দশ বৎসরের। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাতে ফুল হইয়াছিল। বৃক্ষতলে প্যালারামের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা লক্ষ্মী গত দিনের শুষ্ক ফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিতেছিল।

হঠাৎ প্যালারামের চক্ষে জল আসিল। সে তাহা মুছিতে গিয়া দেখিল যে, লক্ষ্মী তাহা দেখিয়াছে। সুতরাং লুকাইতে গিয়া পুনরায় হাসিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। প্যালারাম তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'আয় মা, আয়, বালাই. কিছু না। এই যে বকুল ফুল, এর গন্ধ কত দিন? তোর বিয়া হয়ে গেলে আমি এ গাছের নিচে চৌবাচ্চা বাঁধিয়ে দেব. তোরা মধ্যে মধ্যে বেড়াতে এসে তোর বুড়ো বাপের কীর্ত্তি দেখ্‌বি। দূরে থাকাই ভাল।'

৫

কুণ্ড মহাশয়ের বড় বড় গুড়ের জালা স্কন্ধে বহন করিয়া সাঁওতালগণ পাহাড়ের উপর লইয়া গিয়াছে, এবং সেখানে খই ভাজিয়া ও মুড়কী প্রস্তুত করিয়া রাশীকৃত করিয়াছে।

গহন বনের মধ্যে দুর্গম ও অজ্ঞাত পথ। কিন্তু সাঁওতালদিগের অজ্ঞাত নহে। সর্দ্দারের মতে পথ ও বাসস্থান অন্যের নিকট অজ্ঞাত থাকাই ভাল। কেবল সাধু পথিক ও বন্ধুর নিকট লুক্কায়িত থাকিবে না।

সে নিম্নের গ্রামগুলি আর নাই। কুণ্ড মহাশয়ের প্রেরিত কারিগর মাল-মশলা লইয়া বহু কষ্টে পর্ব্বতের উপর উঠিল। সঙ্গে কুণ্ড মহাশয়ের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথ এবার এফ. এ. পাশ করিয়াছে। তাহার পাহাড় পর্ব্বত দেখিবার বড় সখ্। প্যালারাম তাহাকে সাদরে স্কন্ধে লইয়া বাঁশের মঞ্চের উপর বসাইয়া দিল। সেখানে বালিকার দল চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া হরিনাথকে দেখিতে লাগিল।

সাঁওতালগণ পূর্ব্বেই মহিষাসুর গড়িয়া রাখিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর কর্ম্মকার কৃষ্ণনগরের কারিগর। সে চমৎকৃত হইয়া বলিল, 'তোমরা যদি এত ভাল গড়াতে পার, তবে আমাকে ডাকা কেন?'

প্যালারাম। ঐ পর্য্যন্ত ; মহিষাসুর আমরা দেখেছি, কিন্তু মা'কে দেখি নাই। সেই অভাবটুকু পূরণ কর্‌বার জন্য আপনাকে নিয়ে আসা।

বিশ্বেশ্বর ভক্তিভরে প্রতিমা গড়িয়া তুলিল। সে রূপে সকলে মোহিত হইয়া বলিল, 'ভবিষ্যতে আমরা ঐ রকম প্রতিমা গড়িব।'

হরিনাথ। তার কোনও আশ্চর্য্য নাই। এদের মধ্যে মুখের গড়ন এত সুন্দর আছে যে, আমাদের দেশে সে রকম একটাও দেখা যায় না।

হরিনাথ লক্ষ্মীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মী পলাইয়া গেল। সেই রঙ্গ দেখিয়া সাঁওতাল রমণীগণ হাসিয়া খুন! হরিনাথ তাহাতে অতিশয় লজ্জিত!

প্রতিমার গঠন সম্পূর্ণ হইলে এবং মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্যালারামের একটু ভয় হইল। সে বলিল, 'ভট্টাচায্য মহাশয়, দেখ্‌বেন যেন পূজোর কোনও বিষয়ে অঙ্গহীন না হয়ে পড়ে।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পূজাপদ্ধতির পীতবর্ণ পুঁথি বাহির করিয়া পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সব সরঞ্জামগুলি মিলাইয়া লইলেন। অবশেষে বলিলেন, 'তোমরা শাক্ত মতে পূজা করিবে ত?'

প্যালারাম। সে কথা আমরা ভেবে দেখেছি। আমার ইচ্ছে যে, বৈষ্ণব মতেই হ'ক।

ভট্টাচার্য্য। কেন? তোমরা ত মদ্য মাংস খাও?

প্যালারাম। আমরা মাংস পেলে পুড়িয়ে খাই, ঝোল ক'রে খাই না, আর মদ্য যে ঠিক খাই, তাও নয়; হেঁড়ে খাই। কিন্তু তাতে আমাদের এত দুর্দ্দশা হয়েছে যে, বলা কঠিন। বৎসর বৎসর আব্‌গারীর দারোগা এসে ভাঙ্গাচুরো কলসী ঘরে দেখ্‌তে পেলেই জনকতককে বেআইনী মদ চুলাইয়ের অপরাধে চালান দেয়। জরিমানা দিতে দিতে আমরা ফতুর হয়ে গিয়েছি। সেই জন্য এবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর মদের দিকে যাব না। আপনি বৈষ্ণব মতেই পূজো করুন।

ভট্টাচার্য্য। তবে কুমড়োর ও আখের বলিদান দিতে হবে।

প্যালারাম। কুমড়ো নেই, তবে লাউ আছে, তাই দিয়ে কাজ সেরে দিন। আর আখের বদলে কচি বাঁশ হ'লে চল্‌বে না?

ভট্টাচার্য্য পুঁথি দেখিয়া বলিলেন 'দরিদ্রের পক্ষে সকলই চলে। তোমাদের ভক্তি যখন আছে, তখন কোনও অমঙ্গল হবে না।'

প্রতিষ্ঠা সাঙ্গ হইয়া গেলে, প্যালারাম ষোল আনা গ্রামবাসীকে লইয়া প্রতিমার শোভা দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। প্যালারামের হৃদয়ে ভক্তি উথলিয়া উঠিল, এবং তাহারই আবেগে সে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, 'মা দুর্গা! আমাদের বিদ্যে বুদ্ধি কম, তবে ভক্তি আছে। শাস্ত্রে বলে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গাছে থাক্‌ত, আমরা নীচে এসে মানুষ হয়েছি। কিন্তু তাদের মত ভক্তি আমরা এখনও পাইনি। যারা জ্ঞানের পথে গেছে, লেখাপড়া শিখেছে, সভ্য হয়েছে, তাদের অহঙ্কার বড়, কিন্তু সে অহঙ্কার আমরা চাইনে। সে পথে তারা তোমার কোনও হদিশ পাচ্ছে না, চুরী চামারী, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যে কথা ক'য়ে নিজের পায়ে নিজে টাঙ্গী মেরে অনুতাপ ক'চ্ছে। আমাদের পূজো নিও, তা হলেই জীবন সার্থক হবে।

'মা দুর্গা! আরও একটা কথা! আমরা এক সময় উলঙ্গ ছিলাম, মধ্যে মোটা কাপড় পরেছি, কিন্তু আজ আমরা আবার উলঙ্গ। তাই, গাছের পাতায় লজ্জা নিবারণ ক'রে তোমার পূজো ক'রব। যাদের সেটুকুতে লজ্জা যায় না, তারা সহরের লোক হয়েও হতভাগা। তাদের জন্য আমরা কাপড় বুনেছি। উৎসর্গ হয়ে গেলে সেগুলো গ্রামে গ্রামে বিলোবার জন্য পাঠিয়ে দেব। আমাদের পরিশ্রম তাতে সার্থক হবে। আমাদের চর্খা আছে, তুলো আছে, জোলা আছে। আমাদের মধ্যে কয়লার খাদে যারা গিয়েছিল তারাও ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কাপড়গুলো বুনেছে, সেগুলো তোমাকে দেখাব!'

খুব উৎসাহিত হইয়া প্যালারাম সকলকে বলিল, 'তোরা এখন সেগুলো নিয়ে আয়।'

৬

সর্দ্দারের হুকুম পাইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে বড় বড় মোট বহিয়া বেদীর সম্মুখে লইয়া আসিল। সহস্র সাঁওতাল মিলিয়া নানা বর্ণের পঞ্চ সহস্র বস্ত্র বুনিয়াছিল, সেই সকল শাড়ী ও ধুতির মূল্য এখনকার বাজারে প্রায় বিশ সহস্র টাকা। মিষ্টান্নের মূল্য প্রায় পাঁচ সহস্র! ইহা ছাড়া কত প্রকার ফল মূল, তাহার সংখ্যা নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিশ্বেশ্বর ও হরিনাথ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। কত হরিণের সিং, ধূপ ও মধু! কত বাঘ-ছাল! বন্য-সম্পত্তিরও একটা শোভা আছে, সার্থকতা আছে। প্রস্তর ও শাল কাষ্ঠের দুর্গের মধ্যে বাস করিয়া সাঁওতালগণ যে সুখে সুখী, সে সুখ কোন্ মহানগরীতে আছে?

বিশু কারিগর বলিল, 'এ সঙ্গীন ব্যাপার! এ জঙ্গলীগুলোর মধ্যে এত যোগাড় ছিল তা স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

প্যালারাম সর্দ্দার বলিল, 'দাদা, পরিশ্রমে কি না হয়? আমরা গড়ে দু ঘণ্টাও পরিশ্রম করিনে। তাতেই দিন চলে যায়: কখনও ছাতাটা বা জুতোটা কেনবার জন্য, কিংবা জমীদারের খাজনা দেবার জন্য টাকা ধার করলে পরিশ্রম একটু বাড়িয়ে দিতে হয়, তার ফলে সকলের কর্ম্মভোগ। যদি বুদ্ধি থাকত, তবে এই জঙ্গলে বসেই আমরা কলের কাজ সেরে নিতে পারতেম। কিন্তু শেখাবার লোক নেই। বাঘের ছাল হরিণের ছাল, মহিষের ছাল, এ সব জিনিসের কি অভাব এখানে আছে? এই পাহাড়ে এত কাঠ ও এত রকম পদার্থ আছে যে, সেগুলো তৈরী ক'রে একত্র করলে আমাদের কুঁড়ে ঘরগুলো কলকেতার বাবুদের বাগানবাড়ীর মত সুন্দর হয়ে পড়ে। এই পাহাড়ের উপর দূরে দূরে সারি সারি ঘর তৈরী করলে কোন্ দিক দিয়ে ময়লা দুর্গন্ধ বেরিয়ে যায়, তার ঠিক থাকে না। একটা বর্ষার ওয়াস্তা। সেই বর্ষার জল পাথরের বাঁধের মধ্যে জমা করলে বড় বড় পুষ্করিণী হয়ে পড়ে, তাতে কমল ফুল ফোটাতে কতক্ষণ? সহরে গিয়ে সমাজ পেতে যে বেয়াকুফী, তা আমরা ক্রমে বুঝতে পেরেছি। বোধ হয়, দুর্গা মা তাই বোঝাবার জন্য বৎসর বৎসর ড্যাঙ্গায় নেমে আসেন। তোমরা সহরে কেবল মন ভোলাবার জন্য পরিশ্রম করছ। সেই জন্য তোমাদের লেখাপড়া। সে পরিশ্রম সার্থক হয় না, কেবল শরীর নষ্ট, মনে কষ্ট, আর খুনোখুনি। আমরাও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছিলেম, কিন্তু ক্রমে চোখ ফুটছে।'

ঢাক বাজিয়া উঠিল। দলে দলে সকলে ধূপ জ্বালিয়া বন ছাইয়া ফেলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্ত্র আওড়াইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেবল পাঁচ গ্রামের নয়, প্রায় একটা পরগণার লোক আসিয়া সাঁওতালদিগের সেই প্রথম পূজা দেখিয়া গেল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথি ক্রমে একে একে সুখে কাটিয়া গেল। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি জাগরণ করিল। সকলেই আনন্দ-উৎসবে মত্ত!

বর্দ্ধমান হইতে যাত্রার দল যথাসময়ে আসিয়াছিল। তাহারা পর্ব্বতের এক পার্শ্বে বৃক্ষপল্লবের সামিয়ানার তলে বসিয়া সীতার বনবাসের ও রাবণবধের যাত্রা জুড়িয়া দিল।

হ্যাপারাম চুপ করিয়া মন্ত্র শুনিতেছিল। প্যালারাম বলিল, 'ওরে হ্যাপা! এ মন্ত্রের কিছু বুঝিস্?'

প্যালারাম সর্দ্দারের কথাগুলি হরিনাথের মনে লাগিয়াছিল। যদি বঞ্চনা না করিয়া সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা যায়, তবে এখনও তাহার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। নিম্নভূমি হইতে বাছা বাছা লোক এই ব্রত গ্রহণ করিয়া অরণ্যে চলিয়া আসুক। সেখানে অকর্ম্মণ্য না হইয়া ভবিষ্যৎ যুগের সূত্রপাত করুক, এবং আত্মরক্ষা করিতে শিখুক। পল্লীগ্রামের পূতিগন্ধময় কর্দ্দমের মধ্যে দল না পাকাইয়া, তাহারা একবার বাহির হইয়া পড়ুক। এ সংসার এমনই স্থান যে, সৎ সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে কখনই সে অন্নাভাবে মরে না, বরং সে ভবিষ্যতের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

হরিনাথ ভাবিতেছিল। লক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

হরিনাথ বলিল, 'আজ দশমী। কাল আমি বাড়ী ফিরে যাব।'

লক্ষ্মীর মুখ ভার হইয়া পড়িল।

'আপনি আর এখানে আস্‌বেন না?'

হরিনাথ। আস্‌ব বই কি।

লক্ষ্মী। তা হ'লে আমাকে চাকরাণী করে' রাখবেন, আমি মাইনে নেব না।

হরিনাথ হাসিল।—'চাকরী ছাড়া কি আর কোনও সম্বন্ধ নাই লক্ষ্মী? মানুষ কেহ কারও দাস নয়। যারা বেশী অলস ও অকর্ম্মণ্য, তারাই পেটের দায়ে সহায়হীন হয়ে চাকরী করে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের খাতিরে এক দল আর এক দলের চাকরী ক'রত। তোমার মান আমার চেয়ে বেশী। যখন আমাকে তোমার সমান দেখবে, তখন আমিই তোমার চাকরী করব, আর তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তখন আমারও চাকরী করিও। চাকরীর বদলে চাকরীই চলে। 'মাইনে' জিনিসটা অপমান ও কলঙ্ক বই আর কিছু নয়। যখন আমি ফিরে আস্‌ব, তখন আমার প্রাণ ও শরীর তোমাদেরই জন্য উৎসর্গ ক'রব।'

লক্ষ্মী কথাগুলির অর্থ ভাবিতে ভাবিতে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

বজ্রবাহন সিং শুনিয়াছিল যে, প্যালারাম সর্দ্দার জমীদারের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছে। এই সুযোগে বাকী খাজনার উৎপীড়নটা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করিয়া, ঘটক মহাশয়কে বলিল, 'শুনেছেন ত?'

কৃষ্ণলাল। কি?

বজ্রবাহন। প্যালারাম সর্দ্দারের দুর্গোৎসব। তার ঘরে যা ছিল, তা' ত

বিলিয়ে দিয়েছে, উপরন্তু কুণ্ড মহাশয়ের কাছে পঁচিশ টাকা ধার করেছে। এবার ধানের অবস্থা বড় ভাল নয়।

কৃষ্ণলাল। এখন উপায়?

বভ্রুবাহন। এই বেলা যা কিছু মাল মশলা, ঘটী বাটী পাওয়া যায়, তা আটক না কর্‌লে সামলান মুস্কিল হবে।

কৃষ্ণলাল। আমি ত নালিশ রুজু করি নাই। ক্রোক্ ক'রব কেমন ক'রে?

বভ্রুবাহন চৌকিদারী টেক্সও দুই সিমাহীর বাকী পড়েছে, আপাততঃ তারই জন্য ক্রোক ক'র্‌তে হবে। কিন্তু একটু সাবধানে কাজ্‌টা সেরে ফেলা ভাল। গোটাকতক পাইক নিয়ে চলুন।

কৃষ্ণলাল ঘটক বলিলেন, 'এখনই।'

দশমীর দিন মধ্যাহ্নে অন্য কোনও কর্ম্ম কাজ না থাকায় তাঁহারা সকলে গ্রামাভিমুখে রওনা হইলেন। এক ক্রোশ মাঠ বাহিয়া ঘটক মহাশয় ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পড়িলেন। শিবিকা-বাহকগণ বলিল, 'হুজুর, গ্রামের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

বভ্রুবাহন সর্দ্দার বহু পশ্চাতে। পাইকদিগের মধ্যে এক জন পাল্কীর সঙ্গে দৌড়িতেছিল, সে বলিল, 'আমি ত অনেক বার এসেছি, এখানেই গ্রাম ছিল, বোধ হয় তারা ভেঙ্গে ফেলে দূরে গিয়ে বসতি করেছে।' ঘটক মহাশয় পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া কথার সত্যতা পরীক্ষা করিলেন। 'তাই ত! এ ত খুব মজার ব্যাপার!'

এক জন চৌকিদার বলিল, 'তাদের বাস এখন চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্যালারাম সর্দ্দারের আস্তানা ঐ পাহাড়ের উপর।'

ঘটক মহাশয় বলিলেন, 'চল্।'

পাহাড় বড় নিকটে নয়। উপস্থিত হইতে বেলা কাটিয়া গেল। পাহাড়ের উপরে উঠিলে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। বভ্রুবাহনের কোনও সন্ধান না পাইয়া ঘটক মহাশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পাইক ও চৌকিদার বলিল, 'হুজুর, রাস্তা-গুলোও মেরে দিয়েছে।'

কৃষ্ণলাল। তাই ত! এখন উপায়? এমন হবে, তা মনে করি নাই।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর এক দল লোক প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিতেছিল। ঘটক মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে তাহারা নিকটে আসিল। দলের নায়ক—হরিনাথ কুণ্ড।

হরিনাথ ঘটক মহাশয়কে দেখিয়া নমস্কার ও 'কোলাকুলি' আরম্ভ করিয়া দিল। ঘটক মহাশয় বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সদ্দার কৈ ?'

হরিনাথ। তারা সিদ্ধি ঘুঁটছে।

ঘটক মহাশয়। তাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমাকে অবজ্ঞা ক'রে এই পূজোটা ক'রে ফেল্লে ?'

হরিনাথ। আপনার বাধা দেওয়া উচিত হয় নাই।

ঘটক। তার শাস্তি তারা পাবে। কাল্ প্রাতঃকালেই আমি এসে এদের মালামাল ক্রোক করব।

এমন সময় এক জন পাইক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'তহশীলদার মশাইকে সকলে সিদ্ধি খাইয়ে জোর ক'রে' কোলাকুলি ক'রছে। সে আবোল তাবোল বক্‌ছে।'

ইহাতে ঘটক মহাশয় ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি এখন ফিরে যাচ্ছি। কাল্ পুলিস ডেকে আনব।'

এই কথা শুনে দলের মধ্য হইতে আপারাম লম্ফ দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'অমন কাজ করবেন না হুজুর, আমরা দেশের লোক। আমাদের যেমন চেহারা, আপনারও তেমনি, মাঝের মধ্যে কেবল আমাদের সিকি পরিশ্রমটুকু আপনি ব'সে ব'সে ধ্বংস ক'চ্ছেন, এর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে' আপনার কোলাকুলি করা উচিত।'

সকলেই সিদ্ধির নেশায় মত্ত। সকলেই চীৎকার করিয়া বলিল, 'উচিত।'

তখন সকলে ঘটক মহাশয়ের পা ধরিয়া পাল্কী হইতে টানিয়া বাহির করিল, এবং কাঁধে করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ঘটক মহাশয় সত্রাসে দুর্গানাম করিতে করিতে বলিলেন, 'মা, রক্ষা কর।'

কিন্তু কাহারও মনে হিংসা দ্বেষ ছিল না। সকলেই বলিল 'কোনও ভয় নাই, আপনি আমাদের দুই পুরুষের জমীদার, মহাপ্রভু। আপনার সম্মানের জন্যই আমরা এটা কচ্ছি।'

সেই সময় প্যালারামও যোড়-করে উপস্থিত। 'অপরাধ মার্জ্জনা করবেন প্রভু। আমরা অনাথ নিঃসহায়।'

ইহাতে ঘটক মহাশয় বলিলেন, 'তবে তোরা আমাকে নাবিয়ে দে, কোলা-কুলিটা সেরে নি।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

চন্দ্র-রশ্মি।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; নানা প্রকার অভিনব যন্ত্রাদির উদ্ভাবনার ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে অনেক নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উন্নত পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই; চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের কিরণে আলোকিত হয়; চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ কঠিন, সূর্য্যের কিরণ ঐ কঠিন ভাগে প্রতিহত হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হয়; এইরূপে দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালেও সূর্য্যকিরণের দ্বারাই পৃথিবী আলোকিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতেও এ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না। সূর্য্যের কিরণেই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই, এ কথা অতি পুরাতন যুগেও ভারতীয় মনীষিগণ জানিতেন। নিরুক্ত-কার মহামুনি যাস্ক লিখিয়াছেন;—

"অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে * * * আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।

—নিরুক্ত, ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

এই সূর্য্যের একটী রশ্মি (রশ্মিসমূহের একাংশ), চন্দ্রমণ্ডলে প্রকটিত হয়, * * * চন্দ্রের দীপ্তি সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-বাজসনেয়ি মাধ্যন্দিন-সংহিতার ১৮ অধ্যায়ের ৪০ কণ্ডিকাতেও এই বিষয় সূচিত হইয়াছে। উহাতে 'সূর্য্যরশ্মি' শব্দ 'চন্দ্রমা'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) এই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 'সূর্য্যরশ্মি' শব্দটী বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন। (২) ইহার অর্থ, সূর্য্যের রশ্মিই যাহার রশ্মি। যাস্কের মতে, ঐ স্থলে 'সূর্য্যরশ্মি' শব্দ 'চন্দ্রমা'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, সূর্য্যের রশ্মি দ্বারাই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। (৩)

এই 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দটীর অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে; ইহার অর্থ, 'সূর্য্যের রশ্মির সদৃশ যাহার রশ্মি'—এরূপও করা যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদ-মাধ্যন্দিন-

---

(১) সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমাস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম।
স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা॥

(২) সূর্য্যস্য রশ্মির্যস্য স সূর্য্যরশ্মিঃ।—"সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ। ২।২।৩৫। * * * অতএব ব্যাপকাব্যাধিকরণপদো বহুব্রীহিঃ।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী, বহুব্রীহিসমাসপ্রকরণ।

(৩) দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত, ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

সংহিতার ভাষ্যকার উব্বট ও মহীধর এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। (৪) এই অর্থে ব্যাকরণানুসারেও কোনও দোষ হয় না। (৫) কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যায় নিরুক্ত-কার যাস্কের প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা অস্বীকার করা যায় না। উব্বট ও মহীধরের ব্যাখ্যার আদর করিলে, 'চন্দ্রমার রশ্মি সূর্য্য-রশ্মির সদৃশ' এইমাত্র সিদ্ধ হয়; যাস্কের অভিপ্রেত সূর্য্য-রশ্মির সহিত চন্দ্র-রশ্মির অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। এই কারণে, উব্বট ও মহীধরের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাস্কের মতানুসরণে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই করা উচিত।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৯।৪।১।৯) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৬) উব্বট ও মহীধর শতপথের অনুসরণ করিয়াই এই 'সূর্য্য-রশ্মি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শতপথের ব্যাখ্যানের সহিত উব্বট ও মহীধরের ব্যাখ্যান অভিন্ন। যাস্ক এই ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থ লইয়াছেন। তাহার কারণ আছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা মন্ত্রের অনুসরণ করিয়াই করা উচিত। যে স্থলে অর্থ-নির্ণয়ের সহায়-রূপে অন্য মন্ত্র পাওয়া যায় না, সেই স্থলেই ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে হয়। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া, যাস্ক শতপথের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। (৭)

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ অনুবাকের অন্তর্গত একাদশ সূক্তের একটী মন্ত্রে এই চন্দ্র-কিরণ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই সূক্তটী গোতম ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সেই স্থলে বলিতেছেন ;—

---

(৪) সূর্য্যস্যেব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ।—উব্বট। সূর্য্যরশ্মিঃ সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ কিরণাঃ যস্য।—মহীধর।

(৫) সপ্তম্যুপমানপূর্ব্বপদস্যোত্তরপদলোপশ্চ।—কাত্যায়নবার্ত্তিক, মহাভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ২য় আহ্নিক, ২৪ সূত্র।

(৬) সূর্য্যরশ্মিরিতি সূর্য্যস্যেব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ।—শতপথ।

(৭) শতপথের সহিত পরবর্ত্তী ঋক্ মন্ত্রটীর একবাক্যতা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কোনও কোনও স্থলে উপমান এবং উপমেয় অভিন্ন হইলেও উপমা হইয়া থাকে, এরূপ দেখা যায় ;—

সাগরঃ সাগরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।

রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ॥

—রামায়ণ, যুদ্ধ (লঙ্কা) কাণ্ড, ১০৯ সর্গ। ৫২-৫৩

শতপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যানে,—"সূর্য্যস্যেব হি চন্দ্রমসো রশ্ময়ঃ" এই স্থলে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও উপমা কল্পিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে, ঋগ্বেদের মন্ত্রটির সহিত একবাক্যতা হইতে পারে।

অত্রা হ গোরমণ্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥

যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ ;—আদিত্য-রশ্মি-নিচয় সূর্য্য হইতে চন্দ্রমণ্ডলে অন্যের অলক্ষিতভাবে পতিত হয়, এই বিষয় ঐ আদিত্য-রশ্মি-নিচয়ই সম্যক্ অবগত আছে। (৮)

'আদিত্য-রশ্মি-নিচয়ই সম্যক্ অবগত আছে', এইরূপ বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। চন্দ্র-রশ্মির এই রহস্য সাধারণ-জন-সমাজে প্রচারিত হয় নাই; সাধারণের দৃষ্টিতে চন্দ্র-রশ্মি চন্দ্রের নিজেরই অসাধারণ সম্পত্তি। এই জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,—'আদিত্য-রশ্মিগণই সম্যক্ অবগত আছে'; অর্থাৎ, অন্য কেহ এই রহস্য অবগত নহে।

চন্দ্রের নিজের কোনও কিরণ নাই, চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য-রশ্মি-দ্বারাই আলোকিত হয়,—এইটুকুমাত্র বৈদিক গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। চন্দ্র-মণ্ডলের উপরিভাগ কঠিন অথবা কোমল, জলময় অথবা শুষ্ক, আমরা এ বিষয়ের কোনও প্রমাণই বৈদিক গ্রন্থে দেখি নাই। পরবর্ত্তী ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ চন্দ্রকিরণে শীতলতা অনুভব করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, চন্দ্র জলময়; সূর্য্যের যে রশ্মিধারা চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, উহা চন্দ্রমণ্ডলের জলরাশির সংস্পর্শে শীতল হইয়া পৃথিবীতে আইসে। (৯) বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ও নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য—ইঁহারা উভয়েই ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তি-যুক্ত মনে করিয়া উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। (১০)

---

(৮) "অত্র হ গোঃ সমমংসতাদিত্যরশ্ময়ঃ স্বং নামাপীচ্যমপচিতমপগতমপিহিতমন্তর্হিতং বাঽমুত্র চন্দ্রমসো গৃহে।"—নিরুক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, ২৫ খণ্ড।

(৯) তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥ ১
—ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায়—শৃঙ্গোন্নতিবাসনা।

সলিলময়ে শশিনি রবে র্দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশম্।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর নিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥ ২
—বরাহমিহির-কৃত-বৃহৎসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়। বরাহমিহিরকৃত-পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৩শ অধ্যায়।

(১০) উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি।—সায়নের ঋগ্বেদ-ভাষ্য, ১ম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম বর্গ।

অম্ময় হি চন্দ্রমসো মণ্ডলম্।—দুর্গাচার্য্য-কৃত টীকা-নিরুক্ত ; ২য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

আমাদের দেশের মহাকবিগণ চন্দ্ররশ্মির এই রহস্য অবগত ছিলেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে কিরণ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত ও শোভিত হয়, ইহা কালিদাস রঘুবংশে (১১) এবং শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে (১২) উল্লিখিত করিয়াছেন।

অতি পুরাতন যুগে ভারতে সত্যের আলোচনা অনেক দূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, বহু পূর্ব্বে স্মরণাতীত প্রাচীন কালে ভারতীয় ঋষিগণ তাহাই স্থির করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের প্রতিভা ও সত্যালোচনার কথা যতই চিন্তা করি, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হই।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমাদের শিক্ষা *

সমবেত মহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আহ্বান করিয়াছেন, [illegible] সহকারে আসিয়াছি। আপনারা যেরূপ আদর অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষ আপনারা যেরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহাতে আমি আনন্দিত ও পুলকিত হইয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অতি সম্মান, বিশেষ যখন মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আপনাদের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে আমার স্থান উপযুক্ত নহে। আজ আমাকে বান্ধব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার মূল্যবান ইতিহাসখানি দান করিয়াছেন। তিনি রায় মহাশয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাহাই আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি।—

---

(১১) পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ॥
তৃতীয় সর্গ; ২২ শ্লোক।

(১২) রথাবসৌ সারথিনা সনাথাদ্ রাজাবতীর্য্যাশু পুরং বিবেশ।
নির্গত্য বিম্বাদিব ভানবীয়াৎ সৌধাকরং মণ্ডলমংশুমালঃ॥ ৬ষ্ঠ সর্গ, ৭ম শ্লোক।

* বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, এম, এ, মহোদয়ের অভিভাষণ।

"যিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় ও পাণ্ডিত্যগৌরবে সমগ্র সভ্য জগতে যশোভূষিত হইয়াছেন; যিনি বিদ্যোৎসাহিতায় ও দানশৌণ্ডিকতায় বঙ্গদেশে দ্বিতীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন; যাঁহার বালসুলভ সরল প্রকৃতি, বীরোচিত মনস্বিতা, দরিদ্রতুল্য সামান্য জীবিকা এবং ঋষিতুল্য উচ্চ চিন্তা ভারতের প্রাচীন উচ্চ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে, সেই চিরকুমার তাপসব্রত, স্বজাতিকুলতিলক, যশোহর-খুলনার অকৃত্রিম বন্ধু ও খুলনার অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, "D. Sc., Ph. D., C. I. E., F. C. S"

এইরূপ লোকের পার্শ্বে আমার স্থান নহে। আবার শিক্ষকমণ্ডলীর সভাপতিত্ব আমার পক্ষেও উপযুক্ত নহে। আমি শিক্ষক নহি—শিক্ষক হইবার শিক্ষাও কখনও পাই নাই। তবে জিজ্ঞাস্য, আমি আসিলাম কেন? তাহার দুইটী উত্তর আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, আমি আমাদের ছাত্রবৃন্দকে নিতান্ত আপনার মনে করি। তাহারা দেশের আশা, আমাদিগের গৌরবের পাত্র। তাহাদের জন্য যাহা কিছু করিতে পারি, তাহা একান্তই করা কর্ত্তব্য মনে করি, সেই জন্যই আসিয়াছি। আমাদের ছেলেরা বুদ্ধিমান সকলেই বলে, কিন্তু তাহারা যে সব বিষয়ে কত ভাল, তাহারা কত সহৃদয়, স্নেহমমতাময়, পরের সেবা করিতে সতত প্রস্তুত, তাহা বাহিরের লোকে জানে না। তাহাদিগের এই সদ্ভাবগুলির সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়, তাহা আমাদের করণীয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় কিছু জানি। অনেক ছাত্র দেশ বিদেশে দেখিয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলের মত সুন্দর চরিত্রবান ছাত্র অন্য স্থানে দেখি নাই। নিজের বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে বিশেষ আদরের চক্ষে দেখি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা দেশকে গৌরবান্বিত করিবে। তাহাদের সাহায্য করা আমাদিগের ধর্ম্মের মত কার্য্য জ্ঞান করা উচিত। সেই জন্য আসিয়াছি। সকলেই কিছু না কিছু করিতে পারি, সেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। তাহা ভিন্ন আপনারা শিক্ষার বিষয় কি ভাবিতেছেন, তাহাও জানা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আসিয়াছি।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে, অন্য একটী কথার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা মার ভাষাতে কার্য্য চালাইবার নিয়ম করিয়াছেন, তাহারই জন্য ধন্যবাদ। ঘরের কথা পরের ঘরের ভাষায় কহা অন্যায় বলিয়া আমার মনে হয়। তাহাতে বাহিরে ঢাক পেটানর ভাব আসিয়া পড়ে। নিজের ঘরের কথা ঘরের ভাষায় কহাই উচিত। **House tops**এর ভাষা—

ঘরের চালের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার তাহার উপযোগী নহে। তবে আমাদের অনেকেই নিজের ভাষা আদর করিয়া শিক্ষা করেন নাই। নিজের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে যে পারে না, সে মানুষই নহে। পিতাকে 'গভর্ণর' ও মাতাকে 'মাম্ম' বলা ঘৃণেয়। তবে কোনও কোনও পরিবারে ইহাই এক কালে চলিয়াছিল। তখন নাম বানানে বিদেশী চেহারা দিবার জন্যও অনেকে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল সে ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দেবতাকে প্রণাম করা উচিত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিখি না। আজ কাল বাঙ্গালাতে কিছু পরীক্ষা হইতেছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বাটীতে বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রস্তরে ক্ষোদিত এই কয়টি কথা দেখিতে পাওয়া যায়— "মা সৎমার ঘরে স্থান পাইয়াছেন" (In the step-mother's Hall) সৎমার স্থান মার ঘরে না হওয়াই উচিত, তবে যদি সৎমা থাকেন, তাঁহার স্থান মার ঘরে হইলে তত দোষের হয় না। তবে মার স্থান সৎমার ঘরে হইয়াছে মনে করিলে মাথা নীচু হইয়া পড়ে, সেই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেকেরই এইটা মনে হইয়াছে যে, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বাঙ্গালা হওয়াই উচিত। মার স্থান সর্ব্বপ্রথম—সৎমার স্থান তাঁহার নীচে, ইহা তোমার আমার সর্ব্ব দেশে ঐ একই কথা। বিলাতে French কি German ভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা করিবার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। কখনও সম্ভব ছিল কি না। আমার ত মনে হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের না হওয়া কলঙ্কের কথা। আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিব, তাহাতে অপরের কি বলিবার থাকিতে পারে? (বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।) তবে আমরা তাড়াতাড়ি খানিকটা ইংরাজী শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। করিয়া খাইবার জন্য চাকুরীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরাজীর স্থান প্রধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু চিরদিনই তাহা থাকিবে কেন? দেশের মান চাও, গৌরব চাও, স্বরাজ চাও, স্বায়ত্ত শাসন চাও, আর নিজের ভাষাকে সৎমার ঘরে স্থান দিবে, ইহা লজ্জার কথা। এইখানে একটী কথা মনে হইল, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। জাপানের বিখ্যাত লেখক 'ওকাকুরা' (Okakura) এখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, অনেক দিন এখানে ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের জন কয়েকের কতকটা ঘনিষ্ঠ ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে আমরা ইংরাজী কায়দায় সম্মান করিবার জন্য Dinner দিই। তাহাতে বড় বড় সুন্দর ইংরাজী ভাষাতে বক্তৃতা

আমাদের কেহ [illegible] করিয়াছিলেন। ওকাকুরা বড় এক জন লেখক। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার দখল অসাধারণ ছিল। কিন্তু উত্তর দিবার সময় তিনি বলেন আমি ইংরাজীতে আপনাদের মত সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু তাহার জন্য আমি লজ্জা অনুভব করি না, ইংরাজী আমার ভাষা নহে, আমার রাজার ভাষা নহে। ঈশ্বর করুন, আপনাদিগের মত পরের ভাষা অত সুন্দর শিখিতে আমাদের কখনও যেন প্রয়োজন না হয়।" তবে কথা এই যে, আমরা কতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা চালাইতে পারি। সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন যে, I. A., I. Sc. পর্য্যন্ত সব শিক্ষা বাঙ্গালাতে চলে। [illegible] আমারও তাহাই মনে হয়। ক্রমে বাঙ্গালাকে শিক্ষার [illegible] তাহা হইতে পারে, আপনাদিগের আলোচনার সময় [illegible], আশা করি। ইংরাজী বিদ্যালয়ে French ও German text book পড়িতে ক্রমায়য়েই বলে। আমাদেরও ইংরাজী Text book পড়িতে কোনও বাধা হইতে পারে না। Text book ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং ইংরাজ শিক্ষকের উপদেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য যথেষ্ট ইংরাজী শিক্ষা উচিত। তাহা ইংরাজী Second Language করিলেও হইতে পারে।

ইংরাজ শিক্ষকের কথা বলিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষা আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে হওয়া উচিত। যাঁহারা আমাদের আপনার, তাঁহারাই শিক্ষকের উপযুক্ত। ডাক্তার রায়কে দেখুন। তিনি ভিন্ন অন্য অনেক উপযুক্ত দেশের লোক আছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। না থাকিলে প্রস্তুত করা উচিত। দেশকে সব বিষয়ে আপনার করিয়া তুলিতে চাও, যদি তাহাই করিতে হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি? উত্তর দেওয়া কঠিন। উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। University Commission-এর প্রথম প্রশ্নের এই যে উত্তর দিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে শুনাইতেছি। কলিকাতা ও অপর অঞ্চলের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা ভাল জানেন, এবং শিক্ষা-কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই আমার সহিত একমত বলিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি।

Q. Do you consider that the existing system of University Education affords to young Indians of ability full opportunity of obtaining

the highest training ? If not, in what main respects do you consider the existing system deficient from this point of view ?

A. I do not. Training depends upon what one is being trained for, but the existing system is without an ideal, or a definite ultimate aim. The country wants education to enable the people to stand on their own legs in every respect, "to prepare them for complete living," to develop their work-power and character-power ; to give them all round strength. A system originally meant for obtaining efficient clerks and now to a limited extent, for vocational works, is failing to meet the progressive needs of our people. Our University has failed to appreciate that it ought to help the process of nation-building. "It is not inspired by motives which answer to deeper things in human nature and the higher things in human aspiration." It is not based upon things which lie close to the hearts of our people. It has little regard for our permanent environments. It is a makeshift and without a corporate life. It has not been allowed sufficient freedom of growth.

Its utility is doubted and it is viewed with suspicion, as tending to disloyalty. Educational Institutions are now subjected to undue political surveillance. There is want of a sufficient number of proper teachers. In Govt. Colleges the foreign element is placed on an undeserved and undesirable basis of superiority. The Indian teacher occupies an inferior position. It is believed that benefaction which favour the employment of Indian teachers even of undoubted merit and ability are not adequately supplemented by Govt. grants. They are not sympathetically treated and the work suffers in consequence. Most of the teachers are too poorly paid, It does not seem to have been realised that the teacher ought to be freed from pecuniary anxiety so as to be able to consecrate his life to his work.

আমাদের শিক্ষা উচ্চ-লক্ষ্য-বিহীন। মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। আত্ম-নির্ভর,—নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে নিজে বহন করিতে হইবে—এই মহা শিক্ষার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। কার্য্যবল, চরিত্রবল, সার্ব্বাঙ্গীন বল যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেরাণী কিংবা আইন-ব্যবসায়ী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। দেশ দিন দিন অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, অনেক নূতন জিনিস প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে, সে প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা চলিতেছে না। আমাদের জাতিকে জাতীয় ভাব শিক্ষা দেওয়া, আমাদিগকে nation করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব-প্রকৃতির যে গভীর ভাবগুলি আছে, তাহার বিকাশ করা, মানব-হৃদয়ের যে সর্ব্বোচ্চ আশা, তাহাহ পরিপূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা নিতান্ত

আমাদের মর্ম্মের ভিতর,তাহারই প্রকাশ প্রয়োজন। দেশের অবস্থা, চারি দিকে আমাদিগকে যাহা ঘেরিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যাহা চিরদিন আমাদিগের থাকিবে,যাহা ছাড়িয়া আমরা যাইতে পারিব না, যাহা আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই কথা আমার মনে হয়। ছাড়া-ছাড়া না হইয়া, আমাদের আশা ভরসা, যাহা কিছু সম্বল আমাদের আছে, তাহা একীভূত হওয়া উচিত। তাহারই জন্য শিক্ষা করিতেছি—জীবনের শেষ লক্ষ্য কি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছি—ইহাই মনে রাখা উচিত।

Emersonএর কথায় "Education should be as broad as man"—মানব-জীবন যতটা প্রশস্ত, শিক্ষারও ততটা প্রসার হওয়া উচিত। মানব-জীবনের একটা চরম উদ্দেশ্য আছে, যাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়। সে ধর্ম্মের ভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়? হিন্দুর হৃদয় ধর্ম্মভাবপূর্ণ, আমাদের শিক্ষায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি? তাহার কোনও বিকাশ হইয়াছে কি? তাহা প্রকাশ হইতে পায় কি? না, তাহা একেবারে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, দেশের ধর্ম্মভাব মরিয়া যায় নাই। তাহা নিদ্রিত অবস্থায় আছে। জাগাইয়া দিতে সময় লাগে না। তবে ঘুম পাড়ান কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন, "বিষয় বালিসে অলস রেখো—সজাগ থেকো ঘুমায়ো না"। এ দেশে শিক্ষা দীক্ষা কথা দুইটী সংলগ্ন। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আমাদের শাস্ত্রীয় স্বারাজ্য-সিদ্ধি—এখানে Home-Ruleএর কথা বলিতেছি না, এক জন বন্ধু যাহাকে Spiritual autonomy বলিয়াছেন, তাহারই কথা বলিতেছি। নিজকে আয়ত্তের মধ্যে আনার শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। এ বিষয় এখন আর বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দৈন্য সংলগ্ন, দিন দিন ছাত্রেরা জীবনের ভার চালাইতে অসমর্থ হইতেছে। আমাদিগের জাতীয় ভাব থাকিতে পারে—Home-Rule ভাবে আত্মা অধিকৃত হইতে পারে, কিন্তু ঘরের ছেলের খাওয়া পরা কিসে চলে, তাহার উপায় করিতে পারি না। যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ-লক্ষ্য-বিহীন, সেইরূপ জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে হইতে পারে, সে লক্ষ্যও বিশেষ কিছুই নাই। অধিকাংশই আইন-ব্যবসায়ী হইতেছে। ব্যবসায়ী আইনজ্ঞ প্রস্তুত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। যখন Senateএ ছিলাম—সরস্বতীর অনুকম্পায় এখন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন—তখন University Law Collegeএর প্রয়োজন

নাই, বলিয়াছিলাম। সার গুরুদাস, ডাক্তার রাসবিহারী প্রভৃতি ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কথা খাটিল না। এখন সে Law Collegeএ শুনিতে পাই ২৫০০ ছেলে। জেলায় মহকুমায় দেখিতে পাই, শত শত উকীল। তাঁহারা সবাই করিয়া খাইতে পান না, তাহা সকলেই জানেন। তবুও দিন দিন দল বাড়িতেছে, আর গৃহে গৃহে দৈন্য বাড়িতেছে। মধ্যবিত্ত লোকের ঘর দুঃখসমাচ্ছন্ন। দেশ নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে—আর আমাদিগের শিক্ষা—বড়, মধ্যবিত্ত, ছোট, এক রকম চলিয়াছে। অন্য কোনও স্থানে এরূপ নাই। Cambridgeএ যখন ছিলাম—৩০০০ মাত্র ছাত্র সেখানে—তার মধ্যে ২০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। ২য় Termএর পরেই Cricket, Boating প্রভৃতিতে সময় যাপন করিয়া Degree না লইয়াই চলিয়া যাইত। বিলাতে Oxford, Cambridgeএ অর্থশালী লোকের সন্তানরাই প্রধানতঃ আসিত। যাহার বাৎসরিক আয় ১০০০ পাউণ্ড, তাহার দুই পুত্র থাকিলে, এক জনকে মাত্র Universityতে পাঠায়, অন্যটিকে School হইতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা সবাই এক রকম প্রণালীতে পড়ি। ইংরাজের ছেলে অতি অল্প বয়স হইতেই ছেলে কি করিবে, তাহা ঠিক করে। আমরা তাহা কখনও ঠিক করি না। কপালের উপর নির্ভর করি। ভাঙ্গা কপালে আর কত হইতে পারে? কাঙ্গালের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দৈন্য আমরা বাড়াইতেছি। অতএব আপনাদিগের নিকট এই আবেদন যে, শিক্ষার প্রথা এইরূপ করুন, যাহাতে সকলের আহারের উপায় হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একই শিক্ষার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। তবে এক একটী সাঙ্গোপাঙ্গ, সম্পূর্ণ হওয়া উচিত—Complete in itself—হওয়া উচিত। কোন্ সময় পর্য্যন্ত কিরূপ শিক্ষা চলিবে, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। আপনারা এই বিষয় আলোচনা করিবেন, আমার আশা।

আইনজ্ঞ বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু Malaria-পীড়াক্রান্ত দেশে ডাক্তারের অভাব। দুইটীমাত্র কলেজ আছে। আজ কাল দুই একটী ছোট School হইয়াছে, কিন্তু আরও অধিক Medical College, School হওয়া উচিত। এই Agricultural দেশে Agricultural School, College, বলিবার মত কিছুই নাই। Engineering অতি কম আছে, এবং technological শিক্ষার একেবারেই কোনও আয়োজন নাই। এ সব লজ্জার কথা।

আপনারা আমার কাছে একটী লিখিত অভিভাষণ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময় ও স্বাস্থ্যের অভাবে লিখিতে পারি নাই। অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বলিবার অবসর আপনাদিগের আলোচনার সময় পাইব, আশা করি। সেই জন্য এইখানেই শেষ করিলাম। শেষ করিবার পূর্ব্বে, আপনারা যে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। *

সপ্ত-সিন্ধু।

ঋগ্বেদে নদীদিগের সাধারণ নাম ছিল—নদী ও সিন্ধু; কোনও কোনও স্থানে ধুনি ও সীবা শব্দ দ্বারাও নদী বুঝাইত। ঋগ্বেদের বহু স্থানে সপ্ত-সিন্ধুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কোনও কোনও ঋষি ইহাদিগকে সপ্ত-যহ্বী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (২) ঋষিগণ মনে করিতেন, পৃথিবীতে যেরূপ দিব্যলোকেও সেইরূপ সপ্ত-সিন্ধু আছে। (৩) আকাশের ছায়াপথকেই

---

* বাগেরহাটের "জাগরণ" শ্রদ্ধাস্পদ চৌধুরী মহাশয়ের এই বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।—আমরা "জাগরণ" হইতে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(১) অস্য। শ্রবঃ। নদ্যঃ। সপ্ত। বিভ্রতি।—১।১০২।২

ইঁহার কীর্ত্তি সাত নদী ধারণ করে।

যঃ। হত্বা। অহিং। অরিণাৎ। সপ্ত সিন্ধূন্।—২।১২।৩

যিনি অহিকে বধ করিয়া সপ্ত সিন্ধুকে প্রবাহিত করিয়াছেন।

অস্মৈ। আপঃ। মাতরঃ। সপ্ত। তস্থুঃ
নৃভ্যঃ। তরায়। সিন্ধবঃ। সুপারাঃ।—৮।৮৫।১

সাত জন জলমাতা ইঁহার নিমিত্ত ছিলেন। সুখে পারকারিণী সিন্ধু সকল নেতাদিগের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত।

(২) অবধয়ন্। সুভগং। সপ্ত। যহ্বীঃ
শ্বেতং। জজ্ঞানং। অরুষং। মহিত্বা।—৩।১।৪

সাত যহ্বী (অর্থাৎ মহতী নদী) শুভ্রবর্ণ, অরুষ, সুভগ, উৎপাদিত (অগ্নিকে) মহত্ব দ্বারা বর্দ্ধিত করেন।

(৩) যত্র। রাজা। বৈবস্বতঃ। যত্র। অবরোধনম্। দিবঃ।
যত্র। অমূঃ। যহ্বতীঃ। আপঃ। তত্র। মাম্। অমৃতং। কৃধি।—৯।১১৩।৮

সেকালে দিব্য-সিন্ধু মনে করা হইত। পৃথিবীতে যেমন সপ্ত-সিন্ধুর মধ্যে একটীকে সিন্ধু বলা হইত, সেইরূপ আকাশের সিন্ধুদিগের মধ্যেও একটী সিন্ধু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।(১) সেইরূপ অপর একটীকে বিপাশ ও অন্যকে অংশুমতী নাম দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়।(২) অপরগুলির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পৃথিবীর সপ্ত-সিন্ধু দুই ভাগে বিভক্ত; উহারা বর্ত্তমান সিন্ধুনদীর দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ শাখানদী-রূপে প্রবাহিত। এই দ্বি-সপ্ত নদী ও আকাশের সপ্ত সিন্ধু লইয়া তিন সপ্ত-সিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই।(৩) ১০ম মণ্ডলের

যে লোকে বৈবস্বত (যম) রাজা, যেখানে দিব্যলোকের প্রবেশদ্বার, যেখানে ঐ সকল মহৎ জল সকল, তথায় আমায় অমর কর।

বৈশ্বানরস্য। বিমিতানি। চক্ষসা
সানূনি। দিবঃ। অমৃতস্য। কেতুনা।
তস্য। ইৎ। উঁ। বিশ্বা। ভুবনা। অধি
মূর্দ্ধনি। বয়াঃইব। রুরুহুঃ। সপ্ত। বিস্রুহঃ।—৬।৭।৬

অমর বৈশ্বানরের (অর্থাৎ সূর্য্যস্থিত অগ্নির) তেজোরূপ পতাকা দ্বারা দিব্যলোকের উন্নত প্রদেশ সকল নির্ম্মিত; সকল ভূতজাতের মস্তকের উপরে শাখাসদৃশ তাঁহার সাত নদী উঠিয়াছে।

(১) জগতা। সিন্ধুং। দিবি। অস্তভায়ৎ।—১।১৬৪।২৫
জগতী ছন্দ দ্বারা সিন্ধুকে দিব্যলোকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

(২) এতৎ। অস্যাঃ। অনঃ। শয়ে। সুসংপিষ্টং। বিপাশি। আ
সসার। সীং। পরাবতঃ।—৪।৩০।১১

এই তাঁহার (অর্থাৎ উষার) শকট; বিপাশা-তীরে ভগ্ন হইয়া শায়িত রহিয়াছে; (তিনি) দূর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

দ্রপ্সং। অপশ্যং। বিষুণে। চরন্তম্
উপহ্বরে। নদ্যঃ। অংশুমত্যাঃ।—৮।৮৫।১৩

অংশুমতী নদীর নিকট বিকৃত বেশে সোমকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।

—অংশু অর্থেও সোম; যঃ। তে। অংশু। বাতচ্যুতঃ।—১০।১৭।১২

(৩) প্র। সু। বঃ। আপঃ। মহিমানম্। উত্তমম্
কারুঃ। বোচাতি। সদনে। বিবস্বতঃ।
প্র। সপ্ত সপ্ত। ত্রেধা। হি। চক্রমুঃ
প্র। সৃত্বরীণাম্। অতি। সিন্ধুঃ। ওজসা।—১০।৭৫।১

হে জলসমূহ! তোমাদিগের সুন্দর, উত্তম মহিমা বিবস্বানের (অর্থাৎ যজমানের) যজ্ঞগৃহে কারু (অর্থাৎ স্তোত্ররচনাকারী) বলিতেছে। (তোমরা) সাত, সাত হইয়া তিন ভাগে

৭৫ সূক্তের ১ম ঋকে ত্রি-সপ্ত নদীর কথা বলা হইয়াছে; ইহার অপর ঋক্‌-গুলিতে কেবল দুই-সপ্ত-নদীর উল্লেখ থাকায়, তৃতীয় সপ্ত-সিন্ধু যে দিব্যলোকের, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ১ম ঋকে 'সিন্ধু'কে অপর নদীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ২য় ঋকে, বরুণ 'সিন্ধু'র পথ সকল কাটিয়াছেন, এবং 'সিন্ধুই' অপর নদীদিগের অগ্রে গমন করিতেছে, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। (১) ৩য় ঋকে, 'সিন্ধু'নদীর মেঘগর্জ্জনসদৃশ শব্দ ও প্রচণ্ড বেগের উল্লেখ আছে। (২) এই সকল বিশেষত্ব দ্বারা আমরা ইহাকে বর্ত্তমান সিন্ধুনদী ভিন্ন অপর কোনও নদী বলিয়া ভ্রম করিতে পারি না। পরবর্ত্তী ঋক সকল হইতে আমরা জানিতেছি যে, 'সিন্ধু'নদীর দুই দিকে দুই শ্রেণীবদ্ধ নদী আসিয়া উহাতে পতিত হইয়াছে। (৩) এক দিকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,

---

প্রবাহিত হইয়াছ; স্রোতস্বিনীদিগের মধ্যে সিন্ধু বল দ্বারা (অপর নদীদিগকে) অতিক্রম করিয়াছে।

(১) প্র। তে। অরদৎ। বরুণঃ। যাতবে। পথঃ
সিন্ধো। যৎ। বাজান্। অভি। অদ্রবঃ। ত্বম্।
ভূম্যা। অধি। প্রবতা। যাসি। সানুনা
যৎ। এষাং। অগ্রম্। জগতাম্। ইরজ্যসি॥—১০।৭৫।২

হে সিন্ধো! বরুণ তোমার যাইবার নিমিত্ত পথ সকল কাটিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তুমি যজ্ঞের (বা অন্নের) অভিমুখে দ্রুত আসিয়াছ। (তুমি) ভূমির উপর উন্নত (পথ) দ্বারা গমন করিতেছ। যেহেতু এই সকল গমনশীলাদিগের অগ্রে গমন করিতেছ।

(২) দিবি। স্বনঃ। যততে। ভূম্যা। উপরি
অনন্তম্। শুষ্মম্। উৎ। ইয়র্ত্তি। ভানুনা।
অভ্রাৎ ইব। প্র। স্তনয়ন্তি। বৃষ্টয়ঃ। সিন্ধুঃ
যৎ। এতি। বৃষভঃ। ন। রোরুবৎ॥—১০।৭৫।৩

ভূমি হইতে (সিন্ধুর) শব্দ দিব্যলোকের উপরে গমন করিতেছে; দীপ্তির সহিত অনন্তবল বহির্গত হইতেছে; সিন্ধু যখন বৃষভের মত গর্জ্জন করিয়া আগমন করেন, মেঘ হইতে যেন বৃষ্টিকারী (মরুৎগণ) বজ্রধ্বান করিতেছেন।

(৩) অভি। ত্বা। সিন্ধো। শিশুং। ইৎ। ন
মাতরঃ। বাশ্রাঃ। অর্ষন্তি। পয়সা ইব। ধেনবঃ।
রাজা ইব। যুধ্বা। নয়সি। ত্বম্। ইৎ। সিচৌ
যৎ। আসাম্। অগ্রম্। প্রবতাম্। ইনক্ষসি॥—১০।৭৫।৪

হে সিন্ধো! শব্দকারিণী (নদী) মাতৃগণ শিশুবৎ তোমার অভিমুখে পয়স্বিনী গাভীর মত আগমন করিতেছেন। রাজা যেরূপ যুদ্ধে (দুই সৈন্যদলকে), সেইরূপ তুমি এই দুইটী (নদী-শ্রেণীকে) লইয়া যাইতেছ, যেহেতু এই সকল প্রবাহিণীদিগের অগ্রে গমন করিতেছ।

শুতুদ্রী, পরুষ্ণী, অসিক্লী-যুক্তা মরুদ্বৃধা, বিতস্তা ও সুষোমা-যুক্তা আর্জীকীয়া। (১) অপর দিকে তৃষ্টামা, সুসর্ত্বা, রসা, শ্বেতী, কুভা, গোমতী, ক্রুমু ও মেহত্নু। (২) পাছে আমরা অপর নদীদিগের মধ্যে 'সিন্ধু'কে হারাইয়া ফেলি, সেই জন্ম ঋষি ৭ম ঋকে পুনরায় ইহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণসমূহ [illegible] বিশেষণগুলি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সূক্তেই [illegible] নদীর শাখারূপে উল্লেখ করায় [illegible] জানিতেন। তিনি এই নদীর নামটী জানিয়াছেন, এইমাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু যমুনা নদীর নাম ঋগ্বেদের ৫ম ও ৭ম মণ্ডলেও প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) ইমম্। মে। গঙ্গে। যমুনে। সরস্বতি
শুতুদ্রী। স্তোমম্। সচত। পরুষ্ণি। আ।
অসিক্ন্যা। মরুৎবৃধে। বিতস্তয়া
আর্জীকীয়ে। শৃণুহি। আ। সুষোময়া। ঐ ৫
হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতি, শুতুদ্রি, পরুষ্ণি, অসিক্নীযুক্তা মরুদ্বৃধে, বিতস্তা ও সুষোমাযুক্তা আর্জীকীয়া! আমার এই স্তব গ্রহণ কর, শ্রবণ কর।

(২) তৃষ্টাময়া। প্রথমম্। যাতবে। সজূঃ
সুসর্ত্বা। রসয়া। শ্বেত্যা। ত্যা।
ত্বং। সিন্ধো। কুভয়া। গোমতীম্
ক্রুমুম্। মেহত্ন্বা। সরথম্। যাভিঃ। ঈয়সে। ঐ ৬
হে সিন্ধো! তুমি প্রথম যাইতে যাইতে তৃষ্টামার সহিত মিলিত হইলে; তৎপরে সুসর্ত্তু, রসা ও শ্বেতার সহিত যুক্ত (হইলে); তুমি কুভার সহিত গোমতীকে, মেহত্নুর সহিত ক্রুমুকে (মিলিত করিয়াছ), এবং ইহাদের সহিত একই রথে গমন করিতেছ।

ঋজীতি। এনী। রুশতী। মহিত্বা
পরি। জ্রয়াংসি। ভরতে। রজাংসি।
অদব্ধা। সিন্ধুঃ। অপসাং। অপঃতমা
অশ্বা। ন। চিত্রা। বপুষী ইব। দর্শতা। ঐ ৭
ঋজুগামিনী, শ্বেতবর্ণা, দীপ্যমানা, সিন্ধু মহত্ত দ্বারা বেগবান্ জল সকল পূর্ণ করিতেছেন (বা আনিতেছেন)। অপরাজিতা সিন্ধু কর্ম্মকারিণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অশ্বের মত বিচিত্র-গতিবিশিষ্টা, দেখিতে বিপুলকায়া রমণীর ন্যায় দর্শনীয়া।

অন্ত এক ঋকে গাঙ্গ্য শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যায়। (১) যমুনা তীরে সুদাসের সহিত ভেদের যুদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (২) অতএব ঋগ্বেদের কালে আর্য্যগণ যমুনার তীরে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, দেখা যায়। কিন্তু ইহাকে সিন্ধুর এক শাখা বলিয়া গ্রহণ করায়, তাঁহারা যে যমুনা নদীর তীরে অধিক দূর গমন করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

শুতুদ্রী নদীর নাম শুধু এই সূক্তে নহে, ৩য় মণ্ডলের একটী সূক্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সূক্ত বিশ্বামিত্র ঋষির রচিত। তিনি দূরবর্ত্তী 'মাতৃতমা সিন্ধু'র অভিমুখে গিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুতুদ্রী ও বিপাশের তীরে আসিয়াছেন। (৩) তাঁহার সঙ্গে শকট, রথ ও অশ্বাদি বর্ত্তমান। আসিয়া দেখেন, নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। (৪) কিরূপে পার হইবেন, এই সমস্যা। তখন তিনি নদীদ্বয়ের আরাধনা করিলেন।

---

(১) যমুনায়াং। অধি। শ্রুতং। উৎ। রাধঃ। গব্যম্। মৃজে।
নি। রাধঃ। অশ্ব্যম্। মৃজে॥—৫।৫২।১৭

যমুনাকূলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গোসম্বন্ধীয় ধন যেন প্রাপ্ত হই, যেন অশ্বসম্বন্ধীয় ধন লাভ করি।

(২) আবৎ। ইন্দ্রং। যমুনা। তৃৎসবঃ। চ
প্র। অত্র। ভেদং। সর্বতাতা। মুষায়ৎ।—৭।১৮।১৯

যমুনা ও তৃৎসুগণ ইন্দ্রকে তুষ্ট করিয়াছিল। এই স্থানে যুদ্ধে ভেদকে (ইন্দ্র) দূর করিয়াছিলেন।

(৩) অচ্ছ। সিন্ধুং। মাতৃতমাং। অযাসম্
বিপাশং। উর্বীম্। সুভগাং। অগন্ম।
বৎসং ইব। মাতরা। সংরিহাণে
সমানং। যোনিং। অনু। সঞ্চরন্তী॥—৩।৩৩।৩

(আমি) মাতৃতমা সিন্ধুর অভিমুখে গিয়াছিলাম। সুভগা, মহতী বিপাশা নদীতে (আমরা) আসিয়াছি। বৎস লেহন করিতে ইচ্ছুক (গাভী) মাতৃদ্বয়ের মত, একই গৃহ অভিমুখে গমনকারি দ্বয় (অর্থাৎ বিপাশা ও শুতুদ্রী)।

(৪) প্র। পর্বতানাম্। উশতী। উপস্থাৎ
অশ্বে ইব। বিসিতে। হাসমানে।
গাবা ইব। শুভ্রে। মাতরা। রিহাণে
বিপাট্। শুতুদ্রী। পয়সা। জবেতে॥—৩।৩৩।১

বন্ধনমুক্তা, আনন্দিতা, কামাতুরা অশ্বীদ্বয়ের মত, (বৎস) লেহন করিতে (ধাবমানা) দুইটী শুভ্র গাভী মাতার মত, পয়োযুক্তা বিপাশা ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্ব্বতদিগের ক্রোড় হইতে (বহির্গত হইয়া) বেগে গমন করিতেছে।

৬

নদীদ্বয় বিশ্বামিত্রকে এই সত্য করাইলেন যে, তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ যজ্ঞ সকলে তাঁহাদিগের নামে স্তোত্র রচনা করিয়া, তাহা পাঠ করিবেন। (১) তিনি যে দূর হইতে শকট, রথাদি লইয়া আসিতেছেন, এবং উহাদের পার করিবার জন্য নদীকে নিম্ন হইতে বলিতেছেন, তাহা ৯ম ও দশম ঋকেও দেখিতে পাওয়া যায়। (২) এই আরাধনার ফলে নদীদিগের জল কমিয়া গিয়াছিল, এবং বিশ্বামিত্র ভরতদিগের সহিত পার হইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের বিপাশা পার হওয়া বৈদিক ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। কারণ, তিনি নদী পার হইয়া, হয় সুদাস রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ-রূপে, কিংবা সুদাস রাজার পুরোহিত-রূপে যমুনাতীরে অবস্থিত ভেদকে সংহার করিতে গমন করিয়াছিলেন। (৩) পূর্ব্বে ভেদ সম্বন্ধে ঋক উদ্ধার করা গিয়াছে।

---

(১) এতৎ। বচঃ। জরিতঃ। মা। অপি। মৃষ্ঠাঃ
আ। যৎ। তে। ঘোষান্। উত্তরা। যুগানি।
উক্থেষু। কারো। প্রতি। নঃ। জুষস্ব
মা। নঃ। নি। কঃ। পুরুষত্রা। নমঃ। তে।—৩।৩৩।৮

হে স্তোত্রকারি! এই বাক্য যেন বিস্মৃত না হও। ভবিষ্যতে তোমার যে সকল স্তোত্র ঘোষিত হইবে, হে কারো! (সেই) উক্থ সকলে আমাদিগকে তুষ্ট করিও। আমাদিগকে পুরুষ সদৃশ (বর্ণনা) করিও না। তোমাকে নমস্কার।

(২) ও ঃ সু। স্বসারঃ। কারবে। শৃণোত
যযৌ। বঃ। দূরাৎ। অনসা। রথেন।
নি। সু। নমধ্বম্। ভবত। সুপারাঃ
অধঃ।অক্ষাঃ। সিন্ধবঃ। স্রোত্যাভিঃ।—৩।৩৩।৯

হে সুন্দর ভগিনীগণ! কারুকে শ্রবণ কর। শকট (ও) রথ সহিত দূর হইতে (আসিয়া) তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুন্দররূপে নত হইয়া সুখে পারকারিণী হও। হে সিন্ধুগণ! স্রোত সকলের সহিত (রথ-চক্রের) অক্ষের নিম্নে (গমন কর)।

আ। তে। কারো। শৃণবাম। বচাংসি
যযাথ। দূরাৎ। অনসা। রথেন।—৩।৩৩।১০

হে কারো! তোমার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াছি। (তুমি) দূর হইতে শকট (ও) রথ সহিত আগমন করিয়াছ।

(৩) মহান্। ঋষিঃ। দেবজাঃ। দেবজূতঃ
অস্তভ্নাৎ। সিন্ধুং। অর্ণবম্। নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্
অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—৩।৫৩।৯

আমরা দেখাইয়াছি, নদীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান কালের সিন্ধুনদ, বৈদিক যুগেই, সিন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নদীদিগের সাধারণ নাম সিন্ধু ছিল বলিয়া, পাছে উহা অন্য সিন্ধুকে বুঝায়, সেই জন্য উহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল, এবং উহার আর একটী নামও দেওয়া হইয়াছিল। সেই নাম কি, এক্ষণে আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে 'সরস্বতী' নাম ৫ম ঋকে উক্ত হইয়াছে। এই সরস্বতী নদী কোন্ নদীর নাম? ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত রচিত হইয়াছিল, দেখা যায়। ২য় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি কতকগুলি ঋকে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি এই নদীকে মাতৃতমা, নদীতমা ও দেবিতমা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ ঋষি ইঁহাকে সপ্ত-ভগিনী-যুক্তা, প্রিয়াদিগের মধ্যে প্রিয়া, সোমপানার্হা ও 'অপসাম্ অপোতমা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে

মহান্, ঋষি, দেবজাত, দেবজূত, নৃচক্ষা বিশ্বামিত্র জলপূর্ণা নদীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যখন সুদাসকে বহন করিতেছিলেন; ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

উপ। প্র। ইৎ। কুশিকাঃ। চেতয়ধ্বম্
অশ্বং রায়ে। প্র। মুঞ্চত। সুদাসঃ।
রাজা। বৃত্রম্। জঙ্ঘনৎ। প্রাক। অপাক্
উদক্। অথ। যজাতে। বরে। আ। পৃথিব্যাঃ।—৩।৫৩।১১

হে কুশিকগণ। (অশ্বের) নিকট (তোমরা) গমন কর; অশ্বকে ধনলাভে চেতনা দাও, এবং মোচন কর; সুদাস রাজা পূর্ব্ব, পশ্চিম (ও) উত্তরে স্থিত বৃত্রকে সংহার করিয়াছেন; অনন্তর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশে যজ্ঞ করিতেছেন।

(১) অম্বিতমে। নদীতমে। দেবিতমে। সরস্বতি।—২।৪১।১৬

হে মাতৃতমে, নদীতমে, দেবিতমে সরস্বতি!

(২) উত। নঃ। প্রিয়া। প্রিয়াসু। সপ্তস্বসা। সুজুষ্টা।
সরস্বতী। সোম্যা। ভূৎ।—৬।৬১।১০

এবং আমাদিগের প্রিয়াদিগের মধ্যে প্রিয়া, সপ্তভগিনীযুক্তা সুন্দররূপে সেবিতা সরস্বতী সোমপানার্হা হইয়াছেন।

প্র। যা। মহিম্না। মহিনা। আসু। চেকিতে
দ্যুম্নেভিঃ। অন্যাঃ। অপসাম্। অপঃতমা।
রথঃ ইব। বৃহতী। বিভ্বনে। কৃতা
উপস্তুত্যা। চিকিতুষা। সরস্বতী।—৬।৬১।১৩

যিনি মহিমা দ্বারা মহতীদিগের মধ্যে বিজ্ঞাত হন; (যিনি) দ্যোতমান (অন্য সকলের অপেক্ষা)

'সিন্ধু'র ঠিক এই বিশেষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭ম মণ্ডলে বশিষ্ঠ ঋষি সরস্বতীকে একটী স্তোত্রে আহ্বান করিয়াছেন। উহার প্রথম ঋকেই সরস্বতী ও সিন্ধু যে একই নদীর নাম, তাহা সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। (১) ২য় ঋকে, সরস্বতী নদীই গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতা বর্ণনা করায়, ইহা যে বর্ত্তমান সিন্ধু ভিন্ন অপর নদী হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। (২)

পার্ব্বতীয় নদীগণ অত্যন্ত শব্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হয়। এই শব্দ দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের মত শ্রুত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ইহারা এত খর-স্রোতা যে, উহাদের বিপরীত দিকে গমন করা বা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সরস্বতী নদীর এই সকল গুণ ঋষিদিগের স্তোত্র হইতে জানিতে পারা যায়। (৩) সরস্বতীর দুই পারে পর্ব্বতশ্রেণী আছে বলিয়া ইহা অয়োময়পুরীযুক্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে 'পারাবতঘ্নী' বলায় বুঝা যাইতেছে যে, এই নদী পার হইতে চেষ্টা করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য মনে করা হইত। ইহার স্রোতঃ এত প্রবল যে, পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে পতিত হইয়া উহাকে অতি সহজেই ভগ্ন করিয়া ফেলে। (৪) পার্ব্বতীয় সিন্ধুদিগের শব্দ হইতেই প্রাচীন কালে ঋষিগণ

অপর সকল কল্যাকারিণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; বিদুর নির্ম্মিত কুতরথ সদৃশ, বৃহতী সরস্বতী জ্ঞানীর দ্বারা উপস্তুতা হন।

(১) প্র। ক্ষোদসা। ধায়সা। সস্রে। এষা

সরস্বতী। ধরুণম্। আয়সী। পূঃ।

প্রবাবধানা। রথ্যা ইব। যাতি। বিশ্বাঃ

অপঃ। মহিনা। সিন্ধুঃ। অন্যাঃ॥—৭।৯৫।১

এই অয়োময়-পুর-যুক্তা সরস্বতী বিধৃত জল সহিত ধারক (সমুদ্র) অভিমুখে শীঘ্র গমন করিতেছেন; অপর সকল জলকে সিন্ধু মহিমা দ্বারা বাধা দিয়া রথী সদৃশ গমন করিতেছেন।

(২) একা। অচেতৎ। সরস্বতী। নদীনাম্

শুচিঃ। যতী। গিরিভ্যঃ। আ। সমুদ্রাৎ।

রায়ঃ। চেতন্তী। ভুবনস্য। ভূরেঃ

ঘৃতম্। পয়ঃ। দুদুহে। নাহুষায়॥—৭।৯৫।২

নদীদিগের মধ্যে শুদ্ধা, গমনশীলা সরস্বতী একাই গিরি সকল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন। বহু লোকের ধনপ্রদানকারিণী (সরস্বতী) নহুষের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

(৩) যস্যাঃ। অনন্তঃ। অহ্রুতঃ। ত্বেষঃ। চরিষ্ণুঃ। অর্ণবঃ।

অমঃ। চরতি। রোরুবৎ॥—৬।৬১।৮

যাঁহার অনন্ত, অপরাজিত, দীপ্ত, চলিষ্ণু, বেগযুক্ত জল গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে।

(৪) ইয়ং। শুষ্মেভিঃ। বিসখা ইব। অরুজৎ

সানু। গিরীণাং। তবিষেভিঃ। ঊর্মিভিঃ।

সাধারণতঃ নদীদিগকে এবং প্রধানতঃ সরস্বতীকে বাক্যের দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে সপ্ত-ছন্দ প্রসিদ্ধ। মনে হয়, পঞ্জাবের সপ্ত-সিন্ধুই সপ্ত-ছন্দ বা বাণীর দেবীরূপে গৃহীতা হইয়াছিলেন। এই সাত বাণী দিব্যলোকের সপ্ত-সিন্ধুতে বাস করেন। দিব্যলোক হইতে তাঁহারা যখন নামিয়া আসেন, তখন এই সপ্ত-সিন্ধুতে প্রবাহিতা হইয়া তাঁহাদের সপ্ত-বাণী শ্রুতিগোচর হয়। (১)

পুরুষ্ণী নদীর নাম ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম মণ্ডলেও দেখিতে পাই। এই নদী সুদাস রাজার রাজত্বকালে একটী যুদ্ধে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহার তীরের বাঁধ সুদাসের শত্রুগণ ভগ্ন করিয়া দেশ ভাসাইয়া দিয়াছিল। (২) উহাদিগকে সুদাস সংহার করেন। সে কালে পরুষ্ণী নদীর তীরবর্ত্তী দেশের মেষ ও অশ্ব প্রসিদ্ধ ছিল। (৩) সরস্বতী নদীর পর পরুষ্ণী নদী বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধি লাভ

পারাবতঘ্নীং। অবসে। সুবৃক্তিভিঃ
সরস্বতীং। আ। বিবাসেম। ধীতিভিঃ ॥—৬।৬১।২

ইনি (অর্থাৎ সরস্বতী) গিরিদিগের উচ্চ স্থান, বল ও প্রচণ্ড উর্ম্মি সকল দ্বারা মৃণালখণ্ডকারীর মত ভগ্ন করিয়াছেন। পারগমনকারীকে হননকারিণী সরস্বতীকে রক্ষার্থ স্তব ও যজ্ঞ কর্ম্ম সকল দ্বারা সেবা করি।

(১) বব্রাজ। সীং। অনদতীঃ। অদব্ধাঃ
দিবঃ। যহ্বীঃ। অবসানাঃ। অনগ্নাঃ।
সনাঃ। অত্র। যুবতয়ঃ। সযোনীঃ
একং। গর্ভং। দধিরে। সপ্ত। বাণীঃ ॥—৩।১।৬

সেই অভক্ষণকারিণী, অহিংসিতা, অনাচ্ছাদিতা (কিন্তু) অনগ্না, দিবালোকের যহ্বীগণের দিকে (অগ্নি) গমন করিতেছেন। সনাতনী, যুবতী, এক স্থানে অবস্থিতা সপ্ত বাণী একই গর্ভ (অর্থাৎ অগ্নিকে) ধারণ করেন।

(২) দুঃআধ্যঃ। অদিতিং। স্রেবয়ন্তঃ
অচেতসঃ। বি। জগৃভ্রে। পরুষ্ণীম্।—৭।১৮।৮

মন্দবুদ্ধি, অজ্ঞানগণ অখণ্ডিতা পরুষ্ণীকে (কূলভেদ করিয়া) জল বহাইয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ঈয়ুঃ। অর্থং। ন। ন্যর্থম্। পরুষ্ণীম্
আশুঃ। চন। ইৎ। অভিপিত্বম্। জগাম ॥—৭।১৮।৯

(শত্রুগণ) অগন্তব্য পরুষ্ণীকে অর্থসদৃশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; শীঘ্রগামী (অশ্বযুক্ত ইন্দ্র) সোম-পানার্থ গমন করিয়াছিলেন।

(৩) উত। স্ম। তে। পরুষ্ণ্যাম্। ঊর্ণাঃ। বসত। শুন্ধ্যবঃ।—৫।৫২।৯

এবং তাঁহারা (অর্থাৎ মরুৎগণ), ঊর্ণা (বা মেষ) ও অশ্বগণ পরুষ্ণী নদীতীরে বাস করে।

করিয়াছিল। সেই জন্ম একটী ঋকে ইহাকে 'মহেনদি' বলিয়া আহ্বান করিতে দেখি। (১) পরুষ্ণী নদীর বর্তমান নাম রাভী। গ্রীকগণ ইহাকে Hydrotes নাম দিয়াছিলেন। পুরাণে ইহা পয়োষ্ণী নামে বিখ্যাত। (২)

পরুষ্ণীর পরে অসিক্নীযুক্তা মরুৎবৃধার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার নাম ৭ম মণ্ডলের একটী ঋকেও বর্তমান। (৩) অসিক্নী নদীর তীরবর্তী প্রজাগণ সুদাস রাজার সময়ে পূরুরাজার অধীনে বাস করিত। যখন সুদাস পূরুকে জয় করেন, তখন তাঁহার প্রজাগণ সুদাসের ভয়ে পলায়ন করে, এই ঘটনা উক্ত ঋকে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক ঋকেও এই ঘটনা সমর্থিত হয়। (৪) ৪র্থ ও ৮ম মণ্ডলের এক একটী ঋকেও অসিক্নীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) ইহার বর্তমান নাম চেনাব। গ্রীকগণ ইহাকে অকেসিনে

সায়নাচার্য্য এই ঋকে ঊর্ণাঃ অর্থে দীপ্তীঃ এবং শুন্ধ্যুবঃ অর্থে শোধিকাঃ অপঃ করিয়াছেন। কিন্তু ১০।৭৫।৮ ঋকে, ঊর্ণাবতী অর্থে ঊর্ণাঃ যাসাং রোমভিঃ কম্বলাঃ ক্রিয়ন্তে; ইতি সায়ন। ১।৫০।৯ ঋকে শুন্ধ্যুবঃ অর্থে শোধিকাঃ অবিক্লিষ্ট। অনুমান করি, শুক্লা শব্দের বহুবচনে শুন্ধ্যুবঃ ও শুন্ধ্যুবঃ দুই পদই হইত।

ম্রিয়ে। পরুষ্ণীং। উষমাণঃ। ঊর্ণাম্

যস্যাঃ। পর্বাণি। সখ্যায়। বিব্যে।—৪।২২।২

যজমানগণ পরুষ্ণী ঊর্ণাকে (অর্থাৎ মেষ-লোমকে) শ্রীণাতে (ব্যবহার করিত;; তাহার শাখা সকল সখিত্বে গৃহীত হইয়াছিল।

(১) সত্যং। ইৎ। ত্বা। মহেনদি

পরুষ্ণি। অব। দেদিশম্।—৮।৬৩।১৫

হে মহানদি পরুষ্ণি। তোমাকে সত্যই বলিতেছি।

(২) ইরাবতীং বিতস্তাং চ পয়োষ্ণীং দেবিকামপি।—কালিকাপুং, ৯।১৬

(৩) ত্বৎ। ভিয়া। বিশঃ। আয়ন্। অসিক্নীঃ

অসমনাঃ। জহতীঃ। ভোজনানি।

বৈশ্বানর। পূরবে। শোশুচানঃ

পুরঃ। যৎ। অগ্নে। দরয়ন্। অদীদেঃ।—৭।৫।৩

হে বৈশ্বানর অগ্নে! তোমার ভয়ে অসিক্নী (নদীর) অমিলিত প্রজাগণ ভোজ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যখন পূরুর দীপ্যমান পুর সকল বিদীর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছ।

(৪) জেষ্ম। পূরুম্। বিদথে। মৃধ্রবাচম্।—৭।১৮।১৩

মৃধ্রবাক্য পূরুকে যুদ্ধে জয় করি।

(৫) যৎ। সিন্ধৌ। যৎ। অসিক্ন্যাম্। যৎ। সমুদ্রেষু।—৮।২০।২৫

যাহা সিন্ধুতে, যাহা অসিক্নীতে, যাহা সমুদ্র সকলে।

অসিক্ন্যাং। যজমানঃ। ন। হোতা।—৪।১৭।১৫

অসিক্নী-তীরে যজমান হোতা সদৃশ।

(Akesines) বলিতেন। অসিক্লীর একটী শাখাকে মরুৎবৃধা বলিত, মনে করি। পঞ্জাবের মানচিত্রে বীন্ধন্ (waedwan) নামে চেনাবের যে শাখা দেখা যায়, তাহাই সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে মরুৎবৃধা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু রোথের মতে, চেনাব ও বেহৎ মিলিত হইয়া যে নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই মরুৎবৃধা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে আমরা বিতস্তা ও সুসোমাযুক্ত আর্জীকীয়া নদীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পঞ্জাবের মানচিত্রে ঝিলম্ নদীর পশ্চিম ভাগে সুহোম নামে এক নদী দেখিতেছি। উহাই প্রাচীন সুসোমা নদী বলিয়া অনুমান করি। যাস্কের মতে, সিন্ধুনদীর আর এক নাম সুসোমা। কিন্তু তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ এখনও সুহোম নামে এক নদী বিতস্তার নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং উহা সিন্ধুতেই পতিত হইতেছে। ইহাই সুসোমার পৃথক্ অস্তিত্বের প্রধান নিদর্শন। বর্ত্তমান ঝিলম্ নদীই বিতস্তা। ইহাকে গ্রীকগণ হাইদস্পেস্ বলিতেন। ইহার আর এক নাম বেহৎ।

কিন্তু আর্জীকীয়া নদী কোন্‌টী? যে দেশ দিয়া আর্জীকীয়া প্রবাহিত, তাহাকে আর্জীক দেশ বলা হইত; এবং সে দেশের লোকদিগকে ঋজীক বলিত। আর্জীক দেশে ও সুন্দর সোমযুক্ত শর্যণাবৎ হ্রদে যাইতে হইলে, চক্রহীন রথ আবশ্যক হইত। (১) সম্ভবতঃ রুশিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের 'শ্লেজে'র মতই এই চক্রহীন রথ; বরফের উপর ইহার ব্যবহার হইত। অতএব শর্যণাবৎ হ্রদ ও আর্জীক দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান হইবার সম্ভাবনা। ঋগ্বেদের যুগে তিনটী দেশের সোম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল; যথা, শর্যণাবৎ হ্রদের, আর্জীক দেশের, এবং সুসোমা নদীর তীরবর্ত্তী দেশের সোম। (২) মনে রাখিতে

---

(১) সুসোমে। শর্যণাবতি। আর্জীকে। পস্ত্যাবতি
যযুঃ। নিচক্রয়া। নরঃ॥—৮।৭।২৯

সুন্দর সোমযুক্ত শর্যণাবৎ (হ্রদে), বজ্রগৃহযুক্ত আর্জীক দেশে নেতৃগণ চক্রহীন রথে গমন করিয়াছিলেন।

আর্জীকে ঋজীকানাং দেশাঃ ইতি সায়ন।

(২) শর্যণাবতি। সোমং। ইন্দ্রঃ। পিবতু। বৃত্রহা।—৯।১১৩।১
আ। পবস্ব। দিশাং। পতে। আর্জীকাৎ। সোম। মীঢ্বঃ।—৯।১১৩।২

বৃত্রহননকারী ইন্দ্র শর্যণাবৎ (হ্রদের) সোম পান কর। হে দিক্‌পতে সোম! আর্জীক (দেশ) হইতে (আসিয়া) ক্ষরিত হও।

হইবে, সোমলতা পর্ব্বতে জন্মায়। (১) অতএব, শর্যণাবৎ হ্রদ, আর্জীক দেশ ও আর্জীকীয়া নদী পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। সায়নাচার্য্য শর্যণাবৎ হ্রদকে কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থিত একটী পুষ্করিণী মনে করেন। তথায় পর্ব্বত কোথায়? সোমলতা সেখানে জন্মাইতেই পারে না। ঋগ্বেদের ঋষির মতে, আর্জীকীয়া নদী বিতস্তার সহিত যুক্ত বা তাহার সন্নিহিত ছিল। যাস্কের মতে, আর্জীকীয়া বিপাশার আর এক নাম। তাহা হইলে আর্জীকীয়া কিরূপে বিতস্তার নিকটে অবস্থিত হইবে? এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, শর্যণাবৎ হ্রদ কাশ্মীরস্থিত উলার হ্রদ ভিন্ন অপর সরোবর হইতে পারে না। এই হ্রদ হইতেই ঝিলম্ বা বিতস্তা উৎপন্না, এবং ইহারই সন্নিকটে কিষণ্-গঙ্গা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইয়া, উত্তরে সিন্ধু-নদীতে পতিত হইয়াছে। এই কিষণ্গঙ্গাই প্রাচীন আর্জীকীয়া নদী বলিয়া মনে হয়। উলার হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই হ্রদের তীরে সোমলতা জন্মিত। ঋগ্বেদে একটী ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্র দধীচি ঋষির অশ্বের শির প্রথম পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন; পরে উহা শর্যণাবৎ হ্রদে প্রাপ্ত হন। (২) বৈদিক যুগে একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে, অথর্ব-পুত্র দধীচি অশ্বের মস্তক ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা প্রদান করেন। (৩) ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ঋষির অশ্ব মস্তক

সায়ন শর্যণাবৎকে "কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ" বলিয়াছেন।

অয়ং। তে। শর্যণাবতি। সুসোমায়াং। অধি। প্রিয়ঃ।

আর্জীকীয়ে। মদিনতমঃ॥—৮।৬৪।১১

তোমার এই শর্যণাবতের (সোম), সুসোমাতে (প্রাপ্ত সোম তোমার) অধিক প্রিয়; আর্জীকীয়াতে (প্রাপ্ত সোম) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ততা-উৎপাদক।

(১) পর্ব্বতঃ। পিতা। মহিষস্য। পর্ণিনঃ।

নাভা। পৃথিব্যাঃ। গিরিষু। ক্ষয়ং। দধে॥—৯।৮২।৩

পূজ্য, পত্রযুক্ত (সোমের) পালক পর্জন্য (দেব); পৃথিবীর নাভিতে গিরি সকলে নিবাস করেন।

(২) ইচ্ছন্। অশ্বস্য। যৎ। শিরঃ। পর্ব্বতেষু। অপশ্রিতম্।

তৎ। বিদৎ। শর্যণাবতি॥—১।৮৪।১৪

পর্ব্বত সকলে লুক্কায়িত অশ্বের শিরকে (পাইতে) ইচ্ছা করিলে, তাহা (ইন্দ্র) শর্যণাবৎ (হ্রদে) প্রাপ্ত হন। শর্যণা নাম দেশাঃ তেষামদূরভবং সরঃ শর্যণাবৎ ইতি সায়নঃ।

(৩) দধ্যঙ্। হ। যৎ। মধু। আথর্বণঃ। বাম্

অশ্বস্য। শীর্ষ্ণা। প্র। যৎ। ঈম্। উবাচ।—১।১১৬।১২

অথর্বপুত্র দধীচি যখন তোমাদিগকে (অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে) অশ্বের শির দ্বারা এই মধু (বিদ্যা) বলিয়াছিলেন।

বজ্র দ্বারা ছিন্ন করেন। তখন অশ্বিদ্বয় তাঁহার স্কন্ধে মনুষ্য-মস্তক জুড়িয়া দেন। এই গল্প হইতে বুঝা যায়, দধীচি ঋষি শর্য্যণাবৎ হ্রদের নিকটে বাস করিতেন। সেই জন্য তাঁহার মস্তক হয় পর্ব্বতে, না হয় হ্রদে পতিত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। আর্জীক দেশ যে পঞ্চজনপদের মধ্যে নহে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ঋক্দ্বয় হইতে বেশ বুঝা যায়। (১)

সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব দিকে যেমন উপরিবর্ণিত নদী সকল অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ উহার পশ্চিম দিকেও কতকগুলি নদী আসিয়া উহাতে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম শাখানদীর নাম তৃষ্টামা; তৎপরে সুসর্ত্তু, রসা ও শ্বেতী; ইহাদের নাম বেদেও তেমন প্রসিদ্ধ নহে। ইহাদের মধ্যে কেবল রসা নদীর নাম ৫ম মণ্ডলের এক ঋকে আছে। সিন্ধু নদী উৎপত্তিস্থান হইতে কিছু দূর আসিলে, দেখা যায়, শৈয়ক (Shaiok), শীগর (Shigar), গুজর (Ghuzar) বা গিলঘিট (Gilghit) ও করং (Karang), এই নদীচতুষ্টয়ের সহিত ইহা ক্রমান্বয়ে যুক্ত হইয়াছে। অতএব অনুমান করি, এই নদীগুলিই যথাক্রমে বেদোক্ত তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা ও শ্বেতী।

গ্রীকগণ বর্ত্তমান কাবুল নদীকে কোফেন (Kophen) বলিতেন। অতএব, ঋষি-কথিত কুভা নদীই বর্ত্তমান কাবুল নদী। কাবুল নদী স্বাৎ নদীর সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধুতে পতিত হইতেছে। ঋষি বলিয়াছেন,—কুভার সহিত গোমতীকে সিন্ধু যোগ করিয়াছে। অতএব, বর্ত্তমান স্বাৎ নদীই গোমতী নামে পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিল। মক্ষমূলর গোমতী নদীকে বর্ত্তমান গোমাল মনে করেন। বোধ হয়, নামসাদৃশ্যে এইরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে যাহাকে

---

(১) যে। সোমাসঃ। পরাবতি। যে। অর্বাবতি। সুন্বিরে।

যে। বা। অদঃ। শর্য্যণাবতি॥—৯।৬৫।২২

যে সকল সোম পরাবতে (স্থিত), যাহারা অর্বাবতে আছে, কিংবা যে সকল এই শর্য্যণাবতে আছে, (ইন্দ্রের জন্য) অভিষব করিতেছেন।

যে। আর্জীকেষু। কৃত্বসু। যে। মধ্যে। পস্ত্যানাম্।

যে। বা। জনেষু। পঞ্চসু॥—৯।৬৫।২৩

আর্জীক দেশ সকলে, কৃত্বনদিগের মধ্যে, পস্ত্যাদিগের মধ্যে, বা পঞ্চজনদিগের মধ্যে যে সকল (সোম) আছে। এই ঋকদ্বয় যে জমদগ্নি ঋষি কর্ত্তৃক রচিত, তাহা ২৫শ ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। জমদগ্নি ঋষি শর্য্যণাবৎ হ্রদের নিকটে বাস করিতেন, বা তথায় গিয়া এই সোম-যজ্ঞ করিতেছেন। আর্জীকদেশ যে পঞ্চ-জনদিগের দেশ হইতে ভিন্ন, তাহাও জানা যাইতেছে।

কুরম্ নদী বলে, উহাই প্রাচীন ক্রুমু। ঋষি বলেন, ক্রুমু ও মেহৎনু যুক্ত হইয়া সিন্ধুতে পড়িয়াছে। তাহা হইলে, বর্ত্তমান তোকী নদীর নাম প্রাচীন কালে মেহৎনু ছিল।

রসা, কুভা ও গোমতী নদীর নাম ৫ম মণ্ডলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) কিন্তু এই ঋকে সরযু নামে এক নদীর উল্লেখ দেখিতেছি। ৪র্থ মণ্ডলেও সরযুর উল্লেখ আছে। (২) ক্রুমু, কুভা প্রভৃতির সিন্ধুর পশ্চিমদিকস্থ শাখা নদী-দিগের সহিত একত্র উল্লেখ দেখিয়া সরযুকে পশ্চিম দিকের কোনও নদী বলিয়া অনুমান করি। বর্ত্তমান কালে গোমাল ও ঝব (Zhob) নামক নদীদ্বয় মিলিত হইয়া সিন্ধুতে পড়িতেছে। মনে হয়, ইহাদের একটীকে সরযু বলা হইত।

ঋগ্বেদে উপরি-বর্ণিত নদী ভিন্ন আরও কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায়। যথা, সীরা, (১) শিফা, (২) অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী, (৩) বয়াবতী, (৪)

---

(১) মা। বঃ। রসা। অনিতভা। কুভা। ক্রুমুঃ
মা। বঃ। সিন্ধুঃ। নি। রীরমৎ
মা। বঃ। পরি। স্থাৎ। সরযুঃ। পুরীষিণী
অস্মে। ইৎ। সুম্নং। অস্তু। বঃ॥—৫।৫৩।৯

(হে মরুৎগণ! দীপ্তিমতী রসা, কুভা, ক্রুমু যেন তোমাদিগকে, সিন্ধুও যেন তোমাদিগকে নিকৃষ্টভাবে রমণ না করে। উদকবতী সরযু তোমাদিগকে যেন নিরুদ্ধ করিয়া না রাখে। তোমাদিগের সুখ আমাদিগের হউক।

(২) উত। ত্যা। সদ্যঃ। আর্য্যা। সরযোঃ। ইন্দ্র। পারতঃ।
অর্ণ। চিত্ররথা। অবধীঃ॥—৪।৩০।১৮

হে ইন্দ্র! সরযু নদীর পারে নিবাসকারী সেই অর্ণ ও চিত্ররথ আর্য্যদ্বয়কে সদ্যঃ বধ করিয়াছিলে।

(১) ত্বং। ধুনিঃ। ইন্দ্র। ধুনিমতীঃ। ঋণোঃ
অপঃ। সীরাঃ। ন। স্রবন্তীঃ॥—১।১৭৪।৯

হে ইন্দ্র! শব্দবতী প্রবাহিতা সীরা (অর্থাৎ নদী) সকলের মত ধুনি তুমি জল সকলকে প্রবাহিত কর।

পরিষ্ঠিতাঃ। অতৃণৎ। বদ্বধানাঃ।
সীরাঃ। ইন্দ্রঃ। স্রবিতবে। পৃথিব্যা॥—৪।১৯।৮

আবদ্ধা, চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতা সীরাদিগকে ইন্দ্র পৃথিবীতে প্রস্রবণরূপে (বা প্রবাহিত হইবার জন্য) বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

সীরানদীঃ সীরা ইতি নদীনামৈতৎ ইতি সায়ন।

অহং। সপ্ত। স্রবতঃ। ধারয়ম্। বৃষা
দ্রবিৎন্বঃ। পৃথিব্যাম্। সীরাঃ। অধি॥—১০।৪৯।৯

দৃষদ্বতী, ও আপয়া। (১) বিশ্বকোষে ইহাদের প্রথমগুলিকে স্বাৎ ও কাবুল নদীর শাখা নদীরূপে ও দৃষদ্বতীকে যমুনার শাখারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত ঋক্ সকলে 'সীরা' শব্দ নদীদিগের সাধারণ নামরূপে বেদে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রাক্-বৈদিক যুগে ঐ নদী আর্য্যদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা এক্ষণে আমুদরিয়া ও সীরদরিয়া নামে যে দুই নদীকে আরাল হ্রদে নিপতিত হইতে দেখি, উহাদের একটীকে প্রাচীন সীরা নদী বলিয়া অনুমান করি। আমুদরিয়া নাম সম্ভবতঃ অম্বু বা অম্বা দরিয়া ছিল। দরিয়া শব্দ দৃধাতু হইতে উৎপন্ন। কারণ, আর্য্যগণ মনে করিতেন, বরুণ বা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা নদীদিগের খাত বিদারণ করিয়া দিয়াছেন। আমুদরিয়ার আর এক নাম অক্ষুস্ (Oxus)। বোধ হয়, উহা অক্ষ বা অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ।

কেহ বলিতে পারেন, সিন্ধু বা সরস্বতীর পূর্ব্ব দিকে সিন্ধুকে লইয়া দশটী নদীর উল্লেখ ১০ম মণ্ডলে দেখিতে পাই; উহার পশ্চিম দিকে আটটী নদীর নাম প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব, ইহাদিগকে দ্বি-সপ্ত নদী কিরূপে বলা যাইতে পারে? অনুমান করি, 'সপ্ত-নদী'র জ্ঞান যখন আর্য্যগণ লাভ করিয়াছিলেন, তখন গঙ্গা ও যমুনার সন্ধান তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি, আর্য্যগণ তখন শুতুদ্রী ও বিপাশ নদীও জানিতেন না। কারণ, বিশ্বামিত্র ঋষিই এই দুই নদীকে স্তবাহ্য করিয়াছেন, দেখা যায়। তাহা হইলে, পরুষ্ণী, অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা,

---

বৃষ (অর্থাৎ পুরুষ) আমি পৃথিবীর উপরে সাতটী দ্রবীভূতা, প্রবাহিনী সীরাদিগকে (অর্থাৎ নদীদিগকে) ধারণ করি।

সায়ন সীরা অর্থে এখানে 'সরণশীলা' বলিয়াছেন।

(২) হতে। তে। স্যাতাম্। প্রবণে। শিফায়াম্।—১।১০৪।৩

শিফার গভীর দেশে তাহারা হত হউক।

(৩) অঞ্জসী। কুলিশী। বীরপত্নী। পয়ঃ
হিন্বানাঃ। উদভিঃ। ভরন্তে।—১।১০৪।৪

অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী জলপ্রাপ্তা হইয়া জলে পূর্ণ হইতেছে।

(৪) বিংশৎশতং। বর্মিনঃ। ইন্দ্র। সাকম্
যব্যাবত্যাম্। পুরুহূত। শ্রবস্যা।—৬।২৭।৬

হে পুরুহূত ইন্দ্র! যব্যাবতী-তীরে ১৩০ বর্ম্মধারীকে এক সঙ্গে যশ ইচ্ছা করিয়া।

(১) দৃষদ্বত্যাং। মানুষে আপয়ায়াম্
সরস্বত্যাং। রেবৎ। অগ্নে। দিদীহি।—৩।২৩।৪

হে অগ্নে! দৃষদ্বতী তীরে, আপয়া তীরে, সরস্বতী তীরে মানুষদিগের মধ্যে ধনযুক্ত হইয়া দীপ্যমান হও।

সুসোমা, আর্জীকীয়া ও সরস্বতী, এই সপ্ত নদীর নাম আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম অবগত হন। অপর দিকে রসা, শ্বেতী, কুভা গোমতী, ক্রুমু ও মেহত্নু নদীগুলিকে, বোধ হয়, আর্য্যগণ প্রথম জানিয়াছিলেন। তৃষ্টামা ও সুসর্ত্তাকে পরে জ্ঞাত হন। আকাশে সপ্ত-সিন্ধুর কল্পনা আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া করিয়াছেন। সেই জন্য সিন্ধু, বিপাশা ও অংশুমতী (বা সুসোমা) নদীর নাম উহাদের মধ্যে দেখিতে পাই।

বেদ-প্রসিদ্ধা ও ঋষিদিগের অতি প্রিয়া সরস্বতী নদীই যে বর্ত্তমান কালের সিন্ধুনদ, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন আর্য্যগণ পরবর্ত্তী যুগে গঙ্গানদীর উপকূলে উপনীত হইয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অতি প্রিয় সরস্বতী নদীকে তাঁহারা ভুলিতে না পারিয়া কেহ কেহ গঙ্গানদীর সহিত তাহার অদৃশ্য মিলনের কল্পনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেহ বা প্রাচীন সরস্বতীর নাম অপর নদীতে আরোপ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ কার্য্যের সুবিধা করিয়াছিলেন। ক্রমে আর্য্যগণ সরস্বতী অপেক্ষা গঙ্গার প্রাধান্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। সেই জন্য মহাভারতেও আমরা দেখিতে পাই :—

> পুরা হিমবতশ্চৈষা হেমশৃঙ্গাৎ বিনিঃসৃতা।
> গঙ্গা গত্বা সমুদ্রাম্ভঃ সপ্তধা সমপদ্যত ।।
> গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীম্।
> রথস্থাং সরযূঞ্চৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা ।।

আদিপর্ব্ব ; ১৭০ অঃ।

অর্থ।—পূর্ব্বকালে হিমালয়ের হেম-শৃঙ্গ হইতে এই গঙ্গা নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রজলে যাইতে যাইতে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষ-(অর্থাৎ বটবৃক্ষ)-জাতা সরস্বতী, রথস্থা সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকীকে (সপ্ত ভাগ জানিবে)।

উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায়, যেমন প্রাচীন সরস্বতী নামে গঙ্গার এক শাখা নদীর নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ সরযূ ও গোমতী নামও অপর দুই নদীতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, সরযূ ও গোমতী নদীদ্বয়ও আর্য্যদিগের প্রিয় ছিল ; সেই জন্য উহাদের নাম নূতন নদীতে আরোপিত হইয়াছে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন নীয়েপ্‌সে * (Niepce), ডাগুয়ের (Daguerre) প্রভৃতি ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আলোকচিত্র বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তখন সাধারণ চিত্রকরেরা একবার বড়ই নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা নবীন উৎসাহের উল্লাসে কহিলেন, না, এই বিদ্যা আমাদের পতনসাধন করিতে পারিবে না। ইহারা বিশ্বের বর্ণ-বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিসমূহ কেবল সাদা ও কালোর সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। ইহাদের কল্পনাও নাই, বিচারশক্তিও নাই। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র পাইবার সম্ভাবনা দেখা গেল, এবং যদিও ইহাতে প্রকৃত চিত্রশিল্পীর কোনও ক্ষতি হয় নাই, এবং আশা করি, কোনও কালে হইবে না। আলোকচিত্র-বিদ্যার এই নূতন শাখাটী এক্ষণে অনেকপরিমাণে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৫০ সালে বৈজ্ঞানিক এড্‌মণ্ড্ বেকারেল (Becquerel) সূর্য্যরশ্মিকে ত্রিশিরকাচের (Prism) সাহায্যে সাতটী রঙ্গে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার কয়েকখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে দুই একটী আলোকচিত্রে কেবলমাত্র সাদা ও কালোর পরিবর্ত্তে কোনও কোনও অংশে স্বাভাবিক রঙ্গের আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেকারেল ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। প্রায় বিংশতি বৎসর পরে অপর এক জন বৈজ্ঞানিক, সেঙ্কার (Zenker) ইহার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় আরও বিশ বৎসর কাল কোনও উন্নতি সাধিত হয় নাই।

বেকারেলের আবিষ্কারের চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে লীপ্‌মান্ (Lippmann) স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার একটী উপায় প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আইভ্‌সের (Ives), উডের (Wood) এবং অপর এক জন বৈজ্ঞানিকের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি পরে আলোচিত হইয়াছে।

---

* ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে ওয়েজ্‌উড (Wedgewood), ডেভী (Davy) সীবেক্ (Seebeck) হার্শেল (Herschel) প্রভৃতি অনেকে সাধারণ ও স্বাভাবিক রঙ্গে আলোক-চিত্র সম্বন্ধে নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু তাঁহাদের ছবি স্থায়ী হয় নাই।

দীপ্যমানের প্রক্রিয়া বুঝিতে হইলে, আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানা আবশ্যক। এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, আলোক এক প্রকার অতিদ্রুত স্পন্দনমাত্র; কিন্তু সে স্পন্দনটা কিসের, তাহা আমাদের জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; এইমাত্র জানিলেই হইল যে, সেই তরঙ্গটা, আমরা যে সকল জিনিসকে স্বচ্ছ বলি, তাহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, এবং অস্বচ্ছ দর্পণ-গাত্রে প্রতিহত হইলে সেগুলি ফিরিয়া আসে। এই স্পন্দনটার মাত্রার উপর আমাদের বর্ণানুভূতি নির্ভর করে, এবং এই স্পন্দনের ফলে সেই অজ্ঞাত পদার্থ বা প্রকৃতিতে যে ঢেউ খেলিতে থাকে, তাহারও দৈর্ঘ্যের তদনুযায়ী বিভিন্নতা ঘটে। সেই জন্যই লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের অনুযায়ী তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। এই দৈর্ঘ্যের অনৈক্যের উপরেই দীপ্যমানের প্রক্রিয়া নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ায়, সাধারণ আলোকচিত্র তুলিবার জন্য আলোকচিত্র-যন্ত্রটা (Camera) যেরূপ ঠিক করিয়া রাখা হয়, সেইরূপই করিতে হয়। কিন্তু আলোকচিত্রের মশলা-মাখান কাচখণ্ডটা (Plate) একটা বিশেষভাবে নির্ম্মিত কাঠের খাপে রাখা হয়। সেটা এরূপ ভাবে গঠিত যে, কাচের যে দিকটা মশলা-মাখান (Film Side), তাহারই গাত্রে এক স্তর পারদ রাখিতে পারা যায়। তাহার ফলে কাচের গায়ে যে জিলাটীন্ ও মশলা (gelatine) মাখান থাকে, তাহার বাহিরের স্তরটা একটা দর্পণের কাজ করে। যে বস্তুটার আলোকচিত্র লওয়া হয়, কাচের পরিষ্কার দিকটা সেই দিকে রাখা হয়; সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বটা মশলার ভিতর দিয়া আসিয়া এই দর্পণের উপর পড়ে, এবং তাহার ছাপটা মশলাতে লাগিয়া যায়। কিরূপে ছাপটা পড়ে, বুঝিতে হইলে, তরঙ্গের কয়েকটা সাধারণ গুণ জানা আবশ্যক। স্থির জলে ঢেউ খেলিলে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের নিঃস্পন্দ সমতলের এক স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হয়, এবং তাহারই পাশে আর একটা স্থান সমানপরিমাণে নিম্নে যায়। এই উচ্চতাটাকে আমরা চূড়া ও নিম্নতাটাকে খাদ বলিতে পারি। একটা চূড়া ও তাহারই পাশের একটা খাদ লইয়া একটা পূর্ণ তরঙ্গ হয়। এটা যে দৈর্ঘ্য অধিকার করে, তাহাকেই আমরা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলিয়া থাকি। অতএব, যখন একটা পূর্ণ তরঙ্গের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বের সমতল হইতে উচ্চে, ও তাহার অপরার্দ্ধ সমানপরিমাণেই নিম্নে থাকে, তখন ঠিক এই দুইয়ের মধ্যাংশ পূর্ব্বের সমতলেই রহিয়া যাইবে; তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে না। এইটাকে আমরা তরঙ্গের কটীদেশ (Node) বলিতে পারি। সুতরাং কোনও স্থান দিয়া একটা

অবিচলিত তরঙ্গ-স্রোত প্রবাহিত হইলে, সেই স্পন্দনশীল পদার্থে অর্দ্ধ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্তরে অন্তরে পূর্ব্বের সমতল হইতে অবিচ্যুত কটীদেশ-শ্রেণী উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ তরঙ্গের ন্যায় আলোকতরঙ্গেরও প্রত্যেকটী একটী চূড়া ও খাদের সমন্বয়ে গঠিত। যখন একটী আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন পূর্ব্বে যে দিকে তরঙ্গগুলি যাইতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে তাহারই সমরূপ আর একটী তরঙ্গ-স্রোত বহিতে থাকে। ফলে, একই স্থলে দুইটী বিপরীত দিকে দুই দল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। একেবারে দর্পণের গাত্রে কোনও রূপ গতি থাকে না; সুতরাং দর্পণের গাত্রটীকে দুই শ্রেণীর তরঙ্গেরই একটী কটীদেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তরঙ্গ-স্রোতের কটীদেশগুলি অর্দ্ধ-তরঙ্গ ব্যবধানে সৃষ্ট হয়। অতএব দর্পণের গাত্র হইতে সমান দূরে, এই দুই শ্রেণীর তরঙ্গেরই আর একটী নিঃস্পন্দ কটীদেশ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তরঙ্গ না থাকিলে, ঐ স্থলে যে অবস্থা ঘটিত, তরঙ্গ সত্ত্বেও তাহাই ঘটে।

এই রূপে অর্দ্ধ-তরঙ্গ অন্তরে অন্তরে এক একটী নিঃস্পন্দ সমতল সৃষ্ট হয়, এবং অবশিষ্ট সমস্ত স্থানটিতে অল্পবিস্তর আলোকস্পন্দন হইতে থাকে। এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে, কাচের গায়ে জিলাটীনের সহিত যে মশলা মাখান হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্যবিকারঘটিত পদার্থ (Silver Compounds)। এই মশলার গুণ এই যে, আলোকতরঙ্গের আঘাতে রৌপ্যের বিকার সরিয়া যায়, কিন্তু যে স্থলে আলোকস্পন্দনের অভাব, সে স্থলে ইহা স্বচ্ছ বিকৃত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। সুতরাং উপরি-বর্ণিত লীপ্‌মানের প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত কাচের গায়ে যে মশলা-মিশ্রিত জিলাটীন মাখান থাকে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধ-তরঙ্গ অন্তরে অন্তরে পর্য্যায়ক্রমে রৌপ্য বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আলোকচিত্র পরিস্ফুট করিবার (Develope) সময় বিকৃত রূপার অংশ দূরীভূত হয়, কিন্তু শুদ্ধ রৌপ্যটী থাকিয়া যায়। ফলে সমব্যবধান অন্তরে অতিশয় পাতলা রূপার পাতের সৃষ্টি হয়। এগুলি প্রায় স্বচ্ছ বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। সুতরাং কাচটীর উপর কোনও বিচিত্র-বর্ণময় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে, প্রত্যেক বিভিন্ন রঙ্গের আলোকের জন্য বিভিন্ন রূপার পাতের শ্রেণী সৃষ্ট হইবে। এইরূপ বিভিন্ন-স্তরপূর্ণ আলোকচিত্রটীকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া (Fix) সেটীকে প্রতিফলিত (Reflected) আলোকে দর্শন করিলে, চিত্রটী

স্বাভাবিক রঙ্গে দৃষ্ট হইবে। কারণ, সাধারণ সাদা আলো যখন এইরূপ কাচে লাগান জিলাটীনে প্রবেশ করে, প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর রূপার পাতগুলি কেবলমাত্র তাহারই সৃষ্টিকর্ত্তা রঙ্গটীকে ফিরাইয়া দেয়, বাকীগুলিকে হয় তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে দেয়, নতুবা চুষিয়া লয়। ফলে, কাচটীর যে স্থানে যে রঙ্গের আলো পড়িয়াছিল, সে স্থানটীতে ঠিক সেই রঙ্গটীই দেখা যায়। সুতরাং ছবিটী স্বাভাবিক রঙ্গে রঞ্জিত হয়।

এই সম্পর্কে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রবন্ধে জিনিসটীর কেবলমাত্র একটা মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লীপম্যানের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার প্রণালী ও ফলাফল এখনও খুব ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই।

উল্লিখিত উপায়টী অতিশয় কঠোর হইলেও, উহাই সোজাসুজি উপায় (Direct Process)। অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প আয়াসে কৃতকার্য্য হইবার জন্য মিঃ আইভস্ (Ives) কিছু মাথা খাটাইয়া একটী সরল পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপায়টী আমাদের চোখের বিভিন্ন রঙ্গ অনুভব করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। ইয়ং (Young), হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ (Helmholtz) প্রভৃতির মতে আমাদের চক্ষে তিনটী রঙ্গের মৌলিক অনুভূতি আছে :—লাল, সবুজ ও বেগুনী (Violet)। বাকী রঙ্গগুলির অনুভূতি এই তিনটীর বিভিন্ন-পরিমাণে সংমিশ্রণমাত্র। সুতরাং যে কোনও রঙ্গীন পদার্থকে আমরা কল্পনার চক্ষে কেবলমাত্র তিনটী রঙ্গে রঞ্জিত দেখিতে পারি, এবং অন্য রঙ্গগুলিকে কেবল এইগুলির বেশী ও কমের ফল মনে করিতে পারি। সুতরাং যদি মশলা-মাখান কাচটীর সম্মুখে একবার লাল রঙ্গের কাচ বা স্বচ্ছ পর্দ্দা, (Transparent Screen or Filter) ধরিয়া, তাহার পর সবুজ ও পরিশেষে বেগুনী রঙ্গ ব্যবহার করিয়া, রঙ্গীন বিষয়টীর তিন রকম আলোতে তিনখানি ছবি তোলা হয়, তাহা হইলে, প্রতি কাচেই তাহার সহিত ব্যবহৃত রঙ্গের আলো ও ছায়ার অনুপাত ফুটিয়া উঠিবে। অতএব, যদি প্রতি কাচখণ্ডে তাহার অনুযায়ী রঙ্গীন আলো ফেলিয়া তিনখানিই এক সঙ্গে দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের চক্ষে এক কালে ঐ তিন রঙ্গেরই আলো ও ছায়ার অনুপাত অনুভূত হইবে। সুতরাং আমরা ছবিটী স্বাভাবিক রঙ্গেই দেখিতেছি, এইরূপ অনুভব করিব।

একই সময়ে তিন রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া ছবি তিনটী দেখিবার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে লিয়ঁ নগরীয় লুমিয়ের কোম্পানীর (Lumiere et ses fils)

পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইঁহারা তিনখানি কাচ ব্যবহারের আবশ্যকতা দূর করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রক্রিয়াতে প্রথমে অনেক শ্বেতসারের দানাকে (Starch granules) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ডিত করা হয়, এবং যখন সেগুলি এত ছোট হইয়া পড়ে যে, এক মিলিমিটার (Millimetre, প্রায় একটী ধান্যের প্রস্থ) দৈর্ঘ্যে চল্লিশ পঞ্চাশটী দানা পাশাপাশি সাজাইতে পারা যায়, তখন সেগুলি তিন ভাগ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী মৌলিক রঙ্গে রঞ্জিত করা হয়। তাহার পর রঙ্গীন শ্বেতসারের দানাগুলি এইরূপ পরিমাণে মিশান হয় যে, মিশ্রটী দেখিতে সাদা বোধ হয়। তখন একটী সমতল কাচখণ্ডে অল্প স্বচ্ছ আঠা মাখাইয়া তাহার উপর এই মিশ্রটী সমানভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং যাহাতে কেবলমাত্র একটী করিয়া দানার স্তর পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। রঙ্গীন দানাগুলির মধ্যে যে ফাঁক পড়িয়া থাকে, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম কাঠ-কয়লার গুঁড়া বা সম্পূর্ণ কাল রঙ্গের অপর কোনও চূর্ণ দিয়া বুজাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সমস্তটী স্বচ্ছ আঠা দিয়া সমতলভাবে আবৃত করা হয়। আঠাটীর এইটুকু বিশেষত্ব থাকে যে, ইহার ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে না, (Impermeable)। ইহার উপর সাধারণ আলোকচিত্র তুলিবার মশলা মাখান হয়। লীপ্‌মানের প্রক্রিয়ার মত ছবি তুলিবার সময় কাচের পরিষ্কার দিকটী আলোকচিত্রের বিষয়টীর দিকে রাখিতে হয়। সুতরাং বিষয়টীর প্রতিবিম্বটী তিন রঙ্গে রঙ্গীন স্বচ্ছ শ্বেতসারের দানার মধ্য দিয়া যাইয়াই তবে মশলার উপর পড়িতে পায়। রঙ্গীন স্বচ্ছ দানাগুলি ঠিক রঙ্গীন স্বচ্ছ পর্দ্দার কাজ করে, এবং তাহার ফলে এই একটী কাচখণ্ডই ঠিক তিনটী বিভিন্ন রঙ্গীন আলোকে ব্যবহৃত তিনখানি কাচের সমান-গুণযুক্ত হয়। এইবার ছবিটী পরিস্ফুট করিতে হয়। এখানেও অল্প বিশেষত্ব আছে। পরিস্ফুটন ও স্থাপন কার্য্য শেষ হইলে কাচের পরিষ্কার দিকটী আলোতে ধরিয়া ছবি দেখিতে হয়। তাহা হইলে আলোটি স্বচ্ছ রঙ্গীন পর্দ্দার ভিতর দিয়া আসিয়া প্রতি রঙ্গের অনুযায়ী প্রতিবিম্বের অনুরূপ অংশে পড়িবে, এবং তাহার ভিতর দিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে। কিন্তু ছবিটী সাধারণ আলোকচিত্রের মত পরিস্ফুট করিলে, ছবি তুলিবার সময় মশলার যে অংশে আলো পড়িয়াছিল, সেই অংশে অস্বচ্ছ রূপার স্তর সৃষ্ট হয়; ছায়ার ভাগটী স্বচ্ছ থাকে। সুতরাং দেখিবার সময় বিষয়টীর রঙ্গীন অংশগুলি ছবিতে বর্ণহীন দেখাইবে, এবং বর্ণহীন অংশটি রঙ্গীন দেখাইবে। সেই জন্য, ছবিখানি পরিস্ফুট করিয়া স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, একটি বিশেষ

দ্রবে ডুবাইতে হয়। ঐ দ্রবের গুণে রূপার পাতগুলি গলিয়া যায়। তাহার পর পুনরায় ছবির বাকী অর্থাৎ ছায়ার ভাগটি পরিস্ফুট করিতে হয়। এইবার ছবিটি আলোর দিকে ধরিয়া দেখিলে,ঠিক স্বাভাবিক রঙ্গে দেখা যাইবে ; কারণ, ছবিটির যে অংশে আলো পড়িয়াছিল, সেই স্থানগুলি এবার স্বচ্ছ থাকিবে, এবং ছায়ার স্থানগুলি ছায়ার অনুপাতে অস্বচ্ছ থাকিবে।

উল্লিখিত প্রক্রিয়াতে একটি কাচে একটিমাত্র ছবি হইবে। কিন্তু উপযুক্ত কাগজে তাহা স্বাভাবিক রঙ্গে মুদ্রিত করা চলে না ; কাচে পাওয়া যাইতে পারে। কাগজে স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র মুদ্রিত (Print) করিবার একটি উপায় অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটিও আমাদের বর্ণানুভূতি-শক্তির উল্লিখিত বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। প্রক্রিয়াটির নাম বিবর্ণীকরণ প্রক্রিয়া * (Bleach out Process)।

এই প্রক্রিয়াতেও প্রথমে তিনটী মৌলিক রঙ্গের আলোকে তিনখানি কাচ ব্যবহার করিতে হয়। প্রভেদ এই যে, সবুজ ও বেগুনীর পরিবর্ত্তে নীল ও হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়। লাল রঙ্গ ও শেষের এই দুইটি রঙ্গেরও উপযুক্ত মিশ্রণে সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক বর্ণ পাওয়া যায়। এমন কি, অনেকের মতে এই তিনটিই মৌলিক রঙ্গ বলিয়া গণ্য। এইরূপে তিন রঙ্গের আলো ব্যবহার করিয়া তিনটি ছবি তোলা হইলে পর, মুদ্রণ কার্য্যের জন্য কাগজটি ঠিক করিতে হয়। আলোক-চিত্রের জন্য এক প্রকার বিশেষ মসৃণ কাগজ পাওয়া যায় ; তাহার এক খণ্ডে কয়েকটি আরক মাখাইতে হয় ; তন্মধ্যে লৌহবিকার-ঘটিত একটি পদার্থের দ্রব (Iron Compound) থাকে। সেই জন্য সাধারণ সাদা ও কালো ছাপের পরিবর্ত্তে, নীল ও সাদা ছাপ পড়ে। কাগজটির উপরে প্রথমে হরিদ্রা রঙ্গের আলোতে তোলা ছবির কাচখানি রাখিয়া ছাপ লইতে হয়। এই কাগজ-খানিতে তাহার পর জলে পাকা হরিদ্রা রঙ্গ গুলিয়া মাখাইয়া দিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য ওরানশিয়া (Aurantia) প্রশস্ত। এইবার কাগজখানি একটি বিবর্ণ কারবার (Bleaching Solution) আরকে ডুবাইতে হয়। বিভিন্ন মশলা অনুসারে বিভিন্ন আরক ব্যবহৃত হয়। আরকের গুণে নীল রঙ্গটি বিবর্ণ হইয়া যায়। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, নীল রঙ্গটি কোনও একটি রঙ্গীন পদার্থের স্তর। সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ স্তরটি গলিয়া যাইলে, ঐ অংশে যে হরিদ্রা রঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাও চলিয়া যাইবে। কিন্তু

* British Journal of Photography, 1917.

যে স্থানে নীল রঙ্গ ছিল না, সে স্থানে কোনও স্তর উঠিয়া যাইবে না; সুতরাং সে অংশে হরিদ্রা বর্ণের ছাপ রহিয়া যাইবে। ফলে কাগজে ঠিক কাচখানির আলোক ভাগের অনুযায়ী হরিদ্রা রঙ্গে ছাপ্ পড়িবে। অপর অংশ সাদা হইয়া থাকিবে।

এইবার কাগজখানিতে পুনরায় পূর্ব্বের নীল ছাপ্ তুলিবার দ্রবসমূহ মাখাইতে হইবে। এইবারে লাল রঙ্গের আলোকে তোলা ছবির কাচখানি ব্যবহার করিতে হইবে। মুদ্রণের পর ছবি পরিস্ফুটন করিয়া কাগজের উপর এক ছোপ্ লাল রঙ্গ বুলাইয়া দিতে হইবে। লাল রঙ্গের মধ্যে ইয়োসিনই (Eosin) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বের মত নীল রঙ্গের ছাপটিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে গলাইয়া ফেলিতে হইবে।

এইবার শেষ বারের নিমিত্ত কাগজখানিতে সেই নীল ছাপ্ তুলিবার মশলা মাখাইতে হইবে। এইবার কাগজখানিতে মুদ্রণ, পরিস্ফুটন ও স্থাপন কার্য্য সাধারণ নীল ছাপের (Blue Print) ছবির মতই হইয়া থাকে। সুতরাং কাগজখানিতে তিনটি কাচের অনুযায়ী আলো ও ছায়ার বিকাশ ঘটে, এবং ঐ আলো ও ছায়াতে বর্ণ-সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। ফলতঃ, ছবিখানি ঠিক স্বাভাবিক রঙ্গেই দেখা যায়।

এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর যেরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অতি অল্প কালের মধ্যেই একেবারে আলোকচিত্র-যন্ত্রেই কাগজে স্বাভাবিক রঙ্গের ছাপ, অতি সহজে লইতে পারা যাইবে। তিনখানি কাচ ব্যবহার করিবার ও তিনখানি ছাপ লইবার কোনও প্রয়োজন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উঠিতে পারে যে, তিনবার ছবি তুলিতে হইলে, রঙ্গীন পর্দ্দার পরিবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ছবি তিনটির ইতরবিশেষ ঘটিতে পারে। সুতরাং একই কাগজে ছবি তিনটি ছাপিলে, একটি ছাপের এক অংশের উপর আর একটি ছাপের অপর অংশ পড়িবে, এবং ছবিটি ঝাপসা দেখাইবে। এ জন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহাদের এক জন, সাঙ্গার শেফার্ডের (Sanger Shepherd) যন্ত্রে এই তিন রকমের ছবি একখানি বড় কাচে, একই সময়ে, পাশাপাশি লওয়া হয়। সুতরাং ছবির বিষয় অল্প নড়িলেও, ছবি তিনখানিতেই সমান পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া, কোনও ক্ষতি হয় না। ছাপ লইবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ফলে, ছবিতে কোনও রূপ ঝাপসা ভাব দেখা যায় না। বেলীর (Bailey) ফটোগ্রাফী ইন্ কালার্স (Photography

in Colours) পুস্তকে, মিষ্টার আইভ্‌সের মৌলিক প্রবন্ধসমূহে (Journal of the Frank Instt) এবং ব্রিটিশ জার্ণাল্‌ অফ্‌ ফটোগ্রাফীতে (British Journal of Photography) এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণী পাওয়া যাইবে। শেষোক্ত বার্ষিক পত্রে পরিস্ফুটন, স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য রাসায়নিক দ্রবসমূহের পরিমাণ ও প্রয়োগের সবিশেষ বিধান আছে।

প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে প্রফেসর রবার্ট্‌ উডের (Prof. Robert Wood) * আবিষ্কৃত একটি অতি সুন্দর প্রক্রিয়ার সামান্য পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রফেসর উডের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে, আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু বেশী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশদভাবে উপায়টির আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, কিন্তু অল্পের উপর লিখিলে, বিষয়টি সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য হইবে। কেবলমাত্র এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই প্রক্রিয়াতে ডিফ্র্যাক্‌শন্‌ গ্রেটিং নামক যন্ত্রের (Diffraction Grating) † তিনখানি ব্যবহৃত হয়। একটি "জাফরী যন্ত্র" (Grating) ‡ ছবিতে লাল রঙ্গের অনুভূতি উৎপন্ন করিবার শক্তি প্রদান করে ; আর একটি সবুজ ও অপরটি বেগুনী রঙ্গের সংযোগ করে। তাহাদেরই সাহায্যে রঙ্গীন বিষয়টি মৌলিক রঙ্গ তিনটিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া পুনরায় একটি ছবিতে একত্রিত করা হয়, এবং তাহার ফলে ছবিটি স্বভাবানুযায়ী রঙ্গ প্রকাশ করে।

এই প্রক্রিয়ার সাজসরঞ্জামের মূল্য একটু বেশী হইলেও, ছবিগুলি এত সুন্দর হয়, এবং একবার একটি ছবি ঠিক তৈয়ারী করিলে তাহা হইতে এত অধিক ছবি এত অল্প আয়াসে ছাপিয়া লওয়া যায় যে, এই প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাভাবিক রঙ্গের আলোকচিত্র বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধিত হইতেছে ; তাহা সত্ত্বেও এখনও প্রক্রিয়াসমূহে অনেক দোষ আছে। কিন্তু সেগুলি নিবারণের জন্য গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

* Nature, June, 1899.

† সমান্তরাল, সম-অভিমুখী সূক্ষ্ম রেখাময়, সমতল কাচখণ্ড ; ইহার গুণ সাদা আলোককে বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট করিয়া, রশ্মিগুলিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে সাজাইয়া দেওয়া।

‡ জাফরীর এক দিক অতিশয় লম্বা হইলে যন্ত্রের রেখা ঘরের (ruling) মত দেখায় বলিয়া, এবং অর্থে ও শব্দে ইংরাজী শব্দটির সহিত কিঞ্চিৎ মিল আছে বলিয়া, আমি এই পারিভাষাটী ব্যবহার করিয়াছি।

সে কোশল, কেবলমাত্র অধ্যবসায় ও অভ্যাসের ফলেই জন্মে। যাঁহারা আলোকচিত্র-বিদ্যার চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুরূহ নহে; কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ও উদ্যমের অপেক্ষা মাত্র। সেইজন্য আমার বোধ হয়, আমাদের দেশে ইদানীং যে সকল ব্যক্তির ছবি তুলিবার সখ জন্মিয়াছে—তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যের সহিত মিষ্টার আইভসের প্রদর্শিত পন্থায় স্বাভাবিক বঙ্গে আলোকচিত্র তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের নিজেদেরও যথেষ্ট আনন্দবর্দ্ধন হইবে, এবং আলোকচিত্র-বিদ্যার স্বাভাবিকতার দিকে ক্রমবিকাশেরও যথেষ্ট অবকাশ ঘটিবে।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ঈথার।

২

এই ঈথারের মধ্যে আলোকের গতি কিরূপে সাধিত হয়, এখন তাহার আলোচনা করিব। সাধারণ পদার্থের অণু-স্পন্দন দ্বারা শব্দ-তরঙ্গ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যে বস্তু শব্দ উৎপন্ন করিতেছে, বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই বস্তুটি কাঁপিতেছে। কাজেই যেটি কাঁপিতেছে, সেটি তৎসংলগ্ন বাতাসের অণুগুলিকে কাঁপাইবে। ফলে সেই কম্পিত বাতাস-অণুগুলি তৎপার্শ্বস্থ অণুগুলিকে আন্দোলিত করিবে। এইরূপে সেই কম্পন চারি দিকে চলিয়া যাইবে, দূর হইতে দূরান্তরে গমন করিবে, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এইরূপে শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সেই কম্পিত বায়ুকণাগুলি যখন আমাদের কানের পাতলা (ঝিঁঝিঁ পাতের ন্যায় পাতলা) চামড়ার (tympanum) উপর ঘাত প্রতিঘাত করে, তখন কর্ণস্থ শব্দবাহী স্নায়ুমণ্ডল শব্দের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। আলোকের গতিবিধি কিন্তু এরূপ নহে। কোনও পদার্থ শব্দ-তরঙ্গের ন্যায় আলোক-তরঙ্গকে বহিয়া লইয়া যায় না। কারণ, (১) আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^{১০} সেণ্টিমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল। পদার্থ দ্বারা প্রবাহিত কাহারও এত দ্রুতগতি নহে। ইহাই প্রথম কারণ। (২) যে স্পন্দন দ্বারা আলোক-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে স্পন্দন লম্বালম্বি ভাবে না হইয়া, আড়া-আড়ি ভাবে হইয়া থাকে। পোলারিজেসন আলোকের আড়া-আড়ি স্পন্দনেই তাহার প্রমাণ। তরল ও বায়বীয় পদার্থের

অণুগুলি অসংলগ্ন, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন —অর্থাৎ অণুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক আছে (intermolecular space)। সুতরাং তরল বা বায়বীয় পদার্থের অণু দ্বারা আলোক-স্পন্দন প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে। যদি কোনও প্রকার অণু দ্বারাই আলোক-স্পন্দন স্থানান্তরিত হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে বরং **কঠিন** বস্তুর অণু দ্বারা তাহা সম্ভব। এখন কঠিন কাহাকে বলে, বুঝিতে হইবে। বস্তুর কাঠিন্য গুণ বলিতে কি বুঝায়, তাহা ভাল করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। **যে গুণ থাকাতে বস্তু তাহার আকার পরিবর্ত্তনের পথে বাধা দেয়, তাহার নাম কাঠিন্য।** যে বস্তুতে এই গুণ আছে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ কঠিন শব্দে অভিহিত করেন। ইহাকে স্থিতিস্থাপকত্ব Elasticity) বলিতে পারা যায়। স্থিতিস্থাপকতাই কঠিন বস্তুর বৈশিষ্ট্য। ইহা দ্বারাই কঠিন বস্তুকে সরিল (fluid) পদার্থ হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। স্পন্দন-প্রবাহী হইতে হইলে বস্তুটির (Inertia) থাকা চাই। যে বস্তুতে স্থিতিস্থাপকতা ও Inertia গুণ আছে, কেবল সেই বস্তুর অণু দ্বারাই আড়াআড়ি স্পন্দন প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। পদার্থমাত্র Inertia গুণে বিভূষিত; কিন্তু সরিল পদার্থে কেবলমাত্র Volume elasticity আছে, কাজেই তাহা দ্বারা লম্বালম্বি স্পন্দনই প্রবাহিত করা যাইতে পারে। আড়াআড়ি স্পন্দন হইতেই আলোকের উৎপত্তি। বায়ু, জল প্রভৃতি সরিল পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা গুণ নাই। অথচ, তাহারা স্বচ্ছ, অর্থাৎ আলোক-স্পন্দন তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈথার সকল দ্রব্যের মধ্যে ও বাহিরে ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বায়ু, জল প্রভৃতি সরিল পদার্থের মধ্যে যে ঈথার আছে, সেই ঈথারই আলোক-স্পন্দন বহিয়া লইয়া যায়। ঈথার যদি কোনও পদার্থই হয়, তবে তাহাকে আমরা কাঠিন্য ও Inertia গুণে ভূষিত করিব। বিরলীকৃত বায়ুর এই দুই গুণ থাকে না, সুতরাং তাহাতে আমাদের কাজ চলিবে না। ঈথার নিশ্চয়ই সরিল পদার্থ হইতে বিভিন্ন। গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ বিশ্ব আকাশেও বায়ু থাকিতে পারে। এবং যদি থাকে, তবে তাহা অতি পাতলা, অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিবে। ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব আমাদের ঠিক জানা নাই। কেহ বলেন, খুব বেশী; কেহ বলেন, খুব কম। একবার ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানিতে পারিলে, তাহার স্থিতিস্থাপকতা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায়; কেন না, স্থিতিস্থাপকতা ও আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুপাত আড়াআড়ি তরঙ্গ-

গতির বর্গের সহিত সমান। মনে কর, স্থিতিস্থাপকতাকে যদি 'ক' ও আপেক্ষিক গুরুত্বকে 'অ' ও আড়াআড়ি তরঙ্গ-গতিকে (Velocity of transverse wave) যদি 'গ' বলা যায়, তবে

$$\text{গ}^{২} = \frac{\text{ক}}{\text{অ}}$$

এই সমীকরণ হইতে ঈথারের স্থিতিস্থাপকতার (rigidity) পরিমাণ $= ৯ \times ১০^{২০}$। সকল পদার্থের মধ্যে কঠিনতম পদার্থ হইতেছে ইস্পাত। তাহার স্থিতিস্থাপকতা $= ৮ \times ১০^{১১}$ সেঃ গ্রাঃ সেঃ (C. G. S.) পদ্ধতি-অনুযায়ী মাপ। ইস্পাতের মধ্য দিয়া আলোকের গতিতে কোনও স্পন্দন চলিয়া যাইতে পারে না; কাচের মধ্য দিয়াও আলোকের গতিতে কোনও স্পন্দন প্রবাহিত হইতে পারে না। না পারিবার কারণ তাহাদের গুরুত্বাধিক্য, অর্থাৎ তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া আলোকের ন্যায় অত বড় গতিতে কোনও স্পন্দন তাহাদের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। ক্রাউন কাচের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ লক্ষ সেণ্টিমিটার গতিতে প্রবাহিত হয়। খুব বড় গতি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কাচের মধ্যস্থ ঈথার তদপেক্ষা ৪০,০০০ গুণ অধিক গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন প্রবাহিত করিতে পারে। অর্থাৎ, তখন ঈথার ২×১০^{১০} সেণ্টিমিটার গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন-বহনে সমর্থ। কাচের বাহিরে স্থিত ঈথার তদপেক্ষাও অধিক গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন বহন করিতে পারে। অর্থাৎ, ইহার স্পন্দন-বহন-গতি—৩×১০^{১০} সেণ্টিমিটার। এখন কথা হইতেছে, কাচস্থ ঈথার ও বাহিরের ঈথারের এই প্রভেদ কেন? কাচস্থ ঈথার বাহিরস্থ ঈথার অপেক্ষা $\frac{২}{৩}$ গতিতে আড়াআড়ি স্পন্দন বহন করে কেন? কাচের মধ্যস্থ ঈথার কি পার্শ্বস্থ ঈথার অপেক্ষা ঘনীভূত হইয়াছে? অথবা, ইহার স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া গিয়াছে? কি হইয়াছে, কেন এরূপ তারতম্য দৃষ্ট হয়? এ প্রশ্নের সমাধান সহজে হইবে না। এ প্রশ্ন বড় জটিল। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়ের সম্পর্কে আসিয়া ঈথারের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরও বলিতে পারা যায় যে, জড়স্থ ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জড়-পার্শ্বস্থ ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক। জড় যত ঘন হইবে, তন্মধ্যস্থ ঈথারও তদনুযায়ী ঘন হইবে।

বিজ্ঞান-জগতে ফ্রেনেলকে (Fresnel) বড় উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মতটা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

১। জড়স্থ ঈথার বাহিঃস্থ ঈথারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ঘন।

২। জড়-অণু ও ঈথারের মধ্যে একটা কোনও আকর্ষণ গোছের শক্তি আছে, যার ফলে খানিকটা ঈথার জড়-পরমাণুকে আঁকড়াইয়া থাকে।

৩। জড়-সংলগ্ন ঈথার জড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলা ফেরা করে।

৪। জড়-সংলগ্ন ঈথারের rigidity তৎপার্শ্বস্থ মুক্ত ঈথারের rigidityর সহিত সমান। এ নিয়মটী কেবল কয়েকটী crystalএর বেলা খাটে না।

যদি এই রকম একটা কিছু মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জড়স্থ ঈথারের আপেক্ষিক গুরুত্বের একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, আলোকের গতির বিপরীত অনুপাতকেই বিবর্ত্তন অঙ্ক (refractive index) কহে। আমরা এই বিবর্ত্তন অঙ্ককে 'u' এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিব। আপেক্ষিক গুরুত্ব, গতিবর্গের বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তন করে। সুতরাং আঃ গুরুত্বমাপ বিবর্ত্তনাঙ্ক বর্গ-মাপের ($u^২$) সমান। ঈথারের আঃ গুরুত্বকে যদি এক ধরি, জড়স্থ ঈথারের গুরুত্ব হইবে $u^২$। তাহা হইলে জড়-সংলগ্ন ঈথারের আঃ গুরুত্ব হইবে $u^২ - ১$। এইরূপে কাগজে কলমে হিসাব করাটা নিতান্ত মন্দ নয়। কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক এরূপ না হইতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষিলে ঠিক এরূপ হিসাবটি হয় ত না টিকিতে পারে। কিন্তু ঐরূপ একটা কোনও হিসাব যে সত্য, সে বিষয়ে কোনও ভুল নাই। একখণ্ড জড়ে যত ঈথার আছে, তাহার $(১ - \frac{১}{u^২})$ ভাগ জড়ের সহিত একরকম বাঁধা আছে। এবং সেই বাঁধা ঈথারটি জড়ের সহিত গমনাগমন করে। আর বাকি $\frac{১}{u^২}$ ভাগ ঈথার মুক্ত। এই মুক্ত ঈথার জড় স্থানান্তরিত হইলে জড়ের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই সরল তথ্যগুলি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত।

আচ্ছা, এখন শব্দ-গতির উপর বাতাসের কি ফলাফল দেখা যাউক। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বোক্ত ভাবটি আরও ফুটাইয়া তোলা। শব্দ কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট গতিতে বাতাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। শব্দ-গতি বাতাসের অণুর স্পন্দন-গতির উপর নির্ভর করে। অণু সকল যে হারে স্পন্দনগুলি চালাইয়া দেয়, সেই হারের উপরও শব্দগতি কতকটা নির্ভর করে। এখন যদি একটা ঝড় বাতাস-অণুগুলিকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহিয়া লইয়া যাইতে থাকে,

তাহা হইলে, ঝড় যে দিকে যাইতেছে, শব্দ সেই দিকে খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে। আর তার ঠিক বিপরীত দিকে খুব আস্তে আস্তে যাইবে। আলোকের বেলা কি এ তর্ক খাটে না? ঝড়ের দিকে কি আলোক দ্রুতপদে গমন করে? যদি বাতাসের সহিত ঈথার চলিয়া যাইতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আলোক দ্রুতপদে গমন করিবে। আর যদি ঈথার স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, ঝড়ের সহিত ঈথার চলাফেরা না করে; ঝড় চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ঈথার নড়িতেছে না—যদি এরূপ হয়, তবে আলোক-গতির কোনও তারতম্য হইবে না। যদি আমরা Fresnelএর মত মানিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে হয়, ঈথার একেবারে অচঞ্চল অবস্থায় থাকে না, আবার সবটা চঞ্চলও হয় না। মুক্ত ঈথার অচঞ্চল, স্থির; তাহার নড়ন-চড়ন নাই। বাঁধা ঈথারের ঝড়ের সহিত গতি আছে; সুতরাং তাহা চঞ্চল; স্থির নহে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আলোক-গতি ঝড়-গতির (১ − $\frac{১}{u^2}$) হারে বাড়িবে।

Fizean, Arago, Maxwell প্রভৃতি মনীষিগণ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা Fresnelএর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জগতে Fresnelএরই জয়-জয়কার ঘোষিত হয়।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। কার্ত্তিক।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বাঙ্গালার প্রাণ' ও "বাঙ্গালী" সাহিত্য প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নানা কথার অবতারণা ও সমালোচনা করিয়াছেন, এবং উপসংহারে প্রতিপক্ষদিগকে শাসাইয়াছেন,—'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।' নরেশবাবু আমাদের দেশে একটা 'উৎকট স্বদেশপ্রেম' দেখিয়াছেন; হয় ত তাহার অস্তিত্ব আছে। হয় ত তাহা অন্য বস্তু। হয় ত তাহা এক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের অভাবের ফল—অন্য ক্ষেত্রে গোঁড়ামীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নরেশবাবু সেই ভাবের আতিশয্যকেই 'স্বদেশপ্রেমের উৎকট রূপ' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'উৎকট স্বদেশপ্রেমে'র বিচারও তাঁহার উদ্দিষ্ট নহে। 'এই স্বাদেশিকতার হাওয়া সাহিত্যের গোষ্পদে ভয়ানক তোলপাড় লাগাইয়া দিয়াছে। এই স্বাদেশিকতার প্রবক্তাদের বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার একটা প্রাণ আছে—যাহার সন্ধান তাঁহারা ছাড়া আর কেউ জানেন না।' সাহিত্যের 'গোষ্পদ'ই বটে। নতুবা এমন সঙ্গতিহীন, মূলসূত্রশূন্য, বিচ্ছিন্ন বক্তব্যের ডোঙ্গা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষিত ছাত্র ও অধ্যাপক তাহাতে নামিতেন না। বাঙ্গালার 'একটা' প্রাণ আছে কি না, জানি না; তবে বাঙ্গালার প্রাণ আছে, জানি ও মানি। তাহার সন্ধান কে জানে, কে না জানে, তাহা জানি না; তবে প্রাণের সন্ধান প্রাণের আধারেই করিতে হয়; অন্যত্র, মিশরের মমীতে বা অন্য দেশের বিগ্রহে বাঙ্গালার প্রাণের সন্ধান করিবার প্রয়োজন প্রকৃতিস্থের হয় না, তাহাও অবশ্য জানি। 'সাহিত্যের ভিতর বাঙ্গালার "বিশেষ সংস্করণে"র প্রাণ থাকিলেই সেটা সাহিত্য', এ কথা লেখককে মানিতে বলিব না। তাহাও নিশ্চয়ই 'সাহিত্য', কিন্তু 'বাঙ্গালার বিশেষ সংস্করণের প্রাণ না হউক, অন্ততঃ 'সাধারণ সংস্করণের প্রাণ' না থাকিলে, তাহা 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নয়, ইহা আমরাও বলিয়া থাকি। 'সাহিত্য', 'বিশ্বসাহিত্য', 'বড় সাহিত্য', 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য' প্রভৃতি যে সকল বড় বড় কথার 'বুলি' লইয়া আজকালকার কলেজের 'বহির্মুখ' ছাত্রেরা লোফালুফি

করিতেছেন, সকল দেশেই 'জাতীয় সাহিত্য' হইতেই সেই উচ্চ সাহিত্যের—সার্ব্বভৌমিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্য সর্ব্বপ্রথমে দৈশিক, জাতীয়। তাহার পর তাহা দেশ-কালের অতীত হইতে পারে। কোনও 'সাহিত্যে'র আদ্যোপান্তই 'বিশ্বসাহিত্য' নয় হইতে পারে না; হয় না। জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ ও স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানব-জাতির অবাধ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হইতে পারে, তাহাতে 'বিশ্ব সাহিত্যে'র উদয় হইতে পারে। 'বিলাতী শিক্ষাজাত কোনও সংস্কারে'র গন্ধ থাকিলেই, তাহার আঘ্রাণমাত্র এ যুগে 'নিষ্ঠাবান সাহিত্য' 'পিরালী' হইয়া যায় না, তাহা আমরাও মানি। কিন্তু 'বিলাতী শিক্ষা'র সঙ্গে 'বিলাতী সাহিত্য'ই থাকে; 'বিলাতী সাহিত্যই' থাকিবে। 'বিলাতী শিক্ষা' ও 'বিলাতী সাহিত্য' বাঙ্গালা অক্ষরের পোষাক পরিয়া স্বদেশী হইতে পারে না, পারিবে না—লেখক যে বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তেমনই একটা বিশ্বশিক্ষাও আছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ শিক্ষা জাতীয়তারই প্রয়োজনে ও প্রেরণায় জাতীয় সংস্কারের ও দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও সাহিত্যের সৃষ্টি করে। শিক্ষাও সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে। সেই সার্ব্বভৌমিক ও দেশ-কালের অতীত 'শিক্ষার গন্ধ' বিশ্বসাহিত্যে থাকিতে পারে। বড় বড় জাতির বড় বড় সাহিত্যে, বিদেশের শিক্ষার, সংস্কারের, সাহিত্যের গন্ধ আছে; তাহাও সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই 'গন্ধ'ই 'বিশ্বসাহিত্য' নহে। 'লেখকের বিশেষত্ব'ই হয় ত সাহিত্য। কিন্তু out-landish উদ্ভট 'বিদেশিতা', জাতীয় প্রকৃতির ও জাতীয় সংস্কারের ও জাতীয় ভাবের বিরোধী, বিদেশের আমদানী 'বিশেষত্ব' কোনও সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিতে পারে না। 'না বলিয়া' 'বিশ্ব-সাহিত্য' হইতে গৃহীত বস্তু ও গন্ধ ও বিশেষত্বও সংগ্রহমাত্র; 'সৃষ্টি' নহে। তাহা বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ। কোনও সাহিত্যে তাহার আমদানী করিলে, সে সাহিত্য পুষ্ট সমৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সেই ধার করা সাহিত্য 'বিশ্বসাহিত্য' বলিয়া দাবী করিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের ছায়া, এমন কি, কায়ারও আমদানী হইতেছে; কিন্তু তাহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য 'বিশ্বসাহিত্যে'র পর্য্যায়ে উঠিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যদি বিশ্বের বরেণ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হয়, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিশ্চয়ই আপনার স্থান অধিকার করিবে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যাহা কিছু ভাল ও বড় বলিয়া সকলের কাছে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে, আদর পাইয়াছে, সে সমস্তই এই "বিলাতী আবহাওয়া"র রচিত বলিয়া একবারেই বাতিল ও নামঞ্জুর—সেটা "বাঙ্গালী" সাহিত্য নয়'—পড়িয়া আমরা সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যে 'যাহা কিছু বড়', সবই 'বিলাতী আবহাওয়ায় রচিত'? যাহা দেশের আবহাওয়ায় রচিত নয়, এবং যাহা প্রকারান্তরে বিলাতী, তাহা নিশ্চয়ই বাতিল ও নামঞ্জুর। 'পৃথিবীতে', এমন কি, দ্যুলোকে ও পাতালে 'আদর পাইলেও' তাহা 'বাঙ্গালী' সাহিত্য নয়, বাঙ্গালা সাহিত্য নয়। 'গীতাঞ্জলি' কি 'বিলাতী আবহাওয়ায় রচিত?' ম্যাক্‌বেথের ডাইনী বুড়ীদের 'আবহাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিশ্বের' মনে পড়ে। সেই 'আবহাওয়া' ও 'কুয়া'য় কি 'গীতাঞ্জলি'র গানের সুর ফুটিয়াছে, না ফুটিতে পারে? 'পৃথিবীর আদরে'র আশায় কোনও সাহিত্যিক পৃথিবীর সাহিত্য ছানিয়া তিলোত্তমার মত 'ধরোত্তমা' সাহিত্য-শ্রীর সৃষ্টি করিবেন না। বিলাতী আবহাওয়ায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সৃষ্টি হয় নাই, মেঘদূতের সৃষ্টি হয় নাই; তবু তাহা বিশ্বসাহিত্য, আশা করি, নরেশবাবুও তাহা অস্বীকার করিবেন না। সেদিনও জয়দেব যে গীতগোবিন্দ গাহিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, আর্য্যেরা তাহাকেও বিশ্বসাহিত্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন। 'বিশ্বসাহিত্য' নামক কথাটার সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বে রামায়ণ মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাও নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্য। আর একটা কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিলেছি না। বিশ্বসাহিত্যের এই সকল 'প্রবক্তা'দের 'বিশ্ব' কি জানেন? একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। আমাদের রাজার জাতির বাসভূমি। তাঁহাদের সেদিনকার দ্বৈপায়ন সাহিত্যই ইঁহাদের বিশ্বসাহিত্য, এবং সেই দ্বৈপায়ন-সমাদর-লাভই, ইঁহাদের মতে, সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য ও পরম পুরস্কার। নাগাদ বিলাতী জুতা ও হুইস্ক বিলাতী কুকুর পর্য্যন্ত ইঁহাদের দৌড়। পৃথিবীর মধ্যে ঐ দ্বীপটিতেই মানবের মন এমন উপাদানে গঠিত যে, তাহারা

অন্য জাতিকে বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের সাহিত্য বুঝিবার বিষয়েও তাহাদের পক্ষে উহা একটা খুব বড় বাধা। 'বিলাতী হাওয়ায় রচিত' সাহিত্য তাহাদের পক্ষে সহজ, অতএব তাহাই কখনও কখনও তাহাদের আদর পায়; তবে সে আদর অরোরা-বোরিয়ালিসের মত ছ' মাস থাকিবে, অথবা বিদ্যুতের মত নিমেষে মিলাইবে, তাহা বলা যায় না! অথচ, এই আদরের লোভে আমাদের সাহিত্য তাহার স্বাতন্ত্র্য ছাড়িবে, জাতীয় ভাব ছাড়িবে; বাঙ্গালীর মানসী শাড়ী ফেলিয়া গাউন ধরিবে। গীতিকবিতা চণ্ডীদাসের প্রসাদী তুলসীর মালা ফেলিয়া দিয়া বনেট পরিবে। কথা-সরিৎসাগর ও একাধিক-সহস্র-রজনী প্যাণ্টোমাইমে নাচিতে আরম্ভ করিবে। নতুবা 'বিশ্বসাহিত্যে' আমার সাহিত্যের আদর হইবে না। পক্ষান্তরে, তোমার আধুনিক সাহিত্যই বা কতটুকু! সেই স্বল্পপ্রাণ সাহিত্যকে জাতীয়তার ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিয়া, বিদেশী আদর্শের দাস করিয়া, এবং মৌলিকতার স্বপ্ন পর্য্যন্ত ভুলাইয়া যদি 'বিশ্বসাহিত্যে'র সৃষ্টি করিতে পার, কর। কিন্তু বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ও তোমার মতে 'বাঙ্গালী' সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার জন্য প্রাণপণ করে, তাহাতে আপত্তি করিও না। তুমি যে 'শিক্ষা' পাইয়াছ, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহা স্বদেশকে দেখিতে দেয় না, বিদেশকে দেখিবার চক্ষু ও চশমা দুই-ই দান করে। স্বদেশী সাহিত্যের গৌরব বুঝিবার বুদ্ধি স্বদেশী সাহিত্যই দিতে পারে। বিদেশী সাহিত্যের চিনির বলদের পক্ষে স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী তত্ত্ব, স্বদেশী ভাব অজ্ঞেয়! বিশ্বের সাহিত্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে তোমারও সমান অধিকার। কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব সাহিত্য আছে; এবং তাহাই সেই জাতির সাহিত্য; এবং জাতির জীবনের পক্ষে বিশ্বসাহিত্য অপেক্ষা তাহার প্রয়োজনও অল্প নহে। বোধ করি, বিশ্বসাহিত্যে'ও এমন উপদেশ আছে। -'যাহা কিছু "বাঙ্গালী", তাহাই জগতের সার' নিশ্চয়ই নহে; কিন্তু তাহাই 'বাঙ্গালীর সার'। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী বলিয়াই আমার; সুইনবরণ আমার নহেন। বিশ্বসাহিত্যও কি মমতাবুদ্ধির বিনিময়ে, স্বজাতি-প্রীতির নিষ্ক্রয়ে, স্বদেশী সাহিত্যের মূল্যে 'সার্ব্বভৌমিকতা' ক্রয় করিবার পরামর্শ দেয়?—বলিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঘানী-গাছে যে দুর্গন্ধ তেল পেষা হইতেছে, তাহা যে বিশ্বসাহিত্যের দানা হইতে নিঃসৃত হয় নাই, এই সকল নমুনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।—লেখকের অনেক মতই এইরূপ। সর্ব্বোপরি প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন 'স্বাদেশিকতা'র প্রতি লেখকের ঘৃণা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়।—যে 'বিশ্ব'-সাহিত্য অর্থাৎ গোলদীঘীর বিশ্ব-বিদ্যার উদার সাহিত্য এমন সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করে, তাহাকে বারবার নমস্কার করি। 'বাহির হইতে কিছু আনিলেই যে আমরা বাহিরের দাস হইয়া যাই, এমন কথা সাহিত্যে খাটে না।' কিন্তু 'দাস হইয়া' বাহির হইতে কিছু আনাকেই যদি বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে, আমরা যে নিতান্তই 'দাস', তাহা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। 'বাহির হইতে' আনিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক তর্জ্জমা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের, বা বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বাহিরের ভাবের আঘাতে অন্তরে প্রতিঘাতের সৃষ্টি, এবং সেই প্রতিঘাত হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু 'বাহির হইতে' আনা কোনও বস্তুই 'সাহিত্য' নহে। ভিতর হইতে যাহা আসে, তাহাই সাহিত্য—অন্ততঃ পুরাতন দলের এইরূপই প্রতীতি। যাহার নিজের ঘরে ও ঘটে কিছু নাই, সেই বাহির হইতে আনে। কেহ বলিয়া আনে, কেহ না বলিয়া আনে। যে না বলিয়া আনে, তাহাকে চোর বলে। আমাদের দেশে এমন বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য 'চোর-পঞ্চাশৎ' লিখিবার সময় আসিয়াছে।—দেড় শত বৎসরের অধীনতার ও রাজদত্ত অবশ্য-স্বীকার্য্য বিদেশী শিক্ষার ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বরেণ্য প্রতিভাও বিদেশী সাহিত্যের ছায়ায় মলিন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আশা করি, 'কেটে যাবে মেঘ'; নবীন গরিমায় আপনার স্বাতন্ত্র্যে আমাদের সাহিত্য কালে রাহু-মুক্ত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; তখন আমরা বিলাতী 'আবহাওয়া ও কুয়া'র হকালতীর পণ্ডশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব, এবং সেই প্রতিভাশালী মহাপুরুষের স্মরণে বলিতে পারিব,—'ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' শ্রীসীতা দেবীর 'অষ্টতারা' গল্প, ভবে

সত্য খুব অল্প। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'বস্ত্র চিন্তা' সময়োচিত প্রবন্ধ। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধে অনেক তথ্য আছে। সংক্ষেপে লেখকের মতের আলোচনা করিবার উপায় নাই ; ইহার আদ্যো-পান্তে একটা সঙ্গতি আছে ; কোনও একটা মতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার বা নমুনা তুলিবার উপায় নাই। ইউরোপের সাহিত্যে যাহা আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা নাই,—এ জন্য লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন ; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপের আদর্শের যে সকল বস্তুর আমদানী হইয়াছে, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ইউরোপের সাহিত্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও কার্য্যপরম্পরার সৃষ্টি, বাঙ্গালায় তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'তৎ-সমে'র আশা কি স্বাভাবিক ?—অন্য দেশের সাহিত্যে যাহা আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও ঠিক তাহাই থাকিবে, বা তাহা না থাকিলে চলিবে না, এ আবদারও কি সমীচীন ? শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'চিত্র-প্রতিমূর্ত্তি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রের 'পল্লী-প্রশস্তি' তথৈবচ।

ভারতী ; কার্ত্তিক।—'হরপার্ব্বতী' একখানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিচ্ছবি।—ইহাতে অঙ্কিত পুরুষ ও নারী হর ও পার্ব্বতী হইলেন কেন, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। বোধ হয়, কিংবদন্তী এই চিত্রে এই অভিধার আরোপ করিয়া থাকিবে। অঙ্কিত নর-নারী বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাজা ও রাণী হইলেও আপত্তি করিবার কারণ নাই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শরৎ-সুন্দরী' নামক ছড়াটি তরল ছন্দে রচিত। শরৎ-সুন্দরী 'হাতে মুখ আড়াল করে' এবং 'পথের বাঁক দিয়ে' কেন চলিবেন, তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহার সৌন্দর্য্য থামটার তালকেই বা আশ্রয় করিল কেন, তাহাই বা কে বলিবে ? 'শরৎ-সুন্দরী' অত্যন্ত 'ছ্যাবলা', উদ্ভট ও খেলো কল্পনা। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কিঙ্করী' একটি বিশেষত্ববর্জ্জিত ক্ষুদ্র উপাখ্যান। ইহাতে কিঙ্করীর পাঁচ বৎসর বয়স হইতে, বোধ হয়, শেষ বয়স পর্য্যন্ত একটা জীবনচরিত আছে। মেয়ে-যাত্রায় কিঙ্করীর জীবনের সূচনা, থিয়েটারে তাহার বিকাশ, বাৎসল্যে তাহার পরিণতি। কিন্তু সমস্তটাই যাত্রার ও থিয়েটারের নাটুকে 'ঢঙ্গে' বিড়ম্বিত। ইহা 'ছোট গল্প' নয়, বড় গল্পের হিসাবেও সুসম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত নহে। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'স্বর্ণ-মৃগ' নামক সুদীর্ঘ পদ্যটি বোধ হয় প্রহেলিকা। ইহাতে অনেক কারিগরী আছে, কিন্তু কবিতা নাই, কবিত্ব নাই। দুই একটি সুন্দর চরণ আছে,—'বাদলের পরে মেঘ-নগরে বজ্রযাগে ধ্রুপদ বাজে আজ।' আবার, 'ন্যাকা করে' সেই ন্যাকামী মাত্র'ও আছে ! কিন্তু সমস্ত কবিতাটির বক্তব্য কি, তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা'র শিরোনাম খুব জাঁকালো বটে, কিন্তু বস্তু অত্যন্ত অল্প। ত্যাগ, ভোগ প্রভৃতি কয়েকটি মামুলী শব্দের চচ্চড়ী। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' উল্লেখযোগ্য—অনেক নূতন তথ্য আছে। শ্রীকালিদাস রায়ের 'বুকের ধনে' এক বৃদ্ধার ছাগল-বাৎসল্যের কথা আছে। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সে দিন একটি ছোট গল্পে এই ভাবটি ফুটাইয়া-ছেন। কবি কালিদাস পরবর্ত্তী। সেই বুড়ীর মনের কথাই ছন্দে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রসের উদ্ভাবনায় সফল হন নাই ; বিড়ম্বনারই সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'বামাবোধিনী'তে 'আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?' এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রধানতঃ আর্থার সাইমন্স, ও বার্ণাড শ'র মতের পরিচয় দিয়াছেন।

'চন্দ্রে'র বঙ্গ-বিজয়।

চন্দ্র নামক কোনও 'ভূমিপতি' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শত্রুভূত বাঙ্গালীকে সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই পরাভব-কাহিনী প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়া অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। পাষাণে নয়, তাম্রপট্টে নয়,—লেখটিকে চিরস্থিতিক করিবার অভিপ্রায়ে কোনও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহাপ্রভাব মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ ইহাকে বহু-ব্যয়ে উত্থাপিত একটি উচ্চ লৌহ-স্তম্ভে (১) উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজধানী দিল্লী নগরীর নাতিদূরে মেহরৌলী নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ কুতুব-মীনারের নিকটে এই লৌহস্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দে বিরচিত তিনটি শ্লোকেই লিপিটি সমাপ্ত। শ্লোকের বাচ্যার্থ লইয়া বড় বেশী গোলযোগ ঘটিবার কথা নহে। কিন্তু তথাপি ব্যঙ্গ্যার্থের সাহায্যেই লিপির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। সেই জন্য বঙ্গবিজেতা চন্দ্রের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তাঁহার পরিচয় লইয়া অদ্যাপি তর্কের অবসান হয় নাই—শীঘ্র হইবারও আশা করা যাইতে পারে না। 'চন্দ্র' বিষ্ণুভক্ত ছিলেন—বিষ্ণুদেবে মতিস্থাপন করিয়া তিনি বিষ্ণুপদ-গিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজারূপে এই লৌহস্তম্ভ উত্তোলন করাইয়াছিলেন। কিন্তু গুপ্তাক্ষরে ক্ষোদিত ত্রিশ্লোকাত্মক প্রশস্তি-লিপিটি তিনি নিজ আদেশে উৎকীর্ণ করান নাই—তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত চন্দ্রের "কর্ম্ম-জিতাবনীতে গমনে"র কথা, অর্থাৎ তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির পর যখন তিনি "ক্ষিতিতে কীর্ত্তিরূপে স্থিত" ছিলেন—তখন স্ববংশের পরবর্ত্তী কোনও 'ভূমিপতি' পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভূমিপতি' চন্দ্রের অবদান শ্লোকে আবদ্ধ করাইয়া লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সেই ভূমিপতিই বা কে—তাঁহার পরিচয় বাহির করাও কম কঠিন নহে।

পরলোকগত ডাঃ ফ্লীটের মতে, (২) লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির অক্ষরের সহিত এলাহাবাদে স্থিত সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়-কাহিনীর ঘোষণা-লিপির অক্ষরের স্পষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।—তাই তিনি মনে করিতেন যে, কেহ

(১) Fleet--*Corp. Insc. Ind.* Vol. III, No. 32.

(২) *Ibidem*—P. 140, Foot-note (পাদটীকা) I.

গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে (খৃঃ ৩২০—৩৩৫) এই লৌহস্তম্ভ-লিপির 'চন্দ্র' বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তিনি তাহাতে বিস্মিত হইবেন না। ডাঃ হর্ণলির মতে (৩) দিল্লী-লিপির কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। এই মতের অনুসরণ করিয়াই ঐতিহাসিক স্মিথ মহোদয় (৪) স্বরচিত "ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে"র দ্বিতীয় সংস্করণে, লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র'কে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ধার্য্য করিয়া তাঁহাকেই বঙ্গবিজেতা মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (খৃঃ ৩৮০—৪১৪) সম্মুখ-সমরে সমবেত বঙ্গবাসীর বিপ্লব পরাভূত করিয়াছিলেন। যদি স্মিথের মতের অনুসরণ করিতে হয়, তবে "ভারতীয় মুদ্রামালা"র সঙ্কলয়িতা জন্ এলানের একটি কথা (৫) যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কথাটি এই—তিনি মনে করেন যে, মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধ হইতে দিগ্‌বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে মালব, গুজরাট, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বহুকাল-প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রপ-শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেই সেই দেশ গুপ্তসাম্রাজ্য-ভুক্ত করিতেছিলেন, তখন অবসর পাইয়া বাঙ্গালীরা সমুদ্রগুপ্ত-বিস্তারিত গুপ্ত-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় সম্রাটের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে সমবেত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আত্মবাহুবলে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও আমরা সমুদ্রগুপ্তকে কোনও প্রসঙ্গেই বঙ্গবিজয় করিতে দেখিতে পাই না—তথাপি তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বঙ্গবিজেতা মনে করিতে গিয়া এলান মহোদয়কে বিনা প্রমাণে বঙ্গদেশকে সমুদ্রগুপ্তের অধীন ধার্য্য করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু স্মিথ পরে স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বী হইয়া মনে করিতেছেন যে, লৌহস্তম্ভ লিপির 'চন্দ্র' গুপ্তবংশীয় কোনও সম্রাট নহেন; কিন্তু এই 'চন্দ্র' ও সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্ম্মা অভিন্ন ব্যক্তি। তথায় উল্লিখিত আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত দিগ্‌বিজয়কালে চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণকে স্ববলে উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রভাব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী

---

(৩) *Indian Antiquary*—Vol. XXI, pp. 43-44.

(৪) *Early History of India*—2nd Edition, p. 275.

(৫) *Indian Coins—Gupta Dynasties*—Introduction, p. XXXVI.

মহাশয় এই দুই ব্যক্তির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরও দুইটি প্রাচীন লিপির তাৎপর্য্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমটি প্রাচীন দশপুরে (বর্ত্তমান মন্দোসরে) আবিষ্কৃত (৬) ৪৬১ মালব-সংবতে প্রদত্ত মহারাজ নরবর্ম্মার রাজত্বসময়ের পাষাণ-লিপি ; দ্বিতীয়টি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শুশুনিয়া-পর্ব্বতগাত্রে গুপ্তযুগের অক্ষরে ক্ষোদিত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্ম্মের পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার (৭) উৎসর্গ-লিপি। উল্লিখিত প্রথম লিপি হইতে আমরা এইমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি যে, প্রাচীন দশপুর-অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিম-মালবাঞ্চলে যখন 'নরেন্দ্র' জয়বর্ম্মার পৌত্র, 'ক্ষিতীশ' সিংহবর্ম্মার পুত্র, 'পার্থিব' মহারাজ নরবর্ম্মা ৪৬১ "মালব-গণাম্নাত" সংবতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪০৪ সংবতে, রাজ্য পরিচালন করিতেছিলেন, তখন "মহাকারুণিক সত্যধর্ম্মার্জ্জিত-মহাধন স্বকুলের সংকর্ত্তা" কোনও ব্যক্তি "শরণ্য বিভু বাসুদেব"কে আশ্রয় করিয়া কোনও পুণ্যোদ্দেশে এই লিপির সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা জানি যে, এই সময়ে মগধের গুপ্ত-সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাযেই বিনা সংশয়ে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, এই মহারাজ-নরবর্ম্মা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত-রূপে মালবাঞ্চলে সম্ভবতঃ দশপুর রাজধানী হইতে রাজ্য-পরিচালন করিতেন। অন্য দুইটী প্রাচীন লিপির (৮) সাহায্যেও অবগত হওয়া যায় যে, নৃপ নরবর্ম্মার পুত্র নৃপ বিশ্ববর্ম্মা, এবং তাঁহার পুত্র নৃপ বন্ধুবর্ম্মা প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজধানী দশপুরনগরে সংস্থাপিত ছিল। উল্লিখিত প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ শুশুনিয়ার লিপি-পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, চক্রস্বামিদেবের উদ্দেশ্যে পর্ব্বত-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের উৎসর্গ পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার পুণ্য কার্য্য ("কৃতিঃ")। বিষ্ণুচক্রের নিম্নে দুই পংক্তিতে কেবল এইমাত্র লিখিত আছে :—

১। "পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ-শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

২। মহারাজ-শ্রীচন্দ্র বর্ম্মণঃ কৃতিঃ।"

গুপ্তযুগের লিপি সকল হইতে বুঝা যায় যে, সে কালে 'মহারাজ'-উপাধি

(৬) *Epi. Ind.*—Vol. XII, No. 35, p. 315 ff.

(৭) *Ibidem*—Vol. XIII ; এবং *Proc.* of the *A. S. B*, 1895, p. 180.

(৮) Fleet—*Corp. Insc. Ind.* Vol. III, Nos. 17 and 18.

সামন্তগণের নামের সহিতই প্রযুক্ত হইত। সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণের উচ্ছেদসাধনের পূর্ব্বে, বোধ হয়, পুষ্করণ [মাড়োয়ারের অংশবিশেষ] রাজ্যও একটী স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রথম লিপিতে আমরা মহারাজ-নরবর্ম্মাকে "ক্ষিতীশ" সিংহবর্ম্মার পুত্র-রূপে উল্লিখিত পাইয়াছি, এবং দ্বিতীয় লিপিতে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মাকে মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র-রূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা লক্ষ্য করিয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নরবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মাকে ভ্রাতা (৯) ধার্য্য করিয়া বাস্তবিক একটী নূতন তথ্যের উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ নরবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক সামন্তরাজ ছিলেন, এবং তদীয় ভ্রাতা চন্দ্রবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিলেন, (সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মাকে নরবর্ম্মার অগ্রজ বলিয়া ধার্য্য করা অযুক্তিযুক্ত হইবে না। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে উল্লিখিত আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্যবিশেষের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে, শুশুনিয়া পর্ব্বত-লিপিতে উল্লিখিত পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা মনে করা শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে পুষ্করণের অধিপতি এই চন্দ্রবর্ম্মাকে, এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত "ভূমিপতি" চন্দ্রকে এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত করা কঠিন ব্যাপার। লৌহস্তম্ভ-লিপির চন্দ্রকে দিগ্‌বিজয়কারী বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া, পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়ী বলিয়া মনে করা (১০) শাস্ত্রী মহাশয়ের ও তদীয় মতাবলম্বী শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয়ের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। মহারাজ নরবর্ম্মার সময়ের দশপুরের লিপির সাহায্যে শুশুনিয়া-লিপির কতকটা 'রহস্যভেদ' হইয়া থাকিলেও, শেষোক্ত লিপির সাহায্যে লৌহস্তম্ভ-লিপির 'চন্দ্রে'র পরিচয়-রহস্য

---

(৯) আলোচ্য বর্ম্মরাজগণের নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলী ধার্য্য করা যাইতে পারে, যথা,—

জয়বর্ম্মা
- সিংহবর্ম্মা
  - চন্দ্রবর্ম্মা
  - নরবর্ম্মা (মালবাব্দ ৪৬১)
    - বিশ্ববর্ম্মা (ঐ ৪৮০)
      - বন্ধুবর্ম্মা (ঐ ৪৯৩)

(১০) প্রবাসী—১৩২০ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন-সংখ্যা, ৫৯৭-৬০০ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন হইয়াছে কি? আমাদের মনে হয়, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি যে সকল আর্য্যাবর্ত্ত-নরপতি সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হয় ত, গুপ্তসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে পর, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে সামন্তরাজ-রূপে স্ব স্ব রাজ্যের শাসনভার হইতে বিচ্যুত করেন নাই। চন্দ্রবর্ম্মার পিতা মহারাজ সিংহবর্ম্মা ও তাঁহার পিতা নরবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষের সময়ে, পুষ্করণের স্বাধীন নরপতি ছিলেন, এবং পরে সমুদ্রগুপ্ত, হয় ত, চন্দ্রবর্ম্মাকে দিগ্‌বিজয়ের পর পুনরায় রাজ্যভার না দিয়া, তদীয় অনুজ নরবর্ম্মাকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দশপুর হইতে মালব প্রদেশের শাসন পরিচালিত করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে, চন্দ্রবর্ম্মা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকে গমন করিলে পর, সমুদ্রগুপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মাকে সামন্ত-রূপে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন-লিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নরবর্ম্মার পুত্র বিশ্ববর্ম্মা ও তৎপুত্র বন্ধুবর্ম্মা যথাক্রমে ৪৮০ ও ৪৯৩ মালবাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের সামন্ত-রূপে মালব প্রদেশের শাসনভার পরিচালিত করিতেন।

গঙ্গধারের প্রস্তর-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, ৪৮০ মালবাব্দে মালবাঞ্চলে বিশ্ববর্ম্মা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি অল্প বয়সেই শাস্ত্রানুসারে শুদ্ধবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করিয়া রাজগণের মধ্যে "সদ্ধর্ম্মমার্গ" প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং

"তস্মিন্ প্রশাসতি মহীং ন্‌পতিপ্রবীরে স্বর্গং যথা সুরপতাবমিতপ্রভাবে।
নাভূদধর্ম্মনিরতো ব্যসনান্বিতো বা লোকে কদাচন জনঃসুখবর্জ্জিতো বা॥"

"সুরপতি ইন্দ্রের স্বর্গপ্রশাসনের ন্যায় অমিতপ্রভাব এই নৃপতিশ্রেষ্ঠের মহী-প্রশাসন-সময়ে পৃথিবীতে কখনও কোনও ব্যক্তি অধর্ম্মনিরত, ব্যসনগামী, বা সুখবর্জ্জিত ছিল না।" আবার মন্দোসরের পাষাণলিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, [প্রথম] কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ("কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি") পার্থিবললামভূত এই বিশ্ববর্ম্মা সেই অঞ্চলের পালনকর্ত্তা ("গোপ্তা") ছিলেন, এবং তাঁহার যুবা বীর-পুত্র নৃপবন্ধুবর্ম্মাও (৪৯৩ মালবাব্দে) সম্যক্ সমৃদ্ধ দশপুর নগরের পালয়িতা ছিলেন ("তস্মিন্নেব ক্ষিতিপতিবৃষে বন্ধুবর্ম্মণ্যুদারে সম্যক্ স্ফীতং দশপুরমিদং পালয়ত্যুন্নতাংসে")। এই দুইটি লিপির সাহায্যে বলিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখিয়াছেন (১১) যে, তাঁহার মতে

(১১) *Indian Antiquary*—1913, p. 218.

মহোসরকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত বলিয়া মানচিত্রে প্রদর্শন করা স্মিথ সাহেবের ভুল হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে। তিনি যে এই মতের পোষণার্থ আরও বলিয়াছেন যে, নরবর্ম্মা ও বিশ্ববর্ম্মাকে গুপ্ত-প্রভাব স্বীকার করিতে দেখা যায় না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপরি-উল্লিখিত লিপিদ্বয়ের প্রমাণ বিপরীত মতেরই সমর্থন করে।

পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাকে অবিসংবাদিতরূপে লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র' বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইলে, ইহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গেই বঙ্গবিজয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু শুশুনিয়া-লিপিতে পুষ্করণাধিপতি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কোনরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল তিনি বিষ্ণুচক্রের উৎসর্গরূপ পুণ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন—ইহাই সেই লিপির প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রী মহাশয় যে দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন যে, পুষ্করণের চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই উক্তির সমর্থক প্রমাণ শুশুনিয়া-লিপি হইতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ শুশুনিয়া পর্ব্বতের সেই গুহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) কোনও তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা হয় ত সেই তীর্থে আগমন করিয়া স্বীয় বিষ্ণুভক্তির পরিচয় রাখিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে চক্রস্বামীর উদ্দেশে চক্র উৎকীর্ণ করাইয়া তাহার উৎসর্গরূপ পুণ্য কার্য্য স্বকৃতি বলিয়া লিপিতে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। তবে যদি বলা যায় যে, শুশুনিয়ার চক্র ও লৌহস্তম্ভ-রূপ ধ্বজ, এই উভয় বস্তুই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, অতএব চক্রদাতা চন্দ্রবর্ম্মা ও ধ্বজ-প্রতিষ্ঠাতা 'চন্দ্র' একই ব্যক্তি হইতে পারেন, তাহা হইলে, এইরূপ উক্তির বিরুদ্ধে এই প্রত্যুক্তিও হইতে পারে যে, গুপ্তবংশীয় নরপতিগণও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাঁহারা আপনাদিগকে 'পরমভাগবত' বলিয়া পরিচিত করিতেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ-লিপিতে কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তৎপাঠে দেখা যায় যে, যিনি

(১) বঙ্গদেশে সমবেতভাবে বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান শত্রুদিগকে যুদ্ধে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।

(২) যিনি সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া সমরপ্রাঙ্গণে বাহ্লিকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(৩) যাঁহার বীর্য্যবায়ুতে অদ্য পর্য্যন্ত [অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পরেও] দক্ষিণসাগর সুবাসিত আছে; অর্থাৎ, যিনি দক্ষিণের বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়া থাকিবেন।

(৪) যিনি মূর্ত্তিতে কর্ম্মার্জ্জিত [স্বর্গ] লোকে চলিয়া গেলেও এখন কীর্ত্তিরূপে ধরাতলে প্রতাপী হইয়া বর্ত্তমান; অর্থাৎ, এই লিপির সম্পাদনসময়ে যিনি স্বর্গগত।

(৫) যিনি পৃথিবীতে স্বভুজার্জ্জিত ঐকাধিরাজ্য বহুকাল ভোগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, যিনি নিজভুজবলে মহারাজাধিরাজ-পদ অর্জ্জন করিয়া তৎপদে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ["প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ"]

(৬) সেই "চন্দ্রাহ্ব ভূমিপতি" ভক্তিবশতঃ বিষ্ণুতে মতিস্থাপন করিয়া বিষ্ণুপদগিরিতে ভগবান্ বিষ্ণুর এই উচ্চ ধ্বজা স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই ছয়টি ঐতিহাসিক তথ্য হইতে আমরা দেখিতেছি যে, 'চন্দ্র' এক জন মহাপ্রভাব মহারাজাধিরাজ ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুরোধে ভূমিপতিকে "মহারাজাধিরাজচন্দ্র" না বলিয়া "ঐকাধিরাজ্যং প্রাপ্তেন" ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু শুশুনিয়া-লিপিতে চন্দ্রবর্ম্মাকে আমরা তৎকালে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণের, এবং সামন্ত-নরপতিগণের প্রতি প্রযোজ্য "মহারাজ" উপাধিতে লাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়াছি। উপরি-উল্লিখিত পঞ্চম তথ্যটির প্রতি বিশেষ প্রণিধান আবশ্যক। চন্দ্র স্বভুজবলে পৃথিবীর "ঐকাধিরাজ্য" প্রাপ্ত হইয়া, তাহা সুচিরকাল ভোগ করিয়াছিলেন, এবং তিনি পূর্ব্ব দিকে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিম দিকে সিন্ধুর সপ্ত মুখ পার হইয়া বাহ্লিকদিগের দেশ পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণেও সাগর পর্য্যন্ত বিজয় বিস্তারিত করিয়াছিলেন—এইরূপ উক্তি চতুর্থ শতাব্দীর আর্য্যাবর্ত্তে কোনও স্বাধীন ক্ষুদ্র স্থানীয় নরপতির সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হইয়া, বরং তাহা প্রাচীন কোনও গুপ্তরাজের সম্বন্ধে অধিকতর সঙ্গতির সহিত প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। সেই সময়ে গুপ্তবংশীয়গণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও বংশের রাজগণ দূরবর্ত্তী দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইরূপ কোনও ঐতিহাসিক তথ্য কোনও পুরাণের বা প্রাচীন লিপির সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাযেই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় বিজয়ী নরপতি সমুদ্রগুপ্তের পিতা বংশের সর্ব্বপ্রথম "মহারাজাধিরাজ" প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ বাহ্লিক প্রভৃতি দেশে বিজয়াভিযান করিয়া প্রথমতঃ গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে সমুদ্রগুপ্তও হয় ত এই ভাবে পিতার সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যরূপেই বঙ্গদেশ প্রভৃতির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হইতেছে, আমরা সমুদ্রগুপ্তের বিজিত প্রদেশসমূহের মধ্যে বঙ্গদেশের কোনরূপ উল্লেখ এলাহাবাদ-লিপিতে পাইতেছি না। বঙ্গদেশ কোনও কালে কোনও ভাবে পুষ্করণের চন্দ্রবর্ম্মার হস্তগত হইয়াছিল, এই প্রমাণ কোথায়? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমাদিগকে অন্য প্রমাণ অন্বেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, গুপ্তরাজগণের মধ্যে কেহ পরে বর্ম্মবংশীয়গণের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এ যাবৎ এরূপ কোনও প্রমাণও

আমরা পাই নাই। বরং গুপ্ত-যুগের দামোদরপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, প্রথম কুমারগুপ্ত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণের সময় বঙ্গোপদেশ গুপ্তগণের অপরোক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত জীবদ্দশায় বিষ্ণুর ধ্বজারূপে এই বহুব্যয়সাধ্য লৌহস্তম্ভ উত্তোলন করাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত পিতার বিজয়ের স্মরণার্থ এই ত্রিশ্লোকাত্মক লিপি রচনা করাইয়া তাহা সেই স্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতৃপিতামহগণ কেবল মহারাজ-পদ-লাঞ্ছিত স্থানীয় নরপতি ছিলেন বলিয়া, সমুদ্রগুপ্ত হয় ত তাঁহাদের কোনও পরিচয় লিপিতে উল্লেখ করিবার জন্য রাজকবিকে বলিয়া দেন নাই। তাই ইহাতে বংশাবলীর কোনরূপ বর্ণনা নাই। সুতরাং স্বর্গীয় ডাক্তার ফ্লীটের মতের সমর্থন করিয়া আমরা লৌহস্তম্ভ-লিপির 'চন্দ্র'কে গুপ্তবংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বলিয়াই মনে করি। এই কারণেই সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপির সহিত মেহেরৌলী স্তম্ভলিপির এতটা অক্ষর-সাদৃশ্য।

এ স্থলে আরও একটী কথা উল্লেখযোগ্য। পুরাণ-সঙ্কলনের কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পার্জিটার মহোদয় লিখিয়াছেন যে, পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গুপ্তবংশীয়গণ সাকেত (অযোধ্যা), মগধ ও প্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরপার্শ্বস্থ দেশ ভোগ করিবেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন (১২) যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ী পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে গুপ্তসাম্রাজ্য যত দূর বিস্তৃত ছিল, তাহা উদ্দেশ করিয়াই পুরাণে এই রাজ্যবিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে সমুদ্রগুপ্তের বা গুপ্তসাম্রাজ্যের কোনরূপ উল্লেখ লক্ষ্য না করিয়া পার্জিটার মহোদয় মনে করেন যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মগধ হইতে বিহার, তীরভুক্তি, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে রাজ্যবিস্তারের পর, এবং সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়-যাত্রার পূর্ব্বে, পুরাণের এই রাজবংশ-বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, তদীয় রাজত্বের শেষ-ভাগে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বঙ্গ-বাহ্লিক প্রভৃতি দেশ জয় করিবার পূর্ব্বেই পুরাণের বংশাবলী-বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, পুরাণের মগধে বাঙ্গালার অংশবিশেষও অন্তর্গত ছিল, তাই তাহাতে বিজিত

(১২) Pargiter—*Dynasties of the Kali Age*—Introduction, p. XII, § 20.

বাঙ্গালা দেশের কোনরূপ স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা-জয় সমুদ্রগুপ্তের ভাগ্যে পতিত হইলে, তাহা তাঁহার বিস্তৃত এলাহাবাদ-লিপিতে উল্লিখিত হইত। বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে সমুদ্রগুপ্তের ও তাঁহার উত্তরপুরুষগণের রাজত্ব-সময়ের নানা-লাঞ্ছন-যুক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাকেও কতকাংশে বাঙ্গালার গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভুক্তির প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

স্থাপত্য-শিল্প।

৭

পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে সৌধের অঙ্গগুলির আকৃতিগত উৎকর্ষের কথা বলিতে গিয়া মহামতি রাস্কিনের মতের উল্লেখ ও তাহার আলোচনা করা হইয়াছে; বলিয়াছি যে, তাঁহার মতে প্রকৃতিবিধান হইতে আকৃতিগত উপকরণ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; প্রকৃতি হইতে সুন্দর আকৃতি লইয়া তাহাকে সুন্দরভাবে যোজনা না করিলে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা। কলিকাতার কোনও পল্লীস্থ একখানি বাটীতে দেখিলাম যে, মৎস্যশল্কের ন্যায় এক প্রকার সামান্য বহিঃবর্দ্ধিত অলঙ্কার দ্বারা তাহার গাত্রটি শোভিত। ইহা চক্ষুর এমনই পীড়াদায়ক যে, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, এই অলঙ্কারটি বর্ম্ম বা ঢালের উপরই শোভন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সৌধের গাত্রে ইহার উপযোগিতা কোথায়? সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, প্রকৃতিবিধান হইতে অনুকরণ করিলেই সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। তবে সৌন্দর্য্যের সন্ধান কোথায়? এ কথা আমি সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, ক্রমিক উদ্গত ভাব (gradation) ও বৈপরীত্য (contrast) এই দুইটি হিসাব ও সামঞ্জস্য করিয়া প্রদর্শন করিতে পারিলে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইবে।

মানুষ সকল সময়েই উত্তেজনার প্রিয় নহে; কেন না, উত্তেজনা স্নায়ুগুলিকে টানিয়া ধরে। যাহার কার্য্য টানিয়া ধরা, তাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বসময়ে প্রিয় হইতে পারে না; এই কারণে যাহা শিথিল করিয়া দেয়, বা এলাইয়া দেয়, তাহাও প্রয়োজনীয়; সুতরাং যাহাতে উত্তেজিত করে, এবং তৃপ্তিসাধন করে, এমন দুইটির সংমিশ্রণ আছে, তাহা প্রিয় বোধ হইবে। যে নেশায় শুদ্ধ মদিরার উত্তেজনা আছে, তাহা সর্ব্বসময়ে কখনই প্রিয় হইতে পারে না; আর যাহাতে উত্তেজনা

হয় না, শুদ্ধ মদিরার মিষ্টত্ব উপভোগ করা যায়, তাহাও মদ্যপায়ীর নিকট আদৃত নহে; কিন্তু যাহা গোলাপী নেশা, অর্থাৎ যাহাতে উত্তেজনা ও মধুরতার মিশ্রণ আছে, শুনিয়াছি, তাহার আবেশে মর্ত্তে নাকি স্বর্গের আবির্ভাব হয়; প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ক্রমিক উদ্গমে চিত্তে তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এবং বৈপরীত্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু দেখিলে মানব-মন যেন ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠে; মনের গতি যে পথে ছিল, বাধা পাইয়া যেন অন্য পথে চালিত হয়; কিন্তু ক্রমিক উদ্গমে এ প্রকার ভাবের বিকাশ হয় না; ইহার গতি যেন অপ্রতিহত। সঙ্গীতে ও চিত্রে আমরা বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গম, এই দুই প্রকার ভাবেরই বিশেষ লীলা দেখি। চিত্রে আমরা দেখি যে, একটা রঙ্গ যেখানে শেষ করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে পরিসমাপ্তিটা সহসা ও সহজে নিষ্পন্ন হয় না। গাঢ় হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঈষৎ গাঢ় করিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হয়; ইহাকে ইংরাজিতে vanish করিয়া দেওয়া বলে, এবং ইহা নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা রামধনু উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার বক্তব্যটি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এক্ষণে মনে করিয়া দেখা যাউক যে, রামধনুর বর্ণপেটককে ক্রমিক ভাবে না দেখিয়া ঠিক সপ্তধা বিভক্ত দেখিতে হইবে; ইহাতে মনে বর্ণের ক্রমিক বিকাশজনিত যে তৃপ্তি আসিত, তাহার আবির্ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। যে রামধনু দেখিয়া মানব-মন উল্লাসে পুলকিত হয়, যাহা কবি ও ভাবুকগণের মন আবেশে মুগ্ধ করে, তাহার কারণ শুদ্ধ বিচিত্র বর্ণের একত্রাবস্থান নহে, তাহার কারণ বর্ণের বিচিত্র ও মনোহর সমাবেশ; ক্রমিক উদ্গম ব্যাপারটি যে মনে তৃপ্তির সঞ্চার করে, তাহা আমরা বর্ণবৈচিত্র্য হইতে কতকটা বুঝিলাম। সঙ্গীতেও এইরূপ। যে সঙ্গীতের সুরের মধ্যে ক্রমিক বিকাশ ও লয় আছে, তাহা যে প্রকার তৃপ্তিপ্রদ, যে সঙ্গীতের সুরের সহসা উত্থান-পতন দৃষ্ট হয়, তাহা সে প্রকার মনোজ্ঞ নহে। রণসঙ্গীতে সুরের উত্থান-পতনের মধ্যে ক্রম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইহা এত উত্তেজক; কিন্তু ইহা কখনই অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ নহে। স্থূলতঃ এই যুক্তির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গীত কেন সাধারণ সঙ্গীত অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজক।

আলো ও আঁধারের বিচিত্র সমাবেশে সহায়তা করে বলিয়া ও ক্রমিক উদ্গম বৈপরীত্য অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ। আমার এই পাঠাগারের সম্মুখে ব্যাপটিষ্ট মিশন্ (Baptist Mission) সমাজগৃহের শীর্ষ বা গম্বুজের উপর

প্রাতঃসূর্য্যের আলোকরশ্মি কেমন বিচিত্র ছায়ালোকের সমাবেশ করিয়াছে; এই শীর্ষের যাহাই দোষ থাকুক না কেন, ইহাতে আমার কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন মনে তৃপ্তি আনয়ন করে; আর তাহারই সন্নিকটে ঐ যে য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ (University Institute) গৃহ রহিয়াছে, উহার উপর কই আলোকছায়ার কোনও খেলাই ত দেখি না; দেখি, এক পার্শ্ব প্রখর আলোকে আলোকিত ও তৎসংলগ্ন আর এক পার্শ্ব তাহার বৈপরীত্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা এইবার সৌধের আকৃতির সহিত ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব। বৃত্তাকার খিলান অপেক্ষা ক্ষেপণীর (parabola) আকার-যুক্ত খিলান যে অধিকতর মনোজ্ঞ, তাহার কারণ এই যে, শেষোক্তটি প্রথমোক্তটি অপেক্ষা অধিকতর ক্রমিক রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে সকল বক্র রেখা সরল রেখায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কল্পিত কোনও ক্ষেত্র বা তদুপরি স্থাপিত সৌধের অঙ্গ যে তেমন মনোহর হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে; যেখানে বক্র রেখার শেষ হইয়া, সরল রেখার আরম্ভ হইল, সেখানে বক্রতার ক্রমের সহসা পরিবর্ত্তন হইয়া লোপ সাধিত হইল বলিয়া, চক্ষুর উপর, সুতরাং ইহার নিয়ন্তা হিসাবে মনের উপর, একটা বিষম আঘাত লাগে। এই জন্যই যে সকল খিলানে বক্র ও সরল রেখার মিশ্রণ দোষ যেমন ত্রিকেন্দ্রাভিমুখী বা Three-centred কিম্বা stilted arch), তাহারা আদৌ মনোজ্ঞ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,যেখানে বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের মিলন দৃষ্ট হয়, তাহা মনোহর না হইয়া যাইতে পারে না। যে সকল গম্বুজ বৃত্তাংশাকারে নির্ম্মিত,তাহা অপেক্ষা একটু চাপা গম্বুজ যে অধিকতর সুন্দর দেখায়, তাহা পাঠান গম্বুজ ও মোগল গম্বুজ নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায়। তাজমহলের গম্বুজের আকৃতি যদি পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান নরপতিদিগের আদর্শানুযায়ী নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ইহা কখনই এমন নয়নানন্দকর হইত না। দাক্ষিণাত্যস্থ দ্রাবিড় স্থাপত্যের মন্দির বিমানের শেখরগুলি একটু চাপা বলিয়া বোধ হয়; আমার বোধ হয়, দক্ষিণদেশীয় স্থপতিরা ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্যের নিয়মগুলি বুঝিতেন।

বৃত্তাংশ হইলেই যে গম্বুজের আকৃতি বিসদৃশ দেখাইবে, এমন কোনও কথাই নাই। যে সকল গম্বুজ অর্দ্ধবৃত্ত অপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তখণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহারা সুন্দর; কেন না, এ স্থলে এই বৃত্তখণ্ডে আমরা বৈপরীত্যের পরিচয়

পাই; এই প্রকারের আকৃতিবিশিষ্ট অনেক গম্বুজের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিজাপুরস্থ ইব্রাহিম আদিল শাহের সমাধিমন্দিরের গম্বুজটির আকৃতি স্থূলতঃ অর্দ্ধবৃত্তাপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং এই কারণেই ইহা দেখিতে মনোহর। একই নগরে অবস্থিত আদিল শাহের পরবর্ত্তী নরপতি মহম্মদ শাহের সমাধিহর্ম্ম্যস্থ গম্বুজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা পূর্ব্বোক্তটি অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট।

গোলাকার গম্বুজকে মনোহর দেখাইবার আর একটী কারণ আছে; ইহা আমাদের চক্ষুর সাধারণতঃ বিকৃত অবস্থা; চক্ষুর দোষ এখানে গুণে পরিণত। পরিপ্রেক্ষিত বা Perspective দৃষ্টি দ্বারা গোলাকার বস্তু অববৃত্তাকার (elliptical) বা ক্ষেপণীর ন্যায় (Parabolic) প্রতীয়মান হয়। এই প্রকার দৃষ্টিবিভ্রমজনিত বোধ দ্বারা বৃত্তের দোষ অনেকটা খণ্ডাইয়া যায়।

মন কখনই এক অবিচ্ছিন্ন ভাবের প্রিয় নহে; সে ভাবের সহিত বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করে। যাহাতেই একত্বের সহিত বহুত্বের বা বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ, তাহাতেই মানব-মন সংবদ্ধ; পূর্ব্বোক্ত পরিপ্রেক্ষিত বা দৃষ্টিবিভ্রম আমাদের বৈচিত্র্য জ্ঞানবিশেষের সহায়তা করে, এবং এ হিসাবে ইহা সৌন্দর্য্যবোধের চরিতার্থতা নিষ্পন্ন করে। দুইখানি সোজা সমান দূরে অবস্থিত রেলের লাইন্‌কে একত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে; পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিতে দেখিবে যে, সম্মুখে উহারা সমান দূরে অবস্থিত বটে, দূরে যেন তাহারা মিশিয়া গিয়াছে; এই যে তাহাদের মধ্য-স্থানের ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া মিলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেমন বৈষম্য বর্ত্তমান, এবং এই কারণেই ইহারা সুন্দর দেখায়। পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে বৃত্তের বক্র রেখার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কেবল সমত্ব বা একত্ব, কেন না, ইহার সীমাবদ্ধ রেখাটির বক্রতার হার বা মাত্রার মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই। এই কারণেই বৃত্তাকার ক্ষেত্র বা বর্ত্তুলাকার গম্বুজ নয়নের তত তৃপ্তিপ্রদ নহে।

প্রাচীন গ্রীক্ স্থপতিরা বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, কেবলমাত্র একত্ব বা সাম্য-সংরক্ষণে কখনই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না; তাঁহাদের আয়োনিক্-শাখান্তর্গত স্তম্ভগুলির বোধিকাসংলগ্ন ব্যাবর্ত্তিত রেখা বা spiral বা voluteএর মধ্যস্থ বক্র রেখাগুলি সমদূরে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ এগুলি arithmetical spiral নহে।

স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য-রক্ষা বিষয়ে ক্রমিক উদ্গম ও বৈপরীত্য স্বতন্ত্র ভাবে ও মিশ্র ভাবে কিরূপ কার্য্যকারী, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা গেল; আমরা ইহাও

দেখিয়াছি যে, বৈপরীত্য দ্বারা নানা কারণে দর্শকের মন কিরূপ ভাবে উত্তেজিত হয়। আমাদের ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যবিদেরা বৈপরীত্যের আদর বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং সৌন্দর্য্যসাধন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করিতেন; তাহা না হইলে বৈপরীত্যের প্রকৃষ্টতম উদাহরণস্থল আয়ত বা চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত সৌধের এত প্রশংসা করিতেন না। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, রেখাদ্বয় মিলিত হইয়া যেখানে সমকোণ উৎপন্ন করে, সেখানে বৈপরীত্যের লীলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটিত, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। এই হিসাবে আয়ত বা চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর যে সৌধ নির্ম্মিত হয়, তাহা বৈপরীত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। রাজমার্ত্তণ্ড-কার ভোজরাজ ষোড়শ প্রকার সৌধের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"আয়তে সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাশ্চতুরস্রে ধনাগমঃ"। অর্থাৎ, আয়তক্ষেত্রের উপর সৌধ-নির্ম্মাণে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রাপ্তি, এবং চতুরস্রাকার ক্ষেত্রের উপর করিলে ধনাগম হয়।

বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গমকে স্থাপত্যের বীজস্বরূপ স্বীকার করিয়া আমরা দেখিব যে, কত প্রকারে গৃহবিন্যাস করা যাইতে পারে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে নিম্নলিখিত চারি প্রকার ক্ষেত্রে গৃহবিন্যাস সম্ভবপর; (ক) সমকোণ-উৎপন্ন-কারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (খ) সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কোণ উৎপন্নকারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (গ) বৈপরীত্য-রহিত বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, (ঘ) বৈপরীত্য ও ক্রমিক উদ্গমযুক্ত বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র; শেষোক্ত ঘ শাখাকে দুইটি উপশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) একই বক্রতাযুক্ত রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, এবং (২) দুইটি বিভিন্ন বক্রতাযুক্ত রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে সকল সৌধের চতুঃসীমা সমকোণিক সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ, তাহাদের বহিরাকৃতিতে যেন দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব মুদ্রিত থাকে; বক্র-রেখাবদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত সৌধে এরূপ বোধ হয় না; সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ উৎপন্নকারী সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র সম্বন্ধেও এই মত প্রযোজ্য।

ভারতীয় প্রাচীন স্থপতিরা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের মূলতত্ত্বগুলি যে অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের গৃহবিন্যাসের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা ষোড়শ প্রকারের গৃহবিন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজমার্ত্তণ্ড-কার বলিতেছেন—

আয়তং চতুরস্রঞ্চ বৃত্তং ভদ্রাসনন্তথা।
চক্রং বিষমবাহুঞ্চ ত্রিকোণং শকটাকৃতিম্।
দণ্ডং পণবসংস্থানং মুরজঞ্চ বৃহন্মুখম্।
ব্যজনং কূর্ম্মরূপঞ্চ ধনুঃ সূর্প্পঞ্চ ষোড়শঃ।

অর্থাৎ, আয়ত, চতুরস্রাকার, বৃত্ত, ভদ্রাসন, চক্র, বিষমবাহু, ত্রিকোণ, শকটাকৃতি, দণ্ড, পণব, মুরজ, বৃহন্মুখ, ব্যজন, কূর্ম্মরূপ, ধনুঃ, সূর্প্প।

পূর্ব্বোক্ত ষোড়শাকৃতির মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি বক্র রেখা বা সরল রেখা ও বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ; (১) বৃত্ত, (২) চক্র, (৩) পণব, (৪) মুরজ, (৫) ব্যজন, (৬) ধনুঃ, (৭) সূর্প্প। রাজমার্ত্তণ্ড-কার একমাত্র বৃত্ত ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সকল ক্ষেত্রকেই কুফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে আর একটী বিষয়েরও উল্লেখ আবশ্যক। সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কোণ উৎপন্নকারী রেখা দ্বারা বদ্ধক্ষেত্রে বৈপরীত্যের লীলা তেমন প্রকটিত নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; রাজমার্ত্তণ্ড-কারও ত্রিকোণ, শকটাকৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রকেও কুফলপ্রদ বলিয়াছেন। নিম্নে ফলনির্ণয়সম্বন্ধীয় সমস্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আয়তে সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাশ্চতুরস্রে ধনাগমঃ।
বৃত্তে পুষ্টিশ্চ বৃদ্ধিশ্চ ভদ্রাসনে কৃতার্থতা।
চক্রে দারিদ্র্যমেবোক্তং শোকো বিষমবাহুকে।
নৃপভীতিস্ত্রিকোণে চ শকটে চ ধনক্ষয়ঃ।
নশ্যন্তি পশবো দণ্ডে পণবে লোচনক্ষয়ঃ।
মুরজে ম্রিয়তে ভার্য্যা অর্থনাশো বৃহন্মুখে।
ব্যজনে বিত্তনাশঃ স্যাৎ কূর্ম্মে বন্ধনপীড়নম্।
চাপে চৌরভয়ঞ্চাপি সূর্প্পে চ ধনসংক্ষয়ঃ।

উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখি যে, দণ্ডাকার সৌধ অর্থাৎ ব্যারাকের আকারে নির্ম্মিত সৌধকে কুফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; ব্যারাকের ন্যায় গৃহ যে নিতান্ত অশোভন, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনও মতদ্বৈধ নাই।

গৃহস্থাপন বা বিন্যাসের যে পূর্ব্বোক্ত চারিটী শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বব্যঞ্জক ; দ্বিতীয়টী পূর্ব্বোক্তটী অপেক্ষা অল্প দৃঢ়তার নির্দ্দেশ করে ; এই প্রকারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীবিভাগে দৃঢ়তার মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত লক্ষিত হয় ; কিন্তু সৌধের সকল স্থানে দৃঢ়তা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। কোনও স্তম্ভের "মাত্লা" বা বোধিকার (capital) কল্পনা

করিতে হইলে তাহাতে দৃঢ়তা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এই জন্যই এ স্থলে সমকোণিক ও সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষা বক্র রেখার কল্পনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি; কোনও সৌধের সকল স্থান আমরা সমান ভাবে দেখি না; প্রথম তলকে যেরূপ ভাবে দেখি, দ্বিতীয় তলকে সে ভাবে দেখি না, ইত্যাদি; অর্থাৎ, সৌধের উচ্চতা আমাদের দৃষ্টি ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং প্রথম তলে যতটা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলে ততটা প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ, প্রথম তলে যদি সমকোণিক ও সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের কল্পনা লক্ষিত হয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলে বা সৌধশেখরে সে প্রকার না করিলেও চলে। আবার ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সৌধের সকল অংশগুলির সমান গুরুত্ব নাই; এ কথা আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছি। কথাটা এই যে, গৃহভিত্তি বা গৃহকোণে যেরূপ গুরুত্ব প্রদর্শিত হওয়া উচিত, তাহার মধ্যস্থ বা গাত্রস্থ স্তম্ভের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও, সেই পরিমাণে গুরুত্ব প্রদর্শিত করিবার প্রয়োজন নাই; এই জন্য স্তম্ভকে চতুষ্কোণ না করিলেও চলে; এই কারণেই স্তম্ভকে নলাকৃতি (cylindrical) অথবা খাঁজযুক্ত (with flutings) ইত্যাদি নানা ভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজনীয় মনে করি। স্তম্ভের গৃহভিত্তির ন্যায় সমান গুরুত্ব না থাকিলেও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে; এই কারণেই হিন্দুস্থপতিরা চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানাবিধ সরল-রৈখিক-ক্ষেত্রযুক্ত স্তম্ভের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, য়ুরোপে সামান্য বহিঃবর্দ্ধিত স্তম্ভের অনুকরণে নির্ম্মিত কুড্যস্তম্ভ * (pilaster) ভিন্ন কোনও স্তম্ভকে সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত হইতে দেখা যায় না; এ বিষয়ে হিন্দুস্থপতিরা য়ুরোপীয় স্থপতি অপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। মানসার প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্র পাঠ করিলে আমরা স্তম্ভের সুন্দর শ্রেণীবিভাগ ও পরিভাষা দেখিতে পাই, যথা—

চতুরস্র স্তম্ভ—ব্রহ্মকাণ্ড।

পঞ্চবাহু স্তম্ভ—শিবকাণ্ড।

ষড়্‌বাহু স্তম্ভ—স্কন্দকাণ্ড।

অষ্টবাহু—বিষ্ণুকাণ্ড।

ষোড়শ বাহু—রুদ্রকাণ্ড।

নলাকৃতি—চন্দ্রকাণ্ড, ইত্যাদি।

---

* কাশ্যপ গ্রন্থে pilasterকে কুড্যস্তম্ভ বলা হইয়াছে।

এ স্থলে আর একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুস্থপতিরা বুঝিতেন যে, স্তম্ভে যে প্রকার দৃঢ়তার প্রকাশ আবশ্যক, উপপীঠে তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজনীয়; এই জন্য তাঁহারা স্তম্ভ যে প্রকার আকারের হউক না কেন, উপপীঠ চতুরস্র ভিন্ন অন্য কোনও আকারে নির্ম্মিত করেন নাই; এমন কি, নলাকৃতি বা চন্দ্রকাণ্ডেরও উপপীঠ চতুরস্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি মহিসুরস্থ হৈসল বল্লাল নরপতিদিগের নলাকৃতি স্তম্ভগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, কোথায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, য়ুরোপীয় অনেক স্তম্ভের (যেমন ডোরিক স্তম্ভ) উপপীঠমাত্রই দৃষ্ট হয় না।

আমাদের বঙ্গদেশস্থ সচরাচর দৃষ্ট একশীর্ষ চৌচাল মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখি যে, মন্দিরটি একটী চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত; মন্দিরের চারিটি পার্শ্বে চারিটি সমকোণ উৎপন্নকারী ক্ষেত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহার শীর্ষদেশে চারিটি ক্রমনিম্ন বক্র ক্ষেত্র মিশিয়াছে; ইহার চারিধারের বক্রাকৃতি কর্ণিস্ পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষেত্রের নিম্নতম অংশ দ্বারা গঠিত। এই সামান্য মন্দিরে গৃহবিন্যাস ও নির্ম্মাণের যে নিয়মগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কেমন সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিম্নতলে সৌধের অঙ্গগুলির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বব্যঞ্জক আকৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, এবং উপরিভাগে এ প্রকার আকৃতির আবশ্যকতা নাই। উপর তলে অল্প দৃঢ়তাব্যঞ্জক আকৃতিযুক্ত অঙ্গের সংস্থান করিয়া তদুপরি পুনরায় অধিকতর দৃঢ়তাব্যঞ্জক অঙ্গের স্থাপন করিলে সৌধের সৌন্দর্য্যহানি হয়। এ বিষয়ে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থাপত্যশিল্পি-চূড়ামণি সার্‌ক্রিষ্টোফার্‌ রেন্‌কে (Sir Cristopher Wren) সেণ্ট্‌পল্‌ গির্জ্জার গম্বুজের উপর সরল রৈখিক সীমাবদ্ধ অঙ্গের কল্পনা ও নির্ম্মাণ করার জন্য বিশেষ দোষ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ বিষয়ে তাঁহার সেণ্ট্‌ ষ্টিফেন্স্‌ গির্জ্জা (St. Stephens, Walbrook) এই দোষ-বর্জ্জিত। আমাদের দেশস্থ প্রাচীন সৌধেও যে এই দোষ বর্ত্তমান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহা অতিশয় মারাত্মক নহে। উড়িষ্যাস্থ ভুবনেশ্বরের মন্দির বা আর যে কোনও মন্দির, বা বুন্দেলখণ্ডস্থ খাজুরাহোর শিবমন্দির নিরীক্ষণ করিলে আমরা দেখি যে, বিমান শেখরের চারি কোণে আমলকাকৃতি অঙ্গের উপর সরল-রৈখিক অঙ্গের ক্রমান্বয়ে সমাবেশ রহিয়াছে। আমাদের বঙ্গদেশীয় মন্দিরও এ দোষ হইতে মুক্ত নয়।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্গীত শাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য এখন বিশ্বের ভাষারাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু আজও তাহার কোনও প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় নাই। সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক উপাদেয় গ্রন্থ দুইখানি বিরচিত হইবার পূর্ব্বে, প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর যে আদৌ কোনও সাহিত্য ছিল, তাহাও অনেকের জানা ছিল না। সুখের বিষয়, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কল্যাণে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের মন হইতে সে ভ্রান্ত ধারণা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তৎপ্রতি দিন দিন লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতেছে। তথাপি সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উক্ত গ্রন্থ দুইখানিতে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান নিহিত থাকিলেও উহাদিগকে কোনরূপেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদের অধিকাংশই আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে সমস্তের সংগ্রহ ও উদ্ধার ব্যতীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। এই গুরুতর কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বঙ্গের স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বহু দিন হইতেই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ-ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য এই প্রাচীন সাহিত্যের সংগ্রহ ও উদ্ধার। এই দীন লেখকও আজ প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। আমার চেষ্টায় কত প্রাচীন গ্রন্থ ও কবি আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই অবিদিত নহে। আমার আবিষ্কৃত অসংখ্য গ্রন্থের বিবরণ ও প্রাচীন কবিতা ও পদাবলী বঙ্গের নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমার সংগৃহীত কতকগুলি পুঁথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ' নামেও প্রচারিত হইয়াছে। আমার সে সব গ্রন্থরাজির মধ্য হইতে 'রাগমালা' নামক একখানি প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের বিষয় সাহিত্য-সমাজের গোচর করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চট্টগ্রামে প্রাচীন কালে সঙ্গীতের বড়ই আদর ও চর্চ্চা ছিল। তাহার ফলে তথায় এক সময়ে বহুল সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের আবির্ভাব এবং অসংখ্য

সঙ্গীত-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মুসলমান-সমাজই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রণী ছিলেন। অনেক মুসলমান পণ্ডিতের আবাসে সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্ম অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকিত। তথায় সকল জাতীয় শিক্ষার্থীরাই সঙ্গীত-শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিতেন। সে কালের পেশাদার বাদ্যকরগণ (হাড়ীগণ) প্রায় সকলেই মুসলমান পণ্ডিতদের শিষ্য ছিল। হিন্দু পণ্ডিতেরও যে এক-বারে অভাব ছিল, এমন নহে। কেবল সঙ্গীত-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিত না; তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যাদির বাদনেও পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত।

প্রাগুক্ত সঙ্গীত গ্রন্থগুলিতে সঙ্গীতের উৎপত্তি-রহস্য এবং রাগতালের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক রাগ ও তালের ধ্যান সংস্কৃত ভাষায় রচিত; বাঙ্গালা পদ্যে তাহার অনুবাদ আছে। প্রায় সকল গ্রন্থেই রাগ-তালের ধ্যান ও পয়ার-(অনুবাদ)-গুলি একই রকম পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাগের ধ্যান পয়ারের নীচে সেই রাগে গেয় এক বা ততোধিক গান বা পদ, এবং প্রত্যেক তালের ধ্যান পয়ারের নীচে সেই তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। উক্ত গান বা পদগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন কবির রচিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সব পদাবলীর অধিকাংশই মুসলমান কবিগণের রচিত। এই সকল পদাবলীর লেখক কবিরাই হিন্দু লেখকগণ কর্ত্তৃক 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিলেও, তাঁহারা সত্য সত্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন কি না, তাহার বিচারের স্থান ইহা নহে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ একখানি প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ। ইহার নাম 'রাগমালা'। এতদ্বিষয়ক অন্যান্য সকল গ্রন্থেরই প্রায় এই নাম দেখা যায়। কেবল আলী রাজা ওরফে কানু ফকীরের রচিত গ্রন্থের নাম 'ধ্যানমালা'। বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত এরূপ অনেকগুলি 'রাগমালা' আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ফাজিল নাছির মোহাম্মদ নামক জনৈক পণ্ডিত আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা। এ গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত বৈষ্ণব পদাবলীও পাওয়া গিয়াছে।

"প্রণামি পরম তত্ত্ব প্রভু দাতা পরমার্থ
অনাদি পুরুষ নৈরাকার।
আদি অন্ত আদি আছ যে যে ত্রিজগত আছ
সৃষ্টিকর্ত্তা নিরঞ্জনি হায় (?) ।" *

---

* এখানে বলিয়া রাখা উচিত, উদ্ধৃতাংশগুলির পাঠে স্থানে স্থানে বর্ণবিন্যাসে ভি আমরা আর কোথাও বড় একটা হস্তক্ষেপ করিব না।

ইত্যাদিরূপ বাক্যে জগদীশ্বর, হজরত মোহাম্মদ, খলিফা-চতুষ্টয় এবং হজরত ইমাম হাছন ও হোছেনের বন্দনা করিয়া কবি স্বীয় পিতামাতার বন্দনা করিয়াছেন। তার পর জান মোহাম্মদ নামক স্বীয় পীরের বা দীক্ষাগুরুর পদবন্দনা করিয়া তিনি নিজের জন্মস্থান চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সুলতানপুরের একটা ক্ষুদ্র গুণ-ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, তথাকার ভূম্যধিপতি পরমগুণবান ওয়াহেদ মোহাম্মদের ইচ্ছায় ও আদেশক্রমেই তিনি এই দুরূহ গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎসম্বন্ধে দুইটি ভণিতা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

(১) "শ্রীযুত ওআহিদ মোহাম্মদ রসধীর। সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত মহিমাসাগর।
তান সুআরতি গাহে ফাজিল নাছির।" দসদিস ভরি জাএ সুকৃতি লহর।

(২) "ধৈর্য্যে ধীর জ্ঞানে গুরু শাস্ত্রে অনুপাম। তান সুআরতি লই ভজি গুরুপদ।
ছিরি ওআহিদ মোহাম্মদ নাম। কহে শ্রীফাজিল নাছির মোহাম্মদ।"

তাঁহার বা তাঁহার আদেষ্টার সম্বন্ধে আর কোনও কথা গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কবির উক্তি এরূপ :—

"সংগিত রাগ আদি সমাপ্ত হইল জদি
এবে কহি সাকের নির্ণয়।
* * *
মঘি সন পরিমাণ হাজার নব্বাশী জান
সকাব্দা সোলস চল্লিসে।
পৌস মাস বহি গেল সংক্রান্তি দিবস ভেল
বিংস দণ্ড সনিবার দিবসে।
বখত জোহর সমে লেখা ভেল অনুক্রমে
সমাপ্ত হইল রাগমাল।
পূর্ব্বাসাঢ়া ধনু শশী তিথি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী
সপ্তবিংস জুমাদিল আউয়াল।"

ইহা হইতে জানা যায়, ১০৮৯ মঘী সনে, বা ১৬৪০ শকাব্দায় পৌষসংক্রান্তি শনিবার দিবস জোহরের সময়ে তাঁহার রাগাদির ঋতুবর্ণনা সমাপ্ত হয়। ইহা ১৯১ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

এই গ্রন্থে কেবল রাগরাগিণীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎপত্তি-রহস্য ও তালের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। তালের সম্বন্ধে যে বিবরণ ইহার শেষাংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন হাতের লেখা, এবং এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আপাততঃ তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। অন্যান্য 'রাগমালা'র সাহায্যে আমরা পরে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিব। ইহাতে প্রথমেই ৪২ রাগ ও রাগিণীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে ; যথা :—

"মালব মল্লার শ্রী বসন্ত উপাম। এহি সপ্ত রাগ আদি মুখ্য সে করিলা।
হিন্দোল কর্ণাট এহি সপ্ত রাগ নাম। একাক্রমে কহিবাম জার জেই প্রিয়া।

ধানসি মালসি আসাবরি রামক্রিয়া।
সিন্ধুরা ভৈরবী দেবী মালবের প্রিয়া॥
বেলাবলি কেদারিকা কানোড়া মাধবী।
মল্লার প্রিয়া কোড়া আওর * পুরবী॥
সুভগা সারাঙ্গ কুমারিকা বেলোআর।
শ্রীরাগ প্রিয়া গৌরী আওর গান্ধার॥

বসন্তের প্রিয়া তুরী এ পটমঞ্জরী।
পঞ্চম ললিতা আর বিভাস গুর্জরী॥
হিন্দোলের প্রিয়া দেবী মায়ূর বরাড়ি।
দীপিকা পাহিড়া মহারাষ্ট্রী দেশকারী॥
কর্ণাটের প্রিয়া নট গয়া রামকেলি।
কামোদ কল্যাণ দেবী আওর ভুপালী।”

তার পর কোন ঋতুতে কোন রাগ গেয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ; যথা :—

“অগ্রাণ পৌষ শেষ পৌষ অর্দ্ধ মাঘ।
হেমন্তের রিত (ঋতু) বহে মালব সুরাগ॥
শেষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্রের পঞ্চদশ।
বসন্তের রিত এহি বসন্ত সরস॥
শেষ চৈত্র মাধবী জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধভাগ।
গাহএ মল্লার রাগ সময় নিদাঘ॥

অর্দ্ধ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ অর্দ্ধতক।
পাউকে † গাহিতে শ্রী অধিক রুচক॥
শ্রাবণের শেষ ভাদ্র অর্দ্ধেক আশ্বিন।
হিন্দোল সময় রিত (ঋতু) শরত প্রবীণ॥
আশ্বিন কুমার অগ্রাণের এক পক্ষ।
গাহএ কর্ণাট রাগ শিশিরের লক্ষ্য॥”

অথ রাগের ধ্যান ও পয়ার। আগেই বলিয়াছি, ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সকলেই বোধ হয় জানেন, সে কালের লিপিকরেরা কলমের মুখে যাহা আসিত, তাহাই লিখিয়া ফেলিতেন। বর্ণবিন্যাস-পদ্ধতির কোনও ধারই তাঁহারা ধারিতেন না। তাহাতেই বাঙ্গালা হাতের লেখা পুঁথিগুলিতে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার বানান পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধেই যখন এই ধারা, তখন কঠিন সংস্কৃত ভাষার যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? যে ভাবে সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগকে সংস্কৃত বলিয়াই বুঝিবার উপায় নাই। সেগুলি অবিকল নকল করিয়া দিলে তাহার এক বিন্দুও কেহ বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সে জন্য আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা পয়ারগুলিই উদ্ধৃত করিতেছি।—

১। মালব রাগের পয়ার।

আইল মালব রাগ মন কুতুহল।
শুক্লবর্ণ দেহকান্তি সুচারু কুণ্ডল॥
সরোজবদন সে যে গলে পুষ্পমাল।
প্রদোষ সময়ে প্রবেসস্ত গীতশাল॥
দেখিআ মহিষী সব মদনমোহন।

প্রমত্ত হইআ অতি করএ চুম্বন॥
উত্তম বসন পরি নৃত্য গীতে মন।
এতেক প্রতিজ্ঞা রাগ মালব রাজন॥
গাঅন সময় দিবা দশ দণ্ড অন্ত।
রাত্রিত গাহিব দণ্ড দশম পর্য্যন্ত॥

এই কথাগুলি আবার ত্রিপদীচ্ছন্দেও বর্ণিত দেখা যায়।

---

* আওর—আর। পাদপূরণার্থ এরূপ করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

† পাউক—বর্ষাকাল।

ইহার নীচে মালবের প্রিয়া ধানশী, মালসী, রামক্রিয়া, সিন্ধুরা, আসাবরী, ভৈরবী—এই ছয় রাগিণীর ধ্যান ও পয়ার যথাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল মালবের নহে, অপর সকল রাগরাগিণী সম্বন্ধেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। রাগিণীর ধ্যান ও পয়ারগুলি প্রদান করিতে গিয়া কবি যে ক্রমে রাগিণী-গুলির নাম দিয়াছেন, এবং যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ না করিয়া তিনি যথেচ্ছভাবে রাগিণীগুলির স্থাপন করিয়াছেন। পদ্য মিলাইবার জন্যই তাঁহাকে ঐরূপ ক্রম করিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কি ক্রমে রাগিণী-গুলির ধ্যানাদি প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিব। সকল রাগিণীর পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিবে। তবে রাগের পয়ারগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি ঘটিবে। এ জন্য আমরা সেগুলি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

২। মল্লার রাগের পয়ার।

শ্যামল সুন্দর অতি রঙ্গ রসে ধীর।
কামিনীমোহন রূপ পুলক শরীর॥
সহজে বিহারযুক্ত সহরিস মন।
কান্তা সঙ্গে কামরঙ্গে কৌতুকে মিলন॥
নীলাঙ্গ পিঙ্গল-নেত্র গভীর বচন।
মল্লার রসিক রাগ গজেন্দ্রবাহন॥

ইহার রাগিণীগুলির পয়ার-প্রদানের ক্রম এইরূপ:—বেলাবলী, পূরবী, কানোড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদার (কেদারিকা)।

৩। শ্রীরাগের পয়ার।

এ নব যৌবনী সব সঙ্গে নারীগণ।
কামকেলি কুতূহলে খেলে বৃন্দাবন॥
নানান সুগন্ধ পুষ্প কৌতুকে তুলিআ।
অঙ্গে অঙ্গে প্রেম রসে মারন্ত মেলিআ॥
লাস ভেস সম্পূর্ণ সে দিব্য মূর্ত্তি ধরে।
এ প্রতিষ্ঠা শ্রীরাগের পৃথিবী ভিতরে॥

রাগিণীগুলির বর্ণনা-ক্রম:—গান্ধার, গৌরী, কুমারী (কুমারিকা), সুহি (সুভগা ?), বেলোয়ার ও বৈরাগী (সারাঙ্গ ?)।

৪। বসন্ত রাগের পয়ার।

পরম সানন্দ মনে খেলে ঋতুরাজ। ধু।
আইলেন্ত ঋতুরাজ করিআ সম্পূর্ণ সাজ
কর্ণযুগে শোভে চ্যুতাঙ্কুর।
পীতবস্ত্র পরিধান হেমবর্ণ দেহ তান
দীপ্তিমান পরম কিশোর (?)॥
আঁখি যুগ প্রভাকর ঘূর্ণিত মদন শর
প্রিয়াগণ সঙ্গে করি সাজ।
চারি পাশে শশীমুখী হই অতি মন সুখী
খেলে নিতি বৃন্দাবন মাঝ॥

রাগিণীগুলির বর্ণনাক্রম:—তুরী, পঞ্চম, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী ও বিভাসা।

৫। হিল্লোল রাগের পয়ার।

কাম-বিলাসে মন মজ্জিআ। ধু।
সঙ্গে সুনাআরি সব দেখি জাগে মনোভব
হিল্লোল রসের তরঙ্গিআ।
প্রিয়াগণ নিজ পাশে মদনমোহন আবেশে
ধরণীতে পড়এ ঢলিআ॥

তা দেখি যুবতী সবে গীত গাহি মনোরঙ্গে সে যে বিদগধ-মণি এথেক প্রতিষ্ঠা ধনী
পতি তোলে আলিঙ্গন দিআ। শাস্ত্র মন সদাএ সুখিয়া।

রাগিণীগুলির বর্ণনাক্রম :—মায়ুর, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ি ও মহারাষ্ট্রি।

৩। কর্ণাট রাগের পয়ার।
আইল কর্ণাট রাগ হরষিত মন।
কেলিকলা কুতূহল সঙ্গে নারীগণ।
হস্তেত কৃপাণ লই অশ্বে আরোহণ।
বিশেষ শিখীর পুচ্ছ শিরেত শোভন।
কুরঙ্গ নয়ান জিনি যুগল লোচন।
কলাপী জিনিআ গ্রীবা অতি সুগঠন।

রাগিণীগুলির বর্ণনাক্রম :—নট, ভুপালী, রামকেলি, গরা, কামোদ ও কল্যাণ।

অতঃপর কোন্ ঋতুতে কোন্ রাগ গেয়, তাহা আবার বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে ইহা কতকটা অনুরূপ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যনিচয়ে প্রতিভাত হইবে; যথা :—

"হেমন্তে মালব যুক্ত বসন্তে বসন্ত যুক্ত গ্রীষ্ম পাটক কাল শরৎ হিন্দোল ভাল
নিদাঘেত মল্লার সুরূপ। শিশিরেত কর্ণাট সারূপ।"

ইহার পর প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীতে গেয় এক বা ততোঽধিক গীত প্রদত্ত হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি, সে সকল গীত প্রায়ই বৈষ্ণব পদাবলী ও বিভিন্ন দেশবাসী বিভিন্ন কবিগণের রচিত। এই অংশই 'রাগমালা'গুলির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। গীতগুলি এ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা এতগুলি কবির সুন্দর পদাবলীর মধুর রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি। 'রাগমালা'-সমূহের এরূপ পদগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি বঙ্গের নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি। তাহা হইতে অসংখ্য হিন্দু কবি ও পঞ্চাশ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতা মুসলমান কবির অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। এই গ্রন্থে অনেক নূতন ও সুন্দর সুন্দর গীত ও পদ আছে, এবং অনেক নূতন কবির নাম পাওয়া যায়। এই সকল গীত ও পদের মধ্যে অনেকগুলি ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মত সুন্দর জিনিস বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিতে পারে, এমন সুধাস্রাবী ঝঙ্কার বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কিছুতেই নাই। সে মধুর রসাস্বাদন হইতে 'সাহিত্যে'র পাঠকবৃন্দকে বঞ্চিত করিব না। এ জন্য আমরা প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীতে গেয় এক একটি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

রাগ—মালব।

সজনি গো সই তুমি না কি আজারে বোল।
কালিআ কানুর বাঁসি বোলে কথ রোল। ধু।
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয়।
ভেকারণে কানাইর বাঁসি রাধার নাম লএ।
চূড়াএ শিখণ্ডি পুষ্প জলধর কালা।
বজাব পূরল বাঁসি কদম সে হেলা।
শুনিতে বাঁসির ধ্বনি পিকরব জনি (জিনি ?)
হেলাএ হরল মন কুলের কামিনী।
ছৈয়দ মর্ত্তুজাএ কহে আধা সোণা বাধা।
নাম ধরি ডাকে বাঁসি মোর নাম রাধা।

১। রাগিণী—ধানশী।

দারুণ পৃআ হামো না বোলাএ।
দারুণ জিউ মোর ধরাম না জাএ। ধু।
একহি খশুরি মোর বহুল সতিন।
সব ভেল ভাগ্যবতী হাম ভেল হীন।
বসন চড়াইমু অঙ্গে মুড়াইম কেশ।
ঘরে ঘরে পৃআ লাগি করিমু উদ্দেস।
সিঙ্গা ফুকিমু রে ডুমুরু বাজাইমু।
দেশে দেশে পৃআর লাগি ভিক্ষা মাগি খাইমু।
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে হাম অভাগিনী।
জীবনের সাধ নাই হেজিমু পরাণি।

ধানশী রাগিণীর পরে নিম্নলিখিত রাগিণীগুলির গীত বা পদ দেখিতে পাওয়া যায়:—১। ধানশী ভাটিয়াল। ২। ধানশী দীপিকা। ৩। ধানশী গুজরী। ৪। ধানশী বেহাগড়া। ৫। ধানশী বেলাবলী। ৬। ধানশী পরজ। ৭। ধানশী কেদার। ৮। ধানশী ভাটিআল ভাঙ্গা।

এই সকল রাগিণীর অনেকগুলি পদ আছে। সব উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না বলিয়া এখানে কেবল একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করিলাম:—

রাগিণী—ধানশী বেহাগড়া।

মরি না লো এথ রাত্রি কেনে।
নিবনে আসিতে ভয় কারে বাস মনে। ধু।
মুখানি শুখাই আছে আসিছ ধাইআ।
কথ না পাইআছ দুঃখ আন্ধার লাগিআ।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বরিখে ঝিমিনী।
কেমনে আইলা বন্ধু পন্থে পঙ্ক পানি।
বাঘ ভালুকের বন্ধু পন্থে বড় ভয়।
তোহ্মা ভাল মন্দ হৈলে গরল উপায়।
দ্বিজ কুমুদে কহে মনে ভাবি অতি।
অনুদিন রাধা কানু প্রেমের আরতি।

এই রাগিণীর পর ১। মালসী ভৈরব ও ২। ঠাসা মালসী রাগিণীর দুইটির গীত দেখা যায়। একটি পদ এখানে তুলিয়া দিলাম:—

রাগিণী—ঠাসা মালসী।

সই বোলম মুই জীব না লো
কানু আনিআ দে।
কালার ভাবে চিত্ত বেআকুল
আকুল করিআছে। ধু।
চুরা * নহে কলা নহে দধি মাখিআ খাইতুম।
অলক দাপন + নহে মুঞি নয়ন ভরি চাইতুম।
কাম সিন্দুর নহে রে মুঞি তুলি দিতুম শীসে।
বন্ধুর ভাবে চিত্ত বেআকুল অন্ন ছাইছে বিষে।
চান্দ বেঁকা কাণ বেঁকা ঐ কদমতটে।
চাম্পা কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে।

---

* চুরা—চিড়া, চিপীটক।

+ দাপন—দর্পণ।

ছৈআদ মর্ত্তুজা কহে ঘঠের কামনা।
মথুরাপুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা॥

৩। রাগিণী—রামক্রিয়া।

রূপ বন্ধু চল দেখি গিআ।
কেমনে ধরাইমু চিত্ত কালা না দেখিআ॥ ধু।
মালতীর মালা গলে সোভিআছে ভালা।
মু'খানি পুর্ণিমার শশী বরণ চিকন কালা.
কদম্বের ডালে বসি বাজাএ মুরলি।
আবড়িছে, কদম্বের পত্র সারি২সারি॥
মির্ত্তুজা কহে মনেত ভাবিআ।
দেখ সখি সাম রূপ কদম্বতলে গিআ॥

ইহার পর রামক্রিয়া ভাটিআল রাগিণীর একটি গীত ও গোল সিন্ধুরা রাগিণীর একটি গীত আছে।

৪। রাগিণী—আসাবরী।

কি পেখল নাঅক ব্রজ জুবরাজে।
নন্দের নন্দন রূপ মনোহর
প্রবেসি রহল হৃদের মাঝে॥ ধু।
উপবনে কেলি কলারসকুশলী
মোহন মুরারি পানে।
জগেক চরাচর অন্তরে জর-জর
বিসম কুসুম শর বাণে॥
বিবিধ কি বস্ত্র কুসুম কলিত
করতালি তরুনিক তালে।
মোহনিহ গীত গুপিগণে গাঅত
নাচত মদন গোপালে॥
অভু সে বংশীত মদনে বিরাজিত
রসভরে পবন বিলসে।
রতি রসে আবেস আলস কলেবর
রহল জুবতি অবিলসে॥
অরুণ বরণ বর বচন মনোহর
বিধু নখ পাঁতি জোর।
তরুণ ভূগমণি লাগাল লোচন
সাম দাস মনাতি তোরে॥

৫। রাগিণী—ভৈরবী।

হাম ভিকারি পরম দেব দাতা।
পিউ পেআছি দেখানে মদমাতা॥ ধু।
খিতি সিংহাসন বাসন মেরি।
অষ্ট সখির মোর চামরধারী॥
শ্রীমৎ দণ্ড ছত্র আকার।
চান্দ সুরুজ দোহো সোভএ তার॥
* * *
তাহে কি বোলসি কাজ অনুহারি (?)॥
* * *
শ্রীহট নগরে বাজএ এক তালে।
কহে ছৈদ সুলতানে মনে হাকারি।
পহু দাতা সুলতান পরম পরম ভিকারি॥

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

তিনুর বুদ্ধি।

দামুর বড় দুঃখ যে, ছোট ভাই তিনুর বুদ্ধি হইল না।

মা-মরা ছেলে, সুতরাং তিনু শুধু বাপের নয়, বড় ভাই দামুরও খুব আদরের ছিল। তার পর বাপ মারা গেল, কিন্তু তাহাকে তিনুর আদরের মাত্রা কম হইল না, বরং একটু বাড়িল। দামু নিজে নিরক্ষর ছিল, নাম সহি করিতে

জানিত না। খাজনার দাখিলা অন্য লোককে দিয়া পড়াইয়া লইতে হইত। এ জন্য তিমু সাত বছরে পড়িলে দামু তাহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। এক বৎসর পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া তিমু 'আঙ্ক আঙ্ক'র দাগা, এবং বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করিল। কিন্তু যখন 'দ্বিতীয়, তিগ্ম, বাগ্মী'র মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল, এবং পাড়ার সমবয়স্ক বালকগণকে কপাটী খেলা এবং পক্ষিশাবকের অন্বেষণে স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে দেখিল, তখন সে পাঠশালা ছাড়িয়া উহাদের মত স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দামু কিন্তু ছাড়িল না; নূতন কাপড় দিয়া, মোয়া বাতাসার লোভ দেখাইয়া, তাহাকে পাঠশালায় দিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু পাঠে অমনোযোগিতার জন্য যে দিন গুরুমহাশয়ের নির্ম্মম বেত্রাঘাত চিহ্ন তাহার পৃষ্ঠদেশে কালশিরা অঙ্কিত করিয়া দিল, সেই দিন লেখাপড়া অপেক্ষা প্রাণটা মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া দামু ভাইকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইল। তিমুর যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

দামু চাষার ছেলে, চাষই তাহার উপজীবিকা। সুতরাং তিমু একটু বড় হইয়া উঠিলে দামু তাহাকে চাষের কাজটা ভাল রকমে শিখাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তিমু কিন্তু তখন ছিপ, বঁড়শী, পাখীর খাঁচা, তাস ও বাগবন্দী খেলা প্রভৃতি লইয়া এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, চাষের কাজে সে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না। বড় ভায়ের পীড়াপীড়িতে দুই চারি দিন মাঠে গেল বটে, কিন্তু সেই দুই চারি দিনের রোদে জলে এমন সর্দ্দি ও জ্বরে পড়িল যে, দামুকে খোরাকীর ধান বেচিয়া ডাক্তারের দেনা শোধ করিতে হইল। ইহার ফলে তিমু মাঠের খাটুনী হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে এমনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল যে, পাড়ার অনেককে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল, 'ওহে দামু, ভাইকে শাসন কর।'

দামুও যে তখন ভ্রাতার শাসনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করে নাই, এমন নহে, কিন্তু শাসন করিবার উপযুক্ত সবলতা তাহার ছিল না। ভাইকে শাসন করিতে গিয়া দামু নিজেই শাসিত হইয়া পড়িত। একটা চড়া কথা বলিলেই তিমু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত; তিরস্কার করিতে গেলে সে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করিত। তখন এক গুণ শাসনের পরিবর্ত্তে দশ গুণ আদর করিয়া, একটা চড়া কথার জন্য বিশটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইত। কোনও

দিন বা মাঠ হইতে ফিরিয়া, বাড়া ভাত ফেলিয়া, তিনুকে পাড়ায় পাড়ায় খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দামু শেষে শাসনের সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, 'দূর হোক, যার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমার কেন মিছে এ কর্ম্মভোগ।'

দামু শাসনের রাশ ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু ভ্রাতার পরিণাম-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। দামু অনেক ভাবিয়া, স্ত্রীর সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিল, তিনুর বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত; সংসারের বোঝা ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িলে তাহাকে বাধ্য হইয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দামু একটী বড় গোছের মেয়ে দেখিয়া, খরচপত্র করিয়া, ভ্রাতার বিবাহ দিল। কিছু দেনাও হইল, কিন্তু দামু সে জন্য ভয় পাইল না, দুই ভাইয়ে খাটিলে দেনা শোধ করিতে কয় দিন লাগিবে? দামুর আশা কিন্তু সফল হইল না। বিবাহ হইল, বৌ ঘর করিতে আসিল, কিন্তু তিনুর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। বরং বিবাহের পর হইতে তিনুর বাবুগিরির মাত্রা যেন একটু বাড়িল। সে একটু বেশী ফিটফাট হইল; মাথায় তেড়ী কাটিল; পাখী পোষা, কপাটী খেলা ছাড়িয়া গান বাজনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। দামু ভ্রাতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। কি করিলে যে ভ্রাতার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

শুধু এক জন দামুকে সহজ উপায় দেখাইয়া দিল। তিনি নিকটবাসী উমেশ ঘোষাল। গ্রামের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়ের মত পরোপকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক আর এক জনও ছিল না। তিনি দিবারাত্র গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই হিতচিন্তা করিতেন, এবং কাহাকেও ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত দেখিলেই অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া যে কোনও উপায়ে তাহাকে ন্যায়ের সূক্ষ্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এ জন্য তাঁহাকে অন্যায়কারীর বিপক্ষে কত মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইত, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সত্য মিথ্যা কত কথাই বলিতে হইত। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই এই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেন, এবং ইহাতে তিনি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিয়া সগর্ব্বে বলিতেন, 'উমেশ ঘোষাল বেঁচে থাকতে কেউ যে অন্যায় ক'রে পার পাবে, সেটী হচ্ছে না।'

এতাদৃশ ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় ভ্রাতার উপর অন্যায় ব্যবহারকারী তিনুর

উপর যে বিরক্ত ও দামুর জন্য ব্যথিত হইবেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি দামুকে পরামর্শ দিলেন, 'ওহে দামু, ছোঁড়াকে পৃথক্ ক'রে দাও, ঢিট হ'য়ে যাবে।'

দামু কিন্তু কথাটা শুনিয়াই এমন একটা বিস্ময়মিশ্র ভীতির ভাব প্রকাশ করিল যে, তিনু ইহা অপেক্ষা শত গুণে অন্যায় অত্যাচার করিলেও সে কখনও এমন কথার কল্পনাও করিতে পারে না।

দামু কল্পনা করিতে না পারিলেও ঘোষাল মহাশয় কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি আর এক দিন দামুকে ডাকাইয়া বেশ একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'ওহে, ভায়ের বিয়ে দিতে টাকা ধার নিলে, কিন্তু তিন বছরেও শোধ করবার নামটী নাই যে।'

দামু সবিনয়ে জানাইল যে, দুই বৎসর ফসল ভাল না হওয়ায় সে টাকাটা দিতে পারিতেছে না, কেবল সুদ মিটাইয়া দিয়া আসিতেছে। আগামী বৎসরে ফসল জন্মিলেই সে দেনা মিটাইয়া দিবে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু তাহার এই অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যদি এক মাসের মধ্যে টাকা না দাও, আমাকে নালিশ করতে হবে।'

দামু কাঁদা-কাটা করিতে লাগিল। তখন ঘোষাল মহাশয় তাহার উপর সদয় হইয়া, ঋণশোধের একটা সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'এক কাজ কর না কেন? তিনে ছোঁড়া তো ব'সে আছে। তাকে আমার বাড়ীতে রেখে দাও, খোরাক পোষাক বাদ বছরে তিরিশ টাকা মাইনে হ'লে দু' বছরে তোমারও দেনা শোধ যাবে, আমারও কাজ চলবে।'

বিস্ময়ে শিহরিয়া দামু বলিল, 'কও কথা খুড়োঠাকুর, ও হতভাগাকে রেখে আপনি করবে কি? না জানে কাজ, না জানে খাটতে, শুধু ব'সে ব'সে আপনকার ভাত মারবে।'

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'ভাত মারে মারবে, সে আমি বুঝবো।'

দামু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওরে বাপ রে, বামুনের ভাত ফাঁকি দিয়ে খাবে? না খুড়োঠাকুর, জেনে শুনে এমনতর কাজ আমি করতে পারব না।'

আসল কথা, ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর ভাত খাওয়া যে কত শক্ত ব্যাপার, তাহা সে বাড়ীতে যে চাকরী করিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল। এ জন্য তাঁহার কাছে চাকর প্রায় টিকিত না। দামু ইহা জানিত। জানিয়া শুনিয়া সে ভাইকে এমন জায়গায় রাখিতে পারিল না।

ঘোষাল মহাশয় ইহাতে দামুর উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তিনি যে এক মাসের মধ্যেই টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না, এমন ভয়ও দেখাইলেন। দামু অনন্যোপায় হইয়া দেড় বিঘা জমীর প্রজাই-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ঘোষাল মহাশয়ের টাকা ফেলিয়া দিল।

ঘোষাল মহাশয় টাকা পাইলেন বটে, কিন্তু দামুর মত মূর্খ চাষাকে জব্দ করিবার উপায় অন্বেষণে বিরত রহিলেন না।

২

'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনে ওরফে তিনকড়ি তখন আহারান্তে তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসিয়া খড়ের আগুন জ্বালিয়া ছিপ্ সেঁকিতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় বড় ভাই দামু মাঠ হইতে ফিরিয়া কাঁধের লাঙ্গলটা নামাইতে নামাইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনকড়ি তখন ডান চোখ বুজিয়া বাঁ চোখের সোজাসুজি ছিপটাকে ধরিয়া তাহার কোন্‌খানে কতটুকু বাঁক আছে, গভীর মনোযোগের সহিত তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। সুতরাং সে জ্যেষ্ঠের আহ্বানে কর্ণপাত করিবার অবকাশ পাইল না। ভ্রাতার এই গভীর উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হইয়া দামু চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে তিনে, ও মুখপোড়া, কাণের মাথা কি খেয়েছিস্?'

তিনকড়ি উদাসভাবে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

দামু বলিল, 'হুঁ? নিজে পেট ঠাণ্ডা ক'রে ছিপ নিয়ে বসেছ, আর গরুগুলো এই দুপুর রোদে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দাঁড়াও হতভাগা, তোমাকে মাছ খাওয়াচ্ছি।'

তিনু নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অগ্নিতে এক মুঠা খড় গুঁজিয়া দিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিতে করিতে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, 'আঃ, কেন বক্-বক্ কচ্চো?'

মাঠের খাটুনী ও রোদে দামুর মাথাটা একেই গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর অকর্ম্মণ্য ভ্রাতার বিরক্তিপূর্ণ উত্তরে তাহা আরও গরম হইয়া উঠিল। সে রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি আমি বক্-বক্ কচ্চি? তবে রে মুখপোড়া?'

দামু দ্রুত গিয়া ছিপখানা তুলিয়া লইল। তিনুর চোখ দুইটা খড়ের ধোঁয়ায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই লাল চোখ দু'টা তুলিয়া সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'দেখ, ছিপ ভাঙ্গলে ভাল হবে না, বলচি।'

দামু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, এবং ছিপখানার মাঝে পা দিয়া মড়্-মড়্ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বহু কষ্টে সংগৃহীত প্রস্তুতপ্রায় ছিপখানাকে ভাঙ্গিতে দেখিয়া তিমু রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সে লাফাইয়া উঠিয়া দামুকে একটা ধাক্কা দিল। দামু পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সামনেই একটা বাঁশের মুগুর পড়িয়াছিল। মুগুরটা তুলিয়া লইয়া দামু সবলে ভ্রাতার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। মুগুর আসিয়া তিমুর মাথায় পড়িল। তিমু দুই হাতে মাথা চাপিয়া 'বাবা গো!' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার হাতের পাশ দিয়া দর দর করিয়া রক্তধারা গড়াইতে লাগিল। ছোটবৌ বড়বৌ—দুই জনেই সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোটবৌ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাবারে, খুন কল্লে রে!'

দামু ভয়ে বিস্ময়ে কাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিকটেই উমেশ ঘোষালের বাড়ী। ঘোষাল মহাশয় তখন মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আচমন করিতেছিলেন। ছোটবৌয়ের চীৎকার কাণে গেলে তিনি বাঁ হাতে গাড়ু এবং ডান হাতে খড়কে লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া তিনি তিমুর অবস্থা-দর্শনে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! মারলে কে? দামু?'

তিমু রক্তমাখা হাত দুইটা দিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'খুড়োঠাকুর গো, আমাকে খুন করেছে গো!'

ঘোষাল মহাশয় দামুর মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'এ কি হে দামু, আমি তো তোমাকে সাদাসিধে লোক বলেই জানতাম। তুমি এমন খুনে বদমাস?'

ভায়ের মাথা হইতে রক্তপাত হইতে দেখিয়া দামু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। ভায়ের রক্তে তাহার রাগের আগুনটা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছিল। এখন ঐ মুগুরটা তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিবে, কি তাহার আগে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিবে, ইহাই স্থির করিতেছিল। এমন সময় ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহার ক্রোধাগ্নিটা আবার ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাগে চোখ পাকাইয়া বলিল, 'দেখ খুড়োঠাকুর, মুখ সামলে কথা কও।'

ঘোষাল মহাশয় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'বটে? কেন হে বাপু, এটা মগের মুল্লুক নাকি? তুমি এক জনকে খুন করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব? তুমি এত বড় বাহাদুর হ'য়ে পড়েছ নাকি?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন, 'চিন্তে, চিন্তে।'

ঘোষাল মহাশয়ের চাকর চিন্তামণি ছুটিয়া আসিল। ঘোষাল মহাশয় তাহাকে আদেশ দিলেন, 'ছুটে গিয়ে একখানা ডুলী ডেকে নিয়ে আয়। যাবার সময় আমীর সাহেবকে আর নসে চৌকীদারকে ডেকে নিয়ে যাবি। শীগ্গীর যা।'

চিন্তামণি ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। নসীরাম চৌকীদার আসিল; পঞ্চায়তের প্রেসিডেণ্ট আমীরুদ্দিন সাহেব আসিলেন। ডুলী আসিয়া পঁহুছিল। ঘোষাল মহাশয় আহত তিনুকে ডুলীতে তুলিয়া মহকুমায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে নিজে ছাতা চাদর লইয়া ডুলীর অনুসরণ করিলেন।

লোক জন সব চলিয়া গেল। দামু তখনও নিঃস্পন্দভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ আসিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, 'ঘরে এস।'

দামু শূন্য উদাসদৃষ্টিতে বড় বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল। বড় বৌ তাহাকে টানিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল।

৩

দুই দিনেও তিনু ফিরিল না দেখিয়া দামু যখন তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং পরদিন সকালে উঠিয়া মহকুমায় যাইবে কি না, বড় বৌয়ের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছিল, তখন সন্ধ্যার সময় তিনু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বাড়ী ফিরিল। দামু উল্লসিতভাবে ছুটিয়া তাহার কুশল-সংবাদ ও বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনু বিরক্তভাবে সংক্ষেপে তাহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রিতে বড় বৌ তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিলে, ছোট বৌ আল্লাদী উত্তর দিল, 'মাথা ধরেছে, কিছু খাবে না।' দামু খোকার দুধটুকু গরম করিয়া তাহাকে দিতে বলিল।

পরদিন সকালে ঘোষাল মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে আসিয়া দামুর চালায় বসিলেন, এবং তিনুকে এক ছিলিম কড়া তামাক সাজিবার আদেশ দিয়া দামুকে জানাইলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারি নামে নালিশ রুজু করিয়াছে, এবং এই জন্যই সে আর এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। দামু ম্লানমুখে বসিয়া কথাগুলা শুনিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় তখন কলিকালে ধর্ম্মের তিরোভাব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, তিনি এরূপ অপ্রিয় কার্য্যের সহিত লিপ্ত থাকিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক

হইলেও তিনু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়ে নাই, ভাগ বাঁটরা করিয়া দিবার জন্য তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদা-কাটা করিয়াছে। ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয় নিতান্ত কোমল; পরের ক্রন্দন তিনি সহ্য করিতে পারেন না, অগত্যা তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। দামু যেন এ জন্য মনে কষ্ট অনুভব না করে।

দামু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, 'ও ছোঁড়ার কথা ছেড়ে দাও খুড়োঠাকুর, ছেলের বাপ হ'তে চল্‌ল, কিন্তু ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু হ'লো না।'

গম্ভীরভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বুদ্ধিই নাই কেন হে, মামলার আর্জ্জি লেখবার সময় মোক্তার যখন বল্‌লে, রাগের মাথায় ভায়ে ভায়ে মারামারি, তার এর এমন কি সাজা হবে? তাতে ও বল্‌লে কি জান?'

সাগ্রহে দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌লে খুড়োঠাকুর?'

একটু সোজা হইয়া বসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বল্‌লে, রাগের মাথায় মারামারি বলবো কেন, আমি বিষয়ের ভাগ চেয়েছিলাম, তাইতে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখলে একবার বুদ্ধিটা? ২০৮ ধারা হ'তে একেবারে ১১১ ধারা।'

উৎসুকদৃষ্টিতে ঘোষাল মহাশয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রফুল্লহাস্যে দামু বলিল, 'এমন কথা বল্‌লে?'

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। দামু বলিল, 'তা হ'লে ওর একটু বুদ্ধি হ'য়েছে, কি বল খুড়োঠাকুর?'

তিনু কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দামু তাহার মুখের উপর প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে তিনে, তুই আলাদা হ'বি?'

তিনু নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দামু বলিল, 'কিন্তু খাবি কি?'

বিরক্তির সহিত তিনু উত্তর করিল, 'হাতী ঘোড়া।'

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি হে দামু, না এতে আমার কোনও স্বার্থ আছে? তোমার মনটা কিন্তু বড় অশুদ্ধ।'

দামু মস্তক নত করিল। ঘোষাল মহাশয় তিনুর হাত হইতে কলিকা লইয়া হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে বলিলেন, 'তিনু আমার উপরেই ভার দিয়েছে। এখন তোমার বিশ্বাসী লোক এক জন ডাকতে পার।'

ঈষৎ ভগ্নস্বরে দামু বলিল, 'আজই?'

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'হাঁ। তিনু বলছে কি জান? যখন তোমার সঙ্গে মামলা চলছে, তখন কি এক সঙ্গে খাওয়া ভাল দেখায়? এতে শুধু চক্ষুলজ্জা নয়, মামলাটাও খেলো হ'য়ে যেতে পারে।'

তিনুর এই বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে দামু চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ঠিক কথা খুড়োঠাকুর, আমার মাথায় এতটা আসে নি।'

দামু ভ্রাতার মুখের উপর প্রশংসাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তিনু মুখ ফিরাইয়া লইল। দামু বলিল, 'আমার আর কাউকে বিশ্বাস নাই খুড়োঠাকুর, তুমিই যা হয় ক'রে দাও।'

হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'বেশ, আমার উপরেই যখন তোমার বিশ্বাস, তখন আমিই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। পক্ষপাতটী আমার কাছে পাবে না দামু, আমার কাছে তুমিও যেমন, তিনুও তেমনই।'

সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শী ঘোষাল মহাশয়ের কর্তৃত্বে বিভাগ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাগের সময় তিনু তেমন উৎসাহ দেখাইল না, কিন্তু দামু খুব উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিল, এবং মনসাতলার আওল জমা তিন বিঘা ও বড় কেলে দামড়াটা তিনুর ভাগে ফেলিয়া দিল।

কয়েক দিন পরে দামুর নামে শমন আসিল। দামু ঢেরা সই দিয়া শমন লইল, এবং তিনুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কা'কে মুক্তার দেওয়া যায় বলতো তিনু?'

তিনু দাতে দাত চাপিয়া উত্তর করিল, 'যমকে।'

দামু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনু দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বড় বৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, 'আহা, হাসতে লজ্জাও করে না!'

দামু তথাপি হাসিয়া উত্তর দিল, 'বুঝছো না বড় বৌ, তিনের এবার বুদ্ধি হ'য়েছে।'

'তোমার মাথা হ'য়েছে' বলিয়া বড় বৌ স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। দামু ভাবিতে লাগিল, তিনুর বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বড় বৌয়ের বুদ্ধিটা তিরোহিত হইল নাকি?

বড় বৌ কিন্তু স্বামীর ন্যায় সহিষ্ণু ছিল না, এবং তিনুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য-দর্শনের নিমিত্তও তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সুতরাং সে তিনুর সমক্ষেই দুগ্ধদানে পোষিত কালসর্পের সহিত তাহাকে তুলিত করিয়া যে সকল কথা বলিত, তাহাতে তিনু মনে মনে গর্জ্জন করিয়া বড় বৌকে কালসর্পের বিষের জ্বালা অনুভব করাইবার নিমিত্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত।

৪

নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। ন্যায়পরায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের তদ্বিরের ক্রটী ছিল না; সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা দামুর অপরাধ প্রমাণিত হইয়া গেল। দামুও অপরাধ অস্বীকার করিল না। সে যে ভাইকে মারিয়াছে, এবং অবাধ্য ভাইকে শাসন করিবার অধিকার তাহার রীতিমত আছে, ইহা বিচারকের সমক্ষে তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিল। বিচারক কিন্তু তাহার অধিকার অনধিকারের বিচার করিলেন না, তিনি অবৈধ প্রহারের অপরাধে দামুর ত্রিশ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। অনাদায়ে ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইল।

দামুর কাছে টাকা ছিল না। নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করায় মোক্তার তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জামীন হইলেন না। প্রহরী দামুকে হাজতে লইয়া গেল। তিমু স্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আদালতের বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া তিমু মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল, সেখানে আর আঘাতের বা বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। আজ সে শুধু বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সে ঘোষাল মহাশয়ের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় তিমু চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, বড় বৌ আলো জ্বালিয়া দাবার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, ঠাকুরপো?'

গম্ভীর স্বরে তিমু উত্তর করিল, 'হুঁ।'

'তোমার দাদা আসছে?'

তিমু নিরুত্তরে আপনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। বড় বৌ তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দাদা কোথায় রইলো ঠাকুরপো?'

বিকৃতকণ্ঠে তিমু উত্তর করিল, 'জেলে।'

উত্তর করিয়াই তিমু দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড় বৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছোট বৌ স্বামীর সম্মুখীন হইয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা, সত্যি বড়ঠাকুরের জেল হইয়াছে?'

তিনু ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'হাঁ হ'য়েছে, তার কি হবে?'

ছোট বৌ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

পরদিন সকালে ঘোষাল মহাশয় মোকদ্দমার খরচপত্র বাবদ নিজ তহবিল হইতে প্রদত্ত টাকার হ্যাণ্ডনোট বা তমশুক লিখাইয়া লইবার জন্য, এবং সাক্ষীদের নিকট প্রতিশ্রুত একটা খাসীর দাম আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনুকে ডাকিতে আসিয়া শুনিলেন যে, ভোরের সময় উঠিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনু জরিমানার টাকা জমা দিলে, দামু মুক্তি পাইল। বাহিরে আসিয়া দামু বলিল, 'আমি সারাটা দিন হ্যাপিত্যেশ ক'রেছিলাম তিনু, বলি তিনে এই আসে, এই আসে।'

তিনু কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইল। দামু তাহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে বলিল, 'কিন্তু এতগুলো টাকা তুই কোথায় পেলি? খুড়োঠাকুরের কাছে খত দিয়েছিস্ নাকি?'

তিনু উত্তর করিল, 'না, ছোট বৌয়ের হাতের রূপোর চুড়ী ক'গাছা, কাণের পাশা দু'টা, আর কোমরের রেট ছড়াটা বদনগঞ্জের হরি পোদ্দারের দোকানে বেচে এসেছি।'

দামু বলিয়া উঠিল, 'করেছিস্ কি রে হতভাগা, একখানা জিনিস কত কষ্টে হয়, আর তুই তিন তিনখানা জিনিস বেচে এলি?'

জোর গলায় তিনু বলিল, 'বেশ করেছি—বেচেছি। তুমি আমাকে মারতে পার, আর আমি জিনিস বেচতে পারি না? তবু এখনো খুড়োঠাকুরের কাছে মামলায় দেনা আছে।'

'সে দেনা শুধবি কিসে?'

'দু' ভায়ে খেটে।'

উৎফুল্লকণ্ঠে দামু বলিল, 'এদ্দিনের পর দেখছি তোর বুদ্ধি হ'য়েছে।'

রোষগম্ভীরকণ্ঠে তিনু বলিল, 'তা হ'য়েছে, কিন্তু আবার যদি মার, তা হ'লে আবার আমি—'

দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'আর তো বৌয়ের গায়ে গয়না নাই, আর কি বেচবি?'

তিনু বলিল, 'আর কিছু না থাকে, বৌকে বেচবো।'

"দূর হতভাগা! নাঃ, তোর কোনও কালেই বুদ্ধি হবে না তিনে!'

দামুর উৎফুল্ল হাস্যধ্বনিতে প্রান্তর-পথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গোরা ও তাহার অবিনাশ।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র অবিনাশ নামে একটী প্রবল ভক্ত ছিল। গোরা যখন জেলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন অবিনাশ তাহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলবল লইয়া হাজির। তাহারা গান ধরিল—

'দুখ নিশীথিনী হল আজি ভোর,
কাটিল কাটিল অধীনতা ডোর।'

কিন্তু গোরার ইহা সম্পূর্ণ অসহ্য হইল। সে অবিনাশকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল, 'দেখ অবিনাশ, তোমরা ভক্তির দ্বারাই মানুষকে অপমান কর, রাস্তার ধারে আমাকে নিয়ে সংয়ের নাচন নাচাতে চাও, সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি, এতটুকু লজ্জা সরম তোমরা আমার কাছে প্রত্যাশা কর না! একেই তোমরা বল মহাপুরুষের লক্ষণ।'

এই গোরার অবিনাশের ন্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও একটী অবিনাশ জুটিয়াছে। গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই প্রবন্ধটিতে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মুক্তিসাধন' কবিতাটিতে লিখিয়াছেন—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।'

এই কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ভক্ত অবিনাশটি কি বলেন, একবার শুনুন।

'কত শতাব্দী ধরে হিন্দুর জীবন-দেবতার মন্দিরে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল'—যেদিন রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইল 'বাঙালী সে দিন তার চিন্তার পুরাতন ও সনাতন পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলে—এ কি শুনি! সে দিন থেকে বাঙালীর মনের সামনে নতুন চিন্তার পথ খুলে গেল!'

অবিনাশের সঙ্গীরাও ঠিক এই সুরে গাহিয়াছিল,

'ভুবন-নিশীথিনী হল আজি ভোর,
কাটিল কাটিল অধীনতা ডোর।'

কেবল কি 'বাঙালী' তাহার সনাতন পথে 'থমকে' দাঁড়াইল? রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণা-বাণী শুনিয়া দিবাকর অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে নিশ্চল হইয়া রহিল—পৃথিবী তাহার আহ্নিক গতি বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া পড়িল—আর সেই স্থিতি-বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া 'ভুজঙ্গম' অর্থাৎ বাসুকি সভয়ে তাহার ফণা গুটাইয়া লইল!

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি নাকি 'এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, এ এক অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্জল্যমান সংগ্রাম, ত্যাগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ!' কেবল ইহাই নহে—'কত শতাব্দী ধরে হিন্দুর জীবন-দেবতার মন্দিরে যে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ মহা অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল......এই অপ্রবৃত্তি হচ্ছে বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। বৈরাগ্যের ভিতরে মানুষ কোনও দিনই আপনার জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে না। মানুষের অন্তরে অন্তরে যে চিন্ময়ী দেবী আসন পেতে বসে আছেন, সে চিন্ময়ী দেবীর আসন থেকে মানুষের মনে যে আদেশ আসছে, সে ত বৈরাগ্যের নয়, সে গ্রহণের, আলিঙ্গনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ দ্বেষের নয়, প্রেমের। প্রেম যেখানে, আনন্দও সেখানে।'

খুব ঠিক কথা। সেই 'আনন্দে'র সন্ধানেই 'চিন্ময়ী দেবী'র আদেশে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী একবার মহেন্দ্রের দিকে, আর একবার তাহার বন্ধু বিহারীর দিকে, আর একবার মহেন্দ্রের দিকে, আর একবার বিহারীর দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই চিন্ময়ী দেবীর আদেশেই 'ঘরে বাইরে'র বিমলা গৃহের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই সন্দীপের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইয়া মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল।

সুরেশবাবু বলিতেছেন—

"প্রেম যেখানে আনন্দও সেখানে......কিন্তু ঐ অপ্রবৃত্তি আশ্রয় করে' আমরা এই প্রেমকে হারিয়েছিলেম, সুতরাং এ জগতে আমরা আনন্দকেও পাই নি।'

অর্থাৎ, এ যাবৎকাল হিন্দু জাতির স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভাবটা বিকশিত হইত, তাহা প্রেম নহে, সুতরাং তাহাতে আনন্দও ছিল না। হিন্দুর সংসার এত দিন বৈরাগ্যের শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল; কেবল রবীন্দ্রনাথই উক্ত কবিতাটি রচনা দ্বারা সেখানে প্রথমে প্রেমের ফুল ফুটাইয়াছেন!

পাঠক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আরও শুনুন।

'আমরা প্রেমকে হারাইয়াছিলাম, তাই বৈরাগ্যকেই চরম পথ মনে করে' নির্ব্বাণকেই আমরা মোক্ষ ব'লে মেনেছিলাম। কিন্তু মিথ্যা যা' তা' কত কাল টিকবে? অনৃতের উপর ভিত্তি করে যে মন্দির, সে মন্দির যত বিরাটই হোক না কেন, যত উঁচুতেই তা' আকাশে মাথা তুলুক না কেন, সত্য এক দিন তাকে নত করবেই।......এই মিথ্যার পথ, অনৃতের পথ, মানুষের এই অকল্যাণের পথ যাঁরা মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা এ জগৎকে গ্রাহ্য করেন নি, তাই তাঁদের বংশধরেরা আজ জগতের অগ্রাহ্য।......কিন্তু কবির বাণী আজ আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের নিগূঢ়তম সত্যটিকে আঘাত করে' আমাদের চোখে একটা নূতন দৃষ্টি এনে দিয়েছে।'

অর্থাৎ, প্রাচীন কালে বেদের ঋষিগণ তপস্যাবলে যে নিবৃত্তিমার্গের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি যে পথে সাধন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, গীতা-ভাগবত যে বৈরাগ্যকে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক কালে গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে বৈরাগ্যকে কল্যাণের পথ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহা আগা গোড়া সব মিথ্যা, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র কবিতাটিতে যে পথের আভাস দিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য! অথবা, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ-শঙ্কর, খ্রীষ্ট-চৈতন্যকে একটা তুলাদণ্ডের এক দিকে স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে যদি তাহার অপর দিকে বসান যায়, তবে রবীন্দ্রনাথই ওজনে ভারি হইবেন। তথাহি—

'অশ্বমেধসহস্রাণি সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেব বিশিষ্যতে॥'

এত দূর গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা, এত দূর বিরাট অজ্ঞতা দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি মনে করিতেছেন, জানি না। কিন্তু আমরা আশা করি, তাঁহার সৃষ্ট গোরা তাহার অবিনাশকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এই ভক্তটিকে সেইরূপ শিক্ষা দান করিবেন।

এখন কথা হইতেছে, সুরেশবাবুর কথাগুলি গম্ভীরভাবে বিচার্য্য কি না?

সাহিত্য-সম্পাদক ত এগুলিকে 'সুরেশকূট' অর্থাৎ হেঁয়ালি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে ইহার দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

লেখক 'বৈরাগ্য', 'নির্ব্বাণ', 'মুক্তি' প্রভৃতি কতকগুলি কথার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার অর্থ জানেন, এরূপ বোধ হয় না। 'হিন্দুর দেবতার মন্দিরে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল', ইহার অর্থ কি? ঋষিগণ যে প্রবৃত্তি-দমন অথবা ইন্দ্রিয়-সংযমের উপদেশ দিয়াছেন, ইহা কি তাই? তাহা অসুর হইল কিরূপে? বরং কুপ্রবৃত্তিকে অসুর বলা যাইতে পারে। মুক্তি-কামীকে প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইবে না, কই, রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাতে সেরূপ ভাব কোথায়? ঐ কবিতাটির অর্থ আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা সংক্ষেপে এই :—'হে ঈশ্বর, তোমার এই নানাবর্ণগন্ধময় পৃথিবীতে তুমি যে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছ, তোমার মন্দিরে তুমি যে লক্ষ বাতি জ্বালিয়া দিয়াছ, আমি তাহারই মধ্যে তোমাকে চাই—আমি বৈরাগ্যের পথে না গিয়া, সংসারের মোহের মধ্যে থাকিয়াই, আমার মনের ভক্তি ফুটাইয়া মুক্তিলাভ করিব।' এ ত বেশ কথা। বাস্তবিক পক্ষে সংসারে কয় জন লোকেই বা বৈরাগ্য চায়? যাহারা মুখে 'মুক্তি' 'মুক্তি' বলিয়া চীৎকার করে, আচারে বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহাদের কয় জনেই বা সংসারের মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? তাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সংসারের ভোগের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে মানুষ ঈশ্বরকে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুর চিরন্তন উপাসনা-প্রণালীও এই ভক্তিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে দেবমন্দিরকে রূপক-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, হিন্দুর সেই আসল মন্দিরে এইপ্রকার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের বিপুল আয়োজনের মধ্যেই ত দেবতার পূজা হয়। মানুষ ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া দেবতাকে পাইতে পারে না বলিয়া, স্বয়ং ভগবান্‌কে এ সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মানুষের পূজা গ্রহণ করিতে হয়। মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্ণগন্ধময় পৃথিবীর মধ্যে, বর্ণগন্ধময় ভগবান্‌কে লাভ করা। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মগণ সেই স্বভাবসঙ্গত উপাসনার পথ পরিত্যাগ করিয়া, 'অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয়'কে ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে বুঝিয়াছেন—সংসার-মোহমুগ্ধ মানবের জন্য সে বৈরাগ্যের পথ নয়। তাই তাঁহার চিত্ত 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে', 'দৃশ্য-গন্ধ-গানে'র মধ্যে ভগবান্‌কে বসাইয়া, মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাইতে ব্যাকুল

হইয়াছে। সুরেশবাবু বলেন, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি 'অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান সংগ্রাম—ত্যাগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ (challenge)'; আমি বলি, তাঁহার এই কবিতা কৃত্রিম উপাসনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে মানব-হৃদয়ের self-assertion (আত্ম-প্রতিষ্ঠা)!

রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্য' চাহেন না—তাহার কারণ, তিনি বৈরাগ্যের অধিকারী নহেন। শ্রুতি বলেন,—

'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।'—মুণ্ডকোপনিষৎ।

ব্রাহ্মণ বিষয় ভোগ করিতে করিতে স্বীয় কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ করিয়া যখন উপলব্ধি করিবেন যে, কর্ম্ম দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিবেন। বেদান্তসার এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়া বলেন,—'অয়মধিকারী জননমরণাদি-সংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।' অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির মাথায় আগুন জ্বালিয়া দিলে, সে যেমন প্রবলবেগে জলাশয়ের দিকে ধাবিত হয়, নির্ব্বাণমুক্তির যিনি প্রকৃত অধিকারী হইবেন, তিনিও সেইরূপ জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারানলে নিজকে নিতান্ত সন্তপ্ত মনে করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বিষয়-ভোগ করিতে করিতে যখন হৃদয় সর্ব্বপ্রকার কামনা-মুক্ত হয়, তখনই মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রুতি বলেন—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।—কঠোপনিষৎ।

এখন কথা হইতেছে, বৈরাগ্যের মধ্যে কি প্রেম নাই, আনন্দ নাই? গত পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে প্রেমের বন্যা নদীয়া হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৈরাগ্যের কথার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে বিশ্ব-প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মূল বৈরাগ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবও বিশ্বজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহা দূর করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বোধিদ্রুমমূলে যে মহা বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই বিশ্বপ্রেম। চৈতন্য খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি তাঁহাদের এই বৈরাগ্যের মধ্যে তাঁহাদের জীবনের অর্থ

খুঁজিয়া পান নাই? যোগী ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে যোগসাধনা করেন, তিনি কি তাহাতে আনন্দ পান না? গীতা বলেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

অর্থাৎ, পাপমুক্ত যোগী এইরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া, মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়াই পরমযোগী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছিলেন—

'সদা ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।'

কিন্তু এই যোগমার্গ, এই নির্ব্বাণের পথ সকলের জন্য নহে। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যেও এক জন ইহার অধিকারী কি না সন্দেহ। সাধারণের জন্য ভক্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিকে 'টানিয়া বুনিয়া' প্রাচীন ভাব ও সংস্কারসমূহের লাঞ্ছনা করিবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি।

নাটক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় নট্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। নৃৎ ধাতু নট্ ধাতুর সংস্কৃত আকার। কেহ কেহ মনে করেন, নাটকের প্রধান অঙ্গ নৃত্য; কারণ, ইহা নট্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমরা কিন্তু অনুমান করি, নৃত্যব্যবসায়ী নটগণ যখন নৃত্য-গীত-সংযোগে নাটক অভিনয় করিত, তখনই নাটক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (১) বিভিন্ন দেশ, যুগ, অবস্থা ও ঘটনাচক্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ও

(১) 'The name for it (drama) is Nataka, and the player is styled Nata, literally 'dancer'. Etymology thus points us to the fact that the drama has developed out of dancing, which was probably accompanied, at first, with music and song only, but in course of time also with pantomimic representations, processions, and dialogue....The prakritised form (of nrit) nat occurs for the first time in Panini, who, besides, informs us of the existence of distinct Nata-Sutras, or manuals for the use of natas, one of which was attributed to Silalin and another to Krisasva....Panini further cites the word natyam in the sense of 'natanam dharma amnayova.' In both cases, we have probably to understand by the term the art of dancing, and not dramatic art.

—*Weber, pp. 196-197.*

চরিত্রের মনুষ্যগণ যেরূপে চিন্তা ও কার্য্য করে, তাহা কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশ করাই নাটকের প্রধান অঙ্গ, বোধ হয়, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি নাটকের অলঙ্কারস্বরূপ; ইহাদের দ্বারা নাটক মনোরম ও সুখভোগ্য হইয়া থাকে। নটগণ যখন নাটক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি অভিনয়ের বিশেষ অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত নাটক বিশেষভাবে নির্ম্মিত অভিনয়-গৃহে অভিনীত হইত। ঐ সকল নাটকে সূত্রধরের উল্লেখ থাকায় মনে হয়, কাষ্ঠ দ্বারা অভিনয়-গৃহ নির্ম্মিত হইত। মহাকবি কালিদাসের সময়ে বা তৎপূর্ব্বেই সংস্কৃত নাটক পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়ের মূল কি আর্য্যগণ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিংবা ইহার বিকাশ তাঁহাদের মধ্যেই সাধিত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদে নানা শাস্ত্রের বীজ নিহিত দেখিতে পাই। নাটক রচনার বীজও ইহার কতকগুলি সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল সূক্তে কথোপকথন দ্বারা বক্তব্য বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। একটী সূক্তে (১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূঃ) পুরূরবা ও তাঁহার পত্নী উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন দ্বারা তাঁহাদের বিবাহ, দাম্পত্য-প্রেম, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সরলভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। (১) অন্য এক সূক্তে (১০।১০৮), ইন্দ্রের সরমা নামে এক কুক্কুরী পণিদিগের দ্বারা অপহৃত গাভীর অন্বেষণে গমন করিয়া, পণিদিগের সন্ধান প্রাপ্ত হয়, বর্ণিত হইয়াছে। তখন সরমা ও পণিদিগের মধ্যে কথোপকথন হয়। পণিগণ সরমাকে গাভীর ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ভগিনী হইতে বলে। কিন্তু সরমা ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের নিকট ইন্দ্রের শক্তি এবং অঙ্গিরা ঋষিদিগের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। 'যদ্যপি পণিগণ গাভীদিগকে ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে ইন্দ্র ও ঋষিগণ সোমপানে মত্ত হইয়া আসিবেন; তখন তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, সে এইরূপ ভয় দেখাইল। আর এক সূক্তে (১:৬১) দেখি, ত্বষ্টাদেব ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঋভুদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া ঋভুদিগকে বলিলেন যে, দেবগণ তাঁহাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিতে বলিয়াছেন যে,

(১) সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২৫; 'পুরূরবা ও উর্ব্বশী সংবাদ' দ্রষ্টব্য।

'আপনারা যদ্যপি একটী চমসকে চারিটী করিতে পারেন, তবে দেবযজ্ঞে ভাগ প্রাপ্ত হইবেন।' ঋভুগণ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, ইতিমধ্যে আমাদের কার্য্য সারিয়া লই; তৎপরে আপনার সহিত দেবলোকে গমন করিব। ইহারা তখন অশ্ব, গো, রথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। দেব-শিল্পী ত্বষ্টা ইহাদের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। যখন ঋভুগণ একটী চমসকেও চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি দেবীদিগের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ঋভুগণ সকল কার্য্য শেষ করিয়া, দেবদূতের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তখন তাঁহারা আপনাদের স্বহস্তনির্ম্মিত অশ্বকে রথে যোজনা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাদিগকে মুঞ্জাতৃণযুক্ত জল পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, এক্ষণে অপেক্ষা করুন, পরে সোম পান করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আবার এক সূক্তে (১০।১০) যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক সূক্তে (১০।৫১) অগ্নি, বরুণ ও দেবগণের মধ্যে কথোপকথন দ্বারা অপর একটী বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

অতএব নাটকের প্রধান অঙ্গ যে বিভিন্ন লোকের মধ্যে কথোপকথন দ্বারা কোনও ঘটনার অভিব্যক্তি, তাহা আমরা ঋগ্বেদের উপরিবর্ণিত সূক্তগুলিতেই প্রাপ্ত হইতেছি। সেই জন্য এই সকল সূক্তেই নাটক-রচনার বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সে কালে সূক্তান্তর্গত ঋক্ সকল যজ্ঞকালে ঋত্বিক্‌-দিগের দ্বারা উচ্চারিত এবং মধ্যে মধ্যে গীত হইত। ইহাকেই সামগান বলে। অতএব উপরি-উক্ত সূক্ত সকলের সহিত সামগানের রীতিও প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করি। এইরূপ ভাবে দেখিলে, নাটকের সহিত গীতির যোগ ইহার প্রথম অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে। এই ব্রাহ্মণে আমরা নাটক-রচনার দ্বিতীয় স্তর প্রাপ্ত হই। 'শুনঃশেপের আখ্যান' নামক গদ্যে রচিত একটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আখ্যানের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে কথোপকথনের ভাগই অধিক। ইহাতে নানা চরিত্রের সন্নিবেশ ও উহাদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি অনেক স্থলে দুই একটী কথা ও কার্য্য দ্বারা অতি সুন্দর-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও রাজা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহাকে এই আখ্যান শ্রবণ করান হইত। (১) ইহা শ্রবণ করিলে অপুত্রকের

(১) তদেতৎপরঋক্‌শতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানম্‌।
তৎ হোতা রাজ্ঞেহভিষিক্তায়াচষ্টে।—৭ম খণ্ড, ৩৩ অধ্যায়। ১৮

পুত্র লাভ হয়, এ জন্য ধনী অপুত্রকগণও ইহা শ্রবণের আয়োজন করিতেন। ইহা শ্রবণ করাইবার নিম্নলিখিতরূপ পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। হোতা ও অধ্বর্য্যু নামক দুই ঋত্বিক্ হিরণ্যকশিপে (অর্থাৎ সুবর্ণসূত্রনির্ম্মিত আসনে) উপবেশন করিবেন। হোতা যাহা বলিবেন, অধ্বর্য্যু তাহার উত্তর দিবেন। হোতা ঋক্ উচ্চারণ করিলে অধ্বর্য্যু 'ওঁ' শব্দ, এবং গাথা উচ্চারণ করিলে 'তথা' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। (১) সায়নাচার্য্য মনে করেন যে, অধ্বর্য্যু কেবল ওঁ ও তথা শব্দ বলিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণে এরূপ কোনও নির্দ্দেশ নাই। পাদটীকায় উদ্ধৃত অংশে, প্রথম এই বলা হইতেছে যে, হোতা বলিবেন, এবং অধ্বর্য্যু প্রত্যুত্তর দিবেন। হোতা ঋক্ বা গাথা উচ্চারণ করিলে অধ্বর্য্যুর উত্তর দিবার কিছু না থাকিলেও তিনি 'ওম্' বা 'তথা' শব্দ দ্বারা প্রত্যুত্তর দিবেন, ইহাই দ্বিতীয় অংশে প্রকাশ করা হইয়াছে, মনে করি। অতএব, আমাদের মতে,আখ্যানান্তর্গত প্রধান প্রধান অংশ হোতা বলিতেন, এবং অধ্বর্য্যু অপর অংশ প্রত্যুত্তরচ্ছলে বলিতেন। এইরূপে তাঁহারা বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আখ্যানান্তর্গত যে কোনও দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন হইতেছে, তাহার যেন এক প্রকার অভিনয় করিতেন। আখ্যানমধ্যে ঋক্ ও গাথা অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হোতা এই সকল গান করিতেন। ইহাতে কিন্তু বাদ্যের বা নৃত্যের কোনও উল্লেখ নাই।

শুনঃশেপের নাম ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্ত-রচয়িতৃরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বরুণের পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম

এই শত ঋক্, গাথা (যুক্ত) শুনঃশেপের আখ্যান। তাহা হোতা অভিষিক্ত রাজাকে বলিবেন।

(১) হিরণ্যকশিপাবাসীন আচষ্টে; হিরণ্যকশিবাসীনঃ
প্রতিগৃণাতি। যশো বৈ হিরণ্যং যশসৈবৈনং তৎ সমর্দ্ধয়তি।—৭।৩৩।১৮

অর্থ:—হিরণ্যকশিপে উপবিষ্ট হইয়া (হোতা) বলিবেন; হিরণ্যকশিপে উপবিষ্ট হইয়া (প্রতিগরকারী) প্রত্যুত্তর করিবেন। যশই হিরণ্য; যশ দ্বারা ইঁহাকে তাহা (অর্থাৎ হিরণ্য) সমৃদ্ধ করে।

ওমিত্যৃচঃ প্রতিগর এবং তথেতি গাথায়া।
ওমিতি বৈ দৈবং তথেতি মানুষং।—৭।৩৩।১৮

ঋকের প্রতিগর ওম্, গাথায় (প্রতিগর) তথা। ওম্ দেবসম্বন্ধীয়, তথা মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

সহস্রমাখ্যাত্রে দদ্যাৎ শতং প্রতিগরিত্রে...।৭।৩৩।১৮

আখ্যানকারীকে সহস্র, প্রতিগরকারীকে শত দান করিবে।

মণ্ডলের ২৪শ হইতে ৩০শৎ সূক্ত শুনঃশেপ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ৭ম ঋকে শুনঃশেপের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে সহস্র যূপ হইতে তাঁহাকে মোচনের উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) অতএব ঋগ্বেদের কালেও শুনঃশেপের গল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার প্রথম সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত শুনঃশেপের আখ্যান এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ইক্ষাকু-বংশে বেধার পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। একদা নারদ ঋষি তাঁহার ভবনে আসিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকে কেন পুত্র আকাঙ্ক্ষা করে?' নারদ ইহা কতকগুলি গাথা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, আপনি দেবরাজ বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করুন, এবং তাঁহার নিকট ইহাও প্রতিজ্ঞা করুন যে, পুত্র হইলে তাহার দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিবেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহার পর রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্র হইল। পুত্র জন্মিবামাত্র দেবরাজ বরুণ হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি দশ দিন পরে যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। বরুণদেব দশ দিন পরে আসিয়া উপস্থিত; রাজা বালকের দন্তোদ্গম হইলে যজ্ঞ করিবেন বলিলে, বরুণ ফিরিলেন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্র,বালক রোহিত ধনুর্ব্বাণ ও কবচধারী হওয়া পর্য্যন্ত বরুণকে যজ্ঞের আশা দিয়া ফিরাইতে লাগিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে রোহিতের নিকট আপন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলে, সে তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে উদরী রোগ প্রদান করিলেন। রোহিত পিতার রোগের সংবাদ লোকমুখে জানিতে পারিয়া গ্রামাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পথে ইন্দ্রদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া ভ্রমণের উপকারিতা রোহিতকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন রোহিত পুনরায় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ফিরিয়া গেলেন।

---

(১) শুনঃশেপং। চিৎ। নিদিতং। সহস্রাৎ
যূপাৎ। অমুঞ্চঃ। অশমিষ্ট। হি। সঃ।
এব। অস্মৎ। অগ্নে। বি। মুমুগ্ধি। পাশান্
হোতঃ। চিকিত্বঃ। ইহ। তু। নিসদ্য। ৫।২।৭

হে অগ্নে! বদ্ধ শুনঃশেপকে সহস্রযূপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে; তিনি শান্ত হইয়াছিলেন; আমাদিগকেও, হে বিদ্বান্ হোতা! পাশ হইতে মুক্ত করিয়া এই স্থলে (আপনি) অবস্থান করুন।

প্রত্যেক সংবৎসরশেষে রোহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গেলেই ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-বেশে আসিয়া তাহার সংকল্প হইতে তাহাকে নিরস্ত করেন, এবং তাহাকে পুনরায় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে পাঠান। এইরূপে ছয়টী সংবৎসর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণের পর রোহিত অজীগর্ত্ত নামক অঙ্গিরা-বংশীয় ঋষিকে বনে স্ত্রী ও তিন পুত্র সহিত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি এক শত গোর বিনিময়ে তাঁহার একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহার দ্বারা বরুণের নিকট হইতে আপনাকে মুক্ত করিবেন, ইহাও জানাইলেন। অজীগর্ত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবেন না, বলিলেন; তাঁহার পত্নী কনিষ্ঠকে দিবেন না, জানাইলেন। ঋষি তখন মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে এক শত গোর বিনিময়ে রাজকুমারকে বিক্রয় করিলেন। রোহিত গৃহে আসিয়া রাজার নিকট ঐ ব্রাহ্মণপুত্রকে প্রদান করিয়া, আপনার পরিবর্ত্তে উহার দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা এই কথা বরুণদেবকে জানাইলে, বরুণ ইহাতে সম্মত হইলেন; কারণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা প্রশস্ততর।

এক্ষণে, রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বসিষ্ঠ, অযাস্য, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋষিদিগকে ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্ নিয়োগ করিলেন। এই যজ্ঞের বসিষ্ঠ হইলেন ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, অযাস্য উদ্গাতা; কিন্তু শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করিতে কাহাকেও নিযোক্তা পাইলেন না।

শুনঃশেপের পিতা, আর এক শত গাভী প্রাপ্ত হইলে, ঐ কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ প্রকাশ করিল। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাকে এক শত গাভী দিলেন, এবং তিনি শুনঃশেপকে হাড়ি-কাঠে বন্ধন করিলেন। এখন উঁহাকে বধ করে কে? তাঁহাকে বধ করিতে কেহই অগ্রসর হয় না। তখন অজীগর্ত্ত, আর এক শত গাভী দিলে, ঐ কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছে, এইরূপ জানাইল। আর এক শত গাভী পাইয়া সে অসি শাণাইতে লাগিল। তখন শুনঃশেপ দেখিলেন, আর তাঁহার নিস্তার নাই। এখনই তাঁহাকে পশুর ন্যায় বধ করিবে। তখন তিনি দেবতাদিগের স্তব আরম্ভ করিলেন। এই সকল স্তোত্র ঋগ্বেদের মধ্যে শুনঃশেপ ঋষির রচিত বলিয়া স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি প্রথম প্রজাপতির স্তব করিলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে অগ্নির স্তব করিতে বলিলেন। অগ্নির স্তব করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া সবিতার নিকট গিয়া তাঁহার স্তব করিতে বলিলেন। সবিতা তাহাতে তুষ্ট হইয়া বরুণ রাজার নিকট গিয়া স্তব করিতে বলিলেন;

কারণ, তাঁহার জন্যই তিনি যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়াছেন। বরুণ তাঁহাকে পুনরায় অগ্নির স্তব করিতে বলিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বিশ্বদেবগণের স্তব করিতে উপদেশ করিলেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে ইন্দ্রের স্তব করিতে বলিলেন। ইন্দ্র স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিরণ্য রথ প্রদান করিলেন। অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন, ইহাও অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে শুনঃশেপ প্রথমে অশ্বিদ্বয়ের ও পরে যখন উষার স্তব করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিজের বন্ধন খসিতে ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উদর কমিতে লাগিল। তাঁহার স্তবও শেষ হইল, শেষ বন্ধনও খসিয়া গেল, এবং হরিশ্চন্দ্রের রোগও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

ঋত্বিক্‌গণ শুনঃশেপের অত্যাশ্চর্য্য ভক্তি ও কবিত্ব দেখিয়া, তাঁহাকেই ঐ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ নূতন নূতন ঋক্ রচনা করিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ইহার পর শুনঃশেপ বিশ্বামিত্র ঋষির ক্রোড়ে উপবেশন করিলে, তাঁহার পিতা অজীগর্ত বলিলেন, 'হে ঋষে! আমাকে আমার পুত্র দাও।' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'দেবগণ আমাকে এই পুত্র দিয়াছেন; অতএব ইনি আমার দেবরাত পুত্র; ইহাকে আমি তোমায় দিব না। এই যে কপিলবংশীয় বভ্রুগণ রহিয়াছেন, ইহারা সকলেই ইহার।' তখন অজীগর্ত শুনঃশেপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমরা তোমার পিতা মাতা—দুই জনে তোমায় ডাকিতেছি, তুমি আমাদের কাছে আইস। জন্মের দ্বারা তুমি অঙ্গিরা-বংশীয়; তুমি বেদবিদ্ ও কবি। পিতামহের বংশ ত্যাগ করিও না। আমার নিকট পুনরায় আইস।' তখন শুনঃশেপ বলিলেন, 'যে কার্য্য শূদ্রদিগের মধ্যেও দেখা যায় না, তুমি তিন শত গাভীর বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়াছ, এবং বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে।' অজীগর্ত নিজের এই কার্য্যকে পাপ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিল, এবং ঐ তিন শত গাভী শুনঃশেপকে দিবে, বলিল। কিন্তু শুনঃশেপ বলিলেন, 'যে বারংবার পাপ কার্য্য করে, সে ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতেও পাপ করিতে পারে। আর তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।' শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অঙ্গিরো-কুলে জন্মিয়া কিরূপে আপনার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি?' তাহাতে বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'আপনি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হউন; আপনার সন্তানগণই আমার বংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আমার দৈব দায় আপনি প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতেই

আপনি আমার পুত্রত্ব লাভ করিবেন।' বুদ্ধিমান ও বিবেচক শুনঃশেপ তখন বলিলেন, 'আপনি আপনার পুত্র ও অপর জ্ঞাতিদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিন— যেন তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করেন, এবং সেই-রূপ কার্য্য করেন।' বিশ্বামিত্র স্বীয় এক শত সন্তানের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশ জনকে এই কথা বলিলে, তাহারা শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিল না। তাহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে 'চণ্ডাল হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। পরে অপর পঞ্চাশ জন ইহাতে স্বীকৃত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

এই আখ্যানের মধ্যে যে অতি সুন্দর Dramatic situation বর্ত্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাখ্যান-রচয়িতা যে তাহার বেশ সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারেন। অতএব বৈদিক যুগেই যে ঋষিগণ নাটক-রচনা ও উহার অভিনয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে যজ্ঞের অঙ্গ-রূপেই এই সকল রচনার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। (১) নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিজের নিজের একটা মত-স্থাপনেই ব্যস্ত; সেই জন্য প্রকৃত ঘটনার সহিত অনেক সময়ে তাঁহাদের মিল থাকে না। এ স্থলে আমরা ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) It has been uniformly held hitherto that the Indian drama arose, after the manner of our modern drama in the Middle ages, out of religious solemnities and spectacles (so called 'mysteries'), and also that dancing originally subserved religious purposes. But in support of this latter assumption, I have not met with one single instance in the Srauta or Grihya-sutras with which I am acquainted (though of the latter, I confess, I have only a very superficial knowledge). The religious significance of dancing is thus, for the older period at least, still questionable; and since it is from dancing that the drama has evidently sprung, the original connection of the latter with religious solemnities and spectacles becomes doubtful also. Besides, there is the fact that it is precisely the most ancient dramas that draw their subjects from civil life; while the most modern, on the contrary almost exclusively serve religious purposes. Thus the contrary, rather, would seem to be the case, namely, that the employment of dancing and of the drama at religious solemnities was only the growth of a later age.

সহযোগী সাহিত্য।

হয়শলা রাজ্য।

হয়শলা রাজ্যের বিধিব্যবস্থা, শিল্প-সৌন্দর্য্য, জনসাধারণ কিরূপ ছিল, S. Srikantaiya সে সম্বন্ধে Quarterly Journal of Mythic Societyতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। রাজা সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ছিলেন।

রাজনীতি।

রাজনীতি বা ধর্ম্ম সকল বিষয়েরই তিনি কর্ত্তা। এ সব বিষয়ে রাজার উপরে কর্তৃত্ব করিবার কেহ ছিল না। সমস্ত দেশটা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ প্রদেশের এক এক প্রদেশে এক এক জন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। কোনও কোনও প্রদেশে স্বয়ং যুবরাজ ও অন্যান্য প্রদেশে রাজপুত্র বা অন্য কেহ থাকিতেন। তাঁহারা রাজভক্ত প্রজা; রাজাকে গভীর ভক্তি জানাইতেন। কোনও নূতন দেশ বা রাজ্য বিজিত হইলে, হয়শলা সাম্রাজ্যের সহিত তাহা বেমালুম যোগ করিয়া লওয়া হইত। পরিবর্ত্তন খুব কমই করা হইত। কোনও কোনও সময় পরাভূত রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তিনি সম্রাটের অধীন থাকিয়া রাজ্য করিতেন।

রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রীকে 'সর্ব্বাধিকারী' কহিত। সময়ে সময়ে যুবরাজও মন্ত্রিসভায় কাজ করিতেন। প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বাধিকারী ছাড়া আরও চারি জন মন্ত্রী থাকিতেন। এই সকল মন্ত্রীকে 'মহামণ্ডলেশ্বর' কহিত। পঞ্চ মন্ত্রীতে মিলিয়া যে মন্ত্রিসভা হইত, তাহাকে 'পঞ্চ-প্রধান' বলিত। এই পঞ্চপ্রধানদের প্রত্যেকেই বংশানুক্রমিক বড়লোকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন।

রাজকাছারীর অন্যান্য অমাত্যগণের উপরে এক জন প্রধান (Chief Secretary) ছিলেন। রাজার সমস্ত হুকুমপত্র রাজার অমাত্য (Royal Secretary) এই প্রধানকে জানাইতেন। এই রাজার অমাত্যের নাম ছিল 'ওমূং'। 'প্রধান' অন্যান্য খাজনাবিভাগের কর্ম্মচারী-দিগকে রাজাদেশ জানাইতেন। খাজনাবিভাগের কর্ম্মচারীরা রাজাদেশ অনুসারে তখন কার্য্য করিতেন।

খাজনাকে 'হুণা' বলিত। গ্রামের লোকের নিকট এই হুণা আদায় করা হইত। প্রত্যেক কাঁড়ী শস্যের জন্য এক 'কনায়' অর্থাৎ ৪ আনা ৪ পাই আদায় হইত। বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় হইতে প্রত্যেক কৃষককে এক কুলা অর্থাৎ জমীর শস্য দিতে হইত।

খাজনা।

লোকে বলিত, এই সকল শস্য একটা কূপে ফেলিয়া স্বর্ণে পরিণত করা হয়। খুব সম্ভব কুলা একটা ছোট জাতির আধার ভাণ্ডকে কহিত। যেমন আমাদের দেশে বিঘা, রশি প্রভৃতির পরিমাণ। এই কুলা ছিল খাজনা নির্দ্দেশ করিবার ভূমির পরিমাণ। অর্থাৎ, একখানি জমী রাখিলে, একখানি জমী অর্থাৎ কুলার শস্য দিতে হইবে। বিজয়নগরের রাজাদের সময় প্রত্যেক ঐরূপ ভূমিখণ্ডের জন্য একটি করিয়া প্যাগোডা দিতে হইত। ধর্ম্মভূমির

উৎপন্নের একপঞ্চমাংশ ও রবিশস্যের একপঞ্চমাংশে ছিল খাজনার হার। নীচু জমীতে অর্থাৎ যেখানে ধান্যাদি জন্মিত, তাহার কর ছিল উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ।

এক রকম জরিমানার নাম ছিল 'হোদেক'। এই জরিমানা দিলে কোনও লোক সাধারণের জন্য গ্রামে কোনও জমী ক্রয় করিতে পারিত। জমীর মূল্যকে জরিমানা বলা হইত।

'হোদেক'।

তাহারই নাম ছিল 'হোদেক।' 'হোদেক' দিলে খারিজ দাখিল প্রভৃতি রাজসরকার আপনা-আপনি করিয়া লইত। নাম প্রভৃতি আঠারখানা খাতায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে থাকিত। সকল বিভাগেই নাম বদলাইয়া ঠিকঠাক করিয়া লওয়া হইত। অন্যান্য প্রকার করও ছিল। দ্বিতীয় বিনয়াদিত্য ধবিহল্লিকে যে দানপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য করের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—গৃহ-কর, বিবাহ-কর, উর-উট্টিগি, টাও, মুরাণু, কবাবৃত্তি, মেসি, ওমেজ, মানকরী, কুতা, কাকাম্বী, বীরবনা (সৈন্য রাখিবার খরচ বাবদ কর), কোদাতিবন (হাতুড়ীর কর), কাট্টারীবনা (কাঁচির কর), আদিকেল বনা (হাপরের কর), হাদাবেরেয়া, হাড্ডিয়ারায়া, কুম্ভবিত্তি (কুম্ভকারের কর), কামার বিত্তি (কামারের কর) প্রভৃতি।

শুল্ক-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী সর্ব্বাধিকারীর সরাসরি অধীনে কাজ করিত। সর্ব্বাধিকারীকে সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগে তাঁহার এক জন লোক থাকিত। পাইকারী ও

শুল্ক।

খুচরা, উভয় প্রকার বিক্রয়ের উপরই শুল্ক ছিল। পাইকারীর শুল্ককে 'পারজুনকা' ও খুচরার শুল্ককে 'কিরকুলা' কহিত। 'ভাদারাভুলা' নামক উপায়ে শুল্ক স্থাপিত হইত। অর্থাৎ, বেয়াল্লিশটি থানা ছিল। এই সকল থানার লোকেরা ঠিক করিত, কোন দ্রব্যের উপরে কিরূপ শুল্ক বসিবে, এবং কোন দ্রব্যের উপরে শুল্ক বসিবে না।

রাজ্যের সকল বিভাগের অপেক্ষা পূর্ত্ত-বিভাগই অধিক কার্য্যতৎপর ছিল। যুদ্ধ-বিভাগের পরই ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। এক জন কর্ম্মজ্ঞ ও কর্ম্মঠ মন্ত্রীর অধীনে এই

পূর্ত্ত-বিভাগ।

বিভাগ থাকিত। নদীর বাঁধ, খালকাটা, পুকুর ও ইঁদারা খনন প্রভৃতি পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্য ছিল।

খুব সাহসী, তেজস্বী, যুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্যদল রাখা হইত। সাহসী ও যুদ্ধকৌশলী লোক-

যুদ্ধ বিভাগ।

দিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। 'বীরকলা' ও 'রক্তিকলা' এই সকল লোককে দেওয়া হইত। এগুলি জায়গীর-জাতীয়।

রাজা নিজে বিচার-বিভাগের কাজ করিতেন। রাজ্যের পঞ্চপ্রধানরা এ বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজার বিচারের উপর আর কাহারও বিচার করিবার অধিকার ছিল না।

ফৌজদারী বিচার।

উহাই শেষ বিচার। বিচারপদ্ধতি বড় সুবিধাজনক ছিল না। পরীক্ষামূলক বিচারেরই প্রচলন ছিল। অনেক বিসংবাদই 'গুরু' মাঝে পড়িয়া মিটাইয়া দিতেন। মন্ত্রপূত খাদ্য খাইতে হইত, এবং খাইবার পূর্ব্বে ভগবানের নামে শপথ করিতে হইত যে, সে দোষ করে নাই। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় এইরূপ হইত। যদি খাইবার সময় গলায় বাধিয়া যাইত, তাহা হইলে অভিযুক্ত দোষী বলিয়া গণ্য হইত। আবার অনেক সময় হরশলেশ্বরের সম্মুখে রক্ত-তপ্ত লৌহদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া সপ্রমাণ করিতে হইত, সে দোষী

কি নির্দোষ। তৃতীয় পন্থা পূর্ব্বের মত শপথ করিয়া ফুটন্ত ঘৃতে হাত ডুবাইয়া ধরিয়া সপ্রমাণ করা। জলে ডুবিয়া বা ফাঁসীতে ঝুলিয়া আত্মহত্যা, বা বিধবা অন্তঃসত্ত্বা হওয়া প্রভৃতি অপরাধ রাজার নিকটে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না। এই সকল অপরাধ সাধারণ সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। সেই জন্য এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি রাজকর্ম্মচারীরা করিতেন না; সমাজের লোকেরা করিতেন। কিন্তু চুরী, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি অপরাধ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে হইলে রাজসরকার হইতে অনুসন্ধানাদি করা হইত। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ প্রকৃত অপরাধী কি না, তাহা দেখা সরকারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুই গ্রামের সীমানা লইয়া প্রায়ই বিবাদ বিসংবাদ-উপস্থিত হইত। ছোটখাটো দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গরু চুরী হইত।

কোনও কর উঠাইয়া দেওয়া বা কোনও অভাবের প্রতীকারের জন্য রাজার নিকট দরখাস্ত করিতে হইত। যে বিষয়ে দরখাস্ত হইত, যে মন্ত্রীর হাতে সেই বিভাগের কর্তৃত্ব থাকিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার মত লওয়া হইত। কোনও ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্যে

দরখাস্তের ক্ষমতা।

ভূমি হস্তান্তরিত করিতে হইলে পুরোহিত ঠাকুরের পদপ্রক্ষালন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইত। এখন এ প্রথা নাই।

খনি।

খনির কাজ দেখিবার জন্য একটা বিভাগ ছিল। এই বিভাগ-পরিদর্শনের জন্য এক জন পরিচালক ছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে বেশ দৃষ্টি রাখা হইত। ছোট সহর কিংবা গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসনসংরক্ষণ-পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই—ইহা পূর্ব্বের মতই ঠিক চলিতেছে।

অনেক সময় গ্রামের উপকারার্থ অর্থসাহায্য দেওয়া হইত। কর্ম্মচারীরা ও দণ্ডুনরা দেখিতেন, যে উদ্দেশ্যে টাকাটা দেওয়া হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয়িত হইল কি না। 'পট্টনস্বামী' অর্থাৎ সহরের 'মেয়র' রাজার নিকট সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতির কথা জানাইতেন, এবং তদনুসারে তাহার প্রতীকার হইত। সাধারণতঃ সহরের এক জন বড় শ্রেষ্ঠী পট্টনস্বামীর পদ পাইতেন। গ্রামবাসীরা কতকগুলি নিয়মানুসারে চলিতে অঙ্গীকার করিলে গ্রাম সহরের পদে উন্নীত হইত।

ব্যবসায়।

বড় বড় শ্রেষ্ঠিরা ব্যবসায় চালাইতেন। ব্যবসায় দেখিবার জন্য অনেক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই পদের নাম ছিল 'শেঠ্টি।' বৈদেশিকেরা, তাঁহাদের যাহাতে অন্যায় ও অসুবিধাদি না হয়, দেখিবার জন্য নিজেদের মধ্য হইতে [illegible] জন লোক ঠিক করিতেন। তাঁহার কাজ অনেকটা এখনকার কন্সলের মত। ব্যবসায় শুধু যে দেশেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। মালয়ী ব্যবসায়ীদের অনেকে এখানে বাড়ী ঘর করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এক জন শ্রেষ্ঠী রাজার এত ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন যে, কোনও সাংসারিক কার্য্যসাধন-ব্যপদেশে রাজা তাঁহাকে কোনও এক বৈদেশিক রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্য্য হাসিল করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীও ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী জাহাজে করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে হাতী, ঘোড়া, মণিমুক্তাদি আনয়ন করিয়া ভারতের বিভিন্ন

জাহাজের নিকটে বিক্রয় করিতেন। সমুদ্রযাত্রার ইহা একটী প্রমাণ নহে কি? আর এক জন ব্যবসায়ী প্রাচী হইতে প্রতীচ্যে মাল চালান দিতেন।

চিকিৎসা-বিভাগ।

চিকিৎসা-বিভাগে এখনকার I. M. Sদের মত সৈন্যদের জন্য স্বতন্ত্র ডাক্তার ছিল। বেলগামীতে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনটী চিকিৎসালয় ছিল। গরীব নিরাশ্রয় নিঃসম্বলদিগের চিকিৎসালয়কে 'কোদিয়ামাথা' কহিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ-শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষারও কতকগুলি বিধিব্যবস্থা ছিল।

'মজরাই।'

শিক্ষা ও পূর্তবিভাগের কার্য্যের একটা মিশ্রিত বিভাগ ছিল। পূর্তবিভাগের মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ কার্য্যের বিভাগটী এই শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। কারণ, শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মন্দিরে মন্দিরে। মন্দিরে গুরু পুরোহিতেরা ধর্ম্ম ও সাংসারিক, উভয়বিধ শিক্ষাই দিতেন। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজসরকার হইতে প্রচুর অর্থ দেওয়া হইত। এখন এই সকল মন্দিরের শিল্পকার্য্য যেমন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, সেইরূপ নানা উৎকীর্ণ লিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে তখনকার সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের ইতিহাসও বহুলপরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ব্যাঙ্কিং।

মন্দিরাদি হইতে লোককে টাকা কড়ি ধার ও সাহায্য দেওয়া হইত। এগুলি ব্যাঙ্কের কার্য্যও করিত।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি।

ব্রহ্মচারীরা গুরুকুলে ঋষির আশ্রমে থাকিতেন। গুরুকুলে ব্রহ্মচারিগণ ১৫ হইতে ১৬ বৎসর, এমন কি, ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। তাঁহারা বাড়ীর বাহিরে থাকিতেন। গুরুর সমস্ত কাজ করিতে হইত, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবনধারণ করিতে হইত। দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তিন রকমের ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাবত্তা ও গুণ ও শিক্ষার উন্নতি প্রচেষ্টার জন্য 'অগ্রহরা' দেওয়া হইত। অগ্রহরা অর্থে একটা গ্রাম বিনা করে শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনও লোককে দেওয়া। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তা ছিলেন। সহরে যে স্থানে ব্রাহ্মণেরা বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, সেই স্থানকে 'ব্রহ্মপুরী' কহিত। অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইত। ব্রহ্মপুরী ব্যতীত শিক্ষাদানের আরও বহু কেন্দ্র সমগ্র দেশে ছড়াইয়া ছিল। মঠে মঠে এই সকল অনুষ্ঠান ছিল। মঠগুলিকে রেসিডেন্সিয়াল কলেজ বলা চলে। ছাত্রদের বাসভবন ছিল—শিক্ষকেরাও সেখানে থাকিতেন। মঠে বসিয়া ছাত্ররা ধর্ম্মবিষয়ক, সাংসারিক ও সামাজিক, সকল প্রকার শিক্ষা পাইত। কোনও কোনও মঠে গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ও ভোজনের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। রাজসরকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন।

ভাষা।

কন্নার রাজভাষা ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ভাগে কন্নাদের প্রচলন ছিল। তামিল পূর্ব্বে। পূর্ব্বে তামিলই রাজভাষা ছিল। ব্যাঙ্গালোর জেলা ও দক্ষিণ প্রদেশে তামিল যে রাজভাষা ছিল, উৎকীর্ণ-লিপিতে রাজাদেশ মুদ্রিত থাকাই তাহার প্রমাণ।

কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হয়শলারাজের চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া

যায়। কন্নাড় অক্ষরে লিখিত শ্রীনোলম্বভাদিগোপার কাহিনীতে যে

মুদ্রা।

মুদ্রার (বিষ্ণুমুদ্রা) পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, তখন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তামার মুদ্রাগুলি অল্প দিনের। মহীশূরকেশরী টিপুসুলতানের সমসাময়িক।

শক্ত ইস্পাতের যন্ত্র দিয়া তক্ষণ কার্য্য করা হইত। তক্ষণ শিল্প এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, প্রায় ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'হুলা' ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তি উৎকৃষ্ট ক্ষোদিত মূর্ত্তির একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হয়শলারাজ্যের সকল মন্দিরে এমন

তক্ষণ শিল্প।

স্থানে এই মূর্ত্তি ক্ষোদিত যে, সকলের দৃষ্টি সেখানে পড়ে। ছবিটী এইরূপ।—একটা অদ্ভুত-জাতীয় পৌরাণিক ব্যাঘ্র লাফাইয়া উঠিয়া 'হুলা'কে আক্রমণ করিয়াছে। 'হুলা' হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঢাল লইয়া ব্যাঘ্রের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং অপর হস্তে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা ব্যাঘ্রের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই চিত্রটী শিল্পীর নিপুণতায় এমন সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলে যে, মনে হয়, যেন এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু শিল্পের সব চেয়ে বাহাদুরী মন্দিরের নির্ম্মাণে ও কারুকার্য্যে, বিশেষতঃ ছাদের নীচের ও বারান্দার ও দরজার। এক রকম ঈষৎ লালচে পাথরের উপর কারুকার্য্য করা—এই পাথরগুলিকে ঘষিয়া মাজিয়া মর্ম্মর পাথরের মত চক্‌চকে মসৃণ করা যায়। যখন খনিতে থাকে, তখন বেশ নরম, কিন্তু বাহিরের রৌদ্র বাতাস জল যত লাগে, ততই শক্ত হইয়া উঠে। মূর্ত্তির হাতের কোনও কোনও বালা নড়ান চড়ান যায়। বেলুড় মন্দিরে নর্ত্তকীর মূর্ত্তি কিরূপ চমৎকার, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন। হলিবিদ মন্দিরের একটা থামের সমান চণ্ডীর মূর্ত্তিটীও কত সুন্দর।

'কন্নাড়' ভাষায় লিখিত একটি নামওয়ালা পুস্তকের নাম জাতক-তিলক। এইখানি জ্যোতিষের পুস্তক; কবিতায় লেখা। ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অহবমল্লের সময় জৈন সিদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, আগেরই তাঁহার পূর্ব্বের লোক।

সাহিত্য।

জাতক-তিলকে 'মানমন্দিরে'র ও গণনার উপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ-প্রথার উপদেশ আছে।

ইহার পর ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে নাগসেন কর্ত্তৃক লিখিত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তার পর ১১২০ খ্রীঃ রাজাদিত্য অঙ্কশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজবর্ম্মা, ভাস্করাচার্য্যের মত তাঁহারও নাম এখনও আছে।

১১৭০ খ্রীঃ নেমিচন্দ্র লীলাবতী ও নেমিনাথপুরাণ নামক দুইখানি রোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ পুস্তক লেখেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রুদ্রভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী চন্দ্রমৌলী তাঁহার পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'জগন্নাথবিজয়'। বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণের জন্ম হইতে বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১১৬৫ খ্রীঃ লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের হরিহরের সাহিত্যিক অভ্যুদয়। তিনি গিরিজাকল্যাণ, শিবগণারগলী, পম্পাশতক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন

রাঘবঙ্ক। তিনি তাঁহার সমান যশস্বী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রকাব্য, সোমনাথচরিত, সিদ্ধরামপুরাণ, হরিহরমাহাত্ম্য, বিবেকচরিত, শম্ভুচরিত প্রভৃতি পুস্তক রাঘবঙ্কের রচিত। রাঘবঙ্কের কোনও ব্যবহারে তাঁহার খুল্লতাত একবার এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক আঘাতে তাঁহার পাঁচটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পাঁচখানি গ্রন্থ লেখার পর সন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাঘবঙ্কের দাঁতগুলি বাঁধাইয়া দেন।

১১৬৫ খ্রীঃ কর্ণাট দেশের এক ক্ষুদ্র রাজবংশে জনৈক সাহিত্যিকের উদ্ভব হয়। ইঁহার নাম পদ্মরাস। তিনি হয়শলা রাজ্যের খালবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। এই বিভাগের কার্য্যে তাঁহার উপর রাজা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং রাজার নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। অনেক বড় বড় কবি সাহিত্যিক-মজলিসে তর্কে তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইতেন।

সাধারণতঃ একখণ্ড কাপড় মানুষের পোষাক ছিল। সর্ব্বদা সে সেইখানা পরিয়াই থাকিত। দেহ উলঙ্গই রহিত। এখনকার মত জামা জুতা মোজার ব্যবস্থা তখন ছিল না।

সামাজিক জীবন।

অবশ্য বুট ও জুতার প্রচলন ছিল; কিন্তু সর্ব্বদা এবং সকলে পরিত না। স্ত্রীলোকেরাই শুধু গহনা পরিতেন, পুরুষরা পরিতেন না। বড়লোকেরা গহনা ব্যবহার করিতেন। পুরুষরা চুলে খোঁপা বাঁধিত। স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরিতেন, এবং এখনকার মত বডিস ব্যবহার করিতেন। নর্ত্তকীরা পায়জামা ব্যবহার করিত। কোনও কোনও স্ত্রীলোক তাওয়াল চটী পরিতেন। বড় বড় মাকড়ীর ব্যবহার ছিল, এবং স্ত্রীলোকদের সর্ব্বাঙ্গ নানারূপ অলঙ্কারে পূর্ণ থাকিত। এখনকার গ্রামে পাঁচ বৎসরের কমবয়স্ক ছেলেরা যেমন উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়, তখনকার প্রথাও তেমনই ছিল। মেয়েরা ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন।

আস্ত একখানা কাঠ গোল করিয়া কাটিয়া গরুর গাড়ীর চাকা হইত। গরুর গাড়ীর দুইটী চাকাই হইত। স্প্রিংতে ডাণ্ডা দেওয়া চাকাও হইত, তবে খুব কম। রাজার গাড়ীর চার চাকা ছিল। চাকাগুলি ডাণ্ডাওয়ালা ও গাড়ীতে স্প্রিং থাকিত।

কুস্তী ও শীকারের খুব চলন ছিল। স্বয়ং রাজা ও রাণীরা মল্লযুদ্ধ দেখিতে আসিতেন। কখনও কখনও নর্ত্তকীরা 'কোলাতাম' নৃত্য করিয়া সমবেত জনসঙ্ঘের মনোরঞ্জন করিত।

ক্রীড়া।

বন্দুক ছিল। একখানা ছবি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, জনৈক লোক বন্দুক দিয়া গুলি ছুড়িতেছে। পদাতিক সৈন্যরা সাধারণতঃ তীর ধনুক ব্যবহার করিত। খুণরা অবশ্য আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। সাধারণ তলোয়ারগুলি তেমন পরিচ্ছন্ন ছিল না। হয়শলেশ্বরের মন্দিরে একখানা চক্‌চকে মসৃণ তীক্ষ্ণধার অসি আছে। বড় বড় মাথার চুল বুনিয়া বুনিয়া সৈন্যদের মস্তক আঘাতের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। লম্বা বুট পরিয়া তাহারা পদদ্বয় বাঁচাইত। অশ্বের গায়ে শিকলের জাল পরাইয়া দেওয়া হইত। অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া বর্শার সাহায্যে কদাচিৎ লড়াই করিত। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই সাধারণতঃ যুদ্ধ করিত। ঘোড়ার জীন ও রেকাবও ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যরা বুকে ধাতুনির্ম্মিত পাত পরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন।

যুদ্ধে যখন কে জিতিবে, কে জিতিবে, এইরূপ ভাব, তখন প্রধান সেনাপতি কোনও বিখ্যাত

বলি।

বীরকে আত্মদান করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে অনুরুদ্ধ হওয়া খুব সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং নিজ হস্তে এই আত্মবলিদানোন্মুখ ভাগ্যবান পুরুষরত্নটীকে একখণ্ড পান দিতেন। ইঁহার পরিবারবর্গকে বিনা করে কিছু পরিমাণ ভূমি ভোগদখল করিতে দেওয়া হইত। যুদ্ধে ইনি প্রাণ হারাইয়া দেবলোকে গমন করেন, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইত। ইহাকে 'বীরকাল' বলিত। তাঁহার স্ত্রী গভীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার ও মহাশক্তির মিলনের আশায় আত্মহত্যা করিতেন। বীরপত্নীর স্মৃতিফলককে 'সত্তীকাল' কহিত।

রাজার জীবনরক্ষার্থ রক্ষী থাকিত। অনেক আজীবন রক্ষী ছিল। তাহাদিগের নাম ছিল 'গাড়ুর।' তাহারা এই শপথ করিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিত যে, প্রাণপণ করিয়া রাজার জীবনরক্ষা করিবে। রাজার মৃত্যু হইলে তাহারা আত্মহত্যা করিত।

'গাড়ুর।'

পুরাকালে জাপানী বীরগণ যেরূপ কারণে হারিকারি করিত, ইহারাও ঠিক তাহাই করিত। বিষ্ণুর রথের নাম গাড়ুর। বিষ্ণুর রথ যেরূপ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও জীবনসাথী, গাড়ুররাও সেইরূপ রাজার জীবনসাথী, তাহাদের এরূপই ধারণা ছিল। সেজন্য রাজার মৃত্যুতে তাহারা আত্মহত্যা করিত।

'সিদিতালেগুড়ু।'

ইহা একরূপ অদ্ভুত বলিদান-প্রথা। ভক্ত একটী স্থিতিস্থাপক কাঠের কাছে গিয়া বসে। সেই কাঠটী বাঁকাইয়া মাথার চুলের ঝুঁটীর ভিতর চালাইয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। তার পর গলা কাটিয়া ফেলিলে নীচের টান অপসারিত হইয়া যায়, এবং মুণ্ডটা কাঠের সহিত লাফাইয়া উপরে উঠে।

সাল্লেখানা।

জৈনেরা একরূপ উপায়ে আত্মঘাত হেত। তাহারা প্রায়োপবেশনে আত্মত্যাগ করে, ইহাকে সাল্লেখানা কহে। দিনের পর দিন, স্ত্রী, পুরুষ অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করে না; ধীরে ধীরে মৃত্যুপথে অগ্রসর হয়।

রাজসম্মান।

বিখ্যাত ও কর্ম্মী লোককে রাজ-উপাধি ও অন্যান্য সম্মান দেওয়া হইত। সামরিক সম্মানও ছিল। রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ সোনার চাক্তী মাথায় বাঁধা হইত। সোনার চাকতীটিকে পট্ট কহিত। রাজাও এরূপ চাক্তী ব্যবহার করিতেন।

'সুজার।'

ব্রাহ্মণেরা রাজসরকারে যে খাজনা দিতেন, তাহা স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করিবার প্রথাকে সুজার কহিত।

রাজ-অন্তঃপুর।

রাজ-অন্তঃপুরে কত পুরনারীর বাস ছিল, বলা কঠিন। কথিত হয়, রাজা নরসিংহের ৩৮০ জন সদ্বংশজাত স্ত্রী ছিলেন। সে সময় রাজা নরসিংহ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কর্ম্ম।

মজুরদিগকে দৈনিক হিসাবে মজুরী দেওয়া হইত। মন্দিরনির্ম্মাতাদিগকে কাধ্য হিসাবে মজুরী দেওয়া হইত। যাহারা মূর্ত্তি খোদাই করিত, তাহাদিগকে আস্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদাই করার পর যে সকল টুকরা পাথরাদি বাহির হইত, তাহাই ওজন করিয়া সমপরিমাণ তামা দেওয়া হইত। যে মূর্ত্তিগুলি খুব সুন্দর

ও বড় হইত, তাহার নির্ম্মাতাদিগকে ঐরূপ প্রথানুযায়ী ওজন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যও দেওয়া হইত। রত্নের কার্য্যে সাধারণতঃ স্বর্ণ দেওয়া হইত।

দুর্ভিক্ষ ও জলাভাবও ঘটিত। সে জন্য ব্যবস্থাও ছিল। খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি তবুও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কারণ, বহু পুষ্করিণী ও মন্দির নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ ছিলেন। রক্ষীরা অতুল সাহসী ছিল। রমণীরা সুন্দরী ছিলেন। মজুররা উদ্ধত ছিল না। মন্দিরগুলি পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ বিবেচিত হইত। পুষ্করিণীগুলি বিস্তৃত ও গভীর ছিল। বনে পর্য্যাপ্ত ফল পাওয়া যাইত; উদ্যানে প্রচুর পুষ্প ফুটিত। হয়শলা রাজ্যের নগরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পময় শোভাময় উদ্যান থাকিত। বহু পুষ্করিণীতে প্রচুর পদ্ম ফুটিত। যোজন যোজন পথের দুধারে সারি সারি গাছ পথিককে ছায়া দিত। জনসাধারণ অতিথিবৎসল, এক কথার লোক, সাবধানী ও বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, কবিত্বময়, সম্মানী, দাতা, উদারহৃদয়, পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা ছলচাতুরীর ধার ধারিতেন না। বেশ সুখে তাঁহারা দিন কাটাইতেন।

দুর্ভিক্ষ।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী,
লেফটেনাণ্ট।

আর্য্য ও ইব্রীয় ভূমির উদ্ভিদ-তত্ত্ব।

ঋগ্বেদে চন্দন কিংবা বল্গুক বৃক্ষের উল্লেখ নাই। বল্গুক ও চন্দন অভিন্ন কি না, বলা কঠিন। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির বাসভূমিতেও চন্দন বৃক্ষ উৎপন্ন হইত না। বাইবেলের 1 Kings 10—11, 2 Chron 2—8, 9—10 পদে চন্দনের উল্লেখ থাকিলে, ইহা ইব্রীয় দেশোৎপন্ন বৃক্ষ নহে। তৎকালে ওফির নামক কোনও দেশ হইতে ইব্রীয় দেশে চন্দন আমদানী হইত। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ বলেন, চন্দন বৃক্ষের আদি জন্মস্থান করমণ্ডল উপকূল, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গুগ্গুল, খস্খস্ ইত্যাদি সুগন্ধির নাম আছে (১ম পঞ্চিকা, ৫ম অধ্যায়) কিন্তু চন্দনের নাম নাই। হিব্রু বাইবেলের বহু পদে ধূপ, ধুনা, অগুরু, গুগ্গুল ইত্যাদি বহু প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ আছে (Song of Solomon 4—14, Proverbs 7—17)। এই সুগন্ধি দ্রব্যগুলি ইব্রীয় যাগ যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির যাজক এই সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য স্বর্ণ-মণ্ডিত ধূপ-বেদীর উপর প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে যি-হোবার আঘ্রাণার্থ দগ্ধ করিত। (Exodus 30 chapter)।

চন্দন।

বৈদিক খদির, শমী, এই দেশীয় বাবল বাইবেলের শিটিম (Shitta)

প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ লাটিনে সাধারণতঃ Acacia নামে পরিচিত। ঋগ্বেদের

খদির, শমী, শিটিম।

প্রায় সমস্ত অংশ ভারতের বাহিরে রচিত, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতে নানা-জাতীয় উত্তম উত্তম বৃক্ষ থাকিতে প্রাচীন আর্য্যগণ যে Acacia-জাতীয় খদির, শমী ইত্যাদি নগণ্য বৃক্ষের দ্বারায় রথ, শকট, যজ্ঞের প্রয়োজনীয় যূপ, পরিধি প্রস্তুত করিতেন, ইহাতে এই মনে হয়, ঋগ্বেদের জন্ম-ভূমিতে ভারতজাত শ্রেষ্ঠ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইত না।

ঋগ্বেদের ৩।৫৩।১৯ ঋকে খদির, শিংসপা ও ২২শ ঋকে 'শিম্বল' নামক বৃক্ষের উল্লেখ আছে। এই 'শিংসপা' ও 'শিম্বল' ভারতজাত 'শিশু' ও 'শিমুল' বৃক্ষ সহ অভিন্ন কি না, বিচারসাপেক্ষ। শিম্ব, শিম্বি, শিম্বী শব্দে শিম লতার ফলের গুচ্ছ ও বীজ বুঝায়। খদির, শিটিম প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষের ফলের গুচ্ছ শিমের ফলের গুচ্ছের ন্যায় হইয়া থাকে। শিমুল বৃক্ষে যে ফল হয়, তাহা প্রায় কলার আকার হইয়া থাকে। উহা খদির, শিটিম ও শিম লতার ফলের গুচ্ছের ন্যায় নহে। ১০।৮৫।২০ ঋকে 'কিংশুক' ও শল্মলি, এবং ৭।৫০।৩ ঋকে 'শল্মলি' নামক বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা ভারতের পলাশ ও শিমুল সহ অভিন্ন কি না, সন্দেহ আছে।

১০।৮৫।২০ ঋকের 'কিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্' অর্থে কিংশুক ও শল্মলি বৃক্ষের দ্বারা রথের উত্তম চক্র প্রস্তুত হয়, এবং ঐ বৃক্ষ বা তাহার রথ সুন্দর ও হিরণ্যবর্ণ, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, পলাশ ও শিমুল কাঠ অত্যন্ত নরম। তাহা দ্বারা রথ কিংবা রথের চক্র প্রস্তুত অসম্ভব। কেবল এক জাতীয় পলাশের ফুল ব্যতীত অন্যান্য-জাতীয় পলাশ ও সর্ব্বপ্রকার শিমুল ফুল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বৈদিক খদির ও বাইবেলের শিটিম কাঠ শক্ত, এবং তাহার ফুল হিরণ্যবর্ণ হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদে ৪।২৭।৪ ও ১০।৯৭।৫ ঋকে 'পর্ণ' শব্দ আছে। কিন্তু পলাশ শব্দ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২য় পঞ্চিকা, ১ম অধ্যায়) অভাব পক্ষে পলাশের যূপের ব্যবস্থা থাকিলেও, 'পলাশ' শব্দে পত্র ও সমস্ত-জাতীয় বৃক্ষ বুঝায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৪।১) পর্ণ শব্দের যে ব্যাখ্যায় পলাশ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অলৌকিকতাপূর্ণ। সোমের পাতা হইতে পলাশের উদ্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, সোম ও পলাশকে এক-জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ

করেন, তখন খদির কাষ্ঠ ভারতে সহজলভ্য ছিল না, কিংবা খদির বৃক্ষ ভারতে জন্মিত না দেখিয়া, পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণযুগে অভাব পক্ষে খদিরের পরিবর্ত্তে পলাশ-যূপের ব্যবস্থা হইয়াছে। পর্ণ-শালা শব্দের অর্থ, পত্রাচ্ছাদিত কুটীর। সম্ভবতঃ আর্য্যগণ ভারতে আগমনের পর যে প্রকার 'করীর', 'সোম' ইত্যাদি উদ্ভিদের পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈদিক শিম্বল, শল্মলি ও কিংশুক বৃক্ষের পরিচয়ও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পলাশ-পত্র দ্বারা ভারতে গৃহ প্রস্তুত হয় কি না, অবগত নহি। কিন্তু এখনও আরব ও সিরিয়া দেশে খর্জ্জুর পত্র দ্বারা কুটীর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ বলেন, যে দেশে বৃষ্টিপাত অধিক হয়, সেই দেশে, অর্থাৎ সুমাত্রা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ভূ-ভাগে, পলাশ ও শিমুল বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহা বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে জন্মে না। অন্য পক্ষে Acacia-জাতীয় খদির, শিটিম প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

ঋগ্বেদের ১০।৩১।১০ ঋকে যে 'শমা' শব্দ আছে, তাহা শমীবৃক্ষ কিংবা খদির-নির্ম্মিত যজ্ঞীয়-পাত্র, ইহাতে মতভেদ আছে। শমী নামক কণ্টকী বৃক্ষকেও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ Acacia-পর্য্যায়ভুক্ত বলেন। এই শমী-কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া ইহা দ্বারা বৈদিক অগ্নি-মন্থনের দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। খদির কাঠ শক্ত বলিয়া বৈদিক কালে আর্য্যগণ তাহা দ্বারা রথ, শকট (ঋগ্বেদ ৩।৫৩ সূক্ত), যজ্ঞের যূপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ১ অধ্যায়) এবং পরিধি প্রস্তুত করিতেন।

আর্য্যদের শমী সহ ইব্রীয় ভূমির 'শমির' নামক (Isaiah 5—6, 7—23) কণ্টকী বৃক্ষের, এবং খদির শিংসপা সহ শিটিম বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি। এই শিটিম বৃক্ষও কণ্টকযুক্ত। শিমের ন্যায় ইহার থোকা থোকা 'হিরণ্যবর্ণ' ফুল ও ফল হইয়া থাকে। শিটিম বৃক্ষ সীনাই পর্ব্বতের পাদদেশে ও যর্দ্দন নদীর তীরবর্ত্তী বালুকাময় স্থানে স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। প্রাচীন কালে ইব্রীয়গণ ইহার দ্বারা যজ্ঞাগারের বেদী, পরিধি, যূপ, মেজ, যিহোবা-দত্ত অনুশাসন-প্রস্তর রাখিবার সিন্দুক, শকট ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন (Exodus 25th Chapter)। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ বলেন,—খদির, শিটিম, বাচল, শমী প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ Acacia-জাতীয়। খদির নানা-জাতীয়। খদির-জাতীয় 'অরি' নামক বৃক্ষের সহিত পশ্চিম-এসিয়া ভূমির 'Aror' নামক বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি (Jeremiah 17—61)।

বৈদিক দেবদারু বৃক্ষ নিজ নামে পরিচিত। আর্য্য-চক্ষে ইহা দেবতুল্য, পবিত্র ও দেব-গৃহীত। ইহার কাষ্ঠ দ্বারা প্রাচীন কালে দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। দেবদারু কাষ্ঠ, মেষলোম ও বর্হি কোনও বিশেষ শ্রেণীর যজ্ঞে দগ্ধ করিবার বিধি আছে (শতপথ ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয়িসংহিতা) এই দেবদারু সহ ইব্রীয় ভূমির 'এরস' (cedar) নামক বৃক্ষের তুলনা করিতে পারি। ইব্রীয়-চক্ষেও এরস পবিত্র। এই 'এরস' ইব্রীয়দের নিকট 'যিহোবা বৃক্ষ' (Psalms 80—10, 104—16) আরবীয়দের নিকট El-Eresh 'এল-এরস' নামে পরিচিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির মূর্ত্তি-উপাসক কোনও কোনও শাখা এরস কাষ্ঠ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ (Isaiah 44/13—19) করিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি মহাপুরুষ মুসার বিধান অনুসারে এরস কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ মেষ-লোম, এসব তৃণ (বর্হি) কোনও বিশেষ শ্রেণীর যজ্ঞ ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে দগ্ধ (Levi 14—4, Numbers 19th Chapter) করিত।

দেবদারু ও যিহোবা-দারু।

ইব্রীয়-চক্ষে উডুম্বর বা ডুমুর পবিত্র। ইহা স্বর্গীয় বৃক্ষ বলিয়া কথিত। প্রথম মনুষ্য বা আদম স্বর্গে উলঙ্গাবস্থায় থাকার পর, জ্ঞান হইলে, যখন আপন নগ্নতা অনুভব করিলেন, তখন এই উডুম্বর বৃক্ষের পত্র দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করিয়াছিলেন (Genesis 3—9)।

উডুম্বর।

প্রাচীন কানান (জুডিয়া) ভূমিতে বিনা যত্নে (বন্যজাত) ডুমুর বৃক্ষ জন্মিত। বৎসরে তিনবার ডুমুরের ফল হইত। ডুমুর ফল ইব্রীয় জনসাধারণ, বিশেষতঃ সৈন্য ও ভ্রমণকারীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী (1 Samuel 25—18) ছিল। গোলা ভরা ধান যেমন আমাদের দেশে খাদ্যসামগ্রীর প্রচুরতার আদর্শ, তদ্রূপ প্রাচীন ইব্রীয় ভূমিতে ডুমুর বৃক্ষের নীচে বসা ও ফল ভক্ষণ করা তৎকালে ঐ দেশের সুখ শান্তির উদাহরণ (1 Kings 4—25) ছিল। ডুমুর ঔষধার্থেও ব্যবহৃত (2 Kings 20—7) হইত।

আর্য্যদের নিকটও ডুমুর বৃক্ষ পবিত্র। ইব্রীয় জাতির ন্যায় আর্য্যগণও ডুমুর স্বর্গীয়-বৃক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্বর্গ হইতে অন্নরস ভূমিতে পতিত হইয়া, তাহা হইতে উডুম্বর বৃক্ষের উৎপত্তি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম পঞ্চিকা) হইয়াছে। ডুমুর ফল ক্ষত্রিয় বা সৈন্যদের ভক্ষ্যোপযোগী খাদ্য (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্চিকা)। বৈদিক ভূমিতে উডুম্বরের তিনবার ফল হইত। উডুম্বর-শাখা রাজাদের অভিষেকে আবশ্যক হইত।

হিন্দু পাঠকবর্গের নিকট বৈদিক বর্হির (কুশ) পরিচয়-দান অনধিকার-চর্চ্চামাত্র। কুশ নানা প্রকার। কুশ, কুশর, দর্ভ, বীরণ, মুঞ্জ ইত্যাদি (১।১৯১।৩ ঋক)। বৈদিক যাগ যজ্ঞে বর্হির বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক বর্হির সহিত বাইবেলের 'এসব' ও আরব জাতির 'বাইনা' (বেনা ?) নামক তৃণের তুলনা করিতে পারি। এই 'এসব' প্রাচীন কানান-ভূমিতে, বিশেষতঃ কি দ্রোণ ও যর্দ্দন উপত্যকায় লিবানোন পর্ব্বতশ্রেণীতে অধিকপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই 'এসব' তৃণ বৈদিক বর্হি সহ অভিন্ন। ভগ্ন অট্টালিকায় ও প্রাচীরগাত্রেও (1 Kings 4—33) এসব জন্মিয়া থাকে।

বর্হি, এসব।

দেবদারু কাষ্ঠ, মেষ-লোম সহ বর্হি যে প্রকার বিশেষ শ্রেণীর বৈদিক যাগ যজ্ঞে দগ্ধ করিবার বিধি আছে, সেই প্রকার ইব্রীয় জাতির অশৌচয়-জল প্রস্তুত (Numbers 19—6) ও কুষ্ঠ-রোগীর প্রায়শ্চিত্ত ও শুচিতা জন্য (Levi 14—4) যাগ যজ্ঞে এরস কাষ্ঠ, সিন্দূরবর্ণ মেষ-লোম সহ এসব দগ্ধ করিবার বিধি দেখা যায়। আর্য্যজাতি যেমন যাগ যজ্ঞে কুশের ব্যবহার দ্বারা পাপমুক্ত ও শুচি হইতেন, তেমনই প্রাচীন ইব্রীয় জাতিও এসবের ব্যবহার দ্বারা পাপমুক্ত (Psalms 51—7) হইতেন। ঋগ্বেদের বহু ঋকে বর্হি 'পবিত্র' নামে পরিচিত।

প্রাচীন পারসীক জাতিও *Barsom* নামক বর্হি-জাতীয় এক প্রকার তৃণ যাগ যজ্ঞে দগ্ধ করিতেন (Vendidad 9—195, Yacna 2—2)। বৈদিক ঋষিগণ বর্হি দ্বারা যে প্রকার সোমরস উঠাইতেন, (৯।৫০।৪, ৯।৫১।১, ৯।৫২।১ ঋক) তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির যাজকগণও পাত্র হইতে এসব দ্বারা দ্রাক্ষারস তুলিতেন। যে প্রকার বিশেষ বিধিমত বৈদিক বর্হির আঁটি (Bundle) বাঁধা হইত, সেই প্রকার বিশেষ বিধিমত পারসীকদের Barsom ও ইব্রীয়দের এসবের আঁটি বাঁধা হইত। এই এসবের আঁটি দ্বারায় ক্রুশে বিদ্ধ মহাত্মা বিশুখৃষ্টের মুখে অন্তিমকালে দ্রাক্ষারস দেওয়া হইয়াছিল (John 19—29)।

ঋগ্বেদের ৭।৫৯।১২ ঋকে 'উর্বারুক' শব্দ আছে। গ্রিফিথ মহোদয় উর্বারুক শব্দের অর্থ Cucumber করিয়া টীকায় কর্কন্ধু (কুল) বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই উর্বারুক Cucumber বা Water-melon-জাতীয় লতা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এ দেশে ইহা শশা, তরমুজ বলিয়া পরিচিত। এই জাতীয় লতার আদি জন্মস্থান

উর্বারুক।

আফ্রিকা। পরে ইহা ক্রমে ক্রমে মিশর, কানান (পালেষ্টাইন) প্রভৃতি দেশ হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

খর্জ্জূর বৃক্ষ শাখাহীন। ইহার পাতাই শাখা-তুল্য। প্রাচীন কালে খর্জ্জূর বৃক্ষ টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীশ নদীর মোহানায় পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত। পরবর্ত্তী কালে ফিনিশিয়া দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে, (Wandering of Plants, 203)। গ্রীক ভাষায় Phonix শব্দের অর্থ (John 12—13) খর্জ্জূর বৃক্ষ। প্রাচীন কানানভূমিতে অধিকতর খর্জ্জূর বৃক্ষ দেখিয়া জেতা আগন্তুক গ্রীকগণ ঐ দেশের নাম ফিনিশিয়া বা খর্জ্জূরপুরী রাখিয়াছেন। প্রাচীন পালমিরা নগরের নাম খর্জ্জূর বৃক্ষ হইতে হইয়াছে।

খর্জ্জূর ও পর্ণ।

যদিও অধুনা আরব, সিরিয়া ও পারস্য দেশের অধিবাসিগণ খর্জ্জূরফলপ্রিয় এবং খর্জ্জূর-ফল তাহাদের একটী প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত, তথাপি প্রাচীন ইহুদীয় জাতি খর্জ্জূরফলপ্রিয় ছিল কি না, বলা কঠিন। বাইবেলের শত শত পদে দ্রাক্ষা ও ডুমুর ফল ভোজনের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু একটী পদেও খর্জ্জূর-ফল-ভোজনের উল্লেখ নাই। খর্জ্জূর বৃক্ষ প্রাচীন কাল হইতে আরব ও ইহুদীয় জাতির চক্ষে পবিত্র (1 Kings 6—29)। প্রাচীন ইহুদীয় মুদ্রায় ও যিরুসালেমের মন্দিরে খর্জ্জূর বৃক্ষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল (1 Kings 6—29)। খর্জ্জূর বৃক্ষ প্রাচীন কানান (জুডিয়া) দেশের রাজকীয় Symbol। ইস্রায়েল সম্প্রদায় মিশর হইতে দাসত্ব-মুক্ত হইয়া মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসর প্রবাস বা ভ্রমণ-কালে পর্ণ-শালায় বাস করিত। পরে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন পূর্ব্ব-স্মৃতিরক্ষার জন্য খর্জ্জূরপত্র প্রভৃতি দ্বারায় কুটীর প্রস্তুত ও সাত দিবস কুটীরে বাস করিয়া প্রত্যেক বৎসর কুটীর-উৎসব (Levi 23—34, Nahimia 8—14) পালন করিত। ইহা 'ইথনিম' (আশ্বিন) মাসে সম্পন্ন করিতে হইত। এ দেশে কদলী গাছ রোপণ দ্বারা যে স্বাগতসম্ভাষণ হয়, তাহা যে প্রকার শান্তি, মঙ্গল ও আনন্দ-জ্ঞাপক চিহ্ন, খর্জ্জূরপত্র হস্তে লইয়া সম্মানিত ব্যক্তির যে অভ্যর্থনা হয়, তাহাও তদ্রূপ ইহুদীয় জাতির নিকট শান্তি ও মঙ্গলের জ্ঞাপক নিদর্শন (John 12—13)। যিরুসালেমের তীর্থযাত্রীদিগকে তীর্থযাত্রার চিহ্ন-স্বরূপ একটী খর্জ্জূরশাখা অর্থাৎ পাতা দেওয়া হইত। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের উপাধি *Palmer*।

ঋগ্বেদের ৪।২৭।৪, ১০।৯৭।৫ ঋকে পর্ণ শব্দ আছে। পর্ণ শব্দের অর্থ পলাশ

গ্রহণ করিতে যে আপত্তি, এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে তাহার আলোচনা করিয়াছি। 'পর্ণ' বলিতে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় উদ্ভিদ বুঝায়, তবে পর্ণ অর্থে খেজুর গাছ হওয়াই সঙ্গত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা ও পাতার মধ্যে প্রভেদ নাই। এখনও পশ্চিম এসিয়ায় খর্জ্জুর বৃক্ষের পাতা ও কাঠ দিয়া কুটীর প্রস্তুত হয়। খর্জ্জুরপত্র দ্বারা প্রস্তুত গৃহই যথার্থরূপে পর্ণ-শালা-পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত। এই খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট। খর্জ্জুর বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে তাহা হইতে সুমিষ্ট পানীয় বাহির হয়।

ঋগ্বেদের ১০।৯৭ সূক্ত ওষধির (Herbs) উদ্দেশ্যে রচিত। এই সূক্তের ৫ম ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ এই—"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা"। দত্ত মহাশয় সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া 'অশ্বত্থ ও পর্ণ' শব্দের অর্থ অশ্বত্থ ও পলাশ, এবং গ্রিফিথ 'অশ্বত্থ' শব্দের অনুবাদে *Holy Fig* (যজ্ঞডুমুর) ও পর্ণ শব্দের অনুবাদে *Parna Tree* (পর্ণ বৃক্ষ) করিয়াছেন। ডুমুর ও অশ্বত্থ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭ম পঞ্চিকা, ৫র্থ খণ্ড) দেখা যায়। 'অশ্বত্থ' অর্থে যজ্ঞডুমুর কিংবা পিপ্পল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

১০।৯৭।৫ ঋকের 'অশ্বত্থ' অর্থে যদি সর্ব্বশ্রেণীর বৃক্ষ বুঝায়, তবে ঐ ঋকের 'পর্ণ' অর্থে কেবল পাতা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 'অশ্বত্থ' অর্থে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ হয়, তবে ঐ পর্ণ শব্দের অর্থও কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ হওয়া সঙ্গত। ১।১৩৫।৮ ঋকে যে 'অশ্বত্থ' শব্দ আছে, গ্রিফিথ তাহার অনুবাদে *Holy Fig* (যজ্ঞডুমুর) ও দত্ত মহাশয় সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া মধু (সোম) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অশ্বত্থের ফল বা ফলের রস আর্য্যগণ যাগ যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'অশ্বত্থ' অর্থ কোনও বিশেষ নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় বৃক্ষ। এবং ১০।৯৭।৫ ঋকের অশ্বত্থ ও পর্ণ শব্দের দ্বারায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ সূচিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৫।৪।১, ২) পর্ণ শব্দের এই বিবরণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,—'গায়ত্রী যখন সোমকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন, এবং তাহা আহরণ করিতেছিলেন, তখন……রাজা সোমের পর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাই পতিত হইয়া পর্ণ হইয়াছিল, এবং সেই জন্য তাহার নাম পর্ণ। ইহাতে যে সোমের দীপ্ত (অংশ) ছিল, এখানেও তাহা হইবে, এবং সেই জন্য পর্ণ-শাখার দ্বারা বৎসসমূহকে অপসারিত করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র—'তিনি তাহা (পর্ণ) ছেদন করেন—'অভীষ্টের জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি। রসের জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি ·····'

এখানে রসের উল্লেখ, এবং পর্ণ-ছেদনে রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি কথা থাকায়, পর্ণ শব্দের অর্থ খর্জ্জুর বৃক্ষ হওয়াই সঙ্গত। পলাশ-ছেদনে কোনও প্রকার রস বাহির হয় না; বিশেষতঃ, পলাশের রস মিষ্ট কিংবা মনুষ্যের পানীয় নহে। অপর পক্ষে, খর্জ্জুরের ফল ও রস মিষ্ট, এবং মনুষ্যের প্রয়োজনীয় পেয়।

শ্রীআজিমউদ্দিন আহম্মদ।

আলোচনা।

খোলা চিঠি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

অনেক দিন থেকেই এমন একটা কামনা মনের মধ্যে ছিল যে, আপনার হাতের মাখম-মাখানো চাবুক আমার পৃষ্ঠদেশে কোনও সুযোগে একবার পড়ুক; কিন্তু ও মনস্কামনা পূর্ণ হতে দেরী দেখে ক্রমেই হতাশ হয়ে আসছিলুম। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করা গিয়েছে,—'আর্ট ও কবিত্বের' দৌলতে আকাঙ্ক্ষার ধন মিলেছে দেখছি। এইবার, যদি অধিকার দেন, বারেকের জন্যে সাহিত্যের লেখক-শ্রেণীভুক্ত হয়ে ধন্য হতে পারি।

সাহিত্যিক-সম্পর্কের দিক থেকে হিসাব করতে গেলে আপনি বর্ত্তমান লেখকের ঠাকুর্দ্দার আসন পাবার যোগ্য,—কারণ আপনি যখন সাহিত্যের দেশায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যাওয়া-আসা কচ্ছেন, তখন আমরা মাতৃগর্ভে। তার পর সাহিত্যের ওপর দিয়ে একটা নতুন যুগের ঢেউ চলে গেল,—রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়-ব্যাপার সারা হতে আর-এক-পুরুষ কেটে গেল,—শেষে তিন পুরুষে সবুজপত্রের আওতায় নাতি-ঠাকুর্দ্দার এই শুভদৃষ্টি!

আর্ট ও কবিত্বের প্রতিপাদ্য আপনি বুঝতে না পারলেও ক্ষতি ছিল না—কেন না, যে বোঝা সম্প্রতি আমরা মাথায় তুলছি, আপনি তা' তার বাবাবারই যোগাড় করে' এনেছেন। এ অবস্থায় ও বোঝাবুঝির বালাই দূর করে দিয়ে আপনাদের একটু একটু পায়ের ধূলো এই সব নাতিপুতিদের মাথায় দিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আপনি তো শুধু বুঝতে পারেননি—অনেকে আবার উল্টাও বুঝেছেন, এবং তাঁরা আমাদেরই সমবয়সী নব্য-সমালোচক। ব্যাপারটা তবে বলি শুনুন,—কিন্তু দাঁড়ান একটু গম্ভীর হয়ে নিই,—যেহেতু নবীনেরা গম্ভীর না হলে প্রবীণেরা তাদের কথাকে ছেলেমানুষী বলেই উড়িয়ে দেন।

এক গামছায় এঁটে-বাঁধা চালকলার মতন একত্র থাকলেও কাব্য ও কলা যে এক বস্তু নয়, এইটি বোঝাবার জন্যে ও প্রবন্ধে যা' বলা গিয়েছিল, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে,

'কাব্য-ভোগের আনন্দ' আর 'আর্ট-যোগের আনন্দ'। কিন্তু, দুঃখের কথা বল্‌বো কি ঠাকুর্দা, ও কথা কারুরই কাণে পৌঁছয় নি! শুন্‌ছি—অস্‌কার ওয়াইল্ড, সাইমনস্‌, রাস্কিন, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রোম্যাঁরলাঁ, এচ্‌ জি ওয়েলস্‌, এ, ই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' পর্য্যন্ত ও-রকম বেফাঁস কথা বলে নি; অথচ এ যুগের "বিচিত্র সমস্যা ও বিচিত্র সমাধান-কল্পনার গোড়ার পরিচয়টা উক্ত নামাবলী-চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের 'মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে গেলে' অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।" (অজিতকুমার—ভারতী)

যে পরিচয়টা গোড়াতেই আবশ্যক, সেটা যে আমি আগাগোড়াই অনাবশ্যক মনে করে ফেলেছি, তার কারণ—

(১) আর্টের মর্ম্মোদ্ঘাটন করাই আমার অভিপ্রেত ছিল; কোনও ভূতপূর্ব্ব কবির চর্ম্মোৎপাটনে অভিরুচি নয়।

(২) এ-যুগ বল্‌তে যে-যুগ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, আমার মতে সে-যুগের মোড় ফিরে যেতে বসেছে; এমন কি, সেই কথা বলেই উদ্দিষ্ট প্রবন্ধ সূচিত হয়েছিল।

(৩) সমাপ্তপ্রায় যুগে বিচিত্র সমস্যা থাক্‌লেও কোনও সমাধান নেই, এইটিই হচ্ছে আমার ধারণা। এ ধারণা বদ্‌লাবার কোনও কারণ আজও ঘটেনি—আশা করি, পরেও ঘট্‌বে না।

(৪) কোনও বিষয়-সম্বন্ধে অপরে কি বলে গিয়েছেন তা' জানার চেয়ে নিজে কি বল্‌তে পারা যায়, তাই দেখায় বিদ্যা-প্রকাশ না হলেও বুদ্ধি-বিকাশ হয়। এই বিশ্বাসবশেই ভারতী-মন্দিরে দেশবিদেশের মতবাদের দলীল জড়ো করে' দেওয়া তেমন সন্তোষজনক মনে হয়নি। চিন্তারাজ্যকে কলা দেখানোই যদি অভিপ্রেত হয়, তা' হলে কাব্য ও কলা সম্বন্ধে অন্যের মতামত পিঠে করে বেড়ানো সহজই হয়ে আসে।

তবু, কিছুমাত্র লজ্জাবোধ না করেই স্বীকার কচ্ছি যে, দেশবিদেশের পণ্ডিতী মতভেদের ধোঁয়া আমার বুদ্ধিমূলে আবশ্যকের অতিরিক্ত লাগ্‌তে পায়নি; আর সেই জন্যেই এ বিশ্বাস আজও এ-পক্ষে থেকে গিয়েছে যে, বস্তু-পরিচয়ের গোড়ার দিকটা অন্যের খাতায় থাকে না, থাকে নিজেরই মাথায়। এর কারণ, সমস্যা আগে মানবসমাজে ঘটে—তার পর মানুষের রচনায় ওঠে; মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে বলেই কেতাব তৈরি হয়, আর ভগবানের হাতে-গড়া এই বিশ্বকাব্যখানা পড়ে বলেই নিজেকে প্রকাশ করে।

অবশ্য, বই পড়্‌তে বারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়,—কথা এই যে, গোড়া বেঁধে নেওয়াটাই সর্ব্বাগ্রে দরকার। অন্যথায় বই পড়ে আমরা বাচাল হতে পারি, শিক্ষকও হতে পারি,—কিন্তু সে না বুঝে ও না শিখে। ঘটনা যখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তখন তার সমস্যা-সমাধানের জন্যে কেতাবের পাতা ওল্‌টাবার সময়, চাই কি, না পাওয়াও যেতে পারে; অথচ বুদ্ধি পরিষ্কার থাক্‌লে দেশকালের উপযোগী করে' তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়; এমন কি, তথাকথিত বিচিত্র সমস্যার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাড়িয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু ও কথা যাক্‌—যা' বলছিলুম তা' এই যে, আর্ট কোনও কবির বিশেষ সৃষ্টি নয়, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিরই কাঠামো। Law of Gravitation যেমন আবিষ্কৃত

হবার পূর্ব্বেও ছিল, এবং মানবজাতি ধূমি-বিচ্যুত হবার পরও থাকবে, Law of spirit বা আর্টও তেমনি কবিকুলের জন্মপূর্ব্ব থেকেই আছে, এবং ও বংশ নির্ব্বংশ হয়ে যাবার পরও থাকবে। কোন্ কবি কি পরিমাণে এই নিয়মকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন, সেইটুকুমাত্র তাঁদের কেতাব পড়ে আমরা জান্‌তে পারি—অবশ্য যদি কষ্টিপাথর অধিকারের মধ্যে থাকে। ও বস্তুর অভাবে বিচিত্র সমস্যা ও সমাধানের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে 'বিচিত্র বিচিত্র' শব্দে মানুষের কানে তালা লাগিয়ে দিতে পারলেও কোনও কবির মর্ম্মস্থান নিশ্চয়ই আমরা স্পর্শ করতে পারি নে।

Artificial আর artistic পর্য্যায় শব্দ নয়, কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে আমরা যে ভাবটা প্রকাশ করে থাকি, তাতে বোধ হয় যে, ও ধারণা আমাদের মধ্যে বিশেষ স্পষ্ট নয়। Nature আর আর্ট এক জিনিস নয়—কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে রবিবাবুর মত পড়ে মনে হয় না যে, এ পার্থক্য তিনি মানাতে চান। যা' স্বাভাবিক নয়, তা' কৃত্রিমও হতে পারে; কিন্তু যা কৃত্রিম, তাই spiritual বা real নয়। যে কৌশলে এই realityকে প্রকাশ করা যায়, তাকেই আমি আর্ট নামে চিহ্নিত করতে চাই। কাব্য ও কলা আমার মতে শুধু বিভিন্নই নয়, আকারে ও প্রকারে একেবারেই স্ত্রী ও পুরুষ।

রবিবাবুর একটী আধুনিক কবিতায় দেখলুম—

"হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটায় গঙ্গা যেন
শুকিয়ে গেল অকারণে"—

কাব্য সম্বন্ধে কবির এই উপমাটী আমরা শিরোধার্য্য করি। এই জন্যেই কাব্যের স্রোতে যখন মানব-সমাজের স্ত্রী-পুরুষ দুলিয়ে ওঠবার উপক্রম করে, তখন শিবকে নেমন্তন্ন করে আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কাব্য-গঙ্গা যতক্ষণ শিবের জটায় থাকেন, ততক্ষণই তিনি কলুষ-নাশিনী; কিন্তু কাব্য-যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ বাদ পড়ে গেলে দক্ষ-যজ্ঞের পুনরভিনয় ঘটবার সম্ভাবনা যে একেবারেই থাকে না, তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতায় জেলখানা ভেঙ্গে যে উলঙ্গ বাস্তব সন্দীপের মূর্ত্তি ধরে বেরিয়ে এসেছে, তাতে realityর অর্থ অন্যরূপ। সন্দীপের মতিগতি (প্রেমিকার নয়) কামিনী ও কাঞ্চনের দিকে ছিল বলেই আর্টের বাস্তব তার কাছে জেলখানা ও আর্টের জেলখানা তার কাছে বাস্তব বিবেচিত হয়েছে।

সন্দীপও natural, নিখিলেশও natural, এদের একটিও আর্টিষ্টিক নয়; তবে ও দুই চরিত্রে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত natureএর ঝোঁক নিম্নাভিমুখ, আর শেষোক্তের ঊর্দ্ধাভিমুখ। আর্ট এ কাব্যের জমীতে একেবারেই নেই। যদি কেউ বলেন যে, কাব্যে না থাকলেও কবিতে ও জিনিস আছে, তা' হ'লে আমার উত্তর—কর্ত্তা নয়, ক্রিয়াই এ প্রবন্ধের বিচার্য্য; তার কারণ, কর্ত্তা এখানে শুধু কাব্যেই প্রচ্ছন্ন নয়, কবির চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন। আমি মানি যে, মগ্নচেতন প্রতিভাই কাব্য-রচনার অধিকারী, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও গ্রাহ্য করাতে চাই যে, পূর্ণচেতন প্রতিভাই আর্ট-রচনার যোগ্যপাত্র। কাব্য আর আর্টকে যে আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি, তার কারণ, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রীরা এযাবৎ ও পদার্থযুগলকে

চট্‌কেই আনন্দনাড়ু পাকিয়েছেন, আর সে নাড়ু হাতে পেয়ে আমরাও নাড়ুগোপাল হয়ে উঠেছি। এখন এই সত্যটাই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে 'আনন্দ' আর 'আনন্দনাড়ু' ঠিক এক জিনিস নয়। কামী ও কামিনীর দেহসর্ব্বস্ব যুগল মিলনের ফলে যা' জন্মায়, তারি নাম আনন্দনাড়ু, কি না ছেলে মেয়ে; অপর পক্ষে, নিষ্কামচেতা প্রেমিক প্রেমিকার মানস-সর্ব্বস্ব যুগল-মিলনের ফলে যা জাগে, তারি নাম আনন্দ—কি না ছেলে মেয়ের প্রাণে যা' থাকে।

কাব্য যে ব্যোমকেশের জটাভরন, তার পরিচয় আকাশ থেকে মাটী পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই পাওয়া যায়। আকাশের কম্পন থেকেই যে বিশ্বপ্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়েছে, আর এই বিশ্বজগৎ যে একখানি মহাকাব্য, এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ কাব্যের মূলে যা' আছে, তা' কাব্য নয়, আর্ট—প্রকৃতি নয়, পুরুষ—মাটী নয়, আকাশ—আসক্তি নয়, অনাসক্তি।

সোজা ক'রে পড়তে গেলে আকাশের দিক থেকেই এ কাব্যকে পড়া উচিত,—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ মাটীর দিক থেকেই এর নকল নিয়ে আমাদের পড়তে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা' আছে, তার নাম Natural Science, দর্শন নয়। Law of natureকেই যদি ঐশী নিয়ম বা Law of spirit বলে গ্রাহ্য করা যায়, তা' হ'লে কাব্য আর আর্ট অবশ্যই অভিন্ন হয়ে পড়ে,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যাপার আসলে তা' নয়।

আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা' আছে, তার নাম দর্শন, কিন্তু দর্শন আর আর্ট এক জিনিস নয়। কাব্যের উপসংহার হচ্ছে দার্শনিকতায়, কিন্তু আর্টের উপক্রমণিকাই ঐখানে। অসত্যকে তিরস্কার করতে করতে আত্মাকে জীবনের বাইরে project করা, অর্থাৎ আত্মাপুরুষকে খাঁচাছাড়া করে' বাইরের আকাশে উড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে দার্শনিকের কাজ; অপর পক্ষে, আর্টের কাজ হচ্ছে আকাশকে জীবনে জীবনে inject করতে করতে humanityকে খাঁচার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তোলা। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় বলতে গেলে, কবি-দার্শনিকের কাজ হচ্ছে 'হেগেলকে ফকির করা', আর কবি আর্টিষ্টের কাজ হচ্ছে 'শঙ্করকে গৃহী করা।'

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূতে'র মুখ দিয়ে যা' বলিয়েছেন, কাব্যের গোড়ার কথা অবশ্যই তাই। কিন্তু আর্টের গোড়ার কথা শুনতে হলে পঞ্চভূতের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ানো একেবারেই অনাবশ্যক। পঞ্চভূতের বাড়ী যদি মনের দক্ষিণ মেরুতে হয়, তবে সর্ব্বভূতান্তরাত্মার বাড়ী হচ্ছে মনের উত্তরমেরুতে। কাব্য জড়তার গ্রাস থেকে আমাদের চিত্তকে চাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেও চিত্তচাঞ্চল্য থেকে মুক্তি দিতে পারে না,—অথচ চিত্তচাঞ্চল্য থেকে মুক্তিলাভ না করলেও আর্ট রচনা করা যায় না। আর্টের কাজ হচ্ছে চিত্তচাঞ্চল্যের ক্ষেত্র থেকে বের করে' নিয়ে মানুষকে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠ করে দেওয়া। একটা উপমা নেওয়া যাক্—

আকাশ থেকে মাটী পর্য্যন্ত যে ছবিখানা চোখের সামনে পাতা রয়েছে, এইটাকেই একটা মানবদেহের গণ্ডী দিয়ে ঘিরে ফেললে আকাশকে মস্তিষ্কে, বাতাসকে তরিয়ে বা হৃদয়ে ও মাটিকে

দেহসংস্পর্শে পাওয়া যায়। এখন, মানুষের মধ্যে এ-ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশের নামকরণ করবার জন্যে বলা যাক—আকাশ=আত্মা,—বাতাস=মন,—মাটী=মনের অন্তর্গত বস্তুপুঞ্জ বা স্মৃতিচিত্র।

বাইরের দিকে চাইলে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাস অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, আর ঐ বাতাস ঘুমিয়ে থাক্‌লে, তৎসংলগ্ন যাবতীয় বস্তুপুঞ্জ নিঃস্পন্দ ও জড়বৎ দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে ঝড় উঠুক—যেখানে যা' কিছু বস্তু আছে, সমস্তই চঞ্চল হয়ে উঠবে। কিন্তু কি ভাঙবে আর কি থাক্‌বে, সেদিকে বাতাস দৃকপাতও করে না, কারণ সে অন্ধ। কাব্যর কাজ হচ্ছে এই বাতাসের চাঞ্চল্যে বস্তুকে চঞ্চল করে' দেখা, অর্থাৎ মনের মধ্যে ঝড় তুলে মনের বস্তুপুঞ্জকে দুলিয়ে তোলা। কিন্তু আকাশের গায়ে এমন একটা সীমারেখা আছে, যার উপরে বাতাস না থাক্‌লেও আকাশের স্পন্দন-সম্ভূত আলোকের অভাব নেই। মানুষের মধ্যে এই আকাশ বা আত্মার স্পন্দন-সম্ভূত আলোকের নামই প্রজ্ঞা, আর এই প্রজ্ঞার আলোকচিত্রই হচ্ছে আর্টিষ্টিক চিত্র। কবি প্রমথনাথ এ চিত্র দেখিয়েছেন। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, এর পর মানবজগৎকে দেখাবার মতন উচ্চতর ছবি আছে কি না, তবে আমার উত্তর এই যে, অপেক্ষা করুন।

কথা উঠেছে, কাব্য আতসবাজিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তার পর নিজের নিজের রুচি অনুসারে কেউ দর্শন, কেউ তত্ত্ব, কেউ বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদির চর্চা করতে থাকেন; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কবির মধ্যে সে সমস্তরই বীজ ছিল। (অজিতকুমার—ভারতী।)

ও কথা সত্য হলে সুখের হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তা' মনে করা চলে না। মাটীর ধর্ম্মে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে—কিন্তু আকাশের ধর্ম্ম শব্দমাত্র; তবু আকাশ মাটীর দরে বিকোবার নয়। পাঁচমিশুলী মালই যে খাঁটী মাল, এ কথা খাঁটী কথা নয়, খাঁটী ভক্তির কথামাত্র।

ফল কথা, স্বভাব-বিজ্ঞানের রাজ্যটীকে চিত্ররসে মণ্ডিত করে' রবীন্দ্রনাথ কাব্য সাজিয়েছেন, এবং তাঁর সাধনার অন্তরতম কথা হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির, সাদা কথায়, স্ত্রীপুরুষের কাম্য মিলন। প্রেম-জিনিসটী তাঁর চক্ষে বস্তু-নিরপেক্ষ নয়, তাই অবস্থার সঙ্গে তাঁর নায়ক-নায়িকার ক্রমাগতই বিরোধ বেধেছে, এবং অবস্থা বদলাবার জন্যে বিদ্রোহ জেগেছে। ফলে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কেউ শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছেন, কেউ কুলত্যাগ করেছেন, এবং অনেকেই সংসার অশান্তিময় করে' তুলেছেন। এক কথায়, আনন্দকে নিজের বাহিরে রক্ষা কর্‌লে জীবন-সমস্যা যে কত বিচিত্র ও জটিল হ'তে পারে, তারই পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

অবস্থা যখন এই রকম, তখন আর্ট এক কথায় সমস্ত জটিলতার চরম মীমাংসা করে দিয়েছে। সে সমাধান হচ্ছে এই যে, বিচিত্র ঘটনার সমস্যা-সমাধান ঘটনার মধ্যে নেই, আছে ঘটনা-দর্শকের নিজেরই মধ্যে। ঘটনার সাগর সেঁচে তার জল নষ্ট করবার চেষ্টা বাতুলতা, 'আনন্দ' জিনিসটাকে কেউ কারুর কৃপাপেক্ষী রেখো না, অনাসক্তির উপরই জীবনের ভিত খাড়া কর—সমস্তই সহজ হয়ে আস্‌বে। কথায় বলে—"আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।"

দেশী ভাষার রবীন্দ্র-সাহিত্য 'অবিদ্যা'কে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেছে ; আর প্রমথনাথের শিল্পনৈপুণ্য ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যাকে confusing করে' পাশাপাশি সাজিয়েছে —উদ্দেশ্য, দুয়ের মধ্য থেকে দেশ ধানা বেছে নিক্। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে 'অবিদ্যার প্রকাশ' বলার অর্থ ও সাহিত্যকে খাটো করা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য মর্য্যাদাই দান করা। অবিদ্যা অনাবশ্যক বিদ্যা তো নয়ই, পরন্তু অত্যাবশ্যক বিদ্যা ; কেন না, অপরাবিদ্যায় দীক্ষিত না হ'লে পরাবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায় না। এখন, সাহিত্যক্ষেত্রে কবি প্রমথনাথ আমার বিচারে জয়ী হলেও, জীবন-গ্রন্থের দিকে কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই তাঁর জাগ্রত ভগবানের অম্লান পুষ্পমালা বুঝি বা দুলে ওঠে,—কেন না, আমার অন্তর বল্‌ছে যে, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যোত্তম তাঁর গুরুর সঙ্গে কপটতা করেছেন, অর্থাৎ গুরুর ভাষ্যকার-রূপে আসরে নেবে স্তুতিচ্ছলে গুরু-নিন্দা করেছেন। কিন্তু ভয় নেই, মুক্তি অবিলম্বেই প্রেম ও ভক্তির মহাতরঙ্গ-কল্লোলে পৃথিবীতে নেমে আসছে—নারায়ণ ও নারায়ণীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, এখন ভক্তোত্তম রবীন্দ্রনাথেরই ঘোষণা-বাণী নাতি-ঠাকুর্দার রসালাপে বেজে উঠুক—

"আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"

প্রণত

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।—শ্রীহরিশ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।—প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ; বৈষ্ণব-সমাজের উপজীব্য ; বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য-রত্নাকরের দিব্য রত্ন।—গোস্বামী প্রভু এই অমূল্য গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং সাধারণের জন্য সরল ভাবে ও সহজ ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের—ভক্তি-তত্ত্বের সার বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।—চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালার পঞ্চম বেদে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, ভাবে, চরিত্রে, রীতিতে, নীতিতে চৈতন্য-চরিতামৃত যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ দেশে অন্য কোনও একখানি গ্রন্থের ভাগ্যে সেরূপ সৌভাগ্য ও সাফল্য ঘটে নাই। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও চৈতন্য-চরিতামৃত অতীতে বাঙ্গালীর চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, বাঙ্গালীকে সদ্ভাবের আধার করিয়াছে ; এবং এখনও যাহারা 'বাঙ্গালী' আছে, সেই 'গণ'কে স্বধর্ম্মে, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। বাঙ্গালীর 'গণ' যে শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াও গুণরাশি-নাশী দারিদ্র্যের মধ্যে এখনও তাহার ধর্ম্মকে সাবধানে রক্ষা করিতেছে, তাহার কারণ এই ত্রি-রত্নের দীক্ষা।

জীবনচরিতের হিসাবেও ইহা অমূল্য।—বাঙ্গালা দেশে রামায়ণ ও মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামৃত ভিন্ন আর কোনও গ্রন্থের ভাগ্যে এত সমাদর ঘটে নাই।

বটতলায় চৈতন্যচরিতামৃত প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য সংস্করণই চরিতামৃতের সর্ব্বশেষ সংস্করণ। ইহাতে কবিরাজ গোস্বামীর মূল, প্রত্যেক শ্লোকের 'আনন্দচন্দ্রিকা টীকা', সরল অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্লোকের পর টীকা, তাহার পর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে টিপ্পনী দিয়া সম্পাদক ভাবার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হরিশ বাবুর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উৎকর্ষ দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালী আপনার রত্ন চিনিয়াছে; গুণগ্রাহী হইয়াছে। স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় একবার চৈতন্যচরিতামৃতের উৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহা এখন দুর্লভ। হরিশ বাবু এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইলেন। আমরা বাল্যকালে বটতলার সংস্করণ পড়িয়াছি। তাহার সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের তুলনা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বটতলাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালী কখনও বটতলার সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনকার সহিত এখনকার তুলনা হয় না। হরিশ বাবুর সংস্করণের কাগজ যেমন উৎকৃষ্ট, ছাপাও তেমনই সুন্দর। অনেকগুলি চিত্রও আছে। তন্মধ্যে একখানি চিত্র, তিন বর্ণে মুদ্রিত। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে মানভঞ্জন, 'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা', 'পাছে পাছে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ। তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন', হরিদাস ও বারাঙ্গনা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। শেষ চিত্রখানি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত সংকীর্ত্তনের ছবিখানি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অনুসারে অঙ্কিত।

সম্পাদক গ্রন্থখানির চিত্রসমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সচিত্র পুস্তকের ভাগ্যে যেরূপ প্রসাধন সম্ভব, তিনি তাহার সংস্থান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চিত্রে প্রাণশক্তির পরিচয় নাই। বাঙ্গালায় সে দিন কবে আসিবে, যে দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অক্ষয়-চিত্র শিল্পীর কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিবে? যাহা অক্ষরে নাই, ভাবে থাকে, সেই আত্মা চিত্রের তূলিকায় ধরা পড়িবে? যিনি ভাবের জগতের অমর ভাবগুলিকে চিত্রপটে অমর করিয়া বাঙ্গালীকে অতীত অবসাদে মুক্ত করিয়া স্বয়ং অমর হইবেন! গৌরাঙ্গদেবের চিত্রে চিত্রকরের মুখে ভাবের আবেশ ফুটিয়াছে। মনে হয়, তাহা আরও দিব্য ভাবে ফুটিল না কেন? মানভঞ্জনের ছবির রাধা ও কৃষ্ণ স্বাভাবিক হইল না কেন?—সখীর স্থিতি-ভঙ্গী অপ্রাকৃত হইল কেন? 'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা' চিত্রের বিষয় বটে। কোন ভাবী শিল্পী এই ভাবের ছবি বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিয়া ধন্য হইবেন? 'পাছে পাছে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ, তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন' দেখিয়া অর্ফিয়সের ছবি মনে পড়ে। চৈতন্যের জীবনের এই কাহিনীর ছবির মত ছবি আঁকিয়া কবে বাঙ্গালী চিত্রকর চিরস্মরণীয় হইবেন?—সমুদ্রকোলে চৈতন্যের অন্তর্ধান—কল্পনার ভাষায় দেখ, এ চিত্র কত মহনীয় হইতে পারে।

বাঙ্গালা সেই প্রজ্ঞাপূতচিত্ত, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভাগ্যবান চিত্রকরের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা জননী তাঁহার সমগ্র সৌন্দর্য্যসম্ভার, তাঁহার ধর্ম্ম, ভাব ও সাহিত্য লইয়া সেই অনাগত—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী চিত্র-প্রতিভার মূর্ত্ত বিকাশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

হরিশ বাবু যাহা দান করিলেন, তাহা সেই সৌভাগ্য-যুগের সূচনা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। তিনি চৈতন্যচরিতামৃতকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। বাঙ্গালীর সমাদরে তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ করুক,—তিনি অন্যান্য গ্রন্থের এইরূপ সংস্করণ প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। —গ্রন্থের প্রথমে স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের একখানি ছবি আছে। এখনকার বাঙ্গালী তাঁহাকে চেনেন না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর স্মরণীয়।—'বরদা মজুমদার' অনেক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দর্শনকাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপাইয়া দেশে কেতাবের দুর্ভিক্ষের দিনে সদ্গ্রন্থ সুলভ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারে বিদ্যানুরাগের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'কাজরী নৃত্য' নামক একখানি চিত্র—কেন না, ইহা চিত্রিত। অবনীন্দ্র বাবুরও গগন বাবুর মত ছবির উপর 'বিদ্রূপ-বজ্র' হানিবার সাধ হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু 'কজরী'র গানে, সুরে, নৃত্যে, এমন কি, 'নাম-পরশনে তার' মনে যে ছবির উদয় হয়, অবনীন্দ্রনাথের ছবিখানিকে তাহার caricature বলিয়াই মনে হয়। ইহা যদি sublimeকে ridiculous করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে, তাহা সফল হইয়াছে। 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' কখন কি ভাব ধরে, তাহা আমরা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাজরী নাচে বিধাতার কমনীয় সৃষ্টি নারী কি এমন অষ্টাবক্র-ভাব ধারণ করে?—বরের মিছিলের ময়ূরপঙ্খীতে যে নৃত্য এখনও দুর্ভাগ্যক্রমে পথিকের চোখে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ কি তাহা হইতে model সংগ্রহ করিয়াছেন? পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর বেণী ও পৃষ্ঠে একটু ছবি আঁকা আছে, অবশিষ্ট সম্বন্ধে 'কি আর বলিব আমি।'—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 'জীবন-শিল্পে' গদ্য-প্রহেলিকার নমুনা দিয়াছেন। দর্শন-শূন্য দার্শনিকতা আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যে অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে। এই সকল 'তাত্ত্বিক' যাহা মনে আসে, তাহাই পাঠকের পাতে পরিবেশন করেন। 'শিল্পী ভাস্করের কাছে পাথরখানি যেমন শুধুই পাথর নয়, জড়বস্তু নয়, পাথরের মধ্যে তিনি কি একটা অর্থ, কি একটা জীবন্ত সত্তা দেখিতে পান, তাঁহার উপলব্ধিতে উহা বোধ হয় যেন প্রকাশেরই স্বচ্ছ উন্মুক্ত দ্বার।' শিল্পী পাথরে জীবন-সত্তা দেখিতে পান, না তাঁহার কল্পনায় যে 'জীবন-সত্তা' থাকে, তাহা তাহা সেই জড়-

বস্তুতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁহার উপলব্ধিতেও উহা 'বস্তু' নয়, বরং উপাদান হইতে পারে। আদ্যোপান্ত শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শনের চেষ্টা যদি 'তত্ত্ব' হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, প্রহেলিকা ভিন্ন সত্য ও তত্ত্বের অন্য কোনও বাহন আমাদের ভাষায় নাই! শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'শিকারী' উদ্ভট গল্প। শিকারের আবহাওয়াটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু গল্পটি একবারে খেলো, ইহার কৃত্রিমতায় মন 'পদে পদে পীড়িত হয়। শ্রীরাখালরাজ রায়ের 'অবৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-আলোচনা' সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'রাজা দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব' প্রবন্ধ হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম—'যদু ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মে অনুরাগবশতঃ হিন্দুগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। নবজাগ্রত হিন্দুশক্তি তাহা নীরবে সহ্য করিল না। ১৪১৪, ১৪১৫ এবং ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের কিয়দংশ রাজত্ব করিয়া জালালুদ্দিন বা যদু বাঙ্গালাদেশ হইতে তাড়িত হন। * * * ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর দনুজমর্দ্দন যদুকে তাড়াইয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা গণেশের বংশের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের কিয়দংশ হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দনুজমর্দ্দন অপ্রতিহতপ্রভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দন দেবের তিরোভাবের পর মহেন্দ্রদেব বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত দনুজমর্দ্দনের সম্পর্ক ঠিক কি তাহা জানা যায় না। তবে তিনি দনুজমর্দ্দনের বংশীয় এবং উত্তরাধিকারী, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। তিনি কয়েক মাস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেই যদু বা জালালুদ্দিন তাঁহাকে তাড়াইয়া বঙ্গের সিংহাসনে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হন। এখন প্রশ্ন এই যে, বৎসরদ্বয় যিনি বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, চাটিগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, এবং পাণ্ডুয়া হইতে টাকা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন, তিনি এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন এক কি না? চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দ্দন নামে কোন ব্যক্তি সত্যই ছিলেন কি না? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, মহারাজ দনুজমর্দ্দন যে কোন দিন চন্দ্রদ্বীপ গিয়া তথায় এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। * * * দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালার একছত্র রাজা মহারাজ দনুজমর্দ্দন হইতে ভিন্ন, রাজা দনুজমর্দ্দন নামে অন্য এক ব্যক্তি পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঘটক-কারিকা, জনপ্রবাদ ও বংশাবলীর প্রমাণ ভিন্ন তাহার অন্য কোনও প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত নাই।' শ্রীমতী সীতা দেবী কর্ত্তৃক Theophile Gautier হইতে অনূদিত 'সুন্দরীর চরণ-কমল' অদ্ভুতরসাশ্রিত সুন্দর গল্প।

ভারতী। অগ্রহায়ণ।—প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সচকিতা'। দেখিলেই 'সচকিত' হইতে হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা কলসী পড়িয়া আছে —আর 'সচকিতা' বোধ হয় 'চেলাকলে' যবনিকার রচনা করিয়াছেন, বা করিতেছেন! এই 'বসন-যবনিকা-বিধায়' সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়' কবিতায় প্রথমটা বাঙ্গালার শীতের ছবি নয়; ইহা কতকটা কল্পনার

শীত, কতকটা পড়া-পুঁথির পাতায় অনুভূত শীত।—'সবুজের বসবাস, ছিল বর্ষা বারো মাস, আর সেই দেবদারু দীন' তুষার-দেশের ছবিতে দেখিয়াছি, হিমালয়েও তাহা সম্ভব।—'ফুলবন আগিকে উজাড়' হইতে 'ফোটে না তাম্বুল-রাগ দাড়িম্বের ফুল' পর্য্যন্ত—বাঙ্গালার শীতের পুষ্পদৈন্য মন্দ নয়। কিন্তু দাড়িম্বের ফুলের রক্তিমার তুলনা খয়ের-চূণ-সুপারী-ইত্যাদি-মিশ্র পানের পিলির রাঙ্গা রং? উপমাটা নিতান্ত বৈঠকী, এবং অত্যন্ত বিপিনচন্দ্রী অর্থাৎ, 'বস্তু-তন্ত্র' নয়? শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঙ্গালার ব্রত'—দ্বিতীয় পর্য্যায় এবারকার 'ভারতী'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইহাতে ব্রতের ইতিহাস আছে,—তৎসম্পর্কে অনেক নূতন কথাও আছে। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার 'বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিকের প্রথম প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক দুইটা পরস্পর বিপরীতমুখী শক্তি নহে; ইহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে ও একযোগে মানব-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।' শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'রাজা রামমোহন রায়ের স্বরূপ' উল্লেখযোগ্য। অজিতবাবু লিখিয়াছেন,—'কোন সময়ে ভারতবর্ষকে ক্যানাডা প্রভৃতি কলোনির মত self-government বা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী হইতেই হইবে, রাজা রামমোহন রায় ইংরাজ-শাসনের সেই প্রারম্ভ-কালেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রিমকোর্ট ও ভারতেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদন-পত্র হইতেই দেখি যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারতবাসীকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত, হতমান ও বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি কি অগ্নিময় বাণীই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরকে তিনি লিখিতেছেন, "They appeal to you by the honour of that great nation which under your royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed.' গভর্মেণ্টের নিকট হইতে license না পাইলে এদেশে কোন সংবাদপত্রাদি বাহির হইতে পারিবে না, প্রধানতঃ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদি এরূপ উক্তি বাহির হইতে পারে, তবে আজ রাজা রামমোহন জীবিত থাকিলে এখনকার প্রেস-অ্যাক্ট সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে কি বলিতেন এবং কি করিতেন, তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন। * * কোথায় স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তাতে তাঁর এতই আনন্দ যে তিনি ঘটা করিয়া টাউনহলে এক ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার নেপ্‌লসে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে, এবং সে সংগ্রামে নেপ্‌লসের লোকদের পরাভব ঘটিয়াছে, এই সংবাদে তিনি এমনি ম্রিয়মাণ হইলেন যে, সেদিন মিঃ বকিংহাম নামক ইংরাজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতে পারিলেন না। তাঁকে চিঠি লিখিলেন—'এক দুর্ঘটনার সংবাদে আমার মন এমনি বিচলিত হইয়াছে যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে, সকল ইউরোপীয় ও এশিয়ার জাতিরা স্বাধীন হইল, এ দৃশ্য আমার জীবিতকালে আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না।' "Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful"। ইংলণ্ড যাইবার পথে কেটালে

এক ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া সেই নিশানকে অভিবাদন করিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া চিরজীবনের মত তাঁর পা ভাঙ্গিয়াছিল। সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি পুনঃপুনঃ আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন, "Glory, glory, glory to France!" মানুষের স্বাধীনতার জন্য এমন passion, এমন একান্ত আবেগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, কে কবে কোথায় শুনিয়াছে? শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য 'বর্ণ-বিশ্লেষণ ও বৃত্তি বিশ্লেষণে সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়াছেন।

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ।

[কোচজাতি।]

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নতিস্পৃহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সম্প্রদায় আপন আপন ইতিহাসের আলোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন। ভারতীয় সভ্য অসভ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এক একটী উৎপত্তি-বিবরণ আছে। লিখিত গ্রন্থ অথবা বংশপরম্পরাক্রমে শ্রুত বাচনিক উক্তি তত্তাবতের ভিত্তি। Ethnology (জাতিতত্ত্ববিদ্যা) ও Philology (শব্দতত্ত্ববিদ্যা) দ্বারা জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা নিতান্ত আধুনিক। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতিগণ এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন হইতে সর্ব্বত্রই অনিচ্ছুক। ভারতীয় জাতি বা রাষ্ট্রবিশেষের ঐতিহাসিক উপকরণ কত দূর সহজলভ্য ও জঞ্জালবর্জ্জিত, এ স্থলে তাহার আলোচনা বাহুল্যমাত্র। অনুচিত উচ্চাভিলাষ ও ন্যায্য অধিকারদানে কুণ্ঠা সাম্প্রদায়িক-ইতিহাস-সঙ্কলনের আর একটী গুরুতর অন্তরায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক উভয়বিধ প্রমাণ যথাসাধ্য উপস্থিত ও আলোচনা করিয়া কামরূপের প্রাচীন অধিবাসী 'কোচ' নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের জাতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করা গিয়াছে। কত দূর কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

রাজা সমুদ্রনারায়ণ কুমারের (দরঙ্গ) বংশাবলী পুস্তকে লিখিত আছে,—'রাজা হৈহয়ের পুত্র 'সহস্র' পরশুরাম কর্ত্তৃক হত হইলে, সহস্রের পুত্রগণ পরশুরামের পিতাকে বধ করেন। এই কারণে পরশুরাম ক্ষত্রিয়-বধে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক ক্ষত্রিয় পলায়ন করেন, এবং উপবীত ত্যাগ করিয়া, গুপ্তভাবে ম্লেচ্ছের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের বংশে উত্তরকালে হিদরী নামে এক জন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিদরীর দ্বাদশ পুত্র হইতে বারটী বংশের সৃষ্টি হয়। ইহারই এক বংশে হরিদাস বা হাড়িয়া মণ্ডলের উৎপত্তি। হরিদাসের স্ত্রী হীরা শাপগ্রস্তা পার্ব্বতী ছিলেন। এই পার্ব্বতীর গর্ভে মহাদেবের সংযোগে বিশ্বসিংহের জন্ম।' প্রসিদ্ধনারায়ণ ও খড়্গনারায়ণের বংশাবলী পুস্তকে উপরি-উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে।

কোচবিহার, বিজনী, দরঙ্গ, বেলতলা ও সাতগাঁয়ের রাজবংশ এই বিশ্বসিংহের

বংশধর। জলপাইগুড়ির বায়কত-বংশ বিশ্বসিংহের ভ্রাতা শিষ্যসিংহ হইতে উৎপন্ন। বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডল ও মাতামহ হাজো, মতান্তরে রমা, উভয়েই রাজা ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কোচবিহারের ইতিহাস ও উপরি-উক্ত বংশাবলী পুস্তকে হাজোর কোনও উল্লেখ নাই। মার্টিন তাঁহার 'ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাজা হাজো (The valiant chief) কর্ত্তৃক মুসলমানেরা রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চল হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, গৌড়েশ্বর জালালুদ্দিনের (যদু) ভয়ে, ১৫শ শতাব্দীতে, অনেক হিন্দু কামরূপ রাজ্যে আসিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের মতে, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে তাৎকালিক গৌড়ের অধিপতি মজফর শাহ কর্ত্তৃক, অনেক হিন্দু রাজা বিনষ্ট ও সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন,—রাজা হাজো (a famous leader) কাছাড়ীদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন; * পূর্ব্বে রঙ্গপুর, আসাম, ত্রিপুরা ও কাছাড় লইয়া কাছাড় রাজ্য গঠিত ছিল। † অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের 'কোচাড়' নাম অবগত ছিলেন। ‡ দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসিগণ এখনও 'কোচাড়' দেশের নাম ভুলেন নাই। কোনও এক সময়ে কুশী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ, নেপালীগণের নিকট কাছাড় নামে পরিচিত ছিল।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে, মোদাগিরির (মুঙ্গের) পরে, এক কৌশিকী-কচ্ছ দেশের নাম আছে। পারস্যাক্ষরে লিখিত 'কোছাড়' ও 'কোচাড়' শব্দের অনৈক্য অতি সামান্য। স্থানীয় নামের স্থলে, অর্থাৎ ব্যাকরণ-সম্মত শব্দ না হইলে, পারসী নকলকারকের পক্ষে মূলের শুদ্ধতা রক্ষা করা প্রায় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। কাছাড় ব্রিটিশ শাসনাধীন হইবার পরেও হেড়ম্ব দেশ নামে পরিচিত হইত। কাছাড়ী জাতির নাম হইতে কাছাড় জেলার নামকরণ হইয়াছে। কাছাড়ীরা মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে কাছাড় অঞ্চল 'ত্রিবেগরাজ্য' নামে পরিচিত ছিল। সে সময় কাছাড়ীরা অপেক্ষাকৃত উত্তরে বাস করিতেন। § পুরাণোক্ত

* আইন-ই-আকবরী ১ম, ৪১০ পৃঃ টীকা।

† বিশ্বকোষ, কাছাড়।

‡ Mr. Glazier's Report. Eastern India III. P. 420.

§ বিশ্বকোষ। রাজমালা ১৪ পৃঃ। Gait's 'History of Assam' P. 242.

হেড়ম্ব দেশ এখন নাগা-হিলের অন্তর্গত। আসামে এখনও 'হোজাই কাছাড়ী' নামে এক জাতি বাস করে।

রাজা মানসিংহের কোচবিহারে আগমন (১৬শ শতাব্দীতে) প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'কোচাড়' নাম, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন 'কাছাড়' হইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে মানসিংহের বর্ত্তমান কাছাড় পর্য্যন্ত গমনের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বুকাননের মতে 'কোচবিহার' ও 'কোচাড়' (Kuch-vihar বা Kochar) ভিন্ন নহে। হাজোর সমসময়ে ও পরে, উত্তর-ময়মনসিংহ কোচরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ইহা প্রকৃত হইলে হাজো অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ, পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যহীন হইয়া, উত্তর-পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, মনে করা কষ্ট-কল্পনা নহে।

নীলাম্বরের পর কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, যে সময় ভূঁইয়া রাজাদের কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, সেই সময় কোচরাজগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছিলেন। ভূঁইয়া বা ভৌমিক নামক সামন্ত রাজপদ, গৌড়ের চক্রবর্ত্তী পাল-রাজগণের সময় হইতে মোসলমান আমল পর্য্যন্ত, কোনও না কোনও প্রকারে বিদ্যমান ছিল। ভূঁইয়া রাজপদ কোনও বংশবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। কোচরাজ হরিদাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যদিও অস্পষ্ট, কিন্তু তিনিই যে কোচ-রাজত্বের স্থাপন-কর্ত্তা, ইহা নহে। "তাবকাত-ই-নাশেরী" পুস্তক-পাঠে, (১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) উত্তরবঙ্গে কোচ বা মেচ জাতির উন্নতাবস্থা জানা যায়। তাঁহাদের দলপতি বা রাজা, বক্তিয়ার খিলিজির তিব্বত-অভিযানকালে পথপ্রদর্শক ছিলেন। *

বৌদ্ধ পালরাজগণ ৮ম শতাব্দীর শেষ হইতে ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, সমগ্র গৌড়দেশে বা তাহার খণ্ডবিশেষে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোচের রাজা গৌড়েশ্বরের করদ ছিলেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কামরূপে ভগদত্ত-বংশীয় রাজারা প্রবল ছিলেন। † উক্ত বংশের অবনতিকালে কোচ জাতি প্রবল হইয়া উঠেন। ৯ম শতাব্দীর আরবীয় বণিক সোলেমান কামরূপের পরে 'কসবান' দেশের নাম করিয়াছেন। টড্ কসবান বলিতে 'কচ' দেশ মনে করিয়াছেন; উহা 'কোচ' দেশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

---

* তাবকাত-ই-নাশেরী। Stewart's History of Bengal, Pages 51, 55. রিয়াজ-উস-সালাতীন; ৫১ পৃঃ।

† গৌড় ইতিহাস, ৬৭ পৃঃ, ১৪৩ পৃঃ।

"খোরসেদ-জাহা-নামা" নামক পারস্য পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২৩ শত বৎসর পূর্ব্বে কোচ প্রদেশের সঙ্গলদিপ বা সাঙ্গলদেব নামক জনৈক হিন্দু রাজা শিবালিক-পর্ব্বতবাসী কেদারকে পরাজিত ও বঙ্গবিহার অধিকার করিয়া গৌড়-নগরের পত্তন করেন। * ফেরদৌশী-কৃত বর্ণনায়, ৪র্থ শতাব্দীর পারস্য সম্রাট বাহারাম গোরের প্রসঙ্গে, সাঙ্গলদেবের নাম আছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ভগদত্ত-বংশীয় রাজা ছিলেন। ভগদত্তের বংশে ৭ম শতাব্দীতে ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের রাজা হন। তিনি কোচবংশোদ্ভব বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ হইতে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে, পাঞ্জাবে হুণ জাতিরা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহাদের জনৈক রাজার নাম কেদার ছিল। তিনি গৌড়বিজেতা ও লক্ষ্মণ-উদয়াদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারই নামানুসারে গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম হইয়াছে, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। ইত্যাদি কারণে সাঙ্গলদেবের আবির্ভাব-কাল, ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে। খৃঃ-পূঃ ৩য় শতাব্দীর গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়, Scyritæ (কিরাত) ও Casyri (কসেরা) জাতির নাম আছে। কিরাত জাতি কামরূপের অধিবাসী। 'কসেরা' শব্দ 'কোচ' নামের রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। † যে দিক দিয়াই হউক, কোচ জাতির উন্নতাবস্থা নিতান্ত আধুনিক সপ্রমাণ হয় না। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদাস মণ্ডল তাঁহাদের দলপতি বা রাজা ছিলেন। হরিদাস মণ্ডল (a Mech chief ‡) গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত খুটাঘাট পরগণার চিকনা গ্রামে বাস করিতেন। স্বজাতির দ্বাদশটী শ্রেষ্ঠ বংশের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল। তিনি হাজোর, মতান্তরে রমার কন্যা হীরা-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। এই সময়ে কামতাপুরের সেন-বংশীয় রাজারা পশ্চিম কামরূপের চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন।

বিশ্বসিংহের জন্মের পরে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ কর্তৃক কামতাপুরের পতন

---

* "This has been touched on before, so we begin the history of the great Koch tribe at the rise of one Shankaldip, a koch chief."—*History of Upper Assam. P. 20.*

† মেগাস্থিনিসের টীকা, ১২৫, ১৮৯ পৃঃ। Cosyri (কসেরী) জাতি হিমালয়-উপত্যকাবাসী।

‡ Hunter's "Statistical account of Cooch Behar" P. 363.

ঘটে। বুকাননের মতে, কামতাপুর-ধ্বংসের পরে, চন্দন ও মদন নামে দুই ভ্রাতা, কামতাপুরের ৩০ মাইল উত্তরে, মুরলাবাস নামক স্থানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্ব অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যাহাই হউক, কোচ জাতি কর্ত্তৃক খেনরাজ্য আক্রান্ত হইয়া অরাজকপ্রায় হইয়াছিল। কোচরাজগণ প্রথমতঃ স্ব-স্ব-প্রধান ছিলেন, পরে একত্রিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন। * কামতাপুরের তাৎকালিক মুসলমান শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহের পুত্র দানিয়েল শাহ (মতান্তরে নশরত শাহ) কোচ জাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। † উক্ত ঘটনার প্রতিশোধ উপলক্ষেই হউক, কিংবা রাজ্যবিস্তারলোভেই হউক, পরবর্ত্তী কোচরাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের মধ্যে মুসলমানেরা কয়েকবার কোচ ও আসাম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা বিশ্বসিংহের রাজ্যবিস্তারের কোনও হানি হয় নাই। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের সময় উল্লিখিত আক্রমণের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নরনারায়ণ নিজ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সাহায্যে কোচরাজ্য পশ্চিমে কুশী ও গঙ্গাতীর, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা, লুসাই পাহাড় ও মণিপুরাদি সহ সমগ্র আসাম ও ভোটরাজ্য সেই সময় কোচরাজ নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিত।

মহারাজ বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ, তাঁহাদের সমসাময়িক মুসলমান রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ‡ মহারাজ নর-নারায়ণের অভিযানে যে সমস্ত সৈন্য গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রায়-কতের (জলপাইগুড়ির রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) অধীনে এক দল শক্তিশালী স্থানীয় যোদ্ধা ছিল। ১৪শ শতাব্দীতে মালেক খসরুর অধীনে, দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তোগলক চীন-বিজয়ের নিমিত্ত যে লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহা এই কামরূপবাসীর হস্তেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য কামরূপ দেশের রত্নপীঠের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। ১২শ শতাব্দীর ভারত-ত্রাস মহম্মদ বক্তিয়ারের বীরলীলা, এই কামরূপ রাজ্যে আসিয়াই সংবরিত

---

* Martin's Eastern India, P. 413.

† গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ। মতান্তরে, তিনি হাজোতে হত হন।

‡ Gait's 'Kooch king of Kamrup', P. 27. আসামবুরুঞ্জি, ৩০ পৃঃ।

হইয়াছিল। গৌড়ের পাল ও সেন-রাজগণের (৮ম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ; সুদীর্ঘ কালের আধিপত্য দ্বারাও কামরূপে কোচরাজত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। পাল ও সেনরাজগণের সময় কামরূপের খণ্ডবিশেষে কোচ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। * ১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ৩০০ বৎসর কালের মধ্যে পাঠান ও মোগলরাজগণ কর্ত্তৃক অন্যূন ১৬ বার আক্রান্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশী ভোট ও আহম জাতির অনবরত উৎপাতের মধ্যে, সিংহাসন রক্ষা করিয়া কোচ জাতি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

বর্ণ

কোচ নামে পরিচিত জাতি মূলে কোন্ বংশ হইতে উৎপন্ন, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান ; আজ পর্য্যন্ত তাহার আলোচনা বিরাম লাভ করে নাই। ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ারের ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার অংশে দেশীয় রাজ্যের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশ 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কোচ জাতির মূলতত্ত্ব-নির্ণয়ে বিস্তর শ্রমস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ আকৃতি, আচার ব্যবহার, ভাষা, খাদ্যাখাদ্য, ধর্ম্ম ও আদিম কালের ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্যে, এই জাতি আর্য্য কি আদিম অধিবাসী, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

মিঃ রিজলির (পরে সার হারবার্ট রিজলি) মতে কোচ জাতি এখন রাজবংশী নামে পরিচিত, রাজবংশীরা দ্রাবিড়-বংশীয় ; তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মিঃ হডসন্ ও ডাঃ ল্যাথামের মতে, কোচ বা রাজবংশী জাতি মঙ্গোলীয় বংশীয়, তুরেণীয় অথবা অনার্য্য বংশসম্ভূত, এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। কর্ণেল ডেল্টন্ বলিয়াছেন,—রাজবংশীরা কৃষ্ণকায়, এবং কোচেরা মোটা-ঠোঁট-বিশিষ্ট ও নিগ্রোদের ন্যায় তাঁহাদের চোয়াল আছে। মিঃ ওল্ডহামের মতে, রাজবংশী জাতি দেখিতে দ্রাবিড়বংশীয়। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল কোচ জাতিকে নিগ্রো জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। মিঃ বিভার্লি লিখিয়াছেন,—কোচ জাতি দ্রাবিড়-বংশসম্ভূত ভূঁইয়া শাখার অন্তর্গত। বুকানন বলিয়াছেন—যদিও সমস্ত রাজবংশী কোচ নহে, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রফেসার ফ্লাওয়ারের মতে ভারতীয় আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি, মূলে ককেশীয় বংশ হইতে উৎপন্ন। রোগাজিন বলিয়াছেন—

* তাবকাত-ই-নাসেরী। রিয়াজ-উস-সালাতীন। Stewart's History of Bengal.

দ্রাবিড়গণ আর্য্য হিন্দুগণের প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্য জাতি। এঃ কর্জ্জনের মতে, দ্রাবিড় জাতি আপনাদিগকে কখনও অহিন্দু বলিয়া পরিচিত করেন নাই। জনৈক বাঙ্গালী লেখক বলেন,—কোচ জাতি প্রাচীন নাগ জাতির একটী শাখা। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে, কোচ জাতি প্রাচীন 'কম্বোজ' জাতি হইতে উৎপন্ন। * আলোচনা-স্থলে এই সকল পণ্ডিতের মতই সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

আধুনিক জাতি-তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত হারবার্ট রিজলি লিখিয়াছেন,—নেপাল, পূর্ব্বোত্তর বঙ্গ, আসাম ও হিমালয় প্রদেশবাসিগণের মধ্যে মঙ্গোলীয় ভাব খুব প্রবল। তাঁহার মতে, বাঙ্গালী-শরীরে বেহারী অপেক্ষা আর্য্য শোণিত অনেক অল্প, এবং মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় শোণিত অনেক অধিক; † অর্থাৎ, অধিকাংশ বাঙ্গালীই দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ আর্য্য শোণিত পঞ্জাবাদি পশ্চিম দেশ ব্যতীত পাইবার উপায় নাই। ‡ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ আনাণ্ডেল কলিকাতা মিউজিয়মে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কলিকাতার অধিবাসিগণকে নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়-বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ ক্রুক নামক আর এক জন সিভিলিয়ান, রিজলির মতের সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহার "The Natives of Eastern India" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সামান্যসংখ্যক লোকের নাক ও মস্তকের মাপ গ্রহণ দ্বারা, কোনও বৃহৎ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সেই সমস্ত জাতির মধ্যে যখন অন্য জাতির রক্ত সঞ্চারিত হয়, তখন তাহাদের মূল উদ্ধার কঠিন হইয়া পড়ে। পাইওনিয়ার পত্রের (১৯১১ খৃঃ ৫ই জুন) সম্পাদকীয় মন্তব্যে রিজলির উল্লিখিত সিদ্ধান্ত, হঠ-কারিতা-প্রসূত অনুমান (rash assumption) বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঐ সব মত গ্রহণ করিতে বিশেষ সাবধান করা হইয়াছে।

জাতিতত্ত্ব-বিদ্যা (Ethnology) বিগত শতাব্দীর একটী উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় আবিষ্ক্রিয়া, কিন্তু উহা এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। জাতি (race) নির্ণয় দূরে থাকুক, মানবজাতি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, এখন পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নই অমীমাংসিত রহিয়াছে। তৎসংক্রান্ত শিক্ষা বা উপদেশাদি (anthropology) অবলম্বনে প্রফেসর সেস একটী সুচিন্তিত

* গৌড়রাজমালা পৃঃ ৩৭।

† Risley's Tribes and Castes of Bengal IXXXi.

‡ " " " " " " " IXXXiXXL.

সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানব-শরীরের উচ্চতা, অস্থি, করোটি, মস্তিষ্ক, দন্ত, নাসিকা, চক্ষু, কেশ, লোম, চর্ম্ম, বর্ণ ও ব্যাধি প্রভৃতির প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া, জাতিতত্ত্ব-বিস্তার প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি আপাততঃ অগ্রহণীয় বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। * ভারতের গৌরবস্থানীয় রাজপুতনার ছত্রিশটী ক্ষত্রিয় রাজকুল শক জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কর্ণেল টড্ রাজস্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † দক্ষিণ ভারতের মালবার প্রদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজ দৃষ্টে এক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,—"এই সকল ব্রাহ্মণের যাহা মূর্ত্তি দেখিলাম তাহাতে আর্য্যরক্ত ইহাদের দেহস্থ ধমনীতে বিন্দুমাত্রও আছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। * * * * * ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত, অথবা ব্রহ্মার তেজে উৎপন্ন বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, দক্ষিণাবর্ত্তে আসিলে তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এক দিনেই অপনোদিত হইতে পারে।" ‡ জাতি-তত্ত্ববিদ্ কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন, শারীরিক বর্ণ কোনও জাতির নিজস্ব হইতে পারে না; বিশুদ্ধ শোণিত ও অনুকূল জলবায়ুর উপরেই তাহা অধিকমাত্রায় নির্ভর করে; যথা, সুমেরু-বৃত্তের নিকটবর্ত্তী দেশবাসী মানবের বর্ণ, বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশে অবিকৃত থাকিতে পারে না। প্রমাণ-সংগ্রহ করিতে গেলে এই সমস্ত নির্দ্ধারণও মূল্যহীন হইয়া পড়ে। কামস্কাট্কা ও লাপলাণ্ড দেশের সব

---

* "But it must be remembered that the science of ethnology is still in its infancy. It is one of the many sciences of which the nineteenth century has witnessed the birth, and among these sciences it is one of the youngest. Its students have already collected a large mass of materials upon which to build its superstructure; but these materials belong rather to the physiological framework of man and the external influences that surround him than to the more subtle forces of the moral and intellectual world. These latter are difficult to seize, distinguish, and arrange, and it will be long before the facts connected with them can be ascertained with the same amount of certainty as the relative size of the skull or the number of convolutions in the brain. For the present, at least, we must be content with those racial characteristics which can be seen and handled, measured or weighed: the scientific appraisement of the mental and moral characteristics which even now we may fancy we can trace must be left to the care of the future."—'*The races of the old testament*' *chapter I. p. 27.*

† রাজস্থান ১ম, ৫ম, অঃ।

‡ ভারতী পত্রিকা ১৩০৪, ১১১ পৃঃ।

জাতি শ্বেতবর্ণ নহে। গ্রীনলণ্ডের এস্‌কুইমো জাতি কৃষ্ণবর্ণ; আবার সাহারা মরুভূমির নিকট বহুকাল বাস করিয়াও টুরেগ জাতি দিব্য শ্বেতবর্ণ। সমস্ত আর্য্যজাতি এক বর্ণের ছিলেন না। * ভারতীয় আর্য্যজাতি বহু বংশে ও বহু বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। কণ্বংশীয় আর্য্যেরা শ্যামবর্ণ ছিলেন। † আর্য্যবংশীয়দের ভারতে উপনিবিষ্ট হইতে বহু সময় আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহাদের কোন্ দল কোন্ সময় কি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা এখন প্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। কোচ জাতি দ্রাবিড় জাতির একটী শাখা বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রাবিড় জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। বহু কাল পূর্ব্বে, মধ্য-এসিয়ার পুরাতন-ভাষাভাষী কতকগুলি লোক, সিন্ধু প্রদেশের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া দ্রাবিড় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক পরে আর্য্য নামে পরিচিত সম্প্রদায়ও এই মধ্য-এসিয়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ‡ মনু, দ্রাবিড় ও কম্বোজ জাতি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়াই মনে করিতেন। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতি-গুলির আদিপুরুষ কেহই বাঙ্গালার পুরাতন অধিবাসী নহেন। তাঁহারা কান্য-কুব্জ, অযোধ্যা, বারাণসী, মগধ, মহারাষ্ট্র, দ্রবিড়, মধ্যভারত ও উৎকল প্রভৃতি দেশ হইতে আগত। কোচ জাতি অনুগঙ্গ প্রদেশ হইতে হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। ইঁহাদের আক্রমণে বাধ্য হইয়া পুণ্ড্র দেশের অধিবাসীরা দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। § কোচ জাতির এতদঞ্চলে আগমনের পূর্ব্বে, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব পার্ব্বত্য পথে, এক (মঙ্গোলীয়) জাতি আসিয়া পুণ্ড্র রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং পরিণামে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্ত দেশে বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহারাই পৌদ। ইহা কত কালের ঘটনা, নিশ্চয় করা কঠিন। কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল অবস্থায়, মঙ্গোলীয়দের পুণ্ড্র দেশে আগমন অবধারণ করেন। যাহাই হউক কোচেরা পৌদ জাতিকে বিতাড়িত করিয়া অধিক দিন নিরাপদে কাটাইতে পারেন নাই। মঙ্গোলীয় জাতির পথ অবলম্বনে, ভড় নামে এক পরাক্রান্ত জাতি আসিয়া পুণ্ড্র রাজ্য জয় করেন, এবং উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকেন। যৌধেয় ও তাঁহাদের সম্পৃক্ত আভীর জাতি কর্ত্তৃক পুণ্ড্র রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই আক্রমণ ভড় জাতির

* 'The races of the old testament', p. 22.

† ঋগ্বেদে ৮মঃ ১৯ সূঃ ৩৭, ১০মঃ ৩১ সূঃ ১১।

‡ Imperial Gazetteer VI. P. 327. ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জাতি, ৪ পৃঃ।

§ গৌড়ের ইতিহাস, ১ খণ্ড, ৪৫, ৬৪ পৃঃ।

আগমনের পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন। আভীরদিগের পূর্ব্বে উড়ুম্বর জাতি পুণ্ড্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পরে ভোজ-গৌড়গণ পুণ্ড্র দেশের রাজা হন। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে শবর জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কোলরীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলা হয়; দশকুমারচরিতে ইঁহাদের বিবরণ আছে। এই সব আক্রমণের পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সেই সময় পুণ্ড্র রাজ্য বলিতে পরবর্ত্তী কালের করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই কেবল বুঝাইত না। পরবর্ত্তী কালের কামতাপুর ও কোচবিহার রাজ্য সময় সময় পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। * পণ্ডিতগণের মতে, পূর্ব্বোক্ত মঙ্গোলীয় জাতির সহিত কোচ জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংস্রব হেতু উভয় জাতির মধ্যে রক্ত-সংস্রব ঘটিয়াছিল। † কোচ জাতির বর্ত্তমান আকৃতি তাহার সমর্থন করে। এই প্রকারের আকৃতি-পরিবর্ত্তন এ কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কোচবিহার, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের যে কোনও শ্রেণীর মুসলমানের সহিত স্থানীয় হিন্দুর আকৃতিগত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। নবদীক্ষিত মুসলমানের সহিত বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মুসলমানের রক্ত-মিশ্রণ, এই পার্থক্য-সৃষ্টির কারণ।

বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে বৈদিক হিন্দু ও জৈন ধর্ম্মের প্রচার ছিল। কামরূপে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ, অর্থাৎ চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েনসাঙ্গের আগমন কাল পর্য্যন্ত হিন্দু মত প্রবল ছিল। ক্রমান্বয়ে জৈন ও বৌদ্ধ মতের বিস্তারের ফলে, আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক ব্রাহ্মণসমাজের চক্ষে বঙ্গদেশ নিতান্তই হীন ছিল। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাভাব পরবর্ত্তী কালে বিবিধ আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জন বাঙ্গালীর সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, এবং ৪টী শাখার মধ্যে ২টীর কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের দেবকোট (দিনাজপুরের নিকট) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। মহাবীরের প্রশিষ্য জম্বুস্বামী, উক্ত অঞ্চলে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৬৩ অব্দে দেবকোটে দেহত্যাগ করেন। অশোকের সভায় কামরূপের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। হিউয়েনসাঙ্গের কামরূপ-আগমনের ফলে, (খৃঃ ৬৩৮) তদ্দেশে বৌদ্ধ মতের রীতিমত প্রচার আরম্ভ হয়। তাৎকালিক কামরূপ রাজ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ

* গৌড়ের ইতিহাস, ২য়, ১১৩ পৃঃ। বিশ্বকোষ।

† গৌড়ের ইতিহাস, ৬৩, ৬৪ পৃঃ।

করিয়াছিলেন। হিউয়েনসাঙ্গের পরে (৭৪৭ খৃঃ), বৌদ্ধ যতি শান্তিরক্ষিত, এবং উত্থানদেশবাসী যতি পদ্মসম্ভব, তিব্বত রাজ খ্রি-স্রোঙ দেউ-চন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্মসম্ভব পথিমধ্যস্থ পার্ব্বতীয় জাতির দেবদেবীগুলিকে বৌদ্ধ দেবদেবীর শ্রেণীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের উপযোগী উপাসনা-প্রণালীর সৃষ্টি করেন। পরে শান্তিরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলও তিব্বতরাজের আহ্বানে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সময়েই পূর্ব্বোত্তর ভারতে বৌদ্ধ মতের বহুল প্রচার আরব্ধ হয়। পালরাজগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের চক্রবর্ত্তিত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে কামরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁহাদের রাজত্বকালে বা সমসময়ে, কামরূপে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের দ্বারা জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাজা কামরূপে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ-স্থাপন ও ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম কামরূপে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের এবং ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। *

পাল-রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল; তথাপি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রগাঢ় চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্ম বলিয়া জনসমাজে প্রকৃত বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইতে পারে নাই। তাৎকালিক বৌদ্ধ প্রচারকগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের উপযোগী বিগ্রহ-পূজা ও বিবিধ উৎসবের সৃষ্টি করেন। কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার মত উত্তরবঙ্গে বহুলরূপে প্রচার হইতেছিল। এই সময় ভারতের বহির্ভাগ হইতে কোনও কোনও বিগ্রহ আনীত হয়। প্রান্ত-সীমাবর্ত্তী পর্ব্বতীয় জাতিগুলিকে বৌদ্ধ মতে আনয়নের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সৃষ্টি হইয়া বৌদ্ধবিহারাদিতে স্থান লাভ করে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত গৌড়দেশে বিস্তৃত হয়। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গৌড় জনের মধ্যে যা কিছু বৈদিকাচার হোমার্থ অগ্নিস্থান। অবশিষ্ট ছিল, এই সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের অবস্থায়, ঐ সমস্ত বৌদ্ধবিগ্রহ ও উৎসবাদি রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। মহাকাল, চামুণ্ডা, রথযাত্রা, দীপালী, ধর্ম্মপূজা, শীতলা, তারা, কালী, চণ্ডী, স্নানপূজা, কালভৈরব, তিস্তা, কামাখ্যা ও করতোয়া ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের মান্য বৌদ্ধোৎসব ও দেবদেবীগুলিকে হিন্দুরা ক্রমশঃ আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বের শেষাবস্থায়, এবং হিন্দু সেনরাজগণের অভ্যুদয়কালে,

* সাহিত্য; ১৩১৪, ৫৪৫ পৃঃ।

শেষোক্ত পরিবর্তনের আরম্ভ হইয়াছিল। বল্লালসেন নিজেই চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। উল্লিখিত দেবদেবীগুলির মধ্যে মহাকাল ধর্ম্মরূপী বুদ্ধের দ্বারপাল ছিলেন। তারাদেবী বিদেশ হইতে আনীতা। হাড়ি ও ডোম জাতি প্রথমে ধর্ম্মের পূজক ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা উহা হিন্দুমতে আনয়ন করেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পূজকদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া নিজেরাই পূজকের স্থান অধিকার করেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত গাজলের কালীর এখনও হাড়ি পুরোহিত; এই কালী রূপান্তরিতা বৌদ্ধদেবী। পাল-রাজগণের সময় মহাকালের উপাসনা বৌদ্ধতান্ত্রিক সমাজে প্রবেশ লাভ করে। ভোটানের বৌদ্ধ-সমাজে এখনও মহাকালের পূজা প্রচলিত। দ্বাদশ চণ্ডীর মধ্যে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বাইহোরাণী নামক সুবিখ্যাত চণ্ডীর এখনও কোচ পূজারী বিদ্যমান। এই চণ্ডী এখন হিন্দুদেবী। অন্য জাতির পূজা ও বলি কোচেরাই তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। অপরের তাহাতে অধিকার নাই। *

বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুর অননুমোদিত কূর্ম্ম ও বরাহ ভক্ষণাদি, তান্ত্রিকতার প্রবল অবস্থায় কামরূপের হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। † বুদ্ধের শূকর-মাংস-ভক্ষণের প্রবাদ হইতে তান্ত্রিকসমাজে বরাহভক্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। নেপালের কোনও কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা-গ্রহণকালে এখনও বরাহ-মাংস ব্যবহৃত হয়। ‡ অন্যান্য জাতির অবস্থা যাহাই হউক, উত্তর-বঙ্গের কোচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট চিহ্ন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত ভক্ষ্যবস্তু, জাতীয় উৎসব ও উপাস্য দেবদেবীগুলি, তাঁহাদের অতীতপ্রায় বৌদ্ধ-জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গের অন্যান্য জাতির তুলনায় কোচ জাতি অধিকমাত্রায় বৌদ্ধভাবাপন্ন থাকিবার কারণ অতি সুস্পষ্ট।

হিন্দু ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক সেনরাজগণের প্রভাব, কোচ অধিবাসীর দেশে (কামরূপ) তেমন ভাবে বিস্তারলাভ করে নাই। পাল-রাজগণের ন্যায় তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য কোনও স্থায়িচিহ্ন কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আধিপত্যকালও তুলনায় পালরাজগণের অপেক্ষা অনেক কম ছিল। যে কোনও মত বা শিক্ষার কথা মনে করা যাউক না কেন, রাজকীয়

* গৌড়ের ইতিহাস; ৫৮, ৬০ পৃঃ।

† যোগিনীতন্ত্র; ২য় ভাগ; ৯ পটল ১৬। "হংস পারাবতং ভক্ষ্যং কূর্ম্মং বারাহমেব চ।"

‡ সাহিত্য পঃ পঃ, ১৭শ ভাগ, ২য়, ১১০ পৃঃ।

প্রভাবে তাহা যত শীঘ্র প্রসার লাভ করিতে পারে, কালস্রোতে হইতে গেলে তাহার বহু গুণ সময় আবশ্যক হয়। গৌড় বা বঙ্গদেশে যে সমস্ত হিন্দুরাজা বৈদিক-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ছিলেন, তন্মধ্যে আদিশূর এক জন। তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইয়া সুদূর পশ্চিম হইতে বেদাচারী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহা ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভ বা মধ্যভাগের ঘটনা। শঙ্করাচার্য্যের কামরূপ-আগমনও প্রায় এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ পাল-রাজগণের রাজত্বকালে আদিশূরের কৃত কার্য্যের ফল, উত্তর-বঙ্গে ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতেছিল। আদিশূরের দৌহিত্র-বংশীয় সেন-রাজগণের গৌড়দেশে আধিপত্যকালে, হিন্দুধর্ম্মস্থাপনের যে পুনরুদ্যোগ আরব্ধ হয়, আজ পর্য্যন্ত তাহা বিরাম লাভ করে নাই। যে সমস্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিজয় সেনের রাজত্বকালে (১০৭৯—১১১৯ খৃঃ) তাঁহারা আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত বল্লাল সেনের আমলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক্রমে বৌদ্ধ-বিদ্বেষে পরিণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধাচার পরিত্যাগ করেন নাই, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। তিনি বরেন্দ্রবাসী এক শত ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া, আর সকলকে ভোট, দরঙ্গ, উৎকল, মগধ ও মোরঙ্গে (পূর্ণিয়ার উত্তর) প্রেরণ বা নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন।* বল্লালসেন নিজে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন ; বৌদ্ধরাও তাঁহাকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাঁহার লক্ষ্যস্থানীয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও নীচ শ্রেণীর লোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা প্রথম প্রথম হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের সহায় সম্পদ ছিল, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বসমাজ-লাভে বিশেষ কোনও বাধা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা পরে হিন্দু হন, এবং সহায়হীন ছিলেন, তাঁহারা সমাজে অপেক্ষাকৃত নীচে স্থান লাভ করেন।† অনেকের মতে, এই কারণেই বৈদ্য জাতির পতন ঘটে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণেও অনেক জাতি বল্লালসেন কর্ত্তৃক সমাজের উচ্চে ও নীচে স্থান লাভ করিয়াছেন।

* গৌড়ের ইতিহাস ; ১৭০, ১৮১ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ; ১৮৭ পৃঃ।

কথিত আছে, ঋণদানে অস্বীকৃত হওয়ায় বৈশ্য—সুবর্ণবণিক জাতি বল্লালসেনের আদেশে অবনমিত হইয়াছেন। যোগী জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও নাকি বল্লাল-বিদ্বেষের ফল। কার্য্যবিশেষে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কৈবর্ত্ত জাতির এক শাখার জল আচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কারণবিশেষে ডোম-জাতীয়া একটী রমণীকে তিনি উচ্চ সমাজে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রতিবন্ধকতায় সফলকাম হইতে পারেন নাই।

এই শ্রেণীর নীচ জাতিগুলির অবস্থা পূর্ব্বে এত মন্দ ছিল না; সম্ভবতঃ বৌদ্ধমত-পরিত্যাগে বিলম্ব করাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। উড়িষ্যা দেশে বাউরী জাতিরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতেন। পরবর্ত্তী সেন রাজগণের আমলে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ধন-প্রাণ হরণ করিলে কোনও দণ্ডভোগ করিতেন না। এই অত্যাচার এত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, হিন্দু রাজগণের নবাগত শত্রু মুসলমানগণকে বৌদ্ধেরা 'ধর্ম্মরূপী' বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে—"ধর্ম্ম হইল যবন রূপী, মাথা অত কালটুপী, হাতে শোভে ত্রিকচ কামান। চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদা-অ বলিআ এক নাম" *। সেন রাজগণের সমাজ-বন্ধন বা বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ও নবাগত মুসলমানগণের সংস্রব-ভয় হইতে দেবীবর মিশ্র কর্ত্তৃক মেল-বন্ধনের সৃষ্টি। তাঁহার মতে, মুসলমান ও নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত সংসৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দোষযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এইরূপে অধিক-দোষগ্রস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিচারে 'ছাটা বংশজ' নামে পরিচিত হন। অল্প দোষে দোষিগণকে লইয়া তিনি 'মেল' বন্ধন করেন। উক্ত হেতুবাদে কোচ-সংস্রবহেতু, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 'বিজয় পণ্ডিতি' মেলের সৃষ্টি হয়। † বঙ্গের সদ্গোপ, তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায়, গন্ধবণিক প্রভৃতি বৈশ্য জাতি, হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও আর বৈশ্যত্ব পান নাই। তাঁহাদের কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্যমূর্ত্তি সদ্ধর্ম্মনিরঞ্জনের স্তব থাকায় বোধ হয়, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কামরূপের কলিতা জাতি বৌদ্ধ কোচ জাতির পৌরোহিত্য করিতেন। এখন হিন্দু হইয়াও আর পূর্ব্ববৎ আর্য্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছেন না; সমাজে অনেক নীচে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বর্ণিত মহাভারতোক্ত মল্ল ক্ষত্রিয়গণ অত্যধিক বুদ্ধভক্ত ছিলেন; ইঁহারা এখন ব্রাত্য শ্রেণীতে অবনমিত। ক্রমশঃ।

শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ।

* ধর্ম্মমঙ্গল।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ২০০-৫ পৃঃ।

প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান।

উদ্ভিদই উদ্ভিদের অস্তিত্বের কারণ-স্বরূপ। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম—সকল উদ্ভিদই পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জীবিত রাখিতেছে, বর্দ্ধিত হইবার উপায় করিয়া দিতেছে। ডারউইন সাহেবের একটী মত আছে—'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' (Survival of the fittest)। উল্লিখিত মতের দোহাই দিয়া অনেকে অনেক রকম কথা বলিয়া থাকেন, অনেকে ভিন্নভাবে সে মতের অনুসরণ করেন। বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিলে, এ কথা মনে হয় না যে, যোগ্যতম তদধীনস্থ বা তদপেক্ষা হীনশক্তিসম্পন্নকে বিনাশ করিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার, স্বকীয় প্রভাব-বিস্তারের জন্য ব্যগ্র। ডারউইনের সংজ্ঞার্থ যদি ইহাই হইত যে, মারামারি কাটাকাটি ভিন্ন জগতে প্রতিপত্তি-লাভের উপায় নাই, তাহা হইলে দুর্ব্বল কিছুতেই পৃথিবীতে স্থান পাইত না। মারামারি কাটাকাটি করিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে? এতদুপায়ে আপাততঃ দুর্ব্বলকে পৃথিবী হইতে না হয় দূরীভূত করিতে পারা গেল, কিন্তু সংসারে ত সকলেই দুর্ব্বল নহে, সবল ও শক্তিশালী জীবও ত পৃথিবীতে আছে। অতঃপর তাহাদিগের মধ্যেই যুদ্ধ বিবাদ বাধিবে। ফলতঃ যে উপায়ে দুর্ব্বলকে বিতাড়িত করিতে হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়েই শক্তিশালীদিগের সংখ্যা হ্রাস হইবে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহা না হইয়া অন্যরূপ হইতেছে; সবল দুর্ব্বলের সহায়তা করিতেছে; দুর্ব্বলও সবলের সাহায্যের জন্য নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে। সহানুভূতি ও সহকারিতা লইয়া সমগ্র সৃষ্টি চলিতেছে। এতদুভয়ের অভাব হইলে বাস্তবিকই সৃষ্টির বিলোপ সংঘটিত হইবে। তখন রাজা প্রজাকে হনন করিবে, শৃগাল শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মানুষ হইতে আরও জীব জন্তুকে উদরস্থ করিয়া ফেলিবে, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি মহীরুহগণ পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিয়া আত্মবিলোপের পথ প্রশস্ত করিয়া লইবে, এবং তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা বা তৃণগুল্মদিগকে সৃষ্টি-রাজ্য হইতে মুছিয়া ফেলিবে। অঘটন-ঘটনপটীয়সীর প্রকৃতি বা সৃষ্টির মধ্যে ঈদৃশ নিয়ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। হিংস্র পশুগণ বনমধ্যে বাস করে; তাহারা লোকালয়ে আসিতে অভ্যস্ত নহে, আমরাও তাহাদিগের পল্লীতে গিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিতে যাই না। গগনবিহারিগণ গাছপালায় নিরাপদে বাস করিতেছে; তাহাদিগের বাসস্থানের উচ্ছেদের জন্য আমরা গাছপালা কাটিয়া দেশকে মরুভূমি করিতে প্রস্তুত নহি।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টির মূলে মারামারি কাটাকাটি নাই; সহানুভূতি ও সহকারিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

শৈশবাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় সকল জীবজন্তু, সকল উদ্ভিদ নিঃসহায়; অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুকীটদিগকে আপাততঃ আমরা অসহায় মনে করিতে পারি, অথবা তাহারা যে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, এমনও সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কি সত্যই সেইরূপ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এ কথা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। তাহারা যতই নিম্নশ্রেণীস্থ হউক, যতই স্বকীয়-শক্তিসাপেক্ষ হউক, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই প্রকৃতির মধ্যে তাহাদিগের জন্য এমনই সুব্যবস্থা করা আছে যে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহারা পারিপার্শ্বিকতার সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ক্রমে নিজ নিজ জাতির বংশধারার প্রবাহে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যথাকালে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। পৃথিবী হইতে অনেক-জাতীয় জীব, অনেক-জাতীয় উদ্ভিদ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা বলিয়া এমন মনে করা ভুল যে, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন'ই তাহার মূলীভূত কারণ। প্রকৃতির নিয়মবশে তাহা হইয়া আসিতেছে, এবং পৃথিবী ক্রমে যত পুরাতন হইতে থাকিবে, ততই নূতন নূতন জাতীয় জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির আবির্ভাব হইবে; সেই সঙ্গে কত পুরাতন জাতির তিরোভাব ঘটিবে। ভূতত্ত্ববিদগণের মুখে শুনিতে পাই —প্রাচীন যুগের কত দেশ, কত মহাদেশ সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এবং সাগরগর্ভ হইতে কত নূতন দেশের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ প্রলয় ব্যাপারে নিমজ্জিত দেশবাসী জীবজন্তু ও তরুলতা সৃষ্টিরাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার যে স্থানে নূতন দেশ ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যে সকল জীবজন্তু বা তরুলতাদি জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় স্থানীয় আবহাওয়া অবস্থানের অনুরূপ হইয়াছে। সুতরাং অন্তর্হিত ও নবাবির্ভূতের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাদের অন্তর্গত সৃষ্ট জীবজন্তু বা বৃক্ষলতাদির মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবেই। কলিকাতার যাদুঘরে গেলে কত প্রকার অন্তর্হিত অদ্ভুত জীবের কঙ্কাল নয়নগোচর হয়, কিন্তু এখন আর সে প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে' সৃষ্টির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; প্রাকৃতিক বিধানই তাহার মূল কারণ।

এক্ষণে আমরা দেখিব, 'উদ্ভিদই উদ্ভিজ্জগতের কারণ' কিরূপ? পৃথিবীর অতি শৈশবাবস্থায় একটীও উদ্ভিদ ছিল না; পৃথিবীতে বীজ উপ্ত হইবার স্থান ছিল না; পৃথিবীতে তখন মৃত্তিকারও আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কালের মধ্যে পৃথিবীময় কত প্রকারের গাছপালা জন্মিয়াছে, রাশি রাশি ভূমি দুর্গম অরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে, রাশি রাশি ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কত কোটী কোটী মণ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, এবং সেই অপরিমেয় শস্যাদি দ্বারা কোটী কোটী নর নারী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রতিপালিত হইতেছে! এ সকলের মূলে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র উদ্ভিদ! পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় ধরিত্রী-পৃষ্ঠে কেবল বারিধি ও প্রস্তরপিণ্ড বা পর্ব্বতরাশি ব্যতীত কিছুই ছিল না, ইহা যেন স্মরণ থাকে। কালের প্রভাববশে পিচ্ছিল প্রস্তরগাত্রে লোমকূপসদৃশ ক্ষুদ্র ছিদ্র, কোথাও বা ফাটল উৎপন্ন হয়। এই সুযোগে কোনও অজ্ঞাত মহাপুরুষ দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরাল হইতে শৈবালাদি প্রাথমিক উদ্ভিদের বীজ নিক্ষেপ করেন,—ইহারাই উদ্ভিদ-জগতের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল উদ্ভিদ ব্যষ্টিভাবে চক্ষুর অগোচর বস্তু হইলেও, সমধিক বৃদ্ধিশীল, অপুষ্পক হইলেও জননশীলতায় অনুপমেয়। ইহারা আত্মদেহ বিভক্ত করিয়া বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অমোঘ শক্তি ধরে। ইহারা এক দিকে যেরূপ বৃদ্ধিশীল, অন্য দিকে সেইরূপ স্বল্পায়ু; সুতরাং ইহাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ নিবন্ধন প্রস্তরগাত্রে বা ফাটলে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ হইতে থাকে। এক্ষণে উক্ত সমাবেশ-ফলকে মৃত্তিকা বা মৃত্তিকান্তর বলিতে ক্ষতি কি? এইরূপে মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতগাত্রে উচ্চতর উদ্ভিদের আসন সৃষ্ট হয়। ক্রমে তাহাতে উচ্চতর উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। অতঃপর ইহারাও জীবিতকালে স্ব স্ব অবয়বের পরিত্যক্ত অংশ—পত্র, ফল, ফুল, কন্দ, মূল প্রভৃতি দ্বারা সেই আসন স্থূলতর করিয়া আরও অধিক ও উচ্চতর উদ্ভিদের স্থান করিয়া দেয়। এইরূপে মহারণ্যের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বারিপাতফলে পাহাড় বিধৌত হইয়া প্রস্তরকণা সহ উদ্ভিজ্জাবশেষও নিম্ন দেশে নামিয়া ভূমির সৃষ্টি করে। সেই ভূমি এক্ষণে মানব জাতির মূলধন।

মানব জাতির সভ্যতামার্গে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান—কৃষিক্ষেত্র, এবং তাহারই পরিপুষ্টিতে মানব জাতির পরিপুষ্টি, জীবজন্তুমাত্রেরই পরিপুষ্টি। কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতা দোহন করিয়াই মানব জাতির সুখ-সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিলাস। সেই উদ্ভিদই স্বকীয় দেহপাত করিয়া ধরিত্রীর কলেবরকে উত্তরোত্তর

উদ্ভিজ্জপদার্থে পুষ্ট করিতেছে। ফলতঃ, ভূমি উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে। উদ্ভিজ্জ পদার্থই ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তির মূল, উৎপাদিকার আধার। উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যেই উৎপাদিকা-শক্তি বা উর্ব্বরতা নিহিত থাকে। ক্ষেত্রস্থ কোনও উদ্ভিদ ক্ষীণ, নিস্তেজ, হীনপ্রভ হইলেই বুঝিতে হইবে, মাটীতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ কৃত্রিমতার দিন বলিয়া ক্ষেত্রের সারহীনতা দূর করিবার নিমিত্ত, কিংবা মাটীকে সমধিক বলবতী করিবার উদ্দেশ্যে ফস্ফরাস্, পটাশ, চূণ প্রভৃতি নিয়োজিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকা পূর্ণতা লাভ করে না। এ সকলের সহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সম্মিলিত হইলে, তবেই তাহা মাটী নামে অভিহিত হইতে পারে।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থ জিনিসটা কি? ভূগর্ভ ও বায়ুমণ্ডল হইতে উদ্ভিদ যে সকল পদার্থ আহরণ করিয়া জীবিত থাকে, এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎসমুদায়ই উদ্ভিদের কলেবর গঠনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল পদার্থ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবামাত্রই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বিভিন্ন সংযুক্ত-পদার্থে পরিণত হয়। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি না যে, ভূমি ও বায়ুমণ্ডল—এতদুভয় স্থানের পদার্থনিচয় হইতে উদ্ভিদের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। কোনও একটা জীবিত উদ্ভিদকে গৃহে আনিয়া যথানিয়মে বিশ্লেষণ করিলে, তন্মধ্যে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, ভূমি ও বায়ুমণ্ডল হইতেও তৎসমুদায়ই পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্ভিদ-শরীরে যে যে পদার্থ পাওয়া যায়, পুনরায় তাহা ধূলায় পরিণত হইয়া মৃত্তিকার কলেবর পরিপুষ্ট করে, এবং বাষ্পীয়াংশ গগনমার্গে গিয়া আপনাপন যৌগিক পদার্থে মিশিয়া যায়। মৃত উদ্ভিদ বা তাহার পরিত্যক্তাংশ মৃত্তিকায় সংযোজিত হইলে ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হয়; কারণ, সেই উদ্ভিজ্জাংশ উদ্ভিদের আহরিত পদার্থ দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, এবং কালক্রমে সেই সমুদয়ই বিগলিত হইলে পরবর্ত্তী উদ্ভিদগণের আহার্য্যে পরিণত হয়। ইহাই হইল উদ্ভিদ দ্বারা উদ্ভিদ-পোষণ। উদ্ভিদ দ্বারা উদ্ভিদ পোষিত হয়, তাহার অন্য এক প্রমাণ এই যে, যে ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ হয়, এবং ফসল স্থানান্তরিত হয়, সে ক্ষেত্র ক্রমে হীনশক্তি হইয়া পড়ে। এইরূপে যত অধিকবার আবাদ হয়, পরবর্ত্তী ফসল সকল তত শক্তিহীন হয়, ফসলের পরিমাণ ও গুণবত্তা তত হ্রাস পায়। অধিক কথায় কাজ কি, এক খণ্ড আবাদভূমি ও এক খণ্ড আবাদযোগ্য পতিত জমীর গাছের বৃদ্ধি ও শ্রী দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভূমির উদ্ভিদের মধ্যে

কত প্রভেদ! পতিত জমীতে গাছ-পালা আপনই জন্মে, আপনই মরে, এবং তাহাদিগের অবয়ব সেইখানেই লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সে জমীর উদ্ভিজ্জ পদার্থ কেহই লইয়া যাইতে পারে না, ফলতঃ মাটীর বস্তু মাটীতেই থাকে, উপরন্তু বায়ু-মণ্ডল হইতে উদ্ভিদ যে সকল পদার্থ আহরণ করিয়াছিল, তাহারও কতকাংশ মৃতাবস্থায় মাটীতে থাকিয়া যায়; এই নিমিত্ত অরণ্যসমূহ এত উর্ব্বরা কিন্তু আবাদী ভূমি সম্বন্ধে অন্য কথা। আবাদী ভূমিতে পুনঃ পুনঃ আবাদ হইতেছে, পরে সে ক্ষেত্র হইতে সমগ্র ফসল স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অনেক ফসলের উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ—পত্র কাণ্ড শিকড় পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইতেছে। এইরূপে ক্ষেত্রকে আমরা নিঃস্ব করিয়া ফেলি, এবং স্বার্থের অনুরোধে গৃহস্থালীর কতক-গুলি আবর্জ্জনা দ্বারা ভূমির সে ক্ষতি পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি।

উদ্ভিদ দ্বারা মাটীর আরও একটী উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোজিত হইলে ভূমি অল্পাধিকপরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা গুণ লাভ করে; তন্নিবন্ধন মাটীর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায়, মাটীর মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপ, বৃষ্টির জল, শিশির ও বাতাস প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা হয়। অন্য দিকে সূর্য্যের আকর্ষণে ভূমির নিম্নস্তরের রস সর্ব্বদা উপরিভাগে উঠিতে থাকে, এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলে ভূমির রসাতি-শয্য কাটিয়া যায়, এবং ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদও শিকড়ের নিকটেই রসের যোগান পায়।

আবার, অনেক উদ্ভিদ স্বকীয় মূলদেশে ব্যাক্টিরিয়া র‍্যাডিসিকোলা নামক জীবাণুদিগকে আশ্রয় দান করিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান (nitrogen) আহরণের সুবিধা করিয়া দেয়। নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া উদ্ভিদগণ বৃদ্ধিশীল হয়। নাইট্রোজেন-সংস্পর্শে মৃত্তিকান্তর্গত অজৈব (inorganic) পদার্থ-রাশি বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইবার যোগ্য হয়। এই জন্য উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে নাইট্রোজেন বাষ্প বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সকল উদ্ভিদের সে শক্তি আছে, তাহারা সাম্বিক-বর্গীয় (Leguminosœa)। অড়হর, মুগ, মটর প্রভৃতি ডাল কড়াই, ধঞ্চে, নীল ও বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বর্গীয় সকল উদ্ভিদই শুঁটীধারী। ইহারা উপরিলিখিত উপায়ে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া পরবর্ত্তী উদ্ভিদগণের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাসের জীবতত্ত্ব।

কুক্কুট। ম্যাক্সমূলর মহোদয় ভাষার উচ্চারণগত উপমা দ্বারা সংস্কৃত সহ গ্রীক লাটিন ইত্যাদি ভাষার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য Cock ও কুক্কুট শব্দ লইয়া অনেক আলোচনা (Science of Language I—348) করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে প্রসঙ্গক্রমে বা উপমা-স্থলে নানা-জাতীয় পশু পক্ষীর নামের উল্লেখ থাকিলেও কুক্কুটের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালে রচিত ঋগ্বেদের অপেক্ষা অপ্রাচীন শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা (১।১৬ কণ্ডিকা), শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।৪।১৮), বাজসনেয়ি-সংহিতা (১। ১৬।১) এবং রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (১৩।৪) কুক্কুটের নাম ও প্রসঙ্গ আছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় কুক্কুট 'মধুজিহ্ব' নামে পরিচিত। উক্ত সংহিতার ভাষ্যকার উবট ও মহীধর নিজ নিজ ভাষ্যে কুক্কুটের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাচীন পারসীকদের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তার বেন্দিদাদ ভাগের ১৮শ ফর্গাদের ৫৫ ও ৫২ পদে কুক্কুটের নাম দৃষ্ট হয়। কুক্কুট জেন্দভাষায় *Parodars*, ভিন্ন-জাতীয় মন্দ-ভাষাভাষী (অবশ্য পারসীকদের মতে) লোকগণের নিকট 'কাহরকাতস্' ও লৌকিক সংস্কৃতে 'কৃকবাক' নামে পরিচিত। কুক্কুট উচ্চবাক্ দ্বারা সুপ্ত-মনুষ্যকে উষার পূর্ব্বে উপাসনার জন্য জাগরিত করিয়া দেয়, এ জন্য পারসীকদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার আহার নিষিদ্ধ (Vendidad 18/35—37, 13—5;) হইয়াছে। আর্য্য জাতির ভক্ষণ-নিষেধের কারণ অবগত নহি। ইরাণীর চক্ষে কুক্কুট পবিত্র ও পূজ্য। হোমরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন গ্রীক পদ্য-সাহিত্যে কুক্কুটের উল্লেখ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত গ্রীক সাহিত্যে কুক্কুটের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সিজার প্রথম শতাব্দীতে বৃটেনে কুক্কুট দেখিয়াছিলেন (The Animals of the Bible)।

কেহ বলেন,—প্রাচীন পারসীক জাতি, এবং কেহ কেহ বলেন, রাজর্ষি সলোমন কর্ত্তৃক কুক্কুট পক্ষী পারস্য প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সিরিয়াতে নীত হয়। আবেস্তার রচনাকাল ও সলোমনের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসর। সলোমনের রাজত্বকালে ইরাণীগণ প্রাচীন বাবিলের পূর্ব্ব দিকে বাস করিত। ইরাণীদের আবেস্তা যে দেশে যে সময়ে রচিত, ঠিক সেই দেশে সেই সময়ে

আর্য্য জাতির প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ রচিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

বাইবেল-বর্ণিত (2 Kings 17—30) 'নার্গেল' নামক দেবতা কুক্কুটাকারে পূজিত হইত। এই নার্গেল-পূজা প্রাচীন কুথীয়ান জাতি দ্বারা সিরিয়াতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই কুথীয়ান জাতি আসিরিয়ার রাজাদের দ্বারা সমরিয়া দেশে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সমরিয়াবাসী ইহুদী (ইব্রীয়) জাতি মিডিয়া অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৮ম পঞ্চিকা ৩৮ অধ্যায়) 'মদ্র' নামক দেশে নির্ব্বাসিত হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক Josephus বলেন,—সম্ভবতঃ এই কুথীয়ান জাতি প্রাচীন পারসীকদের কোনও শাখা, কিংবা তাহাদের প্রতিবেশী জাতি। পরলোকগত লেয়ার্ড মহোদয়ও ইহার সমর্থন (Nineveh and its Remains, 3—538) করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের কুষাণ-মুদ্রায় কুক্কুটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদের ন্যায় হিব্রু ভাষায় রচিত 'Old Testment'এ কুক্কুটের নাম বা কোনও প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীন কালে ঋগ্বেদ ও হিব্রু বাইবেলের জন্মভূমিতে কুক্কুট পক্ষী ছিল না ; প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় জাতির নিকট কুক্কুটের নাম অজ্ঞাত ছিল। কুক্কুটের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ, জাভা, এবং মালাক্কা দ্বীপ। পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ভাষায় রচিত চারিখানি নূতন ধর্ম্মগ্রন্থের (New Testment) মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম St. Markএর পুস্তকে কুক্কুটের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কোকিল।

যে কোকিল পক্ষী লইয়া কবিগণের এত উপমা-সৃষ্টি, সেই কোকিল পক্ষীর নাম ঋগ্বেদে নাই। ঋগ্বেদ অপেক্ষা অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় (২৪।৩৭, ৩৯ কণ্ডিকা) 'অন্যবাপ' ও 'পিক' শব্দ আছে। ভাষ্যকার উবট ও মহীধর 'অন্যবাপ' শব্দের অর্থ কোকিল করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৭।১০৪।২২ ঋকে যে 'কোক' শব্দ আছে, তাহার অর্থে নিশাচর-পক্ষী বুঝায়। ইহারা 'যাতুধান' নামক অশরীরী অনিষ্টকারী evil-spirit-রূপে রাত্রে আর্য্যগণের অপকার করিত। "উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি শ্বযাতুমুত কোকযাতুম্।" মিষ্টার গ্রিফিথ এই 'কোক' শব্দের অনুবাদে *Cukoo*, এবং মিষ্টার দত্ত 'চক্রবাক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ঋকের যাতুধান-রূপী হিংস্রক পশুপক্ষিগণ যে নিশাচর, ঋক-পাঠে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু কোকিল ও চক্রবাক নিশাচর-পক্ষী নহে। অধিকন্তু ইহারা দিনে কিংবা রাত্রে

লোকালয়েও আসে না। পেচক নিশাচর-পক্ষী। যে জাতীয় পেচক উৎসন্ন স্থানে বাস করে, হিব্রুতে তাহা 'কোশ' নামে (Psalms 102—6) পরিচিত। ইহার সহিত 'কোক' শব্দের সাদৃশ্য আছে। ইংরাজি ভাষায় অনূদিত বাইবেলের Authorised Versionএর যে যে স্থানে Levi 11—16 Deut 14—15) cuckoo শব্দ আছে, মূল হিব্রু শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া Revised Version সংস্করণে তাহার অনুবাদ Sea maw, Sea gull, বা গাংচিল করা হইয়াছে। মনে হয়, প্রাচীন আর্য্য ও ইব্রীয় নিবাস পিক বা পরভৃতের রবে মুখরিত হইত না।

প্রথম হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে নানা-জাতীয় জীব জন্তুর নামের উল্লেখ থাকিলেও, কপি কি বানরের নাম দেখা যায় না। ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত

কপি।

অপ্রাচীন অংশ দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তে বৃষাকপি ও কপি, এবং অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদে (২৪।৩০ কণ্ডিকা) 'মর্কট' শব্দ আছে। বৈদিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের এই সূক্তকে ও শুক্ল যজুর্ব্বেদকে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলেন। কপির নাম হিব্রুভাষায় কোফেস। বাইবেলে বর্ণিত 'কোফেস' (কপি) তৎকালে ওফির নামক দেশ হইতে (1 Kings 10—22, 2 Chron 9—21) কানান-ভূমিতে আমদানী হইত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন,—কপি ও কোফেস, উভয় শব্দই তামিল-ভাষামূলক। কেহ এই ওফির দেশকে দক্ষিণ-ভারতের সহিত অভিন্ন মনে করেন (Science of Language 190)। কিন্তু বাইবেল-বর্ণিত এই 'ওফির' দেশ নানা প্রমাণ দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় তারিখের 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সমর্থিত হয়। ঋগ্বেদের ১০।৮৬।১৩ ঋকের "বৃষাকপায়ি রেবতি ...." ইত্যাদি ঋক-বচনের 'বৃষাকপায়ী' শব্দের ব্যাখ্যায় নিরুক্ত-কার (১২।১০) 'বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্নৈবৈনাভিসৃষ্টকালতমা' অর্থ, এবং দুর্গাচার্য্য তাঁহার টীকায় বৃষাকপি অর্থে 'আদিত্য, সূর্য্য' ও বৃষাকপায়ী অর্থে 'উষা, সূর্য্যা' করিয়াছেন।

গ্রীক-চক্ষে কুকুর পবিত্র। হোমরের বর্ণনায় কুকুর উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রে কুকুর অশুচি ও অপবিত্র-রূপে চিত্রিত। ঋগ্বেদের

কুকুর।

১।১৮২।৪ ঋকে (১) আর্য্য-শত্রু পরজাতীয়দিগকে হেয়-রূপে চিত্রিত করিবার জন্য তাহাদিগকে কুকুরের সহিত তুলনা

(১) জম্ভয়তমভিতো রায়তঃ শুনো হতং মৃধো বিদথুস্তান্যশ্বিনা।

করিয়া অশ্বিদ্বয়ের নিকট তাহাদের বিনাশকামনা করা হইয়াছে। ৯।১০।১১ ও ১৩ ঋকে (১) দেখা যায়, আর্য্যগণ যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগকে কুকুরের ন্যায় অশুচি বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ৭।১০৪।২২ ঋকে দেখা যায়, (২) কুকুর অশরীরী যাতুধান-রূপে রাত্রিকালে আর্য্যদের অপকার করিয়া বেড়াইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৩) কুকুর অপবিত্র-জীব-রূপে পরিচিত।

ঋগ্বেদের ২।৩৯।৪ ঋকে (৪) দেখা যায়, কুকুর মনুষ্যের শরীরের ও গৃহের রক্ষক। ঋগ্বেদের ৭।৫৫।৩ ঋকের "স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃসর" দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, সারমেয় রাত্রে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ঐ সূক্তের ৪র্থ ঋকের "ত্বং শূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দর্তু শূকরঃ" দ্বারা জানা যায়, কুকুর বন্য শূকরের উপদ্রব হইতে শস্যক্ষেত্র-রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইত।

ঋগ্বেদের ৭।৫৫ সূক্তে ও রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে (৭০।২০) কুকুর গৃহের ও পশুর রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অপ্রাচীন অংশে অর্থাৎ ১০।১৪।১০-১২ ঋকে, এবং ইরাণীদের আবেস্তার বেন্দিদাদ ভাগের ৮ম ফর্গাদের ৪৭—৪৮ পদে চারি-চক্ষু-বিশিষ্ট কুকুর যমদূত-রূপে চিত্রিত। কুকুর ইরাণীদের গৃহের ও পশুপালের রক্ষক-(Vendidad, 13 Fargard)-রূপে বর্ণিত দেখা যায়। প্রাচীন ইব্রীয় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও কুকুর অপবিত্র ও অশুচি (Exodus 22—31, Dent 23—18)। অধিকন্তু কুকুর বিক্রয়ের মূল্য পর্য্যন্ত অপবিত্র। Job, 30—1 ও Isaiah 56—11 পদে কুকুর পশুপাল-রক্ষক-রূপে বর্ণিত। আর্য্যগণ যেমন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কুকুর বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তেমনই প্রাচীন ইব্রীয় জাতিও পরজাতীয় লোকমাত্রকে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়া ঘৃণা (I Samuel 17—43, 2 Kings 8—13, Psalms 22—16, 59—6) করিতেন। প্রাচীন ইহুদী জাতিও কুকুরের দৃষ্টি অপকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মুসলমানদের নিকটও কুকুর অশুচি ও অপবিত্র। হজরত মোহাম্মদ কুকুর দ্বারা পশুরক্ষণ-কার্য্য ব্যতীত কুকুর-পালন নিষেধ করিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ কুকুর শয়তান-তুল্য। ইহার দৃষ্টি মনুষ্যের অত্যন্ত অপকারী

---

(১) অপশ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম।—১ম ঋক।

অপশ্বানম অরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ। ১৩ ঋক।

(২) উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি শ্বযাতুমুত কোকযাতুম্।

(৩) গার্হপত্যাহবনীয়া বংতরেণা নো যা রথো বা শ্বাবা প্রতিপদ্যেত কা তত্র প্রায়শ্চিত্তিরিতি............৭ম পঞ্চিকা, ২য় অধ্যায়।

(৪) শ্বানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খগলেব বিস্রসঃ পাতমস্মান্।

বলিয়া হদিস সরিফে বর্ণিত হইয়াছে (মেস্কাত সরিফ, সারমেয়-প্রসঙ্গ)। আরবী ও হিব্রুতে কুকুর শব্দের প্রতিশব্দ কালব্।

ঋগ্বেদে গর্দ্দভ হেয় ও অপবিত্র জীব নহে। বরং ইহা দেবতাদের বাহন। ঋগ্বেদের ১।৩৪।৯, ১।১১৬।২, ১।১৬২।২১, ৮।৮৫।৭ ঋকে রাসভ অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহন। ৩।৫৩।৫ ঋকে গর্দ্দভ ইন্দ্রের বাহন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঋগ্বেদের জন্মভূমিতে প্রাচীন কালে লোকে গর্দ্দভারোহণে অভ্যস্ত ছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় বৈদিক ভূমিতে গর্দ্দভারোহণ অসম্মানকর ছিল না, বরং দেববাহনরূপে কল্পিত হওয়ায়, গর্দ্দভারোহণ সম্মানকর ছিল, এমন বুঝা যায়। ৮।৫৬।৩ ঋকে শত-গর্দ্দভ দানের প্রসঙ্গ দ্বারা প্রাচীন আর্য্যনিবাসে গর্দ্দভ-সুলভতা প্রমাণিত হয়। প্রাচীন পারসীক জাতির নিকটও গর্দ্দভ পবিত্র জন্তু (Yacna 41—28) পৃথিবীর মধ্যে তাতার দেশে অশ্ব, আরব দেশে উষ্ট্র ও সিরিয়া ভূমিতে গর্দ্দভ অধিবাসীদের সাধারণ বাহন (Isaiah 21—7)।

গর্দ্দভ।

মহাপুরুষ আব্রাহাম (Genesis 22—3) ও মহাত্মা যিশুখৃষ্ট সর্ব্বদা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন। বাইবেলের Genesis 49—11, Numbers 22—22 ইত্যাদি বহু পদে গর্দ্দভ ইহুদীয় জাতির সাধারণ বাহন রূপে পরিচিত। Isaiah 21—7 পদে দেখা যায়, গর্দ্দভ ইহুদীয় জাতির রথের বাহনও ছিল। সিরিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনও দেশের লোক সাধারণতঃ গর্দ্দভারোহী নহে। পালেষ্টাইনের গর্দ্দভ পৃথিবীর মধ্যে সুশ্রী। প্রাচীন আসিরিয়া দেশে বন্য গর্দ্দভ ছিল। খরের হিব্রু নাম খামর।

আর্য্য ও ইহুদীয় জাতির গো-পূজা-প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই একমাত্র গো-প্রধান দেশ, ইহা মনে করা ভুল। প্রাচীন সিরিয়া ভূমির অন্তর্গত বাশন দেশ প্রাচীন কালে গরুর জন্য বিখ্যাত (Deut 32—14, Psalms 22—12) ছিল। বাইবেলে যত অধিক-পরিমাণে গরুর প্রসঙ্গ আছে, উষ্ট্রের প্রসঙ্গ তাহার তুলনায় অত্যল্পমাত্র। বাইবেলের Kings 8—63, 2 Chron 7—5, 29—33 পদে রাজর্ষি সলোমনের বাইশ সহস্র গো-বলির বৃত্তান্ত আছে।

গো।

প্রাচীন আর্য্যনিবাসেও গো সুলভ ছিল। ঋগ্বেদের ৮।৫।৩৭ ঋকে দশ সহস্র গো-দান ও ৮।৪৬।২২ ঋকে দশ সহস্র গো-লাভের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের

কোনও কোনও দেবতাকে 'বৃষ' নামে ও বিশেষণে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রাচীন আক্কাদ ও সিমিরর (মেসপটুমিয়া) প্রদেশবাসিগণও কোনও দেবতা-বিশেষকে Bull god নামে সম্বোধন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 289) করিত।

বৈদিক ভাষায় বৃষের অপর নাম 'উক্ষণ'। সেমিটিক ভাষাতেও বৃষের নাম 'ঈক্ষণ' (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 456)। যে প্রকার আর্য্যদের দ্বিতীয় মাসের নাম 'বৃষ', তদ্রূপ ইব্রীয় জাতির দ্বিতীয় মাসের নাম 'বুল' (Kings 6—38)। উভয় নামের অর্থ, সেচনকারী। গরুর অপর নাম হিব্রু ও আরবীতে বকর। ষাঁড় হিব্রুতে 'সর' নামে (Levi 22—28) পরিচিত।

ঋগ্বেদের 'অহি' ও 'অহিশুব' (৮।৩২।২৬ ঋক) ও আবেস্তার (Vendidad 18—45) 'অজিহ', এবং হিব্রু বাইবেলের (Psalms 140—3) 'অকশুব' অভিন্ন। যে জাতীয় ফণাধারী বিষধর সর্প আমাদের নিকট 'ফণী' নামে পরিচিত, ইহাদের হিব্রু নাম (Dent 32—33) 'কেথেন'। যেমন বিষধরমাত্রই আমাদের নিকট 'সর্প' নামে পরিচিত, তদ্রূপ হিব্রু বাইবেলে সর্ব্ব-শ্রেণীর বিষধরের সাধারণ নাম 'সিফোন' ও 'সরাফ'। আবেস্তায় ইহারা 'স্রুবার' (Yacna 9—34) নামে পরিচিত।

সর্প।

ঋগ্বেদ (৬।৭২।৩ ঋক) ও আবেস্তায় (Vendidad 1—8 ; Yacna 9—62) অহি ও বৃত্র অভিন্ন। নির্ঘণ্টুতেও (১।১০) অহি ও বৃত্র এক-পর্য্যায়-ভুক্ত। অহি ও বৃত্র প্রাচীন আর্য্য ও ইরাণী জাতির চিরশত্রু ও অহিতা-কাঙ্ক্ষী। ঋগ্বেদ ও আবেস্তার 'অহি' ও 'বৃত্র' দেবতা ও অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে কল্পিত। ইহারা সর্ব্বত্র Evil Spirit রূপে পরিচিত।

বাইবেলেরও সর্ব্বত্র 'অহি' ও 'শয়তান' অভিন্ন। প্রথম মনুষ্য আদম হইতেই সর্প ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে পরিচিত। এই সর্পের প্ররোচনায় ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আদমের স্বর্গ-চ্যুতি ঘটিয়াছিল। তখন হইতে অহি মনুষ্যের শত্রু (Genesis 3—15)।

অহি ও বৃত্র পূর্ব্বে দেব-পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। ঋগ্বেদের ২।১২।৪, ১।৩২।১২ ঋক ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় পঞ্চিকায় তাহার আভাস ও ইঙ্গিত আছে। ইব্রীয় জাতির সর্প ও শয়তান যে পূর্ব্বে দেবতা বা *Angel*দের অন্তর্গত ছিল, তাহা সুস্পষ্ট New Testmentএর অন্তর্গত 2 Peiter 2—4,

Luke 10 -18 পদে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদের অপ্রাচীন অংশের ১০।১১৩।৭ ঋকে ও ব্রাহ্মণভাগে এবং আবেস্তার Yacna 9—23 পদে স্বর্গে দেবাসুরের যুদ্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ New Testmentএর Revelation 12 Chapterএ স্বর্গে দিয়াবল (শয়তান) সহ স্বর্গীয় দূত মীখাইলের যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কাল্ডিয় জাতিরও এই বিশ্বাস ছিল (Mononment Fact and Higher Critical Fancies 106)।

ঋগ্বেদে বৃত্র ও অহি জল-অবরোধক-রূপে (১।৩২ ও ৩৩ সূক্ত) পরিচিত। বাইবেলেও (Revelation 12—16) দিয়াবল (শয়তান) নদী-স্রোতের অবরোধকারি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাতালবাসী সর্প সংস্কৃতে 'নাগ' ও হিব্রুতে 'ন্যক' নামে পরিচিত। ইন্দ্র-শত্রু এই বৃত্র বা পিশাচ পিশঙ্গবর্ণ (১।৩৩।৫ ঋক) ও ইহুদীয় জাতির দেব-শত্রু দিয়াবল বা নাগবর্ণ (Revelation 12—3) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। গর্ব্বিত বৃত্র ঋগ্বেদের ২।১২।১২ ঋকে 'রৌহিণ' এবং দাম্ভিক নাগ বাইবেলে (Isaiah 51—9) 'রহব' নামে পরিচিত। আর্য্য জাতির সর্ব্বগুণসমন্বিত দেবতা ইন্দ্র যে প্রকার গর্ব্বিত 'রৌহিণ'কে (২।১২।১২ ঋক) তদ্রূপ সর্ব্বগুণসমন্বিত যিহোবা দাম্ভিক 'রহব'কে (Isaiah 51—9) বিনাশ করিয়াছিলেন। যে প্রকার সমুদ্র-স্থায়ী মহানাগ বা শয়তান যিহোবা কর্ত্তৃক (Isaiah 27—1) খড়্গ দ্বারা হত হইয়াছিল, তদ্রূপ "ত্যং চিদিত্থা কত্পয়ং শয়ানমসূর্যে তমসি বাবৃধানম্ তং চিন্মন্দানো বৃষভঃ সুতস্যোচ্চৈরিন্দ্র অপগূর্য্যা জঘান", যে বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশিরসম্ভোগপূর্ব্বক জলমধ্যে শয়ন করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লসিত ছিল, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরস-পানে হৃষ্ট হইয়া বজ্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন (৫।৩২।৬ ঋক)।

সর্প-বৈদ্যের মন্ত্রপাঠে সর্প বিষ নষ্ট হয় (ঋগ্বেদ ৭।৫০ সূক্ত, Psalms 58—5, Ecclesiastes 10—11, Jeremiah 8—17) অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য ও ইহুদীয় জাতির এমন বিশ্বাস আছে। নাগ-পূজা অতি প্রাচীন (Numbers 21—8, 2 Kings 18—4)। অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা পৌরাণিক কথা। নহুষ অর্থ সর্পবিশেষ। ইহুদীয় জাতি যে ধাতুময় সর্প প্রস্তুত করিয়া পূজা করিত, তাহার নাম 'নহুষ্টন' (2 Kings 18—4) ছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব কোনও কোনও গ্রীক মুদ্রায় পেচকের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

গ্রীকদের নিকট পেচক জ্ঞানদাতা। ইহা মিনার্ভা দেবীর বাহন। প্রাচীন আর্য্য জাতি পেচকের রব ও দৃষ্টি অপকারী ও অমঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্বেদের ৭।১০৪।১৭, ২২ ঋকে দেখা যায়, যাতুধান নামক রাক্ষসগণ উলূক-রূপে রাত্রে আর্য্যদের অপকার করিত। 'কোক' নামক পেচক জাতীয় এক প্রকার নিশাচর পক্ষী (৭।১০৪।২২ ঋক) যাতুধানগণের বাহন, প্রাচীন আর্য্যগণ এমন বিশ্বাস করিতেন। ইহার সহিত ইব্রীয় ভূমির উৎসন্ন স্থানে বাসকারী কোশ-জাতীয় পেচকের তুলনা করিতে পারি (Psalms 102—6)। ঋগ্বেদের ১০।১৬৫।৪ ঋকে পেচক যম-দূত-রূপে চিত্রিত। ইব্রীয়-চক্ষে পেচক অপবিত্র (Leve 11—16)। পেচকের দৃষ্টি ও রব ইব্রীয় জাতির নিকট অমঙ্গলজনক (Psalms 102—6, Isaiah 34—14)। জনশূন্য অর্থাৎ পেচকের বাসভূমি হইবে, এই উপমা ইব্রীয় জাতির মধ্যেও প্রচলিত (Isaiah 34—11) ছিল।

উলূক।

ঋগ্বেদে Tiger শব্দের প্রতিশব্দ, অথবা ব্যাঘ্র কি শার্দ্দূল শব্দ নাই। এমন কি, চিতাবাঘের নাম বা প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে যে 'বৃক' শব্দ আছে, তাহার অর্থ হিংস্রক, অনিষ্টকারী, তস্কর। অশরীরী যাতুধানগণ পর্য্যন্ত বৃকের (৬।৫১।৬ ঋক) পর্য্যায়ভুক্ত। আধুনিক অভিধানে বৃক অর্থে নেকড়ে বাঘ গৃহীত হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন নির্ঘণ্ট (৩।২৪) নিরুক্ত ইত্যাদি কোষ গ্রন্থে বৃক অর্থে বলবান, তস্কর, ইত্যাদি। বাইবেলেও Tiger শব্দের কোনও হিব্রু প্রতিশব্দ নাই। পুরাতন বাইবেলের অপ্রাচীন অংশে অর্থাৎ Psalms ও Isaiah প্রভৃতি পুস্তকে যে 'নিমার' শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ চিতা ও কেন্দুয়া বাঘ। এই *Nemar* শব্দের অর্থ Tiger নহে। ঋগ্বেদ ও বাইবেলের বহু ঋকে ও পদে উপমাস্থলে কিংবা বর্ণনায় সিংহ, ভল্লুক, বরাহ, এমন কি বৃষের পরাক্রমের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শার্দ্দূলের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ঋগ্বেদের ১।১০৫।৭, ১৮ ঋকে বৃক অর্থে চন্দ্র, এবং ৮।২২।৬ ঋকে লাঙ্গল। অপ্রাচীন শুক্ল যজুর্ব্বেদে (২৪।৩৩ কণ্ডিকা) যে 'শার্দূলো বৃকঃ' শব্দ আছে, ভাষ্যকার উবট ও মহীধর তাহার অর্থ 'শার্দ্দূলো ব্যাঘ্রঃ বৃকঃ' করিয়াছেন।

বৃক ও ব্যাঘ্র।

ঋগ্বেদে শ্যেনের আসন অতি উচ্চ। ঋগ্বেদে শ্যেন পূজ্য। ঋগ্বেদের ৯।৯৬।৬ ঋকে শ্যেন গৃধ্র-জাতীয় ও ৪।৩৮।৫, ৬।৪৬।১৩ ঋকে মাংসাশী, এবং ৪।২৭ সূক্তে দ্রুতগামি-রূপে পরিচিত। শ্যেনের বাসস্থান অদ্রি বা পর্ব্বতের উপর উচ্চ

শ্যেন।

বৃক্ষে। এই শ্যেন আমাদের নিকট উৎক্রোশ বা কুরব পক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। এই কুরর পক্ষী উচ্চ বৃক্ষে বাস করে, এবং মাংসাশী। কখনও কখনও এই কুরর ছোঁ মারিয়া মধুর চাক লইয়া যায়। এই কুরর বা উৎক্রোশ মধু পান করিতে ভালবাসে।

এই শ্যেন বা কুরর পক্ষী প্রাচীন ইব্রীয় জাতির নিকট সম্মানিত ছিল। শ্যেন প্রাচীন আসিরিয়াস, ইব্রীয় ও আরব জাতির পূজ্য ছিল। হিব্রু ও আরবীতে শ্যেন 'নিশর্' নামে পরিচিত। আসিরীয়ার রাজা সনহেরিব 'নিশরক' নামক দেবতার মন্দিরে পুত্রের হস্তে নিহত হয়েন (2 Kings 19—37)। হজরত মোহম্মদের পূর্ব্বে আরববাসিগণ 'নশর' নামে এই নিশরের পূজা (কোরাণ সরিফ সুরা নুহ্ ২৩ আয়েত) করিত। প্রাচীন ইব্রীয় জাতি বিশ্বাস করিতেন, শ্যেন বা নিশর গত যৌবন ফিরিয়া পায়, (Psalms 103—5)। শ্যেনের ন্যায় 'নিশর' পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে বৃক্ষের উপর বাস করে (Job 39—27, Jeremiah 49—16)। নিশর দ্রুতগামী পক্ষী (Dent 28—49)। বৈদিক শ্যেন যে প্রকার সুপর্ণ ও পক্ষে শক্তি ধারণ করে, তদ্রূপ নিশরের পক্ষও খুব শক্তিশালী (Dent 32—11)।

নোয়ার পূর্ব্বেও এই নিশর পূজা ছিল। প্রাচীন পারসীক জাতির নিকট এই শ্যেন 'শায়না' নামে পরিচিত (Farvardin Yasht 97, Bahram Yasht 41)। 'শায়না' প্রাচীন পারসীক জাতির সম্মানাস্পদ। প্রাচীন আসিরিয়ানগণ শ্যেনকে 'শুরহু' নামে অভিহিত করিতেন (Hibbert Lectures by Prof. Sayce, 277)।

হারিদ্রব ও রোপণাকা।

ঋগ্বেদের ১।৫০।১২ ঋকের 'শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি'র হারিদ্রব শব্দের অর্থ দত্ত মহোদয় বেদজ্ঞ সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া 'হরিতালদ্রুম' এবং মিষ্টার গ্রিফিথ মহোদয় তাঁহার ঋগ্বেদের অনুবাদে 'হরিতাল বৃক্ষ' করিয়াছেন। গ্রিফিথ মহোদয় তাঁহার অনুবাদের টীকায় বলেন,—হরিতাল নামে কোনও প্রকার বৃক্ষ নাই। প্রফেসর রথ ও বোথলিঙ্ক মহোদয়দ্বয়ের কৃত বিখ্যাত বৈদিক অভিধানের অনুসরণ করিয়া বলেন, সম্ভবতঃ ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় পীতবর্ণ পক্ষী। ঋগ্বেদের অন্যত্র (৮।৩৫।৭ ঋক) যে 'হারিদ্রবেব পতথো বনে দুপ................' ঋক আছে, তাহাতে জানা যায়, 'হারিদ্রবেব' অর্থ বৃক্ষ নহে। 'হারিদ্রবেব' কথা থাকায় দুইটি হারিদ্রব পক্ষীর কথা জানা যাইতেছে।

যাহাই হউক, প্রাচীন আর্য্যগণ শুক ও হারিদ্রব নামকও কোনও পক্ষিবিশেষে শরীরের রোগ প্রক্ষিপ্ত করা যায়, এই প্রকার বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন পারসীক জাতিরও হোমা নামক পক্ষীর সম্বন্ধে এই প্রকার একটা ধারণা ছিল। হোমা পক্ষীর ছায়াস্পর্শে রোগনাশ ও উচ্চপদলাভ হয়, প্রাচীন পারসীক জাতি বিশ্বাস করিতেন (Farvardin Yasht 139)।

প্রাচীন আরব ও ইব্রীয় জাতির 'হোদহোদ' নামক পক্ষীর সম্বন্ধেও এই প্রকার ধারণা ছিল। এই 'হোদহোদ' পক্ষী তাহাদের নিকট 'চিকিৎসক-পক্ষী' বলিয়া পরিচিত। এই 'হোদহোদ' পক্ষী সাধারণতঃ চক্রবাকের ন্যায় যুগ্মরূপে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা সাধারণতঃ বালুকাময় স্থানে ও মরুভূমিতে বাস করিতে ভালবাসে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা কপিঞ্জল। কিন্তু সূক্তের মধ্যে কপিঞ্জল শব্দ নাই। শকুন শব্দ আছে। শকুনের অর্থ পক্ষী। এ দেশে এখনও অনেকের বিশ্বাস, বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট-জাতীয় নিশাচর পক্ষী রাত্রিকালে গৃহস্থ-বাড়ীর নিকট ডাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, এবং তস্কর আসে। ইহা উলূকজাতীয় ও সর্পভুক। নিরুক্ত (৩।১৯) ও নির্ঘণ্টু (৩।১৩)তে কপিঞ্জল শব্দের "কপিরিব জীর্ণ কপিরিব জবত ঈষৎপিঙ্গলো বা গমনীয়ং শব্দং পিঞ্জয়তীতি বা" ব্যাখ্যা ও অন্যত্র (নিরুক্ত ৯।৪) শকুনি অর্থ আছে। ১।১৯১।১১ ঋকে শকুন্তিকা নামক পক্ষীর নাম দেখা যায়। এই শকুন্তিকা সর্পশত্রু ও সর্পবিষ-হরণকারী। ময়ূর ও নকুল (কুসুম্ভ) (১।১৯১।১৪ ঋক) যেমন সর্পবিষ-হরণকারী, অথচ সর্প-ভুক, তদ্রূপ এই শকুন্তিকা পক্ষীও সর্পভুক। ঋগ্বেদের ২।৪২।৩ ঋক "অবক্রন্দ দক্ষিণতো গৃহাণাং সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী শকুন্তে। মানঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥" দ্বারা জানা যায়, কপিঞ্জলের রব অমঙ্গলজনক। তজ্জন্য কপিঞ্জল (শকুন) যাহাতে গৃহের দক্ষিণ দিকে সুমঙ্গলসূচক ভদ্রবাদী ক্রন্দন করে, এবং তস্কর না আইসে, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তস্করের কথা থাকায় জানা যাইতেছে যে, ইহারা উলূকজাতীয় নিশাচর পক্ষী।

কপিঞ্জল।

ইহার সঙ্গে ইব্রীয় দেশের পেচক-জাতীয় নিশাচর সর্প-ভুক 'কিপোদ' নামক (Isaiah 34-15) পক্ষীর অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই 'কিপোদ'

পক্ষী যে স্থানে ডাকে, এবং বাস করে, তাহা শীঘ্রই জন-শূন্য হয়, প্রাচীন ইত্রীয় জাতি এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। কপিঞ্জলের স্বর কর্করিতুল্য, ইহা ঋগ্বেদের ২।৪৩।৩ ঋক "যদুৎপতন্বদসি কর্করির্যথা ....." দ্বারা জানা যাইতেছে। এ জন্য ঐ ঋকে কপিঞ্জলের নিকট "শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধিনঃ" এই ভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে।

ইত্রীয় দেশের 'কিপোদ' পক্ষীর স্বরও কর্করিতুল্য, অথচ গুরুগম্ভীর। ঋগ্বেদের ১।৩০।৪ ঋকের 'কপোত' কোন্ জাতীয় পক্ষী, এখানে তাহারও একটু আলোচনা করিব। পৃথিবীর সমস্ত দেশে পারাবত (Pegion) পালিত হইয়া থাকে। এই পারাবত নিরীহ পক্ষী। ঋগ্বেদের ১০। ১৬৫।২ ঋকে কপোত-কৃত অমঙ্গল-নাশের "শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু" এইরূপ প্রার্থনা আছে। কপোত ও পারাবত যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষী, ইহা দ্বারা তাহা বুঝা যায়। শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতায় (২৪।২৩,২৫ কণ্ডিকা) কপোত ও পারাবত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষিরূপে বর্ণিত দেখা যায়। ঋগ্বেদের ৮।৩৪।১৮ ঋকে পারাবত শব্দ আছে। ঋক-পাঠে ইহা যে Dove-জাতীয় ঘুঘু কিংবা এদেশীয় কবুতর, তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত ১০।১৬৫ সূক্তের কপোত ঐ সূক্তে কখনও কখনও শকুন (পক্ষী) এবং ঐ সূক্তের ৪র্থ ঋকে বিশদভাবে "যদুলুকো বদতি মোঘ-মেতদ্যৎকপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি। যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তুমৃত্যবে॥" উলূকও যমদূত-নামে অভিহিত ও চিত্রিত।

শ্রীআজিমউদ্দীন আহম্মদ।

দুখে দুলী।

১

গ্রামের প্রান্তভাগে, যেখানে ক্রোশত্রয়ব্যাপী বিস্তৃত মাঠটা আপনার অবাধ শূন্যতা লইয়া কুমড়াগাছি গ্রামখানার সহিত মিলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইখানে—সেই শূন্যতা ও পূর্ণতার সন্ধিস্থলে দুখীরাম বাইতির ক্ষুদ্র কুটীরখানি যেন গ্রামের পূর্ণতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অসীম শূন্যের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শূন্যতা ও পূর্ণতার মধ্যস্থলে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি সাগরতরঙ্গমধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায়

প্রতীয়মান হইত; অন্ধকারময়ী রজনীতে দূর প্রান্তর হইতে সেই ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষীণ আলোকরেখা পথিকদিগকে আলেয়ার লীলা প্রদর্শন করিত। গভীর রজনীতে যখন গ্রাম প্রান্তর সব গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া যাইত, তখন সেই কুটীর হইতে কচিৎ বাঁশীর করুণসুর উত্থিত হইয়া স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে ছুটিয়া বেড়াইত।

এই কুটীরের যে মালিক, তাহার সহিতও যেন গ্রামের কোনও সম্পর্ক ছিল না। দিন রাত্রির মধ্যে সে একবারও এই কুটীর ছাড়িয়া যাইত না; শুধু সপ্তাহের মধ্যে এক দিন রামনগরের হাটে গিয়া চামড়া কিনিয়া আনিত, এবং সাত দিন ধরিয়া যে জুতা গড়িত, তাহা হাটে গিয়া বেচিয়া আসিত। আসিবার সময় চাল, ডাল, নুন, তেল, সব কিনিয়া আনিত, আর সেই সঙ্গে দুই ঝাঁপি তাড়ী বা এক বোতল ধেনো মদ লইয়া আসিত। গভীর শূন্যতার মধ্যে প্রাণটা যখন হাঁপাইয়া উঠিয়া হা-হা করিতে থাকিত, তখন দুখীরাম একটু তাড়ী বা একটু মদ গলায় ঢালিয়া দিয়া আবার জুতা গড়িতে বসিত। কচিৎ গ্রামের কোনও কৃষক শক্ত চামড়ার মোটা জুতা খরিদ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার কুটীরে আসিত, এবং একবেলা ধরিয়া দরদস্তুর করিয়া হয় ত এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া যাইত। কখনও বা কোনও শ্রান্ত পথিক তাহার কুটীরসম্মুখস্থ বটগাছের তলায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিত, দুখীরাম অম্বাক সাজিয়া আনিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে বসিত। শ্রান্তি দূর করিয়া পথিক চলিয়া যাইত, দুখীরাম আসিয়া আপনার কাজে মন দিত।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তর আকাশ সব যখন মিশিয়া যাইত, আকাশের কালো বুকে দপ্ দপ্ করিয়া তারা জ্বলিতে থাকিত, বটগাছের উপর পাখীর কল-কল শব্দ থামিয়া আসিত, তখন দুখীরাম উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া হুঁকা কলিকা লইয়া দাবার উপর বসিত, এবং অন্ধকার দিগন্তের দিকে বসিয়া আপন মনে গুণ্-গুণ্ করিয়া গাহিতে থাকিত—

'পার কর, পার কর বোলে ডাকচি বারে বারে।
মাঝি! বেলা গেল, সন্ধ্যে হলো, যাব দেশান্তরে।'

দুখীরামের পারে যাইবার সময়টা যে খুব কাছাকাছি হইয়াছিল, তাহা নহে। বয়সটা এখনও চল্লিশের ভিতর, কিন্তু এই বয়সেই সে যেন পারে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ পার অপেক্ষা ও পারে সুখের মাত্রাটা

বেশী কি না, সে সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, এ পারের যাতনাটা এতই অসহ্য, জীবনযাত্রাটা এমনই একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল যে, ও পারে গিয়া একটা পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িবার জন্য তাহার প্রাণটা যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিত। তাই সে ও পারে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পর-পারের কাণ্ডারীকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকিত—

> 'শুনেছিলাম যেন পুরাণে তুমি কর্ণধার,
> ভবে কর্‌ছে পারাপার (মরি হায়) ;
> হরি ! তুফান ভারি, রইতে নারি,
> তরী টলমল করে।'

তরী খুবই টলমল করিতেছিল, তুফানও ছিল। সে তুফানে দুখীরাম যখন তরীটাকে সামলাইতে পারিত না, তখন ব্যাকুলভাবে পারের কাণ্ডারীকে আহ্বান করিত।

২

দুখে ঢুলীর যে এমন অবস্থা হইতে পারে, ইহা কেহ কখনও কল্পনাই করিতে পারে নাই। যাহার ঢোলের শব্দ শুনিলে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক ছুটিয়া আসিত, যাহার সম্মুখে বড় বড় ঢুলীরাও ঢোলে ঘা দিতে সাহস করিত না, বড় বড় জমীদারেরাও এক দিন পয়সা দিয়া যাহাকে পাইত না, সেই দুখীরামকে যে এক দিন ঢোল ছাড়িয়া জুতা শেলাই করিয়া খাইতে হইবে, ইহা যেন লোকের ধারণার অতীত। কিন্তু ধারণার অতীত ঘটনাটাও যখন চোখের উপর বাস্তবিক ঘটিয়া গেল, তখন অদৃষ্টের উপর নিতান্ত অবিশ্বাসী লোকেরাও অদৃষ্ট না মানিয়া থাকিতে পারিল না।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ঢুলী যুধিষ্ঠির বাইতির নিকট দুখীরাম ঢোল শিখিয়াছিল। শুধু শিখে নাই, অল্প দিনের মধ্যে গুরুর বিদ্যাটা এমত অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহাতে গুরুও আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এক দিন এক বড় আসরে গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। শ্রোতৃবর্গ রুদ্ধশ্বাসে এই প্রতিযোগিতার জয়-পরাজয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির সে দিন যেন সারা জীবনের সমগ্র শিক্ষা, সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া গুরু শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধের চেষ্টা কিন্তু সফল হইল না। দুখীরাম যখন তেওটের মধ্যে কাওয়ালীকে টানিয়া আনিয়া পরমের মুখে তেওটের তেহাই দিবার জন্য হাত তুলিল, গুরু তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে হাত গুটাইয়া

লইয়া ঢোলের উপর হাত দুইটা রাখিল। দুখীরামেরও তেহাই সম্পূর্ণ হইল না, সে একটা তেহাই দিয়া গুরুর দিকে চাহিতেই দ্বিতীয় তেহাই দিতে উদ্যত হাতটা আর নামাইতে পারিল না; ত্রস্তভাবে কাঁধ হইতে ঢোলটা নামাইয়া গুরুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। গুরু হাত দুইটা বাড়াইয়া দুখীরামের গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বাহবা দুখীরাম, তুইই আমার নাম রাখতে পারবি।'

দুখীরাম উপুড় হইয়া পড়িয়া গুরুর পায়ের ধূলা মাথায় দিল। শ্রোতৃবৃন্দ দুখীরামের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে দুখীরামের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। বিবাহে, পূজায় ঢোলের বাজনার জন্য দুখীরামকে বায়না দিতে বড়লোকমাত্রই আগ্রহান্বিত হইত। কবি বা তর্জ্জার আসরে দুখীরামের ঢোল না বাজিলে আসর যেন আদৌ জমিত না।

দুখীরামের এই আকস্মিক উন্নতিতে অনেক ঢুলীই ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে গ্রামের বদন ঢুলীই প্রধান। বদনেরও একটু নাম যশ ছিল, কিন্তু চন্দ্রোদয়ে খদ্যোতের মত দুখীরামের অভ্যুদয়ে বদনের সে নামটুকু সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া আসিল। যশোহানির জন্য বদন দুখীরামকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিল।

এই সুনামের হানি ছাড়া বদনের ঈর্ষার আর একটু কারণ ছিল। দুখীরামের এই প্রসিদ্ধির সহিত যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, তেমনই তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই মেয়ে দিয়া তাহার প্রসিদ্ধিলব্ধ অর্থের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে সৈরবীর মা প্রধান। সৈরবীর মা সৈরবীকে সাত বৎসর বয়সে একবার সাড়ে তিন গণ্ডা টাকায় দেবীপুরের হারু দাসের কাছে বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু বছর দুই পরে হারু দাস যখন এই ক্রীত সম্পত্তির উপর আপনার স্বত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেল, তখন সৈরবীর মা চারি বৎসর খাওয়ান পরান বাবদ তিন গণ্ডা টাকা লইয়া মেয়েকে পুনরায় অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল। এই দ্বিতীয় পক্ষ মেয়েটার বিনিময়ে কেহই দেড় গণ্ডার বেশী দিতে রাজী হইল না। সৈরবীর মাও কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিল না; সৈরবী পনর বছরে পা দিল, তথাপি মা দেড় গণ্ডা টাকায় তাহাকে কাহারও হাতে দিল না।

মুচীর মেয়ে হইলেও সৈরবীর একটু রূপ ছিল। যৌবনের আবির্ভাবে সে রূপ যেন আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দুখীরাম তিন গণ্ডা টাকা দিয়াই এই বয়স্থা রূপসী মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। কিছু বায়নাও দিল।

ইহাতে কিন্তু বদন দাস তাহার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। একে দুখীরাম তাহার নামডাকের উপর ঘা দিয়াছিল, এখন আবার তাহার মনোনীতা ভাবী পত্নী সৈরবীকেও কাড়িয়া লইল। বদন অনেক দিন হইতে সৈরবীর মূল্য দেড় গণ্ডা টাকা ডাক দিয়া বসিয়া ছিল, এবং তাহার আশা ছিল, এই দেড় গণ্ডাতেই এক দিন সৈরবীর মাকে রাজী হইতে হইবে। বুড়ী বুঝি রাজী হয়-হয় হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ নবাব দুখীরাম তিন গণ্ডা টাকা ডাক দিয়া তাহার আশার মূলে কুঠারাঘাত করিল। উঃ, কি ভয়ানক এই লোকটা! ভগবান ইহার এত অত্যাচার সহিবেন কি? বদন দিনে দুইবার পঞ্চানন্দের গাছতলায় গিয়া মাথা কুটিয়া আসিত। পঞ্চানন্দ অনেকের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিলেও, বদনের আন্তরিক প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

৩

সে বৎসর গ্রামে দুই দলে খুব প্রবল আড়াআড়ির সহিত বারোয়ারী আরম্ভ হইয়াছিল। আড়ম্বরে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য উভয় দলেই যথেষ্ট উদ্যমের সহিত আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল। দুইটা দলই প্রবল; এক দলের কর্ত্তা পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট বলরাম ঘোষ; অপর দলের অধ্যক্ষ জীবন রায়। বলরাম বাবুর পক্ষে কলিকাতার ভূষণ দাস ও মতি রায়ের যাত্রার বায়না হইল; আর জীবন রায়ের পক্ষ চাকীপুরের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলাই বৈরাগী ও বসন্তবাড়ীর নটবর দাসকে বায়না দিয়া আসিল। সেই সঙ্গে কবির আসরে বাজাইবার জন্য দুখীরামের বায়না হইল।

এখানে বায়না লইবার পর অপর পক্ষ দুখীরামকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাকে দ্বিগুণ অর্থের প্রলোভন দেখাইল। দুখীরাম কিন্তু সে প্রলোভনে ভুলিল না। কেন না, সে কবির আসরে বায়না পাইলে আর কোনও বায়নাই গ্রহণ করিত না। কবির আসরে উভয় পক্ষে যখন তুমুল সঙ্গীত-সংগ্রাম চলিত, সুরের কায়দায়, রাগরাগিণীর ঘোরফেরে,

নূতন নূতন তাল লয়ের মধ্য দিয়া জিগীষু পক্ষদ্বয় যখন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য আপনাদের সমগ্র শিক্ষা দীক্ষাকে নিয়োজিত করিতে থাকিত, তখন সেই আড়াআড়ির গানে, সেই ওস্তাদী তালমানের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া দুখীরাম যে আমোদ পাইত, পূজা বা বিবাহের আসরে শুধু শানায়ের একঘেয়ে সুরের সঙ্গে বাজাইয়া তেমন আমোদ সে পাইত না। সুতরাং কবির আসরের বায়না ছাড়িয়া দুখীরাম বলরাম বাবুর পক্ষে বায়না গ্রহণ করিল না।

ইহাতে বলরাম বাবু ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দুখীরামকে ডাকাইয়া আনিয়া বায়না লইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুখীরাম সবিনয়ে জানাইল, সে যখন অপর পক্ষে বায়না লইয়াছে, তখন এ পক্ষে বায়না লইতে অক্ষম। বলরাম বাবু হুকুম দিলেন, 'বায়না ফিরিয়ে দে।'

দুখীরাম হাতযোড় করিয়া সবিনয়ে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'লাখ টাকা দিলেও তা পারব না হুজুর।'

বলরাম বাবুর মুখখানা ভ্রুকুটীভীষণ হইল। কিন্তু দুখীরাম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বদন দাস বায়না লইবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, 'একটু ভাল বাজাতে পাবে ব'লে ও অহঙ্কারে কাউকে মানে না হুজুর। তা নইলে হুজুরের মত লোককে অপমান করে যায়।'

বদনের এই টিপ্পনীতে বলরাম বাবুর ক্রোধটা যেন একটু বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। ভদ্রলোকের প্রতি ছোটলোকের এরূপ অবজ্ঞতার শাস্তি কতটা ভীষণ হইতে পারে, তিনি বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

এক পাড়ায় মাত রায়ের যাত্রার আসরে আখড়াই বাজনা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অপর পাড়ায় কবির আসরে দুখীরামের ঢোলের গুরু-গম্ভীর শব্দে গ্রামখানা মাতিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যাত্রার আসরের ভিড় যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং কবির আসরে লোকের ঠেলাঠেলিতে তিলধারণের স্থান রহিল না।

তখন গাওনা আরম্ভ হইয়াছে; সহস্র সহস্র দর্শকের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলাই বৈরাগী সবেমাত্র সখী-সংবাদের মহড়া ধরিয়াছে—

'ওহে ত্রিভঙ্গ নবজলদাঙ্গ, এ কি রঙ্গ বামে কুব্জা রঙ্গিণী!'

সঙ্গে সঙ্গে দুখীরাম ফাঁকের ঘরে প্রথম তেহাই মারিয়া চৌতালের বোলটা

ধরিয়াছে, এমন সময়ে সহসা উৎসুক জনমণ্ডলীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া লালপাগড়ী-ধারী পুলিসের দল আসরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং দুখীরামের তাল দিবার জন্য উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিল। দুখীরাম ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার আকস্মিক বিস্ময় অপনীত হইবার পূর্ব্বেই এক জন কনেষ্টবল তাহার কাঁধ হইতে ঢোলটা ছিনাইয়া লইয়া এত জোরে দূরে আছাড়িয়া ফেলিল যে, সে আঘাতে ঢোলের কাঠটা ভাঙ্গিয়া দুইখান হইয়া গেল, একটা লোক খুন হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই অগণ্য দর্শকদিগের কে কোথায় যে ছুটিয়া পলাইল, তাহার উদ্দেশ রহিল না। পুলিস দুখীরামের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে বীরদর্পে টানিয়া লইয়া চলিল।

তখন জনশূন্য যাত্রার আসরে একটা ছেলে উঠিয়া কীর্ত্তন ধরিয়াছে—

'তুমি অনাথের নাথ শ্রীপতি শ্রীনাথ দীননাথ দীনতারণ!'

উদ্গত ভক্তির উচ্ছ্বাসে বলরাম বাবু অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

হাজতে গিয়া দুখীরাম জানিতে পারিল যে, গয়ারাম পালের গরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব দিনে গয়ারাম পালের একটা তেজী গরু মাঠ হইতে আসিয়া ছটফট করিতে করিতে হঠাৎ মারা গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, কাটী ঘা (সর্পাঘাত); কেহ বলিয়াছিল, বিষ খাইয়াছে।

এক পক্ষ হাজত বাসের পর আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। জীবন রায়ের দল চাঁদা করিয়া দুখীরামের পক্ষে এক জন উকীল দিল। দুখীরামের বিপক্ষে অনেক সাক্ষী আসিয়াছিল, কিন্তু উকীলের জেরায় তাহাদের সাক্ষ্য টিকিল না; দুখীরামকে গরুর মুখে বিষ দিতে দেখিয়াছে, এ কথা কেহই প্রমাণ করিতে পারিল না। প্রমাণের অভাবে দুখীরাম মুক্তি পাইল।

মুক্তি পাইয়া দুখীরাম ঘরে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু দুইটী জিনিস সে আর ফিরিয়া পাইল না; একটী তাহার প্রিয় ঢোলখানি, দ্বিতীয়, সৈরবী। ঢোলখানি তাহার সমক্ষেই পুলিস কর্ত্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল; আর তাহার হাজত-বাসের মধ্যেই মদন দাস সৈরবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। বলরাম বাবুর অনুরোধে ও আদেশে সৈরবীর বাপকে দুই গণ্ডা টাকাতেই রাজী হইতে হইয়াছিল। মদন বারোয়ারীতে বাজাইয়া দুই টাকা পাইয়াছিল;

বাকী দেড় গণ্ডা টাকা বলরাম বাবুর নিকট কর্জ্জ করিয়াছিল। শুনিয়া দুখীরাম বুকের ভিতর একটা মস্ত আঘাত অনুভব করিল।

কষ্টে সে আঘাতটাকে সামলাইয়া দুখীরাম কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সে আবার একটা নূতন ঢোল কিনিয়া আনিল, কিন্তু সে ঢোল দিয়া তেমন মিঠা আওয়াজ বাহির হইল না। সেটাকে বেচিয়া আর একটা কিনিল; কিন্তু তাহার আওয়াজও দুখীরামের মনের মত হইল না। রঙ্গের মুখে কর্ত্তব দিতে গেলে আওয়াজটা যেন ম্যাড়-ম্যাড় করিত। দুখীরাম সে ঢোলটাও বেচিয়া ফেলিল। এমনই করিয়া সে পাঁচ সাতটা ঢোল বেচিল, কিনিল, কিন্তু তাহার পুরাতন ঢোলের অনুরূপ ঢোল একটাও পাইল না। ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে তালও যেন কাটিয়া যাইতেছে; বাজাইতে বাজাইতে হাতটাও যেন অবশ হইয়া আসে; শ্রোতৃবর্গ যেন বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করে। বিরক্ত হইয়া দুখীরাম ঢোল ছাড়িয়া দিল, এবং জীবিকার জন্য পৈতৃক ব্যবসায় জুতা তৈরী আরম্ভ করিল।

সংজদার লোকেরা বলিল, 'আহা, এমন ওস্তাদ লোকটা জ্যান্তে মরে' রইলো।' বিজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিল, 'হবে না, গুরুর অভিশাপ। গুরুকে আসরের মাঝখানে 'থ' বানিয়ে দিলে, সে অভিশাপ যাবে কোথায়? এমনি ক'রে লোকা ধোপারও নাকি গলায় ছেঁদা হ'য়ে গিয়েছিল।'

দুখীরাম কিন্তু এ সকল কথায় কাণ দিল না। সে গান বাজনার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া সূচ, সূতা, চামড়ার মধ্যেই আপনার মনটাকে ডুবাইয়া রাখিল। যখন চঞ্চল মনটা তাহার ভিতর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভাসিয়া উঠিত, তখন সে তাড়ির ঝাঁপি আর ধেনো মদের বোতল লইয়া বসিত। ঢোলের আওয়াজ কাণে আসিলে কুটীরের ভিতর ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত, এবং তাহাতেও শব্দের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ না হইলে, কাণে আঙ্গুল চাপা দিত। তবে কচিৎ কোনও বিনিদ্র রজনীতে, ঘনঘটাচ্ছন্ন কোনও দুর্য্যোগময় নিশীথে, রজনীর স্তব্ধতা যখন বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিত, তখন সে ছোট বাঁশের বাঁশীটা লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিত, এবং তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনার শূন্য প্রাণের করুণ উচ্ছ্বাস বাহির করিয়া শূন্য প্রান্তরের স্তব্ধ বক্ষকে আকুল করিয়া তুলিত।

৪

সে দিন শীতের সন্ধ্যাটা খুব জমাট শীত ও ঘন কুয়াসার মধ্যে

এমনই একটা গভীর বিষাদের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, দুখীরাম কিছুতেই মনটাকে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিবার পূর্ব্বেই সে তাড়ীর ঝাঁপিটা বাহির করিল। কিন্তু সে দিন সপ্তাহের শেষ দিন; ঝাঁপিটা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। তলায় যেটুকু পড়িয়াছিল, সেইটুকুই ঢালিয়া পান করিল। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। সন্ধ্যা জ্বালিয়া বোতলটা লইয়া দেখিল, তখনও আধ বোতল মজুদ। তাহারই খানিকটা গলায় ঢালিয়া দিয়া, তামাক খাইয়া, দুখীরাম কাজে বসিল। মাথাটা চন্‌-চন্‌ করিতে লাগিল। দুখীরাম জোরে জোরে চামড়ায় ফোঁড় দিতে আরম্ভ করিল।

কাজ কিন্তু হইল না। কয়েকটা ফোঁড় দিতেই দুখীরাম যেন পরিচিত কণ্ঠের মৃদু কাতর আহ্বান শুনিতে পাইল। সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া সে ক্ষণকাল কাণ পাতিয়া শুনিল তার পর লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, সৈরব?'

'হাঁ' বলিয়া সৈরবী ঘরে ঢুকিল। দুখীরাম সরিয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসিল। সৈরবী দরজা ভেজাইয়া দিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। দুখীরাম বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন সময় কি মনে ক'রে সৈরব?'

মৃদুস্বরে সৈরবী বলিল, 'খুদের বাপের অসুখ।'

ব্যস্তভাবে দুখীরাম বলিয়া উঠিল, 'কি অসুখ?'

'জ্বর।'

'কে দেখছে?'

'কেউ না। সে দিন নিতাই কবিরাজ দু'টো বড়ী দিয়েছিল, তাই খেয়ে দু'দিন ভাল ছিল। আজ আবার বিকেল থেকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এয়েছে।'

একটু ভাবিয়া দুখীরাম বলিল, 'কোম্পানীর ডাক্তারখানায় যায় না কেন?'

'কাল যাবে বলছে।'

'আমাকে কি তার সাথে যেতে হবে?'

'না।'

দুখীরাম জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৈরবী

ঘাড়টা নীচু করিয়া আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে বলিল, 'কাল হাকিম বাবুর ছেলের বিয়ে, খুদের বাপ ঢোলের বায়না নিয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট বলরাম বাবুকে অনেকে হাকিম বাবু বলিত। হাকিম বাবুর নাম শুনিয়া দুখীরাম মাথা নীচু করিল। সৈরবী বলিল, 'কাল বিয়ে, আজতো বায়না ফেরৎ দেওয়া যায় না। তার উপর হাকিম লোকের ঘর।'

একটু ভাবিয়া মুখ তুলিয়া দুখীরাম বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু আমি যে ঢোল ছেড়ে দিয়েছি, সৈরব।'

দুখীরাম জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সৈরব তেমনই নতমুখে বলিল, 'তা জানি।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দুখীরাম বলিল, 'আর কাউকে না হয় দেখ্।'

সৈরবী নিরুত্তরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া আস্তে আস্তে দরজাটী ভেজাইয়া দিল। দুখীরাম বসিয়া শাণ-কাঠখানার উপর তুরপুণের বাঁটটা অস্থিরভাবে ঠুকিতে লাগিল।

একটু পরে সে দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, 'সৈরব!'

উত্তর আসিল না। দুখীরাম ব্যস্তভাবে উঠিয়া দরজা খুলিয়া ডাকিল, 'সৈরব, চলে গেলি?'

সৈরবী তখন চলিয়া গিয়াছিল। দুখীরাম ফিরিয়া আসিয়া বোতলের শেষ মদটা সব একনিঃশ্বাসে গলায় ঢালিয়া দিল। তার পর চামড়ায় দুই চারিটা ফোঁড় না দিতেই তাহার চোখ দুইটা এমন অবশভাবে মুদিয়া আসিল যে, তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না; সে যন্ত্রপাতিগুলা একটু সরাইয়া মোটা কাঠখানা মাথায় দিয়াই শুইয়া পড়িল।

পর দিন সকালে উঠিয়াই দুখীরাম তাড়াতাড়ি বদনের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বদন তখন চাটায়ের উপর বসিয়া ময়লা কাঁথাখানা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তামাক টানিতেছিল। দুখীরামকে দেখিয়াই সে বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিল। দুখীরাম জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ?'

বদন তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, 'কাল সারারাত জ্বরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে।'

দুখীরাম বলিল, 'ঔষধপত্তর খাও।'

বদন বলিল, 'আজ কোম্পানীর ডাক্তারখানায় যাব মনে কচ্ছি।'

'তাই যাও' বলিয়া দুখীরাম ঘরের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'যন্ত্রটা কোথায়?'

বদন বিস্ময়ে কোনও উত্তর করিতে পারিল না। ঘরের এক পাশে আড়ায় ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান ঢোলটা ঝুলিতেছিল। দুখীরাম হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া হুঁকাটা বদনের হাতে ফিরাইয়া দিল, এবং ঘরে গিয়া ঢোলটা পাড়িয়া আনিল। তাহার কাপড়টা খুলিয়া দুইটা চাপড় দিয়া আপন-মনে বলিল, 'ঠিক আছে।' বলিয়া পুনরায় তাহাতে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'তা হ'লে আমি হাকিম বাবুর বাড়ী চললাম। 'ক' দিনের বায়না?'

বদন বলিল, 'ছ দিনের। কিন্তু মাগী যে বললে, তুমি রাজি নও?'

দুখীরাম মৃদু হাসিল। বদন ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, 'ভৈরবী!'

দুখীরাম বলিল, 'ওর দোষ নাই। কাল আমি ওকে পষ্ট কিছু বলি নাই।'

বলিয়াই দুখীরাম ঢোলটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বদন হুঁকাটা হাতে লইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুখীরামকে পুনরায় ঢোল কাঁধে করিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল। বলরাম বাবুও কম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি দুখীরামকে বিনা বায়নায় বাজাইতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুখীরাম বলিল, 'আমি বদনের বদলী এয়েছি, হুজুর।'

বলরাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বদনা কোথায়?'

দুখীরাম বলিল, 'তার জ্বর।'

একটু ভাবিয়া বলরাম বাবু বলিলেন, 'তুই বাজা, কিন্তু বদনার সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল, তা আমি দেব না, তুই ও'দিনে বারো আনা পাবি।'

দুখীরাম সবিনয়ে উত্তর করিল, 'পাওনার কথা আমার সঙ্গে কেন হুজুর, আমি বদনের বদলী, পাওনা যা তা বদনের। আমি বাজাতে এয়েছি, বাজিয়ে যাব।'

বলরাম বাবু আর কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু লোকে বড় গোল বাধাইল; দুখীরাম পুনরায় ঢোল কাঁধে লইয়াছে শুনিয়া অনেকেই তাহার বাজনা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। বিবাহের পর দিন সন্ধ্যার সময় যখন প্রসিদ্ধ শানাইদার রঘু হাড়ী বাবুদের শানাই শুনাইতে উদ্যত হইল, তখন অনেকেরই ইচ্ছা হইল, দুখীরাম উহার সঙ্গে উঠিয়া সঙ্গত করুক।

দুখীরাম কিন্তু বাবুর বিনা হুকুমে উঠিতে পারিল না। বাবুও সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও দুখীরামকে উঠিতে হুকুম দিলেন না; অপর এক জন ঢুলীকে শানায়ের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দুখীরাম মাথা হেঁট করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, বলরাম বাবু আজ পূর্ব্ব রাগের প্রতিশোধ লইতেছেন। তাই দুখীরাম উপস্থিত থাকিতে আজ অন্য ঢুলী উঠিয়া তাহার সম্মুখে সঙ্গত আরম্ভ করিল। কিন্তু সে ত এ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ইহাতে তাহার আর মান অপমান কি! তবু যেন দুখীরামের প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল।

কিন্তু গানের সঙ্গে যখন সঙ্গত মিলিল না, শানাইদার মাঝে মাঝে ঢুলীর উপর তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তখন দুখীরাম আর থাকিতে পারিল না; সে ঢোলটা কাঁধে লইয়া উন্মত্তভাবে আসরের মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সমবেত শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া মাথাটা একবার নীচু করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'দোষ যদি কিছু হয় তা হবে, কিন্তু দুখীরাম আজ একবার ঢোলে ঘা না দিয়ে থাকতে পারবে না।'

কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দুখীরাম ঢোলে ঘা দিয়া সঙ্গত আরম্ভ করিল। শ্রোতৃমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। উপযুক্ত সুরের উপযুক্ত সঙ্গতে আসর যেন মাতিয়া উঠিল; বাজনার তালে তালে সুর নাচিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া শ্রোতাদের অন্তর মুগ্ধ করিতে লাগিল; বহুকাল পরে দুখীরাম আজ প্রাণ ভরিয়া বাজাইয়া যেন বিস্মৃতপ্রায় সুখ-স্বপ্নটাকে জাগাইয়া তুলিল। তার পর মুগ্ধ শোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে দুখীরাম কখন যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সঙ্গীতশেষে যখন দুখীরামের খোঁজ পড়িল, তখন শানাইদার বলিল, 'সে চলে গেছে।'

দুখীরাম তখন আপনার কুটীরদ্বারে তাড়ীর ঝাঁপিটা পাশে রাখিয়া হুঁকা হাতে লইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে—

'মাঝি! বেলা গেলো, সন্ধ্যে হলো, যাব দেশান্তরে।'

সে দিন দুখীরামের হাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সে চামড়ার বোঝা, তাড়ীর ঝাঁপি, মদের বোতল দাবার এক পাশে রাখিয়া তামাক সাজিয়া খাইতে বসিল। তখনও ঘরে আলো জ্বলে নাই; শীতের স্তব্ধ সন্ধ্যার মধ্যে অন্ধকার ঘরখানা তাহার প্রাণে যেন কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। উঠিয়া আলো জ্বালিতেও তাহার ইচ্ছা

হইল না; শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

'ঘরে আছিস্?'

চমকিয়া উঠিয়া দুখীরাম উত্তর দিল, 'কে? সৈরব?'

'হাঁ, সারাটা দিন কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি?'

'হাটে গিয়েছিলাম সৈরব।'

উঠানের উপর ঠিক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৈরবী বলিল, 'ঘরে আলোটাও জ্বালতে পারিস্ নি বুঝি? অন্ধকারে ভূতের মত বসে' তামাক টানছিস্।'

দুখীরাম নিরুত্তরে মৃদু হাসিল। অন্ধকারে সৈরবী তাহা দেখিতে পাইল না। হুঁকায় জোরে একটা টান দিয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে দুখীরাম বলিল, 'এমন সময়ে কেন সৈরব?'

সৈরবী বলিল, 'আমি দু'বার এসে তোকে খুঁজে গিয়েছি।'

দুখীরাম উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিল। সৈরবী বলিল, 'আলোটাই ছাই জ্বাল না।'

দুখীরাম উঠিয়া আলো জ্বালিল, এবং কেরোসীনের ডিবাটা দাবার উপর রাখিয়া বলিল, 'বসবি?'

সৈরবী একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'হাঁ, আমি তোর ঘরে কুটুম্বিতে করতে এয়েছি কি না। তোর বাজনার দামটা নে।'

বলিয়া সে আঁচল হইতে দাম খুলিতে লাগিল। দুখীরাম একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, 'বাজনার দাম? আমি কি পয়সার তরে বাজাতে গিয়েছি সৈরব?'

ঝঙ্কার দিয়া সৈরবী বলিল, 'তবে কি জন্য গিয়েছিলি? আমার মাথা খেতে? তা মাথা তো খেয়ে এয়েছিস্।'

দুখীরাম ভীতভাবে সৈরবীর মুখের দিকে চাহিল। সৈরবী বলিল, 'হাকিম বাবুর কাছে না বলে এসেছিস, সৈরবীর কথায় বাজাতে এয়েচি।'

দুখীরাম বলিল, 'সত্যি যা, তা বলেছি।'

তীব্রস্বরে সৈরবী বলিল, 'কবে থেকে এত সত্যিবাদী হ'লি?'

দুখীরাম কোনও উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সৈরবী বলিল, 'আজ হাকিম বাবু ওকে ডাকিয়ে নিয়ে কি লাঞ্ছনাটাই করেছে। বলেছে, হয় তোকে, নয় আমাদের—দেশ থেকে তাড়াবে।'

দুখীরাম নিরুত্তর। সৈরবী তাহার সম্মুখে টাকাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নে, আমি চল্লুম।'

দুখীরাম বলিল, 'শোন্।'

সৈরবী ফিরিয়া দাঁড়াইল। দুখীরাম বলিল, 'টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যা।'

'কেন বল্ তো?'

'আমি তোকে দিচ্ছি।'

সৈরবীর চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কঠোরস্বরে বলিল, 'তার পর?'

'তার পর গাঁ ছাড়তে হয়, আমিই ছাড়বো।'

'সে তোর খুসী। কিন্তু তোর টাকা আমি কেন নিতে যাব? আমাকে কি তুই তেমনি মেয়ে মনে করিস্? আমার মরতে জায়গা ছিল না, তাই সে দিন তোর কাছে এসেছিনু। ছি ছি, তুই এমন!'

বলিয়া সৈরবী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। দুখীরাম বলিল, 'বড্ড অন্ধকার, আলোটা ধরবো?'

'রেখে দে তোর আলো। তোর আলোর মুখে ঝাঁটা, তোর মুখেও—'

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সৈরবী অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। দুখীরাম স্পন্দহীনভাবে দাবার উপর বসিয়া রহিল। শীতের কন্‌কনে বাতাস কানের পাশ দিয়া হু-হু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। সারা দিনের অনাহারে শরীরটা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। দুখীরাম হাত বাড়াইয়া একটা তাড়ীর ঝাঁপি টানিয়া লইল, এবং একনিঃশ্বাসে অনেকটা তাড়ী গলায় ঢালিয়া দিল। মাথাটা চন্-চন্ করিয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া দুখীরাম গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'পার কর, পার কর বলে' ডাকচি বারে বারে।'

গায়িতে গায়িতে তাহার মনটা যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন সে ঝাঁপিটা টানিয়া লইয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া জড়িতকণ্ঠে গায়িতে লাগিল—

'শুনেছিলাম বেদপুরাণে, তুমি কর্ণধার,
ভবে করতে পারাপার;
হরি, তুফান ভারী, রইতে নারি, তরী টলমল করে।'

গান-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট তাড়ীটুকু গলায় ঢালিয়া দিয়া ঝাঁপীটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং উঠিতে গিয়া সেইখানেই ঢলিয়া পড়িল।

পর দিন সকালে ধার্ম্মিক বলরাম বাবু যখন পাপিষ্ঠ দুখীরামকে কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ফেলিয়া গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহাই ভাবিতেছিলেন, তখন চৌকীদার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, সংসারের চিরস্থায়ী আইনের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে দুখীরাম সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছে;—তাহার লাসটা উঠানের উপর ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্য।

"উরুক্ষিতি ও পঞ্চজন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় আর্য্যগণ যেমন আপনাদিগকে 'আর্য্য' বলিতেন, সেইরূপ তাঁহারা 'আয়ু' নামেও পরিচিত ছিলেন। আর্য্য ও আয়ু এই দুই শব্দ যথাক্রমে ঋ ও ই ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই দুই ধাতুর অর্থই গমন করা। (১) মক্ষমূলর আর্য্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন, কৃষক। কিন্তু এরূপ অর্থ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কারণ, আর্য্যগণ যে কৃষিকার্য্য করিতেন, তাহা কৃষ্টি ও চর্ষণি শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তমরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন, আর্য্যগণ প্রথমে বেদিয়ার মত যাযাবর অর্থাৎ ভবঘুরে (nomad) জাতি ছিলেন, সেই জন্য আর্য্য ও আয়ু নামে তাঁহারা আপনাদিগকে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অর্থ আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, গমনার্থক ঋ ধাতু হইতে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের অর্থের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের সকল গুলিই ধর্ম্মাত্মক। ঋ ধাতু হইতে বৈদিক ঋত, ঋতয়ু, ঋতু, আর্য্য প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন। (২) ঋত অর্থে যজ্ঞ, সত্য, ব্রত প্রভৃতি। ঋতয়ু অর্থে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। ঋতু অর্থে যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত কাল। অতএব, আর্য্য

---

(১) যাঃ। আগন্তি। কৃতেন। কর্ম্মণা। চ।—১০।৪৮।৩
কৃত কর্ম্ম দ্বারা আমাতে গমন করে।

(২) অগ্নিঃ। নেতা। ভগঃ ইব। ক্ষিতীনাম্।
দৈবীনাম্। দেবঃ। ঋতুপাঃ। ঋতাবা।—৩।২০।৪
দেব, ঋতুপালক, ঋতরক্ষাকারী অগ্নি ভগসদৃশ দেবপূজক ক্ষিতিদিগের নেতা।

শব্দের '(যজ্ঞ দ্বারা) দেবগণের নিকট গমনকারী' অর্থই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (১)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঋগ্বেদের যুগেই অগ্নিকে প্রথম আয়ু বলা হইত। আর্য্যগণ মনে করিতেন. অগ্নি দেবতাদিগের দূত। যখন তাঁহারা যজ্ঞ করেন, অগ্নিই দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আনয়ন করেন। অতএব, অগ্নিই দেবতাদিগের নিকট প্রথম-গমন-কারী। এই জন্য অগ্নিই 'আয়ু' নামের প্রথম বা প্রধান অধিকারী। ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। যে সকল মানব যজ্ঞ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে আয়ু নামের অধিকারী হইবেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

অতএব, অগ্নির উপাসকগণ, অব্রত দাস, দস্যু প্রভৃতি জাতি হইতে আপনাদিগের প্রভেদ করিতে আয়ু ও আর্য্য এই দুই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে 'অর্য্য' শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অর্থ কোনও স্থলে 'অরি বা শত্রু-সম্বন্ধীয়'; আবার কোথাও 'স্বামী', বা আর্য্য। যে 'অরি' শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ স্বামী (২), এবং যাহা 'রা' হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ, শত্রু, বা অদাতা (৩)। উদ্ধৃত ঋকে 'অর্য্য' শব্দ স্বামী অর্থে ইন্দ্রকেও বুঝাইতে দেখা যাইতেছে। অতএব, গমনার্থক 'ঋ' ধাতুর অর্থ সাধারণ গমন নহে। দেবতা-সম্বন্ধীয় গমনই 'ঋ' ধাতুর প্রকৃত অর্থ।

আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজা বা ধনী ছিলেন, তাঁহাদিগকে 'মঘবান'

---

(১) উরু। জ্যোতিঃ। জনয়ন্। আর্যায়।—৭।৫।৬

আর্য্যের নিমিত্ত বৃহৎ জ্যোতি উৎপাদন করিয়া......।

আর্যায় কর্ম্মবতে জনায় ইতি সায়ন। কর্ম্মবতে অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্ম নিমিত্ত।

যদি। বিশঃ। মানুষীঃ। দেবযন্তীঃ

প্রযস্বতীঃ। ঈড়তে। শুক্রং। অর্চিঃ।—৩।৬।৩

যখন দেবের নিকট গমনকারী, হবিঃপ্রদানকারী মনুষ্য প্রজা দীপ্ত অর্চিকে স্তব করে।

(২) সং। অর্যঃ। গাঃ। অজতি। যস্য। বষ্টি।—১।৩৩।৩

অর্যঃ স্বামিরূপ ইন্দ্রঃ যস্য দেবস্য বষ্টি অসুরেণাপহৃতাঃ গাঃ প্রদাতুং কাময়তে।

অর্থ :—যাহার ইচ্ছা করেন স্বামী (ইন্দ্র) গো সকল (গ্রহণ করিয়া) প্রদান করেন।

(৩) সঃ। অর্যঃ। পুষ্টীঃ। বিজঃ ইব। আ। মিনাতি।—২।১২।৫

অর্যঃ অরেঃ সম্বন্ধীনি পুষ্টীঃ পোষকানি গবাশ্বাদীনি ধনানি আমিনাতি সর্ব্বতো হিনস্তি।

অর্থঃ—তিনি (ইন্দ্র) শত্রুর পোষক ধন সকল বিজসদৃশ সংহার করেন।

বলা হইত (১)। মঘ শব্দ পারসীক মাগি (M gi) শব্দের অনুরূপ। মঘবানদিগকে 'সূরি' নামেও অভিহিত দেখি (২)। অগ্নি ভারত নামে আহূত হইতেন (৩)। অগ্নি যাহাদিগকে ভরণ করেন, তাঁহারাও 'ভারত' নামে অভিহিত হইতেন। সেই জন্য অগ্নিপূজক আর্য্যদিগের আর এক নাম ভারত জন (৪)। আর্য্যগণ আপনাদিগকে তুর নামেও অভিহিত করিতেন;

---

(১) এষঃ। ক্ষেতি। রথবীতিঃ। মঘবা। গোমতীঃ। অনু
পর্বতেষু। অপশ্রিতঃ।—৫।৬১।১৯

এই মঘবান রথবীতি গোমতী (নদীর) নিকট পর্ব্বত সকলে পলায়ন করিয়া বাস করিতেছেন।

মা। মঘোনঃ। পরি। খ্যতং।—৫।৬৫।৬

মঘবানদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

অস্মাকম্। অগ্নে। মঘবৎসু। ধারয়।
অনামি। ক্ষত্রং। অজরং। সুবীর্য্যম্—৬।৮।৬

হে অগ্নে! আমাদিগের মঘবানদিগের মধ্যে অনমনীয় ক্ষত্র (অর্থাৎ বল), অজর সুবীর্য্য স্থাপন কর।

প্র। তৎ। দুঃশীমে। পৃথবানে। বেনে।
প্র। রামে। বোচম্। অসুরে। মঘবৎসু।—১০।৯৩।১৪

অর্থঃ—দুঃশীম, পৃথবা, বেন, রাম, অসুর (এই সকল) মঘবান্দিগের মধ্যে বাক্য বলিতেছি।

(২) অদব্ধেভিঃ তব। গোপাভিঃ। ইষ্টে
অস্মাকম্ পাহি। ত্রিষধস্থ। সূরীন্।—৬।৮।৭

হে তৃতীয় লোক-(অর্থাৎ স্বর্গ)-বাসী! তোমার বলে অপরের দ্বারা অপরাজিত রক্ষা সকলের সহিত আমাদিগের সূরিদিগকে রক্ষা কর।

অধ। সূরিভ্যঃ। সুদিনা। বি। উচ্ছান্।—৭।১৮।২১

অনন্তর সূরিদিগের জন্য সুদিন সকল উদিত হউক।

উভয়াসঃ। জাতবেদঃ। স্যাম। তে
স্তোতারঃ। অগ্নে। সূরয়ঃ। চ। শর্মণি।—২।২।১২

হে জাতবেদ অগ্নে! স্তবকারগণ ও সূরিগণ উভয়ে তোমার সুখ প্রাপ্ত হইব।

(৩) ত্বং। নঃ। অসি। ভারত। অগ্নে। বশাভিঃ। উক্ষভিঃ।
অষ্টাপদীভিঃ আহুতঃ।—২।৭।৫

হে ভারত অগ্নে! তুমি আমাদিগের হও; বশা (অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী), উক্ষ (অর্থাৎ বৃষ), অষ্টাপদী-(অর্থাৎ গর্ভবতী গাভী) দিগের দ্বারা আহুত হও।

(৪) বিশ্বামিত্রস্য। রক্ষতি। ব্রহ্ম। ইদং। ভারতং। জনং।—৩।৫৩।১২

বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র ভারত জনকে রক্ষা করে।

(১) কিংবা তাঁহাদের মধ্যে তুর নামক এক সম্প্রদায় ছিল। শূর, ধৃষ্ণু, তুর ও যোধ, এই সকল নাম একটী ঋকে প্রাপ্ত হই; (২) ইহারা ইন্দ্র-পূজক আর্য্য সম্প্রদায়। ইহারাই সেকালের যোদ্ধা জাতিদিগের অন্তর্গত ছিলেন।

ঋগ্বেদের কালে যাঁহারা রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনু, দ্রুহ্যু, পূরু, তুর্বশ ও যদু প্রসিদ্ধ (৩)। ইঁহাদের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ হইত। ঋগ্বেদে চেদি বংশের ও

---

(১) সুশেবঃ। এবৈঃ। ঔশিজস্য। হোতা

যে। বঃ। এবাঃ। মরুতঃ। তুরাণাম্।—৫।৪১।৫

ঔশিজ-পুত্রের হোতা অশ্ব সকলের সহিত সুখযুক্ত হউন। হে মরুৎগণ! যে সকল অশ্ব তোমাদিগের 'তুর'দিগের।

(সায়নের মতে—শীঘ্রগমনকারী তোমাদিগের যে সকল অশ্ব।)

বিশ্ব। ইৎ। তা। তে। হরিবঃ। শচীবঃ

অভি। তুরাসঃ। স্বযশঃ। গৃণন্তি।—১০৪৯।১১

হে অশ্ববান্, কর্ম্মবান্, স্বকীর্ত্তিযুক্ত! এই সকলই তোমার। তুরগণ তোমার অভিমুখে স্তব করিতেছে।

(২) নহি। ত্বা। শূরঃ। ন। তুরঃ। ন। ধৃষ্ণুঃ

ন। ত্বা। যোধঃ। মন্যমানঃ। যুযোধ।—৬।২৫।৫

তোমার (অর্থাৎ ইন্দ্রের) সহিত শূর নহে, তুর নহে, ধৃষ্ণু নহে, তোমার সহিত যোদ্ধা বলিয়া অভিমানীও যুদ্ধ করে নাই।

(৩) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বশেষু

যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পূরুষু। স্থঃ।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতম্

অথ। সোমস্য। পিবতং। সুতস্য॥—১।১০৮।৮

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। যদি যদুদিগের, তুর্বশদিগের, দ্রুহ্যুদিগের, অনুদিগের, পূরুদিগের মধ্যে থাক, হে বৃষদ্বয়! অতঃপর এখানে আইস, অনন্তর সুতসোম পান কর।

[সায়ন যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু, পূরু প্রভৃতি শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে আধ্যাত্মিক অদ্ভুত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।]

নি। গব্যবঃ। অনবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ

ষষ্টিঃ। শতাঃ সুষুপুঃ। ষট্। সহস্রা।—৭।১৮।১৪

গোকামী অনুগণ ও দ্রুহ্যগণ ছয় হাজার, ছয় হাজার—চিরনিদ্রা গিয়াছিল।

অয়ং। তে। মানুষে। জনে। সোমঃ। পূরুষু। সূয়তে।

তস্য। আ। ইহি। প্র। দ্রব। পিব॥—৮।৫৩।১০

তোমার জন্য এই সোম পূরুদিগের মধ্যে মানুষ জন অভিষব করিতেছে

নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ভোজ-বংশীয় রাজার নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) আর এক রাজ-বংশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা অসমাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বলিয়া মনে করি। (৩) এতদ্ব্যতীত সুমিত্র বংশ (৪) গুঙ্গু জাতি (৫) অজ, শিগ্রু, যক্ষু (৬) রুশম, রুম, শ্যাবক,

---

এখানে আইস, তাহার (অর্থাৎ সোমের) রস পান কর।

ন। মে। পূরবঃ। সখ্যে। রিষাথন।—১০।৪৮।৫

হে পুরুগণ। আমার (অর্থাৎ ইন্দ্রের) বন্ধুত্ব নষ্ট করিও না।

যৎ। দ্রুহ্যবি। অনবি। তুর্বশে। যদৌ
হুবে। বাং। অথ। মা। আ। গতম্।—৮।১০।৫

যখন দ্রুহ্য, অনু, তুর্বশ (ও) যদুর মধ্যে তোমাদের দুইটীকে আহ্বান করে, অনন্তর আমার নিকট এস।

(১) মাকিঃ। এনা। পথা। গাৎ। যেন। ইমে। যন্তি। চেদয়ঃ।—৮।৫।৩৯

যে পথে চেদিগণ গমন করেন, সে পথে কেহ যাইতে পারে না।

(২) ভুজীয়ং। ইৎ। রোহিতস্য। পাকস্থামানম্।
ভোজং। দাতারম্। অব্রবম্।—৮।৩।২৪

ভোজ পাকস্থামাকে, লোহিত (অশ্বের) দাতাকে এই চতুর্থ ঋক্ বলিয়াছি।

(৩) ইন্দ্র। ক্ষত্রা। অসমাতিষু। রথপ্রোষ্ঠেষু। ধারয়।
দিবি ইব। সূর্যং। দৃশে।—১০।৬০।৫

হে ইন্দ্র! অসমাতিদিগের মধ্যে বলবানদিগকে রথপ্রোষ্ঠে ধারণ কর, যেমন দেখিবার জন্য সূর্য্যকে দিবালোকে (ধারণ কর)।

যস্য। ইক্ষ্বাকুঃ। উপ। ব্রতে। রেবান্। মরায়ী। এধতে।
দিবি ইব। পঞ্চ। কৃষ্টয়ঃ। ১০।৬০।৪

যাঁহার (অর্থাৎ অসমাতি রাজার) ব্রতে (অর্থাৎ কর্ম্মে) ধনবান ও শত্রুহন্তা ইক্ষ্বাকু, দিব্য লোকে পঞ্চ কৃষ্টির মত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

(৪) সুমিত্রেষু। দীদয়ঃ। দেবয়ৎসু।—১০।৬৯।৭

দেবভক্ত সুমিত্রদিগের মধ্যে দীপ্ত হও।

(৫) অহং। গুঙ্গুভ্যঃ। অতিথিগ্বং। ইষ্করং। ইষম্
ন। বৃত্রতুরম্। বিক্ষু। ধারয়ম্।—১০।৪৮।৮

আমি (ইন্দ্র) গুঙ্গুদিগের হইতে অন্নসদৃশ সোম-যজ্ঞকারী, বৃত্রসংহারকারী, অতিথিগ্বকে প্রজাদিগের মধ্যে ধারণ করিয়াছি।

(৬) অজাসঃ। চ। শিগ্রবঃ। যক্ষবঃ। চ।
বলিং। শীর্ষাণি। জভ্রুঃ। অশ্ব্যানি।—৭।১৮।১৯

অজগণ, শিগ্রুগণ, ও যক্ষুগণ, অশ্ব মস্তক সকল (ইন্দ্র নিমিত্ত) আহরণ করিয়াছিল।

রুপ, (১) গন্ধার (২) প্রভৃতি জাতির নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের বিষয় পরে কিছু বিস্তারিতভাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল জাতি ভিন্ন অনেক ঋষি-বংশের নাম ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন অথর্ব্বা (৩) ও তাঁহার পুত্র দধীচি, কবি ও তাঁহার পুত্র উশনা, (৪) মনু. ভৃগু, অঙ্গিরা (৫), কুশিক-বংশীয় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, (৬) তৃৎসু-বংশীয় বসিষ্ঠ (৭)

---

(১)　　রুপেকাসঃ। মা। অব। সুধন্তি। অস্তঃ
গব্যাং। সহস্রৈঃ। রুশমাসঃ। অগ্নে।—৫।৩০।১৩

হে অগ্নে। রুশমগণ আমাকে সুন্দর গৃহ ও সহস্র গো দান করিয়াছে।

যৎ। বা। রুমে। রুশমে। শ্যাবকে। কৃপে
ইন্দ্র। মাদয়সে। সচা।—৮।৪।২

হে ইন্দ্র। যখন তুমি রুমে, রুশমে, শ্যাবকে, কৃপে (ইহাদের) সহিত মত্ত হও।

(২)　　গন্ধারীণামিব। অবিকা।—১।১২৬।৭

গন্ধারীদিগের মেষসদৃশ।

(৩)　　যজ্ঞৈঃ। অথর্ব্বা। প্রথমঃ। বি। ধারয়ৎ।—১০।৯২।১০

অথর্ব্বা যজ্ঞ সকলের দ্বারা প্রথম ধারণ করেন।

(৪)　　উশনা। কাব্যঃ। ত্বা। নি। হোতারং। অসাদয়ৎ।
আযজিং। ত্বা। মনবে। জাতবেদসম্।—৮।২৩।১৭

কবি-পুত্র উশনা তোমাকে হোতৃরূপে স্থাপন করিয়াছেন; জাতবেদা তোমাকে মনুর নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে (স্থাপন করেন)।

(৫)　　দ্বিতা। অদধুঃ। ভৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ।—২।৪।২

ভৃগুগণ ইঁহাকে (অগ্নিকে) আয়ুর বিশদিগের মধ্যে দুই ভাগে ধারণ করিয়াছিলেন।

উত। ত্বা। ভৃগুবৎ। শুচে।
মনুষ্বৎ। অগ্নে। আহুত অঙ্গিরস্বৎ। হবামহে।—৮।৪৩।১৩

হে শুচি, আহুত অগ্নে! তোমাকে (আমরা) ভৃগুর মত, মনুর ন্যায়, অঙ্গিরা সদৃশ আহ্বান করিব।

(৬)　　বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্
অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—৩।৫৩।৯

যখন বিশ্বামিত্র সুদাসকে লইয়া যাইতেছিলেন, ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

সসর্পরীঃ। অমতিং। বাধমানা। বৃহৎ। মিমায়।·জমদগ্নি দত্তা।—৩।৫৩।১৫

অজ্ঞানকে দূর করিতে সমর্থা, জমদগ্নি-দত্তা বাণী সকল প্রভূত শব্দ করিতেছে।

(৭)　　বসিষ্ঠস্য। স্তুবতঃ। ইন্দ্রঃ। অশ্রোৎ
উরুং। তৃৎসুভ্যঃ। অকৃণোৎ। উঁ। লোকম্।—৭।৩৩।৫

ভরদ্বাজ (১), শুনহোত্র-বংশ, (২) গৃৎসমদ বংশ (৩) কণ্ব (৪) প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ঋষি-বংশীয়গণ ঋগ্বেদের রচয়িতা ছিলেন। ইঁহারা কোন্ কোন্ রাজার সময়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

যে সকল জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল, তাহাদের যে সকল নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উহাদের বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধে তেমন কিছু বলা হয় নাই। এক্ষণে আমরা উহাদের সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

শত্রু জাতিদিগের মধ্যে পনি নামক এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৫)। উহাদিগকে সম নামেও অভিহিত হইতে দেখি (৬)। সায়নাচার্য্য

ইন্দ্র স্তবকারী বসিষ্ঠের (স্তব) শ্রবণ করিয়াছিলেন; এবং উরুলোককে তৃৎসুবংশকে দান করিয়াছিলেন।

(১) যাভিঃ। বিপ্রং। প্র। ভরদ্বাজং। আবতম।—১।১১২।১২

যে সকল (রক্ষা) দ্বারা বিপ্র ভরদ্বাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) তীব্রঃ। বঃ। মধুমান্। অয়ম্। শুনহোত্রেষু। মৎসরঃ।

এবং। পিবত। কাম্যম্।—২।৪১।১৪

তোমাদিগের শুনহোত্রদিগের মধ্যে এই মধুযুক্ত তীব্র মত্ততাকর (সোম), এই কাম্যকে পান কর।

(৩) তব। বয়া। গৃৎসমদাসঃ। অগ্নে.........।—২।৪।৯

(৪) যেন। আব। তুর্বশং। যদুং

যেন। কণ্বং। ধনস্পৃতম্।

রায়ে। সু। তস্য। ধীমহি।—৮।৭।১৮

যাহার দ্বারা তুর্বশকে, যদুকে রক্ষা কর, যাহার দ্বারা ধনাকাঙ্ক্ষী কণ্বকে ধনলাভার্থ তাহার প্রার্থনা করে।

(৫) অচিত্রে। অন্তঃ। পণয়ঃ। সসন্তু।

অবুধ্যমানাঃ। তমসঃ। বিমধ্যে।—৪।৫১।৩

অচিত্রের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে পণিগণ অজ্ঞানী হইয়া বাস করুক।

(৬) পণেশ্চিৎ। বিম্রদা মনঃ।—৬।৫৩।৩

পণির মন ও (দানার্থ) কোমল কর।

তয়া। সমস্যা। হৃদয়ং। আরিখ।

কিকিরা। কৃণু।—৬।৫৩।৮

তাহার (অর্থাৎ অঙ্কুশের) দ্বারা সমের হৃদয় কাটিয়া কিকিরা কর।

[অঙ্কুশ এক প্রকার সূক্ষ্ম লোহার দণ্ড।]

সম অর্থে শত্রু করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পণি জাতি আর্য্যদিগের সমকক্ষ ও সমানবর্ণ ছিল বলিয়া সম নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ইহারা ধনবান বাণিজ্যকারী ও কুসীদজীবী জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) ইহারা কিন্তু আর্য্যদিগের মত যজ্ঞ করিত না, এবং আর্য্য ঋষিদিগকে দান (২) করিত না। সেই জন্য তাহারা দেবত্ব ও মঘ পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যেমন পৃথিবীতে পণি জাতি ছিল, সেইরূপ দেবলোকেও দেবশত্রু-রূপে দেব-পণি ছিল, আর্য্যগণ এরূপ বিশ্বাস করিতেন। এই দেবপণিদিগের সহিত সূর্য্য, ঊষা, অগ্নি, গো লইয়া ইন্দ্রাদি আর্য্য দেবতাদিগের বিবাদ হইয়াছিল। আর্য্যদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, দেবপণিদিগের শ্রেষ্ঠ 'বল' কোনও সময়ে সূর্য্য, অগ্নি, গো, ঊষা হরণ করে। (৩)

উত। ব। নেমঃ। অস্তুতঃ। পুমান্। ইতি। ক্রবে পণিঃ।
সঃ। বৈরদেয়ে। ইৎ। সমঃ।—৫।৬১।৮

অর্থ—এবং নেম অস্তুত পুরুষ পণি ইহা বলি। সে বৈরদেয়বাসী সম।

ভৃত্যৈ। অগ্নে। সমসা। যৎ। অসন্। মনীষাঃ —১০।২২।৪

অর্থ—সমের ভরণীয় অন্নের নিমিত্ত যাহা (আছে) মনীষিগণ প্রাপ্ত হউন।

(১) ন। রেবতা। পণিনা। সখ্যং। ইন্দ্রঃ
অসুন্বতা। সুতপাঃ। সং। গৃণীতে।—৪।২৫।৭

সোমপানকারী ইন্দ্র, যাহারা সোমযজ্ঞ করে না, এরূপ ধনবান পণির সহিত সখ্য উচ্চারণ করেন না।

ইন্দ্রঃ। বিশ্বান্। বেকনাটান্। অহঃদৃশঃ
উত। ক্রত্বা। পণীন্। অভি।—৮।৬৬।১০

সকল কুসীদজীবী, দিবসগণনাকারী পণিদিগের অভিমুখে (গমন করিয়া) কার্য্য দ্বারা (অভিভব করে)।

চোষ্কূয়মাণঃ। ইন্দ্র। ভূরি। বামম্
মা। পণিঃ। ভূঃ। অস্মৎ। অধি। প্রবৃদ্ধ।—১।৩৩।৩

হে প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র! ভূরি শোভন (দ্রব্য) দাতা হও; আমাদিগের হইতে অধিক পণি যেন না হয়।

[সায়ন অর্থ করেন—অস্মৎ অধি অস্মাসু পণির্ম্মাভূঃ ব্যবহারী মাভূঃ। গবাং মূল্যং আযাচস্বেত্যর্থঃ। অর্থাৎ, আমাদিগকে গবাদি প্রদান করিয়া পণির মত (অর্থাৎ ব্যবসায়ীর মত) মূল্য লইও না।]

(২) ন। দেবত্বং। পণয়ঃ। ন। আনশুঃ। মঘম্ —১।১৫১।৯

পণিগণ দেবত্বকে, মঘকে প্রাপ্ত হয় নাই।

(৩) সঃ। উষাং। অবিন্দৎ। সঃ। স্বঃ। সঃ
অগ্নিং। সঃ। অর্কেণ। বি। ববাধে। তমাংসি।

প্রাচীন নবগ্ব দশগ্ব অঙ্গিরাগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবের সাহায্যে পণিদিগের নিকট হইতে উহাদিগকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনা ঋগ্বেদে কিম্বদন্তী-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা ইহা হইতে অনুমান করি যে, আর্য্য ও পণিগণ পূর্ব্বে এক দেশেই বাস করিতেন। কিন্তু এক সময়ে সেখানে পণিগণের প্রভুত্বই অধিক হইয়াছিল। ক্রমে আর্য্যগণ তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। দেখা যায়, পণ, পণ্য, বিপণি প্রভৃতি বাণিজ্যসংক্রান্ত শব্দ বাণিজ্যপ্রধান পণি জাতির নাম হইতেই উৎপন্ন। পণি জাতির প্রধান দেবতার নাম 'বল'।

সমজাতীয় পণিদিগের নাম ও কর্ম্ম হইতে উহাদিগকে সেমেটিক-জাতীয় ফিনিসীয় বলিয়া মনে হয়। রোমানগণ কার্থেজবাসীদিগের সহিত যে যুদ্ধ করেন, তাহা পিউনিক্ (Punic) যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এসিয়া-মাইনর-বাসী ফিনিসীয়গণ কার্থেজ নগরের প্রতিষ্ঠা করে। আর্য্য রোমানদিগের নিকট ইহারাই পিউনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সকলেই জানেন, বাণিজ্যপ্রধান ও কুসীদজীবী ফিনিসীয়গণ প্রভূতধনবান ছিল। অতএব অনুমান করি, বৈদিক আর্য্যগণ এই জাতীয় লোকের সহিত একই দেশে বাস করিতেন, এবং ইহাদিগের উপর প্রভুত্বও স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে শত-দাঁড়যুক্ত নৌকার উল্লেখ দেখা যায়। (১) বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র-যাত্রারও উল্লেখ আছে। আর্য্য ব্যবসায়ীগণকে বণিক্ বলা হইত। ( ) সম্ভবতঃ 'পণিক' শব্দ হইতে আর্য্যগণ বণিক্ শব্দ প্রাপ্ত

---

(৩) বৃহস্পতিঃ । গোবপুষঃ । বলস্য । নিঃ
মজ্জানং । ন । পর্ব্বণঃ । জভার ।—১০।৬৮।৯

তিনি উহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি গাভী, তিনি অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), তিনি অর্কের দ্বারা অন্ধকার সকল দূর করিয়াছিলেন। বলের গো দেহ হইতে, অস্থি হইতে মজ্জার ন্যায়, ইহাদিগকে বৃহস্পতি বাহির করিয়াছিলেন।

(১) ঊহথুঃ । ভুজ্যুং । অশ্বঃ । শতঅরিত্রাম্ ।
নাবং । আতস্থিবাংসম্ ।—১।১১৬।৫

(অশ্বিদ্বয়) শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় স্থাপন করিয়া ভুজ্যুকে গৃহে বহন করিয়াছিলেন।

বেদ । নাবঃ । সমুদ্রিয়ঃ ।—১।২৫।৭

সমুদ্রে স্থিত (বরুণ) নৌকাদিগকে জানেন।

(২) যয়া । বণিক । বঙ্কুঃ । আপ । পুরীষম্ ।—৫।৪৫।৬

যে (ধী বা যজ্ঞ) দ্বারা বক্র বণিক্ (কক্ষীবান) জল পাইয়াছিলেন।

হইয়াছেন। যে সকল পণি অগ্নি উপাসনা করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহারা আর্য্যদিগের মধ্যে বণিক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দাস ও দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ঋগ্বেদের এক স্থানে দেখা যায়, তাহারা 'অনাসঃ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) সায়নাচার্য্য অনাসঃ অর্থে বলেন,—আস্যরহিতান্ (অর্থাৎ মুখহীন), অতএব বোবা। আমরা অনুমান করি, উহাদের নাক চেপ্টা ছিল। দেখা যায়, যুদ্ধকালে উহারা স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ করিত। (২) ইহাদিগকে 'মৃধ্রবাচ' বলা হইত। (৩) ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পণি, দাস ও দস্যুদিগের ভাষা আর্য্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। উহারা দনুর বিশ ছিল বলিয়া উহাদিগকে 'দানব' বলা হইত। (৪) দানবদিগেরও রাজা ছিল।

যে। অস্যাঃ। আচরণেষু। দধ্রিরে। সমুদ্রে। ন। শ্রবস্যবঃ।—১।৪৮।৩

ধনকামিগণ যেমন সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করেন, সেইরূপ যাহারা তাঁহার (অর্থাৎ উষার) আগমনে (রথ প্রেরণ করেন)।

সমুদ্রং। ন। সংচরণে। সনিষ্যবঃ।—১।৫৬।২

ধনকামী (বণিক)গণ যেমন সমুদ্রে বিচরণ করিতে (নৌকায়)।

(১) অনাসঃ। দস্যূন্। অমৃণঃ। বধেন।—৫।২৯।১০

নাসিকাহীন দস্যুদিগকে বধ (অর্থাৎ বজ্র) দ্বারা সংহার করিয়াছ।

(২) স্ত্রিয়ঃ। হি। দাসঃ। আয়ুধানি। চক্রে।

কিম্। মা। করন্। অবলাঃ। অস্য। সেনাঃ।—৫।৩০।৯

দাস (নমুচি) স্ত্রীদিগকে অস্ত্র করিয়াছিল। ইহার অবলা সেনা আমার কি করিবে?

(৩) নি। দুযোণে। অবৃণক্। মৃধ্রবাচঃ।—৫।২৯।১০

মৃধ্রবাক্যদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছেন।

মৃধ্রবাচঃ হিংসিতবাগিন্দ্রিয়ান্ অসুরান্ ইতি সায়ন।

দনো বিশঃ। ইন্দ্র। মৃধ্রবাচঃ।—১।১৭৪।২

হে ইন্দ্র! মৃধ্রবাক্যযুক্ত দনুর বিশ (অর্থাৎ প্রজা)।

নি। অক্রতূন্। গ্রথিনঃ। মৃধ্রবাচঃ। পণীন্। অশ্রদ্ধান্।

অবৃধান্। অযজ্ঞান্।—৭।৬।৩

অক্রতু, জল্পক, মৃধ্রবাক্যযুক্ত, (হিংসিতবাগিন্দ্রিয়যুক্ত), অশ্রদ্ধাকারী, অবর্দ্ধনকারী, অযজ্ঞ পণিদিগকে।

(৪) নি। মায়িনঃ। দানবস্য। মায়াঃ

অপাদয়ৎ। পপিবান্। সুতস্য।—২।১১।১০

সোমের পানকারী (ইন্দ্র) মায়াবী দানবের (অর্থাৎ বৃত্রের) মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহারা অযাজ্ঞিক। (১) ইহারা অহি বা বৃত্র নামেও অভিহিত হইত। (২) বোধ হয়, ইহারা সর্প পূজা করিত; সেই জন্য ইহারা অহি নামে বিখ্যাত ছিল।

ঋগ্বেদে আমরা মূর, যাতুধান, রাক্ষস, কিমীদিন্ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদিগেরও নাম প্রাপ্ত হই। মূরদিগের দেবগণ গ্রীবাশূন্য বলিয়া বর্ণিত। (৩) এই মূর জাতির অস্তিত্ব আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়েও প্রাপ্ত হইতেছি। কারণ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় ছিলেন বলিয়া লিখিত। যখন আরব দেশের মুসলমানগণ স্পেন অধিকার করেন, তখন স্পেনবাসী আর্য্যগণ তাহাদিগকে মূর আখ্যা প্রদান করেন। অতএব, আর্য্য স্পেনীয়দিগের ভাষায় মূর শব্দ ছিল এবং উহা তাঁহারা শত্রুগণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। সংস্কৃতে মূর শব্দের অর্থ মূঢ়। স্পেনীয় ভাষাতেও ইহার এইরূপ কোনও অর্থ ছিল।

---

(১) [illegible] অব্রতাঃ

[illegible]

হে ইন্দ্র [illegible] পারে নাই।

(২) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হে [illegible] করিতেছেন।

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্

নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।—১।৩২।১১

অহি অর্থাৎ বৃত্র, যাহা রক্ষিত বা লুক্কায়িত, দাস অর্থাৎ বৃত্র, যাহা পালিত জল সকল, পণি যাহা অবরুদ্ধ [illegible] গো সকলের মত, অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল।

(৩) মা তে অমাজুরো যথা

মূরাস ইন্দ্র সখ্যে ত্বাবতঃ।—৮।২১।১৫

হে ইন্দ্র! অমাজুরগণ (অর্থাৎ [illegible]) যেমন তোমার আশ্রয়, মূরগণ যেরূপ সখ্য প্রাপ্ত না হউক।

বি গ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু

মা তে দৃশন্ সূর্য্যমুচ্চরন্তম্।—৭।১০৪।২৪

গ্রীবাশূন্য মূরদেবগণ নাশ প্রাপ্ত হউক। উদীয়মান সূর্য্যকে তাহারা যেন না দেখে।

যাতুধান নামে আর এক জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখা যায়। ইহাদের নানা সম্প্রদায় ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, একটী ঋকে উলূকযাতু, শুশুলূকযাতু, শ্বযাতু, কোকযাতু, সুপর্ণযাতু ও গৃধ্রযাতু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) বোধ হয় ইহারা রাক্ষসজাতীয় ছিল, এবং উলূক শ্ব, কোক, গৃধ্র প্রভৃতি উহাদের উপাধি ছিল। যাতুধান নাম পুরুষ রাক্ষসে এবং শাশদানা নাম স্ত্রীরাক্ষসীতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। (২) কোনও কোনও ঋকে যাতুধান শব্দের পরিবর্ত্তে যাতুজূ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) এই শব্দ দ্বারা কি জূ জাতিকে বুঝাইতেছে?

কিমীদিনগণ ব্রহ্মদ্বেষী, ঘোরদর্শন, আমমাংসভোজনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৪) প্রাচীন মিসরবাসীগণ মিসর দেশকে কমিং (অর্থাৎ কৃষ্ণ) বলিত। কিমীদিনগণ কি কমিংবাসী ছিল? সে কালে কোনও আর্য্যকে যাতুধান বা রাক্ষস বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। (৫) উদ্ধৃত ঋকে শুচি বা শ্বেত রাক্ষস বলায় মনে হয়, রাক্ষসগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। একটী ঋকে উহাদিগকে তমোবৃধ বা অন্ধকারবর্দ্ধক বলা হইয়াছে। (৬) ইহাতে তাহাদের কৃষ্ণবর্ণের আভাস পাওয়া যায়।

---

(১) উলূকযাতুং। শুশুলূকযাতুং। জহি
শ্বযাতুং। উত। কোকযাতুম্।
সুপর্ণযাতুং। উত। গৃধ্রযাতুং
দৃষদা ইব। প্র। মৃণ। রক্ষঃ। ইন্দ্র।—৭।১০৪।২২

হে ইন্দ্র। উলূকযাতু, শুশুলূকযাতু, শ্বযাতু, কোকযাতুকে বিনাশ কর। সুপর্ণযাতু ও গৃধ্র রাক্ষসকে বজ্র দ্বারা সংহার কর।

(২) ইন্দ্র। জহি। পুমাংসং। যাতুধানম্
উত। স্ত্রিয়ং। মায়য়া। শাশদানাম্।—৭।১০৪।২৪

হে ইন্দ্র। পুরুষ যাতুধান (ও) স্ত্রী শাশদানাকে মায়া দ্বারা হনন কর।

(৩) যাতুজূনাং। জামিম্। অজামিম্। প্র। মৃণীহি। শত্রূন।—৪।৪।৫

(৪) ব্রহ্মদ্বিষে। ক্রব্যাদে। ঘোরচক্ষসে
দ্বেষঃ। ধত্তম্। অনবায়ং। কিমীদিনে।—৭।১০৪।২

ব্রহ্মের দ্বেষী, আমমাংসভক্ষণকারী, ঘোরদর্শন, কিমীদিনের জন্য অনবায় দ্বেষ ধারণ কর।

(৫) যঃ। মা। অযাতুং। যাতুধান। ইতি। আহ
যঃ। বা। রক্ষাঃ। শুচিঃ। অস্মি। ইতি। আহ।—৭।১০৪।১৬

অযাতু আমাকে যে যাতুধান বলিয়াছে, কিংবা '(আমি) শ্বেতরাক্ষস হই' যে বলিয়াছে।

(৬) ইন্দ্র সোমা। তপতং। রক্ষঃ। উব্জতং
নি। অর্পয়তম্। বৃষণা। তমঃ বৃধঃ।—৭।১০৪।১

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া দাস ও দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পুর সকল অধিকার করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের বিষয় ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাদের রচিত ঋক্ সকলে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বাঁশের কথা।

আমাদের দেশে গৃহনির্ম্মাণের যে সমস্ত উপাদান আছে, তন্মধ্যে বাঁশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণ ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রকারেও ইহা যে কত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি কাগজ প্রস্তুত জন্যও ইহার আদর হইতেছে। যন্ত্র-সাহায্যে বাঁশগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়; তৎপর সেই খণ্ডিত বাঁশগুলিকে যন্ত্র-সাহায্যে চূর্ণীকৃত করিয়া মণ্ড (Pulp) প্রস্তুত হয়। সেই মণ্ড হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এ দেশে বাঁশও যেরূপ প্রচুর জন্মিয়া থাকে, ইহার ব্যবহারও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঁশ কিরূপে জন্মে, এবং বৃদ্ধি পায়, এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অপরাপর বৃক্ষলতাদির যেমন প্রতি বৎসর কিংবা এক বৎসর অন্তর (১) ফল ফুল হইয়া থাকে, বাঁশ গাছের সেরূপ হয় না। সাধারণতঃ ৩০।৪০ বৎসর (২)

হে ইন্দ্র ও সোম! হে বৃষদ্বয়! রাক্ষসকে সন্তাপ দাও, অন্ধকারবর্দ্ধককে হনন কর, নীচে স্থাপন কর।

(১) চালমুগার (Taraktogenos Kurzii) যে বৎসর ফুল হয়, তার পরের বৎসর সেই গাছের ফল পাকিয়া থাকে।

(২) কোনও কোনও জাতীয় বাঁশের বৎসর বৎসর ফুল হইয়া থাকে। ইহাদের নাম Dandrocalamus Strictus এবং Dandrocalamus Hamiltonii. •

"A few clumps in a forest or a few culms here and there flower every year but at the interval of a certain number of years it flowers gregariously."—Kanjilal's Flora.

Dandrocalamus Strictus নিটোল বাঁশ। কখনও কখনও সামান্য রকমের ফাঁপাও হইয়া থাকে। ইহার গাঁটগুলি উঁচু উঁচু। লাঠী, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ইহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমেরা অনেক সময় এই বাঁশের লাঠী ব্যবহার করিয়া থাকে।

অন্তর ইহার এক একবার ফুল হইয়া থাকে। সেই ফুল হইতে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা পাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বাঁশের ঝাড় ক্রমশঃ মরিয়া যায়। সেই বীজ হইতে ক্রমে চারা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উহা ঝাড়ে (Clump) পরিণত হইয়া থাকে।

বাঁশের চারাটী যখন প্রথম বীজ হইতে জন্মে, তখন উহাকে ঠিক একটী ঘাসের মতন দেখা যায়। উহার ঠিক সেইরূপ পাত্‌লা পাত্‌লা আঁশের ন্যায় শিকড় (Fibrous root) হয়, এবং ডাঁটার (Stalk) গোড়ার দিকটাও সেইরূপ মোটা হইয়া থাকে। যে বৎসর চারাটী জন্মে, সে বৎসর উহার কয়েকটী নূতন পাতা বাহির হওয়া ব্যতীত আর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। দ্বিতীয় বৎসর ঐ চারায় একটী পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সেই পাত্‌লা পাত্‌লা আঁশের ন্যায় শিকড় হইতে উহার একটী নূতন রকমের মোটা মূল (Rhizome) বাহির হইয়া থাকে। সেই মূলের অগ্রভাগ ক্রমে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়া আর একটী চারায় পরিণত হয়। সেই চারা ক্রমে বড় হইয়া তাহা হইতে পুনরায় সেইরূপ আর একটী মোটা মূল (Rhizome) বাহির হয়।

এইরূপে প্রতি বৎসর নবোৎপাদিত চারা হইতে একটী করিয়া মোটা মূল বাহির হইয়া থাকে, এবং সেই মূল হইতে আর একটী নূতন চারা জন্মিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের চারাটী প্রথম বৎসরের চারা অপেক্ষা প্রথম প্রথম কিছু দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ার একটী কারণ আছে। প্রথম বৎসরের চারা হইতে যে মোটা মূলটী বাহির হয়, তাহাতে যথেষ্ট-পরিমাণে চারা-বর্দ্ধনোপযোগী খাদ্যসমূহ (Carbo-hydrates) সঞ্চিত থাকে। পরবর্ত্তী বৎসরের চারা সেই সব সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই উহা প্রথম প্রথম দ্রুত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু কিছু দিন পরে উহার বৃদ্ধির গতি কমিয়া গিয়া পূর্ব্ব বৎসরের চারার ন্যায় সমভাবাপন্ন হয়।

চারা প্রথম বৎসরে সাধারণতঃ ১ ফুট কিংবা ১½ ফুটের অধিক দীর্ঘ হয় না। দ্বিতীয় বৎসরের চারা ফুট তিনেক দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১৯১৩ সনে বাঁশের (১) বীজ হইতে যে চারা জন্মান হইয়াছিল, আমরা ১৯১৭ সনে

Dandrocalamus Hamiltonii খড়ের কাজ অপেক্ষা ইহার দ্বারা ডালা, চাটাই প্রভৃতিই বেশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে কোনও কোনও স্থানে বড়া বাঁশ বলে।

(১) মুলি বাঁশ (বঙ্গদেশ), তড়ই (আসামী), ওতি (কাছাড়) Melocanna Bambusoides.

দেখিয়াছি যে, উহা হইতে প্রায় ১৫ ফিট দীর্ঘ নূতন চারা জন্মিয়াছে। আমরা অনুমান করিলাম, সেই বাঁশের ঝাড় পূর্ণায়তনের হইতে আরও প্রায় ২।৩ বৎসর লাগিবে। আর এক জায়গায় দেখিয়াছি, ১৯১৪ সনে যে ঝাড় (১) বীজ হওয়ায় মরিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে এখন যেরূপ বাঁশ জন্মিতেছে, আশা করা যায়, তাহা ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই ব্যবহারোপযোগী হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বীজ হইতে যে বাঁশের গাছ জন্মিয়া থাকে, তাহা ৮।৯ বৎসরের মধ্যেই সাধারণতঃ পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়।

বাঁশ পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলেও প্রথম বৎসরে যে বাঁশটী (Culm) জন্মে, তাহা অত্যন্ত নরম থাকে। তখন উহার গায়ে প্রতি গাঁটের সঙ্গে একটী করিয়া খোলা (Sheath) জড়ান থাকে। এই সময় প্রথম প্রথম উহাতে কোনও পত্রাদিও থাকে না। গায়ের রঙটা চক্চকে শাদাটে মতন (Waxy) হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের গাছ হইতে যে মোটা মূল বহির্গত হয়, তাহার সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করিয়াই উহা তখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই মোটা মূলগুলিতে এরূপ খাদ্য সঞ্চিত থাকে যে, নূতন চারাটী অঙ্কুরিত হইলে পর ৩।৪ মাসের মধ্যেই উহা পূর্ণাকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ পূর্ণাকার ধারণ করিতেই উক্ত মূলের সঞ্চিত খাদ্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই জন্য নবোদ্গত বাঁশগাছে প্রথম প্রথম পত্রাদি কিছুই জন্মিতে পারে না। কিন্তু ৫।৬ মাস পরে উহাতে সামান্য কিছু পত্রাদির উদ্গম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বর্ষে উক্ত গাছটী আর সেই মোটা মূলের সঞ্চিত খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। এই সময়ে সেই মূলের সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হইয়া যায়। সে তখন মাটী হইতে রস টানিয়া লইয়া নিজেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

মানুষের পাকস্থলী দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, বৃক্ষলতাদির পত্র দ্বারা সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহারা মূল দ্বারা রস টানিয়া পত্রের উপর লইয়া যায়। পত্র বায়ু হইতে বাষ্প (Carbon) টানিয়া লইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেয়। সেই মিশ্রিত দ্রব্যসমূহ আলোক ও পত্রমধ্যস্থিত

---

(১) কালীনরি বাঁশ (বঙ্গদেশ), কালিয়া (আসামী) Oxytenanthera Auriculata.

সবুজ বর্ণের পদার্থ (Chlorophyle) (১) সাহায্যে খাদ্যে পরিণত হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসে। তাহার দ্বারাই উদ্ভিদের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম বর্ষে বাঁশে যে কিছু পাতা জন্মিয়াছিল, সেই পত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় বর্ষের মূলোত্থিত রস প্রচুরপরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। তাহার ফলে এই সময়ে গাছটীতে ক্রমে ক্রমে আরও নূতন পত্র ও শাখা প্রশাখার উদ্গম হইতে থাকে। প্রতি গাঁটের গায়ে যে খোলা (Sheath) জড়ান ছিল, তাহাও ক্রমশঃ আল্‌গা হইয়া মাটীতে পড়িতে থাকে। রঙও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া কালাটে-গোছ হয়। তবে তাহার চাক্‌চিক্য ভাবটী চলিয়া যায় না। এই সময়ে গাছটীকে এরূপ দেখায় যে, তখন অনেকেই ইহাকে ব্যবহারোপযোগী বলিয়া স্থির করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বর্ষের বাঁশ কখনও উপযুক্ত-পরিমাণে শক্ত (lignified) হয় না। ইহা দ্বারা যে কাজ করা যাইবে, অল্পকাল-মধ্যে তাহা ঘুণ ধরিয়া খারাপ করিয়া ফেলিবে।

তৃতীয় বর্ষে গাছটীতে আরও শাখা প্রশাখার উদ্গম হইয়া পত্রাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। উহার সমস্ত খোলাগুলি তখন পড়িয়া যায়। রঙের আর চাক্‌চিক্য থাকে না—বেশ কালাটেগোছের (dull-green) হয়। এই সময়ে উহা উপযুক্তপরিমাণে শক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। এই সময় হইতে অন্যান্য বৃক্ষ-লতাদি যে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বাঁশও সেই নিয়মে বর্দ্ধিত হয়। তখন উহার বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

বাঁশ (২) কিরূপ হারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে দেরাদুন ফরেষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ অস্‌মস্টন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে নিজে পরীক্ষা পূর্ব্বক তাহার ফলাফল (৩) প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

The culms there appeared early in August their growth

---

(১) যে পদার্থ বিদ্যমান থাকায় পত্রের বর্ণ সবুজ হয়, তাহাকেই Chlorophyle বলে।

(২) Dandrocalamus Giganteus, বড় বাঁশ।

(৩) S. Indian Forester, February, 1918.

in height was completed by the end of November. The growth was at first very slow, gradually quickening for 4 to 6 weeks until the bamboo was some 12′ or so in height when a maximum rate of growth was attained which was maintained fairly uniformly for several weeks after which the rate gradually decreased till the end of November when growth ceased.

অর্থাৎ, যে বাঁশটী অগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে জন্মিয়াছিল, তাহা নভেম্বর মাসের শেষভাগেই পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। প্রথমে ইহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। তৎপরে ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া আনুমানিক ১২′ দীর্ঘ হইয়াছিল। ইহার পর ইহার গতি আরও বর্দ্ধিত হইয়া কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে বাড়িতেছিল। তৎপরে ইহার গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নভেম্বর মাসের শেষাশেষি পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়।

তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে যে বাঁশটী নূতন বহির্গত হইয়াছিল, তাহা ৩½ মাসে অর্থাৎ নভেম্বরের শেষভাগে দৈর্ঘ্যে ৭১′ হইয়াছিল। তিনি বলেন, বর্ষাকালের মধ্যভাগেই বাঁশ বাড়িতে থাকে, এবং বর্ষা শেষ হইলেও ২।১ মাস পর্য্যন্ত উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলে শৈত্য ভাব যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, অর্থাৎ রাত্রিকালে যখন বৃষ্টি পড়িতে থাকে, অথবা বৃষ্টিপাতের অব্যবহিত পরেই ইহার বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত হইয়া থাকে।

"The maximum rate of growth is attained when the relative humidity is greatest or in other words when the atmosphere is saturated and this is the condition at night both during and shortly after rains.

মিঃ অসমসটন একাদিক্রমে এক পক্ষকাল উহার বৃদ্ধির গতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ-কালে তিনি দেখিয়াছেন যে, দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে বৃদ্ধির হার প্রায়ই দ্বিগুণ হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম :—

তারিখ	সময়	দৈর্ঘ্য (ফুটে)	বৃদ্ধি দিবা	বৃদ্ধি রাত্রি	২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি (ইঞ্চিতে)
১৯শে অগষ্ট	বেলা—৬টা	৪·১৫	·১১	—	
	সন্ধ্যা—৬টা	৪·২৬			
২০শে ঐ	বেলা—৬টা	৪·৪৬	·২০	·২০	৪·৮
	সন্ধ্যা—৬টা	৪·৬৬			
২১শে ঐ	বেলা—৬টা	৪·৮৬	·১৪	·২০	৪·১
	সন্ধ্যা—৬টা	৫·০০			
২২শে ঐ	বেলা—৬টা	৫·২৭	·২৫	·২৭	৬·২
	সন্ধ্যা—৬টা	৫·৫২			

*　*　*　*

এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৯শে অগষ্ট সন্ধ্যা ৬টায় যে বাঁশটী ৪.২৬´ দীর্ঘ ছিল, ২০শে অগষ্ট ভোর ৬টার সময় তাহা ৪.৪৬´ হইল। অতএব সমস্ত রাত্রিতে উহা ·২০´ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ বাঁশই ১৯শে অগষ্ট ভোর ৬টায় ৪.১৫´ ছিল, এবং সন্ধ্যার সময় উহা ৪.২৬´ ফুট হয়। অতএব দিনমানে উহা কেবলমাত্র ·১১´ বাড়িয়াছিল।

দিনমানে যাহা .১১´ অর্থাৎ ১.৩″ বাড়িয়াছিল, রাত্রিতে তাহা ·২০´ অর্থাৎ ২.৪″ বৃদ্ধি পাইল। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালের বৃদ্ধির হার যে দ্বিগুণ হয়, ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

এই বাঁশের বৃদ্ধির হার এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে ২১শে অগষ্টের সন্ধ্যা ৬টা হইতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ১৩.০″ হইয়াছিল। অর্থাৎ ১০ দিন পূর্ব্বে যাহার বৃদ্ধির হার ২৪ ঘণ্টায় ৪.৮″ ছিল, দশ দিন পরে তাহার বৃদ্ধির হার ২৪ ঘণ্টায় ১৩.০″ হইল। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে উহা দৈর্ঘ্যে ২৩' ফুট হয়। সেই সময় হইতে উহা নয় দিনে ৯.১৮' ফুট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলেও দেখা যাইতেছে যে, ১০ দিন পূর্ব্বে যাহা ১৩.০″ অর্থাৎ দৈনিক ১'—১″ হারে বাড়িতেছিল, দশ দিন পরে তাহারই বৃদ্ধির হার দৈনিক ১'—২″ হইল। এইরূপ আশ্চর্য্য বৃদ্ধির হার খুব কম উদ্ভিদেরই হইয়া থাকে।

বৃদ্ধির হারের এইরূপ তারতম্য অনেকটা বায়ুমণ্ডলের শৈত্যের উপর নির্ভর করে। মিঃ অস্‌মস্‌টন নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

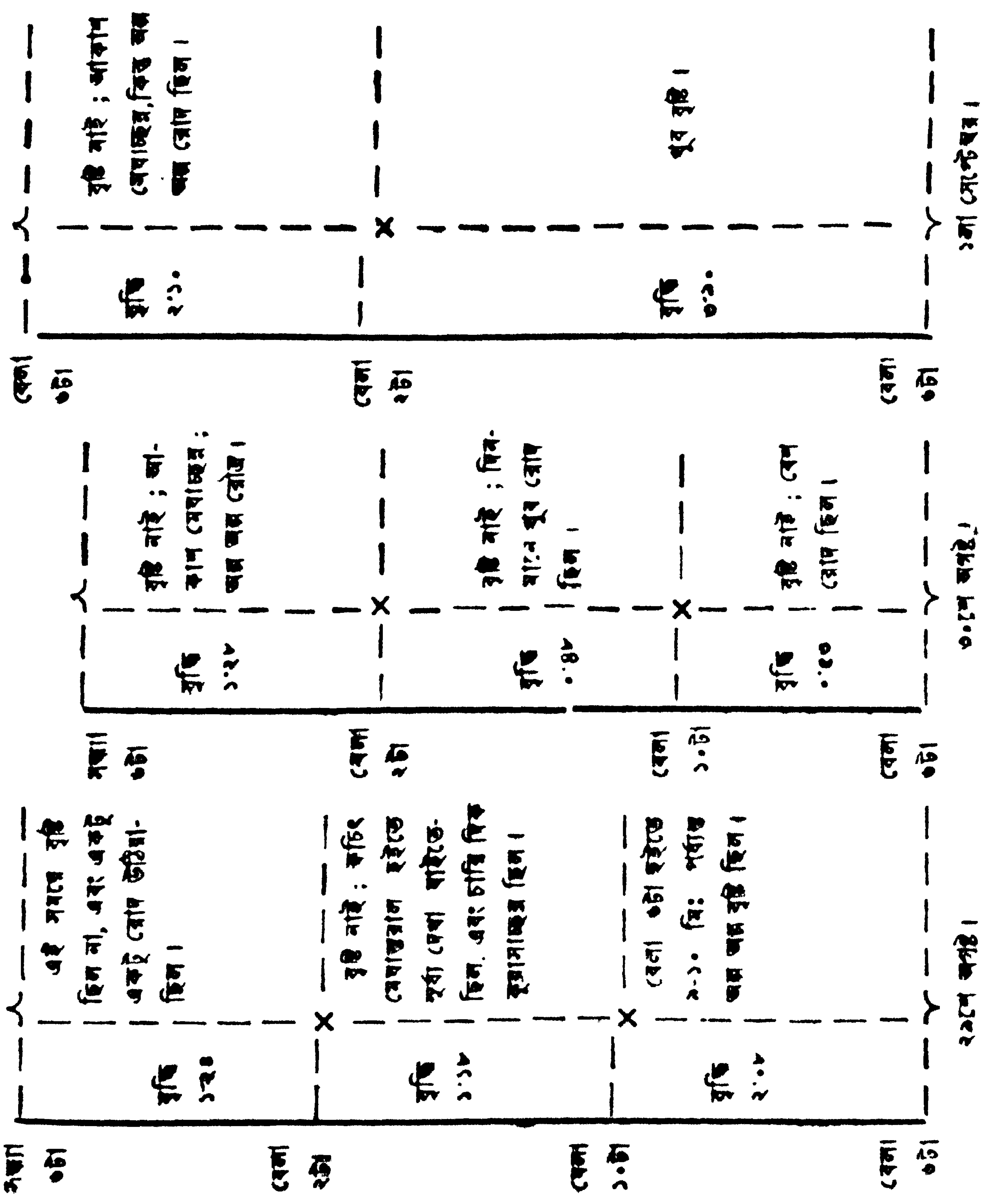

২৯শে অগষ্টের পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত দিবস বায়ুমণ্ডলে শৈত্যাভাব থাকায় সন্ধ্যা ৬টা হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ২০ ঘণ্টায় উহা মাত্র ১.২৪" বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই দিন বেলা ২টা হইতে পরদিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত প্রায় একইরূপে বাড়িতেছিল। কিন্তু সেই দিন বেলা ১০টার পর হইতে পরদিন বেলা ৬টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২০ ঘণ্টায় উহা ২.০৮" বাড়িয়াছিল। এ স্থলে এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার কারণ এই যে, বেলা ৬টা হইতে বেলা ৯—১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সেই দিন অল্প অল্প বৃষ্টি

হইয়াছিল, এবং তৎকালে বায়ুমণ্ডলে যথেষ্টপরিমাণে শৈত্য ভাব বিরাজিত ছিল।

৩০শে অগষ্ট তারিখে যে সময়ে খুব রৌদ্র ছিল, এবং বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে শৈত্যভাবশূন্য ছিল, সেই সময়ে ২০ ঘণ্টায় অর্থাৎ বেলা ২টা হইতে পরদিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত উহা ০·৪৮ মাত্র বাড়িয়াছিল। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর খুব বৃষ্টি থাকায় উহা বেলা ২টা হইতে পরদিন বেলা ৬টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬ ঘণ্টাতেই ৩·৯০" বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বায়ুমণ্ডলের শৈত্যভাব বাঁশের বৃদ্ধির কিরূপ সহায়তা করে, তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। অতএব ইহা এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বায়ুমণ্ডলের শৈত্য ভাব যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, নবোৎপাদিত বাঁশের ডগাটীও (Shoot) তখন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে।

বাঁশের চারা প্রথম উদ্গমের পর হইতে যে কয় মাসের মধ্যে উহা দৈর্ঘ্যে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত না হয়, সেই কয় মাসই ইহা এইরূপ গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তৎপর ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ইহাতে ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখার উদ্গম ও কার্য্যোপযোগী কঠিন (Properly lignified) হওয়া ব্যতীত আর তেমন কোনও বিশেষত্ব থাকে না। তবে শাখা প্রশাখা জন্মিতে আরম্ভ করিলেই যে ইহার খোলাগুলি খসিয়া পড়িতে থাকে, এবং ক্রমশঃ রঙ্গের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বাঁশের ঝাড় বীজ হইতে জন্মান সহজসাধ্য নহে। কেন না, বাঁশের বীজ সহজে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বাঁশের চাষ করেন, তাঁহারা সকলেই কলম (cutting) হইতে ঝাড় জন্মাইয়া থাকেন।

বারান্তরে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন।

প্রাণময় প্রেম।

[Love in a Life—*R. Browning.*]

কক্ষ হ'তে কক্ষান্তর
হর্ম্ম্য মাঝে খুঁজি সারা বেলা,
দুজনে একত্র করি বাস।
হৃদয়! হৃদয় মোর!—ত্যজ শঙ্কা, নিশ্চিত এবার
মিলিবে দর্শন তার—সাক্ষাৎ সে প্রেম-প্রতিমার।
নহে—মিলিবেক শুধু শয্যায় সুবাস—
নহে সে সঙ্কোচভ, যবে চকিতে চঞ্চলা
ত্যজি কক্ষ, রেখে যায় যবনিকা'পর!
দেখিছ না—পর্য্যঙ্কের আস্তরণ-কোণে
অঙ্কিত কুসুমদাম, সংস্পর্শে তাহার
মুকুলিত নব-অনুরাগে?
এখনো যেন সে আভা জাগে
হের, ওই বিমল দর্পণে.
উজ্জল পালখ যবে শিরোপার তুলিল নালাব!

২

তবু ত এ দিন যায়—
শেষ নাহি হয়—কক্ষ দ্বার;
ভাগ্যের পরীক্ষা করি ফিরে—
বিশাল এ হর্ম্ম্য খুঁজি পার্শ্ব হ'তে অন্তঃস্থলে পশি;
একই ফল মিলে ভাগ্যে—আমি পশি' পলায় রূপসী।
কাটাব সারাটা দিন অন্বেষণে কিবে?
কিসের ভাবনা তায়?—হের চারিধার
নামিতেছে ধীরে এবে গোধূলির ছায়;
তার সাথে সন্ধানের অন্ধি-সন্ধি কত
উপনীত, প্রাণে করি আশার সঞ্চার।
বুঝিছ না—আছে খুঁজিবার,
এ আঁধারে এ-ধার ও-ধার,
গোপন-প্রকোষ্ঠ আছে যত
কক্ষা-দরি, তন্ন তন্ন করি সব আছে দেখিবার।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোরা ।

১

আমার মাঝে নাইকো 'আমি' আর,
নূপুর-বেণু শুনিয়ে কবে কার!
আমার পড়া, আমার গুরুপণা,
জ্ঞানের বোঝা, মানের গবেষণা,
সকলি সখা, ফুরিয়ে গেছে আজ!
ঘুচিয়ে গেছে ধরার সাথে কাজ!

২

আমার এবে কেবলি অনসর!
মনের সাধে লুটাই ধূলি 'পর!
কেমন করে বুকের মাঝে মোর,
উথলে কেন আকুল আঁখি-লোর,
কেমন করে বল্‌ব সখা, আর!
বোঝার সে যে, নয় গো বোঝাবার!

৩

স্বপনে হেরি কাহার কাল রূপ!
চমকে উঠি, রইতে নারি চুপ!
কি যেন সে যে কেমন ইসারায়,
কি কথা মোরে জানিয়ে যেন যায়,
বুঝি না কিছু, বুঝিতে নাহি চাই!
আপনা শুধু হারিয়ে ফেলি ভাই!

৪

কোথায় বাজে নূপুর রুণু ঝুনু!
মধুর সুরে বাজায় কেবা বেণু!
জানি না তারে, চিনি না তারে কভু,
পরাণ-মন পাগল করে তবু,
পারি না আর রইতে নদীয়ায়!
কে যেন আজি আমারে শুধু চায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ।—চিত্রকর শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত 'পথহারা'র কল্পনা সুন্দর। ইহার পারিপার্শ্বিক আকাশ, পাহাড়, বনভূমি, তরুলতা প্রাকৃত নহে। গুহা-শিল্পের প্রকৃতি-চিত্রের অনন্যসাধারণ অনুকরণ। অনুকরণে ও অনুসরণেও বটে, নন্দলাল যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে 'ক্লাসিকে'র প্রচুর আভাস আছে। চিত্রকর তাঁহার তুলিকায় ভারতীয় চিত্রের পৌরাণিক যুগের ভাব আনিয়াছেন, তাহাও সত্য। কিন্তু পৌরাণিকের 'নকল'ই কি চিত্র-প্রতিভার চরম? তাহাই কি 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র একমাত্র লক্ষ্য? চিত্রের লতা-গুল্মগুলি কল্পনার রাজ্য হইতে, বা প্রাচীনতম চিত্রকরদিগের চিত্রপট হইতে সংগ্রহ না করিয়া নন্দলাল যদি প্রকৃতি হইতে আহরণ করিতেন, এবং এই ভারতীয় ভাবটিকে ভারতের দৃশ্য-জগতে ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কোনও চিত্রকলা-পদ্ধতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হইত না। এই চিত্রের রেখা-বিন্যাসে, বর্ণের সমাহারে ও সামঞ্জস্যে যে নিপুণতার পরিচয় আছে, স্বভাবের অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ হইত না। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র অনুসারী চিত্রকরগণের মধ্যে, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ে, নন্দলালই বোধ করি, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রতিভাশালী চিত্রকর। এমন প্রতিভা, এমন শক্তি শুধু গতানুগতিকতার অনুবর্তন করিবে? প্রকৃতিকে বর্জন করিয়া চিরকাল গুহা-চিত্রে দাগা বুলাইয়াই তৃপ্তি লাভ করিবে?—চিত্রখানি 'অস্বাভাবিক' হইলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। যাহা উদ্ভটের আবেষ্টনেও এত সুন্দর হইয়াছে, তাহা সত্যে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আরও সুন্দর হইতে পারিত, 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নিতান্ত গোঁড়া ভিন্ন বোধ করি আর কেহ তাহা অস্বীকার করিবেন না। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল হইতে সঙ্কলিত 'আইরিশ যুদ্ধ-গান' পড়িয়া বুড়া বয়সেও রক্ত একটু গরম, মনটা একটু 'চাঙ্গা' হইয়াছিল।

'মনোনিতা' তোরে গড়িল যে ধাতা বিবিধ
বর্ণরাগে—
ইচ্ছা কি তাঁর, অত্যাচারীর চরণ সেথায় জাগে?
চাই মোরা শুধু চির-স্বাধীনতা,
স্বপনেও যেন ভুলি না সে কথা,
স্বাধীনতা মোর স্বদেশ-দেবতা;
বলগে ও-দলে—
দেশ-শত্রুরে তাড়াতে মোদের অনেক যুঝি-
য়াছে,
তার বিনিময়ে (হোক না ক্ষণিক) যাব না
কারার মাঝে।

মনে কর দেখি হতাহত সেই বিপুল কিও জাতি
ছিল যারা সেই ঘোর দুর্দিনে ত্যজি দারা
সুত সাথী!
শ্যাম তৃণ-বীথি রক্তেতে লাল,
মরণের তরে নর পালে পাল
শির-প্রতিজ্ঞ,—শক্ত মা কপাল
জ্বলেছে 'গুলী' ফেটে!
কিসের শঙ্কা? আজ তোরা সবে আজি
সুযোগ মেতে,
হোক বৃথা মরা, সে-ও ভাল এই অপমানে
বাঁচা হ'তে।

শ্রীকাজী আবদুল ওদুদ 'মুসলমান সাহিত্যিক' প্রবন্ধে যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নবীন মুসলমান সাহিত্যের জন্যই উদ্দিষ্ট বটে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পক্ষেও কাজি সাহেবের অনেক পরামর্শ সুপথ্য। ইনিও মামুলী প্রথামত বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানের মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের সার-সত্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণ এখন বঙ্কিমের ও তাঁহার পরবর্ত্তী হিন্দু লেখকগণের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিতেছেন; 'ঢিলটির বদলে পাটকেল' বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও হিন্দু পত্র বা হিন্দু লেখক তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। কাজি সাহেব নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ও জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফলের বিচার করিয়াছেন,—'আমাদের অল্প কয়েক জন সাহিত্যিক প্রতিশোধ লইবার জন্য সৃষ্টিতে মন দিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু-সাহিত্যিক মুসলমানের নানা বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁদের কৃত কর্ম্মের প্রতিশোধের জন্য তাঁহারা হিন্দু-সাহিত্যিকদের উল্টা সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ হিন্দু লেখকেরা যেরূপ যেরূপ অবস্থায় হিন্দুর চেয়ে মুসলমান-চরিত্র হীন দেখাইয়াছেন, মুসলমান লেখকেরা ঠিক সেইরূপ সেইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া হিন্দুকে মুসলমান অপেক্ষা হীন অঙ্কিত করিতেছেন। এক পক্ষের এরূপ অন্যায় করা এবং অপর পক্ষের এরূপ প্রতিশোধ লওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের সংবাদ নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বাংলার সন্তান, উভয়ের সমবেত চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে; এ ক্ষেত্রে এই দুই জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষের ভাব থাকিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে বড় অকল্যাণের কথা। কিন্তু আঘাত করিলেই প্রতিঘাত পাওয়া স্বাভাবিক। প্রায় সকল সাহিত্যেই কবির লেখনীর আঘাত অক্ষয় হইয়া আছে। মুসলমান মহাকবি ফেরদৌসি মাহমুদ গজনবীর কুৎসা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিশোধ-লিপিতে বেশী মুন্সিয়ানা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এবং সাহনামার মত অমর কাব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ থাকার জন্যই উহা আজও লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। অথবা ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথা। আয়েশার চরিত্রাঙ্কনের জন্য মুসলমান সাহিত্যিক তাঁহাকে এই বলিয়া গালি দেন যে, তাঁহার এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পাঠানদের অন্দর-মহলে অবরোধপ্রথা খুবই দৃঢ় ছিল; সে ক্ষেত্রে আয়েসা ও জগৎসিংহের ভালবাসা হওয়া দূরে থাকুক, দেখা হওয়াই অসম্ভব। এ অভিযোগ যে সত্য, তাহা কোন সমালোচকই অস্বীকার করিতে পারেন না, কেন না বঙ্কিমচন্দ্র "কৎলুখাঁ" ও "ওসমান"কে এমন উদার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই যে, তাঁহারা সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য শত্রুকে অন্তঃপুরে স্থান দিবেন। কিন্তু সত্যদৃষ্টি সমালোচক এই কথা বলিয়াই ত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি উড়াইয়া দিতে পারেন না। কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই রসের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ত বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ ধরা যায় না। এই যে বিপন্ন বীরের প্রতি নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, এই যে মিলনের চিত্র—যে মিলন জাতি, সমাজ, পারিবারিক বন্ধন—সমস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নিজের মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে সৃষ্টি ত কোন সাহিত্যরসিকই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।' কাজি সাহেব এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন,—'কবি বা ঔপন্যাসিক যদি তাঁহার সৃষ্টিতে এমন কিছু রস না দিতে পারেন যাহা

মানুষের আত্মাকে তৃপ্ত করে, তবে শুধু গালাগালির জন্যই কেহ তাঁহার কাব্যকে আদর করিবে না।' তাঁহার অনেক পরামর্শই, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর পক্ষেই হিতকারী; মনোহারী না হইলেও তাহা উভয় সম্প্রদায়েরই চিন্তনীয়। শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'আল্হা' উপাদেয় প্রবন্ধ। 'আল্হা' যুদ্ধের গান। স্থানে স্থানে শ্রোতা ও গায়ক এত উত্তেজিত হইয়া ওঠে যে, শান্তি রক্ষা করা কষ্টকর হয়। সেই জন্য গবর্মেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, সেনানিবাসে গানের সময় সৈনিক শ্রোতারা কোন প্রকার অস্ত্র এমন কি লাঠীও সঙ্গে রাখিতে পাইবে না।' বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস্ এলিয়ট যখন যুক্ত-প্রদেশের ফররুকাবাদ জেলার সেটল-মেণ্ট অফিসর ছিলেন, তখন আল্হার গান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন। ইলিয়টের সঙ্কলিত 'আল্হা'তে তেইশটি পালা বা 'লড়াই' আছে। পালাগুলি ইতিহাস-মূলক, কিন্তু ইতিহাস নহে। লেখক কয়েকটি পালার গল্প প্রবন্ধে নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমতী সীতাদেবীর 'পুষ্পদূত' সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও প্রাদেশিক গন্ধিত সেকালের আখ্যান। একালের ভঙ্গীর অত্যাচারে সেকালের ছাব ম্লান হইয়াছে। নবীন লেখক ও লেখিকারা কিসের জন্য গুরু-চণ্ডালীর পূজা করেন? যদি বোধসৌকর্য্য তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'বসন্তদেবের বর্ণগন্ধবিচিত্র বনমন্দিরে', 'শুদ্ধান্তপুর', 'লঘুচ্ছন্দপদে', 'স্বর্ণভৃঙ্গার', 'গোপনচারিণী', 'বিরাজ' যাহারা বুঝিবে, তাহারা কি বিরাজের পাশে 'কবুক' না দেখিলেই 'বাঁশ-বনে ডোম-কানা' হইয়া উঠিবে? শ্রীরাধাবল্লভ নাগের 'বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্যে' সেকালের ওকালতী অধিক; পাঁচালীর পরিচয় অল্প। 'বিরাট সমাজ' হইতে যাঁহারা দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। সাহিত্য স্বস্থানেই থাকে। তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। 'শিক্ষিত সমাজের গণ্ডীর বাহিরে বৃহৎ বাঙ্গালী সমাজ পড়িয়া রহিয়াছে।' তাহা সত্য। কিন্তু সে সমাজ যে নিরক্ষরের সমাজ। সে সমাজে তুমি কোন সাহিত্যের প্রচার করিবে? অতীতের ধারা আর অতীতে ফিরিবে না। পুরাতন পাঁচালী গাহিবার, এবং শুনিবার অবকাশ বিধাতা কাড়িয়া লইয়াছেন। পুরাতন যায় যায়। নব যুগের নূতন গানের পাঁচালী যদি নব-যুগের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহা কি সার্থক হইত? যদি আজ জন-সাহিত্যে জনের ভাব ঢালিয়া দাও, জন কি তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে? 'স্মৃতি'র কাল গিয়াছে। স্মৃতি দুর্ব্বল হইয়াছে। এ কালের সাহিত্য পড়িবার সাহিত্য। এই শিক্ষাহীন দেশের 'বৃহৎ বাঙ্গালী সমাজ' কি খাঁটি সাহিত্যও পড়িতে পারিত? শিক্ষার অভাবই এই উদ্ভট বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম দায়ী। তোমরা যাহাকে 'শিক্ষা' বল, যে-ধনে ধনীদিগকে 'শিক্ষিত' বল, তাহা ও তাঁহারাই এই একদেশিক সাহিত্যের স্রষ্টা। বর্ত্তমান শিক্ষা-নীতির তাহাই অবশ্য-ম্ভাবী ফল। 'জন', 'গণ' ও 'সমাজ' আপনার দীক্ষায় দীক্ষিত, জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং বর্ণ-পরিচয়ে, বস্তু-পরিচয়ে, দেশ পরিচয়ে ও ভাব পরিচয়ে অভ্যস্ত হইলে, সেই সমাজ-গত ব্যাপক জ্ঞানের প্রভাবে ও প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যাপক জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইত। শিক্ষিত জন ও গণ সাহিত্যের দাবী করিত; শিক্ষিত জন ও গণ প্রকৃতির নিয়মে সে দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য হইত; জনের ও গণের জন্য খাঁটি সাহিত্যের সৃষ্টি করিত। চাহিদা নহিলে যোগান হয় না। সমগ্র দেশ সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সেই অন্ধকারে তোমার

ইংরেজীনবীশ জোনাকীর দীপ্তি। তাহার ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ। তাহাই ভবিষ্যতের কেন্দ্র। ইতিমধ্যই তাহাতে সোনার ধানের আশা করিও না। জাতীয়তা ও শিক্ষা ও সাহিত্য 'অন্যোন্যাশ্রয়ী'। এক নাহলে অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। জাতীয় সাহিত্যে পূর্ব্ব আদর্শের প্রয়োজন আছে। পূর্ব্ব-বৈভব নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু অতীতের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। নব-যুগের নূতন ভাবের গানও চাই, তাহা শুনিবার কানও চাই। সাহিত্য যদি গান দিতে পারিত, তুমি কান দিতে পারিতে কি? আত্মশক্তির উদ্বোধন—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের 'নান্যোব নান্যোব নান্যোব গতিরন্যথা।' দেশের চার কোটী নর-নারী যদি তোমার পাঠক হইত, তাহা হইলে তুমি হারাণের হেনাকে নারাণের কোলে তুলিয়া দিয়া তাহাদের সাহিত্যের সাধ মিটাইতে পারিতে কি? সে সাহস করিতে কি? সে প্রবৃত্তি হইত কি?

ভারতী। পৌষ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদের অঙ্কিত 'চন্দ্রমুখী' তরল বর্ণের লীলা;—নীল বেষ্টনীর মধ্যে শ্বেত, লঘু গোলাপী ও লঘুতম নীলের বর্ণ রসে ছবিখানি যেন শিল্পী কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, সুনীল আকাশে শুভ্র-মেঘখণ্ডের ক্রোড়ে চন্দ্রবিম্বের মত ভাসিতেছে। দেব-প্রতিমায় যেমন বর্ণচ্ছটা থাকে, তেমনই চিত্রকর রামেশ্বরপ্রসাদ চন্দ্রমুখীর পারিপার্শ্বিকরূপে চন্দ্রবিম্বের আভাস দিয়াছেন; একটা পূর্ণচন্দ্রের 'ক্যালেন্ডার' আঁকিয়া দিয়াছেন! অতএব, ইনি 'চন্দ্র-মুখী'। অতএব, ইহা 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'। অতএব, চন্দ্র-চারিণীর অঙ্গুলিগুলিও সেই ছাঁচে ও ছাঁদে বাঁধা। সেক্সপীয়রের নাটকে আছে—চাষারা দৃশ্যপট আঁকিতে না পারিয়া পর্দ্দায় দৃশ্যের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। রামেশ্বরপ্রসাদ তাহাদিগকেও হারাইয়া দিয়াছেন। এখন 'মরালগামিনী' আঁকিবার সময় ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির শিষ্যগণ চিত্রিতার দুই চরণে দুটি হাঁস আঁকিয়া দিবেন। 'গজেন্দ্র গামিনী'র পালায় নিশ্চয়ই হাতীর ডাক পড়িবে। 'চামর চামর কেশ' যদি ছবির নাম হয়, তাহা হইলে সুন্দরীর মাথায় কিম্বদন্তী চমরী ধরিয়া ছাড়িয়া দাও। যদি 'শুকনাসে'র সৌন্দর্য্য ফুটাইবার ইচ্ছা থাকে, তোমার মানসীর নাকের দাঁড়ে একটি রক্তচঞ্চু, কণ্ঠী-ধারী, হরিৎ টিয়া বসাইয়া দাও। যদি দুইটি চোখকে বাটীতে পরিণত করিয়া, একটাতে তোলা ও আর একটাতে একটু জল আঁকিয়া দাও, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা, নৈবেদ্যের চূড়ায় মোণ্ডা, দুধের উপর চিনির মত মনোহর হইতে পারে। শুনিয়াছিলাম, জলের আলিপনা নিমেষে মিলায়। 'জলের আল্পনা'র ভাগ্যেও তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু মাসে মাসে ধারাবাহিক জলের আল্পনা' চলিয়াছে। লেখকের অধ্যবসায় এবং সম্পাদক-মিথুনের ও পাঠকবর্গের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী এই 'ভারতী'কে উপন্যাসের নৈবেদ্য সাজাইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন। এখন সেই ভারতী জরতী। 'জলের আল্পনা'য় তাহার তৃপ্তি। দেবতাদের ভাগ্যও 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ!' শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের চোখের দেখা' ঐহিক চোখের দেখা বটে, কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক চোখে খুব 'চেঁচাইয়া চাহিয়া' না দেখিলে দেখা দুষ্কর! যথা—

'এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো,
যেখান-সেখান ঘুরে বেড়ায়—কাঁচপোকাটি ধোরো ;
মেরে রেখো কোটোয় তুলে,
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে
টিপ্‌ করে' সই কপালটিতে পোরো ;
এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো।'

মনটি কাঁচপোকা! আরশোলা কাঁচপোকা হয়, শুনিয়াছি। কিন্তু এই কবির কামনায় রচা মন—শুঁয়ে পোকা? সেও কি উন্মাদিনী কল্পনার যোরে কাঁচপোকা হইতে পারিবে? তার পর চিন্তাকে চাবুক লাগাও—সেই পোকাটি ধর, তাহাকে মেরে কোটোয় তুলে রাখো, যখন চুলে গোলাপ পরবে, ঠিক সেই সময়ে—যখন পায়ে আলতা কি বুট পরিবে, খবরদার! সে সময়ে নয়,—টিপ্‌ করে' কপালটিতে পোরো'—ইহার কাছে নৈষধ কোথায় লাগে? এমন সৃষ্টিছাড়া অনুরোধ—এমন কাঁচপোকার কবিত্ব আর কোন্ দেশের গীতিকাব্যে আছে? দ্বিজু রায়ের 'আষাঢ়ে' ইহার কাছে থই পায় না।—কবি আবার উপমায় কালিদাস। তাঁহার 'হংস বলাকা বকের পাখার মত চোখের আগে ভিড় করে সব কত!' আহা! অবস্থা সঙ্গীন, তাহা অবশ্য চোখের দেখা'তেই বুঝা গিয়াছে। এখন কাঁচপোকাটা মাথা হইতে বাহির হইয়া 'ভারতী'র শুভ্র পদ্মবনে ভর করিল। দেখ, যদি চোখের উপর হইতে বকের পাখাগুলা সরিয়া যায়। নতুবা উমেশ রায় মহাশয়ের মহৌষধ—অথবা শিবাম্বুই ব্যবস্থা। অবস্থাবিশেষে কানে অনেক রকম শব্দ বাজে। এ কবির বলব বলা, ইঁহার 'প্রাণের ভিতর সোনার সারং বাজে!' কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিতে হয় 'ভারতী'কে।—'যে জন সেবিবে ও পদ-কমল, তাকেই পড়তে হবে!' শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'প্রতিভার লক্ষণে' অনেক কৌতুকজনক তথ্য আছে।—আতর্থী বলিতেছেন,—'পাগলা-গারদের অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুব ছেলেবেলাতে যাদের প্রতিভা স্ফূরিত হয়, একটু বয়স হলেই তাদের মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, আর পাগলদের ছেলে-পিলেদের ভিতরও এ-রকম অকালপক্বতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।'—অধিকাংশ মাসিকের, বিশেষতঃ 'ভারতী'র কবিকুঞ্জেও ইহার প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইতেছে।—'শীতকালে মিল্টন লিখতে পারিতেন না; বসন্ত কিংবা শরৎ ছাড়া অন্য সময় বাগ্‌দেবী যে তাঁর কাছ থেকে কোথায় সরে পড়তেন, তার খোঁজ পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠত।' কিন্তু এ দেশের মিল্টনেরা শীতের সময়েও পাঠককে নিষ্কৃতি দিতে দেন না। আচ্ছা, নূতন মহাকাব্য 'পৃথ্বীরাজ' কোন্ ঋতুতে লেখা? শ্রী...দেবীর 'কে' নিতান্ত 'ছেলে-ভুলান' গল্প। এতটা কোনও পেটুক গল্প-পাঠকও হজম করিতে পারিবে, এমন আশা করি না। তবে ইহার প্রধান গুণ এই যে, নিরাশ হইবার জন্য পাঠককে দশ বিশ পৃষ্ঠা পড়িয়া মরিতে হয় না। দুই পৃষ্ঠাতেই সে কাজ শেষ হইয়া যায়। 'Brevity is the soul of wit', অতএব, ইহাও witএর দাবী করিতে পারে। কিন্তু তাহাই অভ্যাভাব। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত' সাময়িক উচ্ছ্বাস,—বাঙ্গালী পল্টনের

যুদ্ধ-যাত্রা-কামনার মতই অপূর্ণ। পল্টন মেসোপোটেমিয়ায় গেল, কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রেরিত হইল না।—বাঙ্গালীর ভাগ্য। গানটি সম্বন্ধেও উহাই বক্তব্য। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' চলিতেছে। এবার তৃতীয় প্রস্তাবে লক্ষ্মী-ব্রতের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। উপাদেয়! এত অনুসন্ধানের ফল এমন উপন্যাসের মত মনোরম করিয়া পরিবেশণ করিবার ক্ষমতা সচরাচর দেখা যায় না। প্রতিভা পরশমণির মত; তাহার স্পর্শে রাঙও সোনা হইয়া যায়। প্রতিভাশালী অবনীন্দ্রনাথ অতীত কালের ব্রত ও তাহার বর্ত্তমান রূপ, আশ-পাশের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা, রাজপথের গাড়ী ও খেয়া-ষ্টীমারের বাঁশীর চিত্রেও সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেন; যাহা সাধারণের চোখে Commonplace, তিনি তাহাকেও সুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়া পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শিক্ষা ও সাধনা'য় "Creed of Buddha" নামক গ্রন্থের প্রণেতা, ভাবুক এড্‌মণ্ড হোম্‌সের কল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিয়াছেন। হোম্‌সের মতে,—শিক্ষা মানুষের জীবনের সাধনারই প্রথম সোপান। ভারতেও শিক্ষা সাধনারই সোপান ছিল। হোম্‌স্ মানুষের সাধনাকে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বীজ যেমন বাহিরের আনুকূল্যে অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণায় যত দিন তার বৃক্ষ-জীবন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, কেবলি বাড়িতে থাকে, মানুষের আত্মাও তেমনি পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমে বিকাশিত হইয়া উঠে। কি করিলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি গোড়া হইতেই অবাধে বিকশিত হয়, সেইটিই শিক্ষকের ভাবিবার বিষয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তাহার বৃদ্ধির সহায়তার জন্য প্রকৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি (instincts) দিয়াছেন, যেমন খাইবার এবং হাত-পা নাড়ার প্রবৃত্তি; এই ভাবে অজ্ঞাতসারে শিশুর শরীর পুষ্টিলাভ করিতে থাকে; তেমনি তার আত্মার বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা আছে। যে কেহ শিশুকে লক্ষ্য করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, সে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে ভালবাসে (১) কথা বলা এবং শোনা; (২) অভিনয় করা; (৩) আঁকা; (৪) নাচা এবং গান করা; (৫) প্রশ্ন করা; (৬) জিনিষ তৈরি করা। (১) কথাবার্ত্তা বলা ও শোনাই পরে লেখা ও পড়ার মধ্যে প্রসারতা লাভ করে। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু অন্যান্য জীবনের সঙ্গে তার যোগ স্থাপন করে। (২) শিশু যখন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে, তখন প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা নিজেদের অন্য-কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া, অর্থাৎ প্রবীণ বা আর-কিছু সাজিয়া অভিনয় করে। এই উভয় প্রবৃত্তিতেই দেখা যায় যে, শিশুরা কল্পনা ও সহানুভূতির সাহায্যে বাহিরের প্রাণীদের মধ্যে আপনাদিগকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। (৩) শৈশব হইতেই ছেলেরা ছবি ভালবাসে, পরে নিজেরা আঁকিতে চায়। পেন্সিল ও কাগজ, খড়ি, কয়লা, রংএর বাক্স প্রভৃতি দিলেই শিশু কিছু-না-কিছু আঁকিতে বসিয়া যায়। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু নিজের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আপনার আনন্দ প্রকাশ করে। (৪) নাচে এবং গানে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ, সকলেরই এটি জানা কথা। এই দুইটি প্রবৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে শিশুর জীবন বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে। (৫) শিশুর প্রশ্ন করার অভ্যাসও সুবিদিত। (৬) শিশুকে এক বাক্স খেলনা ইট দিলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি

তৈরির কাজে কাটাইয়া দিবে। * * এই প্রবৃত্তি দুটির সাহায্যে শিশু প্রকৃতির কলকারখানার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পায়। প্রকৃতির এই বারটি জ্ঞানের চাবির দ্বারাই খোলা যায়।—প্রথম দুটি বৃত্তির সাহায্যে শিশুর আত্মা প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়—দ্বিতীয় দুটির সাহায্যে সৌন্দর্য্যের দিকে এবং শেষের দুটির সাহায্যে সত্যের দিকে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের দিকে প্রকৃতি নিজেই অহরহ শিশুর আত্মাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। হোম্‌স্ বলেন, শিক্ষকের কাজ শিশুর এই স্বভাব-দত্ত বৃত্তিগুলির বিকাশের সাহায্য করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই বিকাশের নাট্যলীলায় শিশুকেই প্রধান অভিনেতা করিতে হইবে। শিশু আপনার আনন্দে আপনাকে বড় করিয়া তুলিবে—শিক্ষক বাগানের সুদক্ষ মালীর কাজ করিবেন মাত্র।' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহান্ত' উপলক্ষে 'কবির তিরোধান' লিখিয়াছেন। ইহাতে সমবেদনা আছে, pityও আছে। শেষটাই বোধ হয় মাত্রায় অধিক। শেষ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যতি হোঁচট খাইয়া মরিয়াছে। খুব টানিয়া বোনা। সত্যেন্দ্রনাথের মত কবির যোগ্য কবি-তর্পণ নয়। শেষ দুটি চরণ—

সরস্বতীর পায়ের কাছে যে পদ্মটি ফুটছে ত্রিকাল ধরে,—
কবি জানে,—পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হ'য়ে।

মনোজ্ঞ। বাঙ্গালা দেশে এই tributeই যথেষ্ট। সত্যেন্দ্র প্রভৃতি সেই পদ্মের পাপড়ী হইয়াও যে গোবিন্দ দাসকে তাহার পরাগ হইবার অধিকার দিয়াছেন, ইহাই আমরা ভাগ্য বলিয়া মনে করি। এ দেশে সাহিত্য আপনার গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার প্রথা নাই, তাহা কে না জানে ভবে? 'সোনার কাটি' শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যত্নে কেন্দ্রায়িত গল্প—যাহা নহিলে মাসিকপত্রের সম্পাদককে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হয়। এই সংখ্যার ভারতীর শেষে শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'মাসকাবারি'তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করি,—'* * কমলিনী ও ললিতের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী আমাদের রুচি-রোচন হয় কেমন করিয়া, সেই কথাই আমি ভাবি।' আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলি, লিখিয়াও একটা আনন্দ পাওয়া যায়। তাহাই লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই সকল তুচ্ছ 'কেচ্ছা'র কল্পনা লেখকদের কলমের 'রুচি-রোচন হয় কেমন করিয়া, সেই কথাই আমি ভাবি।'

হিব্রু জাতির ধর্ম্মের মূল।

১

হিব্রু জাতির ধর্ম্মপুস্তকের নাম পুরাতন টেষ্টামেণ্ট। যিশুখৃষ্টের চরিত যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে নূতন টেষ্টামেণ্ট বলে। ইহাই খৃষ্ট-ধর্ম্মবাদীদিগের ধর্ম্মপুস্তক। এই দুই গ্রন্থ বাইবল নামে প্রসিদ্ধ। বাইবল শব্দের অর্থ পুস্তক। পুরাতন টেষ্টামেণ্টের প্রথমেই বিশ্ব-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই বিশ্ব-সৃষ্টি ছয় দিনে সাধিত হয়। যে দেব বিশ্বের সৃষ্টি করেন, বাইবলে তাঁহার নাম ঈলোই। তাঁহার দুইটী দেহ; একটী মনুষ্য-দেহ, এবং অপর প্রেত-দেহ। প্রেত-দেহকে Holy Ghost বলা হয়।

মনুষ্যদেহধারী ঈলোই যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা ঈডেন নামে প্রসিদ্ধ। যিনি হোলি গোষ্ট—তিনিই বোধ হয় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। ঈলেহিম নামে দেব সম্প্রদায় ঈলোইএর অধীনে দেবস্থান ঈডেনে বাস করিতেন। ঈডেনের পূর্ব্ব দিকে যে দেব-উদ্যান ছিল, তাহাতে কর্ম্ম করিবার জন্য আদম ও তৎপত্নী ঈভ নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা কৃষক সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। বাইবেলের মতে ঈলোই আদমকে মৃত্তিকা হইতে গঠন করিয়া প্রাণদান করেন, এবং তাহার আদম নামকরণ করেন। এই দম্পতী সর্পের প্ররোচনায় দেবোদ্যানের জ্ঞান-ফল ভক্ষণ করে। পাছে তাহারা অমৃত-ফল ভক্ষণ করিয়া দেবগণের মত অমর হয়, এই ভয়ে ঈলোই দেবোদ্যান হইতে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন ঈডেনের বাহিরে আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে দেবগণ আদম-বংশের কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন। ঈলোই সম্ভবতঃ এই পাপকর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া আদম-বংশ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। কথিত আছে, এই জন্য জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। কেবল আদমবংশীয় নোহ নামক এক ব্যক্তিকে স্ত্রী পুত্রাদি সহ রক্ষা করিবার জন্য ঈলোই কৃপা-প্রদর্শন করিয়া নৌকা-গঠনের আদেশ প্রদান করেন। এই নৌকা দ্বারা নোহ পরিবার ও জীবজন্তু সহ জলপ্লাবনে রক্ষা পায়। জল কমিয়া ভূমি বাহির হইলেই নোহ অগ্নিবেদী রচনা করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান

ভক্ষণ করিবার অধিকারী ছিল না। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা বাইবলে বর্ণিত অগ্নিপূজক জাতিকে আর্য্যজাতি বলিতে হয়। ভারতীয় আর্য্যদিগের ইন্দ্রের মত, ঈলোই বৃষ্টির আনয়নকারী, বজ্রধারী, ধানুকী, এবং যুদ্ধের দেবতা বলিয়া বর্ণিত।

মিশরে বোধ হয় সকলের প্রথমে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয়, এবং উহারা সর্পপূজক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মিশরজাতীয় লোকের সহিত আর্য্যদিগের বিবাদ বাইবলে সূচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করি।

২

প্রাচীন কালে বাবিলন নগরের দক্ষিণে উর নামে এক নগর ছিল। অতিপূর্ব্বকালে এই নগরে য়িহুদী-জাতীয় অব্রম্ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার পিতা ঐ নগর হইতে কনান দেশে গিয়া বাস করেন। বাইবেল গ্রন্থে দেখিতে পাই, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অব্রমের সহিত কয়েকটী সর্ত্ত করিয়া, তাঁহার বংশকে রাজবংশ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি তাঁহার অব্রম নামের পরিবর্ত্তন করিয়া অব্রহম বা অব্রহ্ম নাম প্রদান করেন। তিনি তাঁহার পত্নীর নামও সরৈ হইতে সারা নামে পরিবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিবারও আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার বংশে পুত্র সন্তান হইলে, কিংবা অন্য বংশ হইতে পুরুষ ক্রয় করিলে, তাহার লিঙ্গাংশ ছেদন করিতে হইবে। পুত্র সন্তান জন্মিবার অষ্টম দিবসে ত্বক্‌চ্ছেদ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। (১)

অব্রহ্মের একটীমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। তাহার নাম ছিল, ঈশাক। একদিন ঈশ্বর তাঁহার ঐ একমাত্র সন্তানকে অগ্নিতে আহুতি দিবার আদেশ করেন। অব্রহ্ম তখনই দুইটী যুবক, নিজ পুত্র ও কাষ্ঠ লইয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে সেই পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইয়া যুবকদ্বয়কে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পুত্র ও কাষ্ঠ লইয়া তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। (২) আনীত কাষ্ঠ দ্বারা একটী বেদি রচনা করিয়া অব্রহ্ম তাহাতে নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়া ছোরা দ্বারা কাটিতে গেলেন। তখন ঈশ্বর আকাশ হইতে বলিলেন, হে অব্রহ্ম! তোমার পুত্রকে কাটিতে হইবে না। আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে, আমার প্রতি তোমার এত ভক্তি।

(১) Genesis, Chap. 17, Verses 1,5,10,11,12 and 15.

(২) Genesis, Chap. 22, Verses 1,2,3,4,5,6,7 and 8.

অনন্তর অব্রহ্ম তথায় একটী মেষকে বদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন। (১) ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদনার্থ জন্তু বধ করিয়া তাহার রক্ত-মাংস অগ্নি-বেদিতে আহুতি প্রদান করিবার প্রথা য়িহুদী জাতি-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহারা মনে করিত, দগ্ধ মাংস ও রক্তোত্থিত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঈশ্বর তুষ্ট হন। (২) মেষ-বলি বোধ হয় নোহের সময় হইতে প্রচলিত ছিল; নচেৎ দেবাদেশক্রমে তথায় মেষ বদ্ধ হইবার কারণ নাই।

উল্লিখিত বর্ণনায় অব্রম্ শব্দ অব্রহ্মে ও সরৈ শব্দ সারাতে পরিবর্ত্তন করিবার মধ্যে, এবং অব্রহ্মের পুত্রের ঈশাক নামকরণে আর্য্যভাবীর হস্ত অনুভব করি। লিঙ্গাংশ ছেদন কর্ম্ম অব্রহ্মের বংশে একটী বিশেষ সংস্কার বলিয়া উহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে এক স্থলে ত্বক্‌চ্ছেদ যজ্ঞের বর্ণনা দেখিতে পাই। সে স্থলের অর্থ সায়নাচার্য্য বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা প্রথম ঐ ঋকগুলির সরল অর্থ করিয়া, পরে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

'বীর সকল স্থূল মেষ পাক করিয়াছিলেন; অক্ষ সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রীড়াস্থলে ছিল; জল সকলের মধ্যে বৃহতী ধনু (লইয়া) দুই জন পবিত্র (অর্থাৎ ছাঁকনি) হস্তে শুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। (৩)

নানা দিক হইতে চীৎকারকারিগণ আসিয়াছিল; নেম পাক করে; অর্ধ পাক করে নাই। এই (কথা) দেব সবিতা আমাকে বলিলেন—একটী কাষ্ঠ (রূপ) অন্ন; একটী ঘৃত (রূপ) অন্ন হইয়াছে। (৪)

চক্রশূন্যা, স্ব-ধারণকারিণী দ্বারা বর্ত্তমান (ও) রক্ষিত গ্রামকে দূর হইতে দেখিয়াছি। স্বামী লোকদিগের যজ্ঞ সেবা করিতেছেন। নবীয়ান্ সদ্য শিশ্ন সকল ছেদন করিতেছেন।' (৫)

---

(১) Genesis, Chap. 22, Verses 9,10,11,12,13,

(২) Leviticus, Chap. 1, Verse 8.

(৩) পীবানং। মেষং। অপচন্ত। বীরাঃ। ন্যুপ্তাঃ। অক্ষাঃ। অনু। দীবে। আসন্। দ্বা। ধনুং। বৃহতীং। অপ্‌সু। অন্তঃ। পবিত্রবন্তা। চরতঃ। পুনন্তা॥—১০।২৭।১৭

(৪) বি। ক্রোশনাসঃ। বিষ্বঞ্চঃ। আয়ন্। পচাতি। নেমঃ। নহি। পক্ষৎ। অর্ধঃ। অয়ং। মে। দেবঃ। সবিতা। তৎ। আহ। দ্রু অন্নঃ। ইৎ। বনবৎ। সর্পিঃ অন্নঃ॥—১৮

(৫) অপশ্যং। গ্রামং। বহমানং। আরাৎ। অচক্রয়া। স্বধয়া। বর্ত্তমানম্। সিসক্তি। অর্যঃ। প্র। যুগা। জনানাং। সদ্যঃ। শিশ্না। প্রমিনানঃ। নবীয়ান্॥—১৯

এই ঋকগুলি হইতে আমরা জানিতেছি যে, কোনও গ্রামে শিশ্নচ্ছেদ যজ্ঞ হইতেছে; ঐ গ্রাম চক্রহীনা স্ব-ধারণকারিণী দ্বারা রক্ষিত। নৌকাই চক্রহীনা রথ-স্বরূপ। অতএব, স্ব বা ঈশ্বর নৌকায় অবস্থিত থাকিয়া গ্রাম রক্ষা করিতেছেন, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এই যজ্ঞে কাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা অগ্নি পূজিত হইতেছেন। নেম নামক ব্যক্তি পাক যজ্ঞ করে; কিন্তু অধ নামক ব্যক্তি পাক করে না। ইহারা চীৎকার করিতে করিতে যজ্ঞে আসিয়া থাকে। স্থূল মেষ পাক করা এবং ধনু ধারণ করিয়া জলে ভ্রমণ করা এই যজ্ঞের বিশেষত্ব। অক্ষ-ক্রীড়ার অর্থ, মনে হয়, আকাশে দেবগণ নক্ষত্র দ্বারা অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। তাহা হইলে, রাত্রিকালে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে।

নোহ জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর তাঁহার সহিত কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামধনু আকাশে স্থাপন করা উহাদের মধ্যে অন্যতম। (১) অতএব, এই যজ্ঞে ধনুর্ধারণ ঐ সর্ত্তের নির্দ্দেশক বলিয়া মনে হয়। স্থূল মেষের বধ নোহের প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ। অব্রহ্মও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখান গিয়াছে। শিশ্নচ্ছেদ যজ্ঞ অব্রহ্মের প্রতিষ্ঠিত। চক্রহীনা স্ব-ধারণকারিণী নৌকা মূসা-প্রতিষ্ঠিত 'আর্ক' নৌকার সদৃশ বলিয়া মনে করি। (২) ঋগ্বেদের ঋষিগণ যজ্ঞকে স্বর্গে যাইবার নৌকা বলিয়া মনে করিতেন। যে ঋত্বিক যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহার উপাধি নবীয়ান্। য়িহুদীদিগের প্রফেটকে নবী বলা হইত। প্রাচীন ব্যাবিলনের প্রফেটগণও নবী নামে খ্যাত ছিলেন। নেম নামক যে ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতেছি, উহার নাম ঋগ্বেদের অপর এক স্থলে বৈবদেয়-বাসী পুরুষ পণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৩) আমরা 'ঋগ্বেদে

সহ-মাতৃ শিপ্রা শিপ্রাণি, শিপ্রঃ, হনু—হনুরাজকনাসিকানি প্রকর্ষেণ হিংসন্। কিন্তু সায়ন ৭।২১।৫ মন্ত্রে শিশ্ন শব্দ পুরুষের লিঙ্গ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) Genesis, Chap. 9, Verse 13.

(২) Exodus, Chap. 25.

(৩) উত। স্ব। নেমঃ। অস্তুতঃ
পুমান্। ইতি। ব্রুবে। পণিঃ।
সঃ। বৈরদেয়ে। ইৎ। সমঃ।—৩।৫৩।১৪

এবং নেম অস্তুত পুরুষ পণি, এই কথা বলি। সে বৈরদেয়-বাসী সম।

[সায়ন ইহার অপর অর্থ করেন। পণিঃ অর্থে স্তোতাহং করিয়াছেন। সম অর্থে, সর্ব্বেভ্যো যাচকার্থঃ।]

আর্য্য ও অনার্য্য' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পণিগণ সম বা সেমেটিক-জাতীয় ফিনিসায় জাতি। প্রাচীন ফিনিসায়া দেশে Berytus (বীরাইতস্) নামে এক নগর ছিল। ইহাই বর্ত্তমান কালে Beyrout (বৈরোৎ) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, ঋগ্বেদে উল্লিখিত বৈরদেয় নগরই বর্ত্তমান বৈরোৎ।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের ৩য় ঋকেও নেম নাম দেখিতে পাই। এ স্থলে দেখি, নেম ইন্দ্রে বিশ্বাসী নহে। আমরা অনুমান করি, ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই সূক্ত রচিত হইয়া যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়াছিল। (১) এই সূক্তে নেম শব্দ পাইয়া প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইনিই সূক্তের ঋষি। এই সূক্ত পাঠ করিলে কাহারও কাহারও এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা নেমকে ঋগ্বেদের অপর স্থলে পণি-বংশীয় পুরুষ-রূপে দেখিতে পাই, তখন আর আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, নেম কোনও ঋষি নহে। দেখান গিয়াছে, সায়ন ৫।৬১।৮ ঋকের ব্যাখ্যাকালে পণি শব্দের স্তবকারী অর্থ করিয়াছেন; বেদের কোথাও কিন্তু পণি শব্দের তিনি এরূপ অর্থ করেন নাই।

ঋগ্বেদে শিশ্নদেব নামক এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। (২) আমার

---

(১) প্র। সু। স্তোমম্। ভরত। বাজয়ন্তঃ
ইন্দ্রায়। সত্যম্। যদি। সত্যম্। অস্তি।
ন। ইন্দ্রঃ। অস্তি। ইতি। নেমঃ। উঁ। ত্বঃ। আহ
কঃ। ঈম্। দদর্শ। কম্। অভি। স্তবাম।—৮।৮৯।৩

হে রণাকাঙ্ক্ষিগণ! ইন্দ্র নিমিত্ত সত্য সুন্দর স্তোম প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, যদি সত্য স্তোম (তোমাদের) থাকে। নেম বলে, ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই, কে ইঁহাকে দেখিয়াছে, কাহার অভিমুখে স্তব করিব?

অয়ম্। অস্মি। জরিতঃ। পশ্য। মা
ইহ। বিশ্বা। জাতানি। অভি। অস্মি। মহ্না।
ঋতস্য। মা। প্রদিশঃ। বর্ধয়ন্তি
আদর্দিরঃ। ভুবনা। দদরীমি।—ঐ। ৪

হে স্তবকারী! এই আমি রহিয়াছি—আমাকে দেখ। এই সমস্ত উৎপন্নদিগের মধ্যে (আমি মহৎ হইয়া রহিয়াছি। যজ্ঞের জ্ঞাতৃগণ আমাকে বর্দ্ধিত করেন; বিদারণশীল (আমি) ভুবন সকল বিদারণ করি।

(২) ন। যাতবঃ। ইন্দ্র। জুজুবুঃ। নঃ
ন। বন্দনা। শবিষ্ঠ। বেদ্যাভিঃ।

মনে হয়, ইহারাই ত্বক্‌চ্ছেদকারী জাতি। ইহাদের বিষয়ই পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্‌গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি। মনে হয়, উদ্ধৃত ঋকের 'বেদ্যা' শব্দ বেডুইন জাতিকে বুঝাইতেছে।

বোধ হয়, অব্রহ্মের দল অব্রহ্মা দস্যু নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১) বাইবেলেও আর্য্য দেবপূজকদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহারা এসিয়া-মাইনরের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য করিতেন। অমরাইট, হিবাইট, অর্কাইট, হিট্টাইট প্রভৃতি নামধেয় জাতি অব্রহ্মের সময়ে ও পূর্ব্বে কনান দেশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল। (২) আমি মনে করি, অমরাইট শব্দে অমৃতপূজক, হিবাইট শব্দে হবি-দাতা, অর্কাইট শব্দে অর্কপূজক ও হিট্টাইট শব্দে হেতি-পূজকদিগকে বুঝাইত। (৩) নিম্নোদ্ধৃত একটী ঋকেই অমৃত, অর্ক ও হব, তিনটী শব্দই বর্ত্তমান। আর্য্যগণ রুদ্র দেবকেই অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, রুদ্রের নাম গ্রহণ করিলে মৃত্যু বা তৎসদৃশ কোনরূপ অনিষ্ট হয়। তাহারা বিশ্বাস করিত, রুদ্রের ধনু ও বাণ আছে। (৪)

সঃ। শর্ধৎ। অর্যঃ। বিষুণস্য। জন্তোঃ

মা। শিশ্নদেবাঃ। অপি। গুঃ। ঋতম্। নঃ।—৭।২১।৫

হে ইন্দ্র! যাতুগণ আমাদিগকে হিংসা না করুক। হে শবিষ্ঠ! বেদ্যাদিগের দ্বারা বন্দনা (হিংসা) না করুক। সেই স্বামী (ইন্দ্র) বিষম প্রাণীদিগের শাসনকর্ত্তা। শিশ্নদেবগণ আমাদিগের যজ্ঞকে যেন নষ্ট করে না।

[শিশ্নদেবা অব্রহ্মচর্য্যাঃ ইতি সায়ন। শিশ্নেন দীব্যন্তি, ক্রীড়ন্তি ইতি শিশ্নদেবাঃ।]

(১) নি। মায়াবান্। অব্রহ্মা। দস্যুঃ। অর্ত।—৪।১৬।৯

মায়াবান্ অব্রহ্মা দস্যু নষ্ট হইয়াছিল।

(২) Genesis, Chap. 10, Verses 16, 17 and Chap. 15, Verses 15, 20.

(৩) ইবে। উঁ। ত্বা। পুরুশাক। প্রযজ্যো

জরিতারঃ। অভি। অর্চন্তি। অর্কৈঃ।

শ্রুধি। হবম্। আ। হুবতঃ। হুবানঃ

ন। ত্বাবান্। অন্যঃ। অমৃত। ত্বৎ। অস্তি।—৬।২১।১০

হে বহুশক্তি, প্রকৃষ্ট যজনীয়! এই ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে অর্ক সকলের দ্বারা অর্চনা করিতেছে। হে অমৃত! হুবান (অর্থাৎ আহূত তুমি) হুবতের (অর্থাৎ আহ্বানকারী আমার) হব (অর্থাৎ স্তোত্র) শ্রবণ কর। তোমার মত (বা) তোমা হইতে (শ্রেষ্ঠ) অন্য কেহ নাই।

পরি। নঃ। হেতিঃ। রুদ্রস্য। বৃজ্যাঃ।—২।৩৩।১৪

রুদ্রের হেতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক।

(৪) অর্হন্। বিভর্ষি। সায়কানি। ধন্ব।—২।৩৩।১০

হে রুদ্র! অর্হ হইয়া ধনু ও সায়ক সকল ধারণ কর। ঋগ্বেদ—২।৩৩।১০।

রুদ্র অগ্নির এক নাম। বোধ হয়, অব্রহ্ম রুদ্রাগ্নিদেবের পূজক ছিলেন। অব্রহ্মও মূসার দেবতা Jealous ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রুদ্রদেবও Jealous দেবরূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। (১)

৩

বাইবেলে দেখিতে পাই, মূসা নামে এক ব্যক্তি ইস্রেলদিগকে মিশরদেশ হইতে উদ্ধার করেন। মূসাই প্রকৃতপক্ষে হিব্রুদিগকে একটী জাতি-রূপে গঠন করেন। মূসার উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতেছি যে, তিনি লেভী-বংশ-সম্ভূত; (২) মিডিয়ান জাতির এক পুরোহিতের কন্যা বিবাহ করেন। (৩) হিব্রুজাতি-গঠনকালে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। (৪) মূসা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহুদীদিগকে মিশর হইতে আনয়ন করেন। (৫) মূসা ও তাঁহার ভ্রাতা আরণ ভিন্ন অপর কাহাকে ঈশ্বর আদেশ প্রদান করিতেন না। ঈশ্বরের মন্দিরে যজ্ঞ করিতে (অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দিতে) কেবল লেভীবংশীয়গণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। (৬) অপর কোনও জু সম্প্রদায়ের ইহাতে অধিকার ছিল না। মূসার ঈশ্বর যুদ্ধের ঈশ্বর ছিলেন। (৭) তিনি বজ্র, অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও বৃষ্টির ঈশ্বর; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে নানা প্রকার রোগ প্রেরণ করেন। (৮) কোনও বংশের উপর অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি তাহাদের সন্তান-উৎপাদন রহিত করিয়া, বংশলোপ করিতেন। এই প্রকার ক্ষমতা অব্রহ্মের ঈশ্বরেও আমরা দেখিতে পাই।

মূসার নিকট যহ্ব যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) যহ্বের আবির্ভাবের পূর্ব্বক্ষণে

(১) মা। ত্বা। রুদ্র। চক্রুধাম। নমোভিঃ
মা। দুঃস্তুতী। বৃষভ। মা। সহূতী।—২।৩৩।৪

হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার সকলের দ্বারা ক্রুদ্ধ করিব না; হে বৃষভ! মন্দস্তুতি দ্বারা (ও) অন্য দেবতা সহিত (তোমাকে) আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধ করিব না।

(২) Exodus, Chap. 2, Verses 1,2,10.
(৩) Exodus, Chap. 3, Verse 1.
(৪) Exodus, Chap. 18, Verse 17.
(৫) Exodus, Chap. 3, Verses 10, 14.
(৬) Number, Chap. 3, Verses 6, 11, 12. Number, Chap. 8.
(৭) Exodus, Chap. 15, Verse 3.
(৮) Exodus, Chap. 9, Verses 23, 18, 15.
(৯) Exodus, Chap. 19, Verses 16 to 21.

সিনৈ পর্ব্বতের উপরে ঘন মেঘের উদয় হইল, এবং বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। বজ্রধ্বনি তাঁহার আগমন ঘোষণা করিল। তূর্য্যধ্বনি শোনা গেল। সিনৈ পর্ব্বত ধূমে আচ্ছাদিত হইল এবং যহ্‌ব অগ্নিবেষ্টিত হইয়া নামিলেন। চুলি হইতে যেমন ধূম উঠে, সেইরূপ ধূম উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সমস্ত পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। যহ্‌ব মুসাকে বলিলেন যে, তুমিই কেবল পর্ব্বতের উপরে থাক; অপর কেহ যেন এখানে না আসে—কারণ, আমাকে দেখিলেই সে মরিয়া যাইবে। কেবল তুমি ও তোমার ভ্রাতা আরণ পর্ব্বতের উপরে আসিতে পারিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, মুসার উপাখ্যান হইতে কি ঐতিহাসিক জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। মুসা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে লেভী বংশ বলা হইত। এই বংশই যহ্‌ব-পূজার পুরোহিত বংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঋগ্বেদে স্তবকারী ঋষি বা ঋত্বিক্‌কে কোনও কোনও স্থলে রেভ নাম দেওয়া হইয়াছে। রেভ শব্দে স্তব করা বুঝাইত। এক জন ঋষির নামও রেভ ছিল, দেখা যায়। (১) মুসা লেভী বা রেভী বংশীয় ছিলেন; ইহা হইতে তিনি কোনও আর্য্যঋষিবংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করি। যহ্‌ব সেই জন্য ঐ বংশকে তাঁহার নবী (বা ঋত্বিক) বংশ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মুসা যজ্ঞের ঋষি, এবং মুসার ভ্রাতা আরণ পুরোহিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, অরণি হইতে তাঁহার আরণ নাম হইয়াছিল। পারসীক মিডিয়ানগণ আর্য্য-বংশীয় ছিল। দেখা যাইতেছে, মিডিয়ানদিগের পুরোহিত-বংশে মুসা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসা যে আর্য্যবংশীয়, আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

বাইবেলে দেহধারী ঈশ্বর ও হোলি গোষ্ট নামক ঈশ্বরের উল্লেখ আছে,

---

(১) তাং। সপ্ত। রেভাঃ। অভি। সং। নবন্তে।—১০।৭১।৩

তাহার (অর্থাৎ বাক্যের) অভিমুখে সাত জন রেভ (অর্থাৎ ঋত্বিক) স্তব উচ্চারণ করে।

[সায়ন এখানে রেভাঃ অর্থে শব্দায়মানাঃ পক্ষিণঃ সপ্ত ছন্দাংসি করিয়াছেন।]

মধু। ছন্দঃ। ভনতি। রেভঃ। ইষ্টৌ।—৮।১১।৩

রেভ (অর্থাৎ স্তবকারী) যজ্ঞে মধুময় স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বিপ্রচৎ। রেভং। উদনি। প্রবৃক্তম্

উৎ। নিন্যথুঃ। সোমং। ইব। স্রুবেণ।—১।১১৬।২৪

গর্ত্তজলে মৃত রেভ (ঋত্বিক) তোমরা (অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়) স্রুবের দ্বারা সোমের মত উঠাইয়াছিলে।

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা বৈদিক যুগে পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ রূপ ধী-র সন্ধান প্রাপ্ত হই। ঋষিগণ মনে করিতেন, এই ধী প্রাপ্ত না হইলে কেহ প্রেয়ের পথ হইতে শ্রেয়ের পথে যাইতে পারে না। এ বিষয়টী কঠোপনিষদে বেশ সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। অতএব, ভারতীয় আর্য্যগণ যাঁহাকে ধী বা হিরণ্যগর্ভ বলিতেন, বাইবেলের ঋষি তাঁহাকেই Holy Ghost আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যিশুখৃষ্টের চরিতেও আমরা দেখিতে পাই। (১)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

কুইনাইন পিল্।

১

দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নানাবিধ আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সত্ত্বেও কি করিয়া গ্রামবাসিগণ কেবলমাত্র কুইনাইন পিলের সাহায্যে আত্মশাসনে দড় হইয়া উত্তরোত্তর দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারে, তাহার তথ্য নির্ণীত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বনমালী ভড়ের দ্বারা।

ভড় মহাশয় পূর্ব্বে বিহারাঞ্চলে কোনও গ্রামে পাটওয়ারী ছিলেন। পাটওয়ারীর পদ দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াতে তিনি দিনকতক কোনও বিখ্যাত ডাক্তারের ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারী করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে কম্পাউণ্ডারগণের পরীক্ষার আইন প্রচার হইলে তিনি সে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে তাঁহার ধারণা হইল যে, ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য কুইনাইন ব্যতীত সুচারুরূপে চলিতে পারে না; সুতরাং তিনি সম্প্রতি যথাসাধ্য কুইনাইনের বড়ি সংগ্রহ করিতেছিলেন।

ইত্যবসরে তাঁহার বিহারীলাল মিত্র ইনকম-ট্যাক্স-আসেসরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিহারীলাল তরুণ যুবা, অতিশয় সুশ্রী চেহারা, ভদ্রবংশজাত। পিতার সম্পত্তি ছিল। সরকারী চাকরীর মধ্যে দেশের উপকারের অনেকগুলি উপায় আছে, এই প্রকার ধারণা উপস্থিত হওয়াতে বিহারী চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, বিহারীলালের বিবাহ নামক জটিল সাংসারিক ধর্ম্ম-পালন ঘটিয়া না উঠাতে, সে মনপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যেই বিহারী সুখ্যাতি লাভ

---

(১) St. Luke, Chap. 3. Verse 22.

করিয়াছিল। জেলার কালেক্টর উড্ সাহেব তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট। এমন কি, দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিহারীলাল ডিপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইবে, সকলের ইহাই ধারণা।

বিহারীলালের প্রধান উদ্দেশ্য, গ্রামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা। ইহার সাধনার পক্ষে বিশেষ এক জন অভিজ্ঞ লোকের দরকার। পূর্ব্বে বিহারীলালের যে কেরাণী ছিল, সে উৎকোচ-গ্রহণের অপরাধে, কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হইলে, যথাসময়ে পদখালির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। বনমালী ভড় মহাশয়ের আবেদনপত্র বিহারীলালের চিত্ত আকর্ষণ করাতে তিনি আহূত হইলেন।

মফঃস্বলে উভয়ের দেখা হইল।

বিহারীলাল। আপনার নাম বনমালী ভড়?

বনমালী। এ নাম এ পরগণায় আর কাহারও নাই। বিশ্বাস না হয়, সেন্সাসের সিডিউল দেখিয়া লউন।

বিহারীলাল। আমি সন্দেহ করি নাই। আমার বক্তব্য যে, আপনার আবেদনপত্র আমি বাছিয়া লইয়াছি। যদি ত্রিশ টাকায় চাকরী স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে আমার সহিত তদন্ত কার্য্যে মাসে অন্ততঃ কুড়ি দিন বাহির হইতে স্বীকৃত হন, তবে আপনাকেই বাহাল করি।

বনমালী। স্বীকার। তবে একটা সর্ত্ত রাখিতে চাহি। আমাকে প্রতি দিন অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা কাল কুইনাইনের বটিকা প্রস্তুত করিতে ও তাহা বক্তৃতা পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে বিলাইতে অনুমতি প্রদান করিতে হইবে, কারণ, দেশ-হিতৈষিতাই আমার প্রধান ব্রত।

বিহারীলাল। আমারও তাহাই। তবে কুইনাইন দ্বারা কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরই কিঞ্চিৎপরিমাণে নিবারিত হয়, ইহাই আমার ধারণা। দেশের অনেক রকম উপকারের পথ আছে।

বনমালী। সকল প্রকার পথেই কুইনাইন কেবল একমাত্র উপায় দেখিতে পাইবেন। এই ঔষধ আমেরিকাজাত। সেখানেই স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্র-শাসনের চরম। বাঙ্গালাতে প্রথমে প্রচারিত হওয়াতে আমরা অন্যান্য অঞ্চল হইতে আত্মশাসনের পথে প্রথমেই অগ্রসর হইয়াছি। ইহাতে পিত্তদমন হয়, অতএব ইন্দ্রিয়দমন হয়। ক্ষুধারও দমন হয়। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যায়। বিদ্যালাভ প্রচুরপরিমাণে ঘটে। যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহাতে ভগবান

ছাড়া আর কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিক্ততার গুণে বিষয়-বাসনার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া শুষ্ক রসনা কেবল হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত বক্তৃতা ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। ইহারই বলে গত শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যত ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে, তাহা অন্য কোনও দেশে হয় নাই। আমেরিকায় খানিকটা হইয়াছিল, তাহাও কেবল ইহারই গুণে। আপনি প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করুন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, সমাজ সম্বন্ধেও আমার সেই বক্তব্য। কুইনাইনের ব্যবহারের পূর্ব্বে 'ভালবাসা' নামক কথা এ দেশে প্রচারই হয় নাই। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাবনা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস বলে না। প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, পিত্তদমন হইলে ও কুইনাইন দ্বারা দেহ সংশোধিত হইলে জাতীয় দোষ থাকে না; এক জাতির সহিত অন্য জাতির, ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডালের, স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ চলিতে পারে। পিণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং এহেন বিবাহে যদি পুত্রসন্তানের অভাবও হয়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই।

বিহারীলাল। আপনার ধারণা অসাধারণ। কিন্তু কত দূর ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। হইতে পারে যে, কুইনাইন-সেবনে জ্বর প্রশমিত হইলে সৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু কুইনাইন তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কুইনাইনের ব্যবহার, এবং স্বায়ত্তশাসন কিংবা অন্য জাতির সহিত বিবাহের প্রস্তাবনা সমসাময়িক হইলেও, হয় ত উভয়ই কোনও অন্যতম কারণের উপসর্গ ও লক্ষণ হইতে পারে। ইহার মধ্যে সত্যটুকু আবিষ্কার করিতে হইবে। যাহা হউক, এখন দুই একখানি গ্রাম পরিদর্শন করা যাউক। এ গ্রামখানি এক কালে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বনমালী। হাঁ। ইহার নাম কালীপুর।

২

কালীপুরের রাজা বদনচন্দ্র সিংহ ও প্রজা স্বরূপচন্দ্র প্রামাণিক, উভয়েই স্বনামধন্য। উভয়ের বাসস্থানের ব্যবধান প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। মধ্যে সনাতন সাহার বসতি।

বদনচন্দ্রের পিতা লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া সে কালে একটা অট্টালিকা

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রজার সংখ্যা বহু। ধান্যে গোলা পূর্ণ থাকিত। ক্রমে প্রজাসত্ব আইন জারি হওয়াতে প্রজাগণ স্বরূপ প্রামাণিককে নেতৃরূপে বরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। সেই মুণ্ডশ্রেণীর ভঙ্গী দেখিয়া বদনচন্দ্রের পিতা মরণকালে পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিলেন 'সাবধান।' বদনচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বাহির হইতে লাঠিয়াল ও উকীলের দল সংগ্রহ করিলেন। দশবৎসরব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের ফলে প্রজাগণকে ঠ্যাঙ্গাইয়া ও উৎখাত করিয়া বদনচন্দ্র জয়নিনাদপূর্ব্বক প্রাসাদের ত্রিতলে বসিয়া নৃত্য, গীত ও নেশায় কিছু দিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক প্রজা পলাইয়া গেল। অনেকে ইস্তফা দিয়া চা-বাগানে ও কয়লার খাদে চাকরী করিতে গেল। বিস্তীর্ণ জমী রাজার খাসদখলে আসিয়া পড়াতে রোডসেসের গুরুভার আরও গুরুতর হইল। খাজনার দশ আনা কমিয়া গেল। যত দুর্ব্বৃত্ত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, অলস ও অকর্ম্মা লোক রাজার স্কন্ধে চাপিয়া তাঁহার মূলধন খাইতে বসিল। বদনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া জমীদারী বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া খট্টাঙ্গশায়ী হইয়া পড়িলেন। রাণী ও রাজপরিবারস্থ সকলে সেই সংবাদ পাইয়া রোগে শোকে বসিয়া পড়িল। দাস দাসী দ্বিতল ও ত্রিতলের গৃহশ্রেণী একাদিক্রমে অধিকার করিয়া গঞ্জিকা-সেবনে তৎপর হইল। নিম্নতলে জীর্ণা গাভী ও ছাগল ও শীর্ণ দরওয়ানমণ্ডলী, ঘোড়ার সহিসের সহিত একত্র হইয়া সান্ধ্য সখ্য স্থাপন করিলে, রাত্রিকালে জনপ্রাণী সে দিকে যাইত না।

কালীপুর ছোটনাগপুরের অন্তর্গত। পূর্ব্বে সেখানে ম্যালেরিয়া ছিল না। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা হইতে অগ্রসর হইল। রাজার অন্ন ও বস্ত্রের ও অর্থের অপব্যয়ের ফলে জ্বর; প্রজার অন্ন ও বস্ত্র ও অর্থের অভাবে জ্বর। রাজার শাল মুড়ি দিয়াও কম্প ও ইনফ্লুয়েঞ্জা; প্রজার উলঙ্গ দেহেও কম্প ও ইনফ্লুয়েঞ্জা। এক জনের বস্ত্র ফেলিয়া দিলে প্রদাহ কমে; অন্যের বস্ত্র পাইলে কমে। অথচ উভয়েরই মানুষের শরীর।

স্বরূপ প্রামাণিক রাজার সহিত লড়িয়া স্বনামধন্য। সম্প্রতি 'সেটেলমেণ্ট্ অফিসার' আসিয়া তাহার পূর্ব্বেকার স্থায়ী জোত-সত্ব অনেক উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরূপের পুণ্যফলে তাহার অদৃষ্টে দুঃসময়। পাপীর বোঝা ভগবান বহেন। পুণ্যবানের বোঝা তাহাকেই বহিতে হয়। সুতরাং সে রোগ ও শোকে শয্যাগত। এত জমী যে, লাঙ্গল ধরিবার লোক নাই।

এত তুলার চাষ ছিল যে, তাহাতেই গ্রামখানির বস্ত্র কুলান হইত। এত সর্ষপের চাষ ছিল যে, কখনও তৈলের অভাব হয় নাই। এত গাভী ছিল যে, সারের অভাব দূরে থাকুক, অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধে গোগৃহের ধরা সিক্ত হইত। পুষ্করিণী ও বাঁধে জল থাকিত, এবং মৎস্য চরিত। সেগুলি এখন শুষ্ক, কিংবা পঙ্কিল। গ্রামে জলাভাব। জল পাওয়া দুষ্কর। যে সকল স্থানে জলাশয় ছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত গজ-কচ্ছপের সংগ্রামে রাজার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। প্রজা যাহাতে জল না পাইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাই উদ্দেশ্য। প্রজার দাসত্ব-স্বীকারের সঙ্গে জলেরও অন্তর্দ্ধান। কাহারও পূর্ব্বেকার জলহীন বাঁধে হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। এখন সে স্বত্ব পুনর্গ্রহণ করিতেও তাহারা অক্ষম। আর শ্রম করিবার শক্তি নাই। লোকবল নাই। অর্থ নাই।

কেবল রাজায় প্রজায় নহে, ক্রমে প্রজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব বাধিল। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে নিজের নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইল; কিন্তু আত্মবিবাদে ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িল। রাজা ও প্রজার ধ্বংসের ফলে জেলার আদালত ও উকীল বাড়িয়া গেল। সহরের নূতন বসতি হইয়া অধিবাসিগণ বহু দেশের পুঁথি-পাঠপূর্ব্বক রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন-তন্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। এই যে পতিত গ্রামবাসী, ইহাদিগের উদ্ধারের সদুপায় কি? অনেকে বলিত, 'স্বায়ত্তশাসন'; অর্থাৎ, ইহাদের উপর আরও ট্যাক্স বসাইয়া দাও। আরও কুইনাইন সেবন করাইয়া দাও। কেহ কেহ বলিত, ইহাদিগকে 'ভোট্' নামক তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত কর। কেহ কেহ বলিত যে, গুরুমহাশয়ের দল বাড়াইয়া, এবং শিক্ষা-কর বসাইয়া গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্মের রাষ্ট্রীয় অর্থ ইহাদিগকে মরণকালে বুঝাইয়া দাও। কেহ কেহ বলিত যে, গ্রামে খোঁয়াড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া গাভীকুলের চর্ম্ম সংগ্রহ কর, এবং তাহারই আয় দিয়া ও নূতন ট্যাক্স বসাইয়া গ্রামের ময়লা ভাগাড়ে ফেলিতে থাক, কিংবা গভীর কূপ খনন করিয়া তাহা ময়লা দিয়া ভর্ত্তি কর। কিন্তু সাবধান! যেন জল বাহির না হয়।

সনাতন সাহা এই সকল কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া গ্রামবাসিগণকে শুনাইতেন। যখন দিবাবসানে শৃগাল ও কুক্কুর বহু শব লইয়া গ্রাম্য শ্মশানে বিকট ধ্বনি করিত, যখন মুমূর্ষু পিপাসাতুর বাকরুদ্ধ কৃষক দারাসুতের নগ্ন ও শীর্ণ দেহপঞ্জরের উপর করস্থাপন করিয়া মানব-জীবনের শেষ অনুভূতি জ্ঞাপন করিত, তখন সকলে ভাবিত যে, স্বায়ত্তশাসনের এই উপযুক্ত সময়।

সনাতন সাহা সে কালের লোক। গ্রামের মহাজন ও কৃষ্ণভক্ত। তিনি বলিতেন, 'ভাই, একবার হরিনাম কর।' লোকের দুঃখে মুখ লুকাইয়া কাঁদিবার জন্য গ্রামে সেই এক জন লোক ছিল।

৩

দুঃখের বিষয়, সনাতন সাহা অপুত্রক।

সনাতনের সহধর্ম্মিণীর মস্তকে কেশের অভাব থাকিলেও সিন্দূরের ছটা অপর্য্যাপ্ত। নাকের নথ বৃহৎ ও সে তল্লাটে প্রসিদ্ধ। একটা কর্ণের অর্দ্ধেক শৈশবে শৃগালের উদরসাৎ হইয়াছিল, কিন্তু দন্তের আয়তন অসাধারণ। এই সব গুণে সে সনাতনের প্রিয় পত্নী। প্রীতির মূলে করুণা। সনাতন ও সনাতন-গৃহিণী উভয়েরই প্রিয় সামগ্রী স্বরূপ প্রামাণিকের কন্যা বল্লভী। পিতার অন্তিম-সময়ে বল্লভী সনাতনের বাটীতে খাটিয়া অন্ন-বস্ত্রের সংগ্রহ করিত। বল্লভীর মা ছিল না। কেবল মাত্র তাহার ভাই বলরামই সংসারে সহায়। বলরাম লাঙ্গল দিয়া যথাসাধ্য ভূমিকর্ষণ করিত। তাহাতেও অনেকটা দিন চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে ভাই ও ভগ্নী বসিয়া পিতাকে রামায়ণ পাঠ করিয়া শুনাইত।

বলরামের লাঙ্গল পূর্ব্বে ছোট ছিল। মধ্যে কৃষিবিভাগের ইনস্পেক্টর কর্তৃক উদ্বোধিত হইয়া সনাতন সাহা বলরামকে 'মেষ্টন্' নামক এক বিরাট লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে বলরাম ও তাহার বলদযুগলের গ্রীবা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে, বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বল্লভী বলিত, 'দাদামণি আমার এ কালের বলরাম, সে কালের বলরামের মত বড় লাঙ্গল বহিতে পারে না, বিশেষতঃ সে কালে কৃষ্ণ সহায় ছিল, এ কালে আমাদের কেহ সহায় নাই।' সাত বৎসরের সুন্দর কচি মুখে কৃষ্ণভক্তির কথা শুনিয়া সাহা-দম্পতীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণার উৎপত্তি হইয়াছিল। সে প্রায় আট বৎসরের কথা। মেয়েটির উপর মায়া জন্মিয়া যাওয়াতে সনাতন সাহা প্রাণপণে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বল্লভী নাপিতের ঘরের ঝি। স্বভাবতঃ, আলতা পরাইতে, পদপ্রক্ষালন করিয়া দিতে, কেশবিন্যাস করিতে সে পটু। কিন্তু বল্লভীর আরও গুণ ছিল। যখন তাদের কাপাসের চাষ ছিল, তখন সে মাতার সঙ্গে সূতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিত, বস্ত্র বুনিয়া জামা শেলাই করিত, এবং সেই জামাগুলি বেচিত। মাতৃজীবন ও কাপাসের চাষের অবসানে ঘরের এক কোণে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চর্খাটি পড়িয়া ছিল।

দিবা দ্বিপ্রহর। সনাতন সাহা তখনও আহার করেন নাই। গৃহিণী রন্ধনশালায়। বল্লভী বাটীর সংলগ্ন একটা ডোবায় ডুব দিয়া আর্দ্র বস্ত্রে মস্তকের সুদীর্ঘ তৈলহীন কেশরাশি সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে শুষ্ক করিতেছিল। প্রতিবাসী নবীন গোয়ালার ছোট একটী মেয়ে ক্ষেমঙ্করী একটা দুগ্ধপূর্ণ ভাঁড় লইয়া উপস্থিত হইল, এবং বল্লভীর অপূর্ব্ব রূপের ছটা স্মিতমুখে দেখিতে লাগিল। যৌবনের মধ্যে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের মধ্যে পবিত্রতা ও সরলতা, সেই পবিত্রতা ও সরলতার মধ্যে রূপ নির্ব্বিবাদে একখানি ঘর বাঁধিয়াছিল। রোগ, শোক ও পাপ তাপের ঝড় এ পর্য্যন্ত তাহাকে আক্রমণ করে নাই।

বল্লভী হাসিয়া বলিল, 'আজ দুধ কত ?'

ক্ষেমী। চারি সের।

বল্লভী। আজ কাকাবাবুর জন্য সন্দেশ তৈয়ারী করিতে হইবে। তুই ছানা করিয়া ফেল্।

ক্ষেমী। তুমি এখন কি করিবে ?

বল্লভী। আমি কাপড় ও চুল শুকাইয়া ধান্ ঝাড়িতে বসিব।

ইহা বলিয়া বল্লভী তাহার সুবর্ণাভ গৌরকান্তিময় দেহ হইতে জীর্ণ আর্দ্র-বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ উন্মোচন করিয়া দক্ষিণ বাহু দ্বারা হংসপক্ষপুটের ন্যায় সেটাকে বিস্তার করিল। এমন সময় এক জন যুবক কদলীবৃক্ষের আড়াল হইতে অবনত-মস্তকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সনাতন সাহার বাটীর কি এই পথ ?'

বল্লভী চমকিয়া যুবকের দিকে তাকাইয়া দেখিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিক দূর দৌড়িয়া পলাইল, এবং আবার তাকাইল। যুবকের মস্তক তখনও অবনত। বল্লভী দূর হইতে বলিল, 'ঐ ধানের গোলার বাম দিক দিয়া চলিয়া যান।'

বল্লভী ইত্যবসরে পলাইয়া সনাতন সাহার নিকট গেল। 'কাকাবাবু! এক জন সাহেবের মত বাবু তোমাকে খুঁজ্ছে।'

সনাতন সাহা তাঁহার খাতাপত্র লইয়া ধান্যের হিসাব মিলাইতেছিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, শীঘ্রই ইন্‌কম্‌টেক্স-আসেসরের গ্রামে আসিবার কথা। তিনি সভয়ে খাতাপত্র লুকাইতে আরম্ভ করিলেন।

'বল্লভী! সর্ব্বনাশ হয়েছে! বোধ হয় আসেসর বাবু এসেছেন। তুই শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া ধানের গোলায় চাবি বন্ধ কর্; হাত পা ধুইবার জল নিয়ে আয়।'

বল্লভীর দারুণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহার কম্পমান নীলবর্ণ দেহ দেখিয়া সনাতন সাহা বলিলেন, 'তোর ভয় কি লো?'

বল্লভী। তিনি আমাকে দেখিয়াছেন।

সনাতন। তাতে ভয় কি? আসল খাতাপত্র পাছে দেখেন, সেই ভয়। তুই ওগুলো সিন্দুকে লুকিয়ে ফেল্।

কোনও আসন্ন বিপদ না দেখিয়া বল্লভী আশ্বস্তা হইল। বল্লভী মনে মনে ভাবিল, 'খাতাপত্র লুকাইবার দরকার কি? খাতাপত্রে এমন কি আছে?'

বিহারীলাল সনাতন সাহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, সনাতন সাহার ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়া গেল। এ সে আমেসর বাবু নয়। এক জন কচি ছেলের মত। মুখে করুণা মাখানো। সনাতন সাহা একখানি চেয়ার দিয়া বলিলেন, 'আজ আমার বড় সৌভাগ্য।'

৪

শ্রান্ত বিহারীলাল চেয়ারে উপবেশন না করিয়া একটা জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

'আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি। এ তল্লাটে একটাও থাকিবার স্থান নাই। রাজার বাড়ীতে আমি যাইতে চাহি না। আমার সঙ্গে এক জন কেরাণী আছেন, তিনিও বোধ হয় অতিথি হবেন।'

কথা সাঙ্গ না হইতেই বৃদ্ধ বনমালী ভড় আসিয়া উপস্থিত। বিহারীলাল ব্যাগ হইতে তাঁহার ধুতি বাহির করিয়া কোট ও নেকটাই প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন। সনাতন সাহা বল্লভীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বল্লভী, এগুলো আমার শোবার ঘরে রেখে দে।' বল্লভী অবনতমুখে সেগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী। উনি বোধ হয় আপনার কন্যা। আমি রাস্তা চিনিতে না পারিয়া বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন।

সনাতন। ওটি আমাদের প্রজা স্বরূপ প্রামাণিকের কন্যা। স্বরূপের অবস্থা এখন খারাপ। তাই ওদের আমি সাহায্য করি। মেয়েটি আমাকে ধর্ম্মবাপ বলিয়া থাকে। অতি কষ্টে ওদের দিন চলে।

বনমালী। ঐ স্বরূপ প্রামাণিকের কথা আপনাকে রাস্তায় বলিতেছিলাম। এক সময় রাজা পর্য্যন্ত স্বরূপকে ভয় করিত। এহেন ধর্ম্মপরায়ণ, পরিশ্রমী ও অসমসাহসী কৃষক এ দেশে জন্মেছে কি না সন্দেহ। তার দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখ হয়।

বিহারী। তার জমীজারাৎ কোথায় গেল?

সনাতন। স্বরূপ রুগ্ন, শয্যাশায়ী। তাহার পুত্র বলরাম অনেক কষ্টে চাষ করে। স্বরূপকে জ্বরেই পাড়িয়া ফেলিয়াছে।

বনমালী। বেশ। আমি আজই দেখিতে যাইব। ইহা বলিয়া বনমালী ভড় তাঁহার কুইনাইনের বড়িগুলি শিশির মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া লইলেন।

'আপনার নিবাস?'

সনাতন। মানকর।

বনমালী। কি আশ্চর্য্য! তবে বনমালী ভড় ডাক্তারের নাম শুনেন নাই?

সনাতন। শুনিয়াছি বৈকি। তাঁহার ঔষধেই আমার স্ত্রীর প্রকাণ্ড প্লীহা সারিয়া গিয়াছিল।

বনমালী। আমি সেই বনমালী ভড় বটি। আপনার স্ত্রীর নাম?

সনাতন। মাধবী।

বনমালী। জগন্নাথ সাহার মেয়ে? হায়, হায়! আগে বলতে হয়। তিনি কোথায় এখন?

সনাতন। এই বাটীতেই। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ইহা বলিয়া সনাতন সাহা ভড় মহাশয়কে রন্ধনশালার দিকে লইয়া গেলেন। সনাতন সাহার স্ত্রী মাধবীকে দেখিয়া ভড় মহাশয়ের, এবং বনমালীকে দেখিয়া মাধবীর চক্ষু জলাকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজ স্বয়ং ধন্বন্তরী সাহাগৃহে অবতীর্ণ!

'ওরে বল্লভী, নমস্কার কর! ওরে ক্ষেমী নমস্কার কর! ইনি আমার প্রাণদাতা। এত বড় পিলে অন্য কেহ ভাল করিতে পারিত না।'

ভড় মহাশয় সিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বল্লভী-কৃত সন্দেশগুলি গলাধঃকরণ করিতে বসিয়া গেলেন। সনাতন সাহা বাহিরে ফিরিয়া বিহারীলালের পরিচর্য্যায় রত হইলেন।

বল্লভী বিহারীলালের কোট ও শার্ট লইয়া দড়ির উপর সযত্নে গুছাইতে বসিল। সেই সময় পকেট হইতে টুক্ করিয়া একখানা ফটো পড়িয়া গেল।

বল্লভী ত্রস্ত হইয়া সেখানি কুড়াইয়া পুনরায় পকেটে রাখিতে গিয়া দেখিল যে, একটী অপূর্ব্ব মানবী মূর্ত্তির চিত্র। নিম্নে লেখা ছিল, 'আমার মা। যিনি স্বর্গে। যার মা নাই, তাহার ধরায় কেহই নাই।—বিহারী।'

সেই চিত্র দেখিয়া, ঐ কথাগুলি পাঠ করিয়া, বল্লভীর স্মৃতিপটে তাহার মাতৃমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা পরক্ষণে বিলীন হইলে বল্লভী

অন্ধকার দেখিল। সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য, আলোকশূন্য! সেই অন্ধকারের মধ্যে বল্লভী তাহার মাতৃমুখ আবার দেখিতে চাহিল। কৈ? বল্লভী অধীর হইয়া একটা আধার অন্বেষণ করিতে লাগিল। আধার না পাইয়া বল্লভী ফটোখানি বুকে করিয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে বসিল!

বিহারীলাল বাহিরের পিঁড়ায় জলযোগ সাঙ্গ করিয়াছিল।

বিহারীলালের সহিত সনাতন সাহার অনেক কথা হইয়াছিল। গ্রামের অবস্থা, প্রজার অবস্থা, জলাভাব, মহাজনী কারবারের লাভ ও লোকসান, অনাবৃষ্টি, রাজার দুর্দ্দশা, বস্ত্রাভাব, একে একে সকল কথা বর্ণনা করিয়া সনাতন সাহা বলিলেন, 'আপনি আমার ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম করুন।'

বিহারী। আপনি খুব সদাশয় লোক। আপনি নিঃসহায় প্রজাকে দয়া করেন বলিয়া আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আচ্ছা, ও মেয়েটির বোধ হয় এখনও বিবাহ হয় নাই?

সনাতন। না। দুঃখের বিষয়, মেয়েটির মা নাই। মা না থাকিলে বিবাহের চেষ্টা করে কে? তবে আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই এক জন ভাল পাত্র খুঁজিয়া বিবাহ দিব, তবে নাপিতের ঘরে ভাল পাত্র গ্রামে পাওয়া দুষ্কর। যদি সহরে পাওয়া যায়, তবে চেষ্টা করিবেন। মেয়েটি সর্ব্বাংশে সুলক্ষণা ও সুন্দরী। লেখা পড়া জানে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

বিহারীলাল ভাবিতে লাগিল। 'মা নাই! কি দুঃখ! নাপিতের ঘরে পাত্র কৈ? ও! আমার বন্ধু সুদাম প্রামাণিক ত বি-এ পাশ করিয়াছে। বিবাহ হয় নাই। কিন্তু সুদামের সঙ্গে ওকে মানাইবে না। সুদাম একটা কালো ভূত। কালো হইলই বা। আমার তাহাতে কি?'

এই প্রকার নানাবিধ স্বগত মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে বিহারীলাল শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বল্লভী বুক ও মুখ ফুলাইয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। হঠাৎ বিহারীলালকে দেখিয়া বল্লভীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

বিহারীলাল তাহার মাতার ফটোখানি বালিশের উপর দেখিয়া ও বল্লভীর বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া চক্ষের নিমেষে সব বুঝিতে পারিল। করুণার উচ্ছ্বাসে ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে বিহারীলাল বলিল, 'তোমার মা ও আমার মা একই।'

বল্লভী গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

কথার কোনও অর্থ ও উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বিশ্বের কোনও নিহিত ও অজ্ঞাত সত্য বিহারীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল।

৫

বনমালী ভড় কুইনাইনের বটিকা, ক্ষেতপাপড়ার রস ও অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গ্রামের মধ্যে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া বসিল। যেমন ঔষধ-প্রয়োগ, অমনই তাহার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন। স্বরূপ প্রামাণিক শয্যা হইতে উঠিয়া ভাত খাইবার জন্য লালায়িত হইল। ভড় মহাশয় বলিলেন, 'না, যতদিন প্রজার ভাত খাইবার ইচ্ছা থাকিবে, ততদিন স্বায়ত্ত-শাসন অসম্ভব। ভাতের মণ্ড খাও, যবের মণ্ড, খইয়ের মণ্ড, এবং অন্য কোনও সস্তা জিনিসের মণ্ড থাকে ত খাও। এক মণ্ডের জোরেই একটা গৃহস্থের দিন চলিতে পারে। যে লাঙ্গল কাঁধে করিবে, সেই ভাত খাইবে। বলরাম! তুমি ভাত খাও। তোমার বাবাকে মণ্ড ও লবণ দাও। 'অখণ্ডমণ্ডলাকারাং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং'। এই হচ্ছে গুরুর কথা। ক্রমাগত ভাত মারিলে গুরুলাভ হয় না। প্রথমে কুইনাইন, তার পর গুরুলাভ। তার পর আত্ম-শাসন। তার পর মুক্তি। মনে থাকিবে ত?'

বলরাম। হাঁ।

বনমালী। এ গ্রামে বাঁশের খুঁটা অনেক, কিন্তু বাঁশ নাই। আমাদের বংশপ্রতিষ্ঠা বাঁশের মাচার উপর। বাঁশ গেলেই বংশ-লোপ। দেখ বাবা, বাঁশের চাষ কর। তুলার চাষ কর। বাটীর চতুর্দ্দিকে পেঁপে গাছ লাগাও। রাঙ্গা আলু পোঁত। নারিকেল গাছ অপর্য্যাপ্ত লাগাও। পদ্মে পুষ্করিণী ভরিয়া দাও। ভাগাড়ের কাছে মুচীকে আসিতে দিও না। ঠেঙ্গাইয়া তাড়াও। ভেরেণ্ডার গাছ লাগাও। রবিশস্যের বন্দোবস্ত কর। তোমাদের দেশ বাঙ্গালার মত ধনশালী নয়। অতএব এখানে তোমরা স্বায়ত্তশাসনের মর্ম্ম বুঝ নাই। তাদের তামাক আছে, পাট আছে, পঞ্চায়েত আছে। তাহাদের ধান অপর্য্যাপ্ত। হিমালয় হইতে বর্ষার জল আসিয়া পলী পড়ে। এ দেশে কেবল তোমাদের পেটের যোগ্য অন্নমাত্র হয়। অনাবৃষ্টি ও জলকষ্ট হইলেই তোমরা মারা যাও। ঘরের ধান কখনও বেচিও না। এক বৎসরের যোগাড় নিশ্চয় করিয়া রাখিও। কাপড় না জুটে ত নেংটী পরিধান করিয়া থাকিবে। ধান বেচিবে না। সিগারেট ফুঁকিও না। খাজনা ও বীজের জন্য ধান

আলাদা রাখিয়া দিবে। ধার করিয়া কাপড় ও বাসন কিনিও না। কেবল শঙ্খের গহনা থাকিবে। বিবাহে পয়সা দাবী করিলে বিবাহ করিও না। নিজের কাপড় গ্রামেই বুনিবার বন্দোবস্ত করিবে। নিজেই সুতা কাটিবে। সস্তা দেখিয়া ও টাকা দেখিয়া ভুলিও না। টাকা ফাঁকি জিনিস। ধার কর্জ্জে দেশ চলিতেছে। টাকা থাকিলেও অনেক সময় অন্ন বস্ত্র মিলে না। লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া বিক্রয় করিতে নাই। ধান চালই লক্ষ্মী। অনাবৃষ্টি হইলে রাঙ্গা আলু ও ডাবের জল খাইবে। বাঁশের মেঝে করিয়া শুইয়া থাকিবে। জ্বর হইলে আমার কুইনাইন পিল খাইবে। গরুর সেবা করিবে। দুগ্ধ বেচিও না। যত পার, বাছুরকে খাইতে দিবে। যত পড়্‌তি জমী আছে, তাহা প্রাণপণে গরুর উপযোগী ঘাস ও খড়, কলাই ও কুর্ত্তির জন্য রাখিবে। এই নাও আমার দশটা বড়ি, শিশিতে রাখিয়া দাও।

স্বরূপ। বলাই, শোন্। এ সব খাঁটী কথা। বল্লভীও শুনিয়া রাখ্।

এমন সময় রাজবাটী হইতে এক জন দরওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল, 'রাজার অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। ডাক্তার বাবুকে ডাক্‌ছেন।'

বনমালী ভড়ের যশ যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

স্বরূপ। ডাক্তার বাবু, যান্। আহা! হাজার হউক, তিনি দেশের রাজা, আমাদের ভগবান। মারিলেও আমাদেরই। রাখিলেও আমাদের।

চিরশত্রুর প্রতি এই অপূর্ব্ব করুণা দেখিয়া বনমালী ভড় ভাবিলেন, 'এই চাষাদের মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ব আছে, তাহা বড়লোকের মধ্যে নাই। অথচ ইহারা অশিক্ষিত। শিক্ষা কোথা হইতে আসে?'

রাজা মদনচন্দ্র সিংহ ত্রিতলে শয়ান। পূর্ব্বে উঠিতে বসিতে পারিতেন, এখন তাহার যো নাই। শরীরের এক অংশ উঠিতে চাহে, কিন্তু পারে না। এক অংশ উঠিতে চাহে না, এবং সামর্থ্যও নাই। এক অংশ উঠিবার সামর্থ্য থাকিলেও উঠিতে চাহে না। এই তিন অংশ লইয়া রাজা শয্যায় উলট্‌পালট্‌ করিতেছিলেন। বনমালী ভড় নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার শরীরের অবস্থা এখন ঠিক দেশের মতন, অতএব শীঘ্রই দেশের মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে।'

রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। রাণী অন্তরালে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রাইভেট্‌ সেক্রেটরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও উপায় নাই?'

বনমালী। দেশেরও যেমন ব্যবস্থা, শরীরের পক্ষেও তাহাই। অর্থাৎ, কুইনাইন পিল, আত্মশাসন ও সমবায়-সমিতি। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত করিয়া পরস্পরের হিতার্থ পরিশ্রম করাই একমাত্র উপায়। ইহারই নাম সমবায়-সমিতি ও স্বায়ত্তশাসন। একটা অঙ্গকে স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আর একটা অঙ্গকে গণ্ডীর বাহিরে রাখা আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। প্রজারা স্বায়ত্তশাসন করিবে, এবং জমীদার ও মহাজন সহরে বসিয়া মজা লুটিবে, এটা শরীরতত্ত্বের বহির্ভূত প্রথা। আমার একাংশ বসিয়া প্রাণসংযম করুক, আর অন্যাংশ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করুক, এ হেন যোগ কোনও শাস্ত্রই প্রচার করে নাই। ইহার একই ঔষধ—কুইনাইন। বংশলোপ হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু এ রোগে প্রথমে সর্ব্বাঙ্গ তিক্তরসে সিক্ত করিতে হইবে। ইহাই আপাততঃ শ্রেয়।

বনমালী তড় একটি বটিকা লইয়া রাজার মুখে দিয়া বলিলেন, 'জলের সহিত খাইয়া ফেলুন।'

রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

বনমালী। আপাততঃ তিক্ত ও কটু, কিন্তু ফলে খুব ভাল। আমি সম্প্রতি আপনার জমীদারীর অবস্থা দেখিতেছিলাম। এত কর্ম্মক্ষেত্র আপনার সম্মুখে যে, মনে করিলে আপনার শরীর উঠিয়া দাঁড়াইবে। কেন না, শক্তি একবার সরল পথে গিয়া থাকে। আপনি প্রজাদের সঙ্গে মিশিয়া মনে করুন, তাহারাই আপনার বৃহৎ পরিবার। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হইবে না, অন্ন বস্ত্র প্রচুরপরিমাণে থাকিবে। সকলে মিলিয়া রাজ্যশাসন করুন। সদ্ব্রাহ্মণ জুটাইয়া শাস্ত্রালোচনা করুন; ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করুন। একবার সঙ্কল্প করুন, উপায় আপনিই জুটিবে। আদালত, আইন কানুন ও অরণ্যে রোদন সবই কমিয়া যাইবে। স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আসিবে।

৬

বনমালীর কুইনাইন পিল রাজা বদন সিংহকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, সপ্ত দিবসের মধ্যে রাজার মতিগতি ফিরিয়া গিয়াছে।

ইত্যবসরে বিহারীলাল গ্রামের প্রজাদিগের ছেলেপুলের সহিত খুব মিশিয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া বিহারীলাল মাঠে ঘাটে ও ভাগাড়ে বেড়াইত। সেই অবসরে কোথায় কি চাষ করিতে হইবে, কোথায় জল বাঁধিতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া ময়লা বাহির হইবে, কি করিয়া অল্প খরচে স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করা যায়, এই সব কথা ভাবিত, এবং নিজের মন্তব্য সকলকে বলিত।

অবসর পেয়ে কল্পনা খুব জাগিয়া উঠে। সেদিন স্বরূপ প্রামাণিক শয্যায় শয়ন করিয়া 'আবোল-তাবোল্' অনেক কথা বকিতে লাগিল। একবার বলিল, 'বলরাম! আমি রেলের গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' নিকটে বলরাম ছিল না। বল্লভীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, 'বাবা, মাঠ হইতে দাদাকে ডাকিয়া আনি।'

স্বরূপ। না। বরং বিহারীবাবুকে ডাকিয়া আন। আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুন্‌ছি।

বল্লভী বাহিরে গিয়া দেখিল, খানিক দূর দিয়া বিহারীলাল যাইতেছে। বল্লভী দৌড়িয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল, 'আপনি একবার আসুন। বাবার কথা শুনে ভয় হ'চ্ছে।'

সকলে স্বরূপের বাটীতে যাইত, কিন্তু তুম্বা ইচ্ছা সত্বেও বিহারীলাল যাইতে সাহস পাইত না। এত ভয় কিসের?

বিহারীলাল। চল।

বল্লভী ভয়ে জড়সড় হইয়া অগ্রে চলিল। পদতলে প্রকাণ্ড এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। বল্লভীর মুখ লজ্জায় ও দুঃখে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

বিহারীলাল বলিল, 'আমার হাত ধর।'

বল্লভী বলিল, 'না। বাটীতে গিয়া কাঁটা বাহির করিব।'

বিহারী। হাঁটবে কি করে?

বল্লভী। লাগুক।

বিহারী। আমি লাগিতে দিব না।

ইহা বলিয়া বিহারীলাল বল্লভীর দক্ষিণ বাহু স্বীয় বাম বাহুতে বদ্ধ করিয়া বলিল, 'তুমি ভর দিয়া চল।'

বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বল্লভী বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি কাঁটা তুলিয়া আসি।'

বিহারী। না। তোমার পিতার সম্মুখে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমি যে আমার আদরের ও যত্নের, তাহা তোমার পিতা জানুন।

বল্লভী ভাবিল, 'কিসের আদর? কিসের যত্ন? উনি বড়লোক, আমি দরিদ্র চাষা। আমার সহিত উঁহার সম্বন্ধ কি?' কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে বল্লভীর বাহু বিহারীলালের বাহুকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিল। তাহারই বলে বিহারীলাল বল্লভীর করতলের এক অংশ হঠাৎ উত্তোলন করিয়া ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিল।

স্বরূপ বিহারীলালকে দেখিয়া বলিল, 'আসুন। দরিদ্রের ঘরে আপনারা আসিলে আমাদের স্পর্দ্ধা হয়।' ইহা বলিয়া স্বরূপ উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

বিহারী। আপনি উঠিতে চেষ্টা করিবেন না।

স্বরূপ। আপনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। আমি চাষা। জন্মাবধি জমীদারের গালি ও জুতা খাইয়াছি। পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়াছি। কেবল খাজনার দায়ে। আমাদের দাসবৃত্তি। আপনাদের মুখে ও কথা শোভা পায় না। বল্লভী! বিহারীবাবুর হাত ছাড়িয়া দাও!

কিন্তু বিহারী সদর্পে হাত ধরিয়া রাখিল, এবং মুখ তুলিয়া বলিল, 'আমার ধারণা কিন্তু স্বতন্ত্র। আমি প্রজাগণকে ঈশ্বরের দৈব শ্রম ও সহিষ্ণুতার আধার বলিয়া মনে করি। দরিদ্র হইলেও আপনার ইতিহাস ভবিষ্যতের চিরস্মরণীয়। ইতিহাস আত্মোৎসর্গই দেখিয়া থাকে, এবং তাহারই মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করে। ভগবানের সম্পূর্ণ অবতার, এই জন্য রাখাল-বালকদিগকেই সখারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অগ্রজ বলরামের হাতে লাঙ্গল দিয়াছিলেন।

স্বরূপের চোখে জল আসিল।

বিহারী পুনরায় বলিল, আমি বল্লভীর কর স্পর্শ করিয়া আজি গৌরবান্বিত।

স্বরূপ। মা! তুমি জল আনিয়া বিহারীবাবুর পা ধুইয়া দাও।

বল্লভী পিতার কথাবার্ত্তায় আর কোনও বিকারের ভাব না দেখিয়া আশ্বস্তা হইয়াছিল। সে বলিল, 'বাবা! তুমি রেলগাড়ীর কথা বল্‌ছিলে, তার অর্থ কি?'

স্বরূপ। তার অর্থ বোধ হয় কুইনাইনের মাত্রা বেশী হইয়া গিয়াছিল। যখন বেশী হয়, তখন অনেক রকম অপূর্ব্ব শব্দ শুনি। অনেক পুরাণো কথা মনে জাগিয়া উঠে। আমি একবার রেলগাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। সে প্রায় দশ বৎসর আগে। তখন তোর মাকে নিয়ে কাশীতে তীর্থ করিতে যাই। সেই তাহার শেষ।

বল্লভী করতলে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেল।

বিহারীলাল। আপনি ও সব কথা বলিয়া কন্যার মনে ব্যথা দিবেন না।

স্বরূপ। বল্লভীর জন্য আপনার ব্যথা হয়?

বিহারী। হয়।

স্বরূপ। না হওয়াই ভাল। আপনি দু'দিনের অতিথি। এ গ্রামে আমার দেহ শীঘ্রই ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন বল্লভী কোথায় যাইবে, বলিতে পারেন? তাহার জীবনে এখনও কত ব্যথার আকর পড়িয়া আছে, তাহা কে জানে? তখন তাহার খবর কে লইবে?

বিহারী। আমি লইব।

স্বরূপ বিহারীলালের কথার মর্ম্ম বুঝিল না। মানব-হৃদয় জাতি কুল মান এড়াইয়া প্রেমের পথে কত দূর 'আত্মহারা' হইতে পারে, সেটুকু সেকালের স্বরূপ প্রামাণিক ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। সে কেবল বলিল, 'ভগবান করুন, যেন আপনি মধ্যে মধ্যে অনাথার মঙ্গল অমঙ্গলের সংবাদ লইতে পারেন। এটা কি আমার পক্ষে কম আশার কথা!

বিহারীলাল দুঃখিত হইল। কি বলিতে চাহিল, বলিতে পারিল না। স্বরূপ প্রামাণিক নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বল্লভী কপাটের আড়াল হইতে ডাকিল, 'জল এনেছি।'

বিহারীলাল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'কেন?'

বল্লভী। পা ধুইয়ে দেব?

বিহারী। তোমার অধিকার কি?

বল্লভী। দাসী।

বিহারী। আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও রমণীর আমার পদতল স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তুমি যাও!

বল্লভী অবাক হইয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৭

বিহারী দেখিল যে, বল্লভীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তাই বিহারী বলিল, 'বল্লভী, রাগ কর নাই ত?'

বল্লভী। না।

বিহারী। তবে বুঝাইয়া বলি। যাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহারই ছোট হইতে পার। দাসত্বের ভাব জগতে আর থাকিবে না। তুমি 'দাসী' বলাতে আমার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে—

বিহারী কথাটি শেষ না করিয়া বলিল, 'আমি তোমার পা ধুইয়া দিতে চাহি। তোমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতে চাহি। তুমি তাহাতে বাধা দিও না।'

বল্লভী কাতরভাবে বলিল, 'আপনি দেবতা, অমন কথা বলিবেন না।'

বিহারী। দেবতা মানুষের পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। মানুষকে বিবাহ করিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। মানুষকে ভালবাসিতে পারে না?

বল্লভী। না।

বিহারী। দেবতা কোন্ জাতি?

বল্লভী। তাঁরা উচ্চ জাতি।

বিহারী। তুমি এ কথা কোথায় পাইলে?

বল্লভী। রামায়ণে।

বিহারী হাসিল। 'আমি সে জাতীয় দেবতা নহি। তাহা হইলে জোর করিয়া তোমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিতাম; এমন কি, আমার মনের ও প্রাণের কথা জোর করিয়া তোমায় বলিতাম। কিন্তু আমি মানুষকে দেবতার চেয়ে বড় মনে করি। তাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর লুকাইয়া থাকেন। সোজা কথায় বলি, তুমি কাহারও পায়ে হাত দিও না। আমার হিংসা হয়। আমার পায়ে হাত দিলেও হইবে, কেন না, তুমি আমার নও।

বল্লভীর মনোমধ্যে এই কথাগুলি মহা আন্দোলন বাধাইয়া দিল। 'কিসের হিংসা?'

বিহারীলাল। নিরাশার হিংসা। আমার মনে আজ একটু আশা হয়েছিল।

বল্লভী। কিসের আশা?

বিহারী। তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে। আমার জাতিবিচার নাই। আমি তোমাকেই চাহি, চিরজীবন চাহিব। তোমাকে না পাইলে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

বল্লভীর বক্ষঃস্থল পূর্ব্বেই কম্পিত হইয়াছিল, সে হঠাৎ দ্রুতবেগে পিতার নিকট গিয়া শয্যার পার্শ্বে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

এমন সময় লাঙ্গল-কাঁধে বলরাম বনমালী ভড়ের সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া বল্লভীকে দেখিতে পাইল।

'বল্লভী, তুই কাঁদছিস্ কেন? বাবা ভাল আছেন ত?'

বল্লভী চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'ভাল আছেন। আমার চ'খে মাকসার জাল পড়িয়াছিল।'

বনমালী। ভয় নাই, একটা কুইনাইন পিল খাইলেই সারিয়া যাইবে।

বল্লভী। আজ সমস্ত দিন কাকাবাবুকে দেখি নাই। সেখানে যাই।

বল্লভী ধীরে ধীরে পায়ের কাঁটা তুলিতে সনাতন সাহার বাটীতে গেল। সনাতন সাহা চেয়ারে বসিয়া স্ত্রীকে সংসারের আয় ব্যয় বুঝাইতেছিলেন। বল্লভীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'মা, কোলে আয়! আজ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছে। বিহারী বাবু আমাদের বাড়ীতে ভাত খাবেন। যে ব্রাহ্মণ আনিয়া দিয়াছিলাম, তার রান্না তিনি পছন্দ করেন না। তুই তোর সে কালের ঘি-ভাত তৈরী করতে পারবি?'

বল্লভী তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া সনাতন সাহার জীর্ণ চসমাখানি কানের উপর সুচারু ভাবে বসাইয়া দিয়া বলিল, 'আমাদের পাপ হবে। জাতি নষ্ট করা কি উচিত?'

সনাতন (হাসিয়া)। উচিত অনুচিত বুঝি না। জাতিভেদ এখন কেবল বিবাহে। আইনে তাও তুলিয়া দিতে চায়। যে জাতি না রাখিতে চাহে, তাকে রাঁধিয়া দিতে দোষ কি?

সনাতনের গৃহিণী মাধবী বলিলেন, 'মা! জাতির ছাই ভস্ম ছাড়া আর কি আছে? তবে পাছে দোষ ঘটে, তাই ডাক্তার বাবু বলেছেন যে, কুইনাইনের বড়ি খেলে দোষ হয় না। তুই না হয় একটা খা।'

বল্লভী আকাশ পাতাল কত কি ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা।'

সেই কুইনাইন পিল খাইয়া বল্লভী শরীরে ও মনে বল পাইল। সেই বলের সাহসে রাঁধিতে বসিয়া গেল, এবং বিহারীলাল খাইবে বলিয়া সাবধানে রাঁধিল। মাধবী সে কালের বধূ, সাহস থাকিলেও অন্নটা বাদ দিয়া ব্যঞ্জনের দিকেই মনঃসংযোগ করিলেন। সনাতন ততক্ষণ লোহার সিন্দুক হইতে স্বীয় উইলখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিয়া বল্লভীর মুখের দিকে চাহিলেন, এবং চাহিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। লোকে বলিত, সনাতন সাহার লক্ষাধিক টাকা পুঁজি। দীপালোকে সনাতন সাহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া অনুমিত হইতেছিল যে, তাঁহার উইলের সঙ্গে বল্লভীর কোনও সম্বন্ধ ছিল।

আহার প্রস্তুত হইলে বিহারীলাল বনমালীর সঙ্গে উপস্থিত হইল।

বিহারীলাল। আমার অনুরোধ আজ রাখিয়াছেন ত?

সনাতন। অনেকটা। অর্থাৎ, অন্নের ভার বল্লভীকে দিয়াছি, ব্যঞ্জনের ভাগে কিঞ্চিৎ আমরা।

বিহারীলালের মুখ গম্ভীর হইল।

বনমালী। তিলি ও নাপিত, ইহাদের মধ্যে তিলিই শ্রেষ্ঠ, যদিও শাস্ত্রে কিছু লেখে না। আমরা অর্থাৎ 'ভড়' বংশ শাকদ্বীপ হইতে ঝড়ে উড়িয়া আসিয়াছিলাম, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ফলে কেবল ব্রাহ্মণেরই ঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে 'ব্রাত্য' ছিল। বৈশ্যের কোনও পাত্তা এখন নাই। শূদ্র যে ঠিক কাহারা, তাহা লইয়া মহা ঝগড়া। কিন্তু কুইনাইন সেবন করাইয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেরই মেরুদণ্ড এক রকম, অর্থাৎ, ঠিক গোসাপের মত। জ্বর আসিলে একই রকম কম্প সকলের, একই সময় ঘর্ম্ম দিয়া ছাড়ে, এবং একই সময় পুনরায় আসে। ইহাই খাঁটী ম্যালেরিয়া, অর্থাৎ, স্বদেশী জ্বর। আমাদের নিজস্ব। যে ব্যাটাই এ দেশে আসুক না কেন, ম্যালেরিয়া সহিতে পারিবে না। আমরাই ক্রমশঃ পারিব। আপনারা এক একটা বড়ি খাইয়া অতিথিসৎকার করুন।

সনাতন (হাসিয়া)। সকলেই খাইয়াছে।

বনমালী। বেশ! বোধ হয় বল্লভীও খাইয়াছে।

বিহারীলাল হাসিল; হাসিয়া লজ্জিত হইল।

৮

সকলে আহারে বসিয়া গেলে বল্লভী ও মাধবী পরিবেষন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে এহেন স্থলে পরিবেষন করা একটু শক্ত কথা, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই।

এই সুযোগে বনমালী ভড় জাতিভেদ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা কহিলেন।

'জাতি জীবের একটা অবলম্বন। জাতির প্রভেদ আছে বলিয়াই জাতিগত প্রত্যেক অংশ জীবনসংগ্রামে বাঁচিয়া থাকে। জাতি সমাজরূপী জননীর জঠর। জাতির গণ্ডীর মধ্যে থাকে বলিয়াই, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও মানব এতদিন তিষ্ঠিয়া আছে, নচেৎ প্রলয় হইয়া পড়িত। যত দিন আত্মবোধ প্রসারিত না হয়, তত দিন জাতিভাব খুব প্রবল থাকে। 'হিন্দু' বলিয়া কোনও জাতি নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও আত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহার আত্মবোধ অতিশয় উদার, এবং যাহারা ব্রহ্মবিদ্, তাহারা এক কালে ব্রাহ্মণ ছিল। তখন

ব্রাহ্মণ কর্ম্মে লিপ্ত ছিল না। অন্যান্য বর্ণের আত্মবোধ তাহাদের কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে। কর্ম্মক্ষেত্রের তারতম্যে বর্ণের তারতম্য। কর্ম্মক্ষেত্রের শিথিলতায় জাতিভেদের শিথিলতা। কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতিই আত্মবোধের বিস্তৃতি। উপযুক্ত শূদ্রের আত্মবোধ অনুপযুক্ত ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাঁড়াইলে তাহার কর্ম্মও অধঃপতিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। এক জন দুরাচার মদ্যপায়ী পরদাররত ব্রাহ্মণ, কিংবা কোনও বিজাতীয়-ব্যবসায়-কারী ব্রাহ্মণ স্বীয় জাতি হইতে ভ্রষ্ট। অথচ কর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে। শূদ্র যুদ্ধ-ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে। কর্ম্মের সহিত জাতিগত পূর্ব্ব-সংস্কারের বিরোধ আরম্ভ হইলেই জাতিভেদ শিথিল হইবে। জগৎ হইতে জাতিভেদ লুপ্ত হইবে না, কিন্তু পুরাতন জাতি ও বর্ণের সহিত অধুনাতন জাতি ও বর্ণের শুক্র ও শোণিত সম্বন্ধের লুপ্ত হইয়া যাইবে। বাস্তবিক কে কোন্ কুলের, ও কোন্ বংশের, তাহার চিহ্ন থাকিবে না।

সনাতন। তবে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহে দোষ কি?

বনমালী। দোষ ও গুণ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, আমাদের বিচারাধীন নহে। আমি কেবল বুঝাইয়া দিতে পারি। জাতিভেদ শিথিল হইবার কতকগুলি সাময়িক কারণ উপস্থিত হয়। প্রথমে বলিয়াছি, কর্ম্ম-বৈচিত্র্য। একই জাতির মধ্যে যদি কর্ম্মের ঐক্য না থাকে, তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে। একই বর্ণের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই দেখুন, ধোপাদের মধ্যে অনেকে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া উচ্চ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা আর কাপড় কাচে না। খুব বর্দ্ধিষ্ণু ধোপার ঝি, যাহার স্বামী হয় ত হাইকোর্টের উকীল, সে এখন নিজে কাপড়ে সাবান মাখায় না, নিজের গায়েই মাখে, এবং স্বামীকেই সেই পূর্ব্ব কালের গর্দ্দভ বলিয়া মনে করে। ক্রমে লেখাপড়া শিখিলে ও দেখিতে খুব সুন্দরী হইলে, ব্রাহ্মণের কুৎসিত বোকা মেয়ে তাহার ভাত রাঁধিয়া দিতে কুণ্ঠিতা হইবে না। এমন উঁচুদরের ধোপাকে অন্য ধোপা দুচক্ষে দেখিতে পারে না। ক্রমে তাহারা যাহাতে দেশ হইতে কাপড় কাচা উঠিয়া যায়, ভগবানকে তাহাই প্রার্থনা করে। এ সব ক্রমবিকাশের কথা। এই জন্য কখনও কখনও বহুবিবাহের দরকার হয়। আজ ধোপা, কাল নাপিত, অন্য বৎসর এক জন মুসলমান দরজি, এবং সুসময়ে একটা সুন্দরী শ্রেষ্ঠীর মেয়ে, এই রকম ক্রমাগত বিবাহ করিলে যে সকল পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের পুত্র-সন্তান আবার সেই সূত্রানুসারে দারপরিগ্রহ করিলে, সুন্দর লক্ষ্যাপায়রার মত

একটা বড় জাতি জন্মিতে পারে, এবং তাহাদের কোনও ভাগিনেয় কিংবা ভগিনীপতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ পুরুষ দাঁড়াইতে পারে; অর্থাৎ, একই আধারে সে ধোপা, নাপিত, ছুতার, কামার, বৈদ্য, এবং দরজির কর্ম্মে পটু হইবে। কাহারও তোয়াক্কা রাখিবে না। অনেকগুলি এই রকম জন্মিলে জিনিসের দর কমিয়া যাইবে, মজুরী কমিয়া যাইবে, বাটীতে দাস দাসীর দরকার হইবে না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর ইহাকে 'ইভল্যুসন' বলিয়া থাকেন।

সনাতন। ইহাতে নানাবিধ বংশগত রোগের সঞ্চার হইতে পারে।

বনমালী। কেবল কুইনাইনের ওয়াস্তা, দাদা, কেবল কুইনাইন।

বিহারী। আমরা যাহাকে নীচ জাতি বলিয়া থাকি, তাহারাই অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রমজীবী কৃষকের সহিত যদি কোনও অলস উচ্চ বর্ণের ক্রমাগত বিবাহ হইতে থাকে, তবে কৃষকেরাই অধঃপতিত হইবে। দেশের হানি হইবে। তবে আর একটা কথা আছে। যদি কোনও উচ্চ বর্ণের লোক নীচ বর্ণের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সেই জাতির উন্নতিসাধন করিতে চাহে, তাহাতে বাধা কি?

বনমালী। আজ কাল কোনও আন্দোলনের মূলে কেবল রূপের মোহ ও পয়সা। উন্নতির কথাটা মুখে। যখন স্বজাতিকেই কেহ উদ্ধার করিতে দাঁড়ায় না, তখন অন্য জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া সেই জাতিকে তুলিতে চাহিবে, এমন বিরাট আত্মবোধ এখনও এ দেশে জন্মে নাই। পূর্ব্বে বিপ্লবের মূলে ধর্ম্ম থাকিত। পাঁচটা জাতি ও বর্ণ ভাঙ্গিয়া একটা নূতন জাতি হইত। যেমন বৈষ্ণব ও শিখ সম্প্রদায়। তখন সকলে ধর্ম্মকেই জাতিবল বলিয়া ভাবিত। এখন পয়সা লইয়া ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব। আমাদের গ্রামে একটা বৈষ্ণবীর অনেক সম্পত্তি ছিল, এবং রূপও ছিল। সে এক জন সুবর্ণবণিকের প্রেমে পড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, এবং উভয়ে নূতন চুক্তির আইনে বদ্ধ হইয়া মোটর-কারে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রত্যহ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। একদিন সেই বৈষ্ণবীর ভূতপূর্ব্ব ভ্রাতা দ্বারে আসিয়া বণিক মহাশয়কে কহিল, 'মহাশয়, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ সম্পত্তিটুকুই ভরসা ছিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক সেই সম্প্রদায় ও ভগবানের নামে ছাড়িয়া দিন।' বণিক চটিয়া কহিলেন, 'হে ভূতপূর্ব্ব শ্যালক! পয়সা নিজস্ব। কোনও সম্প্রদায়ের নহে। আমি পতিত বৈষ্ণব জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার ভগিনীকে বিবাহ করি নাই। আমার উদ্দেশ্য তার চেয়েও মহৎ। সেটা যে কি, তাহা

শীঘ্রই একটা সমিতিতে ঠিক হইয়া যাইবে। আপাততঃ জাতির খাতিরে তোমাকে পাঁচটি টাকা দিতেছি।' এই প্রকারে সুন্দরী মেয়েগুলো ও জমানো পয়সাগুলো দেশাত্মবোধপূর্ণ নব্য সমাজ বাছিয়া লইতে পারিলে ভবিষ্যতে বর্ণাশ্রম অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া গ্রামে গ্রামে খঞ্জনী বাজাইয়া ভিক্ষা করিবে, এবং সহরের উন্নত গোষ্ঠী তাঁহাদের অন্ধ ও খঞ্জ ভ্রাতৃবর্গের জন্য হয় একটা 'রিলীফ-ওয়ার্কস্' কিংবা স্বায়ত্তশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করিতে বসিবেন।'

এই রকম নানাবিধ আলোচনায় সকলের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল; এবং সকলে প্রচুর ভোজন করিল।

৯

বিহারীলালের সে রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। সে প্রত্যূষে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। গ্রীষ্মকাল। কতকগুলি যোগযুক্ত কৃষক পূর্বাভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া মাঠে গান করিতেছিল। কতকগুলি সুন্দর পাখী এ দিক ও দিক উড়িয়া স্বরূপ প্রামাণিকের বাটীর কদম্ব বৃক্ষের শীর্ষে আশ্রয় লইতেছিল। বিহারীলাল উন্মনা হইয়া সেই পাখীগুলিকে দেখিবার জন্য কদম্ব বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল।

কিন্তু পাখীর চেয়ে বিহারীর আরও একটী প্রিয় জিনিস সেই বৃক্ষতলে বসিয়া এক-মনে কি ভাবিতেছিল।

ধ্যান একটা অদ্ভুত পদার্থ। সে যাহাকে ধ্যান করে, সে তাহাকে টানিয়া আনে।

বিহারী নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বল্লভী! তোমার বাবা কেমন আছেন?'

বল্লভী চমকিয়া উঠিল। 'এত ভোরে এখানে? বাবা ঘুমাইতেছেন।'

বিহারী। বলরাম কৈ?

বল্লভী। গরু লইয়া মাঠে গিয়াছে।

বিহারী। তুমি একলা ব'সে কি ভাবছিলে?

বল্লভী লুকাইতে গেল; কিন্তু জন্মাবধি সে মিথ্যা কথা কহে নাই, তাই সে বলিল, 'তোমাকে ভাবছিলুম।' সেই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে দুই এক বিন্দু অশ্রু সত্যের সাক্ষ্য দিতে বল্লভীর নয়নপল্লবের এক কোণে দেখা দিল। সেই মধুর 'তোমাকে' শুনিয়া বিহারী বুঝিল যে, তাহার কাল্পনিক জগৎ সত্য। সেখানে প্রেম আছে, প্রেমের ক্ষেত্র আছে, তাহার জন্য একটা আসন পাতা

আছে, সেই আসনের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে এক জন দেবতা আছেন, এবং তিনি সেই আসনে উভয়কে একত্র বসিবার অধিকার দিয়াছেন। যত শক্তির আকর সেখানে। সেখানে পাপ নাই, জরা মরণ নাই।

বিহারী ধীরে ধীরে বল্লভীর হাত ধরিয়া বলিল, 'চল,আমরা একটু বেড়াই।'

বেড়াইতে বেড়াইতে বিহারী বলিল, 'ঐ যে পাখীগুলি—তোমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ আসে?'

বল্লভী হাসিয়া বলিল, 'না, আজ অনেকগুলি এসেছে। বোধ হয়, ঐ গাছে ঘর বাঁধবে।'

বিহারী। আমি তোমাকে লুকিয়ে একটা কথা বলি। আমিও ওদের সঙ্গে এসেছি। তোমাদের ঐ মাঠের পাশে একটা ঘর বাঁধব; সেই ঘরের পাশে একটা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ক'রব। আমার প্রতিজ্ঞা যে, যত দিন এই প্রজাদের অবস্থা ভাল না হয়, যত দিন তারা লেখাপড়া শিখে মাথা না তুলিতে পারে, তত দিন ঐ ঘর আমার বাসস্থান হবে; আর ঐ মন্দিরের দেবতা আমার বল হবে। দেশ ও সমাজ হইতে অনেক দূরে থাকিয়াও দেশের উপকার করব। তোমার মনে এ সব ভাবনা কখনও হয়?

বল্লভী বলিল, 'হয়।'

বিহারী। সে দিন তোমাকে বলেছিলেম যে, তোমার মা ও আমার মা একই। যদি আমরা দু'জনে ব'সে সেই মন্দিরে মা'র কথা ভাবি, তবে বোধ হয় আমাদের দু'জনের জীবনের দুঃখ মিটিয়া যাইবে।

বল্লভী। যাবে।

উভয়ে উভয়কে অবলম্বন করিয়া শ্যামদূর্ব্বাদলশোভিত মাঠের মধ্যে গিয়া ভবিষ্যতের গৃহ ও মন্দিরের স্থানটি বাছিয়া লইল।

বিকালে বনমালী ভড় ও সনাতন সাহা কি একটা প্রকাণ্ড পরামর্শ করিতেছিল। সেই পরামর্শের মধ্যে রাজা বদনচন্দ্র ও প্রজামণ্ডলী যোগ দিয়াছিল। সনাতন সাহা রাজা বদনচন্দ্রের ঋণের টাকা শোধ দিয়া বিষয়ের কি একটা নূতন বন্দোবস্তের তদ্বির করিয়াছিল। বদনচন্দ্র এক লক্ষ টাকা গ্রামের উন্নতির জন্য দিয়াছিল। বিশ সহস্র টাকা একটা মন্দির-প্রতিষ্ঠায়, এবং বিশ সহস্র বল্লভীর বিবাহে ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল।

বিহারীলাল সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দেওয়াতে কালেক্টর সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া লিখিলেন, 'যদিও আমি তোমার মত দক্ষ কর্ম্মচারী পাইব না,

কিন্তু তুমি যে ব্রত লইয়াছ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ঈশ্বর করুন, তুমি কৃতকার্য্য হও।'

বনমালী ভড় বড় সোজা লোক নয়। তাহার কুইনাইন-পিল একটা দাতব্য ঔষধালয়ে স্তূপীকৃত হইল। বনমালী যত দিন বাঁচিয়া ছিল, তত দিন কুইনাইনের বড়ী প্রস্তুত করিত। বনমালী অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে, সনাতন সাহা ও তাঁহার স্ত্রী মাধবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, 'যত দিন স্বায়ত্ত-শাসন সম্পূর্ণ না হয়, এগুলি তৈয়ারী করিয়া সকলকে বাঁটিয়া খাওয়াইবে। ইহা ছাড়া দেশের পক্ষে অন্য কোনও ভাল ঔষধ নাই।'

শ্রীনিধিরাম।

সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয়।

[সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুত মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অভি-ভাষণ ;—গত ১৯শে মাঘ ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।]

* * * রাজার ও রাজ্যের মঙ্গলার্থ রাজভক্ত ভারত তাহার দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে স্বর্গে ভগবানের আসন নড়িয়া উঠে বলিয়া যে দেশের বিশ্বাস ; দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অভিসম্পাতে যে দেশে কাব্যের সৃষ্টি ; সে দেশের লোক অত্যাচারপ্রপীড়িত ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধনের জন্য যে প্রাণপণ যত্ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় ভারত যে তাহার ধর্ম্মপ্রাণতার চিরপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিকই গত চারি বৎসরের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুরম্য-সৌধমালা-পরিশোভিত আনন্দমুখর জনপদের তলদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ আলোড়ন আস্ফালন চলিতেছিল, তাহা কে জানিত? শত শত বৎসর ধরিয়া যে সম্পদ, যে সৌন্দর্য্য, যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইতেছিল, কে জানিত, তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া দিবার জন্য উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত অনলাম্বুধি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? য়ুরোপের এত সভ্যতা, এত বিদ্যা, এত শিক্ষা—

যাহার আদর্শে আমরা আমাদের জীবন গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র—তাহার ভিতরে এত বিষ, এত দাহ, এত উন্মত্ততা! ইহা স্বহস্তে যাহা গঠন করে, অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ন্যায় এক দিনের খেয়ালে তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এ সভ্যতা—এ শিক্ষার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নই এখন আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে।

এই প্রশ্নের সহিত আমাদের সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া এখন আমাদের মধ্যে মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারতীয় অর্থাৎ আর্য্য-সাহিত্যের আদর্শ—ত্যাগ, সংযম—ভোগ বিলাস নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Pessimistic বা দুঃখবাদের সাহিত্য বলিয়া আমাদের সাহিত্যের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের দেশেরও এক সম্প্রদায় লেখক এখন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপ যাহাকে Pessimism বলে, আমাদের সাহিত্যের আদর্শ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সাহিত্য সুখের বা ভোগের বিরোধী নহে; তবে শাস্ত্র ভোগেও সংযত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা ভোগের পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে।

আমাদের কবি ও শাস্ত্রকারগণ স্থায়ী সুখলাভের জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভোগ কর—কিন্তু সংযত ও নিষ্কাম হইয়া। তাহার ফলে অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইবে। আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর, প্রয়োজন হইলে, অম্লানবদনে বনে বনে গোচারণ করিতে পারিতেন; সুবর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিয়া মৃৎপাত্রে আহার করিতে পারিতেন; মর্ম্মর-প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া ঋষির উটজে কুশশয়নে নিশাযাপন করিতে পারিতেন। আর্য্য-শাস্ত্রকার মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি তাহাকে প্রকৃত সুখের অনন্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের সন্ধান বলিয়া দেন। সেই ক্ষীরোদ-সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হইলে বহু প্রলোভন, বাধা বিঘ্ন এড়াইতে হইবে। কিন্তু ঘোরতর ঐহিকতাপ্রিয় (materialistic) ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা জীবন-সুরার সমস্ত পান করিবেন, ভোগের কণামাত্রও বাদ দিবেন না। তাঁহাদের কথা—"আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চট্‌কাব, দুই পায়ে ক'রে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।"

এই উৎকট ভোগলালসার ফল য়ুরোপ হাতে হাতে পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপে যে কোনও আন্দোলনের সূচনা হয়, আমাদের দেশে তাহারই সমর্থন করিয়া এক দল লোক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং স্বতঃ পরতঃ তাহারই প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হন। য়ুরোপীয় সমাজে ঐ আন্দোলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাঁহাদের থাকে না। দেশের সমস্ত উন্নতি তাঁহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়া যাইতে উৎসুক। কিন্তু পৃথিবীর উন্নতি ত এত সহজে সাধিত হয় না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত চিন্তা কত ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলি কোরক অবস্থায় শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কতকগুলি ফুটিতে ফুটিতে প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কতকগুলি আবার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যেগুলিকে এক সময়ে পৃথিবীর লোক চিন্তা বা ভাবের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, কালে তাহাদেরই উচ্ছেদের জন্য কত শত চেষ্টা হইয়াছে। অতএব, পুরাতন হইলেই যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এমন নহে, সেইরূপ নূতন হইলেই যে তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়, এমনও হইতে পারে না। বরং পুরাতনের দোষ গুণ অনেক দিনের পরীক্ষিত বলিয়া উহার স্বপক্ষে বিপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে পারা যায়; কিন্তু একেবারে অপরীক্ষিত নূতনকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির ন্যায় কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের স্বভাব। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না, কি জানি যদি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ছুরিকা লুক্কায়িত থাকে। এই সন্দেহ, সঙ্কোচের জন্য যাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করেন, করুন; কিন্তু ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

য়ুরোপের এক একটা নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে আমাদের সন্দেহ সঙ্কোচের যথেষ্ট কারণ আছে কি না, তাহা সেই সকল মতের একটু আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে নীট্‌জে ও ইব্‌সেনের মতের খুব আলোচনা হইতেছে। যে অতিমানুষবাদ (Superman) এখন ওতপ্রোতভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নীট্‌জে সেই মতের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে "feminist movement"ও খুব প্রবল হইয়াছে। ইব্‌সেন সেই আন্দোলনের এক জন প্রধান সহায়। নীট্‌জে ও তৎসম্প্রদায়ের মত আধুনিক জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যে

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং গত সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের জন্য ইহারা বহুলপরিমাণে দায়ী। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ এই মতের একটু আলোচনা করিব।

নীজ্‌কের মতের সারাংশ এই—আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা একেবারে উদ্দেশ্যহীন। অতএব, মনুষ্যজাতির সম্মুখে একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—Superman বা 'অতি-মানুষ' জাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, এই মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতিসহকারে যাহাতে এক শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম, যে রাজনীতি বা সমাজনীতি, ইহাদের মতে, এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। জগতে কেবল শক্তিশালী লোকেরই প্রয়োজন; কারণ, এই সকল শক্তিশালী লোক হইতেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি জাতির সৃষ্টি হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে "অতিমানব" জাতির সৃষ্টি সম্ভবপর হইবে।

নীজ্‌কের নীতিশাস্ত্রে দয়া ধর্ম্মের স্থান নাই। কারণ, ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা হইতেই দয়ার সৃষ্টি। দয়া মানুষকে শক্তিহীন করে। নীজ্‌কের নিজের কথা এই—

'Pity is opposed to the tonic passions which enhance the energy of the feeling of life, its action is depressing. A man loses power when he pities. On the whole, pity thwarts the law of development which is the law of selection. It preserves that which is ripe for death, it fights in favour of the disinherited and the condemned of life. By multiplying misery quite as much as by preserving all that is miserable, it is the principal agent in promoting decadence.'

অর্থাৎ, দুর্ব্বলের উপরেই লোকে দয়া করিয়া থাকে। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা জগতের আবর্জ্জনা; তাহারা জগতে 'disinherited', অর্থাৎ, সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত, এবং 'condemned', অর্থাৎ, বধ্য। তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে কেবল দুঃখদৈন্যের ভার বর্দ্ধিত করা হয়। তাহাতে মানব জাতির অবনতিই ঘটিবে, জগৎ supermanএর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া-প্রকাশ অতি অন্যায় কার্য্য।

আবার—

"The weak and the botched shall perish; first principle of our humanity. And they ought even to be helped to perish."

অর্থাৎ, দুর্ব্বল লোকদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যজাতির নীতিশাস্ত্রের প্রথম মূল মন্ত্র। ইহারা যাঁহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কথা ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-বাদের (Suivival of the fittest) প্রতিধ্বনিমাত্র। তিনিও বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অযোগ্য, পীড়িত,রুগ্ন মানবের রক্ষার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা মানব জাতির উন্নতির পরিপন্থী—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

নির্ভীকতা, রণপ্রিয়তা—ইহাই নীজ্‌কের মতে উন্নত মনুষ্যজাতির বিশেষ গুণ।

"War and courage have done more great things than charity. What is the good? Ye ask. To be brave is good. Live your life of obedience and of war."

যাঁহারা জর্ম্মান্ সেনানী Bernhardi প্রণীত "Germany and the next war" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে নীজ্‌কের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। Bernhardi লিখিয়াছিলেন—

"War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind, failing which would result a course of evolution deleterious to the species, and, too, utterly antagonistic to all culture. War, said Heraclitus, is the father of all things. Without war, inferior or demoralised races would only too easily swamp the healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality. If circumstances require, it is not only the right but the moral and political duty of a statesman to bring about a war!"

সেই একই কথা। অর্থাৎ, যুদ্ধে মনুষ্য জাতির মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, অশক্ত, আবর্জ্জনাস্বরূপ, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জাতির সারাংশটুকুই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, যুদ্ধ সংঘটিত করা রাজনীতিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

এই শিক্ষার ফলেই জার্ম্মানী দুর্ব্বল বেলজিয়মকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই নীজ্‌কের মতে পুরোহিতদের একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা চাতুরী—

"All lies through and through, without a shred of psychological reality—a vampyrism of pale subterranean leeches! Sin was invented

in order to make science, culture, and every elevation and noble trait in man quite impossible; by means of the invention of Sin the priest is able to rule."

ঈশ্বর সম্বন্ধে নীজ্‌্‌কের মত পূর্ব্ববর্ত্তী মত সকলেরই অনুরূপ। তিনি বলেন—

"An omniscient and omnipotent God who does not even take care that his intentions shall be understood by his creatures—could he be a god of goodness? A God, who for thousands of years has permitted innumerable doubts and scruples to continue unchecked as if they were of no importance in the salvation of mankind, and who, nevertheless, announces the most dreadful consequences for any one who mistakes his truth,—would he not be a cruel God, if being himself in possession of the truth, he could calmly contemplate mankind, in a state of miserable torment, worrying its mind as to what was truth?"

বিবাহ সম্বন্ধে নীজ্‌কের মত—ভবিষ্যতে বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে—এক নূতন জাতির সৃষ্টি করা। এ জন্য 'concubinage" প্রথার প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে। "Wife" ও "concubine"এর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ—

"If, on the ground of his health, the wife is also to serve for the sole satisfaction of the man's sexual needs, a wrong perspective opposed to the aims indicated, will have most influence in the choice of a wife."

নীজ্‌কে, এমন কি, "Trial marriage" বা "Leasehold marriage"-এরও পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিয়া যদি অসুবিধা মনে হয়, উভয় পক্ষ সে বিবাহ বাতিল করিতে পারেন।

আবার সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধেও, সমাজকে কঠোর বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এমন কি, স্থলবিশেষে বন্ধ্যাত্ব-সম্পাদনও সমাজের কর্ত্তব্য হইবে।—

"Society, as the trustee of life, is responsible for every botched life before it comes into existence, and as society has to suffer for such lives it ought, consequently, to be made impossible for them ever to see the light of day. Society should in many cases actually prevent the act of procreation and may, without any regard for rank, descent, or intellect, hold in readiness the most rigorous forms of compulsion and restriction, and, under certain circumstances, have recourse to sterilisation."

মহাভারতের ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠক ভারতে ক্ষাত্রশক্তির অতি-

বুদ্ধির দিনে এই সকল ভয়াবহ অনার্য্যজুষ্ট মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সেই সকল মতবাদেরই পরিণতি। এই অনর্থকর মতবাদের সহিত আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-ব্যবস্থার তুলনা করুন। সে উপদেশ কি পবিত্র ও মহান্! এই তুলনা হইতে, আর্য্য সভ্যতার মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধ হইবে; আর উপলব্ধ হইবে যে, আমরা অন্ধের ন্যায় কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচের সমাদর করিতেছি।

এই সমস্ত ভাব সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা আধুনিক "Bolshevism"এর দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। Bolshevikরা বিবাহ-পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া "nationalisation of women", অর্থাৎ, স্ত্রীমাত্রকেই সাধারণের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

ইব্‌সেনের নাটকগুলির সার মর্ম্ম এই যে, সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে এমনই চাপিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা পুরুষের হাতে ক্রীড়ণকের ন্যায় হইয়া আছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে একেবারেই সমর্থ নহে।

আমাদের আধুনিক এক শ্রেণীর সাহিত্যে পূর্ব্বোক্ত এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়;—

'সমস্ত সমাজ চারি দিক্ থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট ক'রে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। তারা ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলচে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে "

ইব্‌সেনের Doll's Houseএর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে Millএর Subjection of Women প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই "নারীজাতির উদ্ধার বিষয়ে আন্দোলন" দিন দিন শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ বিলাতে suffragetteদের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, নারীজাতির শত্রু। আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সমুদায় নারীজাতিকে পাষাণপিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পে, গানে, কবিতায় এই কথারই প্রচার করা ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের, হিন্দু শাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি করা এক সম্প্রদায় লেখকের 'কর্ত্তব্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের কথা মানিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, যে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য লজ্জা, শিষ্টাচার প্রভৃতি

বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, লোকের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার করে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হইয়াছে, বা তাহারা সেই পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ প্রভৃতি নারীগণের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও শাস্ত্রবিহিত আচার-পালনে সংপিষ্ট হইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন, করুন; কিন্তু আমরা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীগণকে চিরকাল দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এবং এখনও পূজা করিব। কারণ, আমরা ত্যাগীর পূজা করি, ভোগবিলাসীর নহে।

পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কি নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রধান সহায়? আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সমাজে নারী—জননী, পত্নী, এমন কি, সর্ব্বস্বহীনা বিধবারূপেও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকট অন্য সমস্ত আদর্শই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয়েরা নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের বদ্ধমূল সংস্কার লইয়া একদেশদর্শী য়ুরোপ যদি আমাদিগকে নারীপীড়ক বলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাই বেদবাক্য মনে করিয়া সমাজ-সংস্কারে ব্যগ্র হইব কি? আমাদের শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে। যে শাস্ত্র বলেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

সে শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে।

একেবারে দোষস্পর্শ-শূন্য সমাজ কখনও ছিল না, কোথাও নাই, এবং, কোনও স্বপ্নরাজ্যে সম্ভব হইলেও, বাস্তব জগতে পরিলক্ষিত হইবে না। এক অনর্থের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সন্তানজনন প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার করিতে যাইয়া তথাকথিত য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্কারকেরা কত বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতএব সংস্কারকের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তবে কি সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। সংস্কার হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। কিন্তু সেই সংস্কার আমাদের জাতীয়তা, আমাদের মেদমজ্জাগত আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই। নচেৎ, তাহা কখনও সুফলপ্রসূ হইবে না।

এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে সমাজে একটা প্রবল অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ইহার ফল অনেক সময় অতি ভীষণ হইয়া থাকে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir John Woodroffe, Sir George Birdwoodএর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই—

"It has destroyed in Indians the love of their own literature, the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all their repose in their own traditional and national religion, has disgusted them with their own homes, their parents, and their sisters, their very wives, and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached."

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খল য়ুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দ্বারা এই অনিষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কয়েক জন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কুলভ্রষ্ট নারীগণের চরিত্র এমনই চিত্তাকর্ষক-ভাবে চিত্রিত করিতেছেন যে, অনেক অপরিণতবয়স্ক পাঠক পাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকের নাই। কিন্তু উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দ্বারা যে কত দূর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্য-কাননের আবর্জ্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ ও সাহিত্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে য়ুরোপীয় ভাবে দুষ্ট হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। আমি বলিয়াছি, আমরা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী নহি। আমরাও সংস্কারের পক্ষপাতী। তবে আমাদের মঙ্গলেচ্ছার বা সংস্কারের মূলে অতীতের প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা বা বিদ্বেষ নাই। আমরা যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার গর্ব্ব করি, তাহার মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয়তার অপূর্ব্ব মর্ম্মরসৌধ যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া, অরাতির আক্রমণপরম্পরা ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণও বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে, "They have survived in a way, and to a degree,

which is not seen in the case of any other country in the world." অর্থাৎ, হিন্দুরা এই সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব যেমন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এমন আর পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই সৌধের সংস্কারে আমরা ইহকালসর্ব্বস্ব, অস্থিরচিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী হইব কেন? যে দেশে এ বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে, সে দেশে ইহার সংস্কারের উপাদান নাই, ইহা কি সম্ভব? একান্ত প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে সাহায্য লইব, কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইব না। তাহা করিলে, আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে।

সুখের বিষয়, গত যুদ্ধে য়ুরোপের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে। আমাদের উচ্চ উদার আদর্শের অনুসরণ করিয়া, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া জগতে পরিচয় দিতে পারিব—"অমৃতস্য পুত্রা বয়ম্"। আমাদের সাহিত্য সেই আদর্শের অনাবিল উৎসস্বরূপ হইয়া, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দৈন্য-দারিদ্র্য, ক্লেদ-কর্দ্দম বিধৌত করিয়া দিবে। ভগবৎসমীপে ইহাই আমার প্রার্থনা। কারণ—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রায় পরিবার।

১

বৎসর পঞ্চাশ পূর্ব্বে বাঙ্গালার তিনটি জেলার অনেকগুলি গ্রামে বিধাত্রী দেবীর নাম সুপরিচিত ছিল, সে নীলের হাঙ্গামার সম্পর্কে। যে স্থানে মধ্য-বাঙ্গালার তিনটি জেলা মিশিয়াছে, তাহারই কাছে গৌরীপুর গ্রাম। গ্রামের জমীদার চৌধুরী মহাশয়েরা বনিয়াদী ঘর। সে অঞ্চলে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অসাধারণ। নিকটেই যাত্রাপুরে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ জমীদারের বাস। রায়পরিবার চৌধুরীপরিবার অপেক্ষা আধুনিক হইলেও প্রভাব প্রতাপে হীন নহে। দুই পরিবারের এলাকার মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ খাল। তাহার জলকর জমা বৎসরে চারি টাকা পৌনে ছয় আনা চৌধুরীদিগের সেরেস্তার কাগজপত্রে লিখিত থাকিলেও সে টাকা কখনও আদায় হয় না। আর সেই খাল-সীমানা লইয়া দুই পরিবারে বহু দিন ধরিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় ও মামলা

মোকর্দ্দমায় যে টাকা বাজে খরচ হইয়াছে, তাহা খালের জলে ঢালিয়া দিলে, বোধ হয়, খালটা বুজিয়া যাইত। পুরুষানুক্রমে পরিচালিত এই সব মামলা মোকর্দ্দমায় উভয় পক্ষের বহু কর্ম্মচারী ধনবান হইয়াছিল। তাহার পর নাটকোচিত অতর্কিতভাবে সহসা সব মামলা মিটিয়া গেল। বৃদ্ধ রামগোপাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শৈলজাপ্রসন্ন চৌধুরীদিগের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া যেরূপে জমীদারী শাসন করিতেন, তাহাতে লোক বলিত, তাঁহার প্রতাপে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।' কিন্তু প্রজার তিনি 'মা বাপ' ছিলেন। শিকারে তিনি সিদ্ধহস্ত, কুস্তীতে তাঁহার পরম আনন্দ, দানে তিনি মুক্তহস্ত, সঙ্গীতানুরাগে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন অনতিক্রান্ত-যৌবনাবস্থায় বিপত্নীক হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহ করাই সকলে স্বাভাবিক মনে করিলেন। তিনি কিন্তু তাহা মনে করিলেন না। তিনি 'সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা' বিধাত্রীর পিতা মাতা উভয়ের কাজ করিতে লাগিলেন। তখন কন্যার বয়স চারি বৎসর মাত্র। দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি শান্ত দান্ত হইয়া কন্যাকে পালন করিলেন; আর এই সময়ের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তখন সমাজের শাসন বড় কঠোর ছিল, ব্যক্তিগত বা বংশগত বিবাদ বিসংবাদেও সামাজিক সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইত না। সেই জন্য ক্রিয়াকর্ম্মে চৌধুরী মহাশয়কে যাত্রাপুরে বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে, এবং রায় মহাশয়কে গৌরীপুরে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে হইত। সেবার রায় মহাশয়ের মাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পর তিন চারি দিন তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া আমলা গোমস্তারা মনে করিল, বোধ হয় কোনও কারণে তিনি অপমান বোধ করিয়াছেন, তবে আবার নূতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে। পঞ্চম দিন রাত্রিকালে সঙ্গীতালোচনার পর আহার করিতে যাইবার সময় শৈলজাপ্রসন্ন খাসমুন্সীকে বলিলেন, 'কাল আমি যাত্রাপুরে যাইব, দ্বিপ্রহরের পরই পাল্কী চাহি।' কর্ম্মচারীরা মুখ চাওয়া-চাহি করিল; কেহ কারণ বুঝিতে পারিল না।

পর দিন মধ্যাহ্নের পরই যাত্রা করিয়া শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে জমীদার-বাড়ীতে উপনীত হইলেন। রায় মহাশয় তখন বৈকালিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, ভৃত্য যাইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া সংবাদ দিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের আগমনে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

স্বাগত-সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন শেষ হইলে শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথার জন্য আসিয়াছি।' রায় মহাশয় বলিলেন, 'যে আজ্ঞা হয়, করুন।' শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, 'সীমানার খালের ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলা যাউক।' রায় মহাশয় বলিলেন, 'সে ত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু খালটা প্রকৃতপক্ষে আমার—' শৈলজাপ্রসন্ন সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'সে তর্ক করিতে আমি আসি নাই। আমি আমার সব সম্পত্তি ও কন্যা আপনার পুত্রকে দান করিতে চাহি।' এ প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, রায় মহাশয় প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ইহার দুই মাস পরে বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে রায় মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল, এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই সব সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্র করিয়া দিয়া শৈলজাপ্রসন্ন সংসারত্যাগী হইলেন; কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না।

হিন্দু কুলবধূর বিষয়-বুদ্ধি যতই কেন প্রখর হউক না, সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে না; তাহা পতির বা পুত্রের কাজের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে, বাহিরের লোক শক্তির কেন্দ্রের সন্ধানও পায় না। কাজেই যত দিন শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন বাহিরের লোক কেহ বুঝিতেও পারে নাই, রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে বিষয়কার্য্যে দক্ষ কেহ আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ রায় মহাশয় বিধাত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সময় সময় যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতেই বুঝিতেন, বধূর বিষয়বুদ্ধি অসাধারণ প্রখর। তাই সময় সময় তিনি আপনার সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় কথাও বধূর সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তিনি পুত্রবধূকে 'মা লক্ষ্মী' বলিয়াই ডাকিতেন, এবং বলিতেন, 'মা লক্ষ্মী সত্যই আমার ঘরের লক্ষ্মী।' শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর স্বামী যখন সংসারের কর্ত্তা হইলেন, তখন বিষয়কার্য্যে বিধাত্রীর প্রভাব একটু একটু প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, রায় মহাশয় মৃত্যুকালে বৃদ্ধ দেওয়ানকে বলিয়া গিয়াছিলেন, জটিল কাজে তিনি যেন 'মা লক্ষ্মী'র পরামর্শ গ্রহণ করেন; কেন না, তিনি দেখিয়াছেন, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধির কাছে পুরুষের কুটিল বুদ্ধিকে পরাভব মানিতে হয়। বৃদ্ধ দেওয়ানও সময় সময় গৌরীপুরের জমীদারীর কথায় অছিলায় নানা বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর পরামর্শ লইতেন।

এই সময় নীলকরের অত্যাচারপীড়িত প্রজারা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া কাছারীতে আসিয়া বলিল, অত্যাচারে তাহাদের পক্ষে ভিটায় বাস করা অসম্ভব

হইয়াছে, জমীদার প্রতীকার না করিলে তাহাদের মান ইজ্জত সব যায়, তাহারা না খাইয়া মরে। নীলকরের প্রবল প্রতাপের বিষয় জমীদারের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'সবই জানি। কিন্তু উপায় কি? নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে যে বাড়ীর একখানা ইটও রাখা দায় হইবে।'

প্রজারা নিরাশ হইল; কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিল। সেই সময় বৃদ্ধ দেওয়ান গোকুল সর্দ্দারকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোকুল তাঁহার অনুসরণ করিল।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া অন্য প্রজাদিগকে বলিল, 'তবে আর কি; চল বাড়ী যাই।' সকলে বাহিরে আসিলে সে বলিল, 'বাবু ত বিদায় দিলেন। কিন্তু ভিটা ছাড়িয়া যাইব, একবার মাকে প্রণাম করিয়া যাইব।' এই বলিয়া সে অন্দরের পথে অগ্রসর হইল, সকলেই তাহার সঙ্গ লইল। অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া গোকুল ডাকিল, 'মা! মাঠাকরুণ!' কালীর মা জমীদার-গৃহে আশ্রিতা-বৃদ্ধা। সে দ্বিতলে দরদালানের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'কি গোকুল?'

গোকুল বলিল, 'নীলকরের অত্যাচারে আমরা সব প্রজারা ভিটা ছাড়িয়া যাইতেছি; তাই একবার মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।'

কালীর মা বলিল, 'তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কর্ত্তাকে সে কথা জানাইয়াছ?'

'হাঁ। তিনি বলেন, নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে বাড়ীর একখানা ইটও বজায় রাখিতে পারিবেন না।'

বিধাত্রী দেবী স্বয়ং জানালার সম্মুখে আসিলেন। যেন পীঠের উপর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বলিলেন, 'তবে কর্ত্তাকে এই অন্দরে আসিতে বল, আমি কাছারীতে যাই।' তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আমি জানি, আমি তোমাদের মা, তোমরা আমার এতগুলি সন্তান। তোমরা যদি আপনাদের মান ইজ্জত রাখিতে না পার, তবে মায় মান ইজ্জত রাখিবে কেমন করিয়া? তবে ত তোমাদের আগে আমাকেই দেশত্যাগী হইতে হয়। তোমরা কি অত্যাচার হইতে মাকেও রক্ষা করিতে পার না?'

'হুকুম পাইলেই পারি। মা, যে খালের ঝগড়া তুমি মিটাইলে, সেই খাল লইয়া দুই ঘরের দাঙ্গা হাঙ্গামায় এই গোকুল সর্দ্দারই বরাবর কর্ত্তাদের 'সর্দ্দার'

ছিল। বুড়া হইলেও এখনও কব্জীতে যে জোর আছে, তাহাতে লাঠীর জোরে কুঠীর পঙ্গপাল নিপাত করিতে পারি। চাই কেবল হুকুম।'

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'ইহার আবার হুকুম কি, গোকুল? ঘরে আগুন লাগিলে আগুন নিবাইতে হয়; সে জন্য কি কখনও কাছারীর হুকুমের বা মার আদেশের অপেক্ষা রাখিতে হয়? তবে আমি তোমাদের মা—আমি এই কথা বলিতেছি যে, তোমরা যদি কোনও বিপদে পড়,তবে যতক্ষণ এ বাড়ীর একখানা ইট থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টার কোনও ত্রুটী হইবে না।'

'তবে আর কাহাকেও ভয় করি না' বলিয়া গোকুল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

পাশেই গোকুলের ছেলে ছিল। সে বলিল, 'কিন্তু যদি—'

সহসা গোকুল তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে বলিল, 'চুপ কর, ছোটলোকের বাচ্ছা। মার কথায় অবিশ্বাস! তিন দিন পাঠশালায় যাওয়ার এই ফল।'

ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে উত্তর দিল না। তখনও বাঙ্গালীর ছেলে বাপের কথার উপর কথা কহিতে শিখে নাই।

প্রজারা যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন কর্ত্তা কাছারীর বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিলেন—নবীন নাপিত তাঁহার দাড়া কামাইবার আয়োজন করিতেছিল। গোকুল কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আজ যে—জমীর কাছে আসিবে, তাহার মাথা ভাঙ্গিব।'

কর্ত্তা চিন্তিতভাবে বলিলেন, 'তাই ত!'

গোকুল বলিল, 'তাহাতে আর কি, কর্ত্তা মহাশয়; এ মরা খালটার জন্য পয়সার লোভে প্রাণ দিতে গিয়াছি, আর মান ইজ্জতের জন্য মার আদেশে প্রাণটা দিতে পারিব না?'

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রজারা কি করিয়াছিল, সে ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়,অর্থাৎ, যুদ্ধ ও সন্ধি, রাজা ও শাসনকর্ত্তা, এই সকলের কথা বাদ দিয়া, যে ইতিহাসে জাতীয় জীবনের স্তরপরম্পরা বর্ণিত হয়, জাতির উন্নতি-অবনতির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, সেই ইতিহাস রচিত হয়, তবে তাহাতে দেখা যাইবে, বাঙ্গালায় নীলবিদ্রোহ জাতীয় জীবনের যুগ-সন্ধি। তখন এক দিকে বাঙ্গালায় ইংরাজ নীলকরের অনাচার, আর এক

দিকে ইংরাজ-শাসনে দেশের লোকের অবিচলিত বিশ্বাস; এক দিকে আত্ম-শক্তিতে দেশের লোকের প্রত্যয়,আর এক দিকে মুষ্টিমেয় নীলকরের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। সেই সময় জাতীয় সাহিত্যে ও দেশের জনসাধারণের কার্য্যে নূতন ভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' রচিত হয়; সেই সময় বাঙ্গালার পল্লী প্রান্তর মুখরিত করিয়া জন-সাধারণ গান করিত—'নীল বানরে সোনার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারেখার'; সেই সময় হরিশের 'হিন্দুপেটরিয়টে' নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদ; আর সেই সময় দেশের জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যে বাঙ্গালা হইতে নীলের চাষের বিলোপ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন, তখনও তেমনই ভাবের বন্যা—আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আগ্রহ বাঙ্গালী গৃহস্থের বহিরঙ্গনের প্রাচীরে প্রহত হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; পরন্তু অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রাপুরের জমীদার-পত্নী বিধাত্রী দেবী সেই ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রজাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

প্রবল বাত্যায় যেমন বনে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া যায়, প্রবল বন্যায় যেমন নদীতে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়, নীলের হাঙ্গামায় তেমনই বাঙ্গালা হইতে নীলকরের অত্যাচার দূর করিয়া দিল। তখনও বাঙ্গালায় লোকের অন্নকষ্ট ছিল না। তাহার 'ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাচ' ছিল। তখনকার মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কথা 'নীলদর্পণে' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—'আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখানা লাঙ্গল, পঞ্চাশ জন মাইন্দার; পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা।' নীলকরের অত্যাচার যখন দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া গেল, তখন বাঙ্গালী আবার যে যাহার কাজে মন দিল, সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

বিধাত্রী দেবীর এক দিনের একটি কথায় তাঁহার নাম বাঙ্গালার তিনটি জেলার অনেকগুলি গ্রামে পরিচিত হইয়া গেল; লোক বলিল, 'সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি কাহাকে দিয়া কি কাজ করান, কে বলিতে পারে? নহিলে কর্ত্তা যে হুকুম দিতে পারিলেন না—গৃহিণী কি সে হুকুম দিতে পারিতেন? ও সব তাঁহারই লীলা।' কেহ বলিল, 'হইবে না—কেমন বাপের মেয়ে?'

তাহার পর আরও বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। বিধাত্রী দেবী পতি পুত্রের সংসার লইয়া—দেবসেবা ও লোকসেবা দেখিয়া—অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্নের বন্দোবস্ত করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে দিনের সে কথা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কর্ত্তা গৃহিণীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার বিকাশ হইত। কর্ত্তা কোনও দিন কোনও কাজে অসময়ে অন্তঃপুরে আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এখন যে?' কর্ত্তা আসল কথাটা বলিবার পূর্ব্বে বলিতেন, 'কেন, আমার কি এ সময় বাড়ীর মধ্যে আসিতে নাই? আমি অন্দরে আসিলাম, তুমি কাছারীতে যাও।' প্রথম প্রথম বিধাত্রী দেবী স্বামীর এই কথায় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেন—'আচ্ছা মানুষ! সেই যে এক কথা গের দিয়া রাখিয়াছ!' কর্ত্তা বলিতেন, 'সে কথা ভুলিলে যে, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গের দেওয়া হইবে।' শেষাশেষি গৃহিণী বলিতেন, 'যাইবই ত—আর দিন কতক দেরী কর—রমা বাবুকে লইয়া আমি কাছারী করিতে যাইব। কি বল রমাবাবু?' এই কথা বলিয়া তিনি একমাত্র সন্তানের;পুত্র রমারঞ্জনের মুখ চুম্বন করিতেন। কর্ত্তা কিন্তু হারিবার পাত্র নহেন; তিনি বলিতেন, 'ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।' তুমি তোমার নূতন কর্ত্তাকে লইয়া কাছারী করিতে যাইবে; আর আমি আমার নূতন গৃহিণীকে লইয়া বোজই কাছারী করি।' এই নূতন গৃহিণী গৌরী—রমারঞ্জনের দিদি। কর্ত্তার কোলে সে মৌরশী বন্দোবস্তে কায়েম মোকাম হইয়াছিল।

সেই সুখের সংসারে বিধাত্রী দেবীর দিন কাটিতেছিল। কিন্তু তিনি যে কেবল সংসারের বন্দোবস্ত লইয়াই—দেবসেবা ও পূজাদি লইয়াই—নাতি নাতিনীকে লইয়াই—পতি, পুত্র, পুত্রবধূ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারিতেন, তাহাও নহে। বৈষয়িক অনেক বিষয়ে কর্ত্তা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তাহা কর্ত্তা জানিতেন, আর তিনি জানিতেন। সম্পত্তির সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা আর কেহ জানিত না। যেমন নদীর প্রবাহে সহস্র সহস্র লোক উপকৃত হইলেও কেহ গিরিগাত্রে লুকায়িত উৎসের সন্ধান রাখে না, তেমনই তাঁহার পরামর্শে আরব্ধ কার্য্যে প্রজাদের অনেক উপকার হইলেও সে কার্য্যের কারণ তাহারা জানিতে পারিত না। কেবল তাহারা কর্ত্তার অনেক কাজেই প্রজার প্রতি স্নেহ দয়ার পরিচয় পাইত, কিন্তু সে স্নেহ দয়া যে মাতৃহৃদয়ের কোমলতা-মন্দাকিনী হইতে প্রবাহিত হইয়া পুরুষের

কঠোরতা স্নিগ্ধ ও সরস করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু রায়-পরিবারের অন্তঃপুর হইতে প্রবাহিত সেই স্নেহধারায় প্রজারা স্নিগ্ধ হইত।

পরিবারে কোথাও সুখের ও শান্তির বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। লোকে বলিত, 'সোনার সংসার। গৃহিণীর গুণে কোথাও কোনও অভাব নাই।'

সহসা এই সংসারে বিপদের বজ্রপাত হইল। ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে গ্রামে দেখা দিল, এবং বজ্র যেমন সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষকেই দগ্ধ করে, তেমনই প্রথমে রায়-পরিবারের চূড়া চূর্ণ করিয়া দিল। রায় মহাশয়ের লোকান্তরের পর—পিতার শ্রাদ্ধের জের মিটাইবার পূর্ব্বেই—পুত্র পীড়িত হইলেন! গৃহিণী সকলকে লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোনও ফল ফলিল না। দুই মাসের মধ্যে পতি পুত্র হারাইয়া বিধাত্রী দেবীর পক্ষে কুসুমাস্তৃত সংসার কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গেল—সাজান সংসার শ্মশান হইল!

২

বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিধাত্রী দেবীর যশ অন্দর হইতে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—বিশ বৎসর পরে অতর্কিত ঘটনার অপ্রত্যাশিত সংঘটনে আবার তাহাই হইল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফুটিয়াছিলেন জয়ে—বিশ বৎসর পরে ফুটিলেন পরাজয়ে; সেবার ফুটিয়াছিলেন ভাবে—এবার ফুটিলেন অভাবে। এ পরাজয় অদৃষ্টের কাছে, অভাব জীবন-সর্ব্বস্বের। পতিপুত্র-পরিত্যক্ত সংসার লইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল। রমার ও গৌরীর দিকে চাহিয়া তিনি শোকবিক্ষত হৃদয়ে বল বাঁধিলেন—সংসার দেখিতে হইবে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে, রমাকে ও গৌরীকে 'মানুষ' করিতে হইবে, বিধবা পুত্রবধূকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি না দেখিলে সব নষ্ট হইবে, রমার ও গৌরীর অযত্ন হইবে। তাই প্রবল চেষ্টায় শোকের আকুলতা সংযত করিয়া, হৃদয়ে রাবণের চিতার দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ব্যথা বুঝিল কালীর মা; আর বুঝিলেন, বৃদ্ধ দেওয়ান। দেওয়ানজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? এ যে শোকেরও অবসর দিলেন না!'

দেওয়ানজী জানিতেন—বিধাত্রী দেবী সম্পত্তির সংবাদ জানিতেন; কিন্তু সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা তিনিও জানিতেন না। এখন তিনি দেখিলেন, বিধাত্রী দেবী সবই জানেন। বিধাত্রী দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস

ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'যাহা বলিয়াছিলাম, হায়, তাহাই হইল! রমাকে লইয়া আমাকেই কাছারী করিতে হইল!' 'কাছারী করিবার' আরও একটা কারণ উপস্থিত হইল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া বিষয়ের ভার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে লইবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিধাত্রী দেবী তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন নাবালক জমীদারদিগকে এক স্থানে রাখা হইত। তাহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল। রমাকে ছাড়িয়া তিনি হয় ত থাকিতে পারিতেন—যখন এত সহিয়াছে, তখন তাহাও হয় ত সহিত; কিন্তু পুত্রবধূ কি লইয়া থাকিবে? তাহাকে যে ছেলে মেয়ে দিয়াই ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, আর ধীরে ধীরে সংসারের কাজ শিখাইতে হইবে। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, গৌরীপুরের জমিদারী তাঁহার, আর তাঁহার শ্বশুরের নির্দ্দেশানুসারে যাত্রাপুর জমিদারীর যে অংশ দেবোত্তর, তাহারও তিনিই আজীবন সেবাইত। সে সব বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস তাহা সামান্য বলিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। বিধাত্রী দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন; প্রজাদিগকে কি তিনি পরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন?

পুত্রবধূকে এবং রমাকে ও গৌরীকে তিনি সদাসর্ব্বদা কাছে রাখিতেন; একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন; সর্ব্বদা সকলে এক সঙ্গে থাকিতেন। যাহারা তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিল না, তাহারা বলিল, 'শক্ত মেয়ে বটে! কিন্তু ঐ রমা গৌরীই ভরত মুনির মৃগশিশু হইবে।' তাহারা বিধাত্রী দেবীকে চিনে নাই। এই সব কাজের মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতাকে ভাবিতেন—'পারের তরী ঘাটে আসিতে যে কয় দিন বিলম্ব হয়, সে কয় দিন অনন্তকর্ম্মা হইয়া তোমাকেই ডাকিবার অবসর দাও।' শোকে শান্তিলাভের জন্য তাঁহার পিতাও ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন কি? কিন্তু তিনিও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আত্মোন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন পিতার দৃষ্টান্ত কন্যা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। পিতার আদর্শে কন্যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করিতেন। যে পিতা কন্যাকে কোনও দিন মাতার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই, যাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাঁহার দেবত্বেরই পরিচায়ক ছিল, যিনি কর্ত্তব্যে অটল, এবং ধর্ম্মে অবিচলিত ছিলেন, সেই পিতাকে বিধাত্রী দেবী দেবতা-জ্ঞানেই পূজা করিতেন। প্রতিদিন দেবপূজা শেষ করিয়া প্রণামান্তে

তিনি পিতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পিতাকে প্রণাম করিতেন। এখন তিনি পিতার উদ্দেশে বলিতেন, 'যেন তোমার কন্যা বলিয়া গর্ব্ব করিবার উপযুক্ত হই।'

পর বৎসরও যখন বর্ষার জল সরিতে না সরিতে ম্যালেরিয়া দেখা দিল, তখন বুঝা গেল—এই ব্যাধি পথভুলা অতিথিমাত্র নহে, বৎসর বৎসর বার্ষিক আদায় করিতে আসিবে। তখন বিধাত্রী দেবী দুইটি কাজ করিলেন; স্বামীর নামে গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর কলিকাতায় একখানি বাড়ী কিনিলেন। বর্ষার পর কয় মাসের জন্য পুত্রবধূকে এবং পৌত্রপৌত্রীকে লইয়া তথায় বাস করিবেন। এ দিকে রমাকে ও গৌরীকে লেখাপড়া শিখাইবারও সময় উপস্থিত হইল। সে বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাও তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি পুত্রবধূকে তাহাদের প্রথম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় তিনি পুত্রবধূর জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন; শিল্পকার্য্য শিখাইতে লাগিলেন। এ দিকে বিষয়কর্ম্মের আলোচনাকালে তিনি পুত্রবধূকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। সংসারের কাজও তাঁহাকে দেখাইতেন।

বিদ্যায় বিধাত্রী দেবীর অসাধারণ আদর ছিল। সে ভাবও তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বলিতেন, 'বিদ্যাই পুরুষের ভূষণ।' কন্যা পিতার কাছে চাণক্য শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।' আর 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কন্যাকেও শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নাই। সেই শিক্ষা কন্যাকে সংসারের সব কাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। পৌত্র-পৌত্রীর বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন, এবং আপনি তাহাদের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করিতেন। চর্চ্চার অভাবে তাঁহার বিদ্যা নিষ্প্রভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন। রমার ও গৌরীর শিক্ষার উন্নতিতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

কালের মত ভিষক আর নাই; তাহার বিস্মৃতি-প্রলেপে আমাদের হৃদয়ে শোক দুঃখের ক্ষতও দূর হয়; যে ক্ষত সারিবার নহে, তাহারও বেদনা-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। বিধাত্রী দেবীরও তাহাই হইয়াছিল। রমা গৌরীকে লইয়া তাঁহার মুখ সময় সময় হাসির কিরণে সমুজ্জ্বল হইত। বিশেষ তিনি

তাহাদের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বিধাতার নির্দ্দিষ্ট মনে করিয়া কাজ করিতেন। সংসার হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, সংসারে বা বিধাত্রী দেবীর হৃদয়ে তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু যাহারা ছিল, তাহাদের লইয়া সংসার আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইল।

পুত্রবধূর প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহের সীমা ছিল না। সংসারের সুখের আস্বাদ পাইতে না পাইতে তাঁহার পক্ষে জীবন দুঃখময় হইয়াছে বলিয়া বিধাত্রী দেবী সর্ব্বদা তাঁহাকে স্নেহে শীতল করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পিত্রালয়ের কেহ আসিলে, তিনি পরম যত্নে থাকিতেন। আগন্তুকরা সকলেই যে আপনাদের আত্মীয়কে সুপরামর্শ দিতেন, এমন নহে; কিন্তু তাহা জানিয়াও বিধাত্রী দেবী তাঁহাদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের পরামর্শে পুত্রবধূ যে শাশুড়ীর প্রাধান্যে সময় সময় একটু বিরক্তি-চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিতেন না, তিনি তাহাও লক্ষ্য করিতেন। তিনি মনে মনে হাসিতেন; সবই পুত্রবধূর, সংসার তাঁহার, পুত্র কন্যা তাঁহার; তিনি ত তাহাদের জন্যই আজও সংসারের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছেন; তিনি ত এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন। তিনি তাহাতে দুঃখিত হইতেন না। কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্য করিতেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহার মাতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, রমার নয়নে বেদনাকাতর দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত, তখন তাঁহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ যাতনা জাগিয়া উঠিত—শূন্য স্থানটা স্নেহে পূর্ণ করিবার চেষ্টা, রমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিবার একটা প্রবল কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে প্রয়াস পাইত। কিন্তু পাছে রমা তাহা বুঝিতে পারে, সেই ভয়ে তিনি সে ভাব ফুটিতে দিতেন না। রমা তাহা বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু সময় সময় তাঁহার মনে হইত, সূর্য্যকিরণ যেমন স্বচ্ছ হ্রদের নিম্নতল পর্য্যন্ত ভেদ করে, রমার দৃষ্টি তেমনই তাঁহার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। বাস্তবিক, শৈশবে শোকের সংসারে বর্দ্ধিত হইয়া রমারঞ্জন বালসুলভ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা সপ্রকাশ থাকিত। বিশেষ সে সর্ব্বদা ছায়ার মত পিতামহীর অনুসরণ করিত, তাঁহার স্নেহে সে এমনই পরিতৃপ্তি লাভ করিত যে, তাহার পক্ষে সংসারে আর কাহারও প্রয়োজন অনুভূত হইত না। পৌত্রী গৌরী যে তাহার মাতার অধিক অনুরক্ত হইয়াছিল, তাহাও বিধাত্রী দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না।

বিধাত্রী দেবী লক্ষ্য করিতেন, প্রকৃতি পুত্রকে পিতার ও কন্যাকে মাতার অনুরূপ করিয়া গঠিত করিয়াছেন। রমার মুখে যেমন, ব্যবহারেও তেমনই তিনি তাঁহার মৃত পুত্রের ছবি দেখিতে পাইতেন। সে তেমনই স্থির—ধীর—উদার—সহৃদয়, তেমনই বুদ্ধিমান, বিবেচক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আজ্ঞানুবর্ত্তী। আর গৌরী তাহার মাতার মত একটু চঞ্চল, ক্ষমতাপ্রিয়, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশবর্ত্তী। কিন্তু পৌত্র পৌত্রীতে তাঁহার স্নেহের তারতম্য ছিল না। তাহারা দুই জন তাঁহার দুই নয়ন, দুই জনই সমান। রমাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ, তাহার উপর বংশের যশ ও সম্পদ নির্ভর করিতেছে; সে কুলপ্রদীপ বংশের শিবরাত্রির সলিতা; বিশেষ সে অল্প বয়সে অর্থ ও প্রভুত্ব লাভ করিবে; সুশিক্ষিত না হইলে সে সম্পদ তাহার পক্ষে বিপদে পরিণত হইতে পারে। গৌরীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ—অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে পরের ঘর করিতে যাইতে হইবে; যত সংবাদ লইয়াই মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাউক না, তাহার মধ্যে অনিশ্চয়ের অনেকটা অবসর থাকেই; কারণ, অজ্ঞতার অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া পরের সংসারের সবটা দেখা যায় না। বিশেষ স্ত্রীলোককে স্বামীর প্রেম, শাশুড়ীর স্নেহ, দেবরাদির ভালবাসা, এ সব নিজগুণে লাভ করিতে হয়। তাহাই স্ত্রীলোকের নিয়তি। সেই জন্য তিনি যেন রমার অপেক্ষাও গৌরীর জন্য অধিক চিন্তিত হইতেন; সর্ব্বদা তাহাকে সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই আগ্রহের আতিশয্য যে সময় সময় গৌরীর ও গৌরীর মাতার কাছে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও তিনি জানিতেন; কিন্তু জানিয়াও আপনার কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ থাকিতেন।

গৌরীর বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখনই বিধাত্রী দেবী দেওয়ানজীকে বলিলেন, এখন হইতে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা ভাল। দেওয়ানজী বলিলেন, 'ভাল—ঘটক দেখি; কিন্তু আর এক বৎসর যাইলে ভাল হয়, সম্বলের মধ্যে ত ঐ দুই গুঁড়া।' বিধাত্রী দেবী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; 'কিন্তু মেয়ে, রাখিবার ত নহে। দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিবে।'

বাস্তবিক, গৌরীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনি চিন্তিত হইলেন। তাহার মাতা যখন তাঁহার আত্মীয়দিগকে রূপে গৌরীর উপযুক্ত এবং ধনবান পাত্রের সন্ধান করিতে বলিলেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিধাত্রী দেবী সে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। পুত্রবধূর পিত্রালয়ের লোক বলিল,

'গৌরীর বিবাহের আবার ভাবনা!' অনেকেই আপনার ঘরে গৌরীকে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকা আনিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু 'উপযুক্ত পাত্র' সম্বন্ধে পুত্রবধূর মতে ও শাশুড়ীর মতে ঐক্য হইল না। পুত্রবধূ মনে করিতেন, রূপবান ও ধনবান জামাতাই উপযুক্ত; শাশুড়ী মনে করিতেন, পুরুষের বিদ্যা ও চরিত্রই রূপ, কেবল কুরূপ না হইলেই হইল; ধনের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, ধনার্জ্জন পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, বংশ ও পরিবার ভাল দেখিয়া গৌরীর বিবাহ দিবেন, কি জানি, যদি তাহার কষ্ট হয়। তাহার মাতা ভাবিতেন, অর্থের বলে তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ীতে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিবেই। ইহাতে কিন্তু বিধাত্রী দেবী বলিতেন, 'তাহা নহে, রাজকন্যা হইলেও মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে সকলের অধীন; তাহাকে নিজ গুণে জয়ী হইতে হয়।' কিন্তু এই কথায় কান্তার মা এক দিন যখন বলিয়াছিল, 'বৌমা গরীবের মেয়ে, তাই টাকার মর্য্যাদা অধিক বুঝেন', তখন বিধাত্রী দেবী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা! এখনও ছেলেমানুষ, সংসারে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; তাহা হয় নাই বলিয়াই বৌমা ভুল করিতেছেন।' অনেক বিষয়ে বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূর মতের জন্য আপনার মত ত্যাগ করিতেন, কিন্তু গৌরীর জন্য পাত্রনির্ব্বাচনের মত অত্যাবশ্যক বলিয়া তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে তাহা করিলে তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন।

তথাপি যখন পুত্রবধূর সঙ্গে মতভেদ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়া পড়িল। শেষে তিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, 'মানুষের পক্ষে ভ্রম অতিক্রম করা অসম্ভব, আত্মশক্তিতে অতিপ্রত্যয় মানুষকে ভ্রান্ত করে। তোমরা আমার দৌর্ব্বল্য অবগত আছ, আমাকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দাও। আমি যেন গৌরীর পাত্রনির্ব্বাচনে ভুল না করি।' তিনি একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। দিবালোকবিকাশের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন অন্ধকার হইয়া থাকে, আশঙ্কার অনিশ্চিত ভাবে তাঁহার হৃদয় তেমনই অন্ধকার হইয়া রহিল। আর কেহ তাহা লক্ষ্য করিল কি না, জানি না—কিন্তু রমা তাহা লক্ষ্য করিল। অপরাহ্নে সে আসিয়া পিতামহীর কাছে দাঁড়াইল। বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রমাবাবু, আজ বেড়াইতে যাও নাই?' সে বলিল, 'না।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' কোনও উত্তর না দিয়া সে তাঁহার কাছে বসিল, তাহার পর তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তিনি তাহার কেশমধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

নিকটে আর কেহ ছিল না। রমা বলিল, 'ঠাকুরমা, আজ কয় দিন হইতে তুমি কি ভাবিতেছ?' বালক যে তাঁহার চিন্তার ভাবও লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে বিধাত্রী দেবী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, 'ভাবনা কি, রমা?' রমা পিতামহীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার বড় বড় চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু দেখা দিল—পিতামহী তাহাকে আপনার চিন্তার কারণ জানিতে দিবেন না। বিধাত্রী দেবী আর থাকিতে পারিলেন না—স্বামীর ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, সে সবই কি এই বালকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে? তাঁহার পক্ষেও অশ্রু-সংবরণ করা অসম্ভব হইল। তিনি রমার মুখ চুম্বন করিলেন; তাহার পর রমার অশ্রু মুছাইয়া ও আপনার অশ্রু মুছিয়া তিনি বলিলেন, 'শিশির জন্য বর খুঁজিতেছি; বর কেমন হইলে ভাল হয়, তাই ভাবিতেছি।' রমা বলিল, 'তাহার জন্য এত ভাবনা কেন, ঠাকুরমা?' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমি যেমন বর ভাল মনে করি, কেহ কেহ তেমন বর ভাল মনে করে না, তাই ভাবিতেছি, কোন মত কাজ করি?' 'কেহ কেহ' কে, রমা তাহা বুঝিল কি না, জানি না; কিন্তু সে বলিল, 'কেন ঠাকুরমা, তুমি ত বরাবরই বল, মন নারায়ণ; তোমার মন যাহা ভাল বলিবে, তুমি তাহাই করিবে। পরের মতের জন্য ভাবনা কেন?'

বালকের উত্তরে বিধাত্রী দেবীর ভাবনা কাটিয়া গেল। যেন দক্ষিণা বাতাসে নিদাঘদিনান্তে পশ্চিম আকাশে সঞ্চিত মেঘমালা সরিয়া গেল; অপগতমেঘ গগনে চন্দ্রালোক দেখা দিল। তাঁহার মনে হইল, দেবতা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন—রমার মুখে তিনি দেববাণী শুনিতে পাইয়াছেন। এই উত্তরের সঙ্গেই তাঁহার পিতৃদত্ত ও গুরুদত্ত শিক্ষার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তিনি আবার রমার মুখ চুম্বন করিলেন; বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ রমাবাবু। তোমার কথাই ঠিক। মনই নারায়ণ; কিন্তু আমরা মায়াবদ্ধ জীব, মধ্যে মধ্যে আপনাদের আশঙ্কায় এমনই বিব্রত হই যে, দেবতার কথা শুনিতে পাই না। তখন তিনিই আবার দয়া করিয়া আপনার কথা শুনাইয়া দেন।'

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

[আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুত বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ;—গত ১১ই মাঘ, উননবতিতম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে পঠিত।]

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতেদুর্হিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু ॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥—অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭। ১৩। ১—৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে, যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূর, তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন, তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুষুপ্ত, তাহা জাগ্রত হয়। আজিকার দিনে সমাসীন সভাসদ্‌বর্গের হৃদয়ের আনন্দ সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে, আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আমার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিংবা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত সকল হৃদয়ের প্রসূত আনন্দ আমার নিজের হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে সমাজের যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দুর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু দিন পূর্ব্বে এই সমাজের এক জন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্য মহোদয় * হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটী কথা বলেন :—

* ৺ রাজনারায়ণ বসু মহোদয়।

"আমি দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে।"

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয়, আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্রক জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয়, পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আজ দু'চার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যত দিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে, তত দিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্ত্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরামাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যে ভাবেই তাহার উল্লেখ কর না কেন, সেই League, Federation, Parliament ধর্ম্মভিত্তি না হইলে নামমাত্রই থাকিবে। সে নামে এ স্থলে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির উপর নহে। ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্মী হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্ম্মী কর্ম্মধন চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর, তাহা অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আসুরিক।

নাইট্‌সকের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

"শুভ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারে। ক্ষমতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয়, তাহাতে। মানুষের শক্তি প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারের অনুভূতিতে। বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে। ক্ষমতা-অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।" *

জার্ম্মাণীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাটসিনি তাঁহার "মানবধর্ম্মে" (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, 'যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না।' ঐহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথের আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা পড়িতেছে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে "ভাই, ভাই", কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি বলেন যে, বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই। সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার-রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যত দিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতির সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennaisএর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস।"

* "What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contentedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity."

প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবসান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পারে না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে থাকিবে, তত দিন সেই অধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জ্জীব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—"আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে, তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহার উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা বিঘ্ন সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই।"

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানবরাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোনও স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনা। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusadeএর সময় যেমন 'God with it! God with it!' বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর—বিশ্বাসের উপর তাহারা একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেব-দানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপুদমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তিলাভ হয়, তাহা ঐশী-শক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ-লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয় দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব"-পরিত্যাগ আবশ্যক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অর্জ্জনীয়।

কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

Mazzini বলেন—

"যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোনও পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপকাঠি কোথায় থাকে? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে, কাহার বলে, কিসের বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে বলি দিতে আহ্বান করিব? যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, তত দিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে মিল পাইতে পারিব না।" *

জর্ম্মাণ জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব, সংগ্রামচেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা (Baron von Freytag Loringhoren) জর্ম্মাণীর এক জন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইস্‌কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল, উভয়েরই পশুপ্রবৃত্তি আছে। বাইবেলের এ কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপভাব মানুষ যে সময় সৃষ্ট হয়, সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই কেন সভ্য হও না, তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না।"†

---

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds who can save us from the tyranny of our fellowmen, whenever they find themselves stronger than we. If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect guggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds.

† The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

কিন্তু তাঁহারও মতে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে শক্তি-পূজাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জর্ম্মণসম্রাট যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন, ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন—

"আমি সমরেশ—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি,—পিতা মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগকে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য্য ভাল কি মন্দ, তোমাদের বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম।"

জর্ম্মণীর নেতৃগণ জর্ম্মাণ সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে, তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা দেন,—"বল, তোমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিবে? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে।" তাঁহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মশাসনতন্ত্র (State and Church) বহু দিন হইতেই ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে—রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য। রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে।

হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। Mazzini এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুসেডের ধ্বনি—'ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।' এই ধ্বনিই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে, ফ্লরেন্সের শিল্পিগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিলেও গম্ভীরভাবে যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্র রাজ্যের নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেন।" *

ইতালীতেই স্যাভনরোলা (Savanorola), ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"

---

* The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade 'God with it' ! "God with it !" alone can rouse the inert into action. Remember the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ;—

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা।"

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে—

'সিদ্ধো ভবতি
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি'

বলিয়াছেন। ভন মল্কি (Von Moltke) একটী শান্তি-সঙ্গতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

"যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায় ; এক কথায়, যুদ্ধ অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব হইতে মানুষকে উদ্ধার করে।" *

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মাণীতে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা, বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধর্ম্মসভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার এক জন অধ্যাপক বলেন,—মানব-দ্রব্যের বিবেক নাই—"Human commodity have no conscience। তিনি বলেন—"উদ্দেশ্য-সাধনে সব পন্থাই সাধু।" সেখানকার এক জন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন,—রাজনীতিক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য।—জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন,—যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); যুদ্ধ হইতে জীবনলাভ হয়। আজকালকার অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণীর এই ভাব। কিন্তু সেই জর্ম্মণীতেই ক্যাণ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে,—

"মানুষ স্বাধীন ; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোনও স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে।"

---

* "War is sacred and instituted by God ; it is one of the holy bonds which rule the world ; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism."

তিনি বলেন যে,—

"ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা-পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।" *

মল্কি (Moltke) হউন, কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে,—আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে; আমাদের মনে এ কথা কখনও স্থান পাইবে না।

"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং"

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতা নোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন—

"পিতা নো বোধি।"

"অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।"

ভক্তদিগেরই তিনি সুলভ।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তন্ময়া

তাঁহাতেই সকলে সম্পূর্ণ;

যত স্তদীয়া

সবই তাঁহার;

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষার অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে।

তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রজ্ঞানই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদিসমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না—বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সমীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূতভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী—

* He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is then a sovereign entity, bearing within himself h law of his own will.

[illegible] অর্জ্জন কর, কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে, বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে ; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোনও কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যবিন্দু 'ত্বং অস্মাকং তবাস্মি'। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা নহে, এবং অমূলক নহে।

ম্যাটসিনি বলেন—

ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests himself successively in humanity.

হিন্দুধর্ম্মেও—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

ভগবানের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাটসিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে—জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনীতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন। *

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটী কোটী হিন্দুর মধ্যে এ রকম একটি লোকও জন্মে নাই, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে ধর্ম্মোৎসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয়, এই আমার প্রার্থনা। ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ।—এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্. এস্-সি., এম্. টী. কর্ত্তৃক লিখিত মূল ইংরেজী গ্রন্থ হইতে শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি. এ., এল্. এল্. বি. কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত।—এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা, ২২।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান পবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ডবল-ক্রাউন ষোল-পেজী এক শত কুড়ি পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট ও ছাপা সুন্দর। ইণ্ডিয়ান প্রেসের ছাপার গৌরব এই পুস্তকে অক্ষুণ্ন আছে। এই গ্রন্থে সাতাশখানি চিত্র নিবিষ্ট হইয়াছে। চিত্রগুলি প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিবার

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

পক্ষে সাহায্য করিবে। দুই বর্ণে মুদ্রিত দশম ও একাদশ চিত্র এই শ্রেণীর ইউরোপীয় চিত্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

ভূমিকায় দেখিতেছি,—'দুই বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগ তত্রত্য নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরাজী, এবং হিন্দী অথবা উর্দ্দু ভাষায় লিখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।' তদনুসারে গ্রন্থকার ইংরেজী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উর্দ্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। গবর্মেণ্ট গ্রন্থকারকে তিন শত টাকা পারিতোষিক দেন।—'সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ' সেই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ।

'স্বাস্থ্যপাঠ' দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। (১) নর-কঙ্কাল, (২) মাংসপেশী, (৩) রক্ত ও রক্তের সঞ্চালন, (৪) শ্বাস-যন্ত্র, (৫) খাদ্য ও তাহার পরিপাক, (৬) মস্তিষ্ক ও স্নায়ু, (৭) চক্ষু ও কর্ণের গঠন, (৮) খাদ্যবিচার, (৯) ব্যায়াম, (১০) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার প্রয়োজনীয়তা, (১১) রোগ ও তাহার প্রতীকার ও সাধারণ দুর্ঘটনা, এই গ্রন্থে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জটিল শারীর-তত্ত্বগুলি সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে।

গ্রন্থকার ও অনুবাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালা ভাষায় শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব না থাকিলেও, তাহার অল্পতা আছে মনে করিয়া' তাঁহারা মধ্য ইংরাজী ও মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগের জন্য এই গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকখানি ছাত্রগণের উপযোগী হইয়াছে। আমরা বলি, শুধু 'অধিকন্তু ন দোষায়' নয়; বাঙ্গালা দেশে ইহার প্রয়োজন ছিল।

শারীর-বিজ্ঞান এ দেশে উপেক্ষিত; 'শরীর-পালন' এখন বিস্মৃত। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' কথায় কথায় পরিণত। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। উপবাসে কোনও জাতিই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। দারিদ্র্য আমাদের জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া 'ভ্যাম্পায়ার' বাদুড়ের মত স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসী ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়ার মহামারীতে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। মানব এ দেশে দানবকে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ দ্রুতবেগে শারীরিক অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে।—বাঙ্গালী পল্টনের রংরুটগণের শতকরা ত্রিশ জন ডাক্তারী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, সুতরাং পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেনা হাতী ও বিশে ডাকাতের জন্মভূমি কঙ্কালসার, পর্বকায়, চশমা-চক্ষু, পাণ্ডুবর্ণ অকালবৃদ্ধে পূর্ণ হইতেছে।—একে আর্থিক অবস্থা—জাতির দেহপুষ্টি দূরে থাকুক—জীবন-রক্ষারই প্রতিকূল। তাহার উপর শারীরধর্ম্মপালনে সাধারণের শোচনীয় বিতৃষ্ণা। কথায় বলে, 'চাচা, আপনা বাঁচা।' কিন্তু আমরা বাঁচিবারও চেষ্টা করি না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত যদি কেহ বাঁচিবার উপদেশ দেন, আমাদের সাহিত্যের 'বিজ্ঞ বৃদ্ধ সনাতন' ও অকালপক্কগণ তাঁহাকে উপহাস করেন। যে দেশে মানব-পরমায়ু 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' নীতির অনুসারী, সে দেশে কাহার জন্য বিশ্বসাহিত্যের হাহাকার ও হোমরুলের হা হুতাশ, তাহা সত্যই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

প্রথমে সত্যের অভিজ্ঞান আবশ্যক, তাহার পর তাহার অনুসরণ সম্ভব। এই জন্য আমরা শারীরবিজ্ঞান ও শারীরধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সাহিত্যের পক্ষপাতী। 'স্বাস্থ্যপাঠ' এই পর্য্যায়ের সুরচিত গ্রন্থ। তাই বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

২২শে কার্ত্তিকের 'এডুকেশন গেজেটে'র সুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালার সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটী এই বিষয়ে পাঠ্যনির্ব্বাচনের সময় আর একখানি সুলিখিত পুস্তক দেখিতে পাইবেন।' আশা করি, এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হইবে না।

শারীরবিজ্ঞানের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় এত অল্প যে, বয়স্কেরাও এই পুস্তক পড়িলে উপকৃত হইবেন। অভিভাবকগণ পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে 'স্বাস্থ্যপাঠ' পড়িতে দিন;—পরিবারে, বংশে, এবং সমগ্র দেশে তাহার ফল ফলিবে। আমরা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

'যেখানেই ধূলা, বালি, পচা ও দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিষ ও আবর্জ্জনা থাকে, সেখানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কীটাণুর উৎপত্তি হয়। এই কীটাণুগুলি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে, ১০।১২ হাজার কীটাণু লইয়া এক একটা করিয়া এক লাইনে সাজাইলে মাত্র এক ইঞ্চ লম্বা একটী লাইন হইবে। এই কীটাণুগুলি হইতেই নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাতাস, ধূলা-বালির সহিত এই কীটাণুকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া আইসে। কতক তোমাদের খাদ্যে বা পানীয়ে বা বস্ত্রের উপরে আসিয়া পতিত হয়, কতক নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে তোমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই কীটাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে রোগ হয়। সকল কীটাণুই যে একপ্রকার, তাহা মনে করিও না। কোন কীটাণু পচা ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, কোন কীটাণু মাটীতে থাকে এবং কোন কোন কীটাণু পচা মাংস ভালবাসে। সকল কীটাণুই যে এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে; কোন কীটাণু কলেরা, কোন কীটাণু বসন্ত রোগ উৎপাদন করে। কলেরার কীটাণু বসন্তরোগ উৎপাদন করিতে পারে না এবং বসন্তরোগের কীটাণু কলেরা উৎপাদন করিতে পারে না। কীটাণুরা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, বায়ু-চলাচল শূন্য ও অপরিষ্কার স্থানে থাকিতে ভালবাসে এবং এই সকল স্থানে আসিয়া আরও কীটাণু প্রসব করে; ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কীটাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে উহা আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে। অনেক কীটাণু খাদ্য ও পানীয় জল বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে, যেমন কলেরার ও সান্নিপাতিক জ্বরের (typhoid ও enteric fever) কীটাণু। অনেক কীটাণু নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে; যথা—হাম, বসন্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগের কীটাণু। আরও একপ্রকারে কীটাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। শরীরের আবরণ চামড়া যদি কোন স্থানে একটু কাটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থান দিয়া মনুষ্যের শত্রু কীটাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। এই তিন প্রকারের মধ্যে কোনও এক প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কীটাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী হয়, এই দুইটী পুনরায় চারিটী হয়। এইরূপে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে

থাকে। ইহাদের সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি হয় যে, একটী কীটাণু হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে অনেক সময় ১,৬৮,০০,০০০ কীটাণুর জন্ম হইতে পারে। যখনই কীটাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করে, তখনই রোগের উৎপত্তি হয়।'

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ।—শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদের অঙ্কিত 'অলকে' নামক ছবিখানিতে 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র মুদ্রাদোষ নাই বলিলেও চলে। কেবল আঙুলে অল্প আভাস আছে। 'ক্রমে ফুলে মধু আসে।' চিত্রের 'বস্তু' ভারতীয় বটে; ভাবও ভারতীয়। ইহাতে ভারতের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টাও সফল হইয়াছে। রামেশ্বরপ্রসাদ সে সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া চিত্রিতার বুকের সৌন্দর্য্যও কাঁচুলীতে কষিয়া আঁটিয়া, ন্যাকড়ায় ঢাকা পাকা পেয়ারার মত ফুটাইয়া দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই! কিন্তু সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু, মস্তকে কলস, কণ্ঠে মতির বালা,—ছন্দ-বালা বুকের কাপড় সরাইয়া, অথবা সে সৌন্দর্য্য দেখাইয়া অলকে যায় না। ইহা রুচিবিরুদ্ধও বটে, অস্বাভাবিকও বটে। 'বার্হস্পত্য-সূত্রম্' একখানি প্রাচীন নীতি-গ্রন্থ। ওপার্ট তাঁহার পুঁথির তালিকায় একখানি বার্হস্পত্য-সূত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে পুঁথিখানি এখন নিরুদ্দেশ। ইংলণ্ডের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী'র সংগ্রহে একখানি ও মান্দ্রাজের গবর্মেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরিতে আর একখানি বার্হস্পত্য-সূত্রম আছে।—শ্রীঅক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় শেষোক্ত পুঁথিখানির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ ছাপিয়া দিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,—'কেবল সূত্র-রীতিতে রচিত রাজনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থের এই প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতের রাজনীতি যে বিশেষভাবে মৌলিক ও পুরাতন বিজ্ঞান, তাহা এই সূত্র-গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।'—এই বার্হস্পত্য সূত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ভারত-বর্ষের রাজনীতিক সম্প্রদায়সমূহের জন্য, বাঙ্গালার নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের জন্য, বিশেষতঃ শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবগতির জন্য আমরা বৃহস্পতির একটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

'জ্ঞাতিভির্ যত্র বৈরং তৎকুলক্ষয়মাবহতি নশ্যতি।'—১ম অধ্যায়; ১০৯ সূত্র।

'দেশকালযোগ্যং কর্ম্ম নয়াবয়ৌ চ বেদয়েৎ।'—৬ষ্ঠ অধ্যায়; ১ সূত্র।

'হিতানি নিরূপয়েৎ।'—৬ষ্ঠ অধ্যায়; ৩ সূত্র।

উভয়েরই একাদশে বৃহস্পতি; আশা করি, কেহ বৃহস্পতির উপদেশ উপেক্ষা করিবেন না। এ দেশের উত্তরপুরুষদিগকে—ছাত্র-সম্প্রদায়কে আর একটি সূত্রে অবহিত হইতে বলি,—

'জিতক্লেশস্য পৌরুষম্।'—৩য় অধ্যায়; ১ সূত্র।

'কুন্তলীন' আমাদের বহুদিনের বন্ধু। তাঁহারা বৃহস্পতির নিম্নলিখিত উপদেশ বিজ্ঞাপনে দিতে পারেন,—

'সুগন্ধবাসান্ কেশান্ কুর্য্যাৎ।'—৩য় অধ্যায়; ৫ সূত্র।

গঙ্গোপাধ্যায় বার্হস্পত্য-সূত্র বাঙ্গালীর গোচর করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন। শ্রীমোহিত-লাল মজুমদার 'নাদিরশাহের জাগরণে' সত্যেন্দ্রনাথের আধুনিক নব্য রচনা-রীতির অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক allusion আছে; 'দিল্লী হিরাট মেশেদ গজনী নিশাপুর পেশাবার' আছে। দুই এক স্থলে বিদ্যাবিলাসের মত রচনায় বৈচিত্র্যও আছে। দুই এক স্থলে মৌলিকতাও আছে।

'মানুষ মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল!'

'দুর্ব্বার তরবারে'ও মানুষ প্রথমে ভূ-তলেই গড়ায়, তার পর হয় স্বর্গে, নয় নরকে যায়, ইহাই জানা ছিল। হঠাৎ ভূ-তলের তলে 'রসাতলে' যাইবে কেন? সুতরাং ইহা মৌলিক। কয়েক স্থলে যতিভঙ্গ হইয়াছে।—বাঙ্গালা কবিতায় finishএর দিকে কবিদের দৃষ্টি থাকে না। দুই তিন পৃষ্ঠা রচনাতেও কাঁটা, খোঁচা, গলদের ছড়াছড়ি। কবিতায় 'প্রসাধন' নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' বটে, কিন্তু এ সকল বিষয়ে অবহিত না হইলে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও বোধ হয় 'কবি' হওয়া যায় না। 'নাদিরশাহের জাগরণে' ক্ষমতার পরিচয় আছে। কবি সাধনায় উদাসীন না হইলে সিদ্ধ হইতে পারেন। কলমের ডগায় যাহা যোগায়, তাহাই প্রতিভার দান নয়, এ কথা কবিকুলেরও স্মরণীয়। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' চতুর্থ প্রস্তাবে 'ভাদুলী ব্রতে'র ছবি আছে। লেখক কলমকে তুলীতে পরিণত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার ছবি আঁকিয়াছেন। শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় 'স্যাবাইন-রমণী' নাম দিয়া 'রোমক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইহা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য নাটিকা। প্রণেতার নাম নাই। গত বারেও আমরা নবীন সাহিত্যিক অজিতকুমারের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিয়াছি। তখন জানিতাম না, তিনি বাঙ্গালার নব-যুগের নূতন সাহিত্যকে দরিদ্র করিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। এ কালে যাঁহারা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া বিনামূল্যে দেশবাসীকে বিবিধ ধার-করা বিলাতী উপদেশ খয়রাৎ করিতেছেন, অজিত প্রথমে সেই শ্রেণীর অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই আপনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; এবং গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার শক্তিবলে সাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহাকে সাহিত্যের instinct বলে, তিনি সেই সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। আমরা তাঁহার অনেক মতের প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু সেই সকল মতের প্রতিষ্ঠায় তিনি যে চিন্তাশক্তির, বিশ্লেষণের ক্ষমতার ও অগাধ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পরিচয় দিতেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; আশান্বিত হইয়াছি। মতান্তরের ক্ষেত্রেও তাঁহার সাহিত্যশক্তিকে আমরা বাধ্য হইয়া ভক্তি করিয়াছি। এত অল্প বয়সে এমন শক্তিশালী সাহিত্যিকের তিরোধান দেশের ও সাহিত্যের পক্ষে সর্ব্বতো-ভাবে শোচনীয়। অজিতের সম্বন্ধে 'ভারতী' লিখিয়াছেন,—'একালের বাংলা-সাহিত্যে অল্প যে কয়েক জন লেখক সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান এক জন। সমালোচন-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা রাখেন, নবীন সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দেখাই যায় না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, এবং এই কঠিন কার্য্যে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণপণ আগ্রহ এবং অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এ দিকে তিনি ছিলেন একাকী; এবং সহস্র বিরুদ্ধ মতের মধ্যে এম্‌নি একাকী দাঁড়াইয়াই তিনি সমান অটলতা ও সফলতার সঙ্গে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া চলিতেছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করিতে পারেন, এমন লোক ত চোখে পড়িতেছে না। শুধু রসিক সমালোচক বলিয়া নয়—জীবন-চরিত-রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত তাঁহার অমর কীর্ত্তি। ইদানীং কিছুকাল ধরিয়া তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার যে সামান্য কিছু-কিছু নমুনা সাময়িক-পত্রাদিতে বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, অজিতকুমারের রামমোহন-চরিত সমাপ্ত হইলে, বাংলা ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত-রূপে সমাদর লাভ করিত। শুধু এ দেশের সাহিত্য নয়, বিদেশের সাহিত্য লইয়াও অজিতকুমার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সাধারণ পাঠকের চোখের সাম্‌নে সাহিত্যের খাঁটী রূপটি ফুটাইয়া দেখাইতে পারিতেন, এবং হৃদয়ের মধ্যে সাহিত্য-রস-গ্রাহিতার একটা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্ম্মের সহিত বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের পরিচয়-সাধন করিয়া দিবার জন্য তিনি যে সকল সুলিখিত প্রবন্ধ মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার রসগ্রাহিতা, বিচারক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি এই অল্পবয়সেই পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার উপার্জ্জিত জ্ঞানকে তিনি অকেজো রাখিয়া যান নাই। * * * মৃত্যুকালে অজিতকুমারের বয়স হইয়াছিল চৌত্রিশ বৎসর মাত্র। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে পরিপূর্ণতা লাভের অবকাশ দিল না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল, তাহা বলা বাহুল্য, এবং ভারতীর যে কি ক্ষতি হইয়াছে তা, শুধু আমরাই জানি।' 'ভারতী'র সহিত আমরাও বলি,—'ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।'

প্রবাসী। মাঘ।—শ্রীসত্যচরণ লাহার 'মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। লেখক মেঘদূতের সংস্কৃত বিশেষণগুলি 'আস্ত' ব্যবহার করিয়াছেন। 'বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বান্', 'হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা', 'কাদিম্বুস্তপ্রথমমুকুল' ও 'অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর' প্রভৃতি সাধারণ পাঠকের নিশ্চয়ই দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা 'দি'কে 'আজ্য' বলিতেন, এবং কদাচিৎ 'ঘৃতে' নামিতেন, তাঁহাদের রচনাতেও এমন 'আস্তাস্ত', সমস্ত সংস্কৃত পদের ব্যবহার দুর্লভ। 'প্রবাসী' পত্রে তথাকথিত 'পণ্ডিতী ভাষা'র প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অপণ্ডিতী 'চল্‌তী' ভাষার জয়লাপ দেখিতে পাই। আবার, বিমলাবাবুর প্রবন্ধে সংস্কৃতেরও বৃষ্টি দেখিতেছি। 'প্রবাসী' 'স্বর্ণলতা'র গদাধরচন্দ্রের মত ভুড়ও খান, টামাকও খান!—প্রবন্ধে গবেষণায় ও পরিশ্রমের পরিচয় আছে। তাঁহার ভাষার গতি 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরভিমুখে' না গিয়া ভবিষ্যতে এই মাটীর দুনিয়াতেই বিচরণ করিবে, ক্রমে হাত আসিবে, এ আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নহে। 'মানুষ

বাঁচে কিসে' টলষ্টয়-লিখিত উপাখ্যানের অনুবাদ—সুখপাঠ্য সৎসাহিত্য। ইহার ভাষা 'মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্বে'র ঠিক উন্টা। 'সে আরও নিকটে গিয়ে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেল।' শ্রীসত্যভূষণ সেন 'এভারেষ্ট ও গৌরীশঙ্করে' লিখিয়াছেন,—'এভারেষ্ট গৌরীশঙ্কর নয়—গৌরীশঙ্কর হিমালয়েরই অন্তর্গত একটি অপর পর্ব্বতশিখরের নাম।' সত্যবাবু বলেন,—'গোঁড়া সাহিত্যিকদের ভাষায় উহার (এভারেষ্টের) গৌরীশঙ্কর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ঠিক নয়।'—তথাস্তু। কিন্তু গোঁড়া ও পাতি, কাঁচা ও ডাবক, সব লেবুরই এ ক্ষেত্রে এক গতি। সত্যবাবু আজ যাহার পরিচয় দিলেন, তাহার বিপরীত যাঁহাদের জানা ছিল, গোঁড়া-পাতি-নির্ব্বিশেষে এত দিন তাহাই চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং 'গোঁড়া'র 'গোস্তাকী' ক্ষমার্হ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'কাফ্রি কবিতা'র অনুবাদ করিয়াছেন। কাফ্রি কবি ওয়েলডন জনসন কোন ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন, এবং সত্যেন্দ্রনাথ কোন ভাষা হইতে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে তাঁহার ভাষায় আফ্রিকার সকল ভাষার অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালা ভিন্ন আর সকল দেশের পক্ষেই তাহা সমান উপযোগী, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। বাস্তবিক, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য না থাকুক, ভাষায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিশ্বের ও বিশ্ব-সাহিত্যের হিংসার বস্তু, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।—সুকুমারী কবিতা পর্য্যন্ত তাহার ধাক্কায় 'কুপো-কাৎ'। 'যম-যাতনার জবর জাঁতা মগজ জুড়ে ঘুরতে রবে!' শুধু 'চলতী' ভাষা নয়, ভাষার জাঁতায় কবিতাও 'একেবারে' ছাতু 'হয়ে গেছে।' বোধ হয়, স্বাধীনতা-বঞ্চিত নব-জাগ্রত বাঙ্গালী দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছে। 'আলোচনা'য় নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে। 'দেশের কথা'র প্রারম্ভে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—'দেশের যে কাগজ খুলি, তাহাতেই দুঃখের কাহিনী, নিরাশার বেদনা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।' চারুবাবু বলেন,—'দুঃখের আঘাত উত্তরোত্তর প্রবল করিয়া এই আত্মবিস্মৃত অচেতন জড় জাতিকে উদ্বোধিত করা * * * ভগবানের ইচ্ছা, আমরা বুঝিতে পারিতেছি।' শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় 'বাঁধনা পরবে' ছোটনাগপুরের একটি পরবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র দুইটি প্রবন্ধে 'চীনা-বাদামে'র চাষে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'বাহিরের ডাক শুনিয়া' তাঁহারই ভাষায় বলা যায়,—'ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে এখন ছেড়ে দে!' কেবল শেষে যোগ করিয়া দাও,—'কেঁদে বাঁচি।' শেষটুকু যদিও গদ্য, কিন্তু যতীন্দ্রবাবুর পদ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল, অতএব মার্জ্জনীয়। 'চ'-লিখিত 'ব্যাঙের জীবনচরিত' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'উর্দ্দু' সারগর্ভ প্রবন্ধ। লেখক উর্দ্দুর উৎপত্তির ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'এখন রেল ও ছাপাখানার সাহায্যে উর্দ্দুর কেন্দ্র ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ ছড়াইয়া উর্দ্দুর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। ভাষার উন্নতির সহিত বিষয়েরও (subject) বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ভারতব্যাপী উর্দ্দুশিক্ষিত সম্প্রদায় এখন ভাষার উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালার সহিত উর্দ্দুর তুলনা করিলে বোধ হয় বাঙ্গালা এখনও অগ্রসর, কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই বাঙ্গালাকে পিছাইয়া পড়িতে হইবে। বাঙ্গালার মত উপন্যাস, গুপ্ত-

কথা, টিকটিকি-রহস্য সম্বন্ধে পুস্তক না থাকিলেও, অন্য ভাষায় চিন্তা করিবার মত বিষয়ের ভাল ভাল পুস্তকের যত অনুবাদ উর্দ্দুতে হইতেছে, বাঙ্গালায় তত হইতেছে না। আবার ওস্মানিয়া ইউনিভার্সিটির গ্রন্থমালা প্রস্তুত হইলে বাঙ্গালা অনেক পিছাইয়া পড়িবে। বঙ্গ-দেশের সাহিত্য-পরিষদের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আপন স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা না করিলে আর প্রাধান্য ত থাকিবেই না, সমকক্ষতাও থাকিবে কি না সন্দেহ। উর্দ্দু ভাষার উৎকর্ষের সভার (অঞ্জুমন্‌-তরক্কি উর্দ্দু) কেন্দ্র আজকাল দক্ষিণের হায়দ্রাবাদে ও সভার পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং হায়দ্রাবাদাধিপতি নিজাম—নবাব উস্‌মান আলির্খা বাহাদুর। এই বিদ্যোৎসাহী নরপতি উর্দ্দু ভাষার একজন কবি, কিন্তু এখনও তিনি আপন কবিতামালা প্রকাশ করেন নাই বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে কবি বলিয়া জানে না। তিনি সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে ওস্মানিয়া ইউনিভার্সিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই উর্দ্দু ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। আরবি, পার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা কেবল সাহিত্যরূপে পড়ান হইবে। তবে উর্দ্দু-ভাষায় এখনও উপযুক্ত পুস্তকাদি নাই, সেই জন্য প্রথমে ভাল ভাল ইংরেজি ও অরবি পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অনুবাদ করিবার জন্য ভারতের বাছা বাছা বিদ্বান ও সাহিত্যসেবী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাও প্রচার করা হইয়াছে যে, ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্যপুস্তক করিবার উপযুক্ত পুস্তক কেহ রচনা বা অনুবাদ করিতে পারিলে নিজাম গবর্ণেমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন।' শ্রীযুত বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় নিজাম নাই। বিন্দু-সঞ্চয়ে সিন্ধুর সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যে শক্তি ও যে সাধনার বলে, নালন্দা, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভব হইয়াছিল, আমরা কি আবার সেই শক্তির উদ্বোধন ও সেই সাধনার প্রবর্তন করিতে পারিব না?

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চিত্রবিদ্যা।

১

আর্য্য সাহিত্যে চিত্রবিদ্যার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। উহা কলাবিদ্যার অন্তর্গত। দৃশ্যকাব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, নাটকাদিতে পর্ব্বত, বন, জলাশয়, পথ, গৃহ প্রভৃতির আকৃতি চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শ্রব্যকাব্যেও উহার উল্লেখ আছে। অনেক কাব্যেই চিত্রের প্রসঙ্গ আছে। দর্শনশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও উপাসনা-গ্রন্থেও উহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বেদান্তের পঞ্চদশী গ্রন্থের একটী পরিচ্ছেদ 'চিত্রদীপ' নামে অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের স্থানান্তরেও চিত্রের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, আশ্রয় ব্যতীত যেমন চিত্রের অবস্থান হয় না, তেমনই সাকার উপাসনায় চিত্র একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিচিত। কারণ, উহা পূজার অন্যতম আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কিরূপ রীতি অবলম্বন করিয়া চিত্রকরগণ চিত্রণ সম্পন্ন করিতেন, অর্থাৎ, যাহা দেখিতেন, স্বকীয় রুচি অনুসারে প্রতিভাবলে তাহাই অঙ্কিত করিতেন, অথবা কোনও সূত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চিত্র করিতেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার পরিচয় দিব।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটী আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, নারায়ণ মুনি এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক। উক্ত মুনি কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার তপে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য দিব্যাঙ্গনাগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার হাব ভাব প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু মুনি তাহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না; তিনি পৃথিবীতে আম্র-রসের দ্বারা অসামান্য রূপবতী রমণীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন; যোগবলে তাহাতেই জীবনসঞ্চার করিলেন। তখন দিব্যাঙ্গনারা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। উক্ত মূর্ত্তি 'উর্ব্বী'তে অর্থাৎ পৃথিবীতে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া, 'উর্ব্বশী' নামে অভিহিত হইল।

মহামুনি নারায়ণ এই প্রকারে লক্ষণযুক্ত চিত্র নির্ম্মিত করিয়া ঐ 'চিত্র-সূত্র' বিশ্বকর্ম্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেদপ্রসিদ্ধ রাজা পুরোরবা উর্ব্বশীর

প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সুপ্রসিদ্ধ কুরুকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে, অতি সুপ্রাচীন কালেই চিত্র-সূত্র হিন্দুশাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি হইতে জানা যায় যে, চিত্র-বিদ্যার আদিম গ্রন্থ 'চিত্র-সূত্র' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চিত্রসূত্রং তবানঘ।' চিত্র-সূত্রের উপ-সংহারে মার্কণ্ডেয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলার মধ্যে চিত্রই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফলের প্রদায়ক; উহা যে গৃহে স্থাপিত হয়, সেখানে মঙ্গলবিধান করে। (১)

চিত্রসূত্রাধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায়ে নৃত্যতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। চিত্রের সহিত নৃত্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, নৃত্যের ন্যায় চিত্রেও ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং মহানৃত্যে যেরূপ দৃষ্টি, ভাব, অঙ্গোপাঙ্গ ও হস্তের নির্দ্দেশ হইয়াছে, চিত্রেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নৃত্য 'পরম চিত্র' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং নৃত্যে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই এখন বলিব, তুমি শ্রবণ কর।

ইহার পরেই কথিত হইয়াছে যে, হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক, পুরুষ এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা সকলেই দৈর্ঘ্যে ও আয়ামে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত; অর্থাৎ, যে পরিমাণ কথিত হইবে, ইহাদের দেহে তাহার বিপর্য্যয় হইবে না।

হংসের দৈর্ঘ্য স্বকীয় অঙ্গুল প্রমাণে এক শত আট অঙ্গুল। ভদ্রের পরিমাণ এক শত ছয় অঙ্গুল। মালব্যের পরিমাণ এক শত চারি অঙ্গুল। রুচকের পরিমাণ এক শত অঙ্গুল, এবং শশকের পরিমাণ নব্বই অঙ্গুল। (২)

---

(১) কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
মঙ্গল্যং প্রথমং বৈতদ্‌গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।—৩য় খণ্ড। ৪৩ অ। ৩৮

(২) যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টয়শ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
করাশ্চ যে মহানৃত্যে পূর্ব্বোক্তা নৃপসত্তম।
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্যং চিত্রং পরং স্মৃতম্॥
নৃত্যপ্রমাণং যেনোক্তং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যতঃ শৃণু।
হংসো ভদ্রোহথ মালব্যো রুচকঃ শশকস্তথা॥

বলা আবশ্যক যে, এই স্থলে যে পরিমাণ কথিত হইয়াছে, বৃহৎসংহিতায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎসংহিতার 'পঞ্চমনুষ্যবিভাগ' নামক প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, হংস-সংজ্ঞক পুরুষের 'ব্যামায়' অর্থাৎ, প্রসারিত ভুজদ্বয়ের পরিমাণ ও উচ্চতা 'ষড়নবত্যঙ্গুল' (ছিয়ানব্বই) হইয়া থাকে। শশক, রুচক, ভদ্র ও মালব্য, ইহাদের পরিমাণ হংসের পরিমাণ অপেক্ষা ক্রমে তিন অঙ্গুল অধিক। সুতরাং শশকের পরিমাণ নিরনব্বই, রুচকের এক শত দুই, ভদ্রের এক শত পাঁচ ও মালব্যের পরিমাণ এক শত আট অঙ্গুল। এই স্থলে টীকাকার ভট্টোৎপল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কথিত পরিমাণ পরবর্ত্তী গ্রন্থের বিরুদ্ধ। (১)

আরও একটী বিষয়ে বরাহমিহিরের সহিত অনৈক্য আছে। মার্কণ্ডেয় পরিমেয় মানবের স্বকীয় প্রমাণানুসারে অঙ্গুল-মান-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাহমিহির পারিভাষিক মান-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। প্রতিমা-নির্ম্মাণ-পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে, গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যরশ্মিতে ধূলির মত যে সূক্ষ্মতর পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পরমাণু। পরিমাণ বিষয়ে ইহাই প্রথম। পরমাণু রজ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূক, যব ও অঙ্গুল, যথোত্তর অষ্ট গুণানুসারে এই পরিমাণ বুঝিতে হইবে। (২) অর্থাৎ, অষ্ট পরমাণুতে এক রজ, অষ্ট রজে এক বালাগ্র, অষ্ট বালাগ্রে এক লিক্ষা, অষ্ট লিক্ষাতে এক যূক, অষ্ট যূকে এক যব, ও অষ্ট যবে এক অঙ্গুল হয়। (৩)

বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাঃ পঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
উচ্ছ্রায়ায়ামতুল্যাস্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়াঃ প্রমাণতঃ।
যেনৈবাঙ্গুলমানেন শতমষ্টাধিকং ভবেৎ।
প্রমাণং নৃপ হংসস্য ভদ্রস্য তু ষড়ুত্তরম্॥
চতুর্ভিরধিকং জ্ঞেয়ং মালব্যস্য তথা নৃপ।
শতঞ্চ রুচকস্যোক্তং দশোনং শশকস্য চ॥

(১) ষণ্ণবতি রঙ্গুলানাং ব্যায়ামো দীর্ঘতা চ হংসস্য।
শশ-রুচক-ভদ্র-মালব্য-সংজ্ঞিতাস্ত্র্যঙ্গুলবিবৃদ্ধ্যা॥—৬৮ অ। ৭
এতদুত্তরত্র বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন বিরুধ্যতে।

(২) জালান্তরগে ভানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিন্দ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধি প্রমাণানাম্॥—৫৭ অ। বৃ সং।
পরমাণুরজো বালাগ্রলিক্ষযূকং যবোঽঙ্গুলং চেতি।
অষ্টগুণানি যথোত্তর মঙ্গুলমেকং ভবতি সংখ্যা॥—১—২।

(৩) তত্র দ্বাদশাঙ্গুলপরিণাহো মূর্দ্ধা।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। তৃতীয় খণ্ড। ৩২ অ

যদিও বরাহমিহির প্রতিমা-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে এই মান-সূত্র বলিয়াছেন, তথাপি চিত্র প্রভৃতিতেও উক্ত সূত্র ব্যবহার্য্য। কারণ, পরিমাণ বিষয়ে প্রতিমা ও চিত্র, এতদুভয়ের একরূপতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়-কথিত চিত্র-সূত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ যেরূপ, বরাহমিহিরের প্রতিমা-পরিমাণ-নির্দ্দেশেও তাহা প্রায় সেইরূপ। কেবল কোনও কোনও স্থলে সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়।

চিত্রের সহিত প্রতিমার কোথায় প্রভেদ হইবে, বরাহমিহির প্রতিমা লক্ষণে তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। প্রতিমা-মস্তকের পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুল, বিষ্কম্ভ হইতে আয়াম চতুর্দ্দশ অঙ্গুল হইবে। কিন্তু চিত্রকর্ম্মে দ্বাদশাঙ্গুলমাত্র দৃশ্য হইবে; অবশিষ্ট বিংশতি অঙ্গুল অদৃশ্য থাকিবে। মার্কণ্ডেয় চিত্রসূত্রে বলিয়াছেন যে, মস্তকের পরিণাহ দ্বাদশাঙ্গুল হইবে।

এই সকল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর যথেচ্ছাচারের অবসর ছিল না। শাস্ত্রীয় সূত্র ধরিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। বিশেষতঃ, হিন্দুদিগের সমস্ত বিষয়েই অদৃষ্টবাদ জড়িত। সুতরাং পরিমাণাদির ব্যতিক্রমে চিত্র-স্থাপয়িতার চরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী। চিত্রের গুণ-দোষ-কথন-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা পরে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

চিত্র সাধারণতঃ পটে ও ভিত্তিতে অঙ্কিত হইত। উভয় চিত্রের আধার-গত পার্থক্য থাকিলেও, উপাদান প্রায়ই একরূপ। রেখাই চিত্রের প্রধান অঙ্গ। কারণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিমাণ ও সংস্থানের অভিব্যক্তি প্রথমতঃ কেবল রেখাপাতের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণান্তরের অভাবেও কেবল অঙ্কন-ক্রিয়ার দ্বারাই মনুষ্যাদির আকৃতি বিন্যস্ত হইতে পারে। পঞ্চদশীর চিত্রদীপ প্রকরণে চিত্রের চারিটী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমা-বস্থা, ধৌত; দ্বিতীয়, ঘট্টিত; তৃতীয়, লাঞ্ছিত; এবং চতুর্থ, রঞ্জিত। পট-চিত্রের আধার বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থা, ধৌত। উহাতে অন্নবিলেপন, অর্থাৎ অন্নমণ্ডের দ্বারা প্রলেপ-দান, ঘট্টিত। তাহাতে মসী, অর্থাৎ, কালীর দ্বারা আকার-সম্পাদন, অর্থাৎ, পরিমাণসূত্রানুসারে কালীর রেখাপাতের দ্বারা লেখনীয় বিষয়ের আকৃতিবিন্যাস, লাঞ্ছিত; এবং স্থানানুসারে উপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসের নাম, রঞ্জিত। (১) স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্টান্তস্থলে চিত্র-রচনার যে পদ্ধতি

(১) যথা চিত্রপটে দৃষ্ট মবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥ ১

কথিত হইয়াছে, তাহাতেও পঞ্চদশী-কথিত ক্রমেরই আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, চিত্রকর্ম্ম যেমন অনেক অঙ্গের দ্বারা ক্রমে উন্মীলিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যও তেমনই বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। নৈষধচরিতে দময়ন্তীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, হংস নখের আঁচড়ের দ্বারাই নলের আকৃতি দময়ন্তীকে দেখাইয়াছিল। সাহিত্যে এই শ্রেণীর অনেক উদাহরণ আছে। (১)

মার্কণ্ডেয়-কথিত চিত্রসূত্রেও চিত্র-নির্ম্মাণের উপযোগী কুড্য-সম্পাদনের পর, তাহাতে শ্বেত প্রভৃতি বর্ত্তিকার দ্বারা (তুলিকার দ্বারা) প্রমাণে চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্থাপনের পর, তাহাতে উপযুক্ত স্থানে সেই সেই বর্ণের বিন্যাস করিবার উপদেশ আছে। (২) বোধ হয়, অত্রত্য 'প্রমাণ' শব্দে চিত্রের পরিমাপক রেখাবিন্যাস অভিপ্রেত হইয়াছে।

চিত্রের স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য কুড্যে যে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মশলার সংমিশ্রণের উপদেশ দেখা যায়। যথা,—তিন প্রকার ইষ্টকচূর্ণ, সাধারণ মৃত্তিকা তিন ভাগ, গুগ্‌গুল, মোম, মধুক (রঙ্গ অথবা যষ্টিমধু) মুরুক (মুরক) মুরা নামক প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, গুড়, কুসুম্ভ ও তৈল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তিন ভাগ অগ্নিদগ্ধ সুধার (চূণ) সহিত চূর্ণাকারে মিশ্রিত করিবে।

অনন্তর ইহাতে দুই ভাগ অপক্ব বিল্বচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (মষকং কষং বুঝা গেল না) উপযুক্তপরিমাণ বালুকা দিবে। তাহার পর পিচ্ছিল বল্কল-জলের দ্বারা সমস্ত ভিজাইবে। এই উপাদান এক মাসে প্রলেপের উপযুক্ত হয়। অনন্তর এই পদার্থের দ্বারা প্রাচীর প্রভৃতিতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। এই প্রকারে ও আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করিয়া, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করিলে, শত বৎসরেও চিত্রের অন্যথা হয় না। (৩)

যথা ধৌতো যন্ত্রিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ। ২
স্বতঃশুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ যন্ত্রিতোঽন্নবিলেপনাৎ
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ।—৬।৩।

(১) চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈ রঙ্গৈ রুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈ র্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।

(২) শ্বেত-তাম্র-কৃষ্ণাভির্বর্ত্তিকাভি র্যথাক্রমম্॥
আলিখ্য স্থাপয়ে দ্বিদ্বান্ প্রমাণে স্থানকে তথা।
ততস্তু রঙ্গয়েদ্রঙ্গৈ র্যথাস্থানানুরূপতঃ॥

(৩) অপি বর্ষশতস্যান্তে ন প্রনশ্যেত্ কর্হিচিৎ।—৪০।৯।

সাহিত্যে চিত্রের যে চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সূত্রকর্ত্তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, কবি এ বিষয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

কালিদাস চিত্রস্থ নায়িকার আলাপকারিত্বের উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন; সূত্রকার এতদপেক্ষাও কঠিনতর ভাববিন্যাস চিত্রের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যিনি নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনাযুক্ত ভাব, মৃতদেহের সংজ্ঞাশূন্যতা ও নিম্নোন্নত ভাব ফলাইতে পারেন, তিনিই চিত্রশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত। যিনি জলের তরঙ্গ, অগ্নির শিখা, ধূম, পতাকাযুক্ত আকাশ প্রভৃতি বায়ুর গতির সহিত অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই চিত্রবিৎ। সুতরাং চিত্রজ্ঞকে এমন ভাবে তুলিকা-পরিচালনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার চিত্র দেখিয়া লোকে যেন সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে, বায়ুবেগে অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিতেছে; বায়ু ধূমরাশিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে; বায়ুর মৃদুমন্দ বেগে জলে তরঙ্গ উঠিয়াছে; এবং আকাশে পতাকা দুলিতেছে। (১)

কাব্যে যেমন নবরসের বিন্যাস হইয়া থাকে, চিত্রেও তেমনই শৃঙ্গারাদি রসপ্রকটনের উপদেশ আছে। (২)

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

রায় পরিবার।

৩

গৌরীর জন্য বহু পাত্রের সন্ধান মিলিতে লাগিল। একে সে অসামান্যা সুন্দরী, তাহার পর বিধাত্রী দেবী কিছু না বলিলেও সকলে জানিত, তিনি প্রচুর যৌতুক দিবেন। গৌরীর মার কথায় সে কথা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অনেক সম্বন্ধের কথায় তিনি বলিতেন, 'ও সব হেঁজি পেঁজি সম্বন্ধ আন কেন?

---

(১) তরঙ্গাগ্নি শিখা ধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্।
বায়ুগত্যা লিখেদ্‌যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥

(২) শৃঙ্গারহাস্যকরুণবীররৌদ্রভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতাঃ।

আমি চাহি, সেরা সম্বন্ধ।' ঘটক-ঘটকীর মুখে সে কথা শাখাপল্লবিত হইয়া পাত্রের অভিভাবককে কল্পতরু-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জানাইয়া দিত। কিন্তু বিধাত্রী দেবীর বাছাইও তেমনই। জহরী যেমন করিয়া জহর পরীক্ষা করে, যে নদীর বালুর সঙ্গে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়, সন্ধানকারীরা যেমন করিয়া সে নদীর বালুকণা পরীক্ষা করে, তিনি তেমনই করিয়া সম্বন্ধ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার উপর তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যাহারা টাকার কথা, পাওনার কথা উত্থাপিত করিবে, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিবেন না। তিনি বলিতেন, 'আমরা কন্যা দান করিব—ছেলে কিনিব না। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বেণের ঘরে কাজ করিতে পারিব না।' তাঁহার বাছাইয়ের কঠোরতায় ঘটক-ঘটকীরা বিরক্ত হইতে লাগিল। এক এক জন প্রগল্ভা ঘটকী মুখের উপর বলিতে লাগিল, 'তাই বল, মা, তোমার এখন নাতিনীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই।' বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিতেন, 'ইচ্ছা থাকুক আর না-ই থাকুক, এ সামগ্রী ঘরে রাখিবার নহে। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমার সোনার কমল কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিতে পারিব না।' অনেক ধনীর ঘরের সম্বন্ধ তাঁহার পছন্দ হইল না। পুত্রবধূর পিত্রালয়ের সকলে বিরক্ত হইয়া গৌরীর মাকে বলিলেন, 'না—বাছা, আমরা আর ইহার মধ্যে নাই। তোমার শাশুড়ীর বুঝ যে কি, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যেমন বুঝেন, তেমন আর কেহ বুঝে না।' পুত্রবধূ বিরক্তি গোপন করা দুঃসাধ্য, ক্রমে অনাবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। বিধাত্রী দেবী সে সব গ্রাহ্যই করিলেন না।

বহু সম্বন্ধের প্রস্তাব ত্যাগ করিবার পর একটী প্রস্তাবে বিধাত্রী দেবীর একটু আগ্রহ লক্ষিত হইল। পাত্ররা দুই ভাই, এক ভগিনী; ভগিনী জ্যেষ্ঠা, পাত্র সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ভগিনীপতি হাইকোর্টের উকীল, ওকালতীতে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এটর্নী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—আর এক বৎসর অবশিষ্ট আছে। পাত্র ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছে, এখনও ফল বাহির হয় নাই। ছেলে দুইটী 'হীরার টুকরা'; বিশেষ, পাত্র; সে সব পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংসারে কেবল মা। স্বামী ডাক্তার ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যশের মন্দিরের সোপানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই বিধবা পুত্রদ্বয়কে 'মানুষ করিয়াছেন'। গৌরীর মা ঘটকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলে দেখিতে কেমন?' ঘটকী বলিল, 'বাছা—ছেলে কার্ত্তিক; তবে বর্ণ তোমার মেয়ের বর্ণের মত অত সুন্দর

নহে।' গৌরীর মা বলিলেন, 'কেন—আমি ত বলিয়াই দিয়াছি, আমি সেরা সম্বন্ধ চাহি।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'পুরুষের রূপ বিদ্যায়, তবে কুরূপ না হয়।' ঘটকী বলিল, 'সে ত মা, তোমরা দেখিয়াই লইবে। ঘটকীর কথায় ত আর কাজ করিবে না।' গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পয়সায় কেমন?' ঘটকী কবুল জবাব দিল, 'সে, ছেলের মা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে—আমার থাকিবার মধ্যে দুই ছেলে, আর মাথা গুঁজিবার বাড়ীটুকু। ছেলেরা বিবাহ করিতেই চাহে না; বলে—'গরীবের ঘরে কে মেয়ে দিবে?' আমি বলি, 'আমি গরীবের মেয়েই আনিব। কিন্তু আমি আর পারি না; বধূদের হাতে সংসার সঁপিয়া দুই দণ্ড ভগবানের নাম করিবার অবসর করিয়া দাও।' তাই অনেক বলায় ছেলেরা স্বীকার হইয়াছে। দুই ছেলের বিবাহ এক সঙ্গে হইবে—বড়র ঠিক হইয়াছে। সে মেয়ের বাপও বড়মানুষ; ঐ ছেলে দেখিয়া ঝুঁকিয়াছেন। এখন সব কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলাম। তোমরা যেমন ভাল বুঝিবে, তেমনই কাজ করিবে।'

গৌরীর মা বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, 'এই সম্বন্ধ!' ঘটকী বলিল, 'হাঁ, মা, এই সম্বন্ধ। আমরা ঘটক-ঘটকীরা একটু বাড়াইয়াই বলি। কিন্তু ছেলের মা আমাকে বলিয়া দিয়াছে—'ঘটক ঠাকরুণ, আমার যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া আমি লোককে ঠকাইতে পারিব না। আমি যেমন বলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনই বলিবে।'' বিশেষ, তোমাদের এ সম্বন্ধ, তাহারাও পছন্দ করিবে কি না, জানি না।' যাহার সম্বলের মধ্যে দুই ছেলে, আর একখানা বাড়ী, সে সম্বন্ধ পছন্দ করিবে কি না সন্দেহ! আহত অভিমানে গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন—আমাদের অপরাধ?' ঘটকী বলিল, 'অপরাধের কথা নহে, মা; তাহারা বলে, 'বড়মানুষে'র ঘরে কাজ করিব? সমানে সমানে নহিলে কুটুম্ব কুটুম্বিতায় সুখ হয় না। তা' বড়রও 'বড়মানুষে'র ঘরেই সম্বন্ধ পাকা হইল।'

বধূর ব্যবহারে বিধাত্রী দেবী একটু বিস্মিত হইলেন। মানুষ টাকার এত গর্ব্ব করে কেন? বিশেষ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৌমা টাকাকেই এত বড় করেন কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন, 'টাকার কথা তুলিতে নাই। কথায় বলে, 'স্ত্রীভাগ্যে ধন।' আমার দিদিমণির কপালে টাকার অভাব হইবে না। পুরুষ মানুষের টাকা উপার্জ্জন করিতে কতক্ষণ? মানুষ টাকা করে—টাকা কখনও মানুষ করিতে পারে না। সম্বন্ধের কাগজ

আনিয়াছ কি?' 'এই যে, বাছা'—বলিয়া ঘটকী অঞ্চলে বদ্ধ 'কমলাকান্তের দপ্তর' হইতে তিনখানা কাগজ লইয়া বলিল, 'দেখ মা, কোনখানা।' গৌরীর মা প্রথমখানার নাম পড়িতেই ঘটকী বলিল, 'ওখানা নহে—ও বৈদ্যদের।' তিনি দ্বিতীয়খানা লইয়া পড়িলেন—'পাত্রের নাম—শ্রীমান সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; পাত্র এম্ এ. পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান—' ঘটকী বলিল, 'হাঁ—ঐখানা।' বিধাত্রী দেবী এক জন দাসীকে সেখানা দিয়া বলিলেন, 'এইখানা সরকার মহাশয়কে দিয়া নকল করাইয়া আন।' পুত্রবধূ এ সম্বন্ধে শাশুড়ীর মত দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না—এখনও সময় আছে।

ঘটকী চলিয়া যাইবার পর বিধাত্রী দেবী এক জন চাকরকে বলিলেন, 'দেখিয়া আয়, দেওয়ানজী মহাশয় একবার আসিতে পারেন কি না।' ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দেওয়ানজী আসিয়াছেন। দেওয়ানজী বৃদ্ধ হইয়াছেন—আর কাজ করিতে পারেন না; কিন্তু বিধাত্রী দেবী তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে দেন নাই। তিনি অনেক সময় আপনার বাড়ীতেই থাকেন—পূর্ণ বেতন পায়েন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আনান হয়। কেবল যে কয় মাস বিধাত্রী দেবী কলিকাতায় থাকেন, সে কয় মাস দেওয়ানজীও কলিকাতায় থাকেন—শরীর ভাল থাকে, নিত্য গঙ্গাস্নানও হয়।

বিধাত্রী দেবীর আদেশে ভৃত্য সম্বন্ধের কাগজখানা দেওয়ানজীকে দিল। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'দিদিমণির জন্য এই একটা সম্বন্ধ আসিয়াছে, ইহার সন্ধান আপনাকেই লইতে হইবে।' ঘটকীর বর্ণিত সব বিবরণ তিনি দেওয়ানজীকে জানাইলেন। দেওয়ানজী পিরাণের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুষ্মান হইলেন, এবং কাগজের লেখা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'মা, বোধ হয় একটা ঠিকানা করিতে পারিব। পাত্রের ভগিনীপতিকে আমি জানি। সুন্দরগঞ্জের চরের মোকদ্দমায় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে ইনি আমাদের 'জুনিয়র' উকীল ছিলেন। আমি তাঁহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়াছিলাম—তিনি দাস বাবুকে আর ব্যারিষ্টার 'সাহেব'কে বুঝান। খুব ধারাল উকীল। বলেন ত তাঁহার কাছেই যাই।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'আমি স্ত্রীলোক—আমি কি ও সব জানি। যাহা করিতে হয়, আপনি করিবেন।' 'আচ্ছা মা, তাহাই হইবে। ক্ষেত্রনাথকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।' বলিয়া দেওয়ানজী বিদায় লইলেন। ক্ষেত্রনাথই এখন দেওয়ানের কাজ করেন;

তিনি দেওয়ানজীর অধীনে কাজ করিয়া কাজ শিখিয়াছেন, তাঁহারই 'হাতে গড়া।'

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বিধাত্রী দেবী সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিলে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দেওয়ানজী মহাশয় একবার দেখা করিবেন। তিনি 'সন্ধ্যা' সারিয়া আসিবেন।

দেওয়ানজী আসিয়া বলিলেন, 'মার অদৃষ্টে ছয় আনা কাজ হাসিল করিয়া আসিয়াছি।' বিধাত্রী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, উকীল বাবুর বাড়ীতে তিনি পাত্রটিকেও দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আলাপও করিয়াছেন। বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলে দেখিতে কেমন?' দেওয়ানজী বলিলেন, 'ছোট মাঠাকুরাণীর উপযুক্ত, রূপে শতে এক—গুণে হাজারে এক।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে শুনিয়াছি, বর্ণ আমার দিদিমণির বর্ণের সমান নহে।' দেওয়ানজী বলিলেন, 'আমার বুড়া মানুষের চোখ, অত সূক্ষ্ম প্রভেদ আর বুঝিতে পারি না, তত টা ঠাহর হয় না। তবে বোধ হয়, মার আমার বর্ণ দুধের ফেনায় গোলাপের আভা, পাত্রের বর্ণ সোনার আভা। তবে পুরুষ মানুষের বর্ণ যতই কেন পরিষ্কার হউক না—মার মত ঘরের মেয়ের বর্ণের মত থাকে না।' বিধাত্রী দেবী দেওয়ানজীর প্রথম কথায় মনে মনে একটু হাসিলেন—বুড়ার দৃষ্টিতে অতিরিক্ত প্রত্যয় না থাকিলে তিনি তাহার উপর নির্ভর করিতেন না, বুড়ার ঠাহরের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। দেওয়ানজী কর্ত্তার আদেশে বর্ষাধিককাল মেয়ে বাছাই করিয়া পুত্রবধূর নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—আর সব সন্ধান লইয়া তিনি তখনই বলিতেছিলেন—'কিন্তু গোলাপেও কাঁটা থাকে, তবে মানুষের প্রকৃতি শিক্ষার বশ।'

বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলের কথা কি বলেন?' দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, 'মনে হইল 'মানুষ' হইবে।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'তবে সব সন্ধান লউন।'

দেওয়ানজী সন্ধান লইয়া সম্বন্ধ পছন্দ করিলেন। কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'গৌরীর বিবাহ তিনি নিজে ঘর-সংসার না দেখিয়া দিতে পারিবেন না।' দেওয়ানজী তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া গৌরীর ভাবী ঘর দেখিতে গেলেন। সম্বন্ধটা যে তাঁহার মনের মত হয় নাই, সেটা আর একবার

জানাইয়া দিবার জন্য গৌরীর মা বলিলেন, 'তা মা, আপনি দেখিয়াই যাহা হয় করুন।' কিন্তু শাশুড়ীর কথা ও আপনার কৌতূহল তিনি এড়াইতে পারিলেন না।

বিধাত্রী দেবী পাকা গৃহিণীর মত বাড়ীর সাজসজ্জা হইতে পাত্রের মাতার কথাবার্ত্তা সব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল—তিনি গৌরীর উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছেন। পাত্রের মাতা বলিলেন, 'মা, আপনি সব দেখিলেন। ধনীর মেয়ে ঘরে আনিতে আমার যেমন সঙ্কোচ হয়—গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে আপনারও অবশ্য তেমনই সঙ্কোচ হইবে। আমি অনেক ভাবিয়া, মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তবে সাহস পাইয়াছি। আমি কোনও কথা গোপন করিতে চাহি না। আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যে হয় উত্তর দিবেন।'

পাত্রের মাতার এই স্পষ্টোক্তি বিধাত্রী দেবীর বড় মিষ্ট বোধ হইল। গৌরীর মা কিন্তু মনে করিলেন, অতটা বিনয় কেবল তাঁহার শাশুড়ীর মন ভুলাইবার জন্য। বড়মানুষের ঘরে কাজ করিতে সঙ্কোচ! বলে, 'মেধা! খাবি?—না, হাত ধুয়ে বসে আছি।'

ইহার পর বিবাহের আয়োজনের পর্ব্ব পড়িল। কলিকাতায় বিবাহ হইবে, কিন্তু উৎসবের আনন্দ হইতে বিধাত্রী দেবী গ্রামের লোককে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। সুতরাং বিবাহের পর তিনি নাতিনী নাতজামাই লইয়া গ্রামে যাইবেন; উৎসব তথায় হইবে; দেওয়ানজী দপ্তর হইতে পুরাতন ফর্দ্দ বাহির করিয়া তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; গহনার ফর্দ্দের বিচার হইতে লাগিল; কাপড়ের নমুনা দেখা চলিতে লাগিল, ইত্যাদি।

যখন আশীর্ব্বাদের দিন দেখিবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরকে বলা হইল, তখন এক দিন বধূঠাকুরাণী তাঁহার খাস দাসীকে বলিলেন, 'আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই। ছেলের মা, গৃহিণীকে 'গুণ' করিয়াছে, পাশকরা ছেলে এখন গড়াগড়ি যায়—পয়সা নহিলে কিছুই হয় না। ঐ রমার মাষ্টারও ত এম্. এ. পাশ করা।' সেই দিন দাসী দেওয়ানজী মহাশয়কে জানাইল, 'বধূঠাকুরাণী বলিলেন, আপনি রমাগৌরীর মঙ্গলই দেখেন। গৌরীর এ সম্বন্ধ কি মনের মত হইল?' দেওয়ানজী কথাটা শুনিয়া বিচলিত ও ব্যথিত হইলেন। পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁহার মতভেদের কথা বিধাত্রী দেবী এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন (তিনি মনে করিতেন, মাতে মেয়েতে মতভেদ হইলে

তাহা আর কাহারও জানিবার নহে) যে, দেওয়ানজী মৃণাঙ্কেরও তাহার আভাস পায়েন নাই। আজ এই কথায় তিনি একটু শঙ্কিত হইলেন—তবে কি সংসারে অশান্তির বিষ প্রবেশ করিয়াছে? তিনি সেই দিনই বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব ব্যবস্থা ত স্থির হইল। কিন্তু একটা কথা—বধূঠাকুরাণী এ সম্বন্ধ সম্বন্ধে কি বলেন?' দেওয়ানজীর প্রশ্ন শুনিয়াই বিধাত্রী দেবী বুঝিলেন, কথাটা আর গোপন নাই। তিনি বলিলেন, 'বধূমাতা 'ছেলে মানুষ', তিনি যাহাই কেন বলুন না, আপনি কি বলেন—টাকা দেখিব, না মানুষ দেখিব? দাঁড়ি পাল্লার কোন্ দিক অধিক ভারী?' দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, 'আমরা গরীব লোক, আমাদের টাকার দিকটাই ভারী দেখিবার কথা. কিন্তু আমরাও মানুষকে টাকার উপর স্থান দিয়া থাকি; বিষয়বুদ্ধির পরিচয় তাহাতেই।' সে কথা শেষ হইল। কিন্তু দেওয়ানজীর মনে বেদনার অবশেষটুকু রহিয়া গেল। যে সংসারের সেবায় তিনি জীবন কাটাইয়াছেন—যাহার কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিতে পারেন, সে সংসারে কি শেষে অশান্তি প্রবেশ করিল? গৌরীর মার সম্বন্ধে তিনি বহু দিন পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মনে মনে দেবতাকে ডাকিলেন, 'মা, সর্ব্বমঙ্গলা—মঙ্গল কর।'

আশীর্ব্বাদের দিন সুশীলের পরীক্ষার ফল জানা গেল, সে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছে। বিধাত্রী দেবীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলিলেন, 'দিদিমণির আমার 'পয়' কেমন!'

আশীর্ব্বাদের সময় গৌরীর মাতুলরা আসিলেন, গৌরীর মার পিত্রালয়ের সম্পর্কে আরও অনেকে—তাহার মাসীরা, দিদিমা প্রভৃতি আসিলেন। সম্বন্ধ যে গৌরীর মাতার মনের মত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া তাঁহার এক জ্যেঠাইমা (তিনি সর্ব্বদাই গৌরীর মার মন রাখিতে চেষ্টা করিতেন; কারণ, 'দশ পুত্র সম কন্যা—যদি পাত্রবিশেষে পড়ে') তাঁহাকে বলিলেন, 'তা মা, তুমি কথা কহিলে না কেন? এ ত আর যে সে কথা নহে—মেয়ের বিবাহ।' গৌরীর মা উত্তর দিলেন, 'শাশুড়ী সব করেন, এখন আমি এক কথা বলিলে বলিবেন, তাঁহার অমান্য করা হইল।' জ্যেঠাইমা গৌরীর মার মাতাকে বলিলেন, 'ধন্য মেয়ে বটে গর্ভে ধরিয়াছিলে। সহ্য গুণে যেন মা বসুন্ধরা! কিন্তু তুমি যদি 'না' বলিতে, তবে তোমার অমতে কি কেহ তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে পারিত?' গৌরীর দিদিমা বলিলেন, 'কিন্তু বেহাইনও অনেক ভাবিয়া

কাজ করিতেছেন।', মার কথা গৌরীর আর ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, 'ভগবান কি আর আমার কোনও কথা বলিবার মুখ রাখিয়াছেন?' জ্যেঠাইমা অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিলেন—তাহার পর জোর করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'সবই আমাদের কপাল! তবে বাঁচিয়া থাকুক তোমার রমা, আবার ফলে ফুলে সংসার হইবে। সংসার ত তোমারই।'

এ দিকে গৌরীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল—কলিকাতায় ও গ্রামে সব উদ্যোগের সংবাদ বিধাত্রী দেবী রাখিতে লাগিলেন, গৌরীর বিবাহে যেন কোনও বিষয়ে কোথাও অঙ্গহানি না হয়। বিবাহের সব ব্যবস্থায় তিনি গৃহিণীপনার ও ক্ষমতাপরিচালন-দক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন।

৪

গৌরীর বিবাহের পর দিন 'বর কনে বিদায়' হইয়া গেল।

বিধাত্রী দেবী এতক্ষণ প্রবল চেষ্টায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাঁহার শূন্য বুকের মধ্যে যে ব্যথা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রবলতর হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। স্মৃতি কেবলই তাঁহার শোকক্ষতে ক্ষার নিক্ষেপ করিতেছিল। শেষে যখন বর কন্যা আশীর্ব্বাদের সময় সুশীলের হাতে গৌরীর হাত দিয়া তাঁহাকেই বলিতে হইল—'এত দিন গৌরী আমার ছিল, আজ তোমাকে দিলাম'—তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার বুকের মধ্যে পুত্রহারা জননীর শোক-বেদনা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আজ কোথায় সে—তাঁহার বক্ষের রক্ত—স্নেহের সম্বল, যে তাঁহার কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পিত করিবে? সে কোথায়? আর কোথায় তিনি—তাহার শোকবেদনবিক্ষত জননী! হায় দেবতা, এ কি তোমার বিধান! তবুও তিনি প্রবল বলে আপনাকে স্থির রাখিয়া, যেন যন্ত্রচালিতবৎ সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু চারি দিকের লোক জন, কাজ—সে সব যেন তিনি আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছিলেন না, অশ্রু যেমন তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিতেছিল, বেদনা তেমনই তাঁহার অনুভূতি অস্পষ্ট করিতেছিল। 'বরকনে বিদায়' হইয়া গেলে তিনি আপনার কক্ষে যাইয়া রিক্ত হর্ম্ম্যতলে পড়িলেন—মনের শক্তি ও শরীরের শক্তি এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা—পুঞ্জীভূত রোদন একটিমাত্র

আর্ত্তনাদে আত্মপ্রকাশ করিল—'বাবা!' তিনি আর তাহার বিকাশ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

তখন পার্শ্বের কক্ষে গৌরীর মা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে রমাকে গৌরীর বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। রমার সাজসজ্জা তিনি পূর্ব্বেই বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌরী পঁহুছিলে তাহার কেমন আদর হয়, রমা তাহা দেখিয়া আসিবে। তিনি রমাকে সেই সব কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় পার্শ্বের ঘরের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। গৌরীর মার জ্যেঠাইমা বলিলেন, 'আজ শুভ দিন, আজ না কাঁদিলে হইত না?' গৌরীর দিদিমা বলিলেন, 'আহা, আজ শোক যে নূতন হইয়া উঠে।' বিধবা দুহিতার জননী তিনি—তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রমা দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। যে বেদনায় পিতামহীর মুখে যাতনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উৎসবানন্দের মধ্যে আর কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু রমা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে সেই বেদনার এমনই বিকাশের জন্যই উৎকর্ণ হইয়া ছিল। পিতামহীর আর্ত্তনাদ তাহার শ্রবণগোচর হইবামাত্র সে দিদির বাড়ী যাইবার জন্য মার উপদেশ ভুলিয়া গেল—ছুটিয়া যাইয়া ঠাকুরমার কাছে শুইয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধাত্রী দেবী তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনি পুত্রহারা—সে পিতৃহারা; কাহার দুর্ভাগ্য অধিক—কাহার বেদনা অধিক? রমাকে বুকের কাছে লইয়া তাঁহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। এক দিন তাহার পিতাও এতটুকুই ছিল—এমনই তাঁহার ছায়ার মত থাকিত, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। একবার মনে হইল, বুঝি এ সেই—তিনি তাহাকেই বক্ষে ধরিয়া আছেন—এত দিনের, এত বৎসরের এই শোক, এই ব্যথা, এ সব দুঃস্বপ্ন—সত্য নহে। কিন্তু তখনই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল—বুকে যে চিতানল, তাহা ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তবে এও সেই—তাঁহার সেই অমূল্য নিধি—সেই স্নেহের সর্ব্বস্ব, সেই স্নেহবন্ধনেই বদ্ধ আছে। তিনি স্নেহের আবেগে রমাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন—যেন সে শোকের ক্ষতে স্নিগ্ধ ভেষজ।

বেদনার আবেগোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পর বিধাত্রী দেবী উঠিয়া বসিলেন—রমার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনিই উদ্যোগ করিয়া তাহাকে দিদির বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, এবং সে ফিরিয়া আসিলে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ধ্যার পর দেওয়ানজী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তিনি ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ ঠিক করিলেন—কত জন লোক যাইবে, কিরূপ কি ব্যবস্থা হইবে, সব স্থির করিলেন, দ্রব্যাদি যাহাতে যথাকালে পঁহুছে, তাহার জন্য উপদেশ দিলেন।

পর দিন তত্ত্ব পাঠাইয়া সরকার প্রভৃতির প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া রহিলেন, এবং তাহারা ফিরিয়া যখন জানাইল, 'কুটুম বাড়ী' সকলেই তত্ত্বের প্রশংসা করিয়াছে, তখন যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।

তাহার পর 'বর কনে' গ্রামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা। তিনি পুত্রবধুকে বলিলেন, 'বৌমা, আমি আগে যাই—সব গোছগাছ করিয়া রাখি, তুমি মেয়ে জামাই লইয়া যাইবে; বরং বেহাইন ঠাকরুণ আমার সঙ্গে চলুন, দুই জনে পরামর্শ করিয়া কাজ করিব।' গৌরীর মা এ প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন; কেন না, ইহাতে তিনি শাশুড়ীর আওতাছাড়া হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবার অবসর পাইলেন। যাইবার সময় কিন্তু সব বিষয়ের বন্দোবস্ত এমন ভাবে করিয়া গেলেন যে, পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের বড় অবসর রহিল না। শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৌমা, রমা বাবু আমার সঙ্গে যাইবেন, না তোমার সঙ্গে যাইবেন?' বৌমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, 'গৃহিণী কি আর কর্ত্তাকে ছাড়িয়া যাইবেন?' বিধাত্রী দেবীও হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ—বাড়ীর কর্ত্তার কি আগে বাড়ী না গেলে ভাল দেখায়। বিশেষ আমার এই শেষ কাজ, কর্ত্তা গৃহিণী পরামর্শ করিয়া করাই ভাল। তবে কি না কর্ত্তা এবার দোটানায় পড়িলেন।' বেহাইন বলিলেন, 'সে ভয় নাই, বেহাইন; দুই দিনে তোমার কর্ত্তাকে পর করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু শেষ কাজ—রমার বিবাহ নহিলে হইবে না।' বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'সে আশীর্ব্বাদ আর করিও না, বেহাইন! এইবার আমার ছুটী।'

গ্রামে উৎসবের স্রোত বহিল—কোনও দিকে কোনরূপ ত্রুটী হইল না। কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দালোকের মধ্যে ভবিষ্যতের দিকে যে ছায়া পড়িল, তাহা বিধাত্রী দেবীও লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। লক্ষ্য করিল—কেবল সুশীল। বিধাত্রী দেবীর ব্যবহারে আর তাহার শাশুড়ীর ব্যবহারে সুশীল একটু প্রভেদ লক্ষ্য করিত। তাহার প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহ যেন শত-ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার সকল ব্যবহারে তাহা আত্মপ্রকাশ

করিত। শাশুড়ীর ব্যবহারে সে তাহা পাইত না। সে মনে করিত, তাহা হয় অতিসংযমের ফল, নহে ত স্নেহের অপূর্ণতার পরিচায়ক। সে তাহা অতিসংযমের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিত—শাশুড়ার কর্ত্তৃত্ব-চালিত সংসারে গৌরীর মা হয় ত জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে একটু দ্বিধা অনুভব করেন। কিন্তু গৌরার মার প্রগল্‌ভা জোঠাইমার অসতর্ক কথায় এক দিন তাহার সে ভাব দূর হইয়া গেল। তিনি কথায় কথায় গৌরীর মাকে বলিলেন, 'তা, মা, তুমি মনে দুঃখ করিও না—রূপে তোমার গৌরীর মত না হউক, জামাই দেখিতে শতে এক জন; আর পয়সা? সে বেহাইন ঠিকই বলিয়াছেন, মেয়ের কপালে থাকে, টাকার অভাব হইবে না।' সুশীল সে কথা শুনিল। কোনও কোনও কথা জলের উপর জলবিন্দুর মত পড়ে,—একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তাহা অচিরে মিলাইয়া যায়; আবার কোনও কোনও কথা শীশার গুলির মত পড়ে—জলে ডুবিয়া যায় বটে, কিন্তু নষ্ট হয় না, ঘটনার জাল সময় সময় তাহা জড়াইয়া তুলিয়া জীবনের কূলে ফেলে। এই কথাও সুশীল ভুলিল না—তাহার শাশুড়া রূপে ও ধনে যেমন জামাতা চাহিয়াছিলেন, সে তেমন হয় নাই। তবে কি সে জীবনে ভুল করিল? প্রথমেই সে ধনীর দুহিতা বিবাহ করিতে ভয় পাইয়াছিল। তাহার আশঙ্কাই কি তবে সত্য হইল? সে রাত্রিতে সে ঘুমাইতে পারিল না। তাহার পার্শ্বে নিদ্রিতা সুন্দরী পত্নীর মুখে চাহিয়া ভাবিল—মার মনের ভাব যে কন্যার মনেও প্রতিবিম্বিত হইবে না, তাহাই বা জানিব কি করিয়া? নবোন্মেষিত যৌবনে প্রথম প্রণয়বিকাশের কালে এমন সন্দেহ অশেষ যন্ত্রণার কারণ। বসন্তের বাতাসে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন যদি সহসা তুষারপাতে বসন্তশোভা বিলীন হয়, তবে সে বড় দুঃখের। বিনিদ্র সুশীল বুঝিল, যত দিন গৌরী তাহার প্রেমে এই সন্দেহ-চিহ্ন ধৌত করিয়া দিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে এই বেদনাচিহ্ন বহন করিতে হইবে। জীবনে সে চিহ্ন অপনীত হইবে কি? সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যখন শিক্ষিত যুবক বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন সে সুখশান্তিময় সংসার-রচনার আশায় সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস করে। জীবনে সুখ, শান্তি, সন্তান লাভ করিয়া ধন্য হইবার আশা করে। তাহার কল্পনা তাহার জন্য নন্দনের রচনা করে; তাহার পর স্বামি-স্ত্রীর প্রেমসঞ্জাত শক্তি সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে পারে। প্রেম বিরাট সেতুর মত উভয়ের হৃদয় যুক্ত করে। কিন্তু যে স্থলে সেই

সেতুর কোনও অংশে—কোনও একটী কীলকে মরিচা ধরিবার অবকাশ থাকে, সে স্থলে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে। অতর্কিতভাবে শ্রুত এই কথাটি সেইরূপ সর্ব্বনাশের অবকাশ প্রদান করিবে কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু সুশীলের সে সন্দেহ সুশীল ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিল না। সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু প্রবোধে শান্ত করিতে পারিল না।

সুশীল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিধাত্রী দেবীর মনে হইল, বোধ হয়, তাহার শরীর ভাল নাই। তিনিও তাহাকে অধিক দিন থাকিবার জন্য জিদ করিলেন না। দশ দিনের মধ্যে সে ফিরিয়া গেল। হৃদয়ে প্রেমানুভূতির আনন্দের সঙ্গে সন্দেহের বেদনা লইয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই বিধাত্রী দেবী সুশীলের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'সুশীল উকীল হইল—উপার্জ্জন এক দিনে হয় না, বিশেষ তাহাকে হাইকোর্টের একটা পরীক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু খরচ বাড়িল; এখন সংসারের ভাবনা সুশীলের মারও যেমন, তাঁহারও তেমনই। তিনি সুশীলকে মাসে এক শত টাকা করিয়া দিবেন।' সুশীলের মা সহসা প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'মা, টাকাকড়ির কথা—আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। এখন তাহারা বড় হইয়াছে।'

সুশীলের মা যখন পুত্রদ্বয়কে এই প্রস্তাব জানাইলেন, তখন সুশীলের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি অনুকম্পা এবং তাহার শ্বশুরবাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নাই ত? সে বলিল, 'মা, পরের পয়সার উপর নির্ভর করিয়া কাজ নাই—আপনারা যাহা পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।' তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতা বলিলেন, 'তোর ইচ্ছা না হয়—লইয়া কাজ নাই। কাল তুই ত নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবি, সেই সময় তোর দিদিশাশুড়ীকে বলিয়া আসিস। আমি বলিতে পারিব না—তাঁহার কথা এমন মিষ্ট যে, 'না' বলিতে পারা যায় না।'

পর দিন সুশীল শ্বশুরালয়ে যাইলে যখন নিকটে আর কেহ ছিল না, তখন বিধাত্রী দেবী তাহার নিকট সে প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে তিনি স্নেহের দ্বারা তাহার যুক্তি খণ্ডিত এবং আপত্তি নিরস্ত্র করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, 'তবুও যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে, তুমি এ টাকা

গৌরীর মেয়ের বিবাহে গৌরীর বুড়া ঠাকুরমার যৌতুক বলিয়া নিও; কিন্তু, দাদা, আমার কথা রাখ—আমার মনে কষ্ট দিও না।' তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে সুশীল তাহার প্রতি দয়ার বা আপনার ধনগর্ব্ববিকাশচেষ্টার কোনও পরিচয়ই পাইল না। গৃহে ফিরিয়া সে তাহার মাতার সহিত সেই কথার আলোচনাকালে বলিল, 'মা, আমিও হারিয়া আসিলাম। কিন্তু ভাল হইল না।'

এই মাসহারার ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে জানাইলে তিনি বলিলেন, 'এক শত টাকায় কি হইবে?' তাঁহার কথায় যে খোঁচাটুকু ছিল, বিধাত্রী দেবী তাহা বুঝিলেন—যে ঘরে কাজ করা হইয়াছে, তাহাকে এক শত টাকা দিয়া গৌরীর উপযুক্ত শ্বশুরবাড়ী করা অসম্ভব। অথচ রমাকে ও গৌরীকে তিনি কোনও দিন বিলাসে লালিতপালিত করেন নাই, তিনি বিলাসের বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক, বৌমার কথার প্রচ্ছন্ন আঘাতটুকু তিনি গ্রহণ করিলেন না; কেবল ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত-প্রকাশের অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'দিবার দরকার হইলে সুযোগও পাওয়া যাইবে। এখন অধিক দিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা মনে করিবে, আমরা 'বড়মানুষী' দেখাইতেছি। তাহা হইলে তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইত না।' বৌমা কথাটার স্পষ্ট জবাব দিলেন না; কিন্তু মনে মনে বলিলেন, 'তাহারা পাইবার আশাতেই এ ঘরে কাজ করিয়াছে।'

এই বিষয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে বিধাত্রী দেবীর মতান্তর ঘটিতে লাগিল। গৌরীর মা ধনের প্রাধান্যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীকে বড় করিবার কল্পনা করিলেন; বিধাত্রী দেবী সে কল্পনাকে মনে স্থান দান করিতে অসম্মত হইলেন। তত্ত্বাদিতে উভয়ের মতের প্রভেদ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ছয় মাস পরে যখন গৌরী 'ঘর করিতে' গেল, তখনও তাহাই হইল। তাহার মা বলিলেন, মেয়ের সঙ্গে দুই জন ঝি দিবেন। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, 'এক জন মাত্র ঝি যাইবে—সেও স্থায়ী হইয়া নহে; তাহার পর গৌরীর শাশুড়ী কিরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিয়া তবে তাহাকে স্থায়ী করা না করার কথা বিচার করা যাইবে। কারণ, মেয়ের স্বাচ্ছন্দই দেখিতে হইবে—'বড়মানুষী' দেখাইয়া কুটুম্বের সঙ্গে সম্বন্ধ তিক্ত করা সুবুদ্ধির কাজ নহে।' অবশ্য বিধাত্রী দেবীর কথাই বজায় থাকিল; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, ক্রমে ব্যাপার জটিল হইয়া উঠিতেছে।

কাশীধামে গৌরীপুরের চৌধুরীদিগের একখানি বাড়ী ছিল। বিধাত্রী দেবী বাড়ীটি সর্ব্বদাই সুসংস্কৃত রাখিতেন; আত্মীয় কুটুম্ব যে যখন চাহিত,

তাহাকেই বাসের অনুমতি দিতেন। এবার বাড়ীর আবার সংস্কার হইল। তাহার পর তিনি কাশীবাসের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সম্পত্তির ও সংসারের আয় ব্যয়ের পাকা ব্যবস্থা করিলেন যে, কেহ কিছু নষ্ট করিতে না পারে। গৌরীপুরে সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার এবং শ্বশুরের ও স্বামীর ব্যবস্থানুসারে যাত্রাপুরের জমীদারীতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তিনি ত্যাগ করিলেন না; কেবল উইল করিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর সব রমারঞ্জনের।

দুর্গোৎসবের পর তিনি গ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। প্রজারা বলিল, 'এত দিনে আমরা মাতৃহীন হইলাম।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'এইবার আমার ছুটীর দরখাস্ত মঞ্জুর করুন, মা!' বিধাত্রী দেবী উত্তর করিলেন, 'আমি আর বহল বরখাস্তের মালিক নহি। এখন বৌমা সব দেখিবেন।' তবে দেওয়ানজী বুঝিলেন, প্রকারান্তরে তাঁহার ছুটীই হইল। কারণ, বুড়ার বুদ্ধি কাজে লাগাইবার যোগ্যতা বিধাত্রী দেবীরই ছিল, সকলের থাকে না।

কর্ম্মচারীরা বলিল, 'কি জানি—কি হয়!'

সম্পত্তির, সংসারের, দেব-সেবার, অতিথি-সেবার, রমার ও গৌরীর সব ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর বিশ্বনাথের চরণে আত্মনিবেদন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

আশ্রিতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে গেল। কালীর মা প্রাচীনা হইয়াছিল, সে সঙ্গে গেল। সে না কি যাইবার সময় তাহার বহিনঝিকে বলিয়াছিল, বৌমার সঙ্গে মতান্তরের জন্যই গৃহিণী এত শীঘ্র কাশীবাসে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ।

পৌরাণিক।

কোচজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সংবাদ কত দূর কি সংগ্রহ হইতে পারে, আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। স্মৃতির অতীত কাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, পরশুরাম-ভয়ভীত এক দল পলায়িত ক্ষত্রিয় ভগবতীর শরণাপন্ন হইলে, দেবী তাহাদিগকে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা কোচে লুকাইয়া রাখেন। এই কোচে লুকায়িত আর্য্যগণ উত্তরকালে 'কোচ' নামে অভিহিত হন।

কোচদেশ সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে :—

"কোচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।"—১৩ পঃ ২।

অর্থাৎ, যোনিগর্ত্তের (কামাখ্যা) সন্নিধানে কোচ নামে দেশ আছে।

"অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতি স্থিতঃ।"—ইতি পীঠমালা।

অর্থাৎ, "আমি কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছি।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :—

"শৃণু কৌন্তেয় রামস্য প্রভাবো যো ময়া শ্রুতঃ।
মহর্ষীণাং কথয়তাং বিক্রমং তস্য জন্ম চ॥
যথা চ জামদগ্ন্যেন কোটিশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
উদ্ভূতা রাজবংশেষু যে ভূয়ো ভারতে হতাঃ॥"

অর্থাৎ, "হে কৌন্তেয়! আমি মহর্ষিগণের মুখে রামের জন্ম ও পরাক্রমের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, সেই সমস্ত বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জামদগ্ন্য কোটী কোটী ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়াছিলেন, এবং সেই সমস্ত রাজবংশে যে সকল ক্ষত্রিয় পরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকল ক্ষত্রিয়ই ভারত-যুদ্ধে নিহত হইলেন।"

উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে :—

"সন্তি ব্রহ্মন্ ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলে জাতান্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে॥
অস্তি পৌরববংশ্যো বিদূরথসুতঃ প্রভো।
ঋক্ষৈঃ সংবর্দ্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্ব্বতে॥
তথানুকম্পমানেন যজ্বনাঽপ্যমিতৌজসা।
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য স দ্বিজঃ।
সর্ব্বকর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ॥"—শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ, "ব্রহ্মন্! কতকগুলি স্ত্রীতে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সন্তানগণ, আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি হৈহয়-কুলজাত ক্ষত্রিয়ও জীবিত আছেন। পুরুবংশীয় বিদূরথ-পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সৌদাস রাজপুত্রকে অমিততেজা মহাযজ্ঞশালী পরাশর অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কারাদি শূদ্র জাতির ন্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তিনি সর্ব্ব-কর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

"এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
একমেব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিদ্গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
কেচিদ্বৈতালিকাঃ শূরাঃ ব্রাহ্মণস্তত্রমর্দ্দিতাঃ॥"

—ইতি স্কন্দপুরাণ, রেণুকা-মাহাত্ম্য।

অর্থাৎ, "পরশুরাম এইরূপে তীক্ষ্ণশর সন্ধানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া, অন্যান্য কাতর রাজগণের নিধনসাধনার্থ, একাকী গমন করিয়াছিলেন। তখন কেহ ভয়ে নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন; কেহ বা ভয়ে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আর কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

"মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি।"

—মৎস্য, বায়ু ও ভবিষ্যপুরাণ। *

অর্থাৎ "শূদ্রাতে কলিকাংশজ মহানন্দিসুত সর্ব্বক্ষত্রান্তক মহাপদ্ম নৃপ উৎপন্ন হইবেন। সেই দিন অবধি শূদ্রবংশীয়গণ রাজা হইবেন। সেই মহাপদ্ম একরাট্ ও একচ্ছত্র হইবেন।"

"নন্দীসুতভয়াদ্ভীমে পৌণ্ড্রদেশাৎ সমাগতঃ।
বর্দ্ধনস্য পঞ্চ পুত্রাঃ স্বগণৈর্বান্ধবৈঃ সহ॥
রত্নপীঠং বিবিশন্তে কালদ্বিপ্রপ্রসঙ্গমাৎ।
ক্ষাত্রধর্ম্মাদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃ ভুবি॥"

—ভ্রামরীতন্ত্র, ২য় পটল।

অর্থাৎ, "বর্দ্ধনের পঞ্চ পুত্র স্বগণ ও বান্ধবগণসহ নন্দীর সুতের ভয়ে পৌণ্ড্রদেশ হইতে ভীমে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রত্নপীঠে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া কালক্রমে বিপ্রদিগের অসঙ্গহেতু ক্ষাত্রধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় পৃথিবীতে 'রাজবংশী' এই নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।"

"জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে।
ম্লেচ্ছচ্ছদ্মানুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ॥ ৩০

* F. E. Pargiter's The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, P. 25., শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ৪৩ পৃঃ।

তে ম্লেচ্ছবাচঃ সততমার্য্যবাচশ্চ সর্ব্বদা।
জল্পীশং সেবমানাস্তে গোপায়ন্তি চ তং হরম্॥" ৩১
—ইতি কালিকাপুরাণ, ৭৭ম অঃ।

অর্থাৎ, "পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয়, ম্লেচ্ছ বেশ ধারণ করিয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ ও আর্য্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। জল্পীশদেবের সেবা ও সেই শিবকে রক্ষা করিয়া কালযাপন করিতেছেন।"

উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন দ্বারা স্থানত্যাগী ও ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥—১০ অঃ, ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ॥"—১০ অঃ, ৪৪।

অর্থাৎ, "পৌণ্ড্র, ওড্র ও দ্রবিড়াদিদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ উপনয়নাদি সংস্কার ও যজন অধ্যয়নাদি ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"—ইতি মনু ১০, ২২।

অর্থাৎ, "ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রাবিড় জাতি উৎপন্ন।" টীকাকার কুল্লূকভট্ট কহেন ইহারা এক জাতি, দেশভেদে নামভেদমাত্র।

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"—ইতি মনু ১০, ৪৫।

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, কিংবা আর্য্যভাষীই হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়।"

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ॥"—ইতি মনু ; ১০, ২০।

অর্থাৎ, "দ্বিজাতিগণ সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, উপনয়ন সংস্কার না হইলে ঐ সন্তানদিগকে 'ব্রাত্য' বলা যায়।"

এতদ্দ্বারা সংস্কারহীন, ম্লেচ্ছভাষাভাষী, দ্রাবিড়াদি-দেশবাসী ও শূদ্রভাবাপন্ন ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা দ্বিজজাতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

কথিত আছে ;—

"পরশুরামভয়াৎ ক্ষত্রী সঙ্কোচাৎ কোচ উচ্যতে।"

অর্থাৎ, পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা সঙ্কোচিত হইলে, সঙ্কোচ (লুক্কায়িত) হইতে 'কোচ' নামের উৎপত্তি।"

"কোচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।
সাধ্বী সতী ব্রাহ্মিকা হি রেবতী জলবিশ্রুতা॥ ২
ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা যা তু যোগিনী সুন্দরী মতা।
*　　*　　*　　*
কালাৎ সা মাধবীদেবী মদ্দেহে লীনতাং গতা॥ ১৮
যথা পুত্রো ভৃঙ্গরাট তথা বিশুর্মাগ্রজঃ।
বিশুসিংহোঽপি কল্পান্তে পরাং সিদ্ধমবাপ্স্যতি॥" ২০

—যোগিনীতন্ত্র, ১৩ পঃ ২, ১৮, ১৯, ২০।

অর্থাৎ, "যোনিগর্ত্তের নিকট কোচদেশে, ব্রাহ্মিকা সাধ্বী সতী জলবিশ্রুতা ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা রেবতী, যোগিনীসুন্দরী নামে উক্ত হইয়াছেন। সেই মাধবী দেবী কালবশে আমার দেহে লীন হইয়াছিলেন। ভৃঙ্গরাট্ আমার যেরূপ পুত্র, এই বিশুসিংহও সেইরূপ জানিবে। বিশুসিংহ ও (বিশ্বসিংহ) কল্পান্তে মোক্ষ লাভ করিবে।"

উদ্ধৃত প্রমাণাদির সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হওয়া সত্বেও আত্মগোপনকারী ম্লেচ্ছ ও শূদ্র-ভাবাপন্ন ব্রাত্যক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন। পরশুরাম-ভয়-ভীত বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও গর্ভবতী মাতা ছদ্মবেশে, কাহারও পিতা লুক্কায়িতভাবে দিন কাটাইয়াছেন, এরূপ পরিগৃহীত জনশ্রুতির অভাব নাই। মহাভারতে লিখিত আছে ;—পরশুরাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের পত্নীগণ, ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মাইয়া ক্ষত্রিয়-বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন।* এমন অবস্থায় কোচজাতির জাতিতত্বসম্বন্ধীয় জনশ্রুতি ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ, অগ্রাহ্য হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। মনু যে সব আচারহীন ক্ষত্রিয়ের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্রাবিড় ও কম্বোজ জাতির নাম আছে। জাতি-তত্ত্ববিদ্ কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, কোচজাতি দ্রাবিড়, মতান্তরে কম্বোজ জাতি হইতে উৎপন্ন। যোগিনীতন্ত্র আধুনিক বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কেবল আধুনিক হইলেই যে তাহা অবিশ্বাস করিতে

*আদিপর্ব্ব ; ১০৪ অঃ।

হইবে, এরূপ যুক্তির সমর্থন করা যায় না। কালিকাপুরাণ ও ভ্রামরীতন্ত্র কামরূপক্ষেত্রে ছদ্মবেশী এক দল ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। কেহ কেহ যোগিনীতন্ত্রের লিখিত 'সঙ্কোচ' ও 'কুবাচ' দুইটী পৃথক জাতি অনুমান করেন। উক্ত তন্ত্রে বিশ্বসিংহ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥"—১৩ পঃ, ১৬।

অর্থাৎ, "তাহার (বিশ্ব সিংহের) পৃথিবীপালক বহু পুত্র উৎপন্ন হয় ; কুবাচগণ সকলেই ধার্ম্মিক রাজা ও যুদ্ধপ্রিয় হইয়াছিল।"

"পূর্ব্ব ভাগে চ সৌমারঃ কুবাচঃ পশ্চিমে তথা।
দক্ষিণে যবনশ্চৈবমুত্তরে প্লব এব চ॥"—১৪ পঃ, ১৯।

অর্থাৎ, "পূর্ব্বভাগে সৌমার, পশ্চিমে কুবাচ, দক্ষিণে যবন, উত্তরে প্লবগণ বাস করে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের "মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ, "মাংসচ্ছেদী ও তিবর জাতি হইতে কোচজাতির উৎপত্তি।" এই বচন উদ্ধৃত করিয়া কোচজাতির হীনাবস্থা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে।* পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া, স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া স্বমত-সমর্থনের প্রয়াস সমর্থনযোগ্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ ;—

"সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্য যোষিতঃ।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ॥"

অর্থাৎ, "রাজপুত রমণীর গর্ভে ক্ষত্রবীর্য্যে তীবর জাতির উৎপত্তি সে জার-দোষে পতিত।"

"মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ, "মাংসচ্ছেদীর গর্ভে তীবরের ঔরসে কোচ জাতির উৎপত্তি।"

"ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বাধমঃ সদাশুচিঃ॥
তীবরেণ চ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকার বভূব হ।
চর্ম্মকারাচ্চ চাণ্ডাল্যাং মাংসচ্ছেদী বভূব হ॥"

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রপুরুষযোগে অপবিত্র ও অধম চণ্ডালের সৃষ্টি। উহারা জারদোষে পতিত। তীবর কর্ত্তৃক চাণ্ডালীতে চর্ম্মকার, এবং চর্ম্মকার হইতে চাণ্ডালীতে মাংসচ্ছেদীর উৎপত্তি।"

* সাহিত্য-পরিষদ পঃ, ১৫ ভা, ৪ সংখ্যা, ২৫১ পৃঃ। প্রবাসী পঃ, ১৩১৬, ৩১২ পৃঃ।

মতান্তরে,—

"কাপালী চর্ম্মকারাশ্চ কুবাচঃ সাবর স্তথা।

* * * *

এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ।"—জাতি-কৌমুদী।

অর্থাৎ, "তীবর পুরুষ ও ব্রাহ্মণকন্যায় কাপালী, চর্ম্মকার, কুবাচ ও সাবর জাতির উৎপত্তি।" উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন দ্বারা কোচ জাতি হীন প্রতিপন্ন না হইয়া বরং আর্য্যবংশ (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) সম্ভূত বলিয়াই সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষকালে বহু জাতি হীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচ জাতির সম্বন্ধে উদ্ধৃত বচনাবলী প্রকারান্তরে তাহার সমর্থন করিতেছে। তীবর, চণ্ডাল, মাংসচ্ছেদী প্রভৃতি জাতির নামে নাসিকা-সঙ্কোচন কিছু কালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়া, ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় উক্তির সাহায্যে তাহাদের অপরাধ ও দণ্ডের ভীষণতা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজপুত ও ক্ষত্রিয়ের মিলনে উৎপন্ন তীবর (তিওর) এখন অস্পৃশ্য জাতি। এই তীবরের ঔরসেই 'কুবাচ' বা কোচ জাতির জন্ম। মাতৃকুলে—ব্রাহ্মণীর গর্ভে 'চাণ্ডালী', চাণ্ডালীর গর্ভে 'মাংসচ্ছেদী' ও মাংসচ্ছেদীর গর্ভে 'কোচ' জাতির উৎপত্তি। মতান্তরে, তীবর ও ব্রাহ্মণীর সংযোগে 'কুবাচ' জাতির জন্ম। সেন রাজত্বকালে যে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করিতেন, * তাঁহাদের, এবং বর্ত্তমান যুগের অসবর্ণ ও (হিন্দুমতে) বিধবা-বিবাহকারিগণের অপরাধ ঐ সমস্ত কোচ, তিবর ইত্যাদি জাতির অপরাধের সহিত একত্র বিচারিত হওয়া আবশ্যক। কোচ জাতি মূলে ক্ষত্রিয় স্বীকার করা হইলেও তাঁহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে, নিতান্ত পক্ষপাতিগণও তাহা বলিতে পারেন না। বঙ্গের কোনও জাতির সম্বন্ধেই এরূপ উক্তি প্রযোজ্য নহে। ইতিপূর্ব্বে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা মোঙ্গলীয় জাতির সহিত কোচ জাতির রক্তমিশ্রণ সপ্রমাণ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, জাতিকৌমুদী ও জাতিমালা আদি গ্রন্থও প্রকারান্তরে তাহার সমর্থন করে।

কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, কোচেরা দ্রাবিড় জাতি হইতে উৎপন্ন, এবং দ্রাবিড়েরা আর্য্য জাতি হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের বহু কাল পূর্ব্বে মনু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্রাবিড় জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ; ১৮৭ পৃঃ।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দ্রাবিড় জাতির উল্লেখ আছে। তন্ত্র, পুরাণ ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মত একত্রে বিচার করিলে কোচ জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। কোচ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অন্যান্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। অনার্য্য (মোঙ্গলিয়ান) রক্ত মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে (২১১ অঃ) লিখিত আছে—

"শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়। এমন কি, একমাত্র সারল্যগুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে, তাহার ব্রাহ্মণত্বও লাভ হইতে পারে।"

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥ ৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥ ৬৫
অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাৎ তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাৎ তু শ্রেয়স্ত্বং কেতি চেদ্ভবেৎ॥ ৬৬
জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৬৭
তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥" ৬৮—মনু ১০ অঃ।

অর্থাৎ, "উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রা কন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্টও সপ্ত জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ব্রাহ্মণ হইতে অনার্য্য নারীতে যে (সন্তান) উৎপন্ন হয়, এবং অনার্য্য হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? (এ প্রশ্নের উত্তর এই) আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যার গর্ভজাত সন্তান সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলে আর্য্য হইবে, এবং অনার্য্যের ঔরসে আর্য্যার গর্ভজাত সন্তান নিশ্চয় অনার্য্যই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বটী নিন্দিত ক্ষেত্রসম্ভূত, এবং পরবর্ত্তী প্রতিলোমজ বলিয়া উভয়েই উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে; ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা।"

মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,—মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির উৎকর্ষ ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তি সপ্তম, পঞ্চম, বা ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত জানিবে। ব্রাহ্মণ

দ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্ন কন্যা নিষাদী; সেই কন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলে যদি তাহাতে আবার কন্যা উৎপন্ন হয়, এবং সে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হয়, এইরূপে পর পর তৎজাতা কন্যা কেবল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলে সপ্তম পুরুষে পুত্র ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি গ্রন্থমাত্রেই আবদ্ধ ছিল না; ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্মবৃত্তান্ত তাহার প্রমাণ। "বাহেবাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ" অর্থাৎ (ব্রহ্মার) বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয় জাতির জন্মক্ষেত্র, পরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "চন্দ্রাদিত্য মনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।" চন্দ্র, সূর্য্য, ও মনু হইতে ক্ষত্রিয়-বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কার ও উপাসনা-প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন, কোচরাজ বিশ্বসিংহ পার্ব্বতীয় অনার্য্য জাতি; তৎকর্ত্তৃক কামরূপে প্রথম ব্রাহ্মণ আনীত হয়, এবং কোচ জাতির হিন্দুমতে প্রবেশলাভ ঘটে। রাজর্ষি বিশ্বসিংহ কামাখ্যা পীঠের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি এক জন যথার্থ হিন্দু রাজার ন্যায় শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং নিজের সন্তানগণকে কাশীধামে রাখিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সবে মাত্র প্রবিষ্ট এক জন নূতন হিন্দুর পক্ষে এতটা হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, আদিশূরের ন্যায় তাঁহার হিন্দুধর্ম্মপ্রিয়তা ছিল। সেই জন্যই তিনি কামরূপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭শ শতাব্দীর রচিত, আসামের বৈষ্ণবচূড়ামণি দামোদর দেবের জীবনচরিত গুরুলীলায় লিখিত আছে,—

"শ্রীহর দেবর ঔরসে উৎপত্তি
বিশ্বসিংহ নররাজ।
পৃথিবীর যত অব্রাহ্মণ বধি
সাধিলন্ত দেবকায॥"

কোচ জাতি যে পূর্ব্বে বঙ্গের অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। পূর্ব্বে কলিতা জাতি ইঁহাদের পৌরোহিত্য করিতেন। কলিতারা এতদঞ্চলে আগন্তুক আর্য্য জাতি। * কোচ জাতির মধ্যে তন্ত্রসম্মত বরাহাদি ভক্ষণ, রথযাত্রা ও দীপালীর ন্যায় উৎসব, চণ্ডী, তারা, ধর্ম্ম, কালভৈরব, কালী, কামাখ্যা,

* Gait's History of Assam, P. 2.

শীতলা, মহাকাল ইত্যাদি দেব দেবীর পূজা এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এই জাতির হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ, বিশ্বসিংহের অনেক পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রচনাকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল। বিশ্বসিংহের জন্মের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে (১৫শ শতাব্দীতে) দেবীবর মিশ্র যে মেল বন্ধন করেন, তদ্দারা তৎকালে কোচ জাতির ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকার আভাস ব্যক্ত হয়। বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ভাল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার দ্বারা যে এ দেশে ব্রাহ্মণ-বসতির সূত্রপাত, এ কথা অগ্রাহ্য। তৎপূর্ব্বে (১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে), কামতাপুরের খেন রাজগণের আমলে এ দেশে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। তৎপূর্ব্বে, অর্থাৎ, ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজির কামরূপ-আগমন বৃত্তান্তে হিন্দু দেবমন্দিরের উল্লেখ আছে। তাহার অনেক পূর্ব্বে, পাল রাজগণের রাজত্বকালে কামরূপে ব্রাহ্মণের বসবাস থাকার উল্লেখ করা গিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীর-রাজ দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কামরূপে নৃসিংহ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।* হিউয়েন সাঙ্গের কামরূপ-আগমন সময়ে (৬৩৮ খৃঃ) তাৎকালিক কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মা স্বয়ং হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোচরাজ সাঙ্গলদেবও হিন্দু ছিলেন। নরক, রামায়ণের সময়ে, এ দেশের রাজা ছিলেন; তিনি কিরাত জাতিকে বিতাড়িত করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজারাজড়ার পক্ষে উপায়-বিশেষের দ্বারা সমাজে উচ্চ-স্থান-গ্রহণ অসম্ভব নহে। কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভ ব্রাহ্মণ-গণকে দশ লক্ষ টাকা প্রণামী প্রদান করিয়া তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী স্বজাতিগণের উপবীতধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।† প্রকৃত হইলেও এই সংস্কার-গ্রহণ, বৈদ্য জাতির পূর্ব্বহীনতার পক্ষে একমাত্র ও অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মুসলমানী পর্ব্ব মহরমে, তাজিয়া দিবার প্রথা কোচ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। তদ্দারা কোচ জাতি সেমেটীক জাতির অন্তর্গত আরববাসীর বংশধর, এরূপ প্রমাণ হয় না।

ভক্ষ্য ও আচার।

বর্ত্তমান হিন্দুয়ানীর চক্ষে দেখিতে গেলে, কোচ জাতির মধ্যে কতকগুলি অখাদ্য-ভক্ষণের অভ্যাস থাকা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার

* রাজতরঙ্গিণী ; ১ম খণ্ড, ৮২, ৮৩ পৃঃ।

† ইষ্টারন ইণ্ডিয়া ; ২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃঃ।

কতক তন্ত্রসম্মত। প্রতিবেশী অন্যান্য অসভ্য জাতির ভক্ষ্য বস্তু কোচ-সমাজে একেবারে প্রবেশলাভ করে নাই, বলা কঠিন; কিন্তু তাহা তুলনায় বঙ্গীয় ভদ্র হিন্দু সমাজের ভক্ষ্য চট্টগ্রামের 'লটাহুংনি' (এক জাতীয় পচা মৎস্য), পূর্ব্ব-বঙ্গের 'কূর্ম্ম', দক্ষিণ-বঙ্গের 'কর্ক্কট' ও 'গুগ্‌লি' অপেক্ষা অধিক আপত্তিকর নহে। রাজপুতানার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের আহেরিয়া উৎসবে বরাহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন।* নেপালের কোনও কোনও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে বরাহ-মাংস-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পিতৃকার্য্যে বরাহ-মাংসের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।† পশ্চিমের কোনও কোনও ব্রাহ্মণসমাজে গো-মাংস-ভক্ষণের প্রথা থাকা জানা যায়।‡ এমন অবস্থায় ভক্ষ্যবস্তুর দ্বারা জাতিবিচার সম্ভব নহে। আসামে 'মারিয়া' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মুসলমান আছে। তাহারা ১৬শ শতাব্দীর আসাম-আক্রমণকারী বন্দি পাঠান সেনার বংশধর। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলে, তাহাদিগকে নীচ শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়াই পরিচিত করিবার চেষ্টা হইত।

শূদ্রাচারবিশিষ্ট বঙ্গের সাহা, যোগী ও রজক ইত্যাদি জাতিগুলিকে আমরা কখনও অনার্য্য মনে করিতে পারি না। প্রতি বৎসর শীতকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সমস্ত কুলী বঙ্গদেশে আগমন করে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভাব নাই। তাহাদের চালচলন-সঙ্গি দোসাদ, ও মুচী অপেক্ষা উন্নত নহে। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সমস্ত কোচ জাতি বাস করে, তাহারা প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির নিকট ভাল ব্যবহার না পাওয়ায়, ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নেপালে রাজাদেশে ইহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। তদ্দেশে উপনিবিষ্ট কোচবিহারবাসিগণের জল এখন আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত। যাহাই হউক, সামাজিক যাবতীয় ক্রিয়া কাণ্ডে কোচ জাতি সম্পূর্ণরূপে শূদ্রাচারী নহে। ক্ষত্রিয়োচিত 'রাক্ষস' বিবাহ প্রথা ইহাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। কোচ জাতির মধ্যে বিধবা-গ্রহণের প্রথা আছে। ইহা ঠিক বিধবাবিবাহ নহে। পরাশরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের বিধি ছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে,রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, বংশ-গৌরবে

* রাজস্থান; ১ খণ্ড, ২৬, ২৭, ৫২৫ পৃঃ।

† মনুসংহিতা; ৩, ২৭০।

‡ রাজস্থান; ২ খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদয়পুরের রাজবংশের আদিপুরুষ জনৈক নাগর ব্রাহ্মণ ও হীনজাতীয়া রমণীর সংযোগে উৎপন্ন। * ১৪শ শতাব্দীতে এই বংশে বিধবাবিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই বিধবার সন্তানের চিতোরের রাজসিংহাসনলাভে কোনও আপত্তি হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে, কোচ জাতি বহুকাল পূর্ব্বে মূল ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা কারণে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পরবর্ত্তী কালে যে সব পরিবর্ত্তন বা সংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল, কোচ জাতির মধ্যে তাহা সংক্রামিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। এমন অবস্থায় আদিম কালের বিধবাবিবাহ প্রথার চিহ্ন এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, মনে করা অযৌক্তিক নহে। ইহাদিগকে উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কত কাল ব্যাপিয়া কত জাতির সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, বলা কঠিন। তাহার চিহ্ন কিছু কিছু থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

কোচবিহার-রাজবংশে ও কোচ জাতির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাহা বঙ্গীয় অন্যান্য হিন্দু সমাজে দৃষ্ট হয় না। হিন্দু ব্যবস্থা-গ্রন্থে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিধি নাই; তথাপি বঙ্গের অনেক জমীদার-বংশে তাহা প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকন্যার সহিত বিবাহিত হইতে পারেন; সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হন। পরস্পর মাতুল ও ভগ্নীপুত্রীর মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ। † মহীসুরের বর্ত্তমান রাজ-ভগ্নী আপন মাতুলের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন। ‡ মণিপুরে ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। § ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পুত্রের পরিবর্ত্তে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হন। || সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত আমাদের এই বঙ্গদেশেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ¶ এ পর্য্যন্ত মেঘনা নদীর পূর্ব্ব পাড়ে কায়স্থ ও সাহা, এবং বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে অসবর্ণ

* I. P. A. S. B, New series. Vol. V. 1909, PP. 167—87.

† ভারতী পঃ; ১৩০৪, ১৮৭—৮৮ পৃঃ।

‡ প্রদীপ পঃ; ১৩০৮, ১৮২ পৃঃ।

§ রাজমালা; ২৭০ পৃঃ।

|| ভারতী পঃ; ১৩০৪, ২২৯ পৃঃ।

¶ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১৮৭ পৃঃ।

বিবাহের চলন আছে। * বঙ্গের বারেন্দ্র-গ্রহ-বিপ্র নামে পরিচিত, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি-বিবরণের উল্লেখ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। টডের মতে শাকদ্বীপ ভারতের বহির্ভাগস্থ কোনও দেশ। কেহ কেহ হিমালয়ের উত্তরস্থ তিব্বতাদি স্থান বলেন। পুরাণে প্রকাশ,—শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কর্তৃক ভারতে আনীত। মহাভারতের যুগে তুর্কীস্থান শাকদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ বলেন,—পারসীকদের ভারত-আক্রমণকালে ইহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। মতান্তরে, ইহারা মগদেশ হইতে আগত। জাতিকৌমুদী গ্রন্থে ইহারা পক্ষিরাজ গরুড় কর্তৃক শাকদ্বীপ হইতে আনীত, লিখিত আছে। বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি-বিবরণ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। কালবশে উচ্চ শ্রেণীর পতন ও নীচ শ্রেণীর উন্নতি বঙ্গে অনুমানমাত্র নহে, প্রামাণিক ঘটনা। ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলীতে লিখিত আছে, আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জপতির নিকট কয়েক জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান; তিনি আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে, আদিশূর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গৌড়ীয় সৈন্যের পরাজয় ঘটে। পরে আদিশূরের সেনাপতি কৌশলে যুদ্ধ-জয় ও ব্রাহ্মণ-আনয়নের অভিপ্রায়ে গো-ব্রাহ্মণ-ভক্ত কান্যকুব্জরাজের বিরুদ্ধে নীচ শ্রেণীর অস্পৃশ্য সাত শত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ-বেশে গোপৃষ্ঠে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কনোজরাজ গো-ব্রাহ্মণ-বধের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি করেন, এবং গৌড়পতিকে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ প্রদান করেন। উক্ত সাত শত ব্যক্তি আদিশূরের অনুগ্রহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। †

* * *

"ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ॥
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গা আরূঢ় ধনুর্দ্ধরাঃ।

* * *

জয়ন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
সপ্তশতীতি বিখ্যাতাস্তেহলীকা প্রাভবংস্তদা॥"—ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলী।

কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্রের মতে একদা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বল্লালসেনের দান-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, বল্লাল চণ্ডীর আরাধনা করেন। চণ্ডী তাঁহাকে 'এখন হইতে দুই

* রাজমালা; ৪৭১, ৪৮৩ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ৭৮ পৃঃ।

প্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইবে' এই বর প্রদান করেন ; বল্লালসেন এই সুযোগে গুণবান সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।*

"* * *

মহান্ কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং

বিপ্রং ময়া জ্ঞাপিতম্।

দত্বেমন্তু বরং নৃপায় সহসৈবান্তর্হিতা পার্ব্বতী

রাজা সপ্তশতদ্বিজানতিগুণানাব্যাজ্ঞয়া নির্ম্মমে।

* * *"

(এড়ুমিশ্রের কারিকা)

বাচস্পতি মিশ্র, ধ্রুবানন্দকে সমর্থন করিয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু গবারোহী সৈন্যগণকে নীচ শ্রেণীর বলেন নাই, নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

"বৃষারূঢ়া বিপ্রাঃ * * *"

—বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরাম।

উত্তরকালে সপ্তশতীরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিবিধ গাঁই ও গোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।† জাতিতত্ত্ব-সংক্রান্ত এই সমস্ত আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইলে, সর্ব্বত্রই রিজলি সাহেবকে সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

সংগ্রহ।

কোচরাজ বিশ্বসিংহের অষ্টাদশ পত্নী ছিলেন ; তন্মধ্যে ২ জন নেপাল হইতে, ১ জন কাশ্মীর হইতে, ৪ জন বারাণসী হইতে ও ২ জন মিথিলা হইতে আনীতা। পরিচয় প্রকাশ না থাকিলেও ইঁহাদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের কেহই ছিলেন না, বলা কঠিন। বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারের ৩ জন রাজকুমার, আসামের অন্তর্গত ভ্রমরাকুণ্ডে স্নান-সংক্রান্ত বিবাদে আসামীগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নরনারায়ণের পক্ষ হইতে আসামে উকীল প্রেরিত হইয়াছিল। আসামরাজ চুখাফার কর্ম্মচারী বড় গোঁহাই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ হত্যা ও মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ; ৭৯ পৃঃ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ; ৮৮, ৮৬ পৃঃ। গৌড়ের ইতিহাস ; ৮০ পৃঃ।

অনুচিত বলিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। * ১৬শ শতাব্দীতে অম্বররাজ স্বনামখ্যাত মানসিংহ কোচবিহারের তাৎকালিক অধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। † উক্ত শতাব্দীতে কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বারে মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের যে ইষ্টকমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার গলদেশে উপবীতের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ‡

১৭শ শতাব্দীতে নেপালের তাৎকালিক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা প্রতাপমল্লের সহিত কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রূপমতী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। প্রতাপমল্ল ১৬৪৯ খৃঃ কাঠমাণ্ডু রাজধানার অদূরবর্ত্তী এক প্রাসাদে (অধুনা বিষ্ণুমন্দির) এক শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন; উহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে এই বৃত্তান্ত ক্ষোদিত দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, রূপমতী দেবী প্রতাপমল্লের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে স্ববর্ণা না হইলে কেহ মুখ্যাপত্নী বা সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।"—মনু; ৩, ১২।

অর্থাৎ, দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা।

"দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।"—মনু; ৩, ১৮।

অর্থাৎ, যে দ্বিজের দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্যে শূদ্রা প্রধান অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিণীস্বরূপা হইয়া যাঁহার সেই সকল কার্য্যে যোগ দেয়, তাঁহার সেই হব্য কব্য দেব ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না, এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা স্বর্গলাভও করিতে পারেন না।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন।"—মনু; ৯, ৮৬।

অর্থাৎ, "স্বামীর দেহ পরিচর্য্যা, দৈনিক গৃহকর্ম্ম ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া কলাপাদি কেবল স্বজাতীয়া স্ত্রীই সম্পাদন করিবেন। ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী করিবেন না।"

---

* আসামবন্তি পত্রিকা; ২৭শে জুন ১৯০১ "ক্ষত্রিয়র সম্বন্ধে এনেকটা মরাই" ও রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জী।

† আইন-ই-আকবরী ১ম, ৩৪০ পৃঃ ও আকবরনামা।

‡ কেহ কেহ ইহা উত্তরীয় বলেন। পাণ্ডাগণের মতে ইহা উপবীত।

১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত আসামের অন্তর্গত জয়ন্তরাজ যশোমাণিকের পরিণয় হইয়াছিল। এই রাজবংশ সিণ্টেঙ্গ জাতির অন্তর্গত। বভ্রুবাহন-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই এই বংশ পরিচিত। ব্রাহ্মণগণের নিকট এই রাজবংশ চিরকাল 'আর্য্য' বলিয়াই সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, এই রাজবংশ খস জাতি হইতে উৎপন্ন। মনুর মতে, খসজাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

অলৌকিকতা।

কোচরাজ বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্ত এ কালে এক সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মহাদেবের ঔরসে শাপগ্রস্তা যোগিনীর গর্ভে (মানব-দেহে) বিশ্বসিংহের জন্ম; যোগিনীতন্ত্রের লিখিত এই বিবরণ গ্রহণ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক। কেহ কেহ এ জন্য তন্ত্রকারকে কটূক্তি করিতেও ছাড়েন নাই।* বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্তে বিস্মিত হইবার এবং তজ্জন্য শাস্ত্রকারকে কটূক্তি করিবার কোনও হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। জনসমাজে বিশেষ খ্যাত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তির জন্ম অলৌকিক উপায়ে সাধিত হইবার বৃত্তান্ত এশিয়া, ইয়োরোপ কোনও দেশেই অজানিত নহে। এই বিজ্ঞানের যুগে ঐ সমস্ত বিবরণ কাল্পনিক বা ভাবপ্রবণতা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু অজানিত কাল হইতে মানবসমাজ নির্ব্বিচারে যাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তন্ত্রকারকে কটূক্তি করিলে তাহার প্রতীকার হইবে, এমন আশা করা যায় না। বুদ্ধমাতার উদরে শ্বেত হস্তীর প্রবেশ, রামচন্দ্রের যজ্ঞফল হইতে জন্ম, ইত্যাদি অলৌকিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতাব্দীতে নাগাশঙ্কর নামক কামরূপের এক জন রাজার করতোয়ার চরে জন্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার অনেক পরবর্ত্তী আড়িমত্ত রাজার ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে জন্ম, বলা হয়। স্বয়ং কৌলীন্য-মর্য্যাদার বিধাতা বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া খ্যাতি আছে। তাঁহার মাতা স্বামী কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্র তটে নির্ব্বাসিতা অবস্থায় বল্লালসেনকে প্রসব করেন। যাহাই হউক, মহাদেবের জনসমাজে স্ত্রী-গ্রহণ এই প্রথম নহে; অতীত কালে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ড্যরাজ্যের রাজা মলয়ধ্বজের কন্যা তটাতকের সহিত শিবের বিবাহ হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ আছে। এই দম্পতি এখন মাদুরায় মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দর নামে পূজা

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা; ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১ পৃঃ।

পাইতেছেন। * এই বিজ্ঞানের যুগে, অলৌকিকতার বিরুদ্ধবাদিগণের চক্ষের উপর, বঙ্গীয় সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ পরমহংসের অলৌকিক উপায়ে (শিব-প্রসাদাৎ) জন্ম, কথিত হইতেছে। বঙ্গের যোগীজাতি শিববংশীয় বলিয়া শাস্ত্রোক্তি আছে। † যাহাই হউক, বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক বলিয়া পরিহার করিলে, ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশমর্য্যাদার কোনও মূল্য থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় মহাদেবও ক্ষত্রিয়; সেই সূত্রে বিশ্বসিংহও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

গেইট তাঁহার আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া সামান্য (humble) হারিয়া মণ্ডলের পরিবর্ত্তে দেবতা শিবকেই আপন জন্মদাতা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের এই জন্মবৃত্তান্ত একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। রূপান্তরিত অবস্থায় সমসাময়িক দিল্লীদরবারে পর্য্যন্ত ইহা ব্যক্ত ছিল। আকবরনামায় মহাদেবের বরে বিশ্বসিংহের জন্ম লিখিত আছে। তাঁহার পিতা তুলনায় পুত্র অপেক্ষা নিতান্ত সামান্য ছিলেন না। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর গোয়ালপাড়া জেলায় সণকোষ ও মনাস নদের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডের তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বজাতির দ্বাদশটী শ্রেষ্ঠ বংশের উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল। তাঁহার উদ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষের পরিচয় পর্য্যন্ত প্রকাশ রহিয়াছে। দিল্লীশ্বর শেরসাহ ও মারহাট্টারাজ শিবাজীর পিতার পদমর্য্যাদা তুলনায় বিশ্বসিংহের পিতার পদমর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত ছিল না। হরিদাস বা হারিয়ার মণ্ডল উপাধি তাঁহাকে রাজা সপ্রমাণ করিতেছে। অভিধানে মণ্ডল অর্থে এক প্রকার রাজা। মণ্ডধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—ভূষিত করা। মনু ও শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থে দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের উল্লেখ আছে। হাণ্টার হরিদাসকে এক জন দলপতি বা সরদার (chief) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠান-রাজত্বকালে ১৪ জন চৌধুরী ও ১২ জন মণ্ডল বঙ্গরাজ্যে বিশেষক্ষমতাপন্ন ছিলেন; অর্থাৎ, মণ্ডলেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্ত ছিলেন। ‡ পাঠান-আধিপত্যের বহু পূর্ব্ব হইতে 'মণ্ডল' উপাধির ব্যবহার ছিল। বঙ্গীয় গুপ্তরাজগণের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে 'মণ্ডলাধিকরণ' বলিত। §

---

* ঐতিহাসিক চিত্র; ১৩১৭, ৫১৪ পৃঃ।

† "ব্রাহ্মণ্যাম্ বধূতাচ্চ নাথঃ সম্ভূত এব হি।" ইতি পরাশর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে অবধূতের (শিবের) ঔরসে "নাথ" উৎপন্ন।—জাঃ কৌমুদী ৩৪—৩৫ পৃঃ।

‡ গৌড়ের ইতিহাস; ২য় খণ্ড ২০৯, ২১০, ২৫৮ পৃঃ।

§ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস"; ১৫ পৃঃ।

মেজর কণ্ডর তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপিনী আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে এমন ৭০টী ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির ভাষায় দৃষ্ট হয়। * বহিঃসংস্রবের প্রসঙ্গ পরিহার করিলে এক জাতির মধ্যেই ভাষা কত পরিবর্ত্তনশীল, ঋগ্বেদ হইতে তাহার প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থার সমুদ্র (আকাশ), স্বসা (সেবাকারিণী), জার (স্বামী) প্রভৃতি শব্দ এখন কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যম (সূর্য্য), বৃহস্পতি (বাক্ দেবতা), সরস্বতী (জলদাত্রী) প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ এখন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের শব্দার্থ ১০ মণ্ডলেই পরিবর্ত্তিত লক্ষ্য হয়।

কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণতঃ দক্ষিণ-বঙ্গের কথিত ভাষার সহিত এতদঞ্চলের কথিত ভাষার মূলে কোনও অনৈক্য নাই; কেবল স্থানভেদে উচ্চারণ বৈষম্য বিদ্যমান। দক্ষিণ-বঙ্গের পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত উত্তর-বঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান ছিল; তাহার ফলে পালি ও প্রাকৃতের উচ্চারণ ও লেখনপদ্ধতি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিবেশী নেপালী, ভূটীয়া ও কতিপয় পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতির ভাষার শব্দ এতদঞ্চলের কথিত ভাষায় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে।

'কোচ ভাষা' নামে একটী পৃথক ভাষার শব্দ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। † সংগৃহীত শব্দগুলি যে দেশজ, এবং বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও তাহার ব্যবহার আছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা পুনরুল্লেখমাত্র। ‡

নাম।

কথিত আছে, কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহার-ক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি। কোচকুমারী ও মহাদেবের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়াও, কোচবিহার নামের উৎপত্তি অনুমান করা হয়। কেহ কেহ সপ্তকোষ নদের তটবর্ত্তী বলিয়া, 'কোষ' হইতে 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। যথা গোদাবরী প্রদেশ, নর্ম্মদা প্রদেশ ইত্যাদি। যোগিনী তন্ত্রে 'কোষ' দেশের নাম পাওয়া যায়। পীঠমালায় এই দেশ 'কোচবধূপুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

---

* Old Testament history.

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা; ১০ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

‡ উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী; ২ ভাঃ, ১০৮ পৃঃ।

কথিত আছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর 'কোচে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইতে 'কোচ' নামের উৎপত্তি। পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত 'কুবাচ' অর্থাৎ মন্দভাষাভাষী হইতেও 'কোচ' নামের উৎপত্তি অনুমান করা হয়। ১৭শ শতাব্দীর আলমগীরনামায় কোচ জাতির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

"সেই দেশ 'ভিতর বন্দ' এবং তাহার বহির্ভাগ 'বাহার বন্দ' নামে পরিচিত। * * * এবং তথায় দুই প্রকার জাতি বাস করে। এক 'মছাহ' (মেছ) তাহারা ভিতর বন্দে, অপর 'বাহার' তাহারা বাহার বন্দে বাস করে। কোচবিহার নামের উৎপত্তি উক্ত 'বাহার' জাতি হইতে। আসাম রাজ্য 'কোচ আসাম' নামে অভিহিত। সে দেশেও অনেক 'কোচ' বাস করে। * * * 'বাহার' জাতি শ্যামবর্ণ ও গমের রংবিশিষ্ট। 'মছাহ' জাতি দেখিতে গৌর-বর্ণ। ইহারা যোদ্ধৃজাতি; বিষ মিশ্রিত তীর ও তরবার ইহাদের অস্ত্র।" ফাতে-হায়ে-ইব্রিয়া পুস্তকে প্রকাশ যে, ভূটীয়া ভাষার সহিত কোচ জাতির ভাষার ঐক্য আছে। রিয়াজ-উস্-সালাতিনে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। সার অ্যাসলি ইডেন তাঁহার ভূটান মিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভূটীয়া জাতির ভূটান রাজ্যে বসবাস দুই শত বৎসরের অধিক নহে। তৎপূর্ব্বে 'টেফু' নামক কোচবিহারবাসী এক শ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক নিম্নভূমিতে তাড়িত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে—

কুচ, কূচ (কুচ্—সংকুচিত হওয়া) পয়োধর।

কোচ (কুচ্—তুচ্ছ হওয়া) জাতিবিশেষ, তিওর।

কুবচ (কু-কুৎসিত বচ—বলা) কটুভাষী, পরনিন্দক।

বিশ্বকোষে কোচ শব্দের সঙ্কোচ অর্থ সমর্থিত হইয়াছে। বিহার অর্থে, ক্রীড়া। বৌদ্ধ যতিগণের মঠ বা আশ্রমকেও বিহার বলিত। হাণ্টার শেষোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাটনার অন্তর্গত 'বিহার' নামক স্থানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত ছিল; তাহা হইতে ঐ স্থান, এবং উত্তরকালে এক বৃহৎ ভূভাগ 'বিহার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচবিহার অঞ্চলে বৌদ্ধ মতের প্রচার থাকা সম্বন্ধে কোনও তর্ক উঠিতে পারে না; বৌদ্ধ-বিহারের পূর্ব্ব অস্তিত্বও অসম্ভব নহে। কোচবিহারের উত্তরে মহাকাল, গোয়ালপাড়ায় মঙ্গলচণ্ডী ও যোগীঘোপা, কামরূপে হাজো ও মঙ্গলচণ্ডী, নওগাঁয়ে যোগীজান, দরঙ্গে সিঙ্গরী নামক দেবস্থান, লক্ষীপুরের খামতি-রাজ্যস্থ বৌদ্ধ দেবালয় ও কামতাপুরের (কোচবিহার) শিলামূর্ত্তিগুলি, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক

যুগের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। অল্পদিন হইল, কোচবিহারে তাম্রনির্ম্মিত বজ্রপাণি বুদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। * বগুড়া মহাস্থানের নিকট বিহার ও ভাসুবিহার গ্রাম অবস্থিত; কানিংহামের মতে, ঐ সব স্থানে বৌদ্ধবিহার স্থাপিত ছিল। বৌদ্ধযুগে মিথিলাদেশ উত্তরবিহার নামে পরিচিত হইত। রাজসাহী দেওপাড়ায় প্রাপ্ত শিলাফলকে বিজয়সেনের প্রসঙ্গে ও মাণিকদত্তের পুরাতন মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকে, এক কলিঙ্গদেশ বা নগরের নাম আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে, ঐ কলিঙ্গ হিমালয়-পাদদেশে অবস্থিত বৌদ্ধতান্ত্রিকতার একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। কোচবিহার অঞ্চলের ময়নামতীর গীতে কলিঙ্গ বাজারের নাম আছে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভনড্যান ব্রুক কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে, কোচবিহারের উত্তরে এক 'কলিঙ্গ' স্থান লাভ করিয়াছে; + ইত্যাদি কারণে কোনও বৌদ্ধবিহার হইতে 'বিহার' নাম সৃষ্ট হইয়া, উত্তরকালে তাহার সহিত 'কোচ' শব্দ যোগ হওয়া সম্ভবপর মনে হয়।

মোগল সংস্রবের পূর্ব্বে 'কোচবিহার' নাম ছিল না। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বসিংহের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বার্দ্ধ 'কোচহাজো' ও পশ্চিমার্দ্ধ 'কোচবিহার' নামে পরিচিত করিতে আরম্ভ করেন। ১৮শ শতাব্দীর লিখিত রাজকীয় কাগজপত্রে কেবল 'বিহার' নাম দৃষ্ট হয়। নেপালে আবিষ্কৃত ১৭শ শতাব্দীর শিলালিপিতে 'বিহার' নাম ক্ষোদিত আছে। ১৬শ শতাব্দীতে মহারাজ নরনারায়ণ ও আহম রাজের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার ও উকীল দ্বারা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আসামবস্থি পত্রে তৎপ্রসঙ্গে কেবল 'বিহার' নাম মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্বকোষে প্রকাশ,—মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্ব্বে কেবল 'বিহার' নাম ছিল, বিহার প্রদেশ হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য 'কোচবিহার' নাম হইয়াছে; বুকাননও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীতে রচিত শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদরদেবের জীবনচরিত পুস্তকে কেবল 'বিহার' নাম লিখিত আছে। ১৮শ শতাব্দীর মেজর রেণেল অঙ্কিত মানচিত্রে রাজ-

* গৌড়ের ইতিহাস; ২ খণ্ড ১১৩ পৃঃ। স্থানীয় অনুসন্ধানে এই আবিষ্কারের সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

+ উড়িষ্যার, গঞ্জামের দক্ষিণে, গোদাবরীতীরে ও গঙ্গাসাগরের নিকট কলিঙ্গদেশের অবস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। পুরাণোক্ত মহাদেবের লীলাস্থান একাম্রক্ষেত্র, এই কলিঙ্গদেশে কথিত হয়। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে, শিবপ্রিয়া বিশ্বসিংহমাতা, ব্রহ্মশাপে একাম্রক্ষেত্রে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন।

ধানীর 'বিহার' নাম দৃষ্ট হয়। ভূটানের দেবরাজ এ পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজকে 'বিহারেশ্বর' লিখিয়া থাকেন। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত মিঃ মার্টিনের পুস্তকে কেবল 'বিহার' নামই দৃষ্ট হয়। এই সময়ে 'বিহার' ও 'কোচবিহার' উভয় নামই লিখিত হইত। হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, কোচ-বিহার রাজদরবারে 'নিজ বেহার' নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপসংহার।

যত দূর আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কোচজাতি—

১। পার্ব্বতীয় অনার্য্য ও অসভ্য জাতি নহেন; ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দূর-বর্ত্তী শাখা ও পরবর্ত্তী সংস্কারহীন, এবং—

২। মঙ্গোলীয় অর্থাৎ উঃ পূঃ দেশ হইতে আগত নহেন; দক্ষিণ পশ্চিম দেশ হইতে আগত, এবং—

৩। উপাসনা-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড ও ভাষা ইত্যাদিতে তাঁহাদের কোনও পৃথক বিশেষত্ব নাই; দেশ ও কালভেদে ঐ সমস্ত গৃহীত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এবং—

৪। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রমাণ, অন্যান্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রমাণ অপেক্ষা ন্যূন নহে, এবং—

৫। মঙ্গোলীয় বা অনার্য্য রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া থাকিলেও শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের হানি হয় নাই, এবং—

৬। ১৫শ শতাব্দী, অর্থাৎ, দেবীবর মিশ্রের মেল-বন্ধনের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা এত হীন ছিলেন না।

শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ।

অফলন্ত উদ্ভিদ।

যে কোনও বৃক্ষ হউক, বা লতা হউক, রোপণ করিলেই যে তাহা ফল, ফুল প্রদান করিবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। কয়েকটী কারণে বৃক্ষলতাদি ফল বা ফুল ধারণ করিতে পারে না। আবার অনেক গাছ ফল ফুল প্রদান করিলেও স্ব স্ব বংশগত গুণানুরূপ ফুল বা ফল প্রদানে বিমুখ হয়। এই শ্রেণীর কতক

উদ্ভিদ কৃত্রিম উপায় সকলের কঠোর প্রয়োগে কোনও ক্রমে ফল বা ফুল ধারণ করে, কিন্তু বংশগত গুণ বিস্মৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমলার কথা বলা যাউক।

আমরা চিরদিন জানিয়া আসিতেছি যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলাই কমলার একমাত্র উৎপত্তিস্থান। ইদানীং জানিয়াছি—নাগপুর ও দারজিলিং পাহাড় অঞ্চলেও কম্‌লা জন্মিয়া থাকে। উক্ত কয়টী স্থানেই কম্‌লার উৎপত্তি আবদ্ধ নহে; ভারতের মধ্যে অপরাপর স্থানেও কম্‌লা জন্মে; কিন্তু মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার স্বাতন্ত্র্য হেতু জেলা বা প্রদেশবিশেষের কম্‌লা ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। আসামের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত নাগাপাহাড় অঞ্চলেও যথেষ্ট কম্‌লা জন্মে, মহীশূরেও কম্‌লা উৎপন্ন হয়। যত প্রকার কম্‌লা খাইয়াছি, মহীশূরজাত কম্‌লা যত বড়, এবং যেমন সুমিষ্ট হয়, এরূপ কম্‌লা ভারতের আর কুত্রাপি হয় না। আকার ও মিষ্টতা ছাড়াও মহীশূর-কম্‌লার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ফলের ভিতরের কোয়ামধ্যস্থিত দানাসমূহকে কোয়ার আবরণ হইতে সহজে পৃথক করিতে পারা যায়। ফলের গুণাগুণ, আবহাওয়া ও মাটীর উপর নির্ভর করে। সে সকল গাছের কলম বা চারা দেশান্তরে,—ভিন্ন আবহাওয়ায়, ভিন্ন মাটীতে স্থানান্তরিত হইলে, সেই সকল গাছের এবং তাহাদিগের ফলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত স্থলবিশেষে স্থানপরিবর্ত্তনহেতু আদৌ ফলধারণ করিতে না পারে।

এইরূপ, যে সকল গাছ স্থানপরিবর্ত্তনফলে আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হয়, তাহাদিগের প্রবাসস্থানে তজ্জাতীয় স্থানীয় বীজের চারার কলম করিলে তাহারা ফল প্রদান করিতে পারে, এবং জাতীয় গুণ বজায় রাখিতে পারে। বাঙ্গালা দেশ কম্‌লার উপযোগী স্থান নহে, কিন্তু বিদেশ হইতে আনীত কম্‌লার কলম স্থানীয় কাগজী বা পাতি লেবুর চারার সহিত জোড় কলম করিলে, কিংবা তাহাতে চোক বা চোখ কলম করিলে, কম্‌লার আসল প্রকৃতি কতকটা রক্ষিত হইতে পারে।

ম্যাঙ্গোষ্টিনের আদিম নিবাস স্থান ব্রহ্ম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ। উক্ত বৃক্ষ নিম্ন বা পশ্চিম বঙ্গের কুত্রাপি ফল প্রদান করে না, কিন্তু দ্বারভাঙ্গা ও দিনাজপুরে তাহা ফলে। দিনাজপুর ও দ্বারভাঙ্গার আবহাওয়ার বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয় স্থানেই তাহারা ফলশালী হয়; কিন্তু নিম্ন বঙ্গ—কলিকাতা অঞ্চলের সহিত দিনাজপুরের আবহাওয়ার অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমোক্ত স্থানে ফল হয় না। এ সমস্যার সমাধান কঠিন।—লক্ষ্ণৌ, সাহারাণ-

পুর, নাভা, (পঞ্জাব) প্রভৃতি স্থানে বেদানা, লকেট, দ্রাক্ষা প্রভৃতি বত প্রচুরপরিমাণে ফলে, এবং ফল সকল এত বড় ও মধুর হয় যে, বাঙ্গালাদেশজাত সেই সকল ফল কিছুতেই তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। বাঙ্গালায় পেয়ারা যেরূপ পর্য্যাপ্ত ফল ধারণ করে, পঞ্জাবে আপেলও সেইরূপ অপরিমিত ফল প্রদান করে; কিন্তু সেই আপেল বাঙ্গালা ও বেহার অঞ্চলে বহু চেষ্টা ও যত্নেও ফল ধারণ করে না।

আমরা কোনও বিদেশ হইতে আনীত উদ্ভিদকে স্বাভাবিক আবহাওয়া দিতে পারি না—ভূগর্ভের পরিগঠন সংস্কৃত করিতে পারি না, বারিপাতের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি না; ফলতঃ সকল রকম ফলের গাছ রোপণ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারি না। ইহাদিগকে লাজুক (shy) গাছ কহে। পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও এ আচরণ দেখা যায়। প্রবাসে প্রেরিত হইলে স্থানীয়তার বিশেষত্বহেতু ইহাদিগের—অবয়বসমূহের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের গঠনাদিরও পরিবর্ত্তন হয়। প্রবাসী জীব বা উদ্ভিদের সন্তানোৎপাদনে পরাঙ্মুখতা বা অক্ষমতার ইহাও একটী বিশেষ কারণ। এ সম্বন্ধে প্রাকৃত-তত্ত্ববিদ্ ডারউইন যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

".........Changed conditions act in two ways, directly on the whole organisation or on certain parts alone, and indirectly through the reproductive system. In all cases there are two facters, the nature of the organism, which is much the most important of the two, and the nature of the conditions." *

স্থানপরিবর্ত্তন, খাদ্যের বিভিন্নতা প্রভৃতি কারণে অনেক গাছ ফল-পুষ্প-ধারণে বিমুখ হয়। ঈদৃশ অবস্থায় কোনও কোনও উদ্ভিদ গর্ভধারণ করে না। তাহাদিগের স্ত্রী-পুষ্প বা স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয় পুং-পুষ্পের রেণু ধারণ করিতে অক্ষম; কিংবা গর্ভসঞ্চার হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না। যে কারণে অনেক স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা হয়, ঠিক সেই কারণে অনেক পুষ্পও বন্ধ্যা হয়, কিন্তু কি কারণে হয়, তাহা বলা যায় না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

---

* Darwin's Origin of Species. Page 99.

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে 'ক্ষণিক' সুখের উৎসবে মাতিয়া চিরকাল বাসনাময় প্রেম-ভালবাসার গানে উন্মত্ত ছিল, এ কথা তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্য-গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে মনে হয় না। "নদীজলে পড়া আলোর মতন" তাঁহার কবি-জীবনের উষাকালে "প্রতি পলকের রাগিণী" যে ঝলকে ঝলকে ছুটিয়া যাইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কালিদাস, সেক্ষপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, সকলেই জীবন-পালার উদ্বোধনে "হেলার ভরে খেলার মত" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে নিজের সম্বন্ধে এই কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

'শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদের গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে।'—উদ্বোধন।

রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের কবিতায় যদিও বিচ্ছিন্ন ভাবের সমাবেশ, সকল স্থানে না হউক, কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়, তাহা হইলেও এই সময়কার প্রেম-ভালবাসার গানগুলির ভাষা যে আধুনিক মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের গানের উৎস হইতে এক বিন্দু-মাত্র লইয়া আমরা কৌতূহল নিবৃত্তি করিব

'ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহ' 'লহ' বলে' পরে আরাধন
পরের চরণে আশা।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা'।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখনাশা'।"

গানটি শুনিয়া বিদ্যাপতির "বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু" মনে পড়ে। "দরশ পরশ" কথা দুইটি বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল বৈষ্ণব কবি-ই ব্যবহার করিয়াছেন।

"দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।"—জ্ঞানদাস।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কেবল যে অনেক পুরাতন শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি প্রেম-ভালবাসার গানের উপযোগী অনেক ভাবও বৈষ্ণব-কবির গীতি-কবিতা হইতে আহরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্ন-ভঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছিলেন—

"পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।"

রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার এক জন নায়িকা বলিয়াছেন,—"শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে।"

জ্ঞানদাসের রাধা পথের মাঝে কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন,—

"সখি হে পেখনু পন্থকি মাঝ।"

রবীন্দ্রনাথের রাধারও পথেই প্রেমিকের সঙ্গে দেখা।

"দাঁড়ায়ে ছিলাম পথের ধারে সহসা দেখিলেম তারে—"

ভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির প্রভাব "ভানুসিংহের পদাবলী" ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক গানে ও কবিতায় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া তাহার আলোকে নিজের কাব্যের কোনও কোনও স্থানে নায়িকার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিনকতক বৈষ্ণব কবির পাঠশালায় প্রেমের পাঠ পড়িয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণব কবির ও রবীন্দ্রনাথের রমণীপ্রেম এক জিনিস নহে।

রাধার প্রেম ভক্তির চিরসহচরী। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা শিক্ষিতা বাঙ্গালিনী। তাহার প্রেম অনুরাগমাত্র। রাধার প্রেমের দৃষ্টি ঊর্দ্ধে। প্রতীচ্য ভাবে শিক্ষিতা ঊনবিংশ শতাব্দীর রাধার প্রেমের দৃষ্টি ধরার দিকে। প্রেম-ভক্তি বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা-ই বৈষ্ণব কবির রাধা দেবতার চরণে অর্পণ করিয়াছে। প্রেম ভালবাসা বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহারই হার গাঁথিয়া রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বঁধুর গলায় পরাইয়া দিতে চাহে। রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্য সম্বন্ধে "বৈষ্ণব কবিতা" নামক পদ্যময় রচনায় টীকা করিয়াছেন।

"আমাদেরই কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়!
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

বাঙ্গালী প্রেমিক প্রেমিকা শিক্ষিত না হইলে বৈষ্ণব সমাজের অবনতির যুগে প্রেম-ভক্তির যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রেম-ভালবাসারও সেই অবস্থা ঘটিল। অশিক্ষিত, কুশিক্ষা ও নামমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক যুবতীর হৃদয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভালবাসার গান কিন্তু কতকটা লালসার ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল বাঙ্গালী-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি এই সকল প্রেম-ভালবাসার কোনও কোনও গানে শুনা যায় বলিয়া আলস্যময় বাঙ্গালী-জগতে সেই অল্পসংখ্যক গানের এত আদর। উদাসীনভাবে যে জাতি বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাদের চিন্তাশূন্য অন্তরের মধুর ভাবগুলিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এইরূপে সঙ্গীতাকারে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

বাঙ্গালীর প্রাণে এত সাধও ছিল! মরমের কথা, হৃদয়ের কথা শুনিতে শুনিতে অবসাদজড়িত চিত্ত অবশ হইয়া পড়ে। "হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু কূল ভেসে যায়।" "মরমে কিসের হুতাশ," "কি বাসনা, কি বেদনা গো" কোথা হইতে যে "কোথাকার কোন্ পবনে" সহসা বহিয়া আসে,

ঠিক করিয়া উঠা যায় না। হৃদয়ের এ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? কবি বলেন—

"হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।"

বাঙ্গালী প্রেমিকের জীবনে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। "শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।" ইহার উপর আবার প্রেমিকের ভয় হয় পাছে এই "যাওয়া আসা" করিতে করিতে, পরিচয় গাঢ় হইয়া প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বে "যদি দূরে যাই চলে।" "যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে!"

'প্রমোদ কাননে' মৃদু মৃদু গান গাহিয়া, বীণা বাজাইয়া, 'সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে' নাচিয়া, হাসিয়া, আকাশের তারা গণিয়া 'চাঁদিনি যামিনী' ভোর করিয়া দিব—এইরূপ স্বপ্নময় বাসনা যাহাদের মনে উদয় হয়, কবি তাহাদেরও মুখে শুনিয়াছেন, 'প্রাণ কেন কাঁদে রে!' রবীন্দ্রনাথের গানের বর্ণে বর্ণে একটা বৃহৎ অতৃপ্তির ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। বিশ্বাসের অভাব কোনও কোনও প্রেম-ভালবাসার গানে পাঠকের মনে বিস্ময়ের উৎপাদন করে।

"কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি?
আদর করিতে মোরে চায় কতবার
সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার।"

কবির গানে শুষ্ক আশালতা, হৃদয়ের ঝরা ফুল, 'শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়' প্রভৃতির উল্লেখ প্রেমিক-প্রেমিকার মরুময় হৃদয়ে দারুণ শোকের হাহাকার উত্থিত করে। 'মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায়।' যেখানে 'প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলা ফেলা', সেখানে যে নানা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে পুরুষ জাতির হৃদয়হীন উদাসীনতার উল্লেখ করিয়াছেন—

"এরা, চাহিলে আপন মন গোপন রাখে।
এত লোক আছে কাছে না ডাকে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকার ভালবাসা 'কেবলি যাতনাময়', 'কেবলি চোখের

জল', 'কেবলি দুখের শ্বাস।' তাঁহার অনেক কবিতায় ও গানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়ে'র কাহিনী তিনি পাঠ করিয়াছেন। যদি কেহ ভবিষ্যতে বাঙ্গালী-হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসার ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা হইতে অনেক রহস্যপূর্ণ উপাদেয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'বৈষ্ণব-কবিতা' নামক মনোহর রচনায় রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে।"

রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়া, কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকেও এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না, বরং মনে হয়, যেন কবি তাঁহার হৃদয়ের দ্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈষৎমাত্র উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে কেবল ভিতরের ছায়া ও অন্ধকার দৃষ্ট হয়। কবির হৃদয় যে কাহার জন্য ব্যথিত, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। জগতের প্রায় সকল প্রেমিক কবির এরূপ দুর্ব্বলতা আছে। পেট্রার্কের ন্যায় কয় জন কবি লরার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন? তাঁহার ন্যায় কয় জন কবি সমালোচনার তীব্র কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া লরার অনুসরণ করিয়াছেন? আর 'চণ্ডে ক্ষ্যাপা'র ত কথাই নাই। চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত কবি জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। চণ্ডীদাসের জাতির কথা স্মরণ করিলে রজকিনী রামীর প্রতি তাঁহার গভীর প্রেমের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রাধা-চরিত্র সেই জন্য তিনি যে ভাবে দেখাইতে সমর্থ

হইয়াছেন, তাহার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই স্বর্গীয় আদর্শ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানের হৃদয়েও রাধা-প্রেমের সুধা বর্ষণ করিয়াছিল, আর তাহার ফলে বঙ্গীয় কাব্য-কুঞ্জে মুসলমান বৈষ্ণব কবির অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের অন্তর্দৃষ্টি আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাঁহার অপরিণত বয়সের কবিতায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। ফেনপুঞ্জের বহু নিম্নে যে অগাধ জলরাশি রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যৌবনে তাহাতে অবগাহন করে নাই। আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, অতৃপ্তির তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় বিক্ষোভিত হইয়াছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রেম যতটা ব্যাপক, ততটা গভীর নহে। একটি হৃদয়ের অখণ্ড প্রেমভাব তিনি বর্ণন করেন নাই। অসংখ্য হৃদয়ের টুকরা ভাব লইয়া তাঁহার গীতি-কাব্য। সামাজিক বাধ তাহার আদর্শ। সেই কারণেই তিনি তাহাকেও তাঁহার কাব্যের মূল আদর্শ করিতে পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, গভীরতা বলিয়া জিনিসটা আপাততঃ বাঙ্গালী-হৃদয়ের কোনও স্থানে নাই। বহির্জগতেও প্রেমের স্রোতে সর্বত্র চর পড়িয়া আসিতেছে। বঙ্গের নদ নদী তরল প্রেমের বন্যায় ফেন ভাসাইয়া দিতেছে, কিন্তু প্রেমের খাত দিন দিন বালুকা ও মৃত্তিকায় ভরিয়া উঠিতেছে।

বিশ বৎসর পূর্বে সন ১৩০৩ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হয়, তখন তিনি গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—'কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পোনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের পনের ষোল বৎসর বয়সের লেখা······গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।' এত অল্প বয়সে কোনও কবি ডুবিতে শিখে না। এ বয়সে প্রেম আভিধানিক সংজ্ঞার বাহিরে যাইতে পারে না। তবে, বাঙ্গালীর অকালপক্কতা বলিয়া একটা জাতীয় গুণ আছে, যাহা অধিক মাত্রায় প্রতিভাবান্ কবিবিশেষের রচনায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের যৌবন-স্বপ্ন যখন চিরদিনের তরে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন।

যৌবনের কল্পনা-প্রসূত কতকগুলি প্রেমের কবিতা ও গান লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর ক্রমিক

সংস্করণ হইতে বুঝা যায়। তের বৎসর পূর্ব্বে সন ১৩১০ সালে রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, তাহার ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—'এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।' এই দ্বিতীয় সংস্করণে যে কবিতাগুলি বাদ গিয়াছে, সেগুলি যে একেবারে অপদার্থ, তাহা নহে; তবে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনার সহিত কিছুতেই খাপ খায় না। কিন্তু যে কবিতাগুলিকে রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদের কলেবরেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বয়সের পরিণতির সহিত কবির বিচারশক্তি যে বাড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অভিব্যক্তির নিয়মের অধীন, এ কথা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ যে কিরূপে সপ্রমাণ করেন, তাহা সকলের বোধগম্য হওয়া দুরূহ ব্যাপার। যে কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিতে যত্নবান হন, কাব্যজগতে তিনি যে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সন ১৩০০ সালে কাব্যানুরাগী লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় 'সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' নামক কাব্য গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি কবিকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়াছিলেন। অথচ উল্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'মানসী'র কয়েকটী কবিতা স্থান পায় নাই, এবং যেগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলির আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোরম করা হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতার ঝঙ্কার ও ভাববিহীন অনেক শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে; ফলে সেগুলি দোষশূন্য হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন কবিতায় ভাষার পারিপাট্য ও চারুকৌশল লক্ষিত হয়। কবিতাপাঠে প্রাণের ভিতর যে উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়, অতিদীর্ঘ কবিতায় ভাষা ও ভাবে সামঞ্জস্যের অভাব হইলে সেই উচ্ছ্বাস হৃদয়কে প্লাবিত না করিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভাবের বিবৃতি যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। ভাবের ও ভাষার পুনরুক্তি আবার নিতান্ত অসহনীয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা-ভঙ্গীতে যে নূতনতা, মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা যতই কেন অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে প্রকাশ পাউক না, যে শিল্পকলার সাহায্যে তাঁহার লেখনী সুন্দর কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ

করিল, তাহার পরিণতির জন্ত কবিকে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যৌবনের ভ্রান্তি, রূপের মোহ যখন কবির মন হইতে দূর হইল, তখন তিনি প্রেমের শক্তি অনুভব করিলেন; আর সেই সঙ্গে তাঁহার কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য্য নূতন ও উজ্জ্বলতর ছটায় ফুটিয়া বাহির হইল। 'মদন-ভস্মের পূর্ব্বে' ও 'মদন-ভস্মের পর' এই যুগল কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রেম যে যৌবন-স্বপ্ন নয়, তাহা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার ভাব ভাষা ছন্দ বোল কলায় পরিপূর্ণতা লাভ করিল। উৎকর্ষ এইরূপেই প্রত্যেক প্রতিভাশালী লেখকের আয়ত্বাধীন হইয়া থাকে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলালকে মরিতে দেখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তর-রাজ্যে যে পুরাতন ভাবগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা 'মানসী'র 'ভুলভাঙ্গা' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতায় বেশ বুঝিতে পারা যায়।—

"বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।"—ভুল-ভাঙ্গা।

যখন আঁখিতে প্রেমের ঘোর ছিল, তখন কবি বাহুলতা সম্বন্ধে 'কড়ি ও কোমলে' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার শেষ দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"লতারে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।"—বাহু।

'কড়ি ও কোমলে' কবি 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা' প্রভৃতি যে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেগুলির রচনাকে 'আকাশ-কুসুম-বনে স্বপন-চয়ন' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কবির হৃদয়ের দেবতা মদন তখনও ভস্মীভূত হয় নাই। 'কড়ি ও কোমলে'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এই কবিতা-

গুলিকে 'যৌবন-স্বপ্ন' নামে নূতন পর্য্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে রক্ষিত হইয়াছে। মদন-ভস্মের পর 'মানসী'র অধিকাংশ কবিতা 'প্রেম' নামে নূতন নিবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিরহানন্দ' (১) প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রেমের গাথা শুনাইতে শুনাইতে রূপের জগৎ হইতে ভাবের জগতে লইয়া যায়। এই প্রেমের গানে কিশোর কবির বীণার রাগিণী শুনা যায় না। 'মানসী'র পর 'সোনার তরী'তে ও তৎপরে 'নৈবেদ্যে' ভাবের গভীরতা ও বিশালতা ভাষার ও ছন্দের গাম্ভীর্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রেমের মাধুর্য্যময় সুন্দর চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছে।

রমণীর রূপরাশির প্রশংসা সকল কবির মুখেই শুনা যায়। প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নারী-চরিত্রের সৌন্দর্য্যের কথা শতমুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুন্দরী কল্যাণী আনন্দময়ী বিষাদিনী তপস্বিনী নারী কবির মানসীরূপিণী প্রতিমা।

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।"—মানসী।

পূর্ব্বেকার সে ভাষা পর্য্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। 'কৈশোরকে' শুনিয়াছিলাম,—

"বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল মুখানি
কুসুম-কুঞ্জ কর আলা!"—নিশীথ গীতি।

'কড়ি ও কোমলে' রমণীকে উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!"

---

(১) এই কবিতা যখন প্রথমে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার 'বিরহ মিলন' নাম ছিল।

তখনও কবি নারীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। ভাষায় ভাবে ছন্দে সেই জন্য এত দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা। গাম্ভীর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব ও অস্পষ্টতা, এই দুইটী দোষ 'কড়ি ও কোমলে' রমণীর রূপ-বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যখন নারী-চরিত্র সম্বন্ধে উন্নত ভাব আয়ত্ত করিতে পারিল, তখন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষায় তাঁহার কবি-হৃদয় ব্যক্ত হইতে লাগিল।

"তুমি এ মনের সৃষ্টি, তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরাণে।"—নারী।

কবি পূর্ব্বে দুইটি বড় বড় চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিতে পান নাই, এখন মানস-নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছেন ; আর যাহা দেখিতেছেন, তাহার চিত্র আঁকিয়া আমাদিগকে দেখাইতেছেন।

"যতবার দিক আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্ত্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।"—প্রিয়া।

প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রেমভাব কিরূপে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সকল পাঠ করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। যখন চোখের নেশা কাটিয়া গেল, তখন প্রেম তাঁহার সাধনার সামগ্রী হইল। এই অবস্থায় নারীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে কবি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

"যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।

যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি' বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম-প্রতিরূপ।"—ধ্যান।

নারীর দেবীভাব এমন কবিত্বময়ী রচনায় আর কোনও বাঙ্গালী কবি বর্ণনা করেন নাই। কবির আদর্শ যে এখন স্বর্গীয় প্রতিভায় মণ্ডিত হইয়া তাঁহার কল্পনার সাথী হইয়াছে, তাহা আরও অনেক কবিতায় স্পষ্ট বুঝা যায়।

"তোমার শান্তি পাছ জনে
ডাকে গৃহের পানে!
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্য কুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে' পড়ে!
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে!"—কল্যাণী।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমভাব রমণী-প্রেমের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

নির্ব্বোধের শাস্তি।

১

ছোট একখানি চালা ঘর, আর তাহারই ভিতর ছোট স্যাকরার দোকান খানি। দোকানে আসবাবপত্র যেমন কম, লোকও তেমনই বেশী ছিল না। শুধু গোকুল একা বসিয়া নিঃশব্দে কাজ করিত। একাই হাপর তাওয়াইয়া রূপা গলাইত; একাই তাহা ঠুক্-ঠাক্ করিয়া পিটিত; কখনও বা প্রদীপের শীষের উপর বাঁক-নল রাখিয়া,তাহাতে ফুৎকার প্রদানপূর্ব্বক গহনায় পান দিত। পাশেই গোপাল দত্তের বড় দোকান; সোনা রূপার যত ভারী ভারী কাজ সেইখানে যাইত। শুধু গরীব চাষা ভূষাদের রূপার মল, দরিদ্র মুসলমান শিশুর রূপার হাঁসুলি, রূপার চুড়ী পৈছা মেরামত, এইরূপ ছোট ছোট কাজই সেই

ছোট দোকানখানিতে আসিত। আর গোকুল একা সকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সেই ছোট-খাট কাজে লাগিয়া থাকিত।

কাজও যে সব সময় থাকিত, তাহা নহে। তখন গোকুল যন্ত্রপাতিগুলা একটু সরাইয়া লই কাঠখানা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িত, এবং কাশীদাসের মহাভারত-খানি খুলিয়া পড়িতে থাকিত—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্।"

অবশ্য সময়-ক্ষেপণের দিকে গোকুলের যতটা আগ্রহ ছিল, পুণ্য-সঞ্চয়ের দিকে ততটা আগ্রহ ছিল না।

পড়িতে পড়িতে গোকুল কখনও কখনও ঘুমাইয়া পড়িত। তখন একটী নয় দশ বছরের মেয়ে আসিয়া 'গোকুলদা, গোকুলদা' বলিয়া ডাকিত। কিন্তু দুই তিন ডাকেও গোকুলের ঘুম না ভাঙ্গিলে সে আস্তে আস্তে আসিয়া কাছে বসিত, এবং গামলা হইতে একটু জল লইয়া নিদ্রিত গোকুলের নাসারন্ধ্রে বা কর্ণ-বিবরে প্রদান করিত। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে সে আগে পরিধেয়ের আঁচলটা নিজের মুখে বেশ করিয়া চাপিয়া দিত; পাছে উদ্গত হাস্যের বেগে এই আরব্ধ রহস্যজনক কার্য্যটা অসম্পন্ন থাকিয়া যায়!

অঙ্গে জল স্পৃষ্ট হইবামাত্র গোকুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং সে হুঙ্কার দিয়া 'পেসাদী!' বলিয়া উঠিয়া বসিত। পেসাদী আর হাসি চাপিতে পারিত না, মুখে কাপড় চাপা সত্ত্বেও সে হাসিয়া উঠিত, এবং সে চাপা হাসি শীঘ্রই কাশীতে পরিণত হইত। গোকুল রাগিয়া বলিত, 'দেখ্ পেসাদী, তুই ভারি দুষ্টু হ'য়েছিস্। কাণে জল দিলি কেন বল্ তো?'

পেসাদী ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে উত্তর করিত, 'তুমি ঘুমুচ্ছিলে কেন বল তো?'

'আমার ঘুমুতে ইচ্ছে হ'য়েছে, তাই ঘুমিয়েছি।'

'আমারও তোমার কাণে জল দিতে ইচ্ছে হ'য়েছে, তাই দিয়েছি।'

রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে গোকুল হাতে মুখে জল দিয়া পেসাদীকে তামাক সাজিতে আদেশ করিত। পেসাদী কোনও দিন বিনা বাক্যব্যয়ে তামাক সাজিতে বসিত; কোনও দিন বা মুখ ভার করিয়া বলিত, 'আমি তোমার তামাক সাজার চাকরাণী নাকি?'

গোকুল হাসিয়া বলিত, 'ছিঃ, আমি কি তাই বলছি।'

'তবে কি বলছো?'

'বলছি যে তুই চমৎকার তামাক সাজতে পারিস্, তোর সাজা তামাক বড্ড মিষ্টি লাগে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

এই প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া পেসাদী তামাক সাজিতে যাইত। তার পর গোকুল তামাক খাইয়া কাজে বসিত; পেসাদী সম্মুখে বসিয়া তাহার সহিত গল্পে প্রবৃত্ত হইত।

খানিক গল্প করিয়া পেসাদী যখন উঠিয়া যাইত, তখন গোকুল হাতুড়ীর ঠুক্ ঠুক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিত—

এত সাধের বাগান আমার, ফুটলো নাকো ফুল।

২

স্বর্ণকার জাতির মধ্যে যে গোকুলের মত নির্ব্বোধ ছেলে জন্মিতে পারে, ইহা গোকুলকে না দেখিলে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত না। গোকুলের বাপ নকুড় স্যাকরা শুধু বুদ্ধিমান্ ছিল না, এক জন নামজাদা কারিকরও ছিল। দেশের যত লোক নকুড়ের কাছেই গহনা গড়াইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। ইহাতে নকুড়ের দোকানটা এমন জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, একা সামলাইতে না পারিয়া সে আপনার পিসতুত ভাই গোপালকে আনিয়া রাখিয়াছিল। গোপাল কাজ কর্ম্ম কিছুই জানিত না; অল্প বয়সে মা বাপ মারা যাওয়ায় গাঁজা খাইয়া, তাস খেলিয়া বেড়াইত। গোকুল তাহাকে আনিয়া হাতে ধরিয়া কাজ শিখাইয়া এক জন কারিকর করিয়া তুলিল। শুধু তাহাই নহে, বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিল।

নকুড় পিসতুত ভাইকে মানুষ করিল বটে, কিন্তু নিজের ছেলেকে মানুষ করিবার সময় পাইল না। গোকুল হাপর তাওয়াইয়া সবেমাত্র যখন সোনা রূপা গলাইতে শিখিয়াছে, তখন নকুড় হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। মরিবার সময় সে রোরুদ্যমানা পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেল, 'গোপাল রইল, ভয় কি?'

কিন্তু দিন কতক পরেই গোপাল যখন এই সামান্য দোকানের আয়ে এত বড় সংসারটা চালাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করিল, তখন গোকুলের মা ভীত হইয়া বলিল, 'ছেলেটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও না ঠাকুরপো, তা হ'লে তো ওর দ্বারাও দু'পয়সা আসতে পারবে।'

গম্ভীরভাবে গোপাল বলিল, 'ও আবার কাজ শিখবে! ওর মত বোকা কি দুনিয়ায় আছে?'

গোকুল যে বাস্তবিক বোকা ছিল, তা নয়, কিন্তু বাপ মারা যাওয়ার পর হইতে সে যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। ইহার উপর কাজ করিতে গেলে সে যখন কাকার কাছে প্রতি পদে ধমক এবং সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত খাইত, তখন তাহার অবশিষ্ট বুদ্ধিটুকুও যেন লোপ পাইয়া আসিত; চোখের জলে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া যাইত; অর্দ্ধগলিত রূপাটা হাপরেই পড়িয়া যাইত। তার পর রীতিমত প্রহার খাইয়া সে এক পাশে বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকিত।

কোনও পুরাতন খরিদ্দার আসিয়া যদি গোপালকে বলিত, 'নকুড়ের ছেলেটীকে বসিয়ে রেখেছ কেন? কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে মানুষ ক'রে নাও না।' তাহা হইলে গোপাল হাসিয়া বলিত, 'মানুষের ছেলেই মানুষ হয়, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না। আর ও হতভাগা কাজ শিখলে কি আপনাদের গয়না গড়াতে হবে?'

খরিদ্দার ইহার কারণ জানিতে চাহিলে গোপাল বলিত, 'হতভাগা কাজের কিছুই জানে না, এরি মধ্যে চুরী বিদ্যেটুকু শিখে নিয়েছে। এক ভরি রূপো গলাতে দিলে দু'আনা চুরী ক'রে বসে থাকে। এর পর ও ভরিকে ভরি পার করবে।'

খরিদ্দার গোকুলের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোপালের সততার প্রশংসা করিত।

কিন্তু কেবল সততা লইয়া থাকিলে যে সংসার-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না, এ কথা গোপাল বেশ জানিত; সুতরাং সে লোকের ব্যর্থ সমালোচনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, নকুড়েরই একখানা ঘর নিজস্ব করিয়া লইয়া, নকুড়ের স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল, এবং দোকানের অংশস্বরূপ গোকুলকে একটা সাঁড়াশী, একটা বাঁট-ভাঙ্গা হাতুড়ী, এবং সোনা ঢালিবার একটা ভাঙ্গা ছাঁচ পাঁচ জনের সাক্ষাতে ফেলিয়া দিল।

গ্রামে সৎ অসৎ দুই প্রকারের লোকই থাকে। গোপালের ব্যবহারটা যাহাদের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইল, তাহারা গোকুলকে পরামর্শ দিল, 'তোর বাপের দোকান, নিজের ঘর ভিটে; গোপালকে তাড়িয়ে দে।'

গোকুল মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'ছিঃ, কাকা যে।'

পরামর্শদাতারা বলিল, 'সাত পুরুষের কাকা! দূর বোকা।'

তাহারা গোকুলকে নির্ব্বোধ আখ্যা দিয়া নিরস্ত হইল। আর গোকুল প্রতিবেশী গগন স্যাকরার দোকানে বিনা বেতনে কাজ শিখিতে আরম্ভ করিল।

বছর দুই শিক্ষার পর যখন কাজটা কতক আয়ত্ত হইল, এবং মায়ের যে দুই একখানি গহনা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন গোকুল খুড়ার দোকানের একটু দূরে একখানি চালা-ঘর তুলিয়া দোকান পাতিয়া বসিল।

'গোকুল দা!'

'কেন রে পেসাদী!'

'ওটা কি গড়ছো?'

'চুড়ী।'

'কার চুড়ী?'

'পরাণ বাগের ছেলের বিয়ে হবে, তারি বোয়ের চুড়ী।'

পেসাদী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা গোকুল দা, তোমার বিয়ে হবে?'

গোকুল রূপার পাতে হাতুড়ীর ঘা দিতে দিতে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল 'হুঁ।'

'আমার?'

'তোরও বিয়ে হবে।'

'তোমার বউকে চুড়ী দেবে?'

'নিশ্চয়।'

'আমাকে?'

'তোকেও তোর বর চুড়ী দেবে।'

পেসাদী ছোট হাতুড়ীটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, 'তুমি কিছু দেবে না?'

'দেব।'

'কি দেবে?'

'সোনার চুড়ী।'

বিস্ময়ে চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া পেসাদী বলিল, 'সোনার চুড়ী?'

গোকুল তাহার হর্ষসমুজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'হাঁ।'

পেসাদী বলিল, 'সত্যি?'

গোকুল বলিল, 'আমি কি মিছে কথা বলি।'

পেসাদী আনন্দে মাথা নাচাইতে নাচাইতে বলিল, 'ওঃ, সোনার চুড়ী! আচ্ছা, কবে দেবে?'

'তোর বিয়ের সময়।'

পেসাদী উঠিয়া দাঁড়াইল; হর্ষোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, 'আমি মাকে বলি গে, সোনার চুড়ী!'

সে প্রস্থানোদ্যত হইলে গোকুল হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং একটু ধমকের সুরে বলিল, 'খবরদার, তা হ'লে কিন্তু দেব না।'

পেসাদীর হর্ষোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। তখন গোকুল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিল, 'এখন এ কথা কাউকে বলতে নাই, বুঝলি?'

পেসাদীর মুখে আবার হাসি ফুটিল; বলিল, 'কাউকে বলবো না?'

গোকুল বলিল, 'না।'

পেসাদী তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া এবং আর একবার গোকুলের প্রতিশ্রুতি লইয়া চলিয়া গেল। গোকুল মুগ্ধ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার হর্ষচঞ্চল গতির দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুলের নিষেধ করিবার একটু কারণও ছিল। পেসাদী প্রতিবেশী গগন দত্তের ভাইঝি। পেসাদীর বাপ ছিল না, বিধবা মা ছিল। মেয়ে বড় হইতেছে দেখিয়া মা তাহার বিবাহের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু মনের মত পাত্র মিলিতেছিল না। এই মেয়েটিই মায়ের একমাত্র সম্বল; সুতরাং বেশী দূরে দিবার ইচ্ছা ছিল না, অথচ একটু ভাল ঘরে দিবারও লোভ ছিল। কিন্তু এরূপ মনোমত পাত্র না পাওয়ায় বিধবা অবশেষে গোকুলকেই মনোনীত করিয়াছিল, এবং গোকুলের মায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও কহিতেছিল। সে কথাবার্ত্তা খুব গোপনে হইলেও মায়ের কথার ভাবে গোকুল সেটুকু বুঝিয়া লইয়াছিল। ইহাতে সে যে মনের ভিতর আশা ও আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস অনুভব করিতেছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও, এ অবস্থায় পেসাদীকে সোনার চুড়ী দিবার প্রতিশ্রুতিটা প্রকাশ পাইলে তাহা যে নিতান্তই লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা গোকুল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। পেসাদীর মা কথাটা শুনিলে কি মনে করিবে! ছিঃ!

গোকুল যে আশায় পেসাদীর নিকট প্রতিশ্রুত হইল, তাহার সে আশা

কিন্তু পূর্ণ হইল না। বিবাহের কথাটা চাপা রহিল না, শীঘ্রই পাঁচ কান হইয়া পড়িল, এবং সেই পাঁচ কানের মধ্যে গোপালেরও একটা কান ছিল। এমন অসম্ভব কথাটা শুনিয়া গোপাল শীঘ্রই পেসাদীর মায়ের কাছে উপস্থিত হইল, এবং গোকুলের মত হতভাগার হাতে মেয়ে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় পেসাদীর মাকে আত্মীয়তাসূচক কতকগুলা তিরস্কার করিয়া দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিল যে, ইহা অপেক্ষা মেয়েটার গলায় কলসী বাঁধিয়া কানা নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়াও লক্ষগুণে ভাল। গোকুল তাহার আত্মীয় হইলে কি হয়, দোষগুণ বলিবার অধিকার ত সকলেরই আছে; এই অধিকারের বলেই সে জানাইয়া দিতেছে যে, গোকুলের মত নিগুর্ণ পাত্র জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

তখন পেসাদীর মা ভীত হইয়া পরমাত্মীয় গোপালের শরণাপন্ন হইল। গোপাল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, গাংপুরে তাহার এক মাস্তুতো শালা আছে। যেমন ঘর, তেমনই বর। পেসাদীর মা যখন তাহার উপর নির্ভর করিয়াছে তখন সে যেরূপেই হউক, এই ছেলেটাকে ঠিক করিয়া দিবে। শুধু তাহাই নয়, সে এমনও আশ্বাস দিতে পারে যে, ইহাতে পেসাদীর মার একটী পয়সাও খরচ হইবে না।

পেসাদীর মা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল, এবং নিজের স্ত্রীবুদ্ধিকে অসংখ্য ধিক্কার দিয়া শতমুখে এই পরোপকারী লোকটীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই সংবাদটা গোকুলের কানে গেলে সে প্রথমটা একটু বিচলিত হইয়া পড়িল; তার পর মনটাকে স্থির করিয়া লইয়া স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং যে জিনিসগুলা গড়িবার জন্য কোনও তাড়া ছিল না, তাহাই দুই দিনে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

গোকুলের মা কিন্তু এত সহজে স্থির হইতে পারিল না। তাহার ছেলের বিবাহে যে কানভাঙ্গানী দেয়, তাহার সুবিচার করিবার জন্য ভগবানের নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল। শুনিয়া গোকুল বলিল, 'ছি মা, কাকা যে।'

গোকুলের মা কিন্তু এত বড় অপমানটা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিল না, সে ইহারই মধ্যে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, এবং গগন দত্তকে ধরিয়া এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভাল ঘর পাওয়া গেল না। মেয়ের বাপ খুব গরীব, কিছু দিয়া খরচের সাহায্য করিতে হইবে। গোকুলের মা তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। পেসাদীর

ববাহের এক দিন পরেই গোকুলের বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। গোকুল বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কেন মা?'

মা বলিল, 'আমার খুসী।'

বলিয়া গোকুলের হাতে এক ছড়া হার এবং দুইখান মাকড়ী দিল, এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দুই গাছা বালা ও দুইটা পাশী মাকড়ী গড়িবার আদেশ দিল।

৪

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পশ্চিম আকাশে একখানা কালো মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল। বাতাস একটুও ছিল না, গাছ পালা সব যেন আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; সন্ধ্যা না হইতেই জমাট অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া যাইতেছিল। এমন সময় পেসাদী আসিয়া ডাকিল, 'গোকুল দা!'

চমকিতভাবে গোকুল বলিল, 'কে, পেসাদী? এমন সময়?'

পেসাদী দোকানের ভিতর আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল 'তোমার চুড়ী কৈ?'

চুড়ীর কথাটা গোকুলের আদৌ মনে ছিল না, সুতরাং সে সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে পেসাদীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পেসাদী একটু হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, 'ভুলে গেছ বুঝি?'

ঈষৎ লজ্জিতভাবে গোকুল বলিল, 'কবে বিয়ে?'

পেসাদী বলিল, 'কবে কি? পরশু।'

গোকুল হাসিয়া বলিল, 'ও, পরশু—এখনো দু'দিন।'

অতঃপর সে পেসাদীর অঙ্গের অলঙ্কারের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর এ সব গয়না এল কোথা হ'তে?'

পেসাদী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, 'গায়ে-হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে হার; মাকড়ী আর মল এসেছে। বালা জোড়া মায়ের ছিল।'

'আজ গায়ে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে?'

'হাঁ।'

বাহিরে গোঁ গোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। পেসাদী ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া উঠিল, 'ওমা, ঝড় উঠলো যে।'

গোকুল বলিল, 'একটু ব'সে যা।'

'না, এই সময়ে পালাই' বলিয়াই পেসাদী ছুটিয়া বাহির হইল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আট গাছা চুড়ী, ছ' ভরির কম কিছুতেই

দাঁড়াবে না। ছ' ভরি সোনা কোথায়? সময়ও নাই, দুই দিনের কম চুড়ী প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু সোনা পাই কোথায়?

গোকুল যখন দোকানে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিল, পেসাদী তখন ঝড়ের ধূলা আর মেঘের অন্ধকারের মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছিল। কিন্তু গোকুলের দোকানের পর গোপালের দোকান পার হইয়া বোস পুকুরের পাড়ের কাছে যাইতেই একটা তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। পেসাদী ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কে আসিয়া দৃঢ় হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে কথা কহিবার অবসরমাত্র না দিয়াই তাহার গলার হার এবং কাণের মাকড়ী ছিনাইয়া লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। পেসাদী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিকটেই লোকের বাস। চীৎকার শুনিয়া অনেকেই ছুটিয়া আসিল। গোপালও দোকান হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল; সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দোকানে গগন ছিল, সেও আসিল। তাহারা পেসাদীর মুখে অলঙ্কার-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। গোপাল ব্যস্ততার সহিত বলিল, 'পুলিসে খবর দাও।'

গ্রামেই পুলিস থানা। গগন সেখানে খবর দিতে ছুটল।

অবিলম্বে দারোগা, জমাদার, কনেষ্টবল প্রভৃতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে; ঝড়ে মেঘের দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। মধ্যগগনে বসিয়া শুক্লাষ্টমীর চাঁদ হাসিতেছে।

দারোগা প্রথমেই পেসাদীর এজাহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সে এই সময় কোথায় গিয়াছিল, কেন গিয়াছিল, চোর কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারিয়াছে কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তরে পেসাদী কাঁদিতে কাঁদিতে গোকুলের দোকানে যাওয়া, সেখান হইতে প্রত্যাগমন, বিদ্যুৎস্ফুরণে চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ান, ইত্যাদি সকল কথা বলিল, কিন্তু চোর কে, বা সে কোন্ দিক্ হইতে আসিল, তাহার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তবে সে যে পিছন হইতে আসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিল। গোপাল সাক্ষ্য দিল যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া এক জন লোককে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ঝড়ের সময় কে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে ভাবিয়া তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, এবং অন্ধকারে লোকটাকেও চিনিতে পারে নাই।

এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া গোপাল দারোগা বাবুর কাণের কাছে মুখ রাখিয়া কি একটা সন্দেহের কথা বলিল। শুনিয়া দারোগা বাবু তাহার মুখের উপর বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

৫

অনেকক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দোকানের দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মাতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার দুইখানি বাহির করিল। নিক্তি ধরিয়া ওজন করিয়া দেখিল, সাড়ে ছয় ভরি। তাহার মুখে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল।

তার পর গোকুল হাপর ঠিক করিয়া মুচিতে গহনা দুইটী রাখিয়া তাহা হাপরে চড়াইয়া দিল, এবং তাহার চারি পাশে কয়লা সাজাইয়া দিয়া জোরে জোরে যাঁতা টানিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিমধ্যস্থ মুচি অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল, গহনা দুইটা উত্তাপে লাল হইয়া আসিল। গোকুল ডান হাতের দুই আঙ্গুলে একটু সোহাগা লইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুচির দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা দোকানের বাহিরে একটা কলরব উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দুম্ দাম্ শব্দে ঘা পড়িল। ভীতি ও বিস্ময়ে বিমূঢ় গোকুল উঠিয়া দরজা খুলিবে কি না স্থির করিবার পূর্ব্বেই দরজাটা হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। দারোগা বাবু সদলবলে দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গোকুল বাঁ হাতে যাঁতা, ডান হাতে সোহাগাটুকু ধরিয়া বিস্ময়স্তব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গোপাল তাড়াতাড়ি গামলার খানিকটা জল হাপরে ঢালিয়া দিল।

হাপর হইতে মুচি নামান হইলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার মধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ হার ও মাকড়ি। পেসাদী হাঁ করিয়া একবার গোকুলের মুখের দিকে, আরবার দারোগার ভ্রূকুটীভীষণ মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, এবং দারোগার নিকট ধমক খাইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই হার ও মাকড়ি তাহারই। গোকুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সত্যি পেসাদী, এগুলা এখন তোরি বটে, কিন্তু মনের মত ক'রে চুড়ী গ'ড়ে দিতে পেলাম না।'

'তবে নিজেই চুড়ী পর' বলিয়া জমাদার তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। গগন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কিন্তু গোকুল—'

দারোগা বাবু একটা অশ্রাব্য ভাষায় তাহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন।

গোকুলের মা গোপালের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া বলিল, 'এ কি হ'লো ঠাকুরপো!'

গোপাল প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কি ক'রবো বল, পাপের সাজা ভগবান্ দেন। হতভাগা নেহাৎ নির্ব্বোধ কি না। একটা দিন না হয় চেপে রাখ্। তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গালিয়ে ফেলতে বসেছে। হরি হে, তুমিই সত্য!'

গোকুলের মা কাঁদিয়া বলিল, 'ও ঠাকুরপো, সে হার মাকড়ী যে আমার; আমিই তাকে গয়না গড়তে দিয়েছি।'

তীব্র বিদ্রূপের স্বরে গোপাল বলিল, 'তুমি তো গোকুলেরই গর্ভধারিণী। এমন রত্নগর্ভা মা না হ'লে এমন রত্ন জন্মায়!'

গোপালের স্ত্রী ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'পরের মেয়ের গয়না নিয়ে ছেলের বিয়ে। গলায় দড়ি!'

গোপাল বলিল, 'শুধু ত বিয়ে নয়, আমার উপর টেক্কা দেওয়া। আমার মধুসূদন আছেন। দীনবন্ধু হে, তুমিই সত্য।'

তাহার এই আহ্বানে দীনবন্ধুর আসন টলিয়াছিল কি না, বলা যায় না, কিন্তু কৃতজ্ঞতার আসনটা নিশ্চয়ই বিচলিত হইয়াছিল।

তার পর ছয় মাস জেল খাটিয়া গোকুল যে দিন ফিরিয়া আসিল, তাহার কয়েক দিন পরে একটা চুরীর মোকদ্দমার থানাতল্লাসীর ফলে গদাই ডোমের ঘর হইতে যখন পেসাদীর হার ও মাকড়ী বাহির হইল, তখন গোপাল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, 'ছোঁড়া যেমন নির্ব্বোধ, তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। ছি ছি, এমন নির্ব্বোধও জগতে থাকে? হরি হে, তুমিই সত্য।'

নির্ব্বোধ গোকুল কিন্তু খুড়ার এ সকল কথায় কান না দিয়া আপনার চালা-ঘরে বসিয়া ঠুক্-ঠাক্ শব্দে রূপা পিটিতে লাগিল; আর তাহারই সঙ্গে মাঝে মাঝে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

এত সাধের বাগান আমার ফুটলো নাকো ফুল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ফাল্গুন। শ্রীনারায়ণপ্রসাদের অঙ্কিত 'শাপসন্তপ্ত অহল্যা' নামক ছবিখানি 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' ও মামুলী চিত্রকলা-পদ্ধতির hybrid ; অথবা ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি ক্রমে স্বভাবের সন্নিহিত হইতেছে। ইহার মেঘ, ভূমি, পাষাণখণ্ড, অহল্যা প্রাকৃতিক ; অন্ততঃ অপ্রাকৃত নহে। ইহাতে পরিপ্রেক্ষিত একবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই। অহল্যার মাথার আধ-ঘোমটা ; তাহাতে 'নন্‌'দিগের মস্তকাবরণের আভাস আছে! গাছপালার পাতাগুলি 'ভারতীয়'—কিন্তু কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা জাগতিক ; কাল্পনিক নহে। পুরাণের অহল্যা গৌতমের শাপে তৎক্ষণাৎ পাষাণী হইয়াছিলেন। চিত্রকর কি তাঁহার 'সন্তপ্ত' মুহূর্ত্ত আঁকিয়াছেন ? শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 'চিত্রকলা-পদ্ধতি'র সাধকগণ স্বাভাবিকতার পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, অক্ষমতাই উদ্ভটতার জননী। চিত্র-প্রতিভাও স্বভাবকে হত্যা করিয়া কোনও একটা পদ্ধতির পূজা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে না। 'বিকৃতি' 'ভারতীয়' বা 'জাতীয়' কলার বৈশিষ্ট্য নহে। 'পাটেল-বিল' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। ইহা পাটেল-বিলের সমর্থন-সভার সভাপতির অভিভাষণ। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে প্রতি-পক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও 'বদ-জবান' গোঁড়া সম্প্রদায়েরই উপজীব্য ছিল। এবার তাহার 'ঠিক উল্টা'! অবনীন্দ্রবাবুর মত 'cultured' শিল্পীর রচনাতেও লঘুতার ও চপলতার অভাব নাই। সভাপতি একটা 'ধ্রুব সত্য' প্রকাশ করিয়াছেন,—'অসবর্ণ বিয়ের আইন পাশ হলেই যে দেশশুদ্ধ কোমর বেঁধে সেই কাজে লেগে যাবে, সে-আশা খুবই কম।' বাস্তবিক, 'সে আশা খুবই কম।' কারণ, যাঁহারা আইনের পক্ষপাতী, তাঁহারা—অন্ততঃ তাঁহাদের পনের আনা তিন পাই—মুখে অসবর্ণ-বিবাহের সমর্থন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন, আপনারা অসবর্ণ-বিবাহের সংস্রবে আসিবেন না, ইহা নিশ্চিত। তাহার পর অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ—এমনি সব আইনগুলির সঙ্গে মুখ্যভাবে আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার যোগ।' ইহাও খুব সত্য। 'আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার যোগ' না হইলে, কোনও সংস্কারই সিদ্ধ হইতে পারে না। আইন হইতে পারে, কিন্তু আইন 'নিজশক্তি' ও 'ইচ্ছা'র সৃষ্টি করিতে পারিবে না। 'স্বয়ম-সিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি ?' যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কি অসবর্ণ-বিবাহের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, তাহার সকলগুলি শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত ? গোঁড়া হিন্দুরা প্রতিলোম-বিবাহে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে 'চণ্ডাল' বলিয়া গণ্য করিলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না ?—'ব্রিটিশ রাজশক্তি ও ইচ্ছা'র সাহায্যে আমরা সমাজকে স্বর্গে লইয়া যাইতেও প্রস্তুত নহি। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের পর 'শ্রীনবকুমার কবিরত্নে'র 'পাতিল-প্রমাদ বা প্রসঙ্গ-প্রতিবাদ' নামক পদ্য। 'নবকুমার কবিরত্ন' কাল্পনিক। মহাকবি নাম গোপন করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন! বহুরূপীর ভূমিকা ধার না করিয়া যাহারা গালি দিতেও পারে না, ছদ্মবেশের মুখের অন্তরালে লুকাইয়া যাহারা গালাগালি বর্ষণ করে, তাহারা শুধু 'কাপুরুষ' নয়, কর্ম্ম পণ্ড করিবার ওস্তাদও বটে! এই শ্রেণীর জীব কখনও অসবর্ণ-বিবাহের ত্রিসীমায় যাইবে না,

ইহাও 'ধ্রুব-সত্য'। ছড়ার নাম দিবারও যাহার সৎসাহস নাই, তাহার সমর্থনের মূল্য কি? শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টুকনি' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। 'স্বরলিপি'তে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটী 'সমর-সঙ্গীতে'র 'কথা' ও সুর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'সমর-সঙ্গীতে'র সুর 'মিশ্র—খেম্‌টা!' বিষয় অবশ্য বাঙ্গালী সৈনিক। 'ইহা বলিলেই সকল বলা হইল।' শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'ডাক-পিয়ন' খুব সংক্ষিপ্ত; এবং তাহাই উহার একমাত্র গুণ। 'ভারতী'র কবিতার নিরিখ সমান আছে। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সপন' 'ভারতী'র কবিতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এবার ব্যাপার গুরুতর। কবি বলিতেছেন,—

'কপাল হইতে হাত সরাইয়া অকস্মাৎ
হেরি তায় রক্ত দরদর—
লুকান্' সঙ্গীন কা'র খোঁচা দেয় বার বার,—
ঝরে ধারা ক্ষণ ঝরঝর।'

আহত কবি হাঁসপাতালে না গিয়া কলম চটাৎ বসিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালী এই রক্তাক্ত কবিতা লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতার 'শোণিতা' নাম রাখিলে হয় না? বাস্তবিক, আমরা 'হেরি তায় রক্ত দরদর' বলিতে না পারি, বাঙ্গালার কবিতা নিশ্চয়ই বলিতে পারে, 'লুকান সঙ্গীন কার খোঁচা দেয় বার বার!' হায়, 'লোকে বলে তুমি করুণানিধান', কিন্তু তুমিও কবিতার প্রতি এত নির্দ্দয়! বাঙ্গালা কবিতার ভাগ্যে কলম সত্যই 'সঙ্গীন্' [স্বার্থ] হইয়া উঠিল। 'ভারতী' শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'উর্ব্বশী'র সমালোচনায় বলিয়াছেন,—'লেখিকা ভাষাকে স্থানে স্থানে বড় মোচড় দিয়াছেন।' লেখিকা এ 'মোচড়ের' ভাষা'র অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও অনায়াসে চলতী ভাষার মহারাণী 'ভারতী'কে বলিতে পারেন, 'ক্রটস, তুমিও!'

প্রবাসী। ফাল্গুন। চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকীলের 'জরার মেয়ে' উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রবস্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের কল্পনার যোগ্য বটে। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' স্বদেশের আলেখ্য, স্বদেশের সৌন্দর্য্য, স্বদেশের ভাবে শিল্পীকে আকৃষ্ট করিতেছে এবং এই সূচনায় ভারতের চিত্রপ্রতিভার ভবিষ্যৎ বিজয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন, তাহা আমরাও স্বীকার করিব। 'জরার মেয়ে'র কল্পনায়, অঙ্কনে, বর্ণ-বিন্যাসে বৈশিষ্ট্য আছে। পরিপ্রেক্ষিত, অনুপাত ও চিত্রবস্তুর সমাবেশে চিত্রকর চিত্রবিজ্ঞান অপেক্ষা যথেচ্ছাচারকে অধিকতর প্রশ্রয় দিয়াছেন। 'জরার মেয়ে'র মুখে বিষাদের ভাব বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু 'জরার মেয়ে'র অপেক্ষা 'জরা'র বিরাট মূর্ত্তিই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'তোমার চিরকেলে অপার' শাক্যকাবীর 'উড়ো চিঠি'তে পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রলয়ের কারণ-পরম্পরার বিশ্লেষণের চেষ্টা ও ভবিষ্যতের আভাস দিবার প্রয়াস আছে। লেখক চলতী ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন; সুতরাং 'মনোকষ্ট'কে প্রকট করিয়াছেন। নূতন-পন্থীরা বলেন, ভাষাকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্যই 'চলতী ভাষা'র আবির্ভাব। 'উড়ো চিঠি' পড়িয়া মনে হয়, ইহার ভাষা যাহাই হউক, বলিবার পদ্ধতির সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য নাই। 'মর আমার, সঙ্গীনের আগে এ Kulture-কে তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব' কোনও বাঙ্গালীই বুঝিতে পারিবে

না। শ্রীউমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত 'শাসনতন্ত্র ও স্বাদেশিকতা'য় কাউণ্ট টলষ্টয়ের 'Patriotism and Government' নামক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। সময়ের উপযোগী! আমাদের ক স্বরা অধিকার'কে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছিলেন। টলষ্টয়ের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিশ্বপ্রেম ও উচ্চাধিকারীর দম্ভ। বিজিত পরাধীন প্রজার পক্ষে 'Patriotism' মহাপাপ নয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। স্বাদেশিকতায় সিদ্ধ না হইলে, তাহার পরবর্ত্তী উচ্চ গ্রামে কোনও জাতি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। যাহাদের 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য' ধূলায় লুটিতেছে, তাহাদের পক্ষে 'প্যাট্রিয়টিজম ভাবটাই' নিশ্চয়ই 'নীচতামূলক এবং অনিষ্টকর' নয়। 'পিয়ার গালের ছোট এক তিল' হইতে শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী যে তালের সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃত্রিমতার প্রাচুর্য্যে তাহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কষ্টকল্পিত উপমার ভারে তিলের সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে। 'স্থল-কমলেরে আলগোছে ছোঁয় শিশু এক শ্যাম-লতা গো!' 'স্থল-কমল' নিশ্চয়ই 'পিয়ার গাল'; সুতরাং তিলটি হইতেছে— 'আলগোছে ছোঁয় শিশু এক শ্যাম-লতা গো!' শ্যাম-লতা নয়, তাহার 'আলগোছে ছোয়া'টুকু! আগেকার কবিরা 'প্রকাশ করিয়া কহিতেন', এখনকার কবিরা ঢাকিয়া কহেন। অনেক কথা কবির মনেই থাকে। যাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাও পুরুষের ভাগ্যের মত—অব্যক্ত, অজ্ঞেয়, অবোধ্য; 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।' 'বিষ্ণুপুরী'র 'বিষ্ণুপুর' উল্লেখযোগ্য সুখপাঠ্য রচনা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নবজীবনের গান' শুনিয়া কবিতার প্রাণ নিশ্চয়ই 'আন্-চান' করিবে। 'বিশপ লেফ্রয়' তাঁহার আর একটী উদ্গার। বিশারদের 'তাও ছাপালি পত্র হলো, নগদ মূল্য এক টাকা' মনে পড়ে। অবশ্য, ইহার মূল্য এক পয়সাও নয়। শ্রীসীতা দেবীর 'রামলীলা' একটী চলনসই আখ্যান। শ্রীঅনামিকা দেবী 'ভাব ও ভাষা' নামক 'কবিতা'য় যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য,—

> 'প্রকাশ করিতে গেলে ভাষা যে জোটে না হায়,
> তাই সে মনের ভাব মনেই মিশায়ে যায়।'

এই জন্যই জগতে 'নীরব-কবি'র সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ কবিতা মনে মিশিয়াও নিস্তার পায় নাই। শ্রীঅনামিকা দেবী কলমের ডগায় বিঁধিয়া সেই সমাহিত ভাবকে তুলিয়াছেন, এবং তাহাকে 'প্রবাসী'র আসরে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উদ্বোধন। ফাল্গুন। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করিয়া কর্ম্মযোগের যে উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন, 'জনৈক ব্রহ্মচারী' 'কর্ম্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য' সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামীর 'বৈদিক বিদুষী মৈত্রেয়ী' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ। কিন্তু সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্র' আমরা সকলকে পাঠ করিতে বলি। প্রেমানন্দই বটে! 'ভূ—বাবু অতি সুন্দর লোক। সবই সুন্দর, অতি সুন্দর। অসুন্দর কাহাকেও তো দেখি না।' প্রেমানন্দের পূত দৃষ্টিতে অসুন্দরও যে সুন্দর হইয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের 'ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কি না?' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। 'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়া স্বয়ং ধন্য হইতেছে, বাঙ্গালীকে ধন্য করিতেছে। স্বর্গীয় স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্বহস্তে উপ্ত ও স্নেহধারায় পুষ্ট ক্ষুদ্র বীজ ক্রমে বাঙ্গালায় মহামহীরুহে পরিণত ও জাতির উপজীব্য হইতেছে। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র

মিত্র 'প্রকৃত মহাত্মা'র চীন সন্ন্যাসী ইয়েন-হোর সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রজশক্তি' আমাদের পক্ষে গ্রীক।

ভাণ্ডার। মাঘ।—ফাল্গুনের 'ভাণ্ডা'র এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসের 'কৃষকের উক্তি' নামক 'কবিতাটি মুরশিদাবাদ জেলার কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় লিখিত।' মরুমারী বটে। 'সমবায় বীমা, জল-সরবরাহ, স্বাস্থ্যোন্নতি ও গৃহনির্ম্মাণ' পাঁচ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে কেবল আভাস আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এই চারিটি বিষয়ের স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা দেখিব। গরু কৃষকের প্রধান অবলম্বন। গরুর জীবন-বীমার ব্যবস্থা হইলে চাষী উপকৃত হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন,—'পশু-বীমার বন্দোবস্ত করিতে হইলে খুব সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হয়। কোনও জায়গায় শতকরা কত গোরু প্রতি বৎসর মারা যায়, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হয়। * * বহু বৎসরের গড় দেখিয়া তবে স্থির করিতে হয়। বীমা কেবল সবল ও সুস্থ পশুরই হইতে পারে। সুতরাং হিসাবও সুস্থ পশু সম্বন্ধেই করিতে হয়। ধরা যাউক, কোনও জায়গায় শতকরা ১০টী সুস্থ পশু প্রতি বৎসর মারা যায়। এক শত পশু যদি বীমা করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর গড়ে ১০টী পশুর দাম বীমা আফিসকে দিতে হইবে। এই ১০টী পশুর দাম যদি ২০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে এক শত বীমাকৃত গোরুর প্রত্যেকের জন্য চাঁদা বৎসর ২০০০÷১০০=২॥০ টাকা দিতে হইবে। ইহা বাদে বীমার কার্য্য চালাইতে অন্য খরচও আছে। সেই সমস্ত ধরিয়া তবে চাঁদার পরিমাণ স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক পশু বীমা করিবার পূর্ব্বে উহাকে ভালরূপ পরীক্ষা করিতে হয়, উহার কোনও পীড়া আছে কি না জানিবার জন্য। বীমার পরে বীমাকারী যাহাতে পশুকে রীতিমত আহার দেয় ও যত্ন করে, তাহাও দেখিতে হয়। জীবন-বীমা অপেক্ষা পশু-বীমায় প্রতারণার সম্ভাবনা অধিক। * * গোরুর জন্য পাঁচ বৎসর চাঁদা দিয়া অনেকে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে ইতস্ততঃ করে না। পাঁচ বৎসর পরে গরুর মূল্য অনেক কমিয়া যায়। তাহাকে মারিয়া ফেলিলে যদি তাহার মূল্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকে সে পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই টাকায় নূতন গোরু কিনিতে ইতস্ততঃ করিবে না। সেই জন্য পশু-বীমাতে পশুর পূরা দাম দেওয়া হয় না। গোরু মারা গেলে তাহার মূল্যের ¾ অংশ বীমাকারী পাইবে, এইরূপই ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্ষে পশুর বীমার জন্য সমবায়-সমিতি খুব কমই হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে কতকগুলি আছে। সেখানে চাষের বলদ ও মহিষ ভিন্ন অন্য কোনও পশু বীমা করা হয় না। চারি বৎসরের কম এবং বারো বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন পশুও বীমা করা হয় না। বীমার পূর্ব্বেই প্রত্যেক পশুর মূল্যনির্দ্ধারণ করা হয়। কোনও সমিতিই একাধিক গ্রামের পশু বীমা করে না। বীমাকৃত পশুর মৃত্যু হইলে তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ হইতে তাহার চামড়ার দাম বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা বীমাকারীকে দেওয়া হয়।' শ্রীমদনমোহন লাহিড়ীর 'দেশী কাগজ' তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। কিন্তু কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশী কাগজ কি আর মাথা তুলিতে পারিবে? 'নানা কথা'য় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। 'উদ্ভিদের আহার্য্য উপাদান ও তাহাদের উপকারিতা' 'কৃষিলক্ষ্মী' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।